আমি পদ্মজা
ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা

ইলমা বেহরোজ

অন্তর্জাল সংস্করণ

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

পর্ব ১

ফাহিমা ক্লান্ত হয়ে ধপ করে ফ্লোরে বসে পড়ল। হাত থেকে লাঠি পড়ে গিয়ে মৃদু আওয়াজ তোলে। তার শরীর ঘেমে একাকার। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম হাতের তালু দিয়ে মুছে, বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। এরপর চোখ তুলে সামনে তাকাল। রিমান্ডে কোনো পুরুষই টিকতে পারে না, সেখানে একটি মেয়ে আজ চার দিন ধরে রিমান্ডে। তাঁর সামনে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছে। চার দিনে একবারও মুখ দিয়ে টু শব্দটি করল না। শারিরীক, মানসিক কত নির্যাতন করা হয়েছে, তবুও ব্যথায় আর্তনাদ অবধি করেনি! মনে হচ্ছে, একটা পাথরকে পেটানো হচ্ছে। যে পাথরের রক্ত ঝরে কিন্তু জবান খোলে না। তখন সেখানে আগমন ঘটে ইন্সপেক্টর তুষারের। তুষারকে দেখে ফাহিমা কাতর স্বরে বলল, 'সম্ভব না আর। কিছুতেই কথা বলছে না।'

তুষার অভিজ্ঞ চোখে মেয়েটিকে দুয়েক সেকেন্ড দেখল।এরপর গম্ভীর কণ্ঠে ফাহিমাকে বলল, 'আপনি যান।'

ফাহিমা এলোমেলো পা ফেলে চলে যায়। তুষার একটা চেয়ার নিয়ে মেয়েটির সামনে বসল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আপনার সাথে আজ আমার প্রথম দেখা।'

মেয়েটি কিছু বলল না। তাকালও না। তুষার মেয়েটির দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে তাকাল। বলল, 'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি চোখ তুলে তাকায়। ঘোলাটে চোখ। কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। চোখের চারপাশ গাঢ় কালো। চোখ দু'টি লাল। মুখের এমন রং রিমান্ডে আসা সব আসামীর হয়। তুষার মুখের প্রকাশভঙ্গী আগের অবস্থানে রেখেই আবারও প্রশ্ন করল, 'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ায়। মনে পড়ে তার! তুষার একটু ঝোকে। মেয়েটি অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকায়। তুষার মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'নাম কী?'

যদিও তুষার মেয়েটির নাম সহ পুরো ডিটেলস জানে।তবুও জিজ্ঞাসা করল। তার মনে হচ্ছে,মেয়েটি কথা বলবে। সত্যি তাই হলো। মেয়েটি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারণ করল, 'পদ্ম...আমি...আমি পদ্মজা।'

পদ্মজা হেলে পড়ে তুষারের উপর। তুষার দ্রুত ধরে ফেলল। উঁচু কণ্ঠে ফাহিমাকে ডাকল, 'মিস ফাহিমা। দ্রুত এদিকে আসুন।'ফাহিমা সহ আরো দুজন দ্রুত পায়ে ছুটে আসে।

১৯৮৯ সাল। সকাল সকাল রশিদ ঘটকের আগমনে হেমলতা ভীষণ বিরক্ত হোন। তিনি বার বার পইপই করে বলেছেন, 'পদ্মর বিয়ে আমি এখুনি দেব না। পদ্মকে অনেক পড়াবো।'তবুও রশিদউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে, সপ্তাহে একেক পাত্রের খোঁজ নিয়ে আসবেন। মেয়ের বয়স আর কতই হলো? মাত্র ষোল। শামসুল আলমের মেয়ের বিয়ে হয়েছে চব্বিশ বছর বয়সে। পদ্মর বিয়েও তখনি হবে। পদ্মর পছন্দমতো। হেমলতা রশিদকে দেখেও না দেখার ভান ধরলেন। রশিদ এক দলা থুথু ফেললেন উঠানে। এরপর হেমলতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'বুঝছো পদ্মর মা,এইবার যে পাত্র আনছি, এক্কেরে খাঁটি হীরা।' হেমলতা বিরক্তভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি আমার মেয়ের জন্য পাত্র চাইনি। তবুও বার বার কেন আসেন আপনি?'

'যুবতী মাইয়া ঘরে রাহন ভালা না।'

'মেয়েটা তো আমার। আমাকেই বুঝতে দেন না।'হেমলতার কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

রশিদ অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলেন না।ব্যর্থ থমথমে মুখ নিয়ে সড়কে পা রাখেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো পাত্রপক্ষ এসে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলবে,

'মোর্শেদের বড় ছেড়িডারে চাই।'

রশিদ নিজে নিজে বিড়বিড় করে আওড়ান, 'গেরামে কি আর ছেড়ি নাই? একটা ছেড়িরেই ক্যান সবার চোক্ষে পড়তে হইব? চাইলেই কি সব পাওন যায়?'

পূর্ণা স্কুল জামা পরে পদ্মজাকে ডাকল, 'আপা? এই আপা? স্কুলে যাবি না? আপারে…"

পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে কোনোমতে বলল, 'না।'পর পরই চোখ বুজে ঘুমে তলিয়ে গেল। পূর্ণা নিরাশ হয়ে মায়ের রুমে আসে।

'আম্মা, আপা কী স্কুলে যাইব না?'

হেমলতা বিছানা ঝাড়া রেখে পূর্ণার দিকে কড়াচোখে তাকান। রাগী স্বরে বললেন, 'যাইব কি? যাবে বলবি।'

পূর্ণা মাথা নত করে ফেলল। হেমলতার কড়া আদেশ, মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছি অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার জন্য নয়। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে। পূর্ণাকে মাথা নত করতে দেখে হেমলতা তৃপ্তি পান। তার মেয়েগুলো মান্যতা চিনে খুব। খুবই অনুগত। তিনি বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'পদ্মর শরীর ভালো না। সারারাত পেটে ব্যাথায় কাঁদছে। থাকুক,ঘুমাক।'

পূর্ণার কিশোরী মন বুঝে যায়,পদ্মজা কীসের ব্যাথায় কেঁদেছিল। সে রাতে নানাবাড়ি ছিল বলে জানতো না।ভোরেই চলে এসেছে। নানাবাড়ি হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে। পূর্ণাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা বললেন, 'তুই যা। মাথা নীচু করে যাবি মাথা নীচু করে আসবি।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

পূর্ণা রুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এরপর গত মাসে মেলা থেকে আনা লাল লিপস্টিক গাঢ় করে ঠোঁটে মাখে। চৌদ্দ বছরের পূর্ণার ইদানীং খুব সাজতে ইচ্ছে করে। হেমলতা সেজেগুজে স্কুলে যাওয়া পছন্দ করেন না বলে,পূর্ণা আগে লিপস্টিক মাখেনি।

টিন দেয়ালের কাঠের ঘড়ির কাঁটায় সকাল দশটা বাজল মাত্র। এখনো পদ্মজা উঠল না। হেমলতা মেয়েদের রুমে ঢোকেন। পদ্মজা দু'হাত ভাঁজ করে ঘুমাচ্ছে। জানালার পর্দা ভেদ করে আসা আলতো পেলব রোদ্দুরের স্পর্শে পদ্মজার মসৃণ, পাতলা ঠোঁট, ফর্সা ত্বক চিকচিক করছে। হেমলতা বিসমিল্লাহ বলে, তিনবার ফুঁ দেন মেয়ের শরীরে। গুরুজনরা বলেন, মায়ের নজর লাগে বেশি। নজর কাটাতে বিসমিল্লাহ বলে ফুঁ দিতে হয়। হেমলতার মায়া লাগছে পদ্মজার ঘুম ভাঙ্গাতে। তবুও আদুরে গলায় ডাকলেন, 'পদ্ম। এই পদ্ম…'

পদ্মজা চোখ খুলে মাকে দেখে দ্রুত উঠে বসে। যেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় সেদিনই হেমলতা ডেকে তোলেন। পদ্মজা অপরাধী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'বেশি দেরি হয়ে গেছে আম্মা?'

'সমস্যা নেই। মুখ ধুয়ে খেতে আয়।'

পদ্মজা দ্রুত কলপাড়ে গিয়ে ব্রাশ করে,মুখ ধোয়। হেমলতা শিক্ষকের মেয়ে। তাই তাঁর মধ্যে নিয়ম-নীতির প্রভাব বেশি। মেয়েদের শক্তপোক্ত নিয়মে রেখে বড় করছেন। পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকে দেখল প্লেটে খাবার সাজানো। সে মৃদু হেসে প্লেট নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। তখন হেমলতা আসেন। পদ্ম দ্রুত ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকে। হেমলতার দেওয়া আরেকটা নিয়ম, খাওয়ার সময় মাথা ঢেকে খেতে হবে। পদ্মজা নিশ্চুপ থেকে শান্তভঙ্গিতে খেতে থাকল । হেমলতা মেয়েকে সহজ কণ্ঠে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করছিস কেন? মুখ ধুতে গিয়ে চুল ভিজিয়ে এসেছিস। খেয়ে রোদে বসে চুলটা শুকিয়ে নিবি ।'

'আচ্ছা, আম্মা।'

'আম্মা, পূর্ণা, প্রেমা আসে নাই?'
'পূর্ণা আসছে। স্কুলে গেছে। প্রেমা দুপুরে আসব।'
'আম্মা, আব্বা কবে আসবেন?'
পদ্মজার প্রশ্নে হেমলতা দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুকনো গলায় জবাব দেন, 'জানি না। খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।'
হেমলতা চলে যেতেই পদ্মজার চোখ থেকে টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে পাতে। পদ্মজা দ্রুত হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। পদ্মজার জীবনে জন্মদাতা আছে ঠিকই। কিন্তু জন্মদাতার আদর নেই। সে জানে না তাঁর দোষটা কী? কেন নিজের বাবা বাকি বোনদের আদর করলেও তাকে করে না? কথা অবধিও বলেন না। দুইবার মাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে, 'আমি কী তোমাদের সত্যিকারের মেয়ে আম্মা? সন্তান হয় না বলে কি দত্তক এনেছিলে? আব্বা কেনো আমাকে এতো অবহেলা করেন? ও আম্মা বলো না?'
হেমলতা তখন নিশ্চুপ থাকেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'তুই আমার গর্ভের সন্তান। আর তোর বাবারই মেয়ে। এখন যা,পড়তে বস। অনেক পড়তে হবে তোর।'
ব্যস এইটুকুই! এর বেশি কিছু বলেন না হেমলতা। পদ্মজার কেন জানি মনে হয়,একদিন হেমলতা নিজ থেকে খুব গোপন কোনো কথা বলবেন। তবে সেটা যেন সহ্য করার মতো হয়। এই দোয়াই সারাক্ষণ করে সে।
'এতো কী ভাবছিস? তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠ।'
হেমলতার কথায় পদ্মজার ভাবনার সুতো ছিড়ল। দ্রুত খেয়ে উঠে। আজ আমের আচার বানানোর কথা ছিল।

সন্ধ্যা কাটতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। কয়েক মাস হলো গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। আট গ্রাম মিলিয়ে অলন্দপুর। তাঁদের গ্রামের নাম আটপাড়া। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধ্যারাত থেকে তিন ঘন্টা গ্রাম অন্ধকারে তলিয়ে থাকে। আর সারাদিন তো বিদ্যুৎ-এর নামগন্ধও থাকে না। বিদ্যুৎ দিয়ে লাভটা কী হলো? পদ্মজা,পূর্ণা,প্রেমা তিন বোন একসাথে পড়তে বসেছিল। বাড়ি অন্ধকার হতেই নয় বছরের প্রেমা খামচে ধরে পদ্মজার ওড়না। পদ্মজা মৃদু স্বরে ডাকল, 'আম্মা? আম্মা..."
'আয়,টর্চ নিয়ে যা।'
হেমলতার আহ্বানে পদ্মজা উঠে দাঁড়াল। প্রেমা অন্ধকার খুব ভয় পায়। পদ্মজার ওড়না ছেড়ে পূর্ণার হাত চেপে ধরে। টর্চ নিয়ে রুমে ঢোকার মুহূর্তে পদ্মজা গেট খোলার আওয়াজ পেল। উঁকি দিয়ে হানিফকে দেখে সে দ্রুত রুমে ঢুকে পড়ল। হানিফ পদ্মজার সৎ মামা।
'বুবু...বাড়ি আন্ধার ক্যান! বাত্তি-টাত্তি জ্বালাও।'হানিফের কণ্ঠ।
'হানিফ আসছিস?'হেমলতা রুম থেকে বেরিয়ে বলেন। হাতে হারিকেন। হানিফ সবকটি দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'হ,আমি।'
'আয়,ভেতরে আয়।'
হানিফ বারান্দা পেরিয়ে বড় ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার ছেড়িগুলান কই তে?'
'আছে রুমেই। পড়ছে।'
'এই আন্ধারেও পড়ে!'
হেমলতা কিছু বললেন না। হানিফ এই বাড়িতে আসলে কেন জানি খুব অস্বস্তি হয়। অকারণেই!
'ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। তুইও খেয়ে নে?'
'এইহানেই খামু? না তোমার সরাইখানাত যাইতে হইবো?'
কথাটায় রসিকতা ছিল। গ্রামে থেকেও হেমলতা খাওয়ার জন্য আলাদা রুম নির্বাচন করেছেন সেটা হানিফের কাছে রসিকতাই বটে! হেমলতা প্রশ্নের জবাব সোজাসাপটা না দিয়ে

বললেন, 'খেতে চাইলে খেতে আয়।'

পদ্মজা কিছুতেই খেতে আসল না। কেমন জড়োসড়ো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, হানিফকে ভয় পাচ্ছে বা অবহেলা করছে। হানিফ ছয় বছর সৌদিতে ছিল। তিন মাস হলো দেশে ফিরেছে। তিন মাসে যতবার হানিফ এই বাড়িতে পা রেখেছে ততবারই পদ্মজা অজুহাত দিয়ে দূরে দূরে থেকেছে। হেমলতার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক মুহূর্তে ভেবে নিল অনেক কিছু। তাই জোর করলেন না। আজই এই লুকোচুরির ফয়সালা হবে। হানিফ পদ্মজাকে দেখার জন্য অনেক ছলচাতুরী করল। কিছুতেই সুযোগ পেল না। বিদ্যুৎ আসার ঘন্টাখানেক পর হানিফ চলে যায়। পূর্ণা, প্রেমা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলল, 'কতবার না করেছি? লোকটার পাশে বেশিক্ষণ না থাকতে? তোরা কেনো শুনিস না আমার কথা?'

পূর্ণা ও প্রেমা বিস্ময়ে হতবিহ্বল। পদ্মজা কখনো তাদের এমন নিষেধ দেয়নি। তাহলে এখন কেন এমন বলছে? হেমলতা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা চুপসে গেল। 'পদ্ম আমার রুমে আয়।'

মায়ের এমন কঠিন কণ্ঠ শুনে পদ্মজার কলিজা শুকিয়ে আসে। হেমলতা নিজের ঘরে চলে যান।

হেমলতা মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা নতজানু হয়ে কাঁপছে। সুন্দরীরা ভীতু আর বোকা হয় তার দৃষ্টান্ত প্রমাণ পদ্মজা। হেমলতার খুব মায়া হয় পদ্মজার সাথে উঁচুকণ্ঠে কথা বলতে। পদ্মজা রূপসী বলেই হয়তো! গোপনে আবেগ লুকিয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী লুকোচ্ছিস? হানিফের সামনে কেন যেতে চাস না? সে কী করেছে?'

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকে। হেমলতা সেকেন্ড কয়েক সময় নিয়ে নিজেকে সামলান। কণ্ঠ নরম করে বললেন, 'হানিফ ধড়িবাজ লোক! সৎ ভাই বলে বলছি না। আমি জানি। তাঁর ব্যাপারে যেকোনো কথা আমার বিশ্বাস হবে। তুই বল কী লুকোচ্ছিস?'

মায়ের আদুরে কণ্ঠে পদ্মজা আচমকা বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো হু হু করে কেঁদে উঠল।

পর্ব ২

বাড়িটা মোড়ল বাড়ি নামে পরিচিত। পদ্মজার দাদার নাম ছিল মিয়াফর মোড়ল। তিনি গ্রামের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। ছয় কাঠা জমির উপর টিনের বিশাল বড় বাড়ি বানিয়েছিলেন চার ছেলের জন্য। দুই ছেলে ষোল বছর আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। দুজনই টগবগে যুবক ছিল। আর একজন আট বছর বয়সে কলেরা রোগে গত হলো। বাকি রইল মোর্শেদ মোড়ল। বর্তমানে এই বাড়ি মোর্শেদের অধীনে। যদিও তিনি থাকেন না সবসময়। পুরো বাড়ির চারপাশ জুড়ে গাছগাছালি। বাড়ির পিছনে নদী। রাত নয়টা বাজলেই পরিবেশ নিশুতি রাতের রূপ ধারণ করে। রাতের এই নির্জন প্রান্তর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে ছেয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার সাথে পদ্মজার ভাঙ্গা কান্না মিলেমিশে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, কোনো আত্মা তার ইহজীবনের না পাওয়া কোনো বস্তুর শোকে এমন মরা সুর ধরেছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে পাশে বসান। পদ্মজা ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে হেমলতাকে বলল, 'মামা সৌদিতে যাওয়ার আগের দিন আমাদের সবার দাওয়াত ছিল না নানাবাড়ি? খালামণি, ভাই-বোনেরা এসেছিল। সেদিন ঢাকা থেকে যাত্রার লোক আসছিল স্কুলে, মনে আছে আম্মা?'

'আছে।'

উঠোনে ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। হেমলতা,পদ্মজা কেঁপে উঠল। পূর্ণা, প্রেমা দরজায় কান পেতে রেখেছিল মা-বোনের কথা শুনতে। হুট করে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হওয়াতে, দুজন ভয় পেয়ে যায়। দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে রুমে ঢুকে পড়ে। হেমলতা বড় মেয়ের সাথে গোপন বৈঠক ভেঙে, দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। উঠানে বিদ্যুৎ নেই। হারিকেন জ্বালান। পিছনে তিন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন মায়ের তিন মেয়ে নিয়ে একা এতো বড় বাড়িতে বাস করাও যুদ্ধ বটে! হেমলতা গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে? কে ওখানে?'

'আমি।'

চির পরিচিত এই কণ্ঠ চিনতে হেমলতার বিড়ম্বনা হলো না। তিনি ব্যস্ত পায়ে উঠোনে নেমে আসেন। গেটের পাশে মোর্শেদ মোড়ল পড়ে রয়েছেন। গায়ে চাদর। হাঁপরের মতো বুক ওঠা-নামা করছে তার। যেন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। হেমলতা দু'হাতে মোর্শেদকে আঁকড়ে ধরলেন। পদ্মজা, পূর্ণা, দৌড়ে আসে। মোর্শেদের এমফাইসিমা রোগ আছে। এ রোগে অল্প চলাফেরাতেই শ্বাসটানের উপক্রম হয় এবং দম ফুরিয়ে যায়। শ্বাস নেবার সময় গলার শিরা ভরে যায়। তিন মা-মেয়ে মোর্শেদকে ধরে রুমে নিয়ে আসে। মোর্শেদ এভাবেই হুটহাট করে বাড়ি ফেরে। কখনো কাকডাকা ভোরে, কখনো নিশুতি রাতে বা কখনো কাঠফাটা রোদে।

মোর্শেদ মোড়লেই এমফাইসিমা রোগটা ধরা পড়ে সাত বছর আগে। মোর্শেদের অ্যাজমা ছিল। আবার ধূমপানে খুবই আসক্ত ছিলেন। ফলে ফুসফুসের এই রোগটি খুব দ্রুত আক্রমণ করে বসে। মোর্শেদ খানিকটা সুস্থ হয়ে রাত একটার দিকে ঘুমালেন। পূর্ণা, প্রেমা রুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। পদ্মজা বারান্দার রুমে ঝিম মেরে বসে আছেন। জানালার বাইরে চোখের দৃষ্টি। জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে! কি সুন্দর দৃশ্য! পদ্মজার মন বলছে, মা আসবে তাঁর খোঁজে। পুরোটা ঘটনা শুনতে আসবেই। সত্যি তাই হলো। কিছুক্ষণ পরই হেমলতা আসলেন।

'আম্মা, বাতিটা নিভিয়ে দাও।'বলল পদ্মজা। কণ্ঠ খাঁদে নামানো। হেমলতা বাতি নিভিয়ে পদ্মজার পাশে বসেন। পদ্মজা তৈরি ছিল তবুও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পদ্মজা তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স দশ ছিল। খুব কম বয়সেই তাকে স্কুলে পাঠানো শুরু করেন হেমলতা। সেদিন, নানাবাড়িতে সবার দাওয়াত পড়ে। হানিফ চলে যাবে

সৌদিতে। তাই এতো আয়জন। পরিবারের মিলন আসর বসে। স্কুল মাঠেও সেদিন নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির সবাই সেখানেই চলে যায়। বাড়িতে থাকে শুধু পদ্মজা, পদ্মজার বৃদ্ধ নানা, আর হানিফ। পদ্মজা ঘুমিয়ে ছিল তাই বাকিদের সাথে যেতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙে, আবিষ্কার করল বাড়িতে কেউ নেই। মোর্শেদ হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়াতে হেমলতা বাপের বাড়িতে উপস্থিত ছিল না।

'পদ্ম নাকি?'পদ্মজা বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপক্রম হতেই কানে আসে হানিফের ডাক। পদ্মজা মিষ্টি করে হেসে মাথা নাড়াল। হানিফের লোলুপ দৃষ্টি তখন পদ্মজার সারা শরীর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইটুকু মেয়ের ফর্সা চামড়া, বিকৃত মস্তিষ্কের হানিফকে যেন বড্ড টানে!

'আয় তো, আমার ঘরে আয়।'

সহজ সরল শিশুসুলভ পদ্মজা মামার ডাকে সাড়া দিল। সে শুনেছে, মামা-ভাগনে যেখানে আপদ নেই সেখানে। অথচ, সেদিন সে মামাকেই ঘোর বিপদ হিসেবে জানল।

পদ্মজা রুমে ঢুকতেই হানিফ দরজা লাগিয়ে দিল।পদ্মজার মন কেমন করে উঠে হানিফের অদ্ভুত চাহনি আর দরজা লাগানো দেখে। হানিফ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করতে থাকে। পদ্মজার দেখতে খুব খারাপ লাগছে। ভয় করছে।

'এদিকে আয় তোর লগে গল্প করি।'

হানিফ বিছানায় বসে পদ্মজাকে কাছে ডাকে। পদ্মজা কাছে যেতে সংকোচ বোধ করে। হানিফ পদ্মজার ডান হাতে ধরে টেনে কোলে বসায়।

'তুই জানোস? তুই যে সবার থাইকা বেশি সুন্দর?'

হানিফের প্রশ্ন পদ্মজার কানে ঢুকেনি। সে মোচড়াতে থাকে হানিফের কোল থেকে নামার জন্য। আপত্তিকর স্পর্শ গুলো পদ্মজার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'মোছড়াস ক্যান রে ছেড়ি। শান্তিমত বইয়া থাক। মামা মেলা থাইকা সাজনের জিনিষ কিইননা দিমু।'

হানিফ শক্ত করে দু'হাতে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। পদ্মজা কিছুতেই নামতে পারছে না।

'মামা, আমি চলে যাব।'কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল পদ্মজা।

'কই যাবি? মামার ধারে থাক।'বলল হানিফ।

হানিফের শক্তপোক্ত হাতের স্পর্শগুলো শুধু অস্বস্তি দিচ্ছে না,স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ব্যাথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা কেঁদে উঠে। ভেজা কণ্ঠে বলল, 'বাড়ি যাব আমি। ব্যাথা পাচ্ছি মামা।'

হানিফ হাতের বাঁধন নরম করে আদুরে গলায় বলল, 'আচ্ছা, আর ব্যাথা দিতাম না। কান্দিস না।'

পদ্মজা চট করে কোল থেকে নেমে পড়ে। হানিফকে তার আজরাইল মনে হচ্ছে। মায়ের কাছে সে আজরাইলের অনেক গল্প শুনেছে। আজরাইল যখন জান নিতে আসবে তখন শরীরে খুব কষ্ট অনুভব হবে। এই মুহূর্তে যেন ঠিক তেমনই অনুভূতি হলো। তাহলে তার হানিফ মামাই আজরাইল। পদ্মজা দরজা খুলতে পারবে না। তাই হানিফকে ভীতিকণ্ঠে অনুরোধ করল, 'মামা দরজা খুলে দাও।'

'ক্যান? আমি তোরে যাইতে কইছি?'

হানিফের কর্কশ কণ্ঠের ধমকে পদ্মজা ভয়ে কেঁপে উঠল। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে। হানিফ পদ্মজাকে জোর করে কোলে তুলে নেয়। পদ্মজা কাঁদছে। তার খুব ভয় লাগছে। বার বার বলছে, 'মামা আমি বাড়ি যাব।'

হানিফের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। বাড়িতে কেউ নেই। বৃদ্ধ সৎ বাবা কানে শুনে না। পদ্মজা হানিফকে কিল,ঘুষি দিতে থাকে। সেই সাথে জোরে জোরে কান্না শুরু করে। এভাবে কাঁদলে পাশের বাড়ির যে কেউ চলে আসবে। হানিফের রক্ত টগবগ করছে

উত্তেজনায়। সে দ্রুত ওড়না দিয়ে পদ্মজার মুখ, হাত, পা বেঁধে ফেলল। পদ্মজার দু'চোখের পানি হানিফের চোখে লাগেনি। হানিফ ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে। পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে! সে সিগারেট জ্বালায়। খুব আনন্দ হলে তার সিগারেট টানতে ইচ্ছে হয়। সিগারেট টানতে গিয়ে মাথায় আসে নৃশংস ইচ্ছে। নাক,মুখ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সিগারেট দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে পদ্মজার বাম পায়ের তালুতে চাপ দিয়ে ধরে রাখে।

পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দু'হাতে শক্ত করে মেয়েকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আম্মা, তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার দমটা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। আমি তোমাকে খুব ডাকছি আম্মা। তুমি আসোনি।'

পদ্মজার কথাগুলো হেমলতার বুক রক্তাক্ত করে দেয়। এ যেন ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের নৃশংসতা। নিজের চোখে তিনি দেখেছেন পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা। হানিফ আর তার দেখা অত্যাচারী পাকিস্তানিদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। হেমলতা নির্বাক, বাকরুদ্ধ। শুধু অনুভব হচ্ছে, তার বুকে পড়ে আদরের পদ্মজা হাউমাউ করে কাঁদছে। সর্বাঙ্গ যেন কাঁপছে। হানিফকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে হাত নিশপিশ করছে। সেদিন একটুর জন্য পদ্মজা ধর্ষিত হয়নি। বাড়িতে সবাই ফিরে এসেছিল। পদ্মজা পোড়া স্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়।

বাকিটুকু আর পদ্মজাকে বলতে হয়নি,হেমলতা জানেন। পদ্মজার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। একুশ দিন বিছানায় ছিল। ততদিনে হানিফ দেশ ছেড়ে চলে যায়। পদ্মজা ভয়ে, লজ্জায় ঘটনাটি কাউকে বলেনি। পায়ের পোড়া দাগ দেখে যখন হেমলতা প্রশ্ন করেছিল, 'পা এমনভাবে পুড়ল কি করে?'

পদ্মজা সহজভাবে জবাব দিয়েছিল, 'চুলার কাছে গিয়েছিলাম। চুলার লাকড়ির আগায় পা লাগছিল।'

কথাটা পদ্মজা সাজিয়েই রেখেছিল। সাথে অনেক যুক্তি। তাই মিথ্যে বলতে একটুও কাঁপেনি। পুরো ঘটনাটা পদ্মজার বুকে তাজা হয়ে আছে। এই ছয় বছরে লুকিয়ে কতবার কেঁদেছে সে। সবসময় চুপ করে কোথাও বসে থেকেছে। হেমলতা মেয়ের নিশ্চুপতা দেখে মাথা ঘামাননি। কারণ,পদ্মজা ছোট থেকেই চুপচাপ ছিল। কিন্তু আজ হেমলতার খুব আফসোস হচ্ছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার তিনটা মেয়েই তার কাছে খোলা বইয়ের মতো। চাইলেই পড়া যায়। বিশেষ করে পদ্মজাকে বাড়ির পিছনের নদীর বুক দিয়ে তরতর করে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ টলটলে পানির মতো মনে হতো। যার জীবনে অস্বচ্ছ বলতে কিছু নেই। সবই সাদামাটা, সহজ সরল। অথচ, পদ্মজার জীবনেই কত বড় দাগ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে! কতবড় ঘটনা লুকিয়ে ছিল! মেয়েরা কথা লুকিয়ে রাখার সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। কথাটি নিজের মেয়েদের ক্ষেত্রে মাথায়ই আসেনি। পদ্মজা শান্ত হলে হেমলতা বললেন, 'পা টা দেখি।'

পদ্মজা বাঁ পা বিছানায় তুলল। হেমলতা পদ্মজার পা কোলে নিয়ে পোড়া দাগটা দেখেন মনোযোগ দিয়ে। রক্ত টগবগ করে উঠে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিংস্রতা যেন লুটোপুটি খাচ্ছে।

'এই পোড়া দাগ হানিফের রক্ত দিয়ে মুছবো।'

কথাটি কত সহজ করে বলেছেন হেমলতা। তবুও পদ্মজা কেঁপে উঠল। কী যেন ছিল কথাটিতে! শরীরের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। হেমলতা বারান্দার রুম ছেড়ে বড় ঘরে ঢোকেন। মিনিট কয়েক পর, রামদা, ছুরি হাতে নিয়ে উঠোনে যান। উঠোনের এক পাশে শক্ত পাথর আছে। ছুরিটা পাথরে ঘষতে থাকলেন সাবধানে। ঘষতে ঘষতে পাথর গরম হয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। মানে ধার হয়ে গেছে। পদ্মজা বারান্দা থেকে দেখছে। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে। হেমলতা বারান্দা পেরিয়ে রুমে ঢুকতে যাবে তখন পদ্মজা উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকল, 'আম্মা!'

'আন্নার চাচার এক মেয়ে নিখোঁজ শুনেছিস তো বড়দের মুখে? সেই মেয়ের ধর্ষক হানিফ। ধর্ষণের পর পুঁতে ফেলেছে। অলন্দপুরের এই একটা মানুষই এতোটা নৃশংস। আমি

তখন ঢাকা পড়তাম। বাড়ি এসে জানতে পারি ঘটনা। আম্মার অনুরোধ আর কান্নায় আমি সেদিন মুখ খুলিনি। এত বড় পাপ চেপে যাই। সেই শাস্তি আমি ধীরে ধীরে পাচ্ছিলাম। আজ পুরোপুরি পেয়ে গেলাম। আমার পাপের শাস্তি শেষ হয়েছে।'

হেমলতা কথা শেষ করে জায়গা ত্যাগ করলেন। কী ধারালো প্রতিটি বাক্য! হেমলতার মুখ দিয়ে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়ে।

পর্ব ৩

'আপা, স্কুলে যাবা না?'পূর্ণা পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করল।

'যাব।'

'তাড়াতাড়ি করো।'

তাড়া দিয়ে পূর্ণা বাড়িতে ঢুকল। পদ্মজা বাড়ির পিছনের নদীর ঘাটে উদাসীন হয়ে বসে আছে। এ নদীর নাম মাদিনী (ছদ্মনাম)। গ্রীষ্মকাল বিদায়ের তিন সপ্তাহ চলছে। এখন বর্ষাকাল। মাদিনী জলে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে যেন স্রোতস্বিনী। ঘোলা জলের একটানা স্রোত বয়ে যায় সাগরের দিকে। উজান থেকে ভেসে আসছে ঘন সবুজ কচুরিপানা। পদ্মজার এই দৃশ্য দেখতে বেশ লাগে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে মাদিনীর স্বচ্ছ জলের দিকে। মাদিনীর বুকের উপর দিয়ে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। লঞ্চ দেখে এক মাস আগের ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। সেদিন রাতে হেমলতা ছুরি ধার দিয়ে রুমে ঢুকে গেলেন। পদ্মজা কাঁপা পায়ে রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নামায পড়ে খেতে বসল। তখন হিমেল হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে। হিমেল হচ্ছে হেমলতার ছোট ভাই।

'আপা? এই পদ্ম, আপা কই?'হিমেলের কণ্ঠ।

'কি হইছে মামা?'জবাব দিল পদ্মজা।

পদ্মজার প্রশ্ন উপেক্ষা করে হেমলতাকে হিমেল ডাকল, 'আপা,এই আপা।'

হেমলতা বাড়ির পিছন থেকে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসেন।

'কি হয়েছে?'

হিমেল হেমলতাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

'আপা, ভাইজান খুন হইছে। রাইতে কে জানি মাইরা ফেলছেরে আপা..."

হিমেল কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। পদ্মজা তাৎক্ষণিক সন্দিহান চোখে মায়ের দিকে তাকাল। হেমলতাকে দেখে মনে হলো, তিনি চমকেছেন। অথচ, তার চমকানোর কথা ছিল না। নাকি হিমেলের সামনে অভিনয় করলেন?

'পূর্ণা, প্রেমাকে ওদিক আসতে দিস না পদ্ম। আমি আসছি।'

হেমলতা বাড়ির বাইরে মিলিয়ে যান। হিমেল পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ছেলেটা বোকাসোকা, জন্মগত প্রতিবন্ধী। বাইশ বছরের হিমেল এখনো শিশুদের মতো আচরণ করে। কথায় কথায় খুব কাঁদে। সেখানে তার ভাই খুন হয়েছে। এক মাস তো প্রতিদিন নিয়ম করে কাঁদবে।

পদ্মজা রাতেই ভেবেছিল এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও এখন ভয় পাচ্ছে খুব। পুলিশ কী এসেছে? মাকে কী ধরে নিয়ে যাবে? ভাবতে গিয়ে, পদ্মজার বুক ধক করে উঠল। গ্রামের কাছেই শহর, থানা। পুলিশ নিশ্চয় চলে এসেছে। পদ্ম ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। সে ঘামছে খুব। নাক,মুখ,গলা ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা খুনের কথা শুনেই খুব ভয় পেয়েছে। তার মনে হচ্ছে সেও খুন হবে। খুব বেশি ভীতু পূর্ণা। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। চোখে ভাসছে, হেমলতাকে পুলিশ শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার খুব কান্না পাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল পদ্মজা। মাথায় ওড়নার আঁচল টেনে নিয়ে পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল,

'প্রেমারে দেখে রাখিস বোন।'

বাড়ি ভর্তি মানুষ। আরো মানুষ আসছে। হেমলতা মানুষজনকে ঠেলে হানিফের লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন ফর্সা রঙের দুই জন মহিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। আকস্মিক আক্রমণে হেমলতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। খেয়াল করে দেখেন, দুজন মহিলা তাঁর

মা আর বোন। তারা হাউমাউ করে কাঁদছে। কিন্তু হেমলতার তো কান্না পাচ্ছে না। ব্যাপারটা লোকচক্ষু ঠেকছে না? একটু কী কান্নার অভিনয় করা উচিৎ? হানিফের মৃত দেহ দেখে মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছেমতো কুপিয়েছে। হেমলতার তা দেখে শান্তি লাগছে! এমন শান্তি অনেকদিন পাওয়া হয়নি। পদ্মজা সেখানে উপস্থিত হয়। হেমলতার নজরে পড়ে। ভীতু চোখে মায়ের চোখের দিকে তাকাল পদ্মজা। হেমলতা ভ্রু কুঞ্চিত করে আবার স্বাভাবিক করে নেন। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখছে পুলিশ এসেছে নাকি। চারিদিকে এতো মানুষ। পদ্মজাকে এদিক ওদিক উঁকি দিতে দেখে হেমলতা এগিয়ে আসেন। চোখমুখ শক্ত করে পদ্মজার মুখ ঘুরিয়ে দেন। পদ্মজা দ্রুত ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল। তার মা চায় না, সে কখনো এতো মানুষের সামনে থাকুক।

হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, পদ্মজা গোয়ালঘর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ আসল। জিজ্ঞাসাবাদ করে হানিফের লাশ নিয়ে গেল। লোকমুখে শোনা যায়, হানিফ খুন হয়েছে শেষ রাতে। এরপর নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। লঞ্চ ঘাটে লাশ ভাসে।

হেমলতাকে পুলিশ নিয়ে যায়নি বলে পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। মানুষের ভীড়ও কমে গেছে। হেমলতার মা কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে উঠোনের এক কোণে বসে আছেন। পদ্মজা গুটি পায়ে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসল। হেমলতা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। সেই হাসি দেখলেন হেমলতার মা মনজুরা। তিনি কিছু একটা ভেবে নেন। হেমলতার কাছে এসে কিড়মিড় করে বলেন, 'তুই খুন করছস?'

'তোমার কেন মনে হচ্ছে এমন?'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। অথচ, পদ্মজা এই প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়েছে খুব। যদি নানু পুলিশকে বলে দেয়? পুলিশ তো তার মাকে নিয়ে যাবে!

'কাইল রাইতে তুই আইছিলি হানিফের ঘরে। আমি দেহি নাই?'রাগে কাঁপছেন মনজুরা।

'হুম আসছি।'হেমলতার নির্বিকার স্বীকারোক্তি।

'কেন মারলি আমার ছেড়ারে? তোর কি ক্ষতি করছে?'

'আসছি বলেই আমি খুন করেছি?'

'এতো রাইতে তুই তার কাছে আর কী দরকারে আইবি?'

'আমি তাকে মারতেই যাব কেন?'

মনজুরা আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হেমলতার দিকে। হেমলতার চোখ মুখ শক্ত। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মনজুরা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পুলিশের কাছে যামু আমি।'

পদ্মজা কেঁদে উঠল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, 'নানু এমন করো না।'

হেমলতা নীচু স্বরে কঠিন করে বললেন, 'আমার মেয়েদের থেকে আমাকে দূরে সরানোর চেষ্টা করো না আম্মা। ফল খুব খারাপ হবে।'

পদ্মজার মনে হলো মনজুরা ভয় পেয়েছেন। মনজুরা সবসময়ই হেমলতাকে ভয় পান। তিনি চুপসে যান। শুধু ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পদ্মজা বুঝে উঠতে পারে না, তার নানু কেন ভয় পায় মাকে? মায়ের অতীতে কী ঘটেছে? কেন তিনি এমন কাঠখোট্টা? ছেলের খুনীকে কোনো মা ছেড়ে দেয়? নানু কেন ছাড়লেন? মেয়ে বলে? নাকি অন্য কারণ? কোনো উত্তর নেই। এসব ভাবলে উল্টো মাথা ব্যাথা ধরে। অন্য আট-দশটা পরিবারের মতো কেনো না তারা? নাকি গোপনে সব পরিবারেই এমন জটিলতা আছে? প্রশ্ন হাজারটা! উত্তর কোথায়?

সেদিন রাতে খাওয়ার সময় হেমলতা নিম্নস্বরে পদ্মজাকে বললেন, 'পদ্ম?'

'জ্বি, আম্মা।'

'আমি হানিফকে খুন করিনি। কারা করেছে তাও জানিনা।'

কথাটি শুনে পদ্মজা খুব চমকায়। তার মা মিথ্যে বলে না। তাহলে কারা খুন করল? পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'তাহলে শেষ রাতে মামার কাছে কেন গিয়েছিলে আম্মা?'

হেমলতা জবাব দেননি। খাওয়া ছেড়ে উঠে যান।

পদ্মজার ভাবনার সুতো কাটল কারো পায়ের আওয়াজ শুনে। ঘাড় ঘুরিয়ে মোর্শেদকে দেখতে পেল। মোর্শেদ পদ্মজাকে ঘাটে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকান।

'এই ছেড়ি যা এন থাইকা।'

পদ্মজার কান্না পায়। খুব খারাপ লাগে। নিঃশব্দে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তা আড়াল করে ব্যস্ত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

কয়েক মাস পর পদ্মজার মেট্রিক পরীক্ষা। তিন বোন বই নিয়ে সড়কে উঠল। পদ্মজার কোমর অবধি ওড়না দিয়ে ঢাকা। পূর্ণা একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়া অবধি কথা বন্ধ হবে না। মাঝে মাঝে জোরে জোরে হাসছে। মেয়েটার হাসির রোগ আছে বোধহয়। একবার হাসি শুরু করলে আর থামে না। পদ্মজা বার বার বলছে, 'আম্মা রাস্তায় কথা বলতে আর হাসতে মানা করছে। চুপ কর না।'

তবুও পূর্ণা হাসছে। বাড়ির বাইরে এসে সে মুক্ত পাখির মতো আচরণ করে। তাকে দেখে মনে হয়, খাঁচা থেকে মুক্ত হয়েছে।

'পদ্ম... ওই পদ্ম। খাড়া।'

পদ্মজা ক্ষেতের দিকে তাকাল। লাবণ্য ক্ষেতের আইল ভেঙে দৌড়ে আসছে। লাবণ্য আর পদ্মজা এক শ্রেণীতে পড়ে। লাবণ্য কাছে এসে হাঁপাতে থাকল। শান্ত হওয়ার পর চারজন মিলে স্কুলের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল।

'বাংলা পড়া শিখে এসেছি আজ?'

পদ্মর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে লাবণ্য বলল, 'আরে ছেড়ি বাড়িত শুদ্ধ ভাষায় কথা কইলে বাইরেও কইতে হইব নাকি?'

'আমি আঞ্চলিক ভাষা পারি না।'

লাবণ্য অসন্তোষ প্রকাশ করল। সে অলন্দপুরের মাতব্বর বাড়ির মেয়ে। তাদের বাড়ির সবাই শিক্ষিত। তবুও তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, পরিবারের দুই-তিন জন সদস্য ছাড়া। আর পদ্মজার চৌদ্দ গুষ্ঠি মূর্খ, দুই-তিন জন ছাড়া। তবুও এমন ভাব করে! আঞ্চলিক ভাষা নাকি পারে না!

'সত্যি আমি পারি না। ছোট থেকে আম্মা শুদ্ধ ভাষা শিখিয়েছেন। উনিও বলেন। তাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেই আরাম পাই।'

'পূর্ণা তো পারে।'

'আমার চেষ্টা করতে ইচ্ছে হয় না।'

'আইচ্ছা বাদ দে। শুন, কাইল আমরার বাড়িত নায়ক-নায়িকারা আইব।'

পূর্ণা বিগলিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন আসব? কোন নায়ক?'

'শুটিং করতে। ছবির শুটিং।'

পদ্মজা এসবে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না। পূর্ণা খুব আগ্রহবোধ করছে। সপ্তাহে একদিন সুমিদের বাড়িতে সাদাকালো টিভিতে সে ছায়াছবি দেখতে যায়। তাই অভিনয় শিল্পীদের প্রতি তার আগ্রহ আকাশছোঁয়া। পূর্ণা গদগদ হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কোন নায়ক নায়িকা? বল না লাবণ্য আপা!'

'দাঁড়া! মনে করি।'

পূর্ণা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। লাবণ্য চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। এরপর মনে হতেই বলল, 'লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী।'

‘তুমি আমার ছবির নায়ক-নায়িকা?’

‘হ।’

স্কুলের যাওয়ার পুরোটা পথ লাবণ্য আর পূর্ণা ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা করল। মূল বক্তব্যে ছিল লিখন শাহ।

পর্ব ৪

দিনটাকে পদ্মজার অলক্ষুণে মনে হচ্ছে। সকালে উঠে দেখল, লাল মুরগিটার একটা বাচ্চা নেই। নিশ্চয় শিয়ালের কারবার। রাতে মুরগি খোপের দরজা লাগানো হয়নি। আর এখন আবিষ্কার করল, দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে না। ঘড়িটা রাজধানী থেকে হানি খালামণি দিয়েছিলেন। গ্রামে খুব কম লোকই হাত ঘড়ি পরে। দেয়াল ঘড়ি হাতেগোণা দুই-তিনজনের বাড়িতে আছে। পদ্মজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময়ের আন্দাজ করার চেষ্টা করল। পূর্ণা, প্রেমা দুপুরে খেয়েই ঘুম দিয়েছে। পদ্মজা মায়ের রুমে উঁকি দিল। হেমলতা মনোযোগ দিয়ে সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন। আটপাড়ায় একমাত্র হেমলতাই সেলাই কাজ করেন। প্রতিটি ঘরের কারো না কারো পরনে তার সেলাই করা কাপড় আছেই।

'লুকিয়ে দেখছিস কেন? ঘরে আয়।'

হেমলতার কথায় পদ্মজা লজ্জা পেল।

'না আম্মা। কাজ আছে।'

'পানি দিয়ে যা।'

হেমলতা জগ বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা জগ হাতে নিয়ে বলল, 'আম্মা, ছদকা কোন মুরগিটা দেব?'

হেমলতা গতকাল স্বপ্নে দেখেছেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। তাই তিনি ছদকা দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। সকালেই পদ্মজাকে মনের কথা জানালেন।

'সাদা মোরগটা দিয়ে দিস। মুন্না কি আসছে?'

'না। প্রতিদিন বিকেলবেলা তো পানি নিতে আসে। কিছুক্ষণ পরই আসবে।'

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। পদ্মজা কলপাড় থেকে পানি নিয়ে আসে। আছরের আযানের সাথে সাথে মুন্না আসল। গ্রামে সচ্ছল পরিবার নেই বললেই চলে। হাতে গোনা কয়েকটা পরিবারে সচ্ছলতা আছে। হেমলতার পরিবারটা টিকে আছে, হেমলতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্য। পুরো আটপাড়ায় টিউবওয়েল মাত্র পাঁচটা। পদ্মজাদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে প্রতিদিন অনেকেই আসে। তার মধ্যে নিয়মিত একজন মুন্না। দশ বছরের একটা ছেলে। মা নেই। বাবা পঙ্গু। সদরে বসে ভিক্ষা করে। পদ্মজা মোরগ নিয়ে কলপাড়ে এসে দেখে মুন্না নেই। একটু সামনে হেঁটে এসে ঘাটে মুন্নাকে দেখতে পেল। ডাকল, 'মুন্না।'

মুন্না ফিরে তাকায়। পদ্মজার হাতে সাদা মোরগ দেখে মুন্না খুব খুশি হয়। পদ্মজা না বললেও বুঝে যায়, ছদকা পাবে আজ। মুন্না এগিয়ে আসল। দাঁত কেলিয়ে হাসল।

'হাসিস কেন? নে মোরগ। তোর আব্বাকে নিয়ে খাবি।'

মুন্না যে খুব খুশি হয় তা দেখেই বোঝা গেল। খুশিতে গদগদ হয়ে মোরগটাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজার ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তিতে প্রশান্তির হাসিতে মেতে উঠল। কী সুন্দর মুন্নার হাসি! পদ্মজা বলল, 'খুব খুশি?'

'হ।'

'দোয়া করবি আমরা যেন ভাল থাকি।'

'করবাম আপা।'

'আচার খাবি মুন্না?'

'হ, খাইবাম।'

পদ্মজা আবার হাসল। মুন্না পেটুক। খাওয়ার কথা শুনলেই চোখ চকচক করে উঠে। পদ্মজা আচার নিয়ে আসে। মুন্নার সাথে বসে আরাম করে খায়। মুন্না একটু একটু করে খেতে খেতে বলল, 'আপা, তুমি খুব ভালা।'

'তাই?'

'হ। বড় হইয়া তোমারে বিয়া করবাম আমি।'

পদ্মজা বিষম খেল। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ শুনল নাকি। বিয়ে তার

কাছে খুব লজ্জাজনক শব্দ। বিয়ে নামটা শুনলেই লজ্জায় লাল টুকটুকে হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে মুন্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ের কথা কোথায় শিখলি?'

'আব্বা কইছে।'

'আর বলবি না এসব। যা, বাড়িত যা।'

পদ্মজা তড়িঘড়ি করে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, হেমলতা রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ থাকে না। হারিকেন জ্বালিয়ে রান্না করতে হয়। প্রতিদিন ঘরে একটা হারিকেন আর রান্নাঘরে একটা হারিকেন জ্বালানো অনেক খরচের ব্যাপার। তাই তিনি বিকেলে রাতের রান্না সেরে ফেলেন।

'আম্মা আমি রাঁধি?'

'লাগবে না। সাহায্য কর শুধু।'

পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখল, কী কাজ করা যায়। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। হেমলতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'লাউ নিয়ে আয়।'

'ছিড়ে আনব? না লাহাড়ি ঘরে আছে?'

'লাহাড়ি ঘরে নাই।'

পদ্মজা মায়ের আদেশ পেয়ে যেন চাঁদ পেয়েছে। এমন ভাব ধরে দ্রুত ছুটে যায় লাউ আনতে। লাউ,বরবটি, ঢেঁড়স, কাঁকরোল, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, ঝিঙা.. ইত্যাদি, ইত্যাদি সব রকমের সবজির মেলা বাড়ির চারপাশ ঘিরে। পদ্মজা সাবধানে ঘাসের উপর দিয়ে লাউ গাছের দিকে এগোয়। বর্ষাকাল হওয়াতে জোঁকের উপদ্রব বেড়েছে। জোঁকের ভয় অবশ্য নেই তার।

হেমলতা পদ্মজার যাওয়া পানে ঝিম মেরে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটাকে দেখলে তার মন বিষণ্নতায় ভরে উঠে। পদ্মজার চুল দেখলে মনে হয়, এই সুন্দর ঘন কালো রেশমী চুল পদ্মজার একেকটা কাল রাত। পদ্মজার ছিমছাম গড়নের দুধে আলতা দেহের অবয়ব দেখলে মনে হয়, এই দেহ পদ্মজার যন্ত্রণা। এই দেহ ধ্বংস হবে। পদ্মজার ওষ্ঠদ্বয়ের নিচে স্থির হয়ে থাকা কালো সূক্ষ্ম তিল দেখলে মনে হয়, এই তিল পদ্মজার এক জীবনের কান্নার কারণ। হেমলতা পদ্মজার রূপের বাহার নিতে পারেন না। কেন কৃষ্ণকলির ঘরে ভুবন মোহিনী রূপসীর জন্ম হলো! জন্ম,মৃত্যু, বিয়ে কারো হাতে থাকে না। যদি থাকতো, হেমলতা মোর্শেদকে বিয়ে করতেন না এবং পদ্মজার মতো রূপসীর জন্ম দিতেন না। আল্লাহর কাছে, রূপসী মেয়ে ভুলেও চাইতেন না। হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আজ শুক্রবার। স্কুল নেই। ফজরের নামায পড়ে তিন বোন পড়তে বসেছে। প্রেমা নামায পড়তে চায় না। ঘুমাতে চায়। হেমলতার মারের ভয়ে নামায পড়ে। সে ঝিমুচ্ছে আর পড়ছে। তা দেখে পদ্মজা আর পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসছে। হেমলতা বিরক্ত হোন। প্রেমার তো পড়া হচ্ছেই না। সেই সাথে পদ্মজা, পূর্ণার মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। তিনি কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, 'প্রেমা,ঘুমাচ্ছিস কেন? ঠিক হয়ে পড়।'

প্রেমা সচকিত হলো। চট করে চোখ খুলে, ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়া শুরু করল। হেমলতা কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'পড়তে হবে না। ঘরে গিয়ে ঘুমা।'

প্রেমা একটু অবাক হয়। তারপরেই খুশি হয়ে ছুটে যায় ঘরে। পূর্ণা মুখ ভার করে ফেলল। তার ও তো পড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, মা কখনো তাকে ছাড় দেন না। হয়তো ছোটবেলা ছাড় দিতেন। মনে নেই। সে আবার খুব দ্রুত সব ভুলে যায়। ব্রেন ভাল প্রেমার। যা পড়ে মনে থাকে। পূর্ণা খুব দ্রুত ভুলে যায়। পদ্মজার সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু রূপ বাদে।

সূর্য উঠার সাথে সাথে মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকেন। হাতে ঝাকি জাল আর বড়শি। কাঁধে

পাটের ব্যাগ ঝুলানো। ভোরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মোর্শেদ বাড়ি ফিরলে পূর্ণা আর প্রেমা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। মাছ খেতে পারে অনেক। অর্থের জন্য হেমলতা খুব কম মাছ আনেন। মোর্শেদ বাড়িতে যতদিন থাকেন ততদিন মাছের অভাব হয় না। মোর্শেদ বলার পূর্বেই পূর্ণা ও প্রেমা গামলা নিয়ে ছুটে আসে উঠানে। মোর্শেদ কাঁধের ব্যাগ উল্টে ধরেন গামলার উপর। পুঁটি, ট্যাংড়া, পাবদা,চিংড়ি মাছের ছড়াছড়ি। হেমলতা ভারী খুশি হোন। পদ্মজা লতা দিয়ে চিংড়ি খেতে খুব পছন্দ করে। আর প্রেমা, পূর্ণা পছন্দ করে পাবদা মাছের ভুনা। মেয়েগুলো খুব খুশি হয়েছে মাছ দেখে। তিনি জানেন, মোর্শেদ বাড়ি থেকে বের হতেই পদ্মজা ছুটে যাবে বাড়ির পিছনে লতা আনতে।

'হুনো, লতা। আমার আম্মারারে পাবদা ভুনা কইরা দিবা। সবজি টবজি দিয়া রাঁনবা না।'

'আব্বা, আপনি বাড়িতে থাকবেন? তাইলে তো প্রতিদিনই মাছ খেতে পারি।'

মোর্শেদ আড়চোখে পদ্মজাকে একবার দেখে তীক্ষ্ণ চোখে হেমলতার দিকে তাকান। এরপর পূর্ণাকে জবাব দিলেন, 'কোনোরহম অশান্তি না হইলে তো থাকবামই।'

গামছা নিয়ে তিনি কলপাড়ে চলে যান। পদ্মজার মুখটা ছোট হয়ে যায়। প্রতিবার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে মোর্শেদ পদ্মজাকে রাগে কটুকথা শোনান। তখন, হেমলতা মোর্শেদকে শাসান। ফলস্বরূপ মোর্শেদ বাড়ি ছাড়েন।

'মোর্শেদ নাকি? বাড়ি ফিরলা কোনদিন?'

মোর্শেদ গোসল সেরে রোদ পোহাচ্ছিলেন। সকালের মিষ্টি রোদ। ঘাড় ঘুরিয়ে রশিদ ঘটককে দেখে হাসলেন।

'আরে মিয়া চাচা। আহেন, আহেন। পূর্ণারে চেয়ার আইননা দে। খবর কী?'

পূর্ণা চেয়ার এনে দিল। রশিদ এক দলা থুথু উঠানে ফেলে চেয়ারে বসলেন আরাম করে। প্রেমাকে উঠানে খেলতে দেখে ফরমায়েশ দিলেন, 'এই মাইয়া যা পানি লইয়া আয়। অনেকক্ষণ ধইরা দমডা আটকাইয়া আছে।'

প্রেমা পানি নিয়ে আসে। রশিদ পানি খেয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'খবর তো ভালাই। বাবা ছেড়িডারে কী বিয়া দিবা না?'

'দুই বছর যাক। পড়তাছে যহন, মেট্রিকটা পাশ করুক। কী কন?'

'মেজোডা না। বড়ডা। তোমার বউ তো মরিচের লাহান। কোনোবায়ও রাজি অয় না। তুমি বোঝাওছেন। পাত্র খাঁটি হীরা। বাপ-দাদার জমিদারি আছে।'

মোর্শেদ আড়চোখে হেমলতা এবং পদ্মজার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। নেই তারা। তিনি জানেন, পদ্মজার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি তিনি করতে পারবেন না। হেমলতা তা হতে দিবেন না। এসব তো আর বাইরের মানুষের সামনে বলা যায় না। মোর্শেদ রশিদ ঘটককে নরম গলায় বললেন, 'থাকুক না পড়ুক। মায়ে যহন চায় ছেড়ি পড়ুক। তাইলে পড়ুক।'

রশিদ নিরাশ হলেন। ভেবেছিলেন, মোর্শেদ রাজি হবে। তিনি মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। এরপর বড় অসুখে পড়লেন। তাই মোর্শেদ বাড়ি ফিরেছে শুনেও আসতে পারেননি। আজ একটু আরামবোধ হতেই ছুটে এসেছেন অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু মোর্শেদের জবানবন্দিতে তিনি আশাহত হলেন। কটমটে গলায় বললেন, 'যুবতী ঘরে রাহন ভালা না। যহন বংশে কালি পড়ব তহন বুঝবা। হুনো মোর্শেদ, এই বয়সী মাইয়াদের স্বভাব চরিত্র বেশিদিন ভালা থাহে না। পাপ কাম এদের চারপাশে ঘুরঘুর কর। বেলা থাকতে জামাই ধরাইয়া দেওন লাগে। বুঝছোনি? তোমার বউরে বোঝাও।'

রশিদ, পাত্রের অনেক প্রশংসা করলেন। জমিজমা, বাড়িঘর সবকিছুর বাড়াবাড়ি রকমের বর্ণনা দিলেন। ফলে,মোর্শেদের মস্তিষ্ক কাজ করা শুরু করল। রশিদ ঘটক যেতেই তিনি হেমলতার পাশে গিয়ে বসেন। ইনিয়েবিনিয়ে পদ্মজার বিয়ের কথা তুলেন। হেমলতা সাফ নাকচ করে দেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে দেন, পদ্মজার বিয়ে তিনি দিচ্ছেন না। আর মোর্শেদকে পদ্মজার ব্যাপারে নাক গলাতে না করেছেন। শেষ কথাটা বেশ কঠিন করেই

বলেন, 'আগে বাপ হও। পরে বাপের কাজ করতে আসবা।'

মোর্শেদের তিরিক্ষি মেজাজ। তিনি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। রগে রগে রাগ টগবগ করছে। পদ্মজাকে বারান্দায় দেখে তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ি যহন রূপ দিয়া নটি হইব, তহন আমার ঠ্যাংও পাইবা না। এই ছেড়ি মজা বুঝাইবো।'

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হেমলতা রান্নাঘর থেকে বের হলেন মোর্শেদকে কিছু কঠিন কথা শোনাতে। পদ্মজা তখন দৌড়ে আসে। হেমলতার হাতে ধরে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। মোর্শেদ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তারও খুব ভাল লাগে। পূর্ণা,প্রেমা কত খুশি হয়। বাড়িটা পরিপূর্ণ লাগে। সে চায় না তার বাবা ঝগড়া করে রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাক। হেমলতা রাগে এক ঝটকায় মেয়ের হাত সরিয়ে দেন। তার সহ্য হয় না মোর্শেদকে। মানুষের কথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বদমেজাজি একজন মানুষ মোর্শেদ। ভালটা কখনো বুঝে না। মানুষের কথায় নাচে। সারাক্ষণ মস্তিষ্কে একটা বাক্যেরই পূজা করে, 'মানুষ কী বলবে?'

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মাথার উপর বৃষ্টি নিয়ে মোর্শেদ বাড়ি ফেরেন। মুখ দেখে বোঝা গেল, তিনি খুব খুশি। হেমলতাকে ডেকে বললেন, 'এক মাসের লাইগগা ঘরটা ছাইড়া লাহাড়ি ঘরে উইঠ্ঠা পড়।'

'কীসের দরকারের জন্য?'

'শুটিং করার লাইগগা মাতব্বর বাড়ির যারা আইছে, তারার বুলি আমরার বাড়ি পছন্দ অইছে। বিরাট অংকের টেকা দিব কইছে। আমিও কথা দিয়া আইছি। কাইলই উঠতে কইয়া আইছি।'

হেমলতা বিরক্ত হতে গিয়েও পারলেন না। সত্যি অর্থের খুব দরকার। পদ্মজার সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। কত খরচ। কলেজে পড়াতে ঢাকা পাঠাতে হবে। তিনি মোর্শেদকে বললেন, 'টাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে বলবা। নয়তো জায়গা হবে না।'

'আরে..বলামনে। এখন সব গুছাইয়ালাও ।'

পূর্ণা আড়াল থেকে সবটা শুনেছে। সাত দিন হয়েছে লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী এই গ্রামে এসেছে। অথচ, সে দেখতে পারল না। হেমলতা যেতে অনুমতি দেননি। পূর্ণা নামাযের দোয়ায় খুব অনুনয় করেছে আল্লাহকে। যেন লিখন শাহ আর চিত্রা দেবীকে স্বচক্ষে দেখতে পারে। আর এখন শুনলো, তাদের বাড়িতেই নাকি আসছে ওরা! পূর্ণার মনে হচ্ছে সে খুশিতে মরে যাচ্ছে।

'এই মগা? আমাকে এক কাপ চা দাও তো।'

মগা ঝড়ের গতিতে চা নিয়ে আসে। লিখন চিত্রার পাশের চেয়ারটায় বসল। এরপর মগাকে বলল, 'দারুণ চা করো তো তুমি।'

মগা কাচুমাচু হয়ে হাসল। ভাবে বোঝা গেল, প্রশংসা শুনে সে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। চিত্রা মগার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে উঠল। চিত্রা হাসলে মগা মুগ্ধ হয়ে দেখে। মাতব্বর বাড়ির কামলা সে। চিত্রনায়ক লিখন শাহ এবং চিত্র নায়িকা চিত্রা দেবীর সেবা করার দায়িত্ব মগাকে দেয়া হয়েছে। মগা এতে ভীষণ খুশি। চিত্রার সুন্দর মুখশ্রীর সামনে সবসময় থাকতে পারবে ভেবে। চিত্রা বলল, 'তোমার ভাইয়ের নাম জানি কী বলছিলে?'

চার ফুট উচ্চতার মগা উৎসাহ নিয়ে জবাব দিল, 'মদন।'

চিত্রার হাসি পায়। অনেক কষ্টে চেপে রাখল। মগা,মদন কারো নাম হয়?

শুটিংয়ের মাঝে হুট করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। সবাই বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছে। হাতে সবার রং চা । ডিরেক্টর আবুল জাহেদ দারুণ খিচুড়ি রান্না করেন। বৃষ্টি দেখেই তিনি রান্নাঘরে ঢুকেছেন।

‘আচ্ছা, মগা এই বাড়ির দুইটা মেয়ে কোথায়? আসার পর একবার এসেছিল। এরপর তো আর এলো না।’

চিত্রা প্রশ্ন করল। মগা বলল, ’ওই যে লাহাড়ি ঘর। ওইডাত আছে।’

‘লাহাড়ি ঘর মানে কি?’

মগার বদলে লিখন বলল, ’যে ঘরের অর্ধেক জুড়ে ধান রাখা হয়। আর অর্ধেক জায়গায় চৌকি থাকে কামলাদের জন্য ওই ঘরকে লাহাড়ি ঘর বলে এখানে। বোঝা গেছে?

চিত্রা চমৎকার করে হাসল।

‘বোঝা গেছে। মগা, বৃষ্টি কমলে লাহাড়ি ঘরে যাব। ঠিক আছে?’

‘আইচ্ছা আপা।’

‘এই লিখন যাবা? ওইতো সামনেই। আলসেমি করো না।’

মগা হৈহৈ করে উঠল, ’না না, বেঠা লইয়া যাওন যাইত না। বাড়ির মালিকের মানা আছে।’

লিখন মগার না করার ভাব দেখে ভীষণ অবাক হলো। চিত্রা প্রশ্ন করল, ’মানা কেন?’

‘বাড়ির বড় ছেড়িডারে তো আপনেরা দেহেন নাই। আগুন সুন্দরী। এই লিখন ভাইয়ের লাহান বিলাই চোখা। ছেড়িডারে স্কুল ছাড়া আর কোনোহানো যাইতে দেয় না। বাড়ি দিবার আগে কইয়া রাখছে লাহাড়ি ঘরে বেঠামানুষ না যাইতে। এই ছেড়ি লইয়া বহুত্তা কিচ্ছা আছে।’

চিত্রা বেশ কৌতুহল বোধ করল। লিখন তীক্ষ্ণ ঘোলা চোখে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দেড় দিন হলো এখানে এসেছে। উঠানের শেষ মাথায় থাকা লাহাড়ি ঘরটা একবারো মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি।

সামনের দরজাটা বন্ধ। দুটো ছোট মেয়ে এসেছিল ঘরটার ডান পাশ দিয়ে। ঘরটার ডানে-বামে পিছনে গাছপালা। বাড়িটা পুরনো হলেও দারুণ। তবে এই মুহূর্তে তাঁর অন্যকিছুর প্রতি তীব্র কৌতূহল কাজ করছে।

পর্ব ৫

লাহাড়ি ঘর দু'ভাগ করা হয়েছে চাদর টানিয়ে। একপাশের চৌকিতে হেমলতা এবং মোর্শেদ থাকেন। অন্যপাশের চৌকি পদ্মজা,পূর্ণা ও প্রেমার দখলে। লাহাড়ি ঘরের পিছনের দরজা আপাতত প্রধান দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিছনে অনেক কচু গাছ ছিল। হেমলতা মোর্শেদকে নিয়ে জায়গা খালি করেছেন। এরপর সেখানে মাটির চুলা তৈরি করা হয়েছে। বড় সড়কে উঠার জন্য ঝোপঝাড় কেটে সরু করে পথ করা হয়েছে। এতে মোর্শেদের সাহায্য ছিল না। হেমলতা দুই মেয়েকে নিয়ে একাই করেছেন। শুটিং দলে অনেক পুরুষ। পদ্মজাকে ভুলেও তাদের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দেওয়া যাবে না । হেমলতার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, পদ্মজার মুখ পুড়িয়ে দিতে। পরক্ষণেই নিজের উপর ঘৃণা চলে আসে। কী করে নিজের মেয়ের প্রতি এমন মনোভাব আসতে পারে? অথচ,পদ্মজার হাতে সূচ ফুটলে হেমলতার মনে হয় নিজের শরীরে আঘাত লেগেছে। কী জন্য এতো টান পদ্মজার প্রতি? ভেতরে ভেতরে হেমলতা এই প্রশ্নের উত্তর জানেন। শুধু প্রকাশ পায় না। না জানার ভান ধরে থাকেন।

'আম্মা? আজ আমি রাঁধি?'

পদ্মজার প্রতিদিনের প্রশ্ন! হেমলতা রাঁধতে দিবেন না জানা সত্ত্বেও পদ্মজা প্রতিদিন অনুরোধ করে। হেমলতা বিপদ-আপদ ছাড়া পদ্মজাকে রান্নাঘরে পাঠান না। সোনার শরীরে মাটির চুলার কালি লাগাতে হেমলতার মায়া লাগে। তিনি হাসেন। পদ্মজা মুগ্ধ হয়ে দেখে। হেমলতার বয়স ছয়ত্রিশ। শ্যামলা চেহারা। দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। চোখের মণি অন্যদের তুলনার বড় আর গাঢ় কালো। চোখ দুটিকে গভীর পুকুর মনে হয়। ছিমছাম গড়ন। পূর্ণা যেনো মায়েরই কিশোরী শরীর। তবে তারা তিন বোনই মায়ের মতো চিকন আর লম্বা।

'আচ্ছা, আজ তুই রাঁধবি।'

পদ্মজা ভাবেনি অনুমতি পাবে। আদুরে উল্লাসে প্রশ্ন করে, 'সত্যি আম্মা?'

'যা, জলদি। আছরের আজান কবে পড়েছে!'

পদ্মজা রান্নার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পূর্ণা আর প্রেমা হিজল গাছের নিচে পাটি বিছিয়ে লুডু খেলছে। প্রেমা বাটপারি করে। এ নিয়ে কিছুক্ষণ পর পর তাদের মাঝে তর্ক হচ্ছে। সকালে বৃষ্টি হয়েছে। রান্না করতে গিয়ে পদ্মজা ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ পেল। কী সুন্দর অনুভূতি!

মোর্শেদ পদ্মজাকে রাঁধতে দেখে কপাল কুঁচকে ফেললেন।

ঘরে ঢুকে হেমলতাকে মেজাজ দেখিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'এই ছেড়ি রাঁন্ধে ক্যান?'

হেমলতা নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন, 'আমি বলেছি।'

'কতদিন কইছি এই ছেড়ির হাতের রাঁন্ধন আমারে না খাওয়াইতে?'

মোর্শেদের কঠিন স্বর পদ্মজার কানে আসে। মুহূর্তে খুশিটুকু ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়। সে জানে এখন ঝগড়া শুরু হবে। তার আম্মা, আব্বার অনুচিত কথাবার্তা মাটিতে পড়তে দেন না। তার আগেই জবাব ছুঁড়ে দেন।

'খেতে ইচ্ছে না হলে খাবা না।'

'রাইতবেলা না খাইয়া থাকবাম আমি?'

'খাবার রেখেও যদি না খেতে চাও সেটা তোমার সমস্যা। আমি বা আমার মেয়ে কেউই না করিনি।'

মোর্শেদ কিছু নোংরা কথা শোনাতে প্রস্তুত হোন। হেমলতা সেলাই মেশিন রেখে উঠে দাঁড়ান। তিনি যেন বুঝে গিয়েছেন মোর্শেদ কী বলবেন। আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'একটা নোংরা কথা উচ্চারণ করলে আমি আজ তোমাকে ছাড় দেব না। পদ্ম তোমার মেয়ে। আল্লাহ সইবে না। নিজের মেয়ে সম্পর্কে এতো নোংরা কথা কোনো বাবা বলে না।'

মোর্শেদ নোংরা কথাগুলো হজম করে নিলেন। তবে কিড়মিড় করে বললেন, 'পদ্ম আমার ছেড়ি না।'

'পদ্ম তোমার মেয়ে। আর, একটা কথাও না। বাড়িতে অনেক মানুষ। নিজের বিকৃত রূপ লুকিয়ে রাখ।'

মোর্শেদ দমে যান। চৌকিতে বসে বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। চোখের দৃষ্টি অস্থির। পদ্মজার জন্মের পর থেকেই হেমলতার রূপ পাল্টে গেছে। কিছুতেই এই নারীর সাথে পারা যায় না। অথচ, একসময় কত মেরেছেন হেমলতাকে। হেমলতার পিঠে,উরুতে, ঘাড়ে এখনো মারের দাগ আছে। সময় কোন যাদুবলে হেমলতাকে পাল্টে দিল, জানা নেই মোর্শেদের।

রাতের একটা শুট করে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। চিত্রা তখন কথায় কথায় জানাল, 'লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম। মগা যে মেয়েটার কথা বলেছিল তাকে দেখতে।'

চিত্রার কথায় লিখন আগ্রহ পেলো না। চিত্রা কখনো কোনো মেয়ের প্রশংসা করে না। খুঁত খোঁজে বের করতে ভালো জানে। নিজেকে খুঁতহীন সেরা সুন্দরী মনে করে।

'মেয়েটার নাম পদ্মজা।মগা, পুরো নাম জানি কী?'

চিত্রা মগার সাথে কথা বললে, মগা খুব লজ্জা পায়। এখনো পেল। লাজুক ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'উম্মে পদ্মজা।'

'ওহ হ্যাঁ। উম্মে পদ্মজা।'

চিত্রার পাশ থেকে সেলিনা পারভীন প্রশ্ন করলেন, 'কী নিয়ে আলাপ হচ্ছে?'

সেলিনা পারভীন চলমান চলচ্চিত্রে চিত্রার মায়ের অভিনয় করছেন। চিত্রা বলল, 'এই বাড়ির মালিক যিনি, উনার বড় মেয়ের কথা বলছি। এমন সুন্দর মুখ আমি দু'টি দেখিনি। মেয়েটার মুখ দেখলেই বুকের ভেতর নিকষিত, বিশুদ্ধ ভালো লাগার জন্ম হবে। এতো শ্রী ভগবান দিয়েছেন মেয়েটাকে।'

লিখন সহ উপস্থিত সবাই অবাক হলো। চিত্রার মুখে কোনো মেয়ের প্রশংসা! অবিশ্বাস্য! সবাইকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে চিত্রা বিব্রতবোধ করল। গলার জোর বাড়িয়ে বলল, 'সত্যি বলছি! সন্ন্যাসী ছাড়া কোনো পুরুষ এই মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারবে না।'

পদ্মজাকে নিয়ে বেশখানিকক্ষণ আলোচনা চলল। আগ্রহ বেশি লিখনের ছিল। যখন শুনলো পদ্মজার ষোল বছর সে দমে গেল। ছোট মেয়ে! হয়তো এমন বয়সী বেশিরভাগ মেয়েরা স্বামীর ঘরে থাকে। তবুও লিখনের পদ্মজাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। তার একটা বোন আছে, ষোল বছরের। এখনো দুই বেণি করে স্কুলে যায়। কত ছোট দেখতে! লিখন আনমনে হেসে উঠল।

হিজল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। রাতের জোনাকি পোকা চারিদিকে। পদ্মজা প্রায় রাতে মুগ্ধ হয়ে দেখে জোনাকি পোকাদের। মনে হয় দল বেঁধে হারিকেন নিয়ে নাচছে তারা। তবে, এই মুহূর্তে রাতের এই সৌন্দর্য পদ্মজার মনে ঢুকতে পারছে না। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। চোখ দু'টো জ্বলছে খুব। মোর্শেদ রান্না খারাপ হওয়ার অজুহাতে থালা ভর্তি ভাত,তরকারি ছুঁড়ে ফেলেছে পদ্মজার মুখে। চোখে ঝোল পড়েছে। তা নিয়ে হেমলতার সেকী রাগ! মোর্শেদ অবশ্য চুপ ছিলেন। তিনি তো রাগ মিটিয়েই ফেলেছেন। আর তর্ক করে কী হবে?

'পদ্ম?'

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা ভেজা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'খুব জ্বলছেরে মা?'

পদ্মজা জবাব দিতে পারল না। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠল। মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই তার। মায়ের আদর ছাড়া কারো আদর পাওয়া হয়নি। সবাই তার দোষ খোঁজে।

হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোল। পদ্মজা ছিঁচকাঁদুনে। ছোট থেকেই কাঁদছে। তবুও জল ফুরোয় না। মন শক্ত হয় না। এমন হলে তো চলবে না! পদ্মজার কান্নার বেগ বাড়ল। হেমলতা সদ্য কাটা বড় গাছের বাকী অংশে বসলেন। চুপ করে পদ্মজার ফোঁপানো শুনছেন। পদ্মজা শান্ত হয়ে মায়ের পাশে বসল। তার মাথা নত। হেমলতা উদাস গলায় বললেন, 'এভাবে চলবে না পদ্ম।

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা বললেন, 'শোন পদ্ম, কেউ আঘাত করলে কাঁদতে নেই। কারণ মানুষ আঘাত করে কাঁদানোর জন্যই। আর যখন উদ্দেশ্য সফল হয় তখন তারা শান্তি পায়। যে আঘাত করল তাকে কেন শান্তি দিবি? শক্ত থাকবি। বুঝিয়ে দিবি তুই এতো দূর্বল নয়। যারে তারে পাত্তা দিস না। হাজার কষ্টেও কাঁদবি না। কান্না সাময়িক সময়ের জন্য মন হালকা করে। পুরোপুরি নয়। যে তোকে আঘাত করবে তাকে তুই তোর চাল-চলন দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবি। তখন তার মুখটা দেখে তোর যে শান্তিটা হবে সেটা কান্না করার পর হবে না। এই শান্তি স্থায়ী!'

হেমলতার কথা পদ্মজার উপর প্রভাব ফেলল না। সে করুণ স্বরে বলল, 'কিন্তু আব্বার ব্যবহার আমার সহ্য হয় না আম্মা। আমার সাথে কেন এমন করে আব্বা?'

'তাকে কখনো সামনাসামনি আব্বা ডাকার সুযোগ পেয়েছিস? পাসনি! তবুও কেন আব্বা, আব্বা করিস?

তাকে তুই পাত্তা দিবি না।'

'তুমি খুব কঠিন আম্মা।'

'তোকেও হতে হবে।'

'আব্বা কেন এমন করে আম্মা? আমিকি আব্বার মেয়ে না? আব্বা কেন বার বার বলেন, আমি তার মেয়ে না।'

হেমলতা চোখ সরিয়ে নেন। পদ্মজা জানে এই জবাব সে পাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে। হেমলতা এক হাত পদ্মজার মাথায় রাখেন।

'কাঁদিস না আর। মায়ের রং না হয় পাসনি। মায়ের মতো শক্ত হওয়ার তো চেষ্টা করতেই পারিস।'

পদ্মজা নির্লজ্জ হয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'আম্মা, আমি কি আব্বার মেয়ে না? বলো না আম্মা।'

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল পড়ছে। খুব মায়া লাগছে হেমলতার। বুক ভারী হয়ে আসছে। তিনি আবেগ লুকিয়ে কণ্ঠ কঠিন করার চেষ্টা করলেন, 'মার খাবি পদ্ম। কতবার বলব, তুই আমার আর তোর আব্বার মেয়ে।'

'কি নাম আমার আব্বার?'

কী শান্ত কণ্ঠ পদ্মজার! হেমলতা চমকান তবে প্রকাশ করলেন না। মেয়েদের সামনে তিনি কখনো দূর্বল হতে চান ন। পদ্মজার দিকে ঝুঁকে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, 'তোর আব্বার নাম মোর্শেদ মোড়ল।'

পদ্মজা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মাকে খুব বিরক্ত লাগছে এখন। খুব কঠিন করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'যাও এখান থেকে। আমার কাছে আর আসবা না। কখনো না।'

কিন্তু সে এমন ব্যবহার বাস্তবে কখনো পারবে না। কখনো না। রাতের বাতাসে ভেসে আসছে হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণ। আকাশে থালার মতো চাঁদ। ঝিরিঝিরি মোলায়েম বাতাস চারিদিকে। পদ্মজার চোখের জল শুকিয়ে গেল। হেমলতা ঝিম মেরে বসে আছেন। একসময় নিস্তব্ধতা কাটিয়ে একটা অসহায় কণ্ঠ ভেসে আসল।

'মায়েরা তাদের জীবনের গোপন গল্প সন্তানদের বলতে পারে নারে পদ্ম।'

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজার কান্না পেল। মানুষটাকে এতো নরম রূপে মানায় না। পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল, 'আমি আর কখনো জানতে চাইব না আম্মা।'

শুটিং দলের একজনও বাড়িতে নেই। সবাই স্কুলে মাঠে গিয়েছে। কয়দিন ধরে নদীর ঘাটে যেতে না পেরে তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠেছে পদ্মজা। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। হেমলতার অনুমতি নিয়ে সে ঘাটে চলে আসল। ঘাটের সিঁড়িতে বসল। কয়েক সেকেন্ড পর টের পেল, গান বাজছে কোথাও। গানের সুর অনুসরণ করে কয়টা সিঁড়ি নেমে আসে। ঘাটের বাম পাশে বাঁধা নৌকায় একজন পুরুষ বসে আছে। হাতে রেডিও। গানের উৎস তাহলে এখানেই। পদ্মজা বিব্রতবোধ করল। উল্টো দিকে ঘুরে ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে চলে আসে। পদ্মজা এতো দ্রুত ফিরাতে হেমলতা প্রশ্ন করেন, 'কেউ ছিল?'

পদ্মজা মাথা নাড়াল। হেমলতা চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কিছু বলেছে? দেখতে কেমন?'

'না আম্মা, কিছু বলেনি। আমাকে দেখেনি। মাথার চুল ঝাঁকড়া। মুখ খেয়াল করিনি।'

'এইটাই তো লিখন শাহ। নায়ক।'

পূর্ণা পুলকিত হয়ে বলল। হেমলতা আর কিছু বললেন না।

পূর্ণা সারাক্ষণ শুটিং দলটার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। হেমলতা বিরক্ত হয়ে পূর্ণাকে কড়া নিষেধ দিয়েছেন, আর না যেতে। যদি যায় মার একটাও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা ভয় পেয়েছে। কিন্তু লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী জুটিটা এতো ভাল লাগে তার যে শুটিং না দেখলে দম বন্ধ লাগে। তাই সে চুপিসারে টিনে একটা ছিদ্র করেছে। হেমলতা সেলাই মেশিন লাহাড়ি ঘরের পিছন বারান্দায় রেখেছেন। সারাক্ষণ সেখানেই থাকেন। সে সেময় পূর্ণা ছিদ্র দিয়ে উঁকি দেয়। শুটিং দেখে। পূর্ণাকে সবসময় দেখতে দেখে পদ্মজার আগ্রহ জাগল। সে উঁকি দিল।

ঝাকড়া চুলের মানুষটা একজন অতি সুন্দরী মেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছে। দৃষ্টি মোহময়। প্রেমময় গানের সুরধ্বনি বাড়ি জুড়ে। ক্যামেরা ধরে রেখেছেন কেউ কেউ। গানের শুটিং বোধহয়! পদ্মজা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করল। লজ্জা পেল। চোখ সরিয়ে নিল।

রাতে ঝড় এসেছিল। লাহাড়ি ঘরের পিছনে তৈরি পথ বন্ধ হয়ে গেছে গাছের ভাঙা ডালপালা দিয়ে। মোর্শেদ রাতে বাড়ি ফেরেননি। হেমলতার একার পক্ষে সম্ভব নয় পথ খালি করার। তাই পদ্মজা, পূর্ণা স্কুল থেকে বাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছিল। উঠোনে শুটিং দলের সবাই ছিল। পদ্মজা মাথা নত হয়ে থেমে থেমে কাঁপতে থাকে। পথ শেষই হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা টানা। অনেকের নজরে পদ্মজা চলে আসল। মিলন নামে একজন পূর্ণাকে ডাকল, 'এই পূর্ণা?'

পূর্ণা দাঁড়াল, সাথে পদ্মজা। পদ্মজা শুটিং দলটার দিকে তাকাচ্ছে না। মিলন পদ্মজার দিকে চোখ স্থির রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল, 'পাশের মেয়েটা কে? প্রথম দেখছি।'

'আমার বড় আপা।'

'আপন?'

মিলন ভারী আশ্চর্য হয়ে বলল। দশ দিন হলো এখানে আসার। কখনো পূর্ণা,প্রেমা ছাড়া কোনো মেয়েকে চোখে পড়ল না। কণ্ঠও শোনা যায়নি। তাই বড় বোন বলাতে সে খুব অবাক হলো। পূর্ণা হেসে বলল, 'হুম। আপন।'

মিলন বিড়বিড় করে বলল, 'চেহারার তো মিল নেই।'

'সবাই বলে।'

'আচ্ছা, যাও।'

দু'বোন লাহাড়ি ঘরে চলে আসল। পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভেতরটা এতো কাঁপছিল। অনেক মানুষের পা দেখেছে, চোখ তুলে মানুষগুলোর মুখ দেখার সাহস হয়নি। তবে, ইচ্ছে হয়েছিল চোখ তুলে তাকাতে!

বিকেলে হাজেরা আসল। সবুর মিয়ার স্ত্রী। সবুর দিনরাত গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে। বউ – বাচ্চাদের খোঁজ রাখে না। হাজেরা এর বাড়ি ওর বাড়ি এটা-ওটা চেয়ে নেয়। এরপর দুই বাচ্চা নিয়ে খায়। পদ্মজার খুব মায়া হয় হাজেরার প্রতি। হাজেরা আসতেই হেমলতা পদ্মজার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'লাউ গাছে কয়টা লাউ দেখেছিস?'

'নয়টা আম্মা।'

'পূর্ণা কই? ওরে বল দুইটা লাউ হাজেরাকে দিয়ে দিতে। কাঁচামরিচও দিতে বলবি।'

পদ্মজার মুখে কালো আঁধার নেমে আসে। হেমলতা পদ্মজার মুখ দেখে বুঝতে পারেন, পূর্ণা বাড়িতে নেই।

'টিভি দেখতে গেছে তাই না?'

পদ্মজাকে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা গেল। বিব্রতভাবে বলল,

'আম্মা, আমাকে ব..বলে গেছে।'

'তুই ওর অভিভাবক? একটু শরীরটা খারাপ লাগছে বলে শুয়েছি। ওমনি সুযোগ লুটে নিছে!'

'আম্মা, আমার দোষ। পূর্ণারে কিছু বলো না।'

পদ্মজার ভেজা কণ্ঠ হেমলতার রাগ উড়িয়ে দিল। তিনি অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে বললেন, 'হাজেরারে নিয়ে যা। ঘোমটা টেনে যাবি। বেগুন বেশি হলে, কয়টা দিয়ে দিস।'

পদ্মজার মন ভরে গেল। তার মা এতো বেশি উদার! কখনো কাউকে ফিরিয়ে দেন না। সামর্থ্যের মধ্যে আরো বেশি কিছু দেওয়ার মতো থাকলে, তিনি কার্পণ্য করেন না। তবে, হাজেরার স্বভাব অভাবে নষ্ট হয়েছে। চুরি করার প্রবণতা আছে। তাই পদ্মজাকে যেতে বললেন।

উঠোনের এক কোণে এবং লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে লাউয়ের মাচা। নয়টা লাউ ঝুলে রয়েছে। তরতাজা টাটকা সবুজ পাতা নজর কাড়ে। পদ্মজা বাড়ির দিকে তাকাল না। একটা

লাউ হাজেরার হাতে দিয়ে বলল, 'কি দিয়ে রাঁধবা?'

'জানি না গো পদ্ম। গিয়া দেহি মাছ মিলানি যায়নি।'

'তোমার ছেলেটার ঠান্ডা কমছে?'

পদ্মজা কাঁচামরিচ ছিঁড়ে হাজেরার আঁচল ভরে দিল। হাজেরা গুনগুন করে কাঁদছে আর বলছে, 'ছেড়াডা সারাদিন মাডিত পইড়া থাহে একলা একলা। রাইত হইলে জ্বরে কাঁপে। দম ফালায়তে পারে না।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'টেহা লাগব না? কই পামু?'

'তুমি, মাতব্বর বাড়িতে যেও। শুনছি, উনারা খুব দান-খয়রাত করেন।'

হাজেরা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। বেগুন গাছ বাড়ির পিছনে। পদ্মজা বাড়ির পিছনে সাবধানে আসল। মনে মনে ভাবছে, হাজেরার ছেলে সুস্থই আছে। সকালে সে দেখেছে। হাজেরা মিথ্যা বলছে৷ মানুষের খুব অভাব পড়লে বুঝি এমনই হয়?

'এতো সবজি আছে। টমেটো নেই? পাওয়া যাবে?'

পরিষ্কার সহজ গলায় বলা পুরুষালী কণ্ঠটি পদ্মজাকে মৃদু কাঁপিয়ে তুলল। ঘুরে তাকাল। লিখনকে দেখে বিব্রত বোধ করল। কারো সামনে নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত না। কথাটি হেমলতা বলেছেন। পদ্মজা হাসার চেষ্টা করল। জবাব দিল, 'এই বর্ষাকালে টমেটো কোথায় পাবেন?'

'বর্ষাকালে টমেটো চাষ হয় না?'

'টমেটো শীতকালীন ফসল।'

'গ্রীষ্ম, বর্ষাতেও তো পাওয়া যায়।'

পদ্মজা অস্বস্তি লুকিয়ে রাখতে পারছে না। স্কুলের শিক্ষক আর খুব আপন মানুষগুলো ছাড়া কোনো পর-পুরুষের সাথে তার কখনো কথা হয়নি। লিখনের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার জবান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বেগুন বুঝিয়ে দিল হাজেরাকে। লিখন বলল,

'আমি তো গতবার বর্ষাকালে টমেটোর সালাদ তৈরি করেছি।'

'হয়তো টমেটোর জাত আলাদা ছিল। সাধারণত আমাদের শীতকালেই টমেটো হয়।'

কথা শেষ করে দ্রুত লাহাড়ি ঘরে ফিরল সে। মনে হচ্ছে পর-পুরুষের সাথে কথা বলে ঘোর পাপ হয়ে গেছে।পাপ মোচন করতে হবে। ঘরে ঢুকে ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেল। হেমলতা ঘুমাচ্ছেন। নয়তো পদ্মজার মুখ দেখে নির্ঘাত বুঝে যেতেন, কিছু একটা ঘটেছে। পদ্মজা ভক্তি নিয়ে আল্লাহ তায়া'লার প্রতি শুকরিয়া আদায় করল।

হেমলতা সালোয়ার-কামিজ সেলাই করছিলেন। তখন বারান্দার সামনে একজন পুরুষ লোক এসে দাঁড়াল।

হেমলতা শাড়ির আঁচল মাথায় টেনে নেন। জিজ্ঞাসুকদৃষ্টি নিয়ে তাকান। লোকটি হেসে বলল, 'আমি মিলন। শুটিং দলের।'

হেমলতা জোরপূর্বক হাসেন। আড়চোখে ঘরের দরজার দিকে তাকান। পদ্মজা ঘুমাচ্ছে।দরজাটা লাগানো উচিত।

'কোনো দরকার?'

'না, এমনি। দেখতে আসলাম। কতদিন হলো আপনাদের বাড়িতে উঠলাম। আর, এদিকটায়ই আসা হয়নি।'

হেমলতা প্যাঁচিয়ে কথা বলা পছন্দ করেন না। সরাসরি বলে উঠলেন, 'এদিকে আসা নিষেধ। আপনাদের বলা হয়নি?'

মিলনের চোখেমুখে ছায়া নেমে আসে। সে অপমান বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে...আচ্ছা, আসছি।'

মিলন স্থান ত্যাগ করল। যাওয়ার পূর্বের তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি হেমলতার নজর এড়াতে পারল না। হেমলতা চোখ বুজে জীবনের হিসেব কষেন। এরপর ঘুমন্ত পদ্মজার দিকে তাকান।

পূর্ণার চেয়ে পদ্মজার বেশি আগ্রহ শুটিং দেখায়। টিনের ছিদ্র আরো দু'টো করেছে। লিখন শাহকে দেখলে তাঁর মায়াময়, কোমল অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির নাম সে জানে না। শুটিংয়ে লিখন শাহ কত ভালোবাসেন চিত্রা দেবীকে। পদ্মজার দেখতে খুব ভাল লাগে। পূর্ণা তেলের বোতল নিয়ে বলল, 'আপা, তেল দিয়ে দাও না।'

'সোনা বোন, একটু দাঁড়া।'

পদ্মজা ছিদ্র দিয়ে লিখন শাহর হাসি, কথা বলার ভঙ্গী দেখছে। লজ্জাও পাচ্ছে খুব। সময়টাকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'এই, আপা। পরেও তো দেখতে পারবা। দিয়ে দাও না।'

'আরেকটু। শুটিং শুরু হচ্ছে। একটু..."

পূর্ণার বিরক্তিতে রাগ হয় খুব। কিন্তু সে তার আপাকে কিছু বলবে না। তার সব ইচ্ছের সঙ্গী, সব গোপন কথার স্বাক্ষী তার আপা। সে তার আপাকে খুব ভালোবাসে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়ের চেয়েও বেশি বোধহয় সে তার আপাকেই ভালোবাসে। বা হয়তো না। পদ্মজা মিটিমিটি হাসছে। পূর্ণা তেল রেখে ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। নাহ! তাঁর এখন ভাল লাগছে না এসব দেখতে। চোখ সরিয়ে নিল।

'কিরে পদ্ম? কী দেখছিস?'

হেমলতার কন্ঠ শুনে পদ্মজা চমকে উঠল। আরক্ত হয়ে উঠল। ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির মালিকের কাছে ধরা পড়লে যেমন অনুভূতি হয় তেমন অনুভূতি হচ্ছে পদ্মজার। বা আরো ভয়ংকর অনুভূতি। হেমলতার দৃষ্টি টিনের ছিদ্রে গেল। সাথে সাথে পদ্মজা অনুভব করল, তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে৷ পূর্ণা ভয়ার্ত চোখে একবার মাকে একবার বোনকে দেখছে। ছিদ্রের গুরু তো সে!

পর্ব ৭

হেমলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দুই মেয়েকে দেখেন। তিনটা ছিদ্র দেখেন। এরপর দৃষ্টি শীতল করে বললেন, 'শুটিং দেখছিলি?'

পদ্মজা বাধ্যের মতো মাথা ঝাঁকাল। হেমলতার রাগ হলো না। তিনি চৌকিতে বসে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'ছিদ্রের বুদ্ধি পূর্ণার?'

প্রশ্নটা শুনে পূর্ণার গলা শুকিয়ে আসল। এক ফোঁটা পানি দরকার। নয়তো দম বেরিয়ে যাবে। পদ্মজা চকিতে চোখ তুলে তাকাল। অসহায় কণ্ঠে বলল, 'আম্মা, আর হবে না। পূর্ণাকে কিছু বলো না। ওর দোষ নাই,আমি... "

হেমলতা পদ্মজাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। প্রেমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেমা, তোর আব্বা কই?'

'উঠানে।'

'গিয়ে বল, আমি ডাকছি।'

প্রেমা ছুটে গেল। আবার ছুটে আসল। হেমলতা বারান্দা পার হয়ে চুলার দিকে এগোলেন। তখন মোর্শের আসলেন।

'কি হইছে? ডাক কেরে?'

'লাহাড়ি ঘরে একটা জানালা করে দাও। মেয়েদের চৌকির পাশে। কাঠ আছে মুরগির খোপের কাছে।'

'কী জন্যে?'

'আমি চাইছি, তাই। না পারলে বল। অন্য কাউকে ডাকব।'

'ত্যাড়া কথা কওন ছাড়।'

'আমার তোমার সাথে ভালো করে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'লাগব কেরে? তোমার তো আমারে পছন্দ না। তোমার পছন্দ বিলাই চোখা ব্যাঠা ছেড়ারে।'

'অহেতুক কথা বল না। মাসের পর মাস কোথায় থাকো তা আমার অজানা নয়। রোগে ধরলেই লতার কথা মনে পড়ে।'

মোর্শেদ মিনিট খানেক রাগ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

মোর্শেদ ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে দুই ফুট উচ্চতার জানালা করলেন। পদ্মজা, পূর্ণা হতবাক। সেই সাথে খুশি। হেমলতা ছোট পর্দা টানিয়ে দেন। রুম থেকে বাহির দেখা যায়। কিন্তু জানালার ওপাশে কে আছে বাহির থেকে দেখা যায় না।

সন্ধ্যা মুহূর্তের শুটিং শুরু হয়। পদ্মজা,পূর্ণা, প্রেমা চৌকিতে বসল চিড়া নিয়ে। তাদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। হেমলতা তা দেখে মৃদু হাসলেন। বড় মেয়ে দুটো কখনো মুখ ফুটে শখ আহ্লাদের কথা বলে না। না বলা সত্ত্বেও অনেকবার দুই বোনের ইচ্ছে পূরণ করেছেন তিনি। আর কিছু ইচ্ছে বুঝতে পারলেও পূরণের সামর্থ্য হয়নি হেমলতার।

হেমলতা ঘরের বাইরে যেতেই পূর্ণা বলল, 'আমাদের মায়ের মতো সেরা মা আর কেউ না। তাই না আপা?'

'মায়ের মতো কেউ হয় না। সবার কাছে সবার মা সেরা। আমাদের মা আমাদের কাছে সেরা। লাবণ্যর মা লাবণ্য আর ওর ভাইদের কাছে সেরা। মনির মা মনির কাছে সেরা।'

'ওরা বলছে?'

'বোকা! এসব বলতে হয় না।'

'না, আমাদের আম্মাই সবচেয়ে ভালো মা। এমন মা আর একটাও নেই।'

হেমলতার কানে প্রতিটি কথা আসে। পূর্ণা সবার অনুভূতি অনুভব করতে জানে না। পদ্মজা জানে।

‘আমাদের আম্মা সত্যি সেরা। আলাদা।’পদ্মজা হেসে বলল।

পূর্ণা জানালার বাইরে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, ’আপা, চিত্রা দিদিরে কেমন লাগে?’

পদ্মজা চিত্রার দিকে তাকাল। ছাইরঙা শাড়ি পরা। হাতে কালো রঙের ঘড়ি। ফুলহাতা ব্লাউজ। শালীন তবে সর্বাঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। নাকে সাদা পাথরের নাকফুল। লম্বা চুল বেণি করে রেখেছে। মুখে খুব মায়া।স্নিগ্ধ একটা মুখ। যেন শরৎ-এর শুভ্র এক টুকরো মেঘ। পদ্মজা বলল, ’আমার দেখা দ্বিতীয় সুন্দর মেয়েমানুষ চিত্রা দিদি।’

পূর্ণা আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, ’প্রথম কে?’

পদ্মজা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে মোহময় কণ্ঠে বলল, ’আমাদের আম্মা।’

হেমলতার বুক শীতল, স্নিগ্ধ, কোমল অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। পদ্মজা এতো সুন্দর করে’আমাদের আম্মা’বলেছে! হেমলতা প্রথম...এই প্রথম শুনলেন, তিনি সুন্দর! ভুবন মোহিনী রূপসীর মুখে শুনলেন। এই আনন্দ কোথায় রাখবেন তিনি। কেন ছেলেমানুষী অনুভূতিতে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি! প্রেমা অবাক স্বরে বলল, ’আম্মা তো কালো। চিত্রা দিদির চেয়ে সুন্দর কীভাবে?’

‘এভাবে বলছিস কেন প্রেমা? তুই ফর্সা হয়ে গেছিস বলে কালোকে ভালো মনে হয় না?’

পূর্ণা গমগম করে উঠল। প্রেমা ভয় পেল। পদ্মজা বলল, ’পূর্ণা, বকছিস কেন? প্রেমা কত ছোট। ও কী সুন্দরের গভীরতা বুঝে? ও খালি চোখে ফর্সা, কালোর তফাৎ দেখে।’

‘সুন্দরের গভীরতা তো আমিও বুঝি না।’

পূর্ণার কণ্ঠ ভারী নিষ্পাপ শোনাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল হেমলতার উপস্থিতি। এরপর বলল, ’আম্মার রং কালো। কিন্তু সৌন্দর্যের কমতি নেই। আম্মাকে কখনো এক মনে দেখিস,বুঝবি। আমাদের আম্মার চোখ দুটি গভীর,বড়,বড়। পাতলা,মসৃণ ঠোঁট। আম্মার ঘন চুলের খোঁপায় এক আকাশ কালো মেঘ। আম্মার শাড়ির কুচির ভাজে আভিজাত্য লুকোনো। আম্মা যখন তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকান, তখন মনে হয়, বিরাট বড় রাজত্বের রানী তাঁর পূর্বপুরুষের ক্ষমতা প্রকাশ করছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এতকিছু থাকা সত্ত্বেও কী আম্মা আমাদের দেখা প্রথম সুন্দর মানুষ হতে পারেন না?’

পদ্মজার প্রতিটি কথা পূর্ণার উপর ভীষণ ভাবে প্রভাব ফেলল। প্রেমা চোখ পিটপিট করে কিছু ভাবছে। পূর্ণা বলল, ’হতে পারে। কাল থেকে আমি আম্মাকে দেখব মন দিয়ে।’

‘আমিও।’প্রেমা পূর্ণার দলে ঢুকল।

হেমলতার চোখ বেয়ে দু’ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই কালো রঙের জন্য ছোট থেকে সমাজে তুচ্ছতাচ্ছিল্য হয়ে এসেছেন। কত লুকিয়ে কাঁদা হয়েছে। কত করে চাওয়া হয়েছে, কেউ সুন্দর বলুক। কিন্তু সেই কপাল কখনো হয়নি। আর আজ, এই বয়সে এসে শুনলেন, তিনি কুৎসিত নন। তার মাঝেও সৌন্দর্য আছে। জন্মদাত্রী মা কালো রঙের জন্য গরম চামচ দিয়ে পোড়া দাগ করেছিলেন ঘাড়ে। আর গর্ভের সন্তান আজ সেই অনুচিত কাজের জবাব দিল। আল্লাহর সৃষ্টি কেউ অসুন্দর নয়। সবার মধ্যেই সৌন্দর্য আছে। যা ধরা পড়ে শুধুমাত্র সুন্দর একজোড়া চোখে।

নিশুতি রাত। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। হেমলতা চোখ খুলেন। হুট করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ইঙ্গিত করছে কোনো ষড়যন্ত্রের। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে দু’জোড়া পায়ের আওয়াজ। হেমলতার বুক কেঁপে উঠল। তিনি দ্রুত উঠে বসেন। দুই চৌকির মাঝের পর্দা সরিয়ে দেখেন পদ্মজার অবস্থান। পদ্মজাকে ঘুমাতে দেখে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়েন। পায়ের আওয়াজ একদম পাশে শোনা যাচ্ছে। হেমলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ডান পাশে তাকান। গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবুও তিনি তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, অদৃশ্য গোপন শত্রুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

‘কে ওখানে?’

হেমলতার ঝাঁঝালো কণ্ঠে পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। সেকেন্ড কয়েক পর দুই’জোড়া পা যেন ছুটে পালাল।

পর্ব ৮

আলো ফোটার পূর্বে নিদ্রা ত্যাগ করে চার মা-মেয়ে একসাথে নামায পড়ল। এরপর বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে তিন বোন পড়তে বসল। রাতভর ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষা স্নানে স্নিগ্ধ প্রকৃতি। মায়াবী সকাল। এমন সকালে কেউ ঘুমাতে চায়। আর কেই বা বই পড়তে পছন্দ করে। অথবা,পছন্দের অন্য যে কোনো কাজ করে। পূর্ণার ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। পড়া একদমই সহ্য হচ্ছে না। পড়া থেকে উঠেই সে মনোবাসনা পূর্ণ করতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সাথে সাথে ঘুমে হারাল। পদ্মজা অনেক ডাকল, উঠল না। এদিকে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। হেমলতা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পূর্ণা ঘুমে?'

'জ্বি, আম্মা।'

'সে জানে না স্কুল আছে। তবুও কোন আক্কেলে ঘুমাল।'

মায়ের কঠিন স্বরে পদ্মজা ভয় পেল। পূর্ণা নির্ঘাত মার খাবে আজ। সে হেমলতাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'তুমি যাও আম্মা। পূর্ণা কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

হেমলতা জানেন, পূর্ণা এতো সহজে ঘুম থেকে উঠবে না। অহরহ এমন হয়ে আসছে। যতই আদর করে ডাকা হোক না কেন, বৃষ্টিমাখা সকালে তার ঘুম ছুটানো যায় না। বাঁশের কঞ্চি পূর্ণা খুব ভয় পায়। কঞ্চির বাড়ি না খাওয়া অবধি ঘুম পূর্ণাকে কিছুতেই ছাড়বে না। এ যেন ভূত ছাড়ানোর মতো। হেমলতা বাঁশের কঞ্চি আনতে যান। এদিকে পদ্মজা ডেকেই যাচ্ছে, 'পূর্ণা? উঠ। মারটা খাওয়ার আগে উঠ। এই পূর্ণা। পূর্ণারে...পূর্ণা উঠ।'

পূর্ণা পিটপিট করে চোখ খুলে আবার ঘুমিয়ে যাচ্ছে। প্রেমা এই ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে। একটা মানুষ এতো ডাকাডাকিতেও কী করে না জেগে থাকতে পারে?

সে নিষকম্প স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বড় দুই বোনের দিকে। হেমলতা হাতে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ঘরে ঢুকেন। তা দেখে পদ্মজা পূর্ণাকে জোরে চিমটি দিল। পূর্ণা মুখে বিরক্তিকর আওয়াজ তুলে আবার ঘুমে তলিয়ে গেল।

'তুই সর পদ্ম। ও মারের যোগ্য। পিটিয়ে ওর ঘুম ছুটাতে হবে।'

পদ্মজা মায়ের উপর কিছু বলার সাহস পেল না। দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হেমলতা পূর্ণার পায়ের গোড়ালিতে বাড়ি দেন। প্যাঁচ করে আওয়াজ হয়। পদ্মজা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। পা ছিঁড়ে গেছে বোধহয়। ঘুমন্ত পূর্ণার মস্তিষ্ক জানান দেয়, আম্মা এসেছেন। এবং তিনি আঘাত করেছেন। সে চোখ খোলার আগে দ্রুত উঠে বসল। চোখ খুলতে খুলতে যদি দেরি হয়ে যায়! এরপর চোখ খুলল। বোকাসোকা মুখ করে মায়ের দিকে তাকাল পরিস্থিতি বুঝতে। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসছে। প্রেমা জোরে হেসে উঠল। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই হাসি থামিয়ে দিল। পূর্ণা ভীতু কণ্ঠে বলল, 'আর হবে না আম্মা।'

'সে তো, প্রতিদিনই বলিস।'

এমন সময় ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। পূর্ণা, প্রেমা মনে মনে খুশি হলো। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। বাড়ি থেকে দুই ক্রোশ দূরে স্কুল। আম্মা নিশ্চয় যেতে না করবেন। পূর্ণা খুশি লুকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা, মেঘ আসবে মনে হয়। যাবো স্কুলে?'

'মেঘ কী করল তোকে? যাবি স্কুলে।'

হেমলতা চলে যেতেই পূর্ণা ভ্রুকুঞ্চন করল। থম মেরে বসে রইল। পদ্মজা তাড়া দিল, 'বসে আছিস কেন? জলদি কর। নয়তো আবার পিটানি খাবি।'

পূর্ণা বিরক্তি নিয়ে তৈরি হলো। তিন বোন স্কুলের দিকে রওনা দিল। বর্ষাকাল চলছে। রাতে বিরতিহীনভাবে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর কাঁদা জমেছে। পথ চলা কষ্টকর।

তিন বোন হাতে জুতা নিয়ে পা টিপে হাঁটছে। পিছলে পড়ে বই খাতা নষ্ট করার ভয় কাজ করছে মনে। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। পদ্মজা পথের পাশ থেকে বড় কচু পাতা ছিঁড়ে নিল তিনটা।

তিন বোন কচু পাতায় মাথা আড়াল করল। কিন্তু দেহ ও বই-খাতা আড়াল করা গেল

না। ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ধ্যাত! ভিজে স্কুলে গিয়ে লাভ কী আপা? দেখ,পায়জামা হাঁটু অবধি কাঁদায় আর বৃষ্টির পানি দিয়ে কী হয়েছে।'

পদ্মজা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝতে পারছিনা কী করব! স্কুলে যাব? নাকি বাড়ি ফিরব।'

'আপা, বাড়ি যাই।'

বলল প্রেমা। পদ্মজা ভাবল। এরপর দু'বোনকে বলল, 'ভিজে তো কতবারই গেলাম। আজও যাই। সমস্যা কী?'

অগত্যা স্কুলেই যেতে হলো। স্কুল ছুটির আগেও বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাড়ি ফেরার পথ ধরল দুই বোন।

প্রেমার এক ঘন্টা আগে ছুটি হয়েছে। পদ্মজা নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'আব্বা আসছিল স্কুলে?'

'হ আসছিল। প্রেমারে নিয়ে গেছে।'

'তোর সাথেও তো দেখা করল।'

পদ্মজার গলাটা করুণ শোনাল। পূর্ণার মন খারাপ হয়। আব্বা কেন তার এতো ভাল আপাকে ভালোবাসেন না?

'পূর্ণা, পড়ে যাবি। সাবধানে হাঁট।'

পদ্মজা সাবধান বাণী দিতে দিতে পূর্ণা ধপাস করে কাঁদা মাটিতে পড়ল। পদ্মজা আঁতকে উঠল। পূর্ণার পা নিমিষে ব্যাথায় টনটন করে উঠে। পদ্মজা পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরেও উঠতে পারছে না পূর্ণা। কাঁদো কাঁদো হয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপা, পা ভেঙে গেল মনে হয়। কী ব্যথা করছে।'

'মচকেছে বোধহয়। ঠিক হয়ে যাবে। উঠার চেষ্টা কর। আমার গলা ধরে চেষ্টা কর।'

গ্রামের পথ। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। পথে কেউ নেই। গৃহস্থরা ভাত ঘুম দিয়েছে। সামনে বিলে থইথই জল। তার পাশে ক্ষেত। ডানে-বামে কাঁদামাটির পথ। পিছনে ঝোপঝাড়। পদ্মজা সাহায্য করার মতো আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। পূর্ণা পা সোজা করার শক্তি পাচ্ছে না। পায়ে প্রচন্ড ব্যথা! ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে সে। পদ্মজা না পারছে পূর্ণাকে তুলতে আর না পারছে পূর্ণার কান্না সহ্য করতে। সে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। পদ্মজার উৎসাহে পূর্ণা মনকে শক্ত করে পায়ের পাতা মাটিতে ফেলল। সাথে সাথে শরীরে ব্যথার বিজলি চমকাল।

'আপারে, পারছি না। আমার পা শেষ। মরে যাব আমি।'

'এসব বলিস না। পায়ের ব্যথায় কেউ মরে না।'

আহত পা ফুলে দুই ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেছে। তা দেখে আতঙ্কে পদ্মজার চোখ মুখ নীল হয়ে গেল। তার কান্না পাচ্ছে খুব। পদ্মজা পূর্ণার পায়ে আলতো করে চাপ দিতেই পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

'একটু সাবধানে হাঁটলে কী হতো? ইশ, এখন কী কষ্টটা হচ্ছে।'

'আপা, পা ব্যথা খেয়ে নিচ্ছে।'

পদ্মজা খুব কাছে পায়ের শব্দ পেল। চকিতে চোখ তুলে ক্ষেতের দিকে তাকাল। মুহূর্তে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে পূর্ণাকে বলল, 'পূর্ণারে, আম্মা আসছে।'

হেমলতাকে দেখে পূর্ণা কলিজায় পানি পেল। মনে হলো, মাকে দেখেই ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। হেমলতা ছুটে আসেন। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'কিছু হয়নি। এসব সামান্য ব্যাপার।'

এরপর পদ্মজাকে বললেন, 'তুই বইগুলো নে।'

হেমলতা এদিকে সেলাই করা কাপড় দিতে এসেছিলেন। যার কাপড় ছিল, সে অসুস্থ। তাই যেতে পারছিল না।

বাড়িতেও কোনো কাজে মন টিকছিল না। তাই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে একটা মানুষকে সাহায্য করা ভালো। ফেরার পথে তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন দুটো মেয়েকে। একটা মেয়ে পথে বসে আছে। আরেকটা মেয়ে পাশে। বিপর্যস্ত অবস্থা তাদের। মেয়ে দু'টিকে চিনতে পেরে বুক কেঁপে উঠল। পথ দিয়ে আসলে দেরি হবে। তাই তিনি ক্ষেতের পথ ধরেন।

পূর্ণা ব্যথায় যেন নিঃশ্বাস নেয়ার শক্তি পাচ্ছে না। একটা ভ্যান পাওয়া গেলে খুব উপকার হতো। দুই মিনিটের মাথায় ভ্যানের দেখা মিলল। অনেক দূরে ভ্যানের অবস্থান। ভ্যানে চিত্রা, লিখন সহ আরো দুজন।

তারা মাতব্বর বাড়িতে গিয়েছিল। যখন কাছাকাছি ভ্যানের অবস্থান তখন চিত্রা পদ্মজা আর তার মা, বোনকে দেখল। উদ্বিগ্নতা নিয়ে ভ্যান থামাতে বলল। লিখনের নজরে ব্যাপারটা আসতেই সে তাড়াহুড়ো করে ভ্যান থেকে নামল। চিত্রা আগে আগে এগিয়ে আসে। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বলল, 'পূর্ণার কী হয়েছে ?'

পদ্মজা বলল, 'কাঁদায় পড়ে পা মচকেছে।'

হেমলতা, চিত্রা,পদ্মজা এবং পূর্ণাকে তুলে দিয়ে লিখন সহ বাকি দুজন সহকর্মী ভ্যান ছেড়ে দিল। তারা হেঁটে ফিরবে।

পা ব্যথা অনেকটা কম লাগছে। দুটি বালিশের উপর পা রাখা। ব্রেস নেই বিধায় ব্রেসের মতো কাপড় বেঁধে দিয়েছেন হেমলতা। যা ব্যাথা পেয়েছে কয়দিন বোধহয় স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে না। হেমলতা মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'এবার খুশি? স্কুলে যেতে হবে না। কাজ করতে হবে না। সকালে উঠে পড়তে বসতে হবে না।'

পূর্ণা রাজ্যের দুঃখ নিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি টিভি দেখতে যাব কী করে?'

কোনো সাড়া না পেয়ে পূর্ণা বুঝতে পারল, সে মুখ ফসকে ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। সে বিব্রত হয়ে উঠল। ঢোক গিলল। এরপর কাঁচুমাচু হয়ে মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'মোটেও খুশি হইনি।'

বিকেলে মগা এসে জানাল, মুন্নার বাপ খুন হয়েছে। কথাটি শোনার সাথে সাথে উপস্থিত সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়ল। পঙ্গু, ভিক্ষুক অসহায় মানুষটাকে কে মারল? এমন মানুষের শত্রু থাকে? এমনই শত্রু যে, একদম মেরে ফেলল। হেমলতা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লেন'কখন?'

মগা বলল, দুপুরের কথা। দুপুর দুটো কি তিনটায় গ্রামবাসী জানতে পারে এই ঘটনা। আস্তে আস্তে সব গ্রামে খবর যাচ্ছে। লাশ নোয়াপাড়ার ধান ক্ষেতে পাওয়া গেছে।

মুন্নার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। দুঃসম্পর্কের যারা আছে তারা মুন্নার দায়িত্ব নিতে চাইল না। মাতব্বর মুন্নার ভার নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুন্না পদ্মজাদের বাড়ি থাকতে চায়। হেমলতা সানন্দে নিয়ে আসলেন মুন্নাকে।

এখন থেকে মুন্না এই বাড়ির ছেলে। পদ্মজা, পূর্ণা খুব খুশি হলো। খুশি হলো না প্রেমা। মুন্না, প্রেমা সমবয়সী। প্রেমা ভাবছে, তার আদরের ভাগ বসাতে মুন্না এসেছে।

হেমলতা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। পদ্মজাকে বললেন, 'প্রেমার পছন্দ হচ্ছে না মুন্নাকে। দুজনের মধ্যে সখ্যতা করে দিস। যাতে একজন আরেকজনকে আপন চোখে দেখে।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল, 'কয়দিনে মিশে যাবে দুজন।'

পূর্ণা ব্যথায় ঘুমাতে পারছে না। প্রেমা, মুন্না ঘুমে। মুন্না খুব কেঁদেছে। এখন ক্লান্ত হয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত তো কম হলো না। পূর্ণা মা-বোনের বৈঠক দেখে বলল, 'আম্মা, মুন্নার

নতুন নাম রাখা উচিৎ।'

'কেন?'

'এখন থেকে মুন্না আমাদের ভাই। আমাদের নাম প দিয়ে। তাইলে ওর নাম ও প দিয়ে হবে। তাই না আপা?'

হেমলতা হেসে বলেন, 'তুই নাম রাখ তাহলে।'

'রাখছি তো। প্রান্ত মোড়ল।'

'মুন্নাকে জানা সকালে। রাজি হলে এরপর সবাই নাহয় ডাকব।'

'রাজি হবে না মানে? পিটিয়ে রাজি করাব।'

হেমলতা মৃদু হাসলেন। পূর্ণা অসুস্থ হলে খুব কথা বলে। মুখ বন্ধ রাখতেই পারে না। অনেক বছর আগের ঘটনা, বা কয়েক বছর পর কি হবে তা নিয়ে অনবরত কথা বলতে থাকে।

গহীন অন্ধকার। আজ বোধহয় অমাবস্যা। হেমলতা কালো চাদরের আবরণে ঘাপটি মেরে বারান্দায় বসে আছেন। হাতের কাছে ছুরি,লাঠি। গত তিন'দিন ধরে তিনি ঘরের পাশে পায়ের আওয়াজ শুনছেন। তখন ঘরে মোর্শেদ ছিল। একজন পুরুষ ছিল। বুকে সাহস ছিল। আজ মোর্শেদ নেই। মুন্নাকে বাড়িতে আনাতে তিনি ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই! আজ কিছুতেই ঘুমানো যাবে না। হাতেনাতে সন্দেহকারীকে ধরে এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হলো কেউ আসছে না। চোখ বুজে আসছে হেমলতার। সারাদিন অনেক খাটুনি গেল।

কাঁদামাটিতে ছপছপ শব্দ তুলে কেউ আসছে। হেমলতা সতর্ক হয়ে উঠেন। শক্ত হাতে লাঠি ও ছুরি ধরেন। পায়ের শব্দটা কাছে আসতেই তিনি বেরিয়ে আসেন। অন্ধকারে পরিষ্কার নয় মুখ। আন্দাজে ছুঁড়ে মারেন হাতের লাঠি। লাঠিটা বেশ ভাল ভাবেই পড়ল সামনের জনের উপর। পিছনের জন দৌড়ে পালাল। লোকটি আর্তনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণেই পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না হেমলতার জন্য। হেমলতা দ্বিতীয় লাঠি দ্বারা আবার আঘাত করলেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির।

আহত ব্যক্তির আর্তচিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে আসে সবাই। টর্চের আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। হেমলতা স্বাভাবিক ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেন জানতেন এই লোকেরই আসার কথা ছিল। শুটিং দলকে তিনি আজই বের করবেন। তবেই শান্তি!পদ্মজা, প্রেমা, মুন্না বেরিয়ে আসে। পূর্ণা ঘরেই রইল। পদ্মজা ডিরেক্টর আবুল জাহেদকে দেখে চমকাল! তখন কোথেকে আগমন ঘটলো মোর্শেদের!

পর্ব ৯

আবুল জাহেদকে আহত অবস্থায় দেখে সবাই চমকে উঠল। কপাল বেয়ে তার রক্ত ঝরছে। একজন দৌড়ে গেল বাড়ির ভেতর ফার্স্ট এইড বক্স আনতে। লিখন কিছু সময়ের জন্য থমকাল। আবুল জাহেদের কপাল ব্যান্ডেজ করার পর তাকে একটা চেয়ারে বসতে দেয়া হলো। হেমলতা লাঠিতে এক হাতের ভর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। লিখন প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছিল? আপনি উনাকে আঘাত করলেন কেন?'

হেমলতা বললেন, 'এই অসভ্য লোক আজ চারদিন ধরে মাঝরাতে এখানে ঘুরঘুর করে। তার উদ্দেশ্য খারাপ।'

লিখন আড়চোখে পদ্মজাকে দেখল। এরপর আবুল জাহেদকে প্রশ্ন করল, 'উনি যা বলছেন,সত্যি?'

আবুল জাহেদ গমগম করে উঠল, 'আমি আজই প্রথম এসেছি এখানে। ঘুম আসছে না। তাই হাঁটতে হাঁটতে এদিক চলে এসেছি। হুট করেই উনি আক্রমণ করে বসলেন।'

হেমলতা প্রতিবাদ করেন দৃঢ় স্বরে, 'মিথ্যে বলবেন না একদম।'

আবুল জাহেদ কিছুতেই তার উদ্দেশ্য স্বীকার করল না। তর্কেতর্কে ভোরের আলো ফুটল। হেমলতা কঠিন করে জানিয়ে দিয়েছেন আজই এই বাড়ি ছাড়তে হবে। হেমলতার সিদ্ধান্ত শুনে দলটির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তীরে এসে নৌকা ডুবতে কীভাবে দেয়া যায়? সিনেমার শেষ অংশটুকু বাকি। শর্ত অনুযায়ী আরো দশদিন আছে। দলের একজন বয়স্ক অভিনেতা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে হেমলতা জবাব দিলেন, 'আমার তিনটা মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারবেন? একটা পুরুষ মানুষ রাতের আঁধারে যুবতী মেয়েদের ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করবে কেন? কীসের ভিত্তিতে?'

হেমলতা সবাইকে এড়িয়ে লাহাড়ি ঘরে ঢুকেন। এদের সাথে তর্ক করে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। আবুল জাহেদের ধূর্ত চাহনি তার নজরে এসেছে বারংবার। প্রথম রাতে পায়ের আওয়াজ শুনে চিনতে পারেননি। এরপরদিন, সন্দেহ তালিকায় থাকা চার-পাঁচ জনকে অনুসরণ করে তিনি নিশ্চিত হোন, রাতে কে লাহাড়ি ঘরের পাশে হেঁটেছিল। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে তুষের স্তূপ। পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢাকা। অসাবধান বশে আবুল জাহেদের কাঁদা মাখা জুতা তুষের স্তূপে পড়ে। ফলে জুতায় তুষ লেগে যায়। এরপরদিন হেমলতা বাড়ির বারান্দায় জুতাজোড়া দেখতে পান। তুষ বাড়ির আর কোথাও নেই। তিনি ব্যস্ত হয়ে তুষের স্তূপের কাছে এসে দেখেন, এক জোড়া জুতার চাপ। সেই জুতা যখন আবুল জাহেদ পরল তিনি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হোন।

শুটিং দলটার মধ্যে একটা হাহাকার লেগে গেল। বেশ কিছুকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলল। এরপর সবাই মোর্শেদকে ধরল। বিনিময়ে তারা আরো টাকা দিতে রাজি। হেমলতার ধমকের ভারে তখন চুপ হয়ে গেলেও টাকার কথা শুনে মোর্শেদের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। ঘরে এসে হেমলতার সাথে ধুন্ধুমার ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন। হেমলতা কিছুতেই রাজি হননি। শেষ অবধি তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারলেন না। দলের কিছু ভাল মানুষের অনুরোধ ফেলতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। দশদিনের বদলে পাঁচ দিনের সময় দেন। হেমলতা স্বস্থিতে নিঃশ্বাস ফেলেন। ভাগ্যিস কোনো ঘটনা ঘটার আগে ব্যাপারটা খোলাসা হয়েছে।

বেশ গরম পড়েছে আজ। মুন্নাকে পাশে নিয়ে পদ্মজা পাটিতে বসে আছে। মনোযোগ দিয়ে মুন্নাকে শিখাচ্ছে, কাকে কী ডাকতে হবে।

'আমায় ডাকবি, বড় আপা। পূর্ণাকে ছোট আপা। আর প্রেমাতো তোর সমান। তাই প্রেমা ডাকবি। দুজন মিলেমিশে থাকবি। বুঝেছিস?'

'হ, বুঝছি।'

‘আম্মাকে তুইও আম্মা ডাকবি। আমাদের আম্মা, আব্বা আজ থেকে তোরও আম্মা, আব্বা। বুঝছিস?’

মুন্না বিজ্ঞ স্বরে বলল, ’হ, বুঝছি।’

হেমলতা রান্না রেখে উঠে আসেন। মুন্নাকে বলেন, ’শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবি। তোর পদ্ম আপা যেভাবে বলে।’

‘কইয়ামনে।’

পদ্মজা বলল, ’কইয়ামনে না। বল, আচ্ছা বলব।’

মুন্না বাধ্যের মতো হেসে বলে, ’আচ্ছা, বলব।’

হেমলতা হেসে চলে যান। পূর্ণা রুম থেকে মুন্নাকে ডাকল, ’মুন্নারে?’

‘হ,ছুডু আপা।’

পদ্মজা মুন্নার গালে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল, ’বল, জি ছোট আপা।’

মুন্না পদ্মজার মতো করেই বলল, ’জি, ছোট আপা।’

পদ্মজা হাসল। পূর্ণা মৃদু হেসে বলল, ’তোর নাম পাল্টাতে হবে। আমি তোর নতুন নাম রেখেছি।’

‘কেরে? নাম পাল্ডাইতাম কেরে?’

পদ্মজা কিছু বলার আগে মুন্না প্রশ্ন করল, ’আইচ্ছা এই কথাডা কেমনে কইতাম?’

পদ্মজা হেসে কপাল চাপড়ে। এই ছেলে তো আঞ্চলিক ভাষায় বুঁদ হয়ে আছে। পূর্ণা বলল, ’তুই এখন আমাদের ভাই। আমাদের নামের সাথে মিলিয়ে তোর নাম রাখা উচিত। কি উচিত না?’

মুন্না দাঁত কেলিয়ে হেসে সায় দিল, ’হ।’

‘এজন্যই তোর নাম পাল্টাতে হবে। আজ থেকে তোর নাম প্রান্ত মোড়ল। সবাইকে বলবি এটা। মনে থাকবে?’

‘হ, মনে রাহাম।’

‘বল, আচ্ছা মনে রাখব।’

‘আচ্ছা, মনে রাখব।’

দুপুর গড়াতেই হাজেরা আসল। সাথে নিয়ে এসেছে বানোয়াট গল্প আর বিলাপ। ইশারা, ইঙ্গিতে সে লাউ চাইছে। মোর্শেদ গতকাল সব লাউ বাজারে তুলেছেন। গাছে আর একটা ছিল। ঘরে চিংড়ি মাছ আছে। প্রান্ত লাউ দিয়ে চিংড়ি খাবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

হেমলতা হাসিমুখে শেষ লাউটা নিয়ে এসেছেন। এখন আবার হাজেরারও চাই। কেউ কিছু চাইলে হাতে থাকা সত্ত্বেও হেমলতা ফিরিয়ে দেননি। আজও দিলেন না। তিনি হাজেরাকে হাসিমুখে লাউ দিলেন। হাজেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলে গেল। পদ্মজা মায়ের দিকে অসহায় চোখে তাকায়। প্রান্ত এই বাড়িতে এসে প্রথম যা চাইল তাই পেল না। মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না তো! হেমলতা পদ্মজার দৃষ্টি বুঝেও কিছু বললেন না। প্রান্তকে ডেকে কোলে বসান। ছেলেটাকে দেখতে বেশ লাগছে। দুপুরে তিনি গোসল করিয়েছেন। মনে হয়েছে কোনো ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করা হচ্ছে। জন্মদাতার মৃত্যু প্রান্তের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলল না। এজন্য কেউই অবাক হয়নি। বাপ-ছেলের শুধু রাতেই একসাথে থাকা হতো। অনেক রাত প্রান্ত একা থেকেছে। এইটুকু ছেলে কত রাত ভয় নিয়ে কাটিয়েছে! হেমলতা আদুরে কণ্ঠে বললেন, ’একটা গল্প শোনাই। শুনবি?’

‘হুনাও।’

পদ্মজা প্রান্তের ভাষার ভুল ধরিয়ে দিল, ’হুনাও না। বল, শোনাও আম্মা।’

প্রান্ত মাথা কাত করে। এরপর হেমলতাকে বলল, ’শোনাও আম্মা।’

আম্মা ডাকটা শুনে হেমলতা বুক বিশুদ্ধ ভাললাগায় ছেয়ে গেল। তিনি কণ্ঠে ভালবাসা ঢেলে বললেন, ’আমাদের একদিন মরতে হবে জানিস তো?’

‘হ।’

‘জান্নাত, জাহান্নামের কথা কখনো কেউ বলেছে?’

প্রান্ত মাথা দুই পাশে নাড়াল। কেউ শোনায়নি। হেমলতা এমনটা সন্দেহ করেছিলেন। প্রান্ত এ সম্পর্কে জানে না। তিনি ধৈর্য্য নিয়ে সুন্দর করে জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন। জান্নাতের বর্ণনা শুনে প্রান্তের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। প্রশ্ন করল হাজারটা। হেমলতাকে জানায়, সে জান্নাতে যেতে চায়। জাহান্নামে যেতে চায় না। হেমলতা বললেন, ’আচ্ছা, এখন গল্পটা বলি। মন দিয়ে শুনবি।’

প্রান্ত মাথা কাত করে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিল। হেমলতা বলতে শুরু করেন, ’একজন মহিলা একা থাকত বাড়িতে। না, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। খুব ছোট ছোট। খুব অভাব তাদের। ছোট একটা জায়গায় মাটির ঘর। ঘরের সামনে শখ করে একটা লাউ চারা লাগায়। লাউ গাছ বড় হয়। লাউ পাতা হয় অনেক। এই লাউ পাতা দিয়ে দিন চলে তার। কখনো সিদ্ধ করে খায়। নুন, মরিচ পেলে শাক রেঁধে খায়। তো একদিন একজন ভিক্ষুক মহিলা আসল। ভিক্ষুক মহিলাটি খায় না দুই দিন ধরে। লাউ গাছে লাউ পাতা দেখে খেতে ইচ্ছে করে। লাউ গাছের মালিক যে মহিলাটি,তাকে ভিক্ষুক বলে, লাউ পাতা দিতে। রেঁধে খাবে। খুব অনুনয় করে বলে। মহিলাটির মায়া হয়। ভিক্ষুক মহিলাকে কথা শোনাতে শোনাতে কয়েকটা লাউ পাতা ছিঁড়ে দেয়। তার কয়দিন পর লাউ গাছের মালিক যিনি, তিনি মারা গেলেন। গ্রামবাসী সহ মসজিদের ইমাম মিলে দাফন করেন। বুঝছিস তো প্রান্ত?’

‘হ।’

প্রান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সে খুবই মনোযোগী শ্রোতা। হেমলতা বাকিটা শুরু করলেন, ’গ্রামের ইমাম একদিন স্বপ্ন দেখেন, যে মহিলাটিকে তিনি দাফন করেছেন তার চারপাশে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তার গায়ে আঁচ অবধি লাগছে না। মহিলাটিকে ঘিরে রেখেছে লাউ পাতা। যার কারণে আগুন ছুঁতে পারছে না। ওইযে তিনি একজন ভিক্ষুককে নিজের একবেলা খাবারের লাউ পাতা দান করেছিলেন। সেই লাউপাতা তাকে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাচ্ছে। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে আমাদের অনেক এবাদত করা উচিত। তার মধ্যে একটি হলো দান। সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা উচিত। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত না। বোঝা গেছে?’

‘হ, বুঝছি। আমি দান করাম।’

‘হুম। করবি। অনেক বড় হবি জীবনে। আর অনেক দান-খয়রাত করবি। আচ্ছা, প্রান্ত এখন যদি কোনো অভাবী এসে বলে, তোর লাউটা দিতে। তুই কী করবি?’

প্রান্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে। এরপর বলল, ’দিয়া দিয়াম।’

‘একটু আগে একজন মহিলা আসছিল না? দেখেছিস তো?’

‘হ, দেখছি।’

‘সে খুব গরীব। বাড়িতে বাচ্চা আছে ছোট। এসে বলল, লাউ দিতে। তাই তোর লাউটা দিয়ে দিয়েছি। এজন্য কী এখন তোর মন খারাপ হবে?’

‘লাউডা তুমি দিছ। তাইলে তোমারে আগুন থাইকা বাঁচাইব লাউডা?’

‘লাউটা আমি দিলেও, তোর জন্য ছিল। তুই এখন খুশি মনে মেনে নিলে লাউটা তোকে আগুন থেকে বাঁচাবে।’

হেমলতার কথায় প্রান্ত খুশি হয় খুব। পরপরই মুখ গম্ভীর করে প্রশ্ন করল, ’একটা লাউ কেমনে বাঁচাইব আমারে?’

প্রান্তর নিষ্পাপ কণ্ঠে প্রশ্নটা শুনে হেমলতা, পদ্মজা, পূর্ণা হেসে উঠল। পদ্মজা বলল, ’কয়টা পাতা অনেকগুলো হয়ে মহিলাটাকে বাঁচিয়েছিল। তেমন একটা লাউ অনেকগুলো হয়ে তোকে বাঁচাবে।’

প্রান্ত একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। হেমলতা হেসে হেসে তার উত্তর দিচ্ছেন। পদ্মজার হুট করেই প্রান্তের থেকে চোখ সরে হেমলতার উপর পড়ে। মা হাসলে সন্তানদের বুকে যে আনন্দের ঢেউ উঠে তা কী জানেন? পদ্মজার আদর্শ তার মা। সে তার মায়ের মতো

হতে চায়।

পাঁচদিন শেষ। শুটিং দলের মধ্যে খুব ব্যস্ততা। সবকিছু গুছানো হচ্ছে। পাঁচ দিনে তাড়াহুড়ো করে শুট শেষ করা হয়েছে। লিখন উঠানে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। চিত্রা এসে তার পাশে বসল। কাশির মতো শব্দ করল লিখনের মনোযোগ পেতে। লিখন তাকাল। ম্লানমুখে প্রশ্ন করল, 'সব গুছানো শেষ?'

'হুম, শেষ। তুমি তো কিছুই গুছাওনি।'

'বিকেলে রওনা দেব। আমার আর কি আছে গুছানোর? দুপুরেই শেষ করে ফেলব।'

'মন খারাপ?'

লিখন কিছু বলল না। লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে শূন্যতা। কিছু ফেলে যাওয়ার বেদনা। বুকের বাঁ পাশে চিনচিন করা ব্যাথা। চিত্রা হাত ঘড়ি পরতে পরতে বলল, 'ছোট বোনের সমান বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে ছিলে। এখন তার প্রেমেই পড়লে।'

লিখন কিছু বলল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। চিত্রা বলল, 'পদ্মজা কিন্তু অনেক বড়ই। আগামী মাসে ওর সতেরো হবে শুনেছি। এই গ্রামে সতেরো বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে হাতেগোনা কয়টা। পদ্মজার শ্রেণীর বেশিরভাগ মেয়ে বিবাহিত। আর খুব কম মেয়ে পড়ে।'

চিত্রার কথা অগ্রাহ্য করে লিখন বলল, 'তোমার বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

'বছরের শেষ দিকে। সব ঠিকঠাক থাকলে। আর ভগবান চাইলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঢাকা রওনা দেবে। হেমলতা, মোর্শেদ বিদায় দিতে এসেছেন। দলটার তিন-চার জনের চরিত্রে সমস্যা থাকলেও বাকিরা খুব ভাল। হেমলতার সাথে মিশেছে খুব। নিজের বাড়ি মনে করে থেকেছে। বাড়ির দেখাশোনা করেছে। লিখন হেমলতার আড়ালে একটি সাহসিকতার কাজ করে ফেলল। ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে আসল। বারান্দায় বসেছিল পদ্মজা। লিখনকে দেখে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। পদ্মজাকে কিছু বলতে দিল না লিখন। সে দ্রুত বারান্দায় উঠে পদ্মজার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে জায়গা ত্যাগ করল। পদ্মজা অনবরত কাঁপতে থাকে। পূর্ণা চৌকি থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। সে হতভম্ব। ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পদ্মজার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। হাত থেকে চিঠি পড়ে যায়। পূর্ণা কুড়িয়ে নিল। পদ্মজার গলা শুকিয়ে কাঠ।

হেমলতা এসে দেখেন পদ্মজা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। কেমন দেখাচ্ছে যেন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেব, 'পদ্ম? শরীর খারাপ?'

মায়ের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ভয় পেল। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্থি। চোখ দু'টি স্থির রাখা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস এলোমেলো। পূর্ণা পরিস্থিতি সামলাতে বলল, 'আম্মা, আপার মাথা ব্যথা।'

'হুট করে এমন মাথা ব্যথা উঠল কেন? পদ্মরে খুব ব্যথা?'

পদ্মজা অসহায় চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। আকস্মিক ঘটনায় সে ভেঙে পড়েছে। ডান হাত অনবরত কাঁপছে। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে দু'মেয়েকে দেখেন। কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কি লুকোচ্ছিস দুজন? কেউ এসেছিল?'

মায়ের প্রশ্নে পদ্মজার চেয়ে পূর্ণা বেশি ভয় পেল। হাতের চিঠিটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল। কি লিখা আছে না পড়ে, এই চিঠি হাতছাড়া করবে না সে।

পর্ব ১০

হেমলতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীরের ফলার মতো পদ্মজার গায়ে বিঁধছে। সে কাঁপা স্বরে জানিয়ে দিল, 'শুটিং দলের একজন এসেছিল।'

হেমলতার ঠোঁট দুটো ক্ষেপে উঠল প্রচন্ড আক্রোশে। পদ্মজা সবাইকে চেনে না। তাই তিনি পূর্ণাকে প্রশ্ন করেন, 'পূর্ণা, কে এসেছিল?'

পূর্ণা দুই সেকেন্ড ভাবল। এরপর নতমুখে বলল, 'কালো দেখতে যে... মিলন।'

পদ্মজা আড়চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার ভয় হচ্ছে, মা যদি এখন বলে মিলন তো তার সামনেই ছিল। তখন কী হবে? পূর্ণা মিথ্যে বলল কেন! সত্য বললেই পারতো।

হেমলতা বিশ্বাস করেছেন নাকি করেননি দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল না। পূর্ণা মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। হেমলতা বারান্দা অবধি এসে আবার ঘুরে তাকালেন। মনটা খচখচ করছে। মনে হচ্ছে,ঘাপলা আছে। নাকি তার সন্দেহ মনের ভুল ভাবনা? কে জানে!

রাতে পদ্মজা খেতে চাইল না। বিকেলের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাকে ঘোরে রেখেছে। চিঠিটা পড়তে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হচ্ছে না। তবুও কেমন, কেমন যেন অনুভূতি হচ্ছে। অচেনা,অজানা অনুভূতি। পদ্মজার হাব-ভাব হেমলতার বিচক্ষণ দৃষ্টির অগোচরে পড়ল না। তিনি ঠিকই খেয়াল করেছেন। কিন্তু মেয়েরা স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার থেকে কথা লুকোনোর ক্ষমতা নিয়ে যে জন্মায় তা তো অস্বীকার করা যায় না। যেমন তিনি এই ক্ষমতা ভাল করেই রপ্ত করতে পেরেছেন। পদ্মজাকে জোর করে খাইয়ে দিলেন। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না।

রাতের মধ্যভাগে মোর্শেদ হেমলতাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে হেমলতা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন। চাপা স্বরে ক্রোধ নিয়ে বললেন, 'তোমার বাসন্তীর কী হয়েছে? সে কী তোমাকে ত্যাগ করেছে? সেদিন ফিরে এলে কেন?'

মোর্শেদ চমকালেন, অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন। হেমলতা বাসন্তীকে চিনল কী করে? এই নাম তার গোপন অধ্যায়। অবশ্য হেমলতার মতো মহিলা না জানলেই বোধহয় বেমানান লাগতো। মোর্শেদ বিব্রত কণ্ঠে বললেন,

'হে আমারে কী ত্যাগ করব। আমি হেরে ছাইড়া দিছি।'

হেমলতা বাঁকা হাসলেন। অন্ধকারে তা নজরে এলো না মোর্শেদের।

'বিশ বছরের সংসার এমন আচমকা ভেঙ্গে গেল যে!'

হেমলতার কণ্ঠে ঠাট্টা স্পষ্ট। চাপা দীর্ঘশ্বাসটা গোপনে রয়ে গেল। মোর্শেদের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল। এ খবরও হেমলতা জানে? এতকিছু কী করে? হেমলতার চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল। তিনি চাদর গায়ে দিয়ে চলে যান বারান্দায়। রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। মোর্শেদের কোনো কৈফিয়ত তিনি শুনতে চান না। তাই বারান্দার রুমে এসে বসেন। কতদিন পর রাতের আঁধারে বারান্দার রুমে তিনি। বিয়ের এক বছর পরই জানতে পারেন, মোর্শেদ তাকে বিয়ে করার ছয় মাস আগে বাসন্তী নামে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। স্বামীর ঘর ছাড়া আর পথ ছিল না বলে, এতো বড় সত্য হজম করে নিতে হয়।

বাসন্তীর মা বারনারী। আর একজন বারনারীর মেয়েকে সমাজ কিছুতেই মানবে না। মোর্শেদের বাবা মিয়াফর মোড়ল টাকার বিনিময়ে দেহ বিলিয়ে দেওয়া একজন বারনারীর মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে মানতে আপত্তি করেন। ততদিনে মোর্শেদ বিয়ে করে নিয়েছে। সে খবর মিয়াফর মোড়ল পেলেন না। তিনি মোর্শেদের মন ফেরাতে শিক্ষিত এবং ঠান্ডা স্বভাবের হেমলতাকে বেছে নিলেন। কুরবান হলো হেমলতার! তখন কলেজে উঠার সাত মাস চলছিল! এরপর পড়াটাও আর এগুলো না। জীবনের মোড় করুণরূপে পাল্টে গেল।

পরদিন সকাল সকাল স্কুলে রওনা হলো তারা। পূর্ণা পথে চিঠিটা পড়ার পরিকল্পনা করেছিল। পদ্মজা হতে দিল না। সেয়ানা দুইটা মেয়ের হাতে কেউ চিঠি দেখে ফেললে? ইজ্জত যাবে। পূর্ণা পদ্মজার প্রতি বিরক্তবোধ করল। চিঠিটা তার কাছে। পথে নতুন করে পরিকল্পনা করল সে ক্লাসে বইয়ের চিপায় রেখে চিঠি পড়বে। তাও হলো না। পর পর দুই দিন কেটে গেল। সুযোগ পেলেও পদ্মজা পড়তে দিতে চাইতো না। সারাক্ষণ হাতে জান নিয়ে যেন থাকে। এই বুঝি মা এলো! দুই দিন পর মোক্ষম সুযোগ পেল। হেমলতা বাপের বাড়ি গিয়েছেন। প্রান্ত এবং প্রেমাকে নিয়ে। যদিও কয়েক মিনিটের পথ। দ্রুতই ফিরবেন। পদ্মজার চেয়ে পূর্ণার আগ্রহ বেশি। সে চিঠি খোলার অপেক্ষায় ছিল। আজ খুলতে গিয়ে মনে হলো, যার চিঠি তার খোলা উচিত এবং আগে তার পড়া উচিত। তাই পদ্মজার দিকে চিঠি বাড়িয়ে দিল। পদ্মজা চিঠি খুলতে দেরি করছিল বলে পূর্ণা তাড়া দিল, 'এই আপা, খোল না। লজ্জা পাচ্ছো কেন? চিঠি এটা। কারো গায়ের কাপড় খুলতে বলছি না।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। যেন পূর্ণা কাউকে খুন করার কথা বলেছে। পদ্মজা বলল, 'কিসব কথা পূর্ণা।'

'আচ্ছা, মাফ চাই। আর বলব না।'

পদ্মজা ভাঁজ করা সাদা কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে। প্রথমেই বড় করে লেখা'প্রিয় পদ্ম ফুল'।

পূর্ণা পাশে এসে বসল। দুজনের মনোযোগ চিঠিতে।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

আমি ভেবে উঠতে পারছি না কীভাবে কী বলব। আজ চলে যাব ভাবতেই বুকে তোলপাড় চলছে। তার কারণ তুমি। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, থমকে গিয়েছিল নিঃশ্বাস, কণ্ঠনালী। এতটুকুও মিথ্যে বলিনি। সেদিন শুটিংয়ে সংলাপ বলতে গিয়ে ভুল করেছি বার বার। না চাইতেও বার বার চোখ ছুটে যাচ্ছিল লাহাড়ি ঘরের দিকে। বুকে থাকা হৃদপিণ্ডটায় শিরশিরে অনুভূতি শুরু হয় সেই প্রথম দেখা থেকেই। প্রতিটা ক্ষণ গুণেছি তোমাকে দ্বিতীয় বার দেখার আশায়। দ্বিতীয় বার দেখা পাই যখন বেগুন নিতে আসো। সেদিন কথা বলার লোভ সামলাতে পারিনি। টমেটোর অজুহাতে শ্রবণ করি পদ্ম ফুলের কণ্ঠ। মনে হচ্ছিল, এমন রিনরিনে গলার স্বর আর শুনিনি। রাতের ঘুম আড়ি করে বসে। তোমায় প্রতিনিয়ত দেখার একমাত্র পন্থা তোমার স্কুল। সবার অগোচরে কতবার তোমার পিছু নিয়েছি। তুমি বোকা, ধরতে পারোনি একবারও। সুন্দরীরা বোকা হয় আবার প্রমাণ হলো। এই রাগ করবে না, বোকা বলেছি বলে।

জানতে পারি, তোমার মায়ের ইচ্ছে তুমি অনেক পড়বে। অনেক উঁচু বংশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে আমি অতি সামান্য। তবুও সাহস করে তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেই। পদ্ম ফুলটাকে যে আমার চাই। তিনি রাজি হননি। নায়কের সাথে আত্মীয়তা করবেন না। আর বললেন, তোমার অনেক পড়া বাকি। তোমার মা কিছুতেই রাজি হবেন না। আহত মনে দু পা পিছিয়ে আসি। ভেবেছি, তোমার কলেজ পড়া শেষ হলে পরিবার নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসব। তোমার মা সম্পর্কে যা জেনেছি, বুঝেছি তাতে এতটুকু বিশ্বাস আছে, তিনি নায়ক বলে আমাকে এড়াবেন না। তিনি বিচক্ষণ মস্তিষ্কের মানুষ।

আমি তোমায় ভালবাসি পদ্ম ফুল।

ইতি

লিখন শাহ্

পদ্মজার মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। পূর্ণা হাসছে। ভ্রু উঁচিয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপারে, লিখন ভাইয়ার সাথে তোমাকে যা মানাবে! কী সুন্দর করে লিখেছে।'

পদ্মজা লজ্জায় চোখ তুলতে পারছে না। পূর্ণা বলল, 'একদম বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ! আপা তুমি কিন্তু বিয়ে করলে লিখন ভাইয়াকেই করবে।'

'আর কিছু বলিস না।'

পদ্মজা মিনমিনে গলায় বলল। পূর্ণা শুনল না। সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে, 'আমার ভাবতেই কী যে খুশি লাগছে আপা। নায়ক লিখন শাহ আমার বোনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদিন বিয়ে হবে।'

'চুপ কর না।'

'এই আপা, লিখন ভাইয়াকে ফেরত চিঠি দিবে না?'

পদ্মজা চোখ বড় করে তাকাল। অবাকস্বরে বলল, 'কীভাবে? ঠিকানা কই পাব? আর আম্মা জানলে? না, না।'

পূর্ণা আর কিছু বলতে পারল না। হেমলতার উপস্থিতি টের পেয়ে চুপ হয়ে গেল। পদ্মজা দ্রুত চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রাখল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে।

পর্ব ১১

মাঘ মাস চলছে। কেটে গেছে চার মাস। শুষ্ক চেহারা আর হিমশীতল অনুভব নিয়ে পদ্মজা বসে আছে নদীর ঘাটে। গুনে গুনে তিন নম্বর সিঁড়িতে। নাকের ডগায় মেট্রিক পরীক্ষা। দিনরাত পড়তে হচ্ছে। নিয়ম করে প্রতিদিন ভোরে পড়া শেষ করে পদ্মজা। এরপর ঘাটে এসে বসে নিজের অনুভূতিদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কখনো উদাস হয়ে আবার কখনো লাজুক মুখশ্রী নিয়ে ভাবে কারো কথা। সেই যে চিঠি দিয়ে হারালো আর সাক্ষাৎ মিললো না তার। কখনো কী মিলবে? তিনি কী আসবেন? এক চিঠি প্রতিদিন নিয়ম করে পড়ে পদ্মজা। ধীরে ধীরে অনুভব করে তার মধ্যে আছে অন্য আরেক সত্ত্বা। যে সত্ত্বা প্রতিটি মেয়ের অন্তঃস্থলের গভীড়ে জেঁকে বসে থাকে ভালবাসার অনুভূতি নিয়ে। পূর্ণা আসল শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে। দুই দিন আগে তার অষ্টম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপানো শীতে পূর্ণা থেমে থেমে কাঁপছে।

'আপা?'

পদ্মজা তাকাল। মৃদু হেসে বলল, 'কী?'পরপরই আবার উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'আম্মা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে?'

পূর্ণা পদ্মজার পাশ ঘেঁষে বলল, 'না, আম্মার কিছু হয় নাই।'

পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বলল, 'আম্মা সারাদিন সেলাইর কাজ করে। একদিকে তাকিয়ে থাকে, এক জায়গায় বসে থাকে। এজন্যই শরীরে এতো অশান্তি। দূর্বল হয়ে পড়ছে। আব্বারে বলিস, আম্মারে নিয়ে সদরে যেতে। আমার কথা তো আব্বা শুনবে না।'

'আচ্ছা।'

দুজন নদীর ওপারে চোখ রাখল। অতিথি পাখির মেলা সেখানে। রোমাঞ্চকর আকর্ষণ। এত পাখি দেখে মন ভরে গেল। পাখিদের কলকাকলিতে এলাকা মুখরিত। এপার থেকে শোনা যাচ্ছে। কোত্থেকে দৌড়ে আসে প্রান্ত। সে চার মাসে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে ভালভাবে। এসেই বলল, 'আপারা কী করো?'

পূর্ণা বলল, 'পাখি দেখি। আয়, দেখে যা।'

প্রান্ত দূরে চোখ রাখল। সকালের ঘন কুয়াশার ধবল চাদরে ঢাকা নদীর ওপার। পাখিদের ভাল করে চোখে ভাসছে না। শীতের দাপটে প্রকৃতি নীরব। তাই পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে দারুণভাবে। প্রান্ত বলল, 'বড় আপা,একটা পাখি ধরে আনি?'

'একদম না। পাখি ধরা ভাল না। অতিথি পাখিদের তো ভুলেও ধরা উচিত না। ওরা আমাদের দেশে অতিথি হয়ে এসেছে।'

প্রান্ত চুপসে গেল৷ এরপর মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'আচ্ছা,ঠিকাছে।'

'তোরা এইহানে কী করস?'

মোর্শেদের কণ্ঠস্বর শুনে তিনজন ফিরে তাকাল। প্রান্ত হাসিমুখে ছুটে এসে বলল, 'আব্বা,আমি আজ তোমার সাথে মাছ ধরতে যাব।'

মোর্শেদ প্রান্তকে কোলে তুলে নেন। এরপর বললেন, 'তোর মায় আমার লগে কাইজ্জা করব।'

'আম্মারে, আমি বলব।'

'আইচ্ছা যা, তুই রাজি করাইতে পারলে লইয়া যামু।'

পদ্মজা চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। মোর্শেদ গত দু'মাস ধরে প্রান্তকে চোখে হারাচ্ছেন। ছেলে নাই বলেই হয়তো! প্রতিটা বাবা-মায়ের একটা ছেলের আশা থাকে।

হেমলতা পর পর তিনটা মেয়ে জন্ম দিলেন। এ নিয়ে মোর্শেদ অভিযোগ করেননি। তবে, মনে মনে খুব করে একটা ছেলে চাইতেন। প্রান্তকে যখন প্রথম আনা হলো, মোর্শেদের খুব রাগ হয় ভিক্ষুকের ছেলে বলে। সময়ের সাথে সাথে প্রান্তকে চোখের সামনে ঝাঁপাতে, লাফাতে দেখে ছেলের জন্য রাখা মনের শূন্যস্থানটা নাড়া দিয়ে উঠল। মোর্শেদ দু'হাত

বাড়িয়ে দেন অনাথ ছেলেটির দিকে। এখন দেখে আর বোঝার উপায় নেই, মোর্শেদ আর প্রান্তের মধ্যে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। মোর্শেদ কাঠখোট্টা গলায় দুই মেয়েকে বললেন, 'সদরে যাইয়াম। দুইডার লাইগা চাদর আনতাম না সুইডার?'

পদ্মজা কথাটা শুনে চমকাল। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পেলে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। পদ্মজার অবস্থাও তাই হলো। খুশিটা প্রকাশ করার মতো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। স্নায়ু কোষ থমকে গেছে। শীতের তান্ডবে প্রকৃতি বিবর্ণ অথচ তার মনে হচ্ছে, বসন্তকাল চলছে। ঢোক গিলে ঝটপট উত্তর দিল, 'আব্বা,তোমার যা পছন্দ তাই এনো আমার জন্য।'

খুশিতে পদ্মজার গলা কাঁপছে। মোর্শেদ অনুভব করলেন সেই কাঁপা গলা। গত সপ্তাহ রমিজের মেয়ে এক ছেলের সাথে রাত কাটাতে গিয়ে ধরা পড়ে। অলন্দপুরে সে কী তুলকালাম তাণ্ডব! ছেলেটাকে ন্যাড়া করে জুতার মালা পরিয়ে চক্কর দেওয়ানো হয়েছে পুরো অলন্দপুর। আর মেয়ের পরিবারকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। পদ্মজা এতো সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও আজও কোনো চারিত্রিক দোষ কেউ দিতে পারেনি। মেয়েটার দ্বারা কোনো অনৈতিক কাজ হয়নি। তার ঘরে যেন সত্যি একটা পদ্মফুলের বাস। মোর্শেদ পদ্মজাকে নিয়ে দোটানায় ভোগেন। খারাপ ব্যবহারটা আগের মতো আসে না। তিনি দ্রুত জায়গা ত্যাগ করেন।

পরদিন সকাল সকাল কলস ভরে খেজুরের মিষ্টি রস নিয়ে আসেন মোর্শেদ। প্রেমা খেজুরের রস দেখেই মাকে বলল, 'আম্মা,পায়েস খাবো।

'আচ্ছা, খাবি।'

সূর্য অনেক দেরিতে উঠল। প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের আলোতে কোনো তেজ নেই। চার ভাই-বোন কাঁচা খেজুরের রস নিয়ে উঠানে বসল পাটি বিছিয়ে। খেজুরের কাঁচা রস রোদে বসে খাওয়াটাই যেন একটা আলাদা স্বাদ,আলাদা আনন্দ। মোর্শেদ নারিকেল গাছে উঠেছেন। পায়েসের জন্য নারিকেল অপরিহার্য উপকরণ। আচমকা পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'আজ কী সোমবার?'

পূর্ণা কথা বলার পূর্বে হেমলতা বারান্দা থেকে বললেন, 'আজ তো সোমবারই। কেন?'

পদ্মজা খেজুরের বাটি রেখে ছুটে আসল বারান্দায়।

'আজ স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল আম্মা। ঝুমা ম্যাডাম বলেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সবাইকে যেতে বলেছেন।'

'আমায় বলে রাখতি। সামনে পরীক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ দেখে পড়া দিবেন এজন্যই ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি যা। এই পূর্ণা, তুইও যা।'

দুই বোন বাড়ি থেকে দ্রুত বের হলো। সূর্য উঠলেও কনকনে শীতটা রয়ে গেছে। দুজনের গায়ে মোর্শেদের আনা নতুন সোয়েটার। পদ্মজা যখন মোর্শেদের হাত থেকে সোয়েটার পেল আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারেনি। মোর্শেদের সামনে হাউমাউ করে কান্না করে উঠে। মোর্শেদ অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ফিরেন অনেক রাত্রিরে। পূর্ণা বলল, 'আব্বার পছন্দ ভালো তাই না আপা?'

'কীসের পছন্দ?'

'সোয়েটার গুলো কী সুন্দর।'

পদ্মজা হাসল। সামনের ক'টি দাঁত ঝিলিক দিল। হাতের ডান পাশে ধানক্ষেত। ধান গাছের ডগায় থাকা বিন্দু বিন্দু জমে থাকা শিশির রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে। অনেকে হাতে কাঁচি নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে ধান কাটার। বাতাসে নতুন ধানের গন্ধ। হঠাৎ পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপারে, লিখন ভাই।'

পদ্মজার নিঃশ্বাস গেল থমকে। মুহূর্তে বুকের মাঝে শুরু হয় তাণ্ডব। পূর্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকাল পদ্মজা। লিখন ব্যস্ত পায়ে এদিকে আসছে। পাশে মগা।

পদ্মজা অজানা আশঙ্কায় চোখ ফিরিয়ে নিল। পূর্ণাকে বলল, 'এখানে আর এক মুহূর্তও না।'কথা শেষ করে পদ্মজা স্কুলের দিকে হাঁটা শুরু করল। পূর্ণা অবাক হয়। কিন্তু, এ নিয়ে রা করল না। লিখন পিছন পিছন আসছে। পদ্মজার বুক কাঁপছে বিরতিহীন ভাবে। চাহনি অশান্ত।

পর্ব ১২

বট গাছের সামনে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লিখন।

শীতের শুষ্কতায় বটগাছের অধিকাংশ পাতা ঝরে পড়েছে। লিখনের কাছে শীতকাল খুবই অপছন্দের ঋতু। শীত চরম শুষ্কতার রূপ নিয়ে প্রকৃতির ওপর জেঁকে বসে থাকে যা সহ্য হয় না লিখনের। ঠান্ডা লেগেই থাকে। ছোট থেকে কয়েকবার নিউমোনিয়ায় ভুগেছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে রুক্ষতা, তিক্ততা ও বিষাদের প্রতিমূর্তি শীতকাল। তখন পদ্মজা এতো দ্রুত হাঁটছিল যে মনে হচ্ছিল, সে পালাতে চাইছে। লিখন আর এগোয়নি। পালাতে দিল পদ্মজাকে। মগা বলেছে, পদ্মজার লোকসমাজের ভয় খুব। তাই লিখন এই নির্জন মাঠের পাশে বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা এ পথ দিয়েই বাড়ি ফিরবে। তখন যদি একটু কথা বলা যায়।

পদ্মজা জড়সড় হয়ে হাঁটছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। বার বার জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।

পদ্মজা মিনমিনে গলায় পূর্ণাকে ডাকল, 'পূর্ণা রে…"

পূর্ণা তাকাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে। উনি মাঝপথে দাঁড়িয়ে নেই তো?'

পূর্ণা চরম বিরক্তি নিয়ে বলল, 'থাকলে কী হয়েছে? খেয়ে ফেলবে?'

পদ্মজা আর কথা বলল না। পূর্ণার সাথে কথা বলে লাভ নেই। তখন লিখন শাহকে পাত্তা না দেয়ার জন্য পূর্ণার খুব রাগ হয়েছে। পদ্মজা বরাবরই মাথা নিচু করে হাঁটে। তাই লিখন শাহকে দেখতে পেল না। পূর্ণা দূর থেকে দেখতে পেল। কিন্তু এইবার আর আগে থেকে বলল না পদ্মজাকে। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ভাবে, লিখন শাহ্ যখন আপার সামনে এসে দাঁড়াবে কী যে হবে!

লিখন-পদ্মজার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। তখন পদ্মজা আবিষ্কার করল লিখনের উপস্থিতি। ওড়নার ঘোমটা চোখ অবধি টেনে নেয় দ্রুত। ভয়ে-লজ্জায় সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরে। লিখনের পাশ কাটার সময় পুরুষালি একটি কণ্ঠ ডেকে উঠল, 'পদ্ম।'

পদ্মজা দাঁড়াতে চায়নি। তবুও কেন জানি দাঁড়িয়ে গেল। লিখন দুয়েক পা এগিয়ে আসল। পূর্ণা ঠোঁট টিপে সেই দৃশ্য গিলছে। লিখন উসখুস করছে। কথা গুলিয়ে ফেলেছে। পদ্মজা লিখনকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। লিখন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখল। পূর্ণা বলল, 'আমাকে বলুন, আমি বলে দেব।'

লিখন পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। এরপর অনুরোধ স্বরে বলল, 'দয়া করে, তোমার বোনকে দিও। আমি কাল বিকেলে ঢাকা চলে যাব।'

পূর্ণা হাসিমুখে চিঠি নিল। এরপর বলল, 'আপা আপনার আগের চিঠিটা প্রতিদিন পড়ে।'

লিখনের ঠোঁট দু'টি হেসে উঠল। পূর্ণা দৌড়ে ছুটে গেল পদ্মজার দিকে। লিখন আর পিছু নিল না। পূর্ণা আসতেই পদ্মজা ধমকে উঠল, 'কী কথা বলছিলি এতো? কেউ দেখলে কী হতো? তুই আম্মার কথা কেন ভাবছিস না।'

পদ্মজার কাঁদোকাঁদো স্বরে পূর্ণা চুপসে গেল। সত্যি কী সে বেশি করে ফেলল? পূর্ণা চোখ নামিয়ে চুপচাপ হেঁটে বাড়ি চলে আসে। চিঠির কথা পদ্মজাকে বলা হয়নি।

গোধূলি বিকেল। হেমলতা পদ্মজাকে ফরমায়েশ দেন, 'পদ্ম, কয়টা টমেটো নিয়ে আয়।'

'আচ্ছা আম্মা।'

পদ্মজা লাহাড়ি ঘরের ডান দিকে হেঁটে আসে। দু'মাস আগে মোর্শেদ এ'দিকের সব ঝোপজঙ্গল সাফ করে টমেটোর ছোটখাটো ক্ষেত করেছেন। লাল টকটকে টমেটো।

হেমলতা রান্নার ফাঁকে বারান্দার দিকে উঁকি দিলেন। মোর্শেদ আর প্রান্ত কিছু নিয়ে বৈঠক করছে।

হেমলতা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। বাসন্তী নামক মানুষটা কী জন্যে ত্যাগের স্বীকার হলো? জানতে ইচ্ছে করলেও হেমলতা প্রশ্ন করেন না। তবু এতটুকু বুঝেছেন মোর্শেদের বাইরের ঘোর কেটে গেছে। যার ফলস্বরূপ সংসারে তার মন পড়েছে। হেমলতাকে খুব সমীহ করে চলেন। তবে হেমলতা জানেন, মোর্শেদ পদ্মজাকে নিজের মেয়ে হিসেবে এখনো বিশ্বাস করেননি। তা নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতেও ভুলেন না।

পদ্মজা সাবধানে ক্ষেতের মধ্যিখানে আসল। টমেটো ছিঁড়তে গিয়ে তার লিখনের কথা মনে হলো। মনে মনে ভাবে, কেন এসেছেন তিনি? কি বলতে চেয়েছিলেন?

জানার জন্য পদ্মজার মনটা ব্যকুল হয়ে হয়ে উঠল।

‘আপা, একটা কথা বলি?’

পদ্মজা চমকে তাকাল। হঠাৎ পূর্ণার আগমনে ভয় পেয়েছে। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল, ’বল।’

‘রাগ করবে না তো?’

পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। বলল, ’করব না।’

পূর্ণা লিখনের দেয়া চিঠি দেখিয়ে বলল, ’লিখন ভাইয়ার চিঠি।’

পদ্মজা ছোঁ মেরে চিঠি নিল। পূর্ণা অবাক হলো। মনে মনে খুশি হলো পদ্মজার আকুলতা দেখে। পদ্মজা দ্রুত চিঠির ভাঁজ খুলল। পূর্ণা বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে, কেউ আসছে নাকি! পদ্মজা পড়া শুরু করল।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

চার মাস কেটে গেল। চার মাসে একটুর জন্যও অবসর মেলেনি। কিন্তু মনে ছিল এক আকাশ ছটফটানি। তোমার মনের কথা তো জানাই হলো না। তোমাদের অলন্দপুরের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছেলের স্বপ্ন তোমাকে ঘরে তোলার। তাই সারাক্ষণ ভয়ে ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ তুলে নেয়নি তো! তিন দিনের সময় নিয়ে চলে এসেছি। শুধু একবার দেখতে আর জানতে, তুমি কী আমার জন্য অপেক্ষা করবে? মেট্রিক পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করলেই হবে। এরপর আমি আমার মা আর বাবাকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে আসব। উনার কাছে অনুরোধ করব, তোমার পড়া শেষ হলে যেন আমার সাথেই বিয়ে দেন। তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব। এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছি। আমি গুছিয়ে লিখতে পারছি না আজ। কয়েকটা চিঠি লিখেছি। একটাও মনমতো হয়নি। অনুগ্রহ করে তুমি মানিয়ে নিও।

ইতি

লিখন শাহ্

বাড়ির সবাই ঘুমে। পদ্মজা চুপিচুপি উঠে বসল পড়ার টেবিলে। রাত অনেক। গাছের পাতায় নিশ্চয় শিশির বিন্দু জমছে। এরপর ভোররাতে টিনের চালে শিশিরকণা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির মতো ঝরবে। গাঁ হিম করা ঠান্ডা। তা উপেক্ষা করে পদ্মজা হাতে কলম তুলে নিল। সাদা কাগজে লিখল, অপেক্ষা করব আমি। এরপর কাগজটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল।

ফজরের নামায পড়ে চার ভাইবোন পড়তে বসল। পড়ায় মন টিকছে না পদ্মজার। বই আনার ছুতোয় পদ্মজা রুমে গেল। রাতের লেখা কাগজটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালার বাইরে ফেলে দিল। এরপর আবার নতুন করে লিখল, আমার আম্মা যা চান তাই হবে।

পড়াশেষে নিয়মমাফিক ঘাটে আসল পদ্মজা। হাতের মুঠোয় তিনটা চিঠি। দু’টো লিখনের। একটা তার লেখা। পূর্ণাও পাশে। প্রেমা, প্রান্ত বাড়িজুড়ে ছুটাছুটি করছে। সামনের কোনোকিছু ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সবকিছুই অস্পষ্ট। কুয়াশার স্তর এত ঘন যে, দেখে

মনে হচ্ছে সামনে কুয়াশার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড় ভেদ করে একটা নৌকা এসে ঘাটে ভীড়ে। নৌকায় লিখন আর মগা। আকস্মিক ঘটনায় পদ্মজার পিল উঠল চমকে। পালানোর মতো শক্তিটুকু পায়ে নেই।

লিখন মায়াভরা কণ্ঠে পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি বাধ্য হয়ে এসেছি। আজ বিকেলে চলে যাব। মগা বলল, প্রতিদিন সকালে ঘাটে নাকি বসো তুমি। তাই এসেছি।'

পদ্মজা মনে মনে সূরা ইউনুস পড়ছে। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। মা দেখে ফেললে কী হবে? বা অন্য কেউ? একটু সাহস যোগাতেই নিজের লেখা চিঠি সিঁড়িতে রেখে, পদ্মজা ছুটে গেল বাড়িতে। পূর্ণা বড় বড় চোখে শুধু দেখল। লিখন নৌকা থেকে নেমে চিঠিটা হাতে তুলে নিল। ভাঁজ খুলে একটা লাইন পেল শুধু। লিখনের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। পূর্ণার কৌতূহল হলো চিঠিতে কী আছে জানার জন্য। তবে তা প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'আপা আপনার কথা প্রতিদিন ভাবে।'

১৯৯৬ সাল। পদ্মজা থেমে থেমে কাঁপছে। হাঁটুর উপর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। তুষার কালো চাদর তার গায়ে টেনে দিল। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। বিষাদভরা কণ্ঠে বলল, 'সেদিন আমার লেখা প্রথম চিঠিটা কুটিকুটি কেন করেছি, জানি না। ইচ্ছে হয়েছিল তাই করেছি। তবে জানেন, আমি একদম ঠিক করেছিলাম। সেদিন যদি আমি কথা দিয়ে দিতাম। আমার কথা ভঙ্গ হতো।'

পদ্মজা হাসল। তুষার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। এরপর বলল, 'লিখনের সাথে আর দেখা হয়নি?'

পদ্মজা হাতের কাঁটা অংশে ফুঁ দিয়ে বলল, 'হয়েছিল।'

'তাহলে, কথা ভঙ্গ হতো কেন বললেন?'

পদ্মজা তুষারের দিকে তাকাল। এরপর আবার হাঁটুতে মুখ লুকালো। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট করে করে দশ মিনিট কেটে গেল। পদ্মজার সাড়া নেই। তুষার ডাকল, 'পদ্মজা? শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

'আপনার কী কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'মুখ তুলে তাকান।'

পদ্মজা ছলছল চোখে তাকাল। তুষার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী সমস্যা হচ্ছে?'

তুষারের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল, 'আমার আম্মা আমার সাথে কেন বিশ্বাসঘাতকতা করল?'

তুষার চমকাল। হেমলতা নামে মানুষটার সম্পর্কে যা জানল, তাতে তার নামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটা যায় না। পরপরই নিজেকে সামলে নিল। এমন কেইস শত শত আছে। ভাল মানুষের খারাপ রূপ। তুষার সাবধানে প্রশ্ন করল, 'কী করেছেন তিনি?'

পদ্মজা উত্তর দিল না। ফ্লোরে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। তুষার গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজা এখন আর কিছু বলবে না। সে ক্লান্ত। অতীত হাতড়াতে গিয়ে মনের অসুস্থতা বেড়ে গেছে তার। তুষার পদ্মজার মুখের দিকে তাকাল। আঁচল সরে গেছে বুক থেকে। চাদরের অংশ ফ্লোরে পড়ে আছে। তুষার চাদরটা টেনে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, পদ্মজার গলায় কালো-খয়েরি মিশ্রণে কয়টা দাগ। গলা টিপে ধরার দাগ! তুষার হুংকার ছাড়ল, 'ফাহিমা?'

ফাহিমা কাছেই ছিল। ছুটে আসল। তুষার বলল, 'আপনি আসামীর গলা টিপে ধরেছেন?'

ফাহিমা চট করে বলল, 'না, স্যার। প্রথম থেকেই গলায় দাগ গুলো দেখছি। প্রশ্নও

করেছি। মেয়েটা উত্তর দিল না।’

তুষার কপাল ভাঁজ করে ফেলল। হাজারটা প্রশ্নে মাথা ভনভন করছে। মস্তিষ্ক শূন্য প্রায়। পদ্মজা যতটুকু বলেছে তার পরবর্তী সাত বছরে কী কী হয়েছিল, না জানা অবধি শান্তি মিলবে না। মাথা কাজ না করলে তুষার সিগারেট টানে। তাই বেরিয়ে গেল।

পর্ব ১৩

বাড়ির গিন্নির মতো কোমরে ওড়নার আঁচল গুঁজে রান্নাবান্না করছে পদ্মজা। হেমলতার কোমরে ব্যাথা। তিনি রান্না করতে চাইলেও পদ্মজা রাঁধতে দিল না। মোর্শেদও বললেন, 'বেদনা লইয়া রান্ধা লাগব না। তোমার মাইয়া যহন রানতে পারে তে হেই রান্ধুক।'

শেষ অবধি হেমলতা হার মানলেন। পদ্মজা মাটির চুলায় মুরগি মাংস রান্না করছে। খড়ি বা লাকড়ি হিসেবে আছে বাঁশের মুড়ো। আগুনের শিখার রং নীলচে। শীতের মাঝে রান্নার করার শান্তি আলাদা। মুরগি মাংস রান্না হচ্ছে। আজ এতিম-মিসকিন খাওয়ানো হবে। হেমলতা বলেন, সামর্থ্য থাকলে মাসে একবার হলেও এতিম-মিসকিনদের খাওয়ানো উচিৎ। নয়তো ঘরে রহমত থাকে না। রান্না শেষ করে পদ্মজা হেমলতার কাছে এলো। বলল, 'আম্মা, রান্না শেষ।'

শুকনো মুখখানা তুলে তাকালেন হেমলতা। বললেন, 'তোর আব্বারে গিয়ে বল, আলী,মুমিন,ময়না তিনজনরে নিয়ে আসতে।'

পদ্মজা কিছু না বলে মাথা নিচু করে ফেলল। মোর্শেদের সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে তার ভয় হয়। অনেকদিন বাজে ব্যবহার করেন না। হুট করে যদি করে ফেলেন। কষ্ট হবে। হেমলতা মৃদু হাসলেন। বললেন, 'কিছু বলবে না। যা তুই।'

পদ্মজা দূর্বল গলায় বলল, 'সত্যি যাব?'

হেমলতা মাথা সামনে ঝুঁকে ইঙ্গিত করেন, যাওয়ার জন্য। পদ্মজা মোর্শেদকে উঠানেই পেল। মোর্শেদ চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছেন। পদ্মজা গুটিগুটি পায়ে হেঁটে আসল। আব্বা ডাকতে গিয়ে গলা ধরে আসছে তার। ঢোক গিলে ডাকল, 'আব্বা?'

মোর্শেদ তাকান। পদ্মজার মনে হলো বুকে কিছু ধপাস করে পড়ল। পদ্মজা দৃষ্টি অস্থির রেখে মিনমিনে গলায় বলল, 'আম্মা বলছে, আলীদের নিয়ে আসতে।'

'রান্ধন শেষ?'

'জি, আব্বা।'

মোর্শেদ গলায় গামছা বেঁধে বেরিয়ে যান। পদ্মজা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অনুভূতিগুলো থমকে গেছে। পদ্মজার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসল। তাড়াতাড়ি ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। গাছ থেকে পাখির কিচিরমিচির শব্দ আসছে৷ সে সেদিকে তাকাল। তখনি হেমলতা ডাকলেন, 'পদ্ম।'

পদ্মজা ছুটে গেল। হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকে বলল, 'কিছু লাগবে আম্মা?'

'না। পূর্ণারা কোথায়?'

'ঘাটে।'

'কী করে?'

'মাছ ধরে।'

'বড়শি দিয়ে?'

'জালি দিয়ে।'

'এতো বড় মেয়ে নদীতে নেমে জাল দিয়ে মাছ ধরে! আচ্ছা, থাকুক। তুই আয়। বস আমার পাশে।'

পদ্মজা হেমলতার পায়ের কাছে বসল। পায়ে হাত দিল টিপে দেওয়ার জন্য। হেমলতা পা সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'লাগবে না।'

এরপর শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজার কপালের ঘাম মুছে দিলেন। বললেন, 'কোমরের ব্যাথাটা কমে আসছে। তোর আব্বা কিছু বলছে?'

'না, আম্মা। আচ্ছা আম্মা, আব্বা এতো পাল্টাল কী করে?'

হেমলতা মৃদু হাসেন। উদাস হয়ে টিনের দেয়ালে তাকান। এরপর বললেন, 'তোর বাপ ভালো মানুষ শুনছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর তার ভালমানুষি দেখিনি ভুলেও। কারণ, তার কানে, মগজে মন্ত্র দেয়ার মানুষ ছিল। অন্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে

না তাই পাল্টাচ্ছে। তোর বাপের ব্যক্তিত্ব নাই। নিজস্ব স্বকীয়তা নাই। অন্যের কথায় নাচে ভালো।'

শেষ কথাটা হেমলতা হেসে বললেন। পদ্মজা কিছু বলল না। হেমলতা শুয়ে পড়লেন। আজ সারাদিন বিশ্রাম নিবেন। আগামীকাল অনেক কাজ। অনেকগুলো কাপড় জমেছে।

'রূপ ক্ষণিকের, গুণ চিরস্থায়ী। শেষ বয়েসে এসে আব্বা বুঝছে।'

পদ্মজার শীতল কণ্ঠ এবং কথার তীরে হেমলতা ভীষণভাবে চমকালেন। তিনি সেকেন্ড কয়েক কথা বলতে পারলেন না। পদ্মজা চলে যাওয়ার জন্য উপক্রম হয়। হেমলতা অবিশ্বাস্য স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'এই খবর কোথায় শুনেছিস?'

পদ্মজা ঘাড় ঘুরে ফিরল। বলল, 'আমি তো তোমারই মেয়ে, আম্মা।'

পদ্মজা চলে গেল। রেখে গেল হেমলতার অবিশ্বাস্য চাহনি।

বিকেলবেলা হেমলতা ঘর থেকে বের হলেন। শরীরে শান্তি এসেছে। পূর্ণা বরই ভর্তা করছিল৷ পাশে প্রেমা। পদ্মজাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ঘাটে বসে আছে। প্রান্তও তো নেই। হেমলতা পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পূর্ণা, প্রান্ত কোথায়?'

পূর্ণা কয়েক সেকেন্ড ভাবল কী উত্তর দিবে। এরপর ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'জানি না আম্মা।'

'জানস না কী? প্রেমা, প্রান্ত কই?'

প্রেমা সহজ স্বরে বলল, 'আমরা ঘাটে ছিলাম। প্রান্ত উঠানে ছিল। এরপর এসে দেখি নাই।'

হেমলতা গলা উঁচিয়ে বলেন, 'কোন মুখে বলছিস জানি না? একসাথে নিয়ে থাকতে পারিস না৷ একা ছাড়িস কেন? কোথায় গেছে ছেলেটা।'

পদ্মজা বাড়ির পিছন থেকে ছুটে আসল। হেমলতার ধমক ঘাট অবধি শোনা গেছে।

'কী হয়েছে?'

'প্রান্ত বাড়ি নাই। দুইটা এই কথা বলেও নাই। বসে বরই ভর্তা করে খাচ্ছে। দিন দিন অবাধ্য হচ্ছে মেয়েগুলো।'

পূর্ণা ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। প্রেমা হেমলতার ধমকে ভয় পাচ্ছে কিন্তু অতোটা না। হেমলতার মন কু গাইছে। তিনি নিজ রুমে যেতে যেতে পদ্মজাকে বললেন, 'বের হচ্ছি আমি। সাবধানে থাকবি।'

দুজন লোক প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। প্রান্তর কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। পদ্মজা হেমলতাকে ডাকল, 'আম্মা।'এরপর দৌড়ে এলো উঠানে। প্রান্ত কাঁদছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে আসেন৷ প্রান্তকে আহত অবস্থায় দেখে ভড়কে যান। বুকটা হাহাকার করে উঠে। তিনি ছুটে আসেন। প্রান্তকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লোক দুটিকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে?'

একজন লোক বলল, 'পলাশ মিয়ার ছেড়ার লগে মাইর লাগছিল। হেই ছেড়ায় পাথথর দিয়া ইডা মারছে। আর ফাইট্টা গেছে।'

মোর্শেদ লাহাড়ি ঘরের সামনে গাছ কাটছিলেন। চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে আসেন। প্রান্তকে এমতাবস্থায় দেখে লোক দু'টিকে তেজ নিয়ে বললেন, 'কোন কুত্তার বাচ্চায় আমার ছেড়ারে মারছে? কোন বান্দির ছেড়ার এতো বড় সাহস?'

মোর্শেদ উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। প্রান্তকে নিয়ে ছুটে যান বাজারে। হেমলতা রয়ে গেলেন বাড়িতে। বাজারে আজ হাট বসেছে। মোর্শেদ হেমলতাকে নিষেধ করেছেন সাথে যেতে। বাড়িতে থেকে হেমলতা হাঁসফাঁস করতে থাকেন। প্রান্ত একা বড় হয়েছে। কতবার কতরকম আঘাত পেয়েছে। দেখার কেউ ছিল না। তাই মিনমিনিয়ে কেঁদেছে। এমন বাচ্চা ছেলের এতো বড় আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদার কথা। কষ্ট তো আর কম পায়নি! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। হেমলতার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পদ্মজা ঘরে লুকিয়ে কাঁদছে। পূর্ণা, প্রেমা বাড়ির বাইরে বার বার উঁকি দিয়ে দেখছে, মোর্শেদ প্রান্তকে নিয়ে ফিরল নাকি!

দেখতে দেখতে চলে এলো মেট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্র শহরে। যেতে লাগে ছয় ঘন্টা। বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেয়া অসম্ভব। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশেই মোর্শেদের মামা বাড়ি। মামা নেই। মামাতো ভাইয়েরা আছে। কথাবার্তা বলে, সেখানেই দেড় মাসের জন্য হেমলতা আর পদ্মজা উঠল। মোর্শেদ বাকি দুই মেয়ে আর প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে রয়ে গেছেন। হেমলতা পদ্মজাকে নিয়ে আসার পূর্বে এসে দেখে গেছেন, পরিবেশ কেমন। মোর্শেদের দুই মামাতো ভাইয়ের মধ্যে একজন রাজধানীতে থাকে। আরেকজনের বয়স হয়েছে অনেক। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে একাই থাকেন। ছেলেরা শহরে চাকরি করে। পদ্মজার জন্য উপযুক্ত স্থান। তাই আর অমত করেননি।

মোর্শেদের যে ভাইটি বাড়িতে আছেন, তার নাম আকবর হোসেন। ষাটোর্ধ বয়সের একজন মানুষ। তবে আকবর হোসেনের স্ত্রী জয়নবের বয়স খুব কম। হেমলতার বয়সী। হেমলতা আকবর হোসেনকে ভাইজান বলে সম্বোধন করেন। দালান বাড়ি। বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে। ফলে, পদ্মজা মন দিয়ে পড়তে পারছে। পরীক্ষাও ভাল করে দিচ্ছে। হেমলতা আকবর হোসেনের দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন। শীতল প্রকৃতির লোক। তিনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাসী লোক। রাতের খাবার আকবর হোসেনের সাথেই খেতে হয়। হেমলতা দেড় মাসের খাওয়ার খরচ নিয়ে এসেছেন। আকবর হোসেন কিছুতেই আলাদা রাঁধতে দিচ্ছেন না। এভাবে অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হেমলতার আত্মসম্মানে লাগে। তিনি কথায় কথায় জানতে পারেন, আকবর হোসেন এবং জয়নবের নকশিকাঁথা খুব পছন্দ। তাই তিনি নকশিকাঁথা সেলাই করছেন। যতক্ষণ পদ্মজা পরীক্ষা দেয় ততক্ষণ হেমলতা কেন্দ্রের বাইরে কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

অনেক রাত অবধি পদ্মজা পড়ে। আজ অনেকক্ষণ ধরে সে কী যেন ভাবছে৷ হেমলতা ব্যাপারটা খেয়াল করেন। পদ্মজার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করেন, 'পদ্ম, কী ভাবছিস?'

পদ্মজা এক নজর হেমলতাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। হেমলতা তাকিয়ে আছেন, জানার জন্য। পদ্মজা দ্বিধা নিয়ে বলল, 'রাগ করবে না তো?'

হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নিলেন। এরপর বললেন, 'কী জানতে চাস?'

পদ্মজা এদিক-ওদিক চোখ বুলায়। কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দুই মিনিট পর নিরবতা ভেঙে বলল, 'দুপুর থেকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, হানিফ মামাকে কে মারল। তোমার সাথে মামার কী কথা হয়েছিল? হানিফ মামাকে... মানে তুমিতো অন্য কারণে গিয়েছিলে। কিন্তু ফিরে এলে। খুনও হলো। আমি সবসময় এটা ভাবি। কখনো উত্তর পাই না। মনে মনে অনেক যুক্তি সাজাই। কিন্তু যুক্তিগুলো মিলে না। খাপছাড়া, এলোমেলো।'

'কাল পরীক্ষা। আর আজ এসব ভেবে সময় নষ্ট করছিস।'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। তবুও পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। তবে কিঞ্চিৎ আশা মনে উঁকি দিচ্ছে।

পর্ব ১৪

চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে হুইসেলের শব্দ। গভীর রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে। আরেকটা আওয়াজও আসছে। কাছে কোথাও নেড়ি কুকুরের দল ঘেউঘেউ করছে। পদ্মজা ইংরেজি বইয়ের দিকে চোখ রেখে মিনমিনে স্বরে বলল, 'পরীক্ষা তো কালদিন পর।'

হেমলতা খোলা চুল মুঠোয় নিয়ে হাত খোঁপা করেন। এরপর বললেন, 'কাল আর কালদিন পর একই হলো।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এমন ভান ধরল যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। হেমলতা চোখ ছোট করে পদ্মজাকে দেখছেন। মেয়েটা পড়ায় মনোযোগ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হতে পারছে না। বার বার নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে টিপছে।

'পদ্ম, ছাদে যাবি?'

হেমলতার এহেন প্রস্তাবে পদ্মজা একটু অবাক হলো। নাকের পাটা হয়ে গেল লাল। এতে নাক লাল হওয়ার কী আছে জানা নেই। পদ্মজা কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা আবার বলেন, 'যাবি?'

পদ্মজা টেবিল থেকে প্রফুল্লচিত্তে ছুটে এলো। বলল, 'যাব।'

আকবর হোসেনের বাড়িটির নাম সিংহাসনকুঞ্জ। বাড়ির নাম এমনটা হওয়ার কারণ ছাদে না গেলে জানা সম্ভব নয়। মা-মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে উঠছে। তাদের পায়ের শব্দ মোহময় ছন্দ তুলে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। অথবা মিলে যাচ্ছে চাঁদের আলোর সাথে একাকার হয়ে। ছাদের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সিংহাসন। তা দেখে পদ্মজার চক্ষু চড়কগাছ। বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা! এত বড় সিংহাসন কার?'

হেমলতা পদ্মজার মুখের ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তিনি দুইদিন আগে এই সিংহাসন আবিষ্কার করেছেন। আকবর হোসেনের কাছে প্রশ্ন করেছেন, ঠিক পদ্মজার মতো করেই। আকবর হোসেনের উত্তর হেমলতা পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তোর আকবর কাকার আব্বু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের। উনার ইচ্ছে ছিল,নিজের বাড়ির ছাদে একটা সিংহাসন করার৷ শেষ বয়সে এসে ইচ্ছে পূরণ করেন। দিনরাত নাকি রাজকীয় ভঙ্গীতে সিংহাসনে বসে থাকতেন। মৃত্যুও হয় সিংহাসনে ঘুমানো অবস্থায়।'

পদ্মজা হা অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। সে সিংহাসন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ময়ূর সিংহাসন! সিংহাসন যেন পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ইট-সিমেন্টের তৈরি সিংহাসন। অনেক বড় দেখতে। পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের বা আরো বেশি হবে৷ হেমলতা বলেন, 'মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনের মতো সিংহাসনের স্বপ্ন বোধহয় তিনি দেখতেন। অর্থের জন্য পারেননি।'

হেমলতার কথা পদ্মজা শুনল নাকি বোঝা গেল না। পদ্মজা অনুরোধ করে অন্য কথা বলল, 'আম্মা, সিংহাসনে বসো তুমি।'

এক কথায় হেমলতা সিংহাসনে বসেন। এরপর পদ্মজাকে ডাকেন পাশে এসে বসতে। পদ্মজা আসল না। দূর থেকে বলল, 'মাঝে বসো আম্মা।'

'কী শুরু করেছিস।'

'বসো না।'

হেমলতা কপাল কুঁচকে সিংহাসনের মাঝে বসেন। পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে আবার হারিয়ে গেল। বলল, 'আরেকটু বাকি।'

'কি বাকি?'

'বাম পায়ের উপর ডান পা তুলে রানিদের মতো বসো।'

হেমলতা বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়েন। পদ্মজাকে বলেন, 'পাগলের প্রলাপ শুরু করেছিস!'

পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে দৃঢ়ভাবে বলল, 'আম্মা, বসো না। নইলে আমি কাঁদব।'

পদ্মজার এমন কথায় হেমলতা হাসবেন না রাগবেন ঠাওর করতে পারলেন না। রাতের সৌন্দর্য, রাতের মায়াবী রূপ প্রতিটি মানুষের ভেতরের আহ্লাদ, ইচ্ছে, কষ্ট, ঠেলেঠুলে বের করে আনার ক্ষমতা বোধহয় নিজে আল্লাহ সাক্ষাৎ করে দিয়েছেন। তাই হেমলতা তার নিজের শক্ত খোলসে ফিরতে পারলেন না। পদ্মজার পাগলামোর সুরে সুর মিলিয়ে তিনি সিংহাসনে রাজকীয় ভঙ্গীতে বসেন। পদ্মজার কেমন কেমন অনুভূতি হয়। বুকের ভেতর ঝিরিঝিরি কাঁপন। এইতো তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানি হেমলতা। এবং তার কন্যা সে পদ্মজা। চোখের মণিকোঠায় ভেসে উঠল একটি অসাধারণ দৃশ্য। হেমলতার সর্বাঙ্গে হীরামণি-মুক্তার অলংকার। অসম্ভব সুন্দর শ্যামবর্ণের এই সাহসী নারীকে দেখতে কতশত দেশ থেকে মানুষ ভীড় জমিয়েছে। আর সে হেমলতার পাশে বসে আছে। চারিদিকে ঢাকঢোল পিটানো হচ্ছে। হাতিশাল থেকে হাতির হুংকার আসছে। তারাও যেন খুশি এমন রানি পেয়ে।

'তোর পাগলামি শেষ হয়েছে?'

পদ্মজা জবাব দিল না। হেমলতার পাশে এসে বসল। কোলে মাথা রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। এরপর আক্ষেপের স্বরে বলল, 'আম্মা, তুমি রানি আর আমি রাজকন্যা কেন হলাম না। সবাই আমাদের ভালোবাসত। সম্মান করতো। মুগ্ধ হয়ে দেখতো।'

হেমলতার বুক চিঁরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজ কেন তার প্রতিকূলে থাকল? কেন পদ্মজা ছোট থেকে সমাজের কারোর মেয়ের সাথে মেশার অধিকার পেল না? তিনি বললেন, 'জন্ম যেভাবেই হউক। জীবনে সফলতা না এনে মৃত্যুতে ঢলে পড়া ব্যক্তির ব্যর্থতা। তুই এমন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা কর যাতে মানুষ সম্মান করে। সম্মান করতে বাধ্য হয়। চোখ তুলে তাকাতেও যেন ভয় করে। যারা দূরছাই করেছে তাদের যেন বিবেকে বাঁধে।'

'পারব আমি?'

'কেনো পারবি না? পুরো জীবন তো দুঃখে,অবহেলায় যায় না।'

'তোমার জীবন থেকে এতোগুলো বছর দুঃখে আর অবহেলায় তো গেছে আম্মা।'

হেমলতা কিছু বলতে পারলেন না। তিনি জীবনে কী পেয়েছেন? উত্তরটা চট করে পেয়ে গেলেন। পদ্মজাকে বলেন, 'আমার মেয়ে তিনটা আমার সফলতা। আমার অহংকার। প্রেমা তো ছোট। তোরা দুইজন নিজেদের মতো থাকিস, পড়িস, কোনো দুর্নাম নাই। এজন্য মানুষ বলে, এইযে এরা হচ্ছে হেমলতার মেয়ে। তখন আমার অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যায়।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল, 'কখনো ভুল কাজ করব না আম্মা। তোমাদের সম্মান আমাদের জন্য আংশিকও নষ্ট হতে দেব না।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে মাঝে মাঝে পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। পদ্মজা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে একটা চাঁদ, অগণিত তারা। আকাশকে তারায় পরিপূর্ণ একটি কালো গালিচার মত লাগছে। হেমলতা বিভ্রম নিয়ে বললেন, 'সমাজের সাথে আমার সখ্যতা কখনো হয়ে উঠেনি। কালো রংয়ের দোষে। প্রকৃতির মতিগতি অবস্থা দেখে দেখে আমার সময় কাটে। আব্বা শিক্ষক ছিলেন বলে, কালো হয়েও পড়ার সুযোগ পাই। অবশ্য আব্বার সামর্থ্যও ছিল। আমাদের সব ভাই-বোনকে পড়িয়েছেন। আম্মা আমাকে পড়ানোতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রং কালো। কেউ বিয়ে করবে না। একটু পড়ালেখা থাকলে হয়তো করবে,সেই আশায়। যখন আমি তোর বয়সে ছিলাম বড় আপার মেয়ে হয়। মেয়েটার গায়ের রং কালো। শ্বশুর বাড়িতে তুলকালাম কান্ড। বংশের সবাই ফর্সা। বাচ্চা কেন কালো হলো। আপাকে বের করে দিল। আপা বাপের বাড়ি ফিরল। সমাজের কতো কটুক্তি কথা হজম করেছে আপা। তখন আমি নামাযের দোয়ায় আকুতি করে চাইতাম একটা সুন্দর মেয়ের। আমার বিয়ে হলে,মেয়েটা যেন পরীর মতো সুন্দর হয়। আমার মতো অবহেলার পাত্রী যেন না হয়। বড় আপার মতো কালো মেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে যেন না হয়।

তুই যখন পেটে,এবাদত বাড়িয়ে দেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে সময় পেলেই সেজদায় লুটিয়ে আল্লাহকে একই কথা বলতাম। আমার পরীর মতো মেয়ে চাই। দোয়া কবুল হলো। তোর যেদিন জন্ম হয়, সবাই অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই ছিল। আমি তো খুশিতে কেঁদেই দিয়েছিলাম। এতো সুন্দর বাচ্চা এই গ্রামে কেন, পুরো দেশেও বোধহয় ছিল না। চোখের পাপড়ি যেন ভ্রুতে এসে ঠেকছিল। ঠোঁট এতো লাল ছিল। যেন ঠোঁট বেয়ে রক্ত ঝরছে। সদ্য জন্মানো শিশুর মাথা ভর্তি ঘন কালো রেশমি চুল। অলন্দপুরের সবার কাছে ছড়িয়ে পরে এই কথা। দল বেঁধে দেখতে আসে। এক সপ্তাহ বেশ তোড়জোড় চলে। কী খুশি ছিলাম আমি। সারাক্ষণ তোকে চুমোতাম। রাতেও ঘুমাতে ইচ্ছে করত না। মনে হতো এই বুঝি আমার পরীর মতো মেয়ে চুরি হয়ে গেল। তোর আব্বা সারাক্ষণ খুশিতে বাকবাকম করতো। বাইরে থেকে এসে গোসল ছাড়া কোলে নিত না। যখন কোলে নিত বার বার আমাকে বলতো, 'ও লতা। ছেড়িডা মানুষ না শিমুল তুলা।'

হেমলতা থামেন। চোখ তার ছলছল। পদ্মজা বলল, 'তারপর?'

'কেউ বা কারা ছড়িয়ে দিল তুই তোর বাপের মেয়ে না। যুক্তি দাঁড় করাল। বাপ,মা কালো মেয়ে এতো সুন্দর কেন হবে? গ্রামের প্রায় সব মানুষ অশিক্ষিত। তাই বিবেচনা ছাড়াই বিশ্বাস করে নিল।'

হেমলতা চুপ হয়ে যান। পদ্মজা টের পেল হেমলতা কিছু একটা লুকিয়েছেন। শুধু গ্রামের মানুষ বললেই এতো বড় দাগ লেগে যায় না কপালে। অন্য কোনো কারণ আছে। যা যুক্তি হিসেবে শক্ত ছিল। হেমলতা দম নিয়ে বলেন, 'একা হয়ে যাই। তোর বাপ সরে গেল। সমাজ সরে গেল। আঁতুড়ঘরে একা সময় কাটাতে থাকি। তোকে দেখলেই মনে হতো, আল্লাহ নিজের কোনো মূল্যবান সম্পদ আমাকে দেখে রাখতে দিয়েছেন। আমি অন্য আমি হয়ে যাই। খোলসটা পাল্টে যেতে থাকে। রাত জেগে স্বপ্ন সাজাই। তোর সাথে ফুল কুড়নোর স্বপ্ন দেখি। ফুল গাছ লাগাই। যখন তোর চার বছর হয় বাড়ি ভরে যায় ফুলগাছে। ছোট শাড়ি পরিয়ে প্রতিদিন মা-মেয়ে মিলে ফুল তুলে মালা গেঁথেছি। নিশুতি রাতে পাকা ছাদে জোছনা পোহানোর স্বপ্ন ছিল। আজ পূরণ হলো। আর দুইটা ইচ্ছে বাকি, সাগর জলে মা-মেয়ে পা ডুবিয়ে পুরো একটা বিকেল কাটাব। আর, শেষ বয়সে নাতি-নাতনীদের নিয়ে তাদের মায়ের জীবনি বলব।'

পদ্মজা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হেমলতার কোমর। তিনি টের পান পদ্মজা ফোপাঁচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'পদ্ম, কাঁদছিস কেন?'

পদ্মজা বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমাকে কখনো একা থাকতে দিও না আম্মা। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তোমার মতো কেউ হয় না।'

'এজন্য কাঁদতে হয়? আমি সবসময় তোর সাথে আছি। কান্না থামা। কী মেয়ে হয়েছে দেখ! কেমন করে কাঁদছে। পদ্ম, চুপ...আর না...মারব এবার...পদ্ম।'

পদ্মজা থামে। কিন্তু ছটফটানি হচ্ছে ভেতরে। কেন এমন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। আকাশ ভরা রাতের দিকে তাকিয়ে ভয় হচ্ছে। একটু আগেই সুন্দর লাগছিল এই আকাশ। আচমকা ভয়ংকর মনে হচ্ছে। মায়ের কোল ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, চারিদিকে অশরীরীদের ভীর। তাদের কোলাহলে মস্তিষ্ক ফেটে যাচ্ছে। পদ্মজা মায়ের কোলে মুখ লুকালো।

'পদ্ম, ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

'না আম্মা।'

'সেদিন মাঝ রাত্রিরে ছুরি নিয়ে বের হয়েছিলাম। হানিফের ঘরটা আব্বা, আম্মার ঘর থেকে দূরে হওয়াতে সুবিধা ছিল। হানিফের ঘরের পাশে গিয়ে দেখি মদনও ঘরে। দুজনকে সামলানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই অপেক্ষা করতে থাকি মদন কখন যাবে। এরপর আরেকজন লোক আসে। একটু দূরে সরে যাই। গোয়ালঘরের পিছনে। মিনিট কয়েক পর উঁকি দিয়ে দেখি দরজা লাগানো। সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি

হানিফ নেই। তখন হয়তো আম্মা দেখছে। তাই ভাবছে আমি খুন করেছি।'

'নানু কেন এমন ভাবল? হানিফ মামা তো তোমারই ভাই।'

হেমলতা তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন না। সময় নিয়ে একটা গোপন সত্যি বললেন, 'আমি তোর নানুর ভাইকে খুন করেছি। তাই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। ভয় পান। সন্দেহ করেন।'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা চমকে উঠে বসল। মুখখানা হা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল হেমলতার দিকে। দৃষ্টি গেল থমকে। হেমলতা পদ্মজাকে সামলে নিতে সময় দেন। দূরের রাতের আকাশে চোখ রাখেন। পদ্মজা নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বলল, 'তিনি কী হানিফ মামার মতো ছিলেন?'

হেমলতা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ান। সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ। হেমলতা সাবধান হয়ে যান। পদ্মজাকে আড়াল করে দাঁড়ান। সেকেন্ড কয়েক পর একটা ছেলের দেখা মিলল। অচেনা মুখ। হেমলতা আগে কখনো দেখেননি। ছেলেটিও তাদের দেখে ভড়কে গেল।

পর্ব ১৫

ভোর বেলার সূর্য উদয়ের সময় পরিবেশে মৃদু সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ল। ট্রেনের জানালা দিয়ে সূর্যের আগুনরঙা আলো পদ্মজার মুখশ্রী ছুঁয়ে দিল। ফজরের নামায পড়ে ট্রেনে উঠেছে তারা। গন্তব্য অলন্দপুর। পদ্মজার মেট্রিক শেষ হলো আজ তিন দিন। হেমলতার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল পদ্মজা৷ পুরো দেড় মাস পর পূর্ণা, প্রেমা, প্রান্তর দেখা পাবে। খুশিতে আত্মহারা সে।

মাঝে একটু জিরিয়ে ফের চলছে ট্রেন। হেমলতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখছেন। কারণে, অকারণে তিনি এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুষ্ক চক্ষুদ্বয় যখন তখন সজল হয়ে উঠে। কিছুতেই বারণ মানে না। নীল আকাশের বুকে যেন সেদিন রাতের স্মৃতি আকার নিয়ে ভেসে উঠল। ছেলেটার বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। অবাক চোখে তাকিয়েছিল। দেখতে বেশ ভাল। হেমলতা পদ্মজাকে আড়াল করে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?'

ছেলেটি হেমলতার কথার ধরনে বিব্রতবোধ করল।ইতস্তত করে বলল, 'মুহিব, মুহিব হোসেন।'

হেমলতার টনক নড়ল। তিনি সাবধানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বারেক হোসেন তোমার বাবা?'

মুহিব ভদ্রতা সহিত বলল, 'জ্বি।'

হেমলতা কী যেন বলতে চেয়েছিলেন,বলতে পারলেন না। তার আগে মুহিব বলল, 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি আসছি।'এরপরই হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। সেদিন আর রাত জাগা হলো না। ছাদ থেকে নেমে গেল তারা। গোপন বৈঠকে একবার বাঁধা পড়লে আর মন সায় দেয় না আলোচনা চালিয়ে যেতে। অনুভূতি গুলো ভোতা হয়ে যায়।

এরপরদিন জানা গেল, মুহিব তার পিতার সাথে রাগ করে ঢাকা ছেড়ে চাচার বাড়ি উঠেছে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের ক্ষমতা খুব। তারা খুব সহজ কারণে মা-বাবার সাথে রাগ করে দূরে সরে যেতে পারে। হেমলতা অবজ্ঞায় কপাল কুঞ্চিত করতে সঙ্কোচবোধ করলেন না। পরে অবশ্য বুঝেছেন, মুহিব খুবই ভাল ছেলে। নম্র, ভদ্র, জ্ঞানী। মেধাবী ছাত্র। বিএ পড়ছে। সবচেয়ে ভাল গুণ হলো, মুহিবের নজর সৎ। হেমলতা চোখের দৃষ্টি চিনতে ভুল করেন না। ঠিক সতেরো দিন পর বারেক হোসেন ছেলেকে নিতে আসেন। যেদিন আসেন এর পরদিন রাতে হেমলতাকে প্রস্তাব দেন। মুহিবের বউ হিসেবে পদ্মজাকে নিতে চান। হেমলতা অবাক হোন। মুহিব মনে মনে পদ্মজার উপর দূর্বল অথচ বোঝা গেল না। নিঃসন্দেহে মুহিব পাত্র হিসেবে উপযুক্ত। মুহিবের বড় দুই ভাই মুমিন, রাজীব। দুজনই চাকরিজীবী। মুমিন বিয়ে করে বউকে ডাক্তারি পড়াচ্ছে। সমর্থনে আছে পুরো পরিবার। অতএব বোঝা গেল, পরিবারের প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্ক, ভাবনা উচ্চ মানের। বারেক হোসেন বিয়ের প্রস্তাবের সাথে এটিও বলেছেন, 'আমার মেয়ে নেই। ছেলের বউরাই আমার মেয়ে। আপনার মেয়ের যতটুকু ইচ্ছে পড়বে। কোনো বাঁধা নেই।'

হেমলতা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি আনন্দ সহিতে জবাব দিলেন, 'পদ্মজা আইএ শেষ করুক। এরপরই না হয়।'

বারেক হোসেন হেসে বলেন, 'তাহলে এটাই কথা রইল।'

স্মৃতির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন হেমলতা। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। গলাটা কাঁপছে। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে পানি পান করলেন।

প্রেমা, প্রান্ত বাড়ির বাইরে সড়কে পায়চারি করছে। পূর্ণা গেটের আড়াল থেকে বার বার উঁকি দিয়ে দূর রাস্তা দেখছে। মোর্শেদ - হেমলতা আর পদ্মজাকে আনতে গঞ্জে সেই কখন গেল, এখনো আসছে না। পুরো দেড় মাস পর মা-বোনের সাক্ষাৎ পাবে তারা। হৃদপিণ্ড

দ্রুতগতিতে চলছে। মিনিট পাঁচেক পর কাঁচা সড়কের মোড়ে মোর্শেদের পাশে কালো বোরখা পরা দুজন মানুষকে দেখতে পেল তারা। পূর্ণা লাজলজ্জা ভুলে আগে আগে ছুটে গেল। পিছনে প্রান্ত এবং প্রেমা। ছুটে এসে মা-বোনকে একসাথে জড়িয়ে ধরে প্রবল কণ্ঠে কেঁদে উঠল পূর্ণা। হেমলতা পূর্ণাকে ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি করা দোষের নয়। পদ্মজার চোখ বেয়েও টপটপ করে জল পড়ছে। প্রায় প্রতিটা রাত সে ভাই বোনদের মনে করেছে। বিশেষ করে পূর্ণাকে বেশি মনে পড়েছে। মনে হচ্ছে কত শত বছর পর দেখা হলো। আর পূর্ণা বাড়ির আনাচে কানাচে পদ্মজার শূন্যতা অনুভব করেছে। সে অশ্রুসিক্ত চোখ মেলে তাকাল পদ্মজার দিকে। এরপর আবার জড়িয়ে ধরে বলল, ’আপা, আমার এতো আনন্দ হচ্ছে। এতো আনন্দ কখনো হয় নাই।’

পদ্মজার কোমল হৃদয় পূর্ণার ভালবাসা দেখে বিমোহিত হয়ে উঠল। সে স্নেহার্ধ কণ্ঠে বলল, ’আমার সোনা বোন। আর কাঁদিস না।’

পূর্ণা চোখের জল দ্রুত মুছল। প্রফুল্লচিত্তে বলল, ‘আপা, আমি তোমার পছন্দের চিংড়ি মাছ দিয়ে লতা রেঁধেছি।’

পদ্মজা অবাক চোখে তাকাল। হেমলতা প্রশান্তিদায়ক সুখ অনুভব করলেন। এক বোনের প্রতি আরেক বোনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখে। পদ্মজা বাকহারা হয়ে পূর্ণার দুই গালে চুমো দিল। মোর্শেদ দৃশ্যটি মুগ্ধ হয়ে দেখেন। এরপর তাড়া দেন, ’দেহো মাইয়াডির কারবার। মানুষ আইতাছে। আর হেরা রাস্তায় কান্দাকাটি লাগাইছে। হাঁট সবাই,হাঁট।’

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চার ভাই বোন ঘাটে গিয়ে বসল। দেড় মাসে কী কী হলো, না হলো সব পূর্ণা বলছে। প্রেমা পূর্ণার নামে বিচার দিল। প্রান্ত প্রেমার নামে বিচার দিল। প্রান্ত কেন বিচার দিল, তা নিয়ে প্রেমা বাকবিতন্ডা লাগিয়ে দিল। সে কী কান্ড! দুজন তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। এরপর দুজনই বিচার নিয়ে গেল হেমলতার কাছে। তখন পদ্মজা শুষ্ককণ্ঠে পূর্ণাকে বলল, ’জানিস পূর্ণা, আম্মা আমার বিয়ে ঠিক করছে।’

পূর্ণা ভীষণ চমকাল। চমকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ’কবে? কার সাথে?’

‘যে বাড়িতে ছিলাম ওই বাড়ির ছেলের সাথে। বিএ পড়ছে। আমার আইএ শেষ হলে বিয়ের তারিখ পড়বে।’

‘আপা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আম্মার না ইচ্ছে তোমাকে অনেক পড়াবে। তোমার চাকরি হবে।’

পদ্মজা চুপ থাকল ক্ষণকাল। এরপর বলল, ’আম্মার কী যেন হয়েছে। পাল্টে গেছেন।’

‘কী রকম?’

‘আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ কথা এড়িয়ে যান। আমার ভবিষ্যত নিয়ে আগের মতো আগ্রহ দেখান না। আমি কথা তুললে এড়িয়ে যান। গল্প করেন না। মানে,আগের মতো নেই।’কথাগুলো বলতে গিয়ে পদ্মজার গলা কিঞ্চিৎ কাঁপল।

‘সেকী!’

‘সত্যি।’

‘কিছু হয়েছে ওখানে?’

‘না। আমি যতটুকু জানি তেমন কিছুই হয়নি।’

পূর্ণা সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে চিন্তায় ডুবল। পদ্মজা শূন্যে তাকিয়ে রইল। লিখন শাহ নামে মানুষটার কথা মনে পড়ছে। তিনি যখন শুনবেন এই খবর, সহ্য করতে পারবেন? সত্যি ভালবেসে থাকলে সহ্য করতে কষ্ট হবে নিশ্চয়ই। পূর্ণা দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল, ’আপা, লিখন ভাইয়ের কী হবে?’

পদ্মজা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকাল। বলল, ’আমি তাকে বলেই দিয়েছি, আম্মা যা বলবেন তাই হবে।’

পূর্ণার বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। তার আপার মতো সুন্দরীকে শুধুমাত্র লিখন শাহর পাশেই মানায়। কত স্বপ্ন দেখল সে, লিখন শাহ এবং পদ্মজাকে নিয়ে। সব স্বপ্নে গুড়ো

বালি। সে কাতর কণ্ঠে বলল, ’লিখন ভাইয়ের সাথে তোর বিয়ে না হলে আমি কষ্ট পাব খুব।’

‘আমিতো আম্মার কথার বাইরে যেতে পারব না।’

পূর্ণা গলার স্বর খাদে এনে বলল, ’যদি লিখন ভাই রাজি করাতে পারে?’

পদ্মজা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। সেই দৃষ্টি যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে, এ হওয়ার নয়! পূর্ণা কপাল কুঁচকে ফেলল। বিরক্তিতে বলে উঠল, ’ধ্যাত!’

বাতাসটা গরম গরম ঠেকছে। ক্রমশ মাথা ব্যাথা বেড়ে চলেছে। এতো এতো গাছগাছালি চারিদিকে তবুও এতটুকুও শীতলতা নেই পরিবেশে। হেমলতা আলমারির কাপড় গুছিয়ে বিছানার দিকে তাকালেন। মোর্শেদ এই রোদ ফাটা দুপুরে কখন থেকে ঝিম মেরে বিছানায় বসে আছে। মুখখানা বিমর্ষ, চিন্তিত। হেমলতা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, ’কোনো সমস্যা?’

মোর্শেদ তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। হেমলতা তাকিয়ে রইলেন জবাবের আশায়। ক্ষণকাল সময় নিয়ে মোর্শেদ বললেন, ’বাসন্তী এই বাড়িত আইতে চায় থাকবার জন্যে।’

হেমলতার চোখ দু’টি ক্রোধে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, ’তোমার ইচ্ছে হলে নিয়ে এসো। বাড়ি তো তোমার।’

মোর্শেদ চকিত চোখে তাকান। তিনি ভেবেছিলেন হেমলতা রাগারাগি করবে। মোর্শেদের চোখ দু’টির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ রূপ নিল। কিড়মিড় করে হেমলতাকে বলেন, ’আমি তারে চাই না।’

হেমলতা ঠাট্টা করে হাসলেন। বললেন, ’বিশ বছর সংসার করে এখন তাকে চাও না! আমি হলে মামলা ঠুকতাম।’

মোর্শেদ আহত মন নিয়ে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখ দুটিতে অসহায়ত্ব স্পষ্ট। হেমলতা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে সরে পড়েন। মোর্শেদ তখন কপট রাগ নিয়ে নিজে নিজে আওড়ান, ’আমারে ডর দেহায়। মা*ডারে খুন করতে পারলে জীবনে শান্তি পাইতাম।’

হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মোর্শেদকে পরখ করে নেন। রাগে ছটফট করছে মোর্শেদ৷ বাসন্তীর প্রতি তার এতো রাগ কেন? তিনি দু পা এগিয়ে আসেন। বললেন, ’ভালোবাসার মানুষকে এভাবে গালি দিয়ে ভালোবাসা শব্দটির সম্মান খুইয়ে দিও না।’

‘আমি তারে কোনকালেও ভালোবাসি নাই। বাসলে তোমারে বাসছি।’

হেমলতা ভীষণ অবাক হয়ে, চোখ তুলে তাকান। ভোতা অনুভূতি গুলো মুহূর্তে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। মোর্শেদ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। দৃষ্টি অস্থির। বিছানা থেকে নেমে, গটগট পায়ে বেরিয়ে যান। হেমলতা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকেন,ঝাপসা চোখ মেলে। এই মানুষটার থেকে এই একটি শব্দ শোনার জন্য একসময় কত পাগলামি করেছেন তিনি। কত কেঁদেছেন। আকুতি, মিনতি করেছেন। সত্য হোক কিংবা মিথ্যে হেমলতার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। বয়সটা কম হলে আজ তিনি অনেক পাগলামি করতেন, অনেক!

পূর্ণার ভীষণ জ্বর। তাই পূর্ণাকে নানাবাড়ি রেখেই পদ্মজা বাড়ি ফিরল। সাথে এলো হিমেল, প্রান্ত, প্রেমা। বাড়িজুড়ে ছোটাছুটি করে লাউ, শিম, লতা, পুঁইশাক বন্দোবস্ত করল। হিমেল বাজার থেকে মাছ এনে দিল। বাড়িতে শুটকি ছিল। আজ হেমলতা আর মোর্শেদ ফিরবে। তাই এতো আয়োজন। দুই দিন আগে ঢাকা গেলেন তারা। হেমলতার বড় বোন হানির মেজো মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। হানি বলেছেন,হেমলতা না গেলে তিনি বিয়ের তারিখ ফেলবেন না। তাই বাধ্য হয়ে হেমলতা গিয়েছেন। তবে,পদ্মজার খটকা লাগছে শুরু থেকে। তার মা তাকে রেখে পাশের এলাকায় যেতেও আপত্তি করেন। আর আজ দু’দিন ধরে তিনি মাইলের পর মাইল দূরে পদ্মজাকে ছাড়া রয়েছেন। এসব এখন ভাবার সময় নয়। পদ্মজা যত্ন করে কয়েক পদের রান্নার প্রস্তুতি নিল। সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই।

পরিবেশ ঠান্ডা,স্তব্ধ। এ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। প্রান্ত-প্রেমা উঠান জুড়ে মারবেল খেলছে। হিমেল শুধু দেখছে। মাঝে মাঝে প্রবল কণ্ঠে হাসছে। হাত তালি দিচ্ছে। রান্না শেষ হলো বিকেলে। প্রেমা,প্রান্ত,হিমেলকে খাবার বেড়ে দিল পদ্মজা। খাওয়া শেষ হলে বলল, 'হিমেল মামা, প্রান্ত আর তুমি পূর্ণারে নিয়ে আসো৷ সন্ধ্যা হয়ে যাবে একটু পর। আম্মা,আব্বাও চলে আসবে।'

হিমেল, প্রান্ত বের হতেই পিছন পিছন ছুটে গেল প্রেমা। পদ্মজা একা হয়ে গেল। রান্নাঘর গুছিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাতাস বইছে প্রবলবেগে। বাতাসের দাপটে চুল, ওড়না উড়ছে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। পরিবেশ অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনটা কু গাইতে লাগল। পদ্মজা এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালু চুলকাতে চুলকাতে গেইটের দিকে বারংবার তাকাচ্ছে৷ যতক্ষণ কেউ না আসবে শান্তি মিলবে না৷ বিকট শব্দ তুলে কাছে কোথাও বজ্রপাত পড়ল। ভয়ে পদ্মজার আত্মা শুকিয়ে গেল। চারিদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে! ঘোমটা টেনে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বিকট বজ্রপাত, দমকা হাওয়া, বড় বড় ফোটার বৃষ্টি। সব মিলিয়ে প্রলয়ঙ্কারী ঝড় বইছে যেন। লাহাড়ি ঘরের মাথার উপরে থাকা তাল গাছ অবাধ্য বাতাসের তেজে একবার ডানে আরেকবার বামে ঝুঁকে পড়ছে। পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল ভয়ে। ছুটে গেল নিজের রুমে। বিছানার উপর কাচুমাচু হয়ে বসল। টিনের চালে ধুমধাম শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে। এতসব শব্দ ভেদ করে আরেকটি শব্দ কানে এলো। সদর ঘরে কিছু একটা পড়েছে। পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। পরপরই খুশিতে আওড়াল, 'আম্মা আসছে।'

বিছানা থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে সদর ঘরে আসল। সদর ঘর অন্ধকারে তলিয়ে আছে। জানালা দিয়ে আসা ইষৎ আলোয় পদ্মজা টের পেল একজন পুরুষের অবয়ব। সাথে সাথে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ল। পা'দুটি স্তব্ধ হয়ে গেল। পদ্মজা কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?'

কোনো জবাব আসল না। পদ্মজা অনুরোধ করে ভেজা কণ্ঠে বলল, 'বলুন না কে আপনি?'

একটি ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দু'টি গভীর কালো চোখ বিভ্রম নিয়ে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। শীতল, স্পষ্ট কণ্ঠে চোখের মালিক বলল, 'আমির হাওলাদার।'

পদ্মজা পুরুষালী কণ্ঠটি শুনে আরো ভড়কে গেল। রগে,রগে বরফের ন্যায় ঠান্ডা সুক্ষ্ম কিছু একটা দৌড়ে গেল। এক হাত দরজায় রেখে, পদ্মজা আকুতি করে বলল, 'আপনি চলে যান। কেন এসেছেন?'

উত্তরের আশায় না থেকে পদ্মজা দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেল। রুমে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল। মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়েছে। কাজ করছে না। লোকটা যদি সম্মানে আঘাত করে বা গ্রামের মানুষ যদি দেখে ফেলে খালি বাড়িতে অচেনা পুরুষের সাথে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সে আর ভাবতে পারছে না। দরজায় করাঘাত শুনে পদ্মজা রুমের সব আসবাবপত্র ঠেলেঠুলে দরজার কাছে নিয়ে আসল। এরপর মাটিতে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। দু'হাত মাথায় রেখে আর্তনাদ করে ডাকল, 'আম্মা, কই তুমি? আমি খুব একা আম্মা। আম্মা... ।'

পর্ব ১৬

টিনের চালে ঝুম ঝুম শব্দ। বৃষ্টির এই ছন্দ অন্যবেলা বেশ লাগলেও এই মুহূর্তে ভয়ংকর লাগছে পদ্মজার। একেকটা বজ্রপাত আরো বেশি ভয়ানক করে তুলেছে পরিবেশ। সে কাচুমাচু হয়ে ফোঁপাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ একটু কমলে কিছু কথা ভেসে আসে বাতাসে, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে ভয় পাবেন না। বিপদে পড়ে এই বাড়িতে উঠেছি। বিশ্বাস করুন।'

পদ্মজা কান্না থামাল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। দরজার ওপাশ থেকে আমির নামের মানুষটা বলছে, 'দরজা খুলুন। বিশ্বাস করুন আমাকে। আমি আপনার সাথে কোনো সুযোগ নিতে আসেনি। ভয় পাবেন না।'

পদ্মজা একটু নড়েচড়ে বসল। আমির আবার বলল, 'শুনছেন?'

পদ্মজা ঢোক গিলে কথা বলার চেষ্টা করল। কথা আসছে না। এরপর খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করল। বলল, 'আ...আমি দরজা খুলব না।'

ক্ষণকাল উত্তর আসল না। এরপর আমির বলল, 'আচ্ছা, খুলতে হবে না। আপনি ভয় পাবেন না প্লীজ।'

'আপনি চলে যান।'

'বৃষ্টি থামতে দিন। হঠাৎ বৃষ্টির জন্যই তো আপনার বাড়িতে উঠা। আমার বৃষ্টিতে সমস্যা হয়।'

আমিরের মুখে স্পষ্ট শুদ্ধ ভাষা শুনে পদ্মজা বুঝল, লোকটা শিক্ষিত। কথাবার্তা শুনে ভালো মানুষ মনে হচ্ছে। তবুও সাবধানের মার নেই। সে দরজা খুলল না। বিছানায় গিয়ে বসল। ভয়টা কমেছে।

'শুনছেন?'

পদ্মজা জবাব দিল, 'বলুন।'

'আপনার নাম কী? ডাকনাম বলুন।'

'পদ্মজা।'

'সুন্দর নাম। আমার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না?'

'জানি।'

আমির অবাক হওয়ার ভান ধরে প্রশ্ন করল, 'কীভাবে? আমাকে চিনেন?"

'না, কিছুক্ষণ আগেই নাম বললেন।'

'তখন তো ভয়ে কাঁপছিলেন, নাম শুনেছেন! বাব্বাহ!'

আমিরের কণ্ঠে রসিকতা। পদ্মজা মৃদু হাসল। কেন হাসল জানে না। আমির বলল, 'শুনছেন?'

'শুনছি।'

'আপনি কী এরকমই ভীতু?'

'আমার সাহসিকতা প্রমাণ করানোর জন্য এখন বের হতে বলবেন তাই তো?'

ওপাশ থেকে গগন কাঁপানো হাসির শব্দ আসল। আমির হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ কথা জানেন তো।'

এই বিষয়ের কথাবার্তা এড়িয়ে গেল পদ্মজা। বলল, 'বৃষ্টি কমলেই চলে যাবেন কিন্তু।'.

'এতো তাড়াতে হবে না। বৃষ্টি কমলেই চলে যাবো।'

'কষ্ট নিবেন না। খালি বাড়ি তো।'

'বাকিরা কোথায়? এটা মোর্শেদ কাকার বাড়ি না?'

'জি।'

'উনার ধানের মিল তো এখন আমার আব্বার দখলে। ছুটিয়ে নিবেন কবে?'

পদ্মজা অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাল। বিস্ময় নিয়ে বলল, 'আপনি মাতব্বর কাকার

ছেলে?'

'অবাক হলেন মনে হচ্ছে।'

'মাতব্বর কাকার ছেলের নাম তো বাবু।'

আমির হেসে বলল, 'আমার ডাকনাম বাবু। আম্মা আর আব্বা ডাকে। ভাল নাম, আমির।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বজ্রপাত থেমেছে। বৃষ্টি রয়েছে। আমির জিজ্ঞাসা করল, 'বাকিরা কোথায় বললেন না?'

'আম্মা, আব্বা ঢাকা। আজ ফেরার কথা ছিল। আর আমার দুই বোন আর ভাই নানাবাড়ি। বোধহয় বৃষ্টির জন্য আসতে পারছে না।'

'এখনো আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

'একটু, একটু।'

'এটা ভালো। অচেনা মানুষকে একেবারেই বিশ্বাস করতে নেই।'

বাসন্তী ভ্যান থেকে নেমে সামনে এগোলেন। মোর্শেদের বাড়িটা তিনি চিনেন না। তাই কোনদিকে যাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিকে আকাশের অবস্থা ভাল না। রাস্তাঘাটেও মানুষ নেই। ঝড়ো হাওয়া বইছে৷ আরো কিছুটা পথ হাঁটার পর আচমকা ঝড় শুরু হলো। তিনি দৌড়ে একটা বাড়িতে উঠলেন। রমিজ আলি বারান্দায় বসে হুঁকা টানছিল। সিল্কের শাড়ি পরনে,পেট উন্মুক্ত, লম্বা চুলের বেণুনীতে ধবধবে সাদা বাসন্তীকে দেখে তিনি অবাক হয়ে এগিয়ে আসেন। বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, 'কেডা আপনে? কারে চান?'

বাসন্তী কেঁপে উঠলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে রমিজকে দেখে, লম্বা করে হাসেন। বলেন, 'হুট কইরা মেঘখান আইয়া পড়ল তো।'

'তে আপনে কার বাড়িত যাইতেন?'

'মোর্ছেদের বাড়ি।'

রমিজ আলি বিরক্তিকর ভাব নিয়ে সরে যান। ঘরের ভেতর থেকে চেয়ার এনে দেন। বলেন, 'মোর্শেইদদার কী লাগেন আপনে?'

বাসন্তী চিন্তায় পড়েন। গ্রামের মানুষ তো জানে না তার আর মোর্শেদের সম্পর্ক। এখন জানানোটা কতটা যুক্তিসংগত? সেকেন্ড কয়েক ভাবার পর যুক্তি মিলে গেল। গ্রামবাসীকে বলা উচিত। নয়তো সে তার অধিকার কখনো পাবে না। একমাত্র গ্রামবাসীই পারে তার জায়গাটা শক্ত করে দিতে। বাসন্তী রমিজ আলির চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তার বউ লাগি। পরথম বউ। তার লগে আমার বিছ বছরের ছম্পর্ক।'

রমিজ আলির চক্ষুদ্বয় যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়ার মতো আনন্দ অনুভব করেন। তিনি প্রবল উৎসাহ নিয়ে বলেন, 'হের পরের বউয়ে জানে?'

'না।'

'থাহেন কই আপনে?'

'রাধাপুর।'

'লুকাইয়া রাখছিল বিয়া কইরা?'

'হ। এখন মোর্ছেদ আমারে তালাক দিতে চায়। আমার সাথে ছংছার করতে চায় না। তাই আমি আমার অধিকার নেয়ার জন্যে আইছি। আমি তার বাড়িতে থাকবার চাই। আপনেরা আমারে ছাহায্য কইরেন। গ্রামবাছী ছাড়া মোর্ছেদ আমারে জায়গা দিব না।'

রমিজ আলি প্রবল বৃষ্টি, আর বজ্রপাতকে হটিয়ে উঁচু স্বরে বলেন, 'আপনের জায়গা করে দেওন আমরার কাম। আপনি চিন্তা কইরেন না।মেঘডা কমতে দেন। এরপর খালি দেহেন কী হয়।'

বাসন্তী চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ভরসা পাওয়া গেল। রমিজ আলির প্রতিশোধের নেশা পেয়েছে। মোর্শেদ তাকে কতো কটু কথা বলেছে,অবজ্ঞা করেছে,অপমান করেছে। এইবার তার পালা। প্রতিটি অপমান ফিরিয়ে দিবেন বলে শপথ করেন। তিনি বাসন্তীকে ভরসা দিয়ে বলেন, 'আপনি বইয়া থাহেন। আমি আরো কয়জনরে লইয়া আইতাছি।"

রমিজ আলি খুশিতে গদগদ হয়ে বেরিয়ে যান। ছইদ, রজব, মালেক, কামরুলকে নিয়ে ফিরেন। সবার হাতে হাতে ছাতা। কামরুল আটপাড়া এলাকার মেম্বার। গ্রামে কোনো অনাচার হলে তা দেখার দায়িত্ব তার। তাই তিনি মাথার উপর বজ্রপাত, ঝড় নিয়েই ছুটে আসেন।

পদ্মজা উসখুস করছে। টয়লেটে যাওয়া প্রয়োজন। প্রস্রাবের বেগ বাড়ছে। এভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়। সাহসও পাচ্ছে না বের হওয়ার। রুমে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। চোখ বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস নিল। এরপর কাঁচি কোমরে গুঁজে নিল। আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। তারপর দরজা খুলল। আচমকা দরজা খোলার আওয়াজ শুনে আমির চমকে তাকাল। আকাশ থেকে কালো মেঘের ভাব কেটে গেছে অনেকটা। সন্ধ্যার আযান পড়ছে। সালোয়ার,কামিজ পরা পদ্মজাকে দেখে মুহূর্তে হৃদস্পন্দন থমকে গেল তার। পদ্মজা ওড়না টেনে নিল নাক অবধি। এরপর কাঁপা পায়ে আমিরের পাশ কাটাল। আমিরের চোখ স্থির। নিঃশ্বাস এলোমেলো। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। পদ্মজা যখন ফিরছিল রুমে তখন আমির ডাকল, 'পদ্মজা?'

পদ্মজা দাঁড়াল। মানুষটা খারাপ হলে এতক্ষণে আক্রমণ করতো। যেহেতু করেনি, মানুষটার উদ্দেশ্য খারাপ না। তাই দাঁড়াল। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না। আমিরের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। শার্ট ভিজে গেছে। তাই বারান্দার দড়িতে রেখেছে,বাতাসে শুকাতে। আমির বলল, 'অলন্দপুরে এমন রূপবতী আছে জানতাম না।'

পদ্মজা লজ্জা পেল। বিব্রতবোধও করল। বৃষ্টি প্রায় কমে এসেছে। পদ্মজা বলল, 'আপনি এবার আসুন। কেউ দেখলে খারাপ ভাববে।'

'যেতে তো ইচ্ছে করছে না।'

লোকটা বলে কী! এতক্ষণ বলল,বৃষ্টি কমলেই চলে যাবে। এখন বলছে, যাবে না। পদ্মজা ঘুরে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে আকুতি নিয়ে বলল, 'চলে যান।'

আমির কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। না চাইতেও পদ্মজা আমিরকে খেয়াল করল। শ্যামবর্ণের একজন পুরুষ। থুতনির মাঝে কাটা দাগ। সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল পদ্মজা। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'বৃষ্টি কমে গেছে। আম্মা,আব্বা চলে আসবে। চলে যান।'

আমিরের নিস্তব্ধতা পদ্মজাকে বিরক্ত করে তুলল। এতো ঘাড়ত্যাড়া, দুই কথার মানুষ কীভাবে হয়? উঠানে পায়ের শব্দ! কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। বারান্দা থেকে তাকাল আমির এবং পদ্মজা। গ্রামের এতোজনকে দেখে পদ্মজার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দৌড়ে রুমে ঢুকে পড়ল। রমিজ আলি চেঁচিয়ে ডাকেন, 'কইরে মোর্শেইদদা। আকাম কইরা এখন লুকায়া আছস ক্যান? বাইর হ। তোর আকাম ধইরা লইয়া আইছি।'

আমির বারান্দা পেরিয়ে বেরিয়ে আসে। গম্ভীরমুখে বলল, 'উনারা বাড়িতে নেই।'

উৎসুক জনতা আমিরকে দেখে অবাক হলো। কামরুল বললেন, 'আরে আমির। শহর থেকে আইলা কবে?'

'এইতো চার দিন হলো। আছেন কেমন?'

'এইতো আছি। তা এইহানে কি করো?'

আমির উত্তর দেয়ার আগে রমিজ আলি প্রশ্ন করেন, 'বাড়িত কী কেউ নাই?'

আমির বেশ সহজ,সরল গলায় বলল, 'আছে। পদ্মজা আছে।'

উপস্থিতি পাঁচ-ছয়জন তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সবার দৃষ্টি দেখে আমির বুঝল,সে কত বড়

ভুল করে ফেলল। তাহলে পদ্মজা এটারই ভয় পাচ্ছিল? আমির দড়ি থেকে শার্ট নিয়ে দ্রুত পরল। এরপর কৈফিয়ত স্বরে বলল, 'আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। বাড়ি ফিরছিলাম। বৃষ্টি নামে তাই এই বাড়িতে উঠে পড়ি। বাড়িতে কেউ নাই জানলে..."

আমির কথা শেষ করতে পারল না। রমিজ আলি চেঁচিয়ে আশেপাশে বাড়ির সব মানুষদের ডাকা শুরু করল। মাতব্বর তাকে কম অপদস্ত করেনি। কোণঠাসা করেছে। মোর্শেদ পথেঘাটে কটু কথা শুনিয়েছে। আজ সেই যন্ত্রণা কমানোর দিন। আমির ভড়কে গেল। কামরুল আঙ্গুল শাসিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, 'তোমার কাছে এইডা আশা করি নাই। তোমার আব্বারে ডাকাইতাছি। উনি যা করার করবেন।'

আমির বিরক্তি নিয়ে বলল, 'আরে আজব! কী শুরু করেছেন আপনারা?'

ছইদ আমিরের বয়সের কাছাকাছি। ব্যক্তিগত ভেজাল আছে তাদের মধ্যে। ছইদ হুংকার ছেড়ে বলল, 'চুপ থাক তুই! তোর বাপে মাতব্বর বইলা তোরে ডরাই আমরা? আকাম করবি আর ছাইড়া দিমু?'

আমিরের চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে। রেগে গেলে চোখের রং পাল্টে যায় তার। কালো মুখশ্রীর সাথে লাল চোখ ভয়ংকর লাগে। ছইদ ভেতরে ভেতরে ভয় পেল। আমিরের হাতে কম মার সে খায়নি। তবে, আজ সুযোগ আছে৷ পুরো গ্রামবাসী এক দলে। সে কিছুতেই ছাড়বে না। ঢোক গিলে বলে, 'চোখ উলডাইয়া লাভ নাই। কুকামের উসুল না তুলে যাইতাছি না।'

আমির রাগে শক্ত হাতে ছইদের কানের কাছে থাপ্পড় দিল। মুহূর্তে ছইদের মাথা ভনভন করে উঠল। ততক্ষণে রমিজের উস্কানিতে মানুষ জমে গেছে। সবার হাতে হাতে টর্চ,হারিকেন। আঁধার নেমে এসেছে। আমির আবারো ছইদকে মারতে গেলে কয়জন এসে জাপটে ধরল। কামরুল একজন মহিলাকে আদেশ স্বরে বলেন, 'শিউলির আম্মা কয়জনরে লইয়া মাইয়াডারে বার কইরা আনো। লুকাইছে নটি। গ্রামডা নটিদের ভীড়ে ধ্বংস হইয়া যাইতাছে'

পদ্মজা মাটিতে নতজানু হয়ে বসে কাঁপছে। দ্রুতগতিতে পা থেকে মাথার চুল অবধি কাঁপছে। বাইরের প্রতিটি কথা কানে এসেছে। চারপাশ যেন ভনভন করছে। শিউলির আম্মা পদ্মজার রুমে আসল। দরজা খোলা ছিল। টর্চ ধরে দেখল পদ্মজা মাটিতে বসে কাঁপছে। সে পদ্মজার মাথায় হাত রেখে বলল, 'কেন এমন কাম করছস?'

পদ্মজা ঝাপসা চোখ মেলে তাকাল। শিউলির আম্মা পাশের বাড়ির। পদ্মজার সাথে ভাল সম্পর্ক। পদ্মজা শিউলির মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, 'ভাবী আমি কোনো খারাপ কাজ করি নাই। সবাই ভুল বুঝছে।'

রীনা নামে একজন মহিলা পদ্মজাকে জোর করে টেনে দাঁড় করাল। হেমলতার অনেক বাহাদুরি এই মেয়ে নিয়ে। অনেক অহংকার। সেই অহংকার আজ ভাল করে ভাঙ্গবে। সে মনে মনে পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠেছে। ঘৃণিত কণ্ঠে পদ্মজাকে বলল, 'ধরা পড়লে সবাই এমনডাই কয়। আয় তুই।'

পদ্মজা আকুতি করে বলল, 'বিশ্বাস করুন আমি খারাপ কিছু করিনি। আম্মা এসব শুনলে মরে যাবে। আপনারা এমন করবেন না।'

কারো কানে পৌছালো না পদ্মজার কান্না,আর্তনাদ, আকুতি। সবাই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর মনের, সুন্দর পরিবারের সদস্য গুলোকে ধ্বংস করায় মেতে উঠল। পদ্মজাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে। কখনো ঘোমটা ছাড়া কোনো পুরুষের সামনে না যাওয়া মেয়েটার বুকের ওড়না পড়ে রইল ঘরে। তিন-চার জন মহিলা শক্ত করে চেপে ধরে রাখল। সবাইকে উপেক্ষা করে পদ্মজা ঘৃণা চোখে তাকাল আমিরের দিকে। আমির চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়ানোর, কিছুতেই পারছে না। পূর্ণা জ্বরের চোটে কাঁপছে। বাড়িতে ঢুকে দেখল কোলাহল। ভয় পেয়ে গেল। একটু এগিয়ে দেখল,পদ্মজার বিধ্বস্ত অবস্থা। জ্বর মুহূর্তে উবে গেল। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার আপারে এমনে ধরছেন

কেন? আপা..এই আপা? কাঁদছো কেন?'

পদ্মজা কেঁদে বলল, 'পূর্ণা, আম্মা মরে যাবে এসব দেখলে। আমি কিছু করি নাই পূর্ণা।'

পূর্ণা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু অনুভব করছে,তার বুক কাঁপছে। ব্যথায় বিষে যাচ্ছে। সে রীনাকে বলল, 'খালা আপনি আমার বোনরে এভাবে ধরেছেন কেন? ছাড়েন।'

রীনা কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'তোর বইনের রস বাইড়া গেছিল। এজন্যে খালি বাড়িত ব্যাঠা ছেড়া ডাইকা আইনা রস কমাইছে।'

পূর্ণার গা রিরি করে উঠল! তেজ নিয়ে বলল, 'খারাপ কথা বলবেন না। আমার আপা এমন না।'

পাশ থেকে একজন মহিলা পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল, 'তোর মা যেমন হের মাইডাও এমন অইছে। নিজেও এমন কিচ্ছা করল। মাইয়াও করল।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। মহিলা বলে যাচ্ছে, 'বুঝলা তোমরা সবাই, মায় এক বেশ্যা, মাইয়ারে বানাইছে আরেক বেশ্যা।'

পদ্মজা আচমকা রেগে গেল খুব। আক্রোশে শরীর কাঁপতে থাকল। রীনা সহ দুজন মহিলাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। এরপর রাগে চেঁচিয়ে বলল, 'আমার মা নিয়ে কিছু বললে,আমি খুন করব। মেরে ফেলব একদম। জিভ ছিড়ে ফেলব ।'

পদ্মজার এহেন রূপে সবাই থতমত খেয়ে গেল। লম্বা চুলগুলো খোঁপা থেকে মুক্ত হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ল। চোখের মণি অন্যরকম হওয়াতে মনে হচ্ছে, কোনো প্রেতাত্মা রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। গ্রামের কয়েক মহিলা আবার বিশ্বাস করে, পদ্মজা কোনো পরীর মেয়ে। তাই এতো সুন্দর। এই মুহূর্তে তারা ভাবছে,পদ্মজার ভেতর কেউ ঢুকেছে। তাই সামনে এগোল না। রীনা একাই এগিয়ে আসল। পদ্মজার চুলের মুঠি ধরে বিশ্রি গালিগালাজ করল। এরপর কামরুলকে বলল, 'কামরুল ভাই, এই বান্দিরে বাঁন্ধা লাগব।'

পূর্ণা,প্রেমা পদ্মজাকে ছাড়াতে গেলে ছইদসহ আরো তিন চারজন এগিয়ে আসল। অন্ধকারের ভীড়ে পড়ে পদ্মজা, পূর্ণা, প্রেমা বাজেভাবে উত্ত্যক্ত হলো। কয়টা কালো হাত নিজেদের তৃপ্তি মিটিয়ে নিল। তিন বোনের কান্না,আর্তনাদ কারো হৃদয় ছুঁতে পারল না। হেমলতার অনুপস্থিতিতে তার আদরের তিন কন্যার জীবন্ত কবর হচ্ছিল,বাধা দেয়ার কেউ ছিল না।

পর্ব ১৭

নৌকা ছাড়ার পূর্বে আকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা চোখে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পর হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো। খোলা নৌকা হওয়াতে চোখের পলকে যাত্রী পাঁচজন কাকভেজা হয়ে গেল। ভিজলেন না হেমলতা। মোর্শেদ ছাতা ধরে রেখেছেন। বজ্রপাতের সাথে সাথে হেমলতার আত্মা দুলে উঠছে। মনটা খচখচ করছে। তিনি জলের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার সঙ্গেই বলের মতো একদলা পানি লাফিয়ে উঠছে। তারপর ছোট্ট ছাতার মতো আকৃতি নিয়ে চারপাশে প্রসারিত হয়ে হাওরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে সুন্দর! কিন্তু সেই সৌন্দর্য মনে ধরছে না। অজানা আশঙ্কায় তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে। মোর্শেদ গলা খাকারি দিয়ে হেমলতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এরপর বলেন, 'কিছু খাইবা?'

হেমলতা নিরুত্তর। মোর্শেদ শুষ্ক হাসি হেসে বলল,

'আর কিছুক্ষণ। আইয়াই পড়ছি।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। নিরুত্তরেই বসে রইলেন। বৃষ্টির স্পর্শ নিয়ে আসা হাওরের হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লাগছে চোখেমুখে। হাওরের ঘোর লাগা বৃষ্টি দেখতে দেখতে তন্দ্রা এসে ভর করে। হেমলতা নিকাব খুলে চোখেমুখে পানি দিয়ে তন্দ্রা কাটান। এরপর ক্লান্ত চোখ দু'টি মেলে তাকান মোর্শেদের দিকে। মোর্শেদের হাতে হাত রেখে বলেন, 'আমার এতো খারাপ লাগছে কেন? বুক পোড়া কষ্ট হচ্ছে।'

মোর্শেদ হেমলতার কণ্ঠ শুনে সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। চিত্ত ব্যাথায় ভরে উঠল। কিছুসময় অতিবাহিত হওয়ার পর আশ্বস্ত করে বললেন, 'আইয়া পড়ছি তো। ওই যে বাজারের ঘাট দেহা যাইতাছে।'

হেমলতা মোর্শেদের হাত ছেড়ে দূরে তাকান। অলন্দপুরের বাজারটা ছোট পিঁপড়ার মতো দেখাচ্ছে। নৌকাটা বার বার দুলছে। চারিদিকে ঝড় বইছে। মনেও তো বইছে। তিনি নিজেকে শান্ত করতে চোখ বুজে বার কয়েক প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেন। ব্যাথাতুর মন আর্তনাদ করে শুধু জানতে চাইল,আমার মেয়েগুলো কেমন আছে?

রীনা চুল এতো শক্ত করে ধরেছে যে পদ্মজার সারা শরীর ব্যথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা আকুতি করেও ছাড়া পাচ্ছে না। পূর্ণা, প্রেমা খামচে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। কিছুতেই তারা বোনকে ছাড়বে না।

আমির ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কামরুল চাচা এটা ঠিক হচ্ছে না! মেয়েগুলোর অভিশাপে পুড়ে যাবেন।'

আমিরের উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রমিজ আলী কামরুলের নরম, নিঃশব্দ, ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'বেশ্যাদের শাপে কেউ পুড়ে না।'

জলিল প্রেমাকে সরিয়ে নিয়েছে। প্রেমার কান্না শোনা যাচ্ছে। বড় আপা,বড় আপা করে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। ছইদ অনেক টেনেও পূর্ণাকে সরাতে পারল না, তাই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পূর্ণার বুকে নোংরা হাতের দাগ বসিয়ে দিল। পূর্ণা এমন ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কোনো মেয়েই এমন নীচু ঘটনার সাক্ষী হতে চায় না। অকস্মাৎ এই ঘটনা কাটিয়ে উঠার পূর্বেই একটা শক্ত হাত পায়জামার ফিতা টেনে ধরল। পূর্ণার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আপা...আপা।'

পূর্ণার আর্তনাদ পদ্মজার মস্তিষ্ক প্রখর করে তুলল। পদ্মজা মুখ তুলে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে পূর্ণা। পদ্মজার এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। কাছে আসতে পারছে না ছইদের জন্য। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। চারিদিকে কোলাহল। গালি দিচ্ছে মা বাপ তুলে। কেউ বলছে না, মেয়েটা ভালো।

এরকম করতেই পারে না। পূর্ণা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কেঁদে মাকে ডাকছে। পদ্মজা এক দৃষ্টে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষ এরকম কেন হয়?

পূর্ণার হাত ছইদ আলগা করতেই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পদ্মজাকে। তার পুরো শরীর কাঁপছে। হৃৎপিণ্ড এতো জোরে চলছে যে অনুভব করা যাচ্ছে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপা...আপা...কেন মেয়ে হলাম আপা? এত কষ্ট হচ্ছে আপা। আপা..."

পদ্মজার দু'চোখ বেয়ে টুপ করে দু'ফোটা জল পড়ে। এক হাতে শক্ত করে পূর্ণাকে বুকের সাথে চেপে ধরল। রমিজের উস্কানিতে কামরুল গলা উঁচিয়ে বলল, 'নটিরে বাঁন ছইদ।'

পূর্ণার কানে কথাটা আসতেই সে আরো জোরে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা ঠান্ডা স্বরে বলল, 'পূর্ণা ছেড়ে দে আমায়।'

রীনা পদ্মজাকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও পদ্মজা জায়গা থেকে এক চুলও নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পূর্ণাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বেঁচে থাকলে সব উসুল হবে। ছেড়ে দে।'

পদ্মজার কণ্ঠে কী যেন ছিল। পূর্ণা সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেল। চোখ তুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজার গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।ছইদ পূর্ণাকে নিতে আসলে পদ্মজা একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। ছইদের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। ছইদ মাগো বলে কুঁকিয়ে উঠল। জলিলসহ উপস্থিত তিন জন তেড়ে আসল পদ্মজার দিকে। পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে কেউ পদ্মজাকে থাপ্পড় দিল, কেউ বা দিল লাথি। দু'তিনজন গ্রামবাসীর মনে মায়া উদয় হলো। ছুটে আসল পদ্মজাকে বাঁচাতে। প্রান্ত ভয়ে চুপসে গিয়েছিল। পদ্মজাকে কাঁদায় ফেলে মারতে দেখে দৌড়ে আসে, জলিলের হাতে শরীরের সব শক্তি দিয়ে কামড় দিল। জলিল প্রান্তের কান বরাবর থাপ্পড় বসাতেই প্রান্তের মাথা ভনভন করে উঠল। পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে দেখে কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। মনে মনে বেশ ভয় পান। কেশে গলা পরিষ্কার করে, দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমরা থামো,এইডা কি করতাছো? থামো, কইতাছি। সবাই সইরা আসো। থামো...!"

সবকিছু থেমে গেল। পদ্মজা কাচুমাচু হয়ে পড়ে রইল কাঁদায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নাভির নিচে একটা লাথি পড়েছে বেশ জোরে। চোখ বুজে রেখেছে। দু'হাত বুকের উপর। লম্বা চুল কাঁদায় মেখে ছড়িয়ে আছে আশেপাশে। যন্ত্রনায় যেন পাঁজরগুলো মড়মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। পূর্ণা জ্বরের তোপে জ্ঞান হারিয়েছে। হেমলতার মা মনজুরা বাড়িতে ঢুকে পদ্মজাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠলেন। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে তুলতে চাইলে কামরুল হুংকার ছাড়েন, 'এই ছেড়িরে ধরন যাইব না। যান এন থাইকা।'

মনজুরা পদ্মজার কামিজ ঠিক করে দিলেন। এরপর দুজন লোককে নিয়ে পূর্ণাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। মনজুরার বুক কাঁপছে হেমলতার ভয়ে। হেমলতা বার বার বলেছিল, দুই দিন তার মেয়েদের চোখের আড়াল না করতে! আর তিনি একা বাড়িতেই ছেড়ে দিয়েছেন! ইচ্ছে হচ্ছে এক ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে। হিমেল নাক টেনে টেনে কাঁদছে। জপ করছে হেমলতার নাম। মনজুরা রেগে ধমক দেন, 'আহ! থাম তো।'

বাপের বাড়িতে কাউকে না পেয়ে হেমলতা চিন্তায় পড়েন। মোর্শেদ বললেন, 'আমরার বাড়িত গিয়া বইয়া রইছে মনে হয়। আও বাড়িত যাই।'

হেমলতা মিনমিনে গলায় বলেন, 'তাই হবে।'

দুজন হেঁটে বাড়ির রাস্তায় উঠে। তখন পাশ কেটে একজন মহিলা হেঁটে যায়। কিছুটা হাঁটার পর মোর্শেদের খটকা লাগল। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মহিলাটি অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছে। মহিলার অবয়ব দেখে মোর্শেদের বাসন্তীর কথা মনে হলো। মনে মনে আওড়ান, 'বাসন্তী আইছে?'

পরপরই নিজের মনকে বুঝ দেন, 'না,না হে আইব কেমনে। আর আইলেও যাইব গা ক্যান?'

তিনি আর মাথা ঘামালেন না। হেমলতার বুক দুরুদুরু করছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। তবুও তিনি ঘামছেন অজানা আশঙ্কায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি দেখতে পেলেন,মাতব্বরকে। মাতব্বরের সাথে আরো দুজন ব্যক্তি। এছাড়া বাড়ির সামনে মানুষের ভীরও দেখা যাচ্ছে। হেমলতার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু একটা ছুটে গেল। তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুটতে থাকেন। পিছলা খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। হেমলতার দৌড় দেখে মোর্শেদ অবাক হোন। প্রশ্ন করেন, 'তুমি দৌড়তাছো ক্যান?'

মলতা প্রশ্নটি শুনলেন না। নিকাব বাতাসের দমকে উড়ে পড়ল দূরে। তিনি ভীর ঠেলে বাড়িতে ঢুকেন। কোলাহল বেড়ে গেল। এতো ভীড়ের মাঝে একটা মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হোন। অন্ধকারে মেয়েটিকে চিনতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তিনি আঙ্গুল তুলে বিড়বিড় করেন, 'মেয়েটা কে?'

হেমলতার প্রশ্ন কারো কান অবধি গেল না। কোথা থেকে একটি আলো এসে পড়ে পদ্মজার উপর। সাথে সাথে হেমলতার চক্ষুদ্বয়ের সামনে পদ্মজার কাঁদারক্তে মাখা মুখ ভেসে উঠল। হেমলতা গগণ কাঁপিয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, 'পদ্মজারে...."

পদ্মজার বুক ধড়াস করে উঠল! অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। আম্মা এসেছে! তার পৃথিবী! তার শক্তি! পদ্মজা দূর্বল দুই হাতে ভর রেখে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। ভাঙ্গা গলার জোর দিয়ে শুধু ডাকল, 'আম্মা...আম্মা।"

হেমলতার পৃথিবী থমকে গিয়েছে। বিধ্বস্ত, পর্দাহীন,কাঁদা,রক্তমাখা পদ্মজাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা তার মেয়ে। তিনি দ্রুত নিজের বোরখা খুলে পদ্মজাকে ঢেকে, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। অসহনীয় যন্ত্রনায় যেন কলিজা বেরিয়ে আসছে তার। তার সোনার কন্যার এ কী রূপ! কে করলো? কাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'পদ্ম...আমার পদ্ম।"

হেমলতার বুকে মাথা রেখে পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, 'আম্মা... আম্মা।'

হেমলতা পদ্মজাকে আরো জোরে চেপে ধরেন বুকের সাথে। দৃষ্টি অস্থির। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে।

মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকে উঁচু গলায় বলেন, 'এইহানে এতো মানুষ ক্যান? মাতব্বর মিয়া আপনে এইনে ক্যান? কী অইছে?'

প্রান্ত,প্রেমা দৌড়ে এসে মোর্শেদকে জড়িয়ে ধরল। দুজন ভয়ে কাঁদছে,কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। মোর্শেদ বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাতব্বর মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে কামরুলকে প্রশ্ন করেন, 'মেয়েটার এই অবস্থা কারা করেছে? এটা কী নিয়মের মধ্যে পড়ে?'

কামরুল মাথা নিচু করে রেখেছেন। মিনমিনে গলায় বলেন, 'আমি ছেড়িডারে মারতে কই নাই। জলিল, ছইদ, আর মজনুর ছেড়ায় নিজ ইচ্ছায় মারছে।'

'আপনি আটকালেন না?'

'আটকাইছি বইললাই মাইয়াডা বাঁইচা আছে। আর এমন নটিদের বাঁচার অধিকার নাই।'

'থামেন মিয়া! কার কী শাস্তি হবে সেটা আমার দায়িত্ব। আপনার না। ছইদ, জলিল আর মজনুর ছেলেকে তো দেখা যাচ্ছে না। আগামীকাল তাদের আমি মাঠে দেখতে চাই।'

কামরুল মাথা নিচু করে রাখলেন। মজিদ হাওলাদার ভারি সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ। গ্রামের মানুষদের দুই হাতে আগলে রেখেছেন। পুরো অলন্দপুরের মানুষ মজিদকে ফেরেশতা সমতুল্য ভাবে। পঁচিশ বছর ধরে অলন্দপুর সামলাচ্ছেন তিনি।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। হেমলতা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছেন না। অনেক বছর আগের ঘটনা আর এই ঘটনা হুবুহু একরকম কী করে হলো? তিনি নিজের ভেতর একটা হিংস্র পশুর উপস্থিতি অনুভব করছেন। কামরুলের মুখ থেকে শোনা তিনটা নাম মস্তিষ্কে নাড়া দিচ্ছে প্রচন্ডভাবে! ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলে!

মজিদ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আগামীকাল সবাই স্কুল মাঠে চলে আসবেন।

মিয়া মোর্শেদ মেয়ে নিয়ে আলো ফুটতেই চলে আসবেন। এই বাড়ি পাহারায় থাকবে মদন আর আলী। আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে সেও উপস্থিত থাকবে।’

পর্ব ১৮

ভীর কমতেই কানে তালা লাগা প্রচন্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। হেমলতা একা পদ্মজাকে তুলতে গিয়ে হিমশিম খান। মোর্শেদ এগিয়ে আসেন। দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেন পদ্মজাকে। বিজলি চমকাল। বিজলির আলোয় পদ্মজার মুখটা দেখে মোর্শেদের বুক কেমন করে উঠল! কষ্টে বুক চুরমার হয়ে গেল। জন্মের দিন পদ্মজাকে কোলে নেয়ার পর যে অনুভূতিটুকু হয়েছিল ঠিক সেরকম একটা অনুভূতি হয়। অনুভূতিটুকুর নাম বোধহয় পিতৃত্ব! প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে। তারা ঘরে ঢুকতেই ভারী বর্ষণ শুরু হলো। মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব দেখা দিল! তবে সেই তাণ্ডব ছুঁতে পারল না মোড়ল বাড়ির মানুষদের মন। ঝড়ের তান্ডবের চেয়েও বড় তান্ডবের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে তারা। হেমলতা গরম পানি করে পদ্মজাকে গোসল করালেন। জামাকাপড় পাল্টে দিলেন। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে নীরবে কেঁদে গেল। চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না কিছুতেই। ইচ্ছে হচ্ছে বাড়ির পিছনের সবচেয়ে বড় আম গাছটার সাথে ফাঁস লেগে মরে যেতে। মন দূর্বলতার শূন্য ছুঁই ছুঁই। হেমলতা পদ্মজার চুল মুছে কপালে চুমু দিলেন। পদ্মজার নাকে এক ফোঁটা জল পড়ল। পদ্মজা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল।

'আম্মা আসছে? আমার আম্মা কই? আম্মা আসে নাই?'

পাশের ঘর থেকে পূর্ণার চিৎকার ভেসে আসল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে পূর্ণা ছুটে এলো। হেমলতাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমলতার বুকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পূর্ণার শরীর আগ্নেয়গিরি মনে হচ্ছে। এতো গরম! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজাও ডুকরে কেঁদে উঠল। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে দুই মেয়ের কান্না শুনলেন। সামলানোর চেষ্টা করলেন না। মনজুরা দরজার সামনে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। টিনের চালে ভারী বর্ষণের শব্দ। জগৎসংসার সেই শব্দে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝরাত। বাতাসের বেগ প্রচন্ড। হেমলতা কালো রংয়ের শাড়ি পরে, একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান। মনজুরা বারান্দার ঘর থেকে উঁচু কণ্ঠে বলেন, 'রাম দা ব্যাগে ক্যান ঢুকাইছস? আর কোন কেলাঙ্কারি বাকি?'

হেমলতা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়ালেন। পলকমাত্র মনজুরার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে,নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বর্ষণ মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনজুরা শুষ্ক হয়ে উঠলেন। ছুটে পদ্মজার ঘরে গেলেন। পদ্মজা চুপচাপ শুয়ে আছে। মৃদু ফোঁপানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ণা ঘুমাচ্ছে। তিনি এ ঘর ছেড়ে দ্রুত বারান্দার ঘরে আসলেন। বড্ড অস্থির লাগছে। জীবনে প্রথম হেমলতার জীবন ভিক্ষা চেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন!

ফজরের আযান শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। সবকিছু শান্ত। পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসল। গেইটে শব্দ পেয়ে চমকে তাকাল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা ঢুকেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। মনজুরা পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পদ্মজা টের পেল না। হেমলতা বাড়িতে ঢুকে কাঁধের ব্যাগটা মুরগির খুপীর সামনে ছুঁড়ে ফেলেন। অন্ধকারের জন্য মুখ স্পষ্ট নয়। হেমলতা বাড়ির পিছনের দিকে চলে গেলেন। পদ্মজার বুক দুরুদুরু করছে। সে ধীর পায়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। পিছনে মনজুরা। পায়ের শব্দে চমকে তাকাল পদ্মজা, দেখতে পেল মনজুরাকে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'নানু,আম্মা কোথায় গিয়েছিল?'

মনজুরা ক্ষণকাল নীরব থেকে এরপর বললেন, 'জানি না।'

মনজুরার কণ্ঠে ভয়। পদ্মজা দূর্বল শরীর ঠেলে নিয়ে আসল বাড়ির পিছন। দেখতে পেল,হেমলতা নদীতে নেমে গোসল করছেন। এক নিঃশ্বাসে কয়েকটা ডুব দিলেন। পদ্মজা ব্যস্ত পায়ে ঘাটের কাছে এলো। ক্ষীণ স্বরে ডাকল, 'আম্মা।'

হেমলতা ঘুরে তাকালেন। ঝড় শেষে আকাশ ধবধবে সাদা । অন্ধকার কাটার পথে।

পদ্মজা বলল, 'ঠান্ডা লাগবে।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। গোসল শেষ করে উঠে আসেন উপরে। পদ্মজা আর কিছু বলল না। হেমলতা উঠানে এসে মনজুরাকে বললেন, 'পূর্ণারে নিয়ে আসো আম্মা।'

পদ্মজা অবাক হয়ে শুধু দেখছে। পূর্ণা আসে ধীর পায়ে হেঁটে। তার জ্বর অনেকটা কমে এসেছে। মনজুরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হেমলতা মৃদু হেসে পূর্ণাকে বললেন, 'পদ্মজা পাশে এসে দাঁড়া।'

পূর্ণা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে বাধ্যের মতো পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। হেমলতা মুরগির খুপীর পাশ থেকে কালো ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে একটা রাম দা আর একটা কৌটা বের করলেন। পূর্ণা রাম দা দেখে চমকে উঠল। দু'বোন চাওয়াচাওয়ি করল একবার। হেমলতা রক্তেমাখা রাম দা দুই মেয়ের পায়ের সামনে রাখলেন। শীতল কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর পৃথিবীতে সেরা মানুষগুলোরই বাঁচার অধিকার আছে। মানুষরূপী পশুদের না। যখন যেখানে কোনো মেয়েকে অসম্মান হতে দেখবি এক কোপ দিয়ে অমানুষটার আত্মা দেহ থেকে আলাদা করে দিবি। যে তোকে অসম্মান করেছে সে দোষী, তুই না। তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ, তোর না। তাই আত্মহত্যার কথা কখনো ভাববি না। দোষীর আত্মা হত্যা করা উচিৎ। আর আমি মনে করি, এতে পাপ নেই। বরং পাপীকে বিনাশ না করা পাপ। আর আমার মেয়েরা যেন সেই পাপ কখনো না করে। সেই...."

'মেয়েদের এসব কি শিক্ষা দিতাছস তুই? মাথা খারাপ হইয়া গেছে তোর?'

মনজুরা হইহই করে উঠলেন। হেমলতা ঢোক গিলে মনজুরার কথা হজম করে নিলেন। এরপর আবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কখনো ছেলে চাইনি। মেয়ে চেয়েছি। প্রতিবাদী, দুঃসাহসীক মেয়ে চেয়েছি। আল্লাহ আমাকে তিনটা মেয়ে দিয়েছেন।

এখন সেই মেয়েরা যদি এইটুকুতে দূর্বল হয়ে পড়ে কীভাবে হবে? ঠিক আগের মতোই মাথা উঁচু করে বাঁচবি। যতদিন আমি আছি কেউ তোদের অসম্মান করে টিকতে পারবে না। আমি না হয় যতদিন বেঁচে থাকি তাদের শাস্তি দেব। পৃথিবী থেকে মুছে দেব। কিন্তু যখন থাকব না? তখন,তখন কী তারা বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকতে দেয়া ঠিক হবে? অন্য কোনো মেয়ের সাথে নোংরামো করবে না তার নিশ্চয়তা আছে? নেই। এখন থেকে নিজেদের শক্ত কর। মেয়েদের সাহস মেয়েদরই হতে হয়। নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের। রাতের স্মৃতি দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে বলব না। মনে রাখ। প্রতিটি মানুষের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তি আছে। সবাই প্রকাশ করতে জানে না। চিনতে পারে না নিজেকে। গত রাতের ঘটনাটা মনে রেখে নিজের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তিটাকে জাগিয়ে হাতের মুঠোয় রাখ। যাতে সঠিক সময়ে হাতের মুঠো খুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারিস। আঘাতে, আঘাতে চুরমার করে দিতে পারিস পাপের জগত।"

এইটুকু বলে হেমলতা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দপ করে বসে পড়েন। পদ্মজা'আম্মা'বলে হেমলতাকে ধরতে চাইলে, হেমলতা হাত উঠিয়ে বলেন, 'দাঁড়িয়ে থাক।'

হেমলতা সময় নিয়ে দম নেন। এরপর কৌটাটা খুলে ঠান্ডা তরল কিছু ঢেলে দেন দুই মেয়ের পায়ে। পূর্ণা কেঁপে উঠে দূরে সরে গেল। পদ্মজা আতঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা, কার রক্ত?'

রক্তের কথা শুনে ঘৃণা আর ভয়ে পূর্ণার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। মনে হচ্ছে,পায়ে পোকা কিলবিল করছে। টাটকা তাজা লাল রক্ত! বমি গলায় এসে আটকে গেছে। হেমলতা পদ্মজাকে জবাব দিলেন না। শুধু মৃদু হাসলেন। পূর্ণা এই ভয়ংকর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারাল। পদ্মজা দু'হাতে জাপটে ধরল পূর্ণাকে। কী আশ্চর্য, এই ভয়ংকর ঘটনা তাকে একটুও বিচলিত করল না! হেমলতার গায়ে ভেজা শাড়ি। তাই পূর্ণাকে ধরলেন না। মনজুরাকে বললেন, 'পূর্ণারে ঘরে নিয়ে যাও, আম্মা।'

মনজুরা কঠোর চোখে তাকান হেমলতার দিকে। হেমলতা আবারো হাসেন। ভেজা

কণ্ঠে বলেন, 'কালো বলে অবহেলা না করে বুকে আগলে রাখলে আমার জীবনটা, আমার মেয়েদের জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো আম্মা।"

হেমলতার কথায় মনজুরার সারামুখ বিষণ্ণতা ছেয়ে গেল। তিনি হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। অপরাধবোধে মাথা নুইয়ে ফেললেন। পূর্ণাকে ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে। হেমলতা সেখানেই পড়ে রইলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। আলো ফুটেছে পুরোপুরি। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। পানি দিয়ে উঠানের রক্ত মুছে দিলেন চিরতরে। রাম দা ধুয়ে লুকিয়ে রাখলেন লাহাড়ি ঘরে। শাড়ি পাল্টে উঠানে পা রাখেন। তখন মগা আসল। এসে খবর দিল, বিচার বসবে দুপুরে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি উড়ে গেছে। পশুপাখি সহ বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে। অনেক মানুষ আহত হয়েছে! এই খবর শুনে হেমলতার চোখ সজল হয়ে উঠল। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। প্রকৃতি কখনো কাউকে ছাড়ে না! গ্রামবাসী অন্যায় দেখেও নিস্তব্ধ থেকেছিল। এ বুঝি তারই শাস্তি!

মাথার উপর সূর্য। প্রচন্ড তাপদাহ । পূর্ণা,পদ্মজা, হেমলতা কালো বোরখার আবরণে নিজেদের ঢেকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে অলন্দপুরের মাধ্যমিক স্কুলের উদ্দেশ্যে। খাঁ খাঁ রোদ্দুর, তপ্ত বাতাসের আগুনের হলকা । সবুজ পাতা নেতিয়ে পড়ার দৃশ্য পড়ছে চোখে। মোর্শেদ বাকিদের নিয়ে আসছে। রীনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে করুণ কান্নার স্বর ভেসে আসে। পদ্মজা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল,রীনার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙ্গে উঠানে পড়ে আছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যান।

বটের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিল এক রাখাল ছেলে। সে হেমলতার মুখ দেখে বুঝল, পিছনের দুটি মেয়ে পদ্মজা আর পূর্ণা। ছুটে আসল। পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পদ্ম আপা তুমি ডরাইও না। তোমার কিচ্ছু হইব না।'

চারদিকে নিঝুম , নিস্তব্ধ,ঝিমধরা প্রকৃতি । ঘামে দরদর তৃষ্ণার্ত রাখাল। হাঁপিয়ে কথা বলছে। স্কুলে যাওয়ার পথে, মাঝে মাঝেই এই পনেরো বছর রাখালের সাথে দেখা হতো পদ্মজার। পদ্মজার জন্য পাগল সে। বড় বোনের মতো মান্য করে। পদ্মজা মৃদু করে হাসল। পদ্মজার মুখের উপর পাতলা পর্দা বলে, রাখালের চোখে তা পড়ল না। রাখালকে পিছনে ফেলে তিন মা মেয়ে এগিয়ে চলল।

স্কুল মাঠে অনেক মানুষ জমেছে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অলন্দপুরের বেশি অর্ধেক মানুষ আসেনি। তবুও প্রায় পাঁচ'শ মানুষ তো এসেছেই! ঘটনা ঘটেছে আটপাড়ায় আর তা ছড়িয়ে পড়েছে সব পাড়ায়! যথাসময়ে বিচার কার্য শুরু হলো। পদ্মজা এবং আমির দুজন দু'দিকে দাঁড়ানো। মাতব্বর ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এদের একসাথে কারা দেখেছেন?'

রমিজ আলী,কামরুল, মালেক হাত তুলল। মজিদ মাতব্বর বললেন, 'কী দেখেছেন? ব্যাখ্যা করুন।'

রমিজ আগে আগে উঁচু কণ্ঠে বলল, 'আমি দেখছি ঝড়ের সন্ধ্যায় আপনের পোলারে পদ্মজার ঘর থেকে বাইর হইতে। বাড়িত আর কেউ আছিলো না।'

আমির রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল, মজিদ মাতব্বর হাতের ইশারায় আটকে দিলেন। আমির বাপের বাধ্য সন্তান, তাই থেমে গেল। মজিদ মাতব্বর বললেন, 'আপনি আমিরকে পদ্মজার ঘর থেকেই বের হতে দেখেছেন?'

রমিজ আলী দৃষ্টি অস্থির রেখে আমতা আমতা শুরু করলেন। দম নিয়ে বললেন, 'তারে বারান্দা থাইকা বাইর হইতে দেখছি।'

মজিদ মাতব্বর নীরব থেকে এরপর বললেন, 'তাহলে কোন আন্দাজে আপনি বলছেন,তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল?'

পদ্মজার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। সে চোখ বুজে ফেলল। রমিজ আলী থমকে গিয়ে

পরপরই হুংকার দিয়ে উঠেন, 'একটা অচেনা ছেড়া খালি বাড়িত কোনো ছেড়ির কাছে কেন যাইব? আপনার নিজের ছেড়া বলে,তার দোষ ঢাকতে পারেন না। আমার ছেড়ির বেলা কিন্তু ছাড়েন নাই।'

'যুক্তি দিয়ে কথা বলুন। আপনার মেয়েকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। তার গায়ে কাপড় ছিল না। তারা একসাথে একই ঘরের একই বিছানায় ধরা পড়েছে। আমির আর পদ্মজার বেলা সেটা হয়নি।'

মজিদ মাতব্বরের ক্ষমতা এবং কথার দাপটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে রমিজ আলীর। কামরুল চুপসে গিয়েছেন। সামনে নির্বাচন। মজিদ মাতব্বরকে ক্ষেপানো মানে নিজের কপালে দুঃখ বয়ে আনা। ভীরের মাঝ থেকে কেউ একজন বলল, 'তাহলে আপনার ছেলে একটা মেয়ের কাছে খালি বাড়িতে গেল কেন?'

মজিদ মাতব্বর উঁকি দিয়ে প্রশ্নদাতাকে খুঁজে বের করলেন। তারই প্রতিপক্ষ হারুন রশীদ! মজিদ মাতব্বর আমিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কেন গিয়েছিলে পদ্মজার বাড়িতে?'

আমির সহজ গলায় বলল, 'বাড়ি ফিরছিলাম হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। সামনে মোর্শেদ কাকার বাড়ি ছিল। মোর্শেদ কাকা বাড়ি নাই জানতাম না। জানলে,বৃষ্টিতে ভিজতাম। তবুও ওই বাড়ি যেতাম না। এই গ্রামের অনেকেই জানে আমার শ্বাসকষ্ট আছে। বাড়ির সবাই জানে,বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে। শ্বাসকষ্ট হয়।'

হারুন রশীদ বললেন, 'যখন দেখলা ছেড়িডা বাড়িত একলা তখন বাইর হইয়া গেলা না ক্যান?'

আমির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আমার মাথায় আসেনি এমন কিছু হতে পারে। আর... "

আমির পদ্মজার দিকে একবার তাকাল। পদ্মজা সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল। আমির বলল, 'আর...পদ্মজা কতটা সুন্দর যারা দেখেছে সবাই জানে। আমি প্রথম দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। তাই মস্তিষ্কে একবারো কোনো বিপদের আশঙ্কা আসেনি।'

মজিদ মাতব্বর ছেলের শেষ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। তবুও স্বাভাবিক থেকেই বললেন, 'গ্রামবাসী কোনো প্রমাণ ছাড়াই লাফিয়েছে। মেয়েটাকে অপদস্থ করেছে। প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে নোংরামো অপবাদ দেয়া অপরাধ।'

মজিদ মাতব্বর কামরুলের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ছইদ,মজনুর ছেলে আরেকটা কে জানি? কোথায় তারা?'

কামরুল ধীরভাবে বলল, 'পাই নাই খোঁজে। মনে হয়, ভয়ে কোনহানো লুকাইছে।'

রমিজ আলী হঠাৎ গমগম করে উঠলেন, 'এইডা আমি মানি না। তারারে আপনে ছাইড়া দিতে পারেন না। আপনের ক্ষমতা বেশি দেইখা আপনে এমনে নিজের ছেড়ারে ঢাইকা রাখতে পারেন না। ধূর্তবাজ লোক।'

আমির রেগেমেগে রমিজ আলীকে ধরতে এলে, মজিদ গর্জন করে উঠলেন, 'আমির!'

আমির কিড়মিড় করে রাগ হজম করার চেষ্টা করল। হারুন অতিশয় ধূর্ত লোক। তিনি রসিকতা করে বললেন, 'সত্য হউক আর মিথ্যাই। বদনাম তো বদনামই।'

মজিদ সবার প্রশ্ন কথা উপেক্ষা করে উপস্থিত গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনাদের আমার বিচারের প্রতি বিশ্বাস আছে?'

সবাই আওয়াজ করে বলল, 'আছে।'

মজিদ মাতব্বর তৃপ্তির সাথে হাসলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কণ্ঠ উঁচু করে বললেন, 'মোর্শেদের মেয়েদের সাথে খারাপ হয়েছে। পদ্মজার নামে অনেক প্রশংসা শুনেছি। সে খুবই ভাল মেয়ে। আর আমার ছেলেকেও সবাই চিনেন, সে কেমন। যারা যারা দোষ করেছে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া হবে। পদ্মজা আর আমির নামে যে পাপের অভিযোগ করা হয়েছে তার যুক্তিগত প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া আমি কখনো কাউকে

শাস্তি দেইনি। আজও দেব না। তবে আমি আজ সবার সামনে মোর্শেদ আর তার স্ত্রীর কাছে একটা প্রস্তাব রাখব।'

হেমলতা, মোর্শেদ সহ উপস্থিত সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকাল। মজিদ মাতব্বর বললেন, 'পদ্মজাকে আমিরের বউ করে নিয়ে যেতে চাই।'

চারিদিকে কোলাহল বেড়ে গেল। সব কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবটি পদ্মজার কানে বাজতে থাকল। জীবনের কোন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে?

পর্ব ১৯

সূর্যের প্রখর তাপে সমস্ত প্রকৃতি যেন নির্জীব হয়ে ওঠেছে। উপস্থিত সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। রমিজ আলি,হারুন রশীদ নামক ধূর্ত মানুষগুলোর চোখ ছানাবড়া। মজিদ মাতব্বর ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনারা চাইলে সময় নিতে পারেন। আজ এখানে...'

হেমলতা কথার মাঝে আটকে দিয়ে বললেন, 'আপনি বিয়ের তারিখ ঠিক করুন।'

মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবের চেয়ে এই প্রস্তাবে হেমলতার রাজি হওয়াটা যেন কোলাহল মুহূর্তে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। পদ্মজা হতবাক, বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! মোর্শেদ চোখ বড় করে হেমলতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আশপাশ থেকে ফিসফিসানি ভেসে আসছে। মজিদ মাতব্বর মৃদু হাসলেন। এরপর আনন্দসহিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন, 'আগামী শুক্রবার আমার ছেলের সাথে মোর্শেদের বড় মেয়ের বিবাহ। আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল।'

কথা শেষ করে হেমলতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'দিন তারিখ ঠিক আছে?'

হেমলতা সম্মতি জানালেন। মোর্শেদ অবাকের চরম পর্যায়ে। কোনো কথা আসছে না মুখে। পদ্মজা ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করে নিল। মুহিবের সাথে যখন তার বিয়ের আলোচনা হলো তখন সে ভারি অবাক হয়েছিল। লিখন শাহ নামে একটা মানুষকে মনে পড়েছিল। এখন তেমন কিছুই হচ্ছে না। অনুভূতিগুলো ভোঁতা। যা হওয়ার হবে। সেসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বিচার সভা ভেঙ্গে গেল। মজিদ মাতব্বর আলাদা করে মোর্শেদের সাথে কথা বলেন। তিনি আগামীকাল নিজ স্ত্রী এবং বাড়ির অন্যান্য বউদের নিয়ে পদ্মজাকে দেখতে আসবেন। মোর্শেদ, হেমলতা সমস্বরে অনুমতি দিলেন। বাড়ি ফেরার পথে অনেকের কটু কথা কানে আসে। পদ্মজা, আমির দুজনেরই চরিত্র খারাপ। এজন্যই বিয়ে হচ্ছে। মাতব্বর ক্ষমতাবান বলে,পুরো ব্যাপারটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু,তলে তলে তো নিজেরা জানে তাদের ছেলেমেয়ে কেমন। তাই তাড়াতাড়ি করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন খুব বিশ্রীভাবে পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কে জানে, মনে কয়তো ছেড়ি পেট বাঁধাইছে। রাইতে বাপ মারে দিয়া পায়ে ধরাইয়া বিয়া ঠিক করছে।'

পদ্মজার মন তিক্ত হয়ে উঠে। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এতো নোংরা মন্তব্য সহ্য করা খুব কঠিন। মিথ্যে অপবাদ চারিদিকে। বোরখার আড়ালে পদ্মজার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল। খুব কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। হেমলতা পদ্মজার একহাত শক্ত করে চেপে ধরেন। মানুষদের ছায়া ছেড়ে ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে তিনি বললেন, 'জীবন খুব ছোট। এই ছোট জীবনে ঘটে অনেক ঘটনা। যে ভাল তার সাথে যে শুধুই ভালই হবে তা কিন্তু ঠিক না, উচিতও না। ভাল খারাপে মিলিয়েই জীবন। তাই বলে,সেই খারাপকে পাত্তা দিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে তার কোনো মানে নেই। খারাপটাকে পাশে রেখে ভাল মুহূর্ত তৈরি করার চেষ্টা করবি। ভালটা ভাববি। শুধুমাত্র কয়জনের কথায় কী আসে যায়? পুরো গ্রামবাসী জানে,তুই কেমন। পুরো অলন্দপুরের যত মানুষ আজ এসেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই মনে মনে তোর গুণগান গেয়েছে। তারা মনে মনে বিশ্বাস করে তুই নির্দোষ। কিন্তু চুপ ছিল। যারা খারাপের দলে তারা সংখ্যায় কম বলে কোলাহল করে নিজেদের দাপট দেখাতে চেয়েছিল। সবার অগোচরে বোঝাতে চেয়েছিল,আমরা অনেকজন। কিন্তু পারেনি। কোলাহল কোনো কিছুর সমাধান নয়। এখন যারা নিন্দা করলো তারা নিজেদের নীচু মনের পরিচয় দিয়েছে, সেই সাথে আমলনামায় পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। তাদের শাস্তি পৃথিবী এবং আখিরাত দুটোতেই হবে। একদিন এদের শাস্তি হবেই,এই কথাটা ভেবে খুশি হ। সব ভুলে যা। বাকি জীবন পড়ে রয়েছে। সেসব নিয়ে ভাব। চোখের জল অতি আপনজন এবং আল্লাহর জন্য ফেলা উচিত। এদের মতো কু-মানুষের জন্য না।'

পদ্মজা হুহু করে কেঁদে উঠল। আচমকা হেমলতাকে মাঝপথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে,কান্নামাখা কণ্ঠে বলল, 'তুমি জাদুকর আম্মা। তুমি জাদু জানো।'

হেমলতা পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। মোর্শেদ পদ্মজাকে কান্না থামাতে বলতে চাইলে,হেমলতা ইশারায় চুপ করিয়ে দেন। পাশেই বিস্তীর্ন ক্ষেত। গ্রীষ্মের দুপুরের রূপ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মোর্শেদের কপাল বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে। তার দৃষ্টি থমকে আছে হেমলতার দিকে। একটা অপ্রিয় সত্য সম্ভাবনার কথা মনে হতেই চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তিনি দ্রুত চোখ সরিয়ে, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলেন। জীবনের লীলাখেলায় তিনি নিঃস্ব। পদ্মজার কান্না থামার লক্ষণ নেই। হেমলতা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সহিত বললেন, 'এতো কাঁদলে কিন্তু মারব।'

আকাশ জুড়ে তারার মেলা। জানালা গলে চাঁদের আলো পদ্মজার মুখশ্রী ছুঁয়ে দিচ্ছে। সে বারান্দার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বুকটা কেমন করছে। অনবরত কাঁপছে। হেমলতার উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত উঠে বসল। হেমলতা পদ্মজার দিকে মুহূর্ত কাল তাকিয়ে রইলেন। পদ্মজা নখ খুঁটছে। হেমলতা বললেন, 'ঘুম আসছে না?'

পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়াল। হেমলতা আর কিছু বললেন না। পদ্মজা পিনপতন নীরবতা কাটিয়ে বলল, 'মেজো আপার বিয়ের তারিখ পড়ছে?'

হেমলতা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। বিছানার উপর বসে পদ্মজাকে টেনে কোলে শুতে ইশারা করেন। পদ্মজা শুয়ে পড়ল। মায়ের কোলটা তার এখন ভীষণ দরকার ছিল। হেমলতা পদ্মজার প্রশ্ন এড়িয়ে অন্য কথা তুললেন। বললেন, 'আমি জানি না কোনো মা তার মেয়ের কাছে নিজের বিয়ে সম্পর্কিত আলোচনা করেছে নাকি। কিন্তু আমি আমার বিয়ের গল্প তোকে বলতে চাই। শুনবি?'

পদ্মজা সায় দিল। হেমলতা পদ্মজাকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার জন্য অতীতে নিয়ে যান, 'সেদিন রাতে আব্বা এসে বলল, তিনদিন পর আমার বিয়ে। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কষ্ট হয়েছিল। আমি আরো পড়তে চেয়েছিলাম। এরপর শুনলাম, যার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে তার পড়াশোনা নেই। জ্ঞানও যথেষ্ট কম। রাগচটা লোক। এসব তথ্য জেনে রাগ,মন খারাপ কিছুই হয়নি। ভয় হয়। না জানি কেমন যাবে সংসার! বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। তোর আব্বাকে তখনো আমি দেখিনি। বিয়ের দিন আয়নায় প্রথম দেখি। কালো একটা মুখ। চোখ দু'টি গভীর। কখনো না দেখা মানুষটাকে, প্রথম দেখেই মনে হয় আমার সবচেয়ে আপন একজন মানুষ। সব ভয় কেটে গেল। বিদায়ের সময় সবাই বলছিল,দুজনকে খুব মানিয়েছে। রাজযোটক। একজন হিন্দু দিদি বলেছিলেন,সাক্ষাৎ রাম সীতা। আটপাড়ায় যদি একজন ছয় ফুট লম্বার মানুষ থাকে তবে সেটা তোদের আব্বা ছিল। বিয়ের পর জানতে পারি,তোর আব্বাকে বিয়ে করার জন্য অনেক মেয়েই পাগল ছিল। নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী মনে হতো। অশিক্ষিত ভেবে নাক কুঁচকেছিলাম। সেই আমি তোর আব্বার জন্য দিনকে রাত, রাতকে দিন মানতে রাজি ছিলাম। এতোটাই ভালবাসা হয়ে গেছিল যে, তোর আব্বা ছুরি নিয়ে রক্তের আবদার করলে আমি আমার বুক পেতে দিতাম... ।"

পদ্মজা মাঝপথে আটকে দিয়ে বলল, 'তাও তো আব্বা তোমাকে ভালোবাসেনি আম্মা।'

হেমলতার হাসি উজ্জ্বল মুখটা নিভে গেল। অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। তিনি দৃষ্টি এলোমেলো রেখে বললেন, 'তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল।'

পদ্মজা চুপ করে রইল। হেমলতাও নিশ্চুপ। দরজার পাশে মোর্শেদ বসেছিলেন। বিড়ি ফুঁকছিলেন। হেমলতার প্রতিটি কথা বুড়ো হয়ে যাওয়া মনটাকে দুমড়ে, মুচড়ে দিল। তিনি বিড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান চৌরাস্তার উদ্দেশ্যে। চৌরাস্তার পাশে একটা বড় ব্রিজ আছে। ব্রিজে দখিনা হাওয়ার তীব্রতা খুব বেশি। সেখানেই এসে দাঁড়ান। ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর পদ্মজা বলল, 'আম্মা, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর প্রশ্ন করব না।

তবুও...'

'বলব একদিন।'

পদ্মজা আর জিজ্ঞাসা করল না,কোনদিন বলবে। নিশ্চুপতার অবস্থানে ফিরে গেল। মুহূর্ত কাল স্থির থেকে হেমলতা বললেন, 'পূর্ণা খুব কান্নাকাটি করে দেখলাম। মেয়েটা এতো দূর্বল কী করে হলো?'

পদ্মজা হেমলতার এক হাত মুঠোয় নিয়ে আশ্বস্ত করল, 'আমি আছি আম্মা। সামলে নেবো।'

'ঘরে যা। রাত হয়েছে অনেক।'

পদ্মজা উঠে বসল। ওড়নাটা ভাল করে টেনে নিয়ে,জুতা পরল। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। হেমলতা বিছানার শেষ অংশ থেকে বালিশ টেনে নেন। বালিশের নিচে দুটি কাগজ ভাঁজ করা ছিল। হেমলতা হাত বাড়িয়ে নেন। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলেন, 'পদ্মজা,এগুলো কী?'

হেমলতা ভাঁজ খুলেন। পদ্মজা ফিরে তাকায়। হেমলতার হাতে লিখনের চিঠি দুটি দেখে সর্বাঙ্গে বৈদ্যুতিক কিছু একটা ছড়িয়ে পড়ে,শরীর কাঁপিয়ে দিল। মাটি যেন দুই পা টেনে ধরল। হেমলতা প্রথম লাইন পড়ে বেশ অবাক হোন। পদ্মজার দিকে একবার চকিতে তাকান। এরপর এক নিঃশ্বাসে দুটো চিঠি পড়ে শেষ করেন। পড়া শেষে থম মেরে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ভয়ে পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেমলতা ধীর পায়ে হেঁটে আসেন পদ্মজার কাছে। দু ভ্রূ প্রসারিত করে, শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, 'এসব কবে হয়েছে? আমাকে জানাসনি কেন?'

পদ্মজা প্যাচপ্যাচ করে কেঁদে বলল, 'যখন উনারা শুটিং করতে আসেন।'পদ্মজার মনে হচ্ছে এখুনি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না। মনে মনে প্রার্থনা করছে,যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে সে। তাহলে এই লজ্জা থেকে বাঁচা যাবে। হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নেন। পদ্মজা অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। বার বার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরছে। পদ্মজা হেমলতাকে চুপ থাকতে দেখে বলল, 'তুমি যা বলবা তাই হবে আম্মা। আমার উপর রেগে যেও না।'

পর্ব ২০

আজ যেন শুধু মোড়ল বাড়ির মাথার উপরেই সূর্যটা উঠেছে। সকাল থেকে আত্মীয় আপ্যায়নের প্রস্তুতির তোড়জোড় চলছে। সবাই ঘেমে একাকার। বাড়ির প্রতিটি মানুষ ব্যস্ত। মোর্শেদ হিমেল ও প্রান্তকে নিয়ে বাজার করে ফিরেছেন সূর্য উঠার মাথায়। লাহাড়ি ঘরের পাশে বড় উনুন করা হয়েছে। সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ)সিদ্ধ চালের ভাত রান্না করা হয়েছে। ফিরনি, রাজ হাঁসের মাংস রান্না হচ্ছে। বাড়িজুড়ে রমরমা ব্যাপার। একদিন আগের ঘটনা ধামাচাপা পড়েছে ৯৫ ভাগ। ছোট ছোট দরিদ্র ছেলেমেয়েরা খাবারের ঘ্রাণ পেয়ে ছুটে এসেছে মোড়ল বাড়ি। সবার মধ্যেই নতুন উত্তেজনা,নতুন অনুভূতি। শুধু পূর্ণা এখনো সেদিনের ঘটনা থেকে বেরোতে পারছে না। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ঘরে। পদ্মজা মনজুরা আর শিউলির মাকে কাজে সাহায্য করছিল। হেমলতা ধমকে ঘরে পাঠিয়ে দেন। পদ্মজা ঘামে ভেজা কপাল মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করে। পূর্ণার দুচোখ জলে নদী! পদ্মজা বিছানার উপর পা তুলে বসল। পূর্ণা পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে, হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পদ্মজা কণ্ঠ খাঁদে নামিয়ে বলল, 'চোখের জল কী শেষ হয় না?'

পূর্ণা নিরুত্তর। পদ্মজা অভিজ্ঞ স্বরে বলল, 'দেখ পূর্ণা, এসব মনে রাখলে তোরই ক্ষতি। দেখছিস না,আমি একদিনের ব্যবধানে সব ভুলে হবু শ্বশুরবাড়ির মানুষদের জন্য রান্নাবান্না করছি। তুইও ভুলে যা। তোর বন্ধুরা আসছে। তুই নাকি তাদের ধমকে দিয়েছিস? এটা কিন্তু ঠিক না।'

পূর্ণা পদ্মজার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ভীষণ শীতল। পদ্মজাকে বলল, 'সত্যি ভুলতে পেরেছো আপা?'

পদ্মজা সঙ্গে,সঙ্গে উত্তর দিল, 'ভুলিনি। কিন্তু সহ্য করতে পেরেছি। তোর মতো চোখের জল অপাত্রে ঢালছি না।'

পূর্ণা উঠে বসে,একটা বালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে দায়সারাভাবে বলল, 'তুমি অনেক শক্ত আপা। আমি খুব দূর্বল। আমি ভুলতে পারছি না।'

পদ্মজা আর এই বিষয়ে কথা বাড়াল না। পূর্ণার গাঁ ঘেঁষে বসে,ফিসফিসিয়ে বলল, 'গতকাল রাতে কী হয়েছে জানিস?'

'কি হয়েছে?'

পদ্মজা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলে, 'তোর নায়ক ভাইয়ের চিঠি আম্মার হাতে পড়েছে।'

পূর্ণা আঁতকে উঠে বলল, 'সেকী! কখন? কীভাবে?'

'আর বলিস না! সেদিন তুই নানাবাড়ি ছিলি। তখন চিঠি দুইটা বের করেছিলাম। বারান্দার ঘরে বালিশের নিচে রেখে দেই। আর মনে নেই। এরপরেই অঘটন ঘটে। এরপরদিন বিচার বসল। চিঠির কথা ভুলেই গেলাম। বারান্দার ঘরে ছিলাম রাতে,তবুও মনে পড়েনি। আর আম্মা পেয়ে গেল।'

উত্তেজনা, ভয়ে পূর্ণার গলা শুকিয়ে গেছে। প্রশ্ন করল, 'আম্মা কী বলছে?'

পদ্মজা ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে কী যেন ভাবে। এরপর ব্যথিত স্বরে বলল, 'তেমন কিছুই না। এজন্যই আরো ভয় হচ্ছে।'

'কিছুই না?'

'কখন হলো এসব জিজ্ঞাসা করেছে। আমি বললাম, তুমি যা বলবে তাই হবে। এরপর আম্মা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

'তারপর?'

'বলল, ঘুমা গিয়ে। শেষ।'

দুই বোন একসাথে চিন্তায় পড়ে গেল। কপাল ভাঁজ করে কিছু ভাবতে শুরু করে। পূর্ণা বলল, 'আম্মা তোমার মুখ দেখে বুঝে গেছে তুমি লিখন ভাইকে ভালোবাসো না।'

পদ্মজা অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'মনে হয়।'

পূর্ণা খুব বিরক্তি নিয়ে বলল, 'লিখন ভাই এতো সুন্দর, তোমাকে এতো ভালোবাসে তবুও কেন ভালবাসোনি আপা? লিখন ভাইয়ের চিঠি তো ঠিকই সময় করে করে পড়তে। বিয়ে করতে কী সমস্যা?'

'আম্মা দিলে তো করবই। সমস্যা নেই।'

'তোমার এই ন্যাকার কথা আমার ভাল লাগে না আপা।'

পদ্মজা হেসে ফেলল। পূর্ণার রেগে কথা বলা দেখে। পদ্মজা পূর্ণার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, 'গতকাল রাতে আম্মা আব্বার প্রতি ভালোবাসাটা আমাকে বলছে। প্রথম দেখেই নাকি আপন, আপন লেগেছিল। আব্বার জন্য আম্মা দিনকে রাত, রাতকে দিন মানতেও রাজি ছিলেন। এতোটা ভালোবাসতেন। আমার তেমন কোনো অনুভূতি হয়নি তোর নায়ক ভাইয়ের জন্য। প্রথম প্রথম কোনো পুরুষের চিঠি পেয়েছিলাম, সবকিছু নতুন ছিল। তাই একটা ঘোরে গিয়ে নতুন অনুভূতির সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম। আম্মার ভালবাসার কথা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে আমি উনাকে ভালোবাসিনি। সবটা মোহ ছিল। দূরে যেতেই উবে গেছে। তবে, উনি খুব অসাধারণ একজন মানুষ। আম্মা উনার হাতে তুলে দিলে আমাকে, কোনো ভুল হবে না। কিন্তু এটা এখন কল্পনাতীত। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

পদ্মজার এতো কথা উপেক্ষা করে পূর্ণা কটমট করে বলল, 'তোমার কী কালাচাঁদরে দেখলে আপন আপন লাগে?'

পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞাসা করল, 'কালাচাঁদ কে?'

পূর্ণা মিনমিনিয়ে বলল, 'তোমার হবু জামাই।'

তারপরই গলা উঁচিয়ে বলল, 'আমিও কালা জানি। কিন্তু আপা,তোমার জন্য লিখন ভাইয়ের মতো সুন্দর জামাই দরকার।'

পদ্মজা এক হাতে কপাল চাপড়ে বলল, 'এখনও লিখন ভাই! যা তোর সাথে তোর নায়কের বিয়ে দিয়ে দেব। এখন আয়, ঘর থেকে বের হ। মুক্তা, সোনামণি, রোজিনা আসছে। তোর সাথে কথা বলবে। আয় বলছি...আয়।'

পূর্ণাকে টেনে নিয়ে বের হলো পদ্মজা।

সূর্য মামার রাগ কমেছে। মোড়ল বাড়ির মাথার উপর থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সদর ঘর ভর্তি মানুষ। হাওলাদার বাড়ির বউদের গ্রামবাসী শেষবার তাদের বিয়েতেই দেখেছে। আবার দেখার সুযোগ হওয়াতে দল বেঁধে মানুষ এসেছে। লোকমুখে শোনা যায়, হাওলাদার বাড়ির মেয়ে-বউদের সারা অঙ্গে সোনার অলংকার ঝলমল করে। মগা-মদন সহ আরো দুজন ভৃত্য মোড়ল বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। পদ্মজাকে শাড়ি পরাচ্ছেন হেমলতা। পদ্মজা এর আগে কখনো শাড়ি পরেনি। পূর্ণা, প্রেমা ছোট হয়েও পরেছে। পদ্মজার কখনো ইচ্ছে করেনি।তাই সে হেমলতাকে বলল, 'প্রথম শাড়ি তুমি পরাবে আম্মা।'

শাড়ি পরানো শেষে, চোখে কাজল এঁকে দেন। ঠোঁটে লিপিস্টিক দিতে গিয়েও,দিলেন না। মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করে চুল খোঁপা করতেই,পূর্ণা ছুটে আসে। হাতে শিউলি ফুলের মালা। হেমলতা মৃদু ধমকের স্বরে বলেন, 'এতক্ষণ লাগল!'

হেমলতার কথা বোধহয় পূর্ণার কানে গেল না। পূর্ণা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'আল্লাহ! আপারে কী সুন্দর লাগছে!'

পদ্মজা লজ্জায় মিইয়ে গেল। চোখে মুখে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে। হেমলতা পদ্মজার খোঁপায় ফুলের মালা লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শুধু রূপে চারিদিক আলোকিত করলে হবে না,গুণেও তেমন হতে হবে।'

পদ্মজা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। তখন হুড়মুড়িয়ে সেখানে উপস্থিত হলো লাবণ্য। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জাপটে ধরে। এক নিঃশ্বাসে বলেও ফেলল, 'আল্লাহ, পদ্ম তুই আমার ভাবি হবি। আমার বিশ্বাসই হইতাছে না। মনে হইতাছে স্বপ্ন দেখতাছি। ইয়া...মাবুদ। শাড়িতে তোরে পরী লাগতাছে। বাড়ির সবাই ফিট খাইয়া যাইব। দেহিস।'

পদ্মজা কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু হাসল। হেমলতা পদ্মজার মাথার ঘোমটা টেনে দেন। লাবণ্যকে বলেন, 'তোমার সইকে নিয়ে যাও।'

পদ্মজা হেমলতার হাতে হাত রেখে অনুরোধ করে বলল, 'আম্মা,তুমি আসো।'

হেমলতা হাসেন। পদ্মজার মাথায় এক হাত রেখে বলেন, 'কয়দিন পর থেকে এরাই তোর আপন। মা পাশে থাকবে না।'

পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। ছলছল চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। পদ্মজাকে নতুন বউ রূপে দেখে হেমলতার বুকে ঝড় বইছে। মেয়েটা কয়দিন পর আলাদা হয়ে যাবে। দুই মাস আগে হলে তিনি সাত রাজার ধনের বিনিময়েও মেয়ের বিয়ে দিতেন না।

'আমি আসছি। লাবণ্য যাও তো নিয়ে যাও। পূর্ণা তুইও যা।'

লাবণ্য পদ্মজাকে নিয়ে যায়। পদ্মজার বুক ধড়ফড় করছে। মায়ের যেন কী হয়েছে! সে পিছন ফিরে তাকায়। সাথে সাথে হেমলতা অন্য দিকে ঘুরে তাকান। চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্রুত তা মুছেন।

সদর ঘর কোলাহলময় ছিল। পদ্মজা ঢুকতেই সব চুপ হয়ে গেল। লাবণ্য পদ্মজাকে ছেড়ে ভারী আনন্দ নিয়ে বলল, 'আম্মা, কাকিম্মা, ভাবি, আপারা এইযে পদ্মজা। আমার নতুন ভাবি।'

পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। অলংকারে জ্বলজ্বল করা পাঁচ জন নারীকে দেখে যেন চোখ ঝলসে গেল তার। সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা চোখ নামিয়ে ফেলল। তখন কোথা থেকে আবির্ভাব হলো আমিরের। সদর দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল পদ্মজা। পদ্মজাকে দেখে থমকে গেল সে। পদ্মজার পরনে খয়েরি রংয়ের জামদানি শাড়ি। শাড়িতে কোনো মেয়েকে এতো সুন্দর মনে হতে পারে এর আগে অনুভব করেনি আমির। আমিরের লজ্জা খুব কম। সে উপস্থিত গুরুজনদের উপেক্ষা করে পদ্মজাকে বলল, 'মাশাআল্লাহ। দিনের বেলা চাঁদ উঠে গেছে।'

লজ্জায় পদ্মজার রগে রগে কাঁপন ধরে। এতো লজ্জাহীন মানুষ কী করে হয়! আমিরের মা ফরিনা ধমকের স্বরে বলেন, 'বাবু,এইনে বয় আইসসা।'

আমির পদ্মজাতে দৃষ্টি স্থির রেখে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। হেমলতা সদর ঘরে প্রবেশ করতেই আমির ধড়ফড়িয়ে উঠল। ছুটে এসে হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। হবু শ্বাশুড়ির প্রতি আমিরের এতো দরদ দেখে ফরিনা খুব বিরক্ত হলেন। পাশ থেকে ফরিনার জা আমিনা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মেয়ের রূপ আগুনের হুল্কা। বাবু এইবার হাত ছাড়া হইলো বলে।'

আমিনার মন্ত্র ফরিনার মগজ ধোলাই করতে পারল না। পদ্মজার রূপে তিনি মুগ্ধ। আমির কালো বলে তিনি ছোট থেকেই আমিরকে বলতেন, 'বাবু তোর জন্যি চান্দের লাকান বউ আনাম।'আর সেই কথা রক্ষার পথে। তিনি শুধু পছন্দ করছেন না শ্বাশুড়ির প্রতি আমিরের এতো দরদ! কী দরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়ে ধরে সালাম করার। আমির হেমলতাকে ভক্তির সাথে প্রশ্ন করল, 'ভালো আছেন?'

হেমলতা মিষ্টি করে হেসে বলেন, 'ভালো আছি। যাও গিয়ে বসো।'

আমির বাধ্যের মতো মায়ের পাশে গিয়ে বসল। মজিদ মাতব্বর, মোর্শেদের সাথে বাইরে আলোচনা করছেন। আর কোনো পুরুষ আসেনি বাড়িতে। তারা বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত। মুহূর্তে পদ্মজার সারা অঙ্গ সোনার অলংকারে পূর্ণ হয়ে উঠল। রূপ বেড়ে গেল লক্ষ গুণ। যার কোনো সীমা নেই। যার সাথেই পদ্মজা কথা বলেছে, সেই এগিয়ে এসে বালা নয়তো হার পরিয়ে দিয়েছে। কি অবাক কান্ড!

সবাই আড্ডা দিচ্ছে। পদ্মজা চুপ করে বসে আছে। কেউ কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছে।

লাবণ্য একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'রানি আপা,বাড়ির পিছনে যাইবা?'

রানি খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'যাব।'

তার খুশির কারণ লাবণ্য কিছুটা ধরতে পেরেছে। রানির একজন প্রেমিক আছে। তাই শুধু সুযোগ খুঁজে দেখা করার। যেখানেই দাওয়াত পড়ে সেখানেই তার প্রেমিক উপস্থিত হয়। লাবণ্য সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পদ্মজা, পূর্ণা, রানিকে নিয়ে বাড়ির পিছনে আসে। রানি বাড়ির পিছনে এসেই ঘাটের দিকে ছুটে যায়। একটা নৌকা এসে ভীরে। নৌকায় কে ছিল দেখা যায় না। রানি নৌকায় উঠে পড়ে। কারো সাথে বিরতিহীন ভাবে কথা বলছে শোনা যায়। পূর্ণা লাবণ্যকে প্রশ্ন করল, 'লাবণ্য আপা? রানি আপা কার সাথে কথা বলে?'

'আবদুল ভাইয়ের সাথে।'

'কোন আবদুল?'

'যার কথা ভাবছিস।'কথা শেষ করে লাবণ্য চোখ টিপল। পূর্ণা অবাক হয়ে বলল, 'মাস্টারের সাথে!'

লাবণ্য হাসে। রানি এগিয়ে আসে। লাবণ্য বলে, 'কথা শেষ?'

'হ চইলা গেছে।'

রানি পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাশাআল্লাহ, তুমি এতো সুন্দর। আমার কোলে নিয়া আদর করতে মন চাইতাছে।'

পদ্মজা মুচকি হেসে বলল, 'আপনি খুব শুকনা। আমাকে কোলে নিতে পারবেন না।'

'শুকনা হইতে পারি। শক্তি আছে।'

রানির কথা বলার ঢংয়ে সবাই হেসে উঠল। পূর্ণা আমিরকে দেখে পদ্মজার কানে কানে বলল, 'আপা তোমার কালাচাঁদ আসছে।'

পদ্মজা পূর্ণাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, 'কীসব কথা! উনার বোনরা আছে।'

'লাবণ্য, রানি যা এখান থেকে।'আমিরের আদেশ শুনে রানি, লাবণ্য খুব বিরক্ত হলো। রানি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, 'দাভাই, থাকি না।'

আমির চোখ রাঙিয়ে তাকাল। ধমকের স্বরে বলল, 'যেতে বলছি যা।'

লাবণ্য বিরক্তিতে, ইশশ! বলে পদ্মজাকে বলল, 'আয় অন্যখানো যাই।'

'পদ্মজা থাকুক। তোরা যা।'আমিরের কথা শুনে বেশি চমকাল পদ্মজা। লাবণ্য ফোঁসফোঁস করতে করতে বলল, 'কেন? কেন?'

পদ্মজা, পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে আছে। আমির দৃষ্টি কঠোর করতেই লাবণ্য,রানি চলে গেল। পূর্ণা চলে যেতে চাইলে পদ্মজা পূর্ণার হাত চেপে ধরে। পূর্ণা পদ্মজার হাত ছাড়িয়ে, ধীরকণ্ঠে বলল, 'একা থেকে তোমার কালাচাঁদের ভালোবাসা খাও।'

'ছিঃ।'

পূর্ণা ছুটে চলে গেল। আমির পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল, 'বিয়ের আগে গুরুজনদের না জানিয়ে এভাবে একা কথা বলা ঠিক নয়।'

'কী হবে?'

পদ্মজা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'কলঙ্ক লাগবে।'

'আর কী বাকি আছে?'

'পরিমাণ না বাড়ানোই ভাল।'

পদ্মজার কথা বলতে একটুও গলা কাঁপেনি। বাড়ির ভেতর চলে আসার জন্য পা বাড়াতে আমির পদ্মজার এক হাত থাবা দিয়ে ধরে,আবার ছেড়ে দিল। পদ্মজা ছিটকে দূরে সরে গেল। আমির বলল, 'তুমি সত্যি একটা পদ্ম ফুল পদ্মবতী। এজন্যই লিখন শাহর মতো সুদর্শন যুবক তোমার প্রেমে পড়েছে।'

দেখা হওয়ার পর এই প্রথম পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। পরপরই চোখের দৃষ্টি সরিয়ে ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। আমির অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে দেখতে

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এবার আত্মীয় বিদায়ের পালা। যাওয়ার পূর্বে লাবণ্য একটা কাগজ পদ্মজার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'দাভাই দিছে।'

ঘুমাবার আগে পদ্মজা কাঁপা হাতে কাগজটির ভাঁজটি খুলল। কাগজটিতে যত্ন করে লেখা-

সারা অঙ্গ কলঙ্কে ঝলসে যাক
তুই বন্ধু শুধু আমার থাক।

পর্ব ২১

সারা বাড়ির সব কাজ শেষ করে, হেমলতা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ঘরে আসেন। মোর্শেদ সবেমাত্র শুয়েছেন। হেমলতা বিছানার এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করেন। মোর্শেদ হেমলতার দিকে ফিরে ধীরকণ্ঠে বলেন, 'ধানের মিলটা পাইয়া যাইতাছি।'

মোর্শেদের গলা দূর্বল হলেও খুশিতে চোখ চকচক করছে। হেমলতা মৃদু হেসে বলেন, 'মাতব্বর কী যৌতুক দিচ্ছেন?'

মোর্শেদ হেসে বলেন, 'সে কইতে পারো। সে আমারে কী কইছে জানো?'

'কী?'

'কইলো, শুনো মোর্শেদ...আইচ্ছা আগে শুনো আমি কিন্তু শহুরে ভাষায় কইতে পারুম না। আমি আমার গ্রামের ভাষায় কইতাছি।'

হেমলতা মোর্শেদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আওয়াজ করেই হাসলেন। বললেন, 'আচ্ছা,যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

মোর্শেদ খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'কইলো,শুনো মোর্শেদ তোমার এই মোড়ল বাড়ি হইতাছে একটা বিল। যে বিলে একটাই পদ্ম ফুল আছে। এই পদ্ম ফুলডার জন্যই এই বিলটা এতো সুন্দর। আর আমি সেই পদ্ম ফুলডারে তুইললা নিয়া যাইতাছি। এই বিলে পদ্ম ফুলডার চেয়ে দামি সুন্দর আর কিছু নাই। তাই আমার আর কিছু লাগব না। বিনিময়ে আমি এই খালি বিলডারে ধানের মিল দিয়ে দিলাম। বুঝলা লতা? মাতব্বর মানুষটা সাক্ষাৎ ফেরেশতা। মন দয়ার সাগর।'

'হুম।'হেমলতা বললেন, ছোট করে। পুনরায় বললেন, 'একটা কথা।'

মোর্শেদ জিজ্ঞাসু ইশারা করেন ভ্রু উঁচিয়ে। হেমলতা উঠে বসেন। বলেন, 'লিখনকে মনে আছে? সে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তোমাকে?'

মোর্শেদ লেশমাত্র অবাক হলেন না। দায়সারাভাবে বললেন, 'এতদিনে জানলা? আমি মনে করছি কবেই জাইননা ফালাইছো।'

'আমি তো আর সবজান্তা নই। আমাকে বলোনি কেন?'

'বইললা কি হইতো? ছেড়ি বিয়া দিতা? আর ছেড়াডা নায়ক। কত ছেড়ির লগে ঘষাঘষি করে। ছেড়িগুলাও নষ্টা। নষ্টাদের সাথে চলে এই ছেড়ায়।'

'মুখ খারাপ করো না। ছেলেটার মধ্যে আমি তেমন কিছু দেখিনি। তুমি আমাকে জানাতে পারতে। নিশ্চিন্তে ছেলেটা সুপাত্র। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, সে মা বাবা নিয়ে আসলে আমি ফিরিয়ে দিতাম না। থাক...এসব কথা। এখন বলেও লাভ নেই। পদ্মজার মন স্থির আছে। পরিস্থিতি, ভাগ্য সেখানে নিয়ে যাচ্ছে,সেখানেই গা ভাসিয়ে চলুক। ঘুমাও এখন। ভোরে উঠে গোলাপ ভাইয়ের বাড়িতে যাবা। কত কাজ বাকি! বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে কী সামান্য কথা!'

হেমলতা একা কথা বলতে বলতে অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে পড়েন। কিছু সময়ের ব্যবধানে ঘুমিয়েও পড়লেন।

সকাল থেকে পূর্ণার দেখা নেই। পদ্মজা পূর্ণাকে খুঁজে বাড়ির পিছনে আসে। পূর্ণা সিঁড়িঘাটে বসে উদাস হয়ে কী যেন ভাবছে। পদ্মজা পা টিপে হেঁটে আসে। পূর্ণা বোনের উপস্থিতি টের পায়নি। পদ্মজা পূর্ণার পাশে বসে। তবুও পূর্ণা টের পেল না। পদ্মজা পূর্ণাকে ধাক্কা দিল। পূর্ণা চমকে তাকাল। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল, 'ভয় পাইছি।'

'উদাস হয়ে কী ভাবছিস?'

'কিছু না।'

'আবার ওইসব ভাবছিস! কতবার না করলে শুনবি বল তো?'

পূর্ণা নতজানু হয়ে রইল। ক্ষণকাল পার হওয়ার পর ভেজা কণ্ঠে বলল, 'নিজের ইচ্ছায়

মনে করে কষ্ট পেতে আমার ইচ্ছে করে না আপা। মনে পড়ে যায়।'

'চেষ্টা তো করবি। আর ভুলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। এছাড়া অমানুষগুলো তাদের শাস্তি তো পেয়েছেই।'

পূর্ণা চোখের জল মুছে আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আম্মা তিন জনকে কী করে মারল আপা?'

'জানি না।'

'জিজ্ঞাসা করবা আম্মাকে?'

পদ্মজা ভাবল। এরপর বলল, 'করব। আজ না অন্য একদিন।'

'বিয়ে করে তো চলেই যাবা।"

পদ্মজা অভিমানী হয়ে তাকাল পূর্ণার দিকে। বলল, 'আর কী আসব না? ফিরে যাত্রা আছে। আবার এমনিতেও আসব। কয়দিন পর পর।'

'তাহলে কালাচাঁদের সাথে বিয়েটা সত্যিই হচ্ছে?'

'তুই কী মিথ্যে ভাবছিস?'

পূর্ণা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফেলল। বলল, 'লিখন ভাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে।'

লিখন নামটা শুনে পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠল। নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয়। তাই সে প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল, 'উনাকে পছন্দ না তাই কালা বলিস, ঠিক আছে। কিন্তু চাঁদ কেন বলিস বুঝলাম না।'

পূর্ণা আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। এরপর যান্ত্রিক স্বরে বলল, 'পাতিলের তলার মতো কালা হয়ে আমার চাঁদের মতো সুন্দর বোনকে বিয়ে করতেছে বলেই কালাচাঁদ ডাকি। নয়তো কালা পাতিল ডাকতাম। আবার দরদ দেখিয়ে বলিও না, উনি তো এতো কালা না। শ্যামলা।'কথা শেষ করে পূর্ণা ঠোঁট বাঁকাল।

পদ্মজা শব্দ করে হাসতে শুরু করল। কিছুতেই হাসি থামছে না। পূর্ণা পদ্মজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি খুব কঠিন আপা। খুব ধৈর্য্য তোমার,ঠিক আম্মার মতো।'

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তাকাল। সময়টা শুধু দুই বোনের। পদ্মজা মায়াবী স্বরে বলল, 'আর তুই ঠিক আম্মার বাহ্যিক রূপের জোড়া পর্ব।'

প্রান্ত, প্রেমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে নদীর ঘাটে। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলে, 'বড় আপা দুলাভাই আসছে।'

আমির আসার খবর শুনেই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পদ্মজা নিজের ঘরে চলে গেল। এই লোকটা এতো বেহায়া আর নির্লজ্জ! গতকাল সকাল-বিকাল বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করেছে। সেই খবর পদ্মজা পেয়েছে। আজ একেবারে বাড়িতে! বিয়ের তো আর মাত্র তিন দিন বাকি। এতোটুকু সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা কী সম্ভব নয়? পদ্মজা কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করে, 'এ কার সাথে বিয়ে হচ্ছে আল্লাহ।'

উঠানে হেমলতা ছিলেন। আমির বাড়ির ভেতর ঢুকেই হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর নতজানু হয়ে বলল, 'কেমন আছেন আম্মা?'

হেমলতার চক্ষু চড়কগাছ! আমিরের সাথে মগা এসেছে। মগার হাতে মাছের ব্যাগ, মাথায় ঝুড়ি। তাতে মশলাপাতি সাথে শাকসবজি। বিয়ের আগে এতো বাজার, আবার আম্মাও ডাকা হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার স্যাপার! হেমলতা ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করে নেন। ধীরেসুস্থে বলেন, 'ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'জি, জি। সবাই ভালো।'

আমির মগাকে ইশারা করল। মগা বারান্দায় মাছের ব্যাগ, মাথার ঝুড়ি রাখল। হেমলতা আমিরকে বললেন, 'এতসব বিয়ের আগে আনার কী দরকার ছিল? পাগল ছেলে।'

আমির হেসে ইতস্তভাবে নতজানু অবস্থায় বলল, 'এমনি।'

'যাও ঘরে গিয়ে বসো।'

'আম্মা...'

হেমলতা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েন। আমির বলল, 'আম্মা, ক্ষমা করবেন। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'কোনো দরকার কী ছিল?'

'আ..আসলে আম্মা। পদ্মজার সাথে একটু কথা ছিল।'

আমির উসখুস করছে। খুব অস্থির। হাত,পা এদিকওদিক নাড়াচ্ছে। কিন্তু চোখ মাটিতে স্থির। হেমলতা আমিরকে ভাল করে পরখ করে নিয়ে বললেন, 'ঘরে আছে নয়তো ঘাটে।'

অনুমতি পেয়ে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে গেল আমির। হেমলতা আমিরের যাওয়ার পানে চেয়ে থেকে ভাবেন,ছেলেটার সাথে এখনও চোখাচোখি হয়নি। সবসময় মাথা নত করে রাখে। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হলো, লাজুক নয় এই ছেলে। হয়তো গুরুজনদের সামনে মাথা নিচু করে রাখা ছোটবেলার স্বভাব। হেমলতা মুচকি হেসে লাহাড়ি ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

পদ্মজার ঘরের শেষ প্রান্তে বারান্দা আছে। বারান্দা পেরোলেই বাড়ির পিছনের দরজা। আমির আসছে শুনে ঘর আর বারান্দার মাঝ বরাবর দরজায় পর্দা টানিয়ে দিল পদ্মজা। আমির ঘরের পাশে দাঁড়াল। পদ্মজা বারান্দার দিকে। পর্দার কাপড় পাতলা,মসৃণ। আমির স্পষ্ট পদ্মজার অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। তিরতির করে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে পদ্মজার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো উড়ছে অবাধ্য হয়ে। আমির ডাকল, 'পদ্মজা?'

'হু?'

'কেমন আছো?'

'ভালো। আপনি?'

'ভালো।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা! পদ্মজা বলল, 'কী বলবেন বলুন।'

'মায়াভরা চোখগুলো দেখার সৌভাগ্য কী হবে?'

আমিরের কণ্ঠে আকুতি! তৃষ্ণা! পদ্মজার অস্বস্তি হচ্ছে। বেহায়া মানুষ বড়ই বিপদজনক। সে পালানোর জন্য পা বাড়াতেই আমির হই হই করে উঠল, 'কসম লাগে পালাবে না।'

পদ্মজা মাথার ওড়না টেনে নিয়ে বলল, 'দরকারি কথা থাকলে বলে চলে যান।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছো?'

'ছিঃ না।'

'তোমায় না দেখলে আজ আর প্রাণে বাঁচবো না। রাতেই ইন্না লিল্লাহ...'

'রসিকতা করবেন না। কাউকে না দেখে কেউ মরে না।'

'পদ্মবতীর রূপ যে পুরুষ একবার দেখেছে সে যদি বার বার না দেখার আগ্রহ দেখায় তাহলে সে কোনো জাতেরই পুরুষ না। একবার দেখা দাও। কসম লাগে...'

'বার বার কসম দিয়ে ঠিক করছেন না।'

'আচ্ছা,কসম আর কসম দেব না। একবার দেখা দাও।'

পদ্মজার দুই ঠোঁট হা হয়ে গেল। কী বলে মানুষটা! কসম করেই বলছে আর কসম দিবে না। আমির ধৈর্য্যহারা হয়ে বলল, 'পদ্মবতী অনুরোধ রাখো...'

'এভাবে বলবেন না। নিজেকে ছোট লাগে।'

'পর্দা সরাব?'

পদ্মজা ঘামছে। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্তি। তবুও সায় দিল। আমির পর্দা সরিয়ে খুব কাছে পদ্মজাকে দেখতে পেল। কালো রঙের সালোয়ার কামিজ পরা পদ্মবতী। কপাল অবধি টেনে রাখা ঘোমটা। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাতেই আমির বলল, 'জীবন ধন্য।'

পদ্মজা হাসি সামলাতে পারল না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। আমির বলল, 'এ মুখ প্রতিদিন ভোরে দেখব। আর প্রতিদিনই জীবন ধন্য হবে। এমন কপাল কয়জনের হয়।'

পদ্মজা কিছু বলল না। আমির আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার

হাতে খুন হয়ে যাই।'

পদ্মজা চমকে উঠল। আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আপনি পাগল।'

আমির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমার উপস্থিতি আমার নিঃশ্বাসের তীব্রতা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে টের পাচ্ছো?'

পদ্মজা দূরে সরে গেল। মনে মনে বলল, 'উফ! আল্লাহ আমি পাগল হয়ে যাব। এ কার পাল্লায় পড়লাম। জ্ঞানবুদ্ধি, লাজলজ্জা কিছু নেই।'

আর মুখে আমিরকে বলল, 'পেয়েছি। এবার আসি।'

আমিরকে কিছু বলতে না দিয়ে পদ্মজা বারান্দা ছাড়ল। বাড়ির পিছনে মগাকে পেল। মগার পথ আটকে বলল, 'মগা ভাই।'

মগা সবগুলো দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'জ্বে ভাবিজান।'

মগার মুখে ভাবি ডাক শুনে পদ্মজা বিরক্ত হলো। কিন্তু প্রকাশ করল না। বিরক্তি লুকিয়ে বলল, 'লিখন শাহর কথা আপনি উনাকে বলেছেন?'

'উনিটা কে?'

'আপনার আমির ভাই।'

'জ্বে ভাবিজান।'

মগার অকপট স্বীকারোক্তি! পদ্মজা এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। মগাকে পাশ কেটে চলে গেল। মগা দৌড়ে এসে পদ্মজার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফিসফিসিয়ে গোপন তথ্য দিল। আগামী দুই দিনের মধ্যে লিখন শাহ আসছে। তার বাবা মাকে নিয়ে। খবরটা মগা গত সপ্তাহ পেয়েছে। পদ্মজার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। ঢোক গিলে নিজেকে আশ্বস্ত করে নিল। সে তো কথা দেয়নি বিয়ে করার। আর না কখনো চিঠি দিয়েছে। লিখন শাহ নিরাশ হলে এটা তার দোষ নয়, লিখন শাহর ভাগ্য। তবুও পদ্মজার খারাপ লাগছে। অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। জীবনে আবার কী কিছু ঘটতে চলেছে? বুক ধড়ফড়, ধড়ফড় করছে। পদ্মজা ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইল ঝিম মেরে।

পর্ব ২২

মোড়ল বাড়ির আনাচেকানাচে আত্মীয়-স্বজনদের কোলাহল। পদ্মজা বিছানার এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। ঘরে দুষ্টু রমণী আছে কয়েকজন। নিজেদের মধ্যে রসিকতা করছে। উচ্চস্বরে হাসছে। অথচ এরাই বিপদের সময় পাশে ছিল না। ভীষণ গরম পড়েছে। পদ্মজার পরনে সুতার কাজ করা সুতি শাড়ি। গরমে শুধু ঘামছে না। বমি পাচ্ছে। প্রেমা পদ্মজার পাশে বসে ছিল। পদ্মজা প্রেমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'এই বনু? আম্মাকে গিয়ে বলবি লেবুর শরবত দিতে?'

প্রেমা মাথা নাড়িয়ে চলে গেল শরবত আনতে। হেমলতা রান্নাঘরে ছিলেন। প্রেমা লেবুর শরবতের কথা বললে তিনি বললেন, 'তুই যা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

লেবু গাছ থেকে সবেমাত্র ছিঁড়ে আনা পাকা লেবুর শরবত বানিয়ে পদ্মজার ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। গিয়ে দেখলেন পদ্মজা বিছানার এক পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। উসখুস করছে। ঘরভর্তি অন্যান্য মানুষে।তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন, 'সবাই অন্য ঘরে যাও। পদ্মজাকে একা ছাড়ো।'

হেমলতার এমন আদেশে অনেকের রাগ হলেও বেরিয়ে গেল। তিনি দরজা বন্ধ করে শরবতের গ্লাস পদ্মজার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'সব সময় মুখ বন্ধ রাখা ভালো না। যারা বিপদে পাশে থাকে না তাদের জন্য বিন্দুমাত্র অসুবিধার মুখোমুখি হবি না। গরমে তো শেষ হয়ে যাচ্ছিস। জানালার পাশটাও অন্যরা ভরাট করে রেখেছিল। ভালো করেই সরতে বলতি।'

পদ্মজা মায়ের কথার জবাব না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে লেবুর শরবত শেষ করল। এবার একটু আরাম লাগছে। আলনার কাপড় গুলো অগোছালো। সকালেই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় মেয়েগুলির কাজ। হেমলতা আলনার কাপড় ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন , 'কী নিয়ে এত চিন্তা করছিস?'

পদ্মজা কিছু না বলে বিছানায় আঙ্গুল দিয়ে আঁকিবুঁকি করতে থাকল। পদ্মজার অস্বাভাবিকতা দেখে হেমলতা কপাল কুঁচকালেন।

'বলবি তো?'

পদ্মজা বিচলিত হয়ে বলল, 'আম্মা উনি বোধহয় আজ আসবেন।'

'উনি? উনি কে? আমির?'

'না আম্মা। লিখন শাহ যে, উনি।'

হেমলতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'কপালে যা আছে তাই তো হবে। ভাবিস না। আমি আছি,সব সামলে নেব। লিখনকে আমি বুঝাব।'

হেমলতার কথা শেষ হতেই,পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল, 'উনি খুব কষ্ট পাবেন আম্মা।'

হেমলতা অবাক হয়ে তাকান পদ্মজার দিকে। পদ্মজা এতো ব্যকুল কেন হচ্ছে? তিনি কী পদ্মজার অনুভূতি চিনতে ভুল করছেন? নাকি শুধুমাত্র কারো মন ভাঙবে ভেবে, পদ্মজার এতো ব্যাকুলতা! হেমলতা দোটানায় পড়ে যান। পদ্মজার জীবনে এ কেমন টানাপোড়ন! এই মুহূর্তে পদ্মজাকে বুঝে উঠতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। ওদিকে হানি ডাকছে। হেমলতার বড় বোন হানি,গতকাল ঢাকা থেকে গ্রামে এসেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে। হেমলতা দরজার দিকে পা বাড়ান। তার আগে বলে গেলেন, 'আমার নোংরা অতীত শুনাব আজ। বাকি সিদ্ধান্ত তোর। যা চাইবি তাই হবে। মনে রাখিস, যা চাইবি তাই পাবি।'

পদ্মজা কিছু বলার আগে হেমলতা চলে গেলেন। পদ্মজার বুকের ভেতর অপ্রতিরোধ্য তুফান শুরু হয়। মায়ের অতীত জানার জন্য কত অপেক্ষা করেছে সে। আজ যখন সেই সুযোগ এলো,তার ভয় হচ্ছে খুব। কেন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। হাত,পায়ের রগে রগে শিরশির অনুভূতি।

ভ্যানগাড়িতে চড়ে অলন্দপুরের আটপাড়ায় ঢুকল লিখন শাহ। সাথে বাবা-মা এবং বোন। বাবা শব্দর আলী, মা ফাতিমা বেগম। বোন লিলি। শব্দর আলী চশমার গ্লাস দিয়ে গ্রামের ক্ষেত দেখছেন। আর বার বার বলছেন, 'এই তো আমার দেশ। এই তো আমার বাংলাদেশ।'

ফাতিমা ভীষণ বিরক্ত ভ্যানে চড়ে। উনার ইচ্ছে ছিল কোনো মন্ত্রীর মেয়েকে ঘরের বউ করে আনবেন। আর ছেলের নাকি মেয়ে পছন্দ হয়েছে গ্রামে। ছেলের জেদের কাছে হেরে আসতেই হলো।

লিখনের পরনে ছাইরঙা শার্ট। চোখে সানগ্লাস। উত্তেজনায় তার হাত পা কাঁপছে রীতিমতো। এমন একটা দিন নেই, যেদিন পদ্মজার কথা ভেবে শুরু হয়নি। এমন একটা রাত নেই, যে রাতে পদ্মজাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা হয়নি। মাঝের সময়ের ব্যবধানে পদ্মজাকে খুব বেশি ভালবেসে ফেলেছে সে। স্বপ্নে কোমরে আঁচল গুঁজে ঘরের কাজ করা পদ্মজাকে দেখতে পায়। কখনো বা অপরূপ সুন্দরী পদ্মজাকে ঘুমের ঘোরে ঠিক বিছানার পাশে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখতে পায়।

কল্পনার পদ্মজাকে নিয়ে সে সংসার পেতেছে। এবার হয়তো সত্যি হতে চলেছে। লিখন আনমনে হেসে উঠল। মনে পড়ে যায় পদ্মজাকে প্রথম দেখার কথা। সঙ্গে,সঙ্গে বুকের মধ্যে অদ্ভুত ঝড় শুরু হয়। কী মায়াবী, কি স্নিগ্ধ একটা মুখ। তার চেয়েও সুন্দর পদ্মজার ভয় পাওয়া। লজ্জায় পালানোর চেষ্টা। পর পুরুষের ভয়ে আতঙ্কে থাকা। লিখন আওয়াজ করে হেসে উঠল। ফাতিমা,শব্দর অবাক হয়ে তাকালেন। লিলির এসবে খেয়াল নেই। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। লিখন মা-বাবাকে এভাবে থাকাতে দেখে,খুক খুক করে কাশল। এরপর বলল, 'সুন্দর না গ্রামটা? বুঝছো আব্বু, এই গ্রামটাই এতো সুন্দর যে আবার আরেকটা সিনেমার জন্য আসতে হবে আগামী বছর।'

শব্দর আলী প্রবল আনন্দের সাথে বলেন, 'সে ঠিক বলেছিস। মন জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে। চারিদিকে গাছপালা,নদী। রাস্তাঘাটও খুব সুন্দর। এখানে একটা বাড়ি বানালে কেমন হয়?'

লিখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস লুকালো। তার বাবা যখন যেখানে যায় সেখানেই বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বানানো আর হয় না।

ফাতিমা বিরক্ত গলায় বললেন, 'তা আমরা উঠছি কার বাড়ি? তোর পছন্দ করা মেয়ের বাড়ি নাকি অন্য কোথাও?'

মায়ের চোখেমুখে বিরক্তি দেখে লিখনের হাসি পেল। বলল, 'তোমাকে রাগলে এতো ভালো লাগে আম্মু।'

ফাতিমা আড়চোখে ছেলের দিকে তাকান। প্রশংসা শুনতে তিনি বেশ পছন্দ করেন। লিখনের মুখে প্রশংসা শুনে একটু নিভলেন।

'হয়েছে, আর কতক্ষণ?'

'পাঁচ মিনিট। অলন্দপুরের মাতব্বর বড় মনের মানুষ। আমাকে নিজের সন্তানের দৃষ্টিতে দেখেন। যতদিন ছিলাম প্রতিদিন খোঁজ নিয়েছেন। নিজের একজন লোককে আমার সহায়ক হিসেবেও দিয়েছিলেন! উনার বাড়িতেই উঠব।'

লিলি চোখমুখ বিকৃত করে বলল, 'অন্যের বাড়িতে উঠব! উফ।'

'মারব ধরে। অন্যের বাড়ি তোর কাছে, আমার কাছে না। মজিদ চাচার বউ ফরিনা চাচি এতো ভাল রাঁধেন। আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। উনার একটাই ছেলে। ঢাকায় পড়ছে, ব্যবসা সামলাচ্ছে। তার সাথে অবশ্য সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু ফরিনা চাচি সারাক্ষণ ছেলে, ছেলে করতেন। আমাকে পেয়ে ছেলের সব ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই ওই বাড়ি আমার কাছে আপন না লাগুক, পরও লাগে না। আর বিশাল বাড়ি। উনারা বিব্রত হবেন না। তিন-চার দিনেরই তো ব্যাপার।'

লিখনের এতো বড় বক্তব্যের পাছে কেউ কিছু বলার মতো পেল না।

হাওলাদার বাড়ির সামনে এসে ভ্যান থামে। বাড়ির চারপাশ সাজানো দেখে লিখন বেশ অবাক হলো। লিলি চারপাশ দেখতে দেখতে বলল, 'দাদাভাই, তুমি বিয়ে করতে এসেছো এই খবর উনারা পেয়েছেন বোধহয়। তাই এতো আয়োজন।'

লিখন লিলির মাথায় গাট্টা মেরে বলল, 'বাড়িতে দুটো মেয়ে আছে। তাদের কারো বিয়ে হবে হয়তো। চল।'

ইটের বড় প্রাচীর চারদিকে। মাঝে বড় গেট। প্রাচীরের উচ্চতা ১৫ ফুট। আর গেটের উচ্চতা বারো ফুট। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন লোক। দুজনই লিখনকে চিনে। তাই লিখনকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল। গেইট পার হলেই খোলা জায়গায়। প্রচুর গাছপালা। বেশি সুপারি গাছ এবং তালগাছ। সবকিছু সুন্দর! দুই মিনিট হাঁটার পর রঙ করা টিনের একটা বড় ঘর। তার সামনে সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে সিমেন্টের তৈরি বসার বেঞ্চি। এই ঘরটাকে গ্রামে আলগ ঘর বলা হয়,কেউ কেউ আলগা ঘর বলে থাকে। অতিথিরা এসে বিশ্রাম করে। রাত্রিযাপন করে।ভেতরে ইট সিমেন্টের তৈরি দু'তালা অন্দরমহল। আলগ ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন মজিদ মাতব্বর, ফরিনা, রিদওয়ান। লিখনকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে উনারা অবাক হোন। সেই সাথে খুশিও। শহরের চারজন মানুষ হেঁটে আসছে। সর্বাঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। দেখতেও ভালো লাগে। লিখন বারান্দায় পা রাখতেই মজিদ মাতব্বর হেসে বলেন, 'আজকের দিনটা সত্যি খুব সুন্দর।'

লিখন হাসল। ফরিনা এবং মজিদ মাতব্বরকে সালাম করে বলল, 'এই হচ্ছেন আমার বাবা- মা আর বোন। আর আম্মু,আব্বু উনি হচ্ছেন মজিদ চাচা। আর ইনি ফরিনা চাচি। আর ওইযে বড় বড় গোঁফদাড়িওয়ালা উনি হচ্ছেন রিদওয়ান ভাইয়া। এই বাড়িরই আরেক ছেলে।'

মজিদ মাতব্বর একজনকে ডেকে বলেন,চেয়ার দিয়ে যেতে। আর অন্দরমহলে খবর পাঠাতে মেহমান এসেছে। তাৎক্ষণিক চেয়ার ও ঠান্ডা শরবত চলে আসে। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই লিখন প্রশ্ন করল, 'বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান চলছে নাকি?'

'সে চলছে। আমার ছেলেটার বিয়ে। একমাত্র ছেলে।'

লিখন হাসে। চোখ পড়ে আলগ ঘরের ডান পাশে। কয়েকটা মেয়ে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে। লিখন আনমনে হেসে উঠল। কোনো মেয়ে যখন তাকে দেখে খুব তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি হয়। নায়ক কী এমনি এমনি হওয়া। শব্দর আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাই নাকি? তাহলে তো ঠিক সময়েই এসেছি। আমরাও একমাত্র ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়েই এই গ্রামে এসেছি।'

মজিদ মাতব্বর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন, 'মেয়ে কে? কার মেয়ে? আমাকে বলুন। এখুনি বিয়ে করতে চাইলে এখুনি হবে।'

শব্দর আলী লিখনকে প্রশ্ন করেন, 'মেয়ের পরিচয় বল।'

লিখন কথা বলার পূর্বেই ফরিনা গেইটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই তো আমার ছেড়ায় আইয়া পড়ছে। আমির এইহানে আয়। দেইখা যা কারা আইছে।'

ফরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই পিছনে তাকাল। আমির চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে আসছে। হাঁটার গতিতে বোঝা যাচ্ছে,বেশ চঞ্চল একটা ছেলে। আমির ঘেমে একাকার। কয়েক ফুটের দূরত্ব থাকা অবস্থায় লিখনকে দেখেই আমির চিনে ফেলল। মগার কাছে লিখনের বর্ণনা শুনেছে। এছাড়া লিখন একজন নামকরা অভিনেতা। তার অভিনীত ছায়াছবি সে দেখেছে। আমির হাঁটার গতি কমিয়ে এগিয়ে এলো। লিখন উঠে দাঁড়াল। হেসে আমিরের সাথে করমর্দন করল। এরপর বলল, 'আমি লিখন শাহ।'

আমির বলল, 'আমির হাওলাদার। বসুন আপনি।'

লিখন নিজ স্থানে বসল। আমির একটু দূরত্ব রেখে দূরে বসল। মজিদ মাতব্বর আমিরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কোথায় থাকিস সারাদিন। বলেছিলাম না,লিখন শাহ এসেছিল? এইযে ইনি।'

আমির শুষ্কমুখে বলল, 'চিনি আমি। উনার অনেক কাজ(ছবি) আমার দেখা।'

শব্দর আলী, ফাতিমা, লিলি, লিখন সবাই হাসল। কেউ চিনে বললে আনন্দ হবারই কথা। রিদওয়ান আমিরকে বলল, ‘জানিস আমির,লিখন বিয়ে করতে গ্রামে আসছে।’

আমির কিছু বলল না। ফরিনা জানতে চান, ’পাত্রী কে? কইলা না তো?’

লিখন বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে বলল, ’পদ্মজা। মোড়ল বাড়ির বড় মেয়ে।’

লিখনের কথা শুনে মুহূর্তে হাওলাদার বাড়ির সব মানুষের মুখ কালো হয়ে গেল। আলগ ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলির কোলাহল থেমে গেল। চারিদিক স্তব্ধ, শান্ত। লিখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কী হলো সবার! লিখন মা-বাবার সাথে চাওয়াচাওয়ি করল। মজিদ মাতব্বর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ’তার সাথে তোমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?’

মজিদ মাতব্বরের কথা বলার ধরণ পাল্টে যাওয়াতে লিখন আহত হলো। বলল, ’না। এখন প্রস্তাব দিতে চাই।’

‘পদ্মজার সাথেই পরশু আমিরের বিয়ে।’

লিখন চকিতে চোখ তুলে তাকাল। বুক পোড়ার মতো অসহনীয় যন্ত্রনা কামড়ে ধরে সর্বাঙ্গে। হাড়ে হাড়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু ছুটতে থাকে। এখুনি যেন সব রগ ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

ফাতিমা করুণ চোখে লিখনের দিকে তাকান। চোখে চোখ পড়তেই লিখন হাসার চেষ্টা করল। তার দৃষ্টি এলোমেলো। কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।'আব্বা আসছি'বলে জায়গা ত্যাগ করে। শব্দর আলী মজিদ মাতব্বরকে প্রশ্ন করলেন, 'মজা করছেন?'

মজিদ মাতব্বর শব্দর আলীর চোখের দিকে সরাসরি চোখ রেখে জবাব দিলেন, 'প্রথম পরিচয়ে মজা করার মতো মানুষ আমি নই ভাইসাহেব।'

লিলি এক হাত লিখনের পিঠের উপর রাখল।ডাকল, 'ভাইয়া।'

লিখন লিলির হাতটা মুঠোয় নিয়ে ঢোক গিলল। বলল, 'বিয়ে হবে না তো কী? বলেছি যখন দেখাবোই।'

'ভাইয়া তোর চোখে জল।'

লিখন দ্রুত হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পরিবেশ থম মেরে গেছে। কেউ কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না। লিলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার ভাইয়ার দিকে। পদ্মজা নামের মেয়েটাকে নিয়ে কত গল্প শুনেছে সে। মেয়েটা তার বয়সী শুনে লিলি খুব হেসেছিল। তার ভাইয়া এতো ছোট মেয়ের প্রেমে পড়েছে! দিনগুলো কত যে সুন্দর ছিল! মেট্রিক পরীক্ষার সময় বার বার খোঁজ নিয়েছে কবে শেষ হবে পরীক্ষা। যেদিন শেষ হলো সেদিন থেকেই শুটিং শুরু হলো। কথা ছিল এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হবে। কিছু জরুরি কারণে আগে শুরু হয়ে গেল। তাই আসতে কয়েকদিন দেরি হলো। মজিদ মাতব্বর স্তব্ধতা কাটিয়ে বললেন, 'বিয়েটা একটা দূর্ঘটনার জন্য খুব দ্রুত ঠিক হয়েছে।'

লিখন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী দূর্ঘটনা?'

ফরিনা সন্দিহান গলায় বললেন, 'তার আগে তুমি কও তো, পদ্মজার লগে কী তোমার প্রেম-ট্রেম আছিল?'

লিখন ফরিনার প্রশ্নে বিব্রতবোধ করল। ধীরকণ্ঠে জবাব দিল, 'না। শুধু আমার পক্ষ থেকেই।'

লিখনের উত্তরে ফরিনা সন্তুষ্ট হলেন। শব্দর আলী কী দূর্ঘটনা ঘটেছিল জানতে চাইলেন। মজিদ মাতব্বর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সব বলেন। সব শুনে লিখন আশার আলো দেখতে পায়। ভাবে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তাই অন্য কেউ পদ্মজাকে বিয়ে করবে না। এমনটা ভেবেই হয়তো পদ্মজার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে যদি এখুনি বিয়ে করতে রাজি থাকে। তাকে ফিরিয়ে না দিতেও পারে। আর পদ্মজা কী বিন্দুমাত্র ভালোবাসে না তাকে? বাসে, নিশ্চয় বাসে। লিখন নিজেকে নিজে স্বান্তনা দেয়। শব্দর আলী আফসোস নিয়ে বললেন, 'কী আর করার! পরিস্থিতি হাতের বাইরে।'

'আপনারা কিন্তু বিয়ে শেষ করে তবেই যাবেন।'বললেন মজিদ মাতব্বর।

ফাতিমা মতামত জানালেন দৃঢ়ভাবে, 'না, না আজই চলে যাব। এই গ্রামে আর এক মুহূর্ত না।'

শব্দর আলী মৃদু করে ধমকে বললেন, 'কী বলছো? কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা। এখন ট্রেন পাবে কোথায়? কাল ভোরে না হয় চলে যাব।'

রিদওয়ান অনুরোধ করে বলল, 'বিয়েটা শেষ হওয়া অবধি থেকে যান। দেখুন, মেহমান হয়ে এসেই অপ্রত্যাশিত খবর শুনলেন। এজন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু তো করার নেই। মেয়েটা জলে ভাসবে বিয়েটা না হলে।'

লিখন সঙ্গে,সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'পদ্মজাকে ফেলনা ভাবছেন কেন? কেউ অপবাদ দিলেই কী সে পঁচে যায়?'

রিদওয়ান কিছু বলতে গেলে মজিদ মাতব্বর কড়া চোখে তাকিয়ে থামতে বললেন। এরপর শিখাকে ডেকে বলেন, 'উনাদের ঘরে নিয়ে যাও। আর আপনারা না করবেন না।

আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি। বিয়ে অবধি না থাকুন। রাতটা থেকে যান।’

বাধ্য হয়ে ফাতিমা থাকতে রাজি হলেন। তিনি রাগে ফোঁসফোঁস করছেন। সব রাগ পড়েছে হাওলাদার বাড়ির উপর। মনে মনে এই বাড়ির বিনাশ চাইছেন তিনি। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। লিখন তার চোখের মণি। নয়তো কী গ্রামের মেয়ে নিতে আসতেন! আর সেই ছেলের মন এভাবে ভাঙল! ঘরে ঢুকেই চোখের চশমা ছুঁড়ে ফেলেন বিছানায়। কটমট করে শব্দর আলীকে বললেন, ’তোমার না এক বন্ধু আছে মেজর। তাকে কল করে বলো মেয়েটাকে তুলে এনে লিখনের সাথে বিয়ে দিতে। আমার ছেলেকে হারতে দেখতে পারব না।’

‘আহ! চুপ করো তো। সব জায়গায় ক্ষমতা চলে না। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করো।’

‘কিসের পরিস্থিতি? তুমি জানো, তোমার ছেলের ব্যাক্তিগত ডায়রিতে আগে শুধু আমার নাম ছিল। সেখানে এখন বেশিরভাগ পদ্মজা নামটা লিখা। কতটা পাগল এই মেয়ের জন্য। এখন মেয়েটাকে ছেড়ে শহরে চলে গেলে, ছেলের দেবদাস রূপ দেখতে হবে। আর আমি তা পারব না।’

শব্দর আলী পায়ের মোজা খুলতে খুলতে বিরক্তি নিয়ে বললেন, ’তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি পারব না। ক্লান্ত আমি। শান্তি দাও।’

ফাতিমা কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। লিলি ঘরে ঢুকেছে। লিখন আসেনি। আমেনা লিলিকে বললেন, ’লিখন কোথায়?’

‘কী জানি! ভাইয়া ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।’

রোদের কঠিন রূপ শীতল হয়ে এসেছে। মৃদু বাতাস বইছে। তবুও লিখন ঘামছে। সে পদ্মজাদের বাড়ি যাচ্ছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মাথায় শুধু কয়টা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, ’আমি কী পাগলামি করছি? এতো আয়োজন ভেঙ্গে কী আমার হাতে তুলে দিবেন পদ্মজাকে? পদ্মজা আমাকে দেখলে কী কাঁদবে? ভালোবাসেনি একটুও? মায়া নিশ্চয় জমেছে?’লিখন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে, ’আল্লাহ, সব যেন ভালো হয়।’

পূর্ণা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে। বাড়ির পিছনে গীত গাইছে অনেকে। সাথে তাল মিলিয়ে দুই বুড়ি নাচ করছে। পুরো বাড়ি সাজানো হচ্ছে রঙিন কাগজ দিয়ে। উঠানের এক কোণে লাল বড় গরু বাঁধা। বিয়ে উপলক্ষে জবাই করা হবে। চারিদিকের এতো আনন্দ পূর্ণার মন ছুঁতে পারছে না। প্রথমত, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত! কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, পদ্মজার জন্য লিখন শাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার পছন্দ হচ্ছে না। সব মিলিয়ে সে বিরক্ত। চোখ ছোট করে বাচ্চাদের খেলা দেখছে। হুট করে চোখে ভাসে লিখনকে। পূর্ণা দ্রুত চোখ কচলে আবার তাকাল। সত্যি তাই। খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় পদ্মজার ঘরে। পদ্মজার কানে কান গিয়ে বলে, ’লিখন ভাই আসছে। তুমি কিন্তু পালিয়ে যাবে আপা। এই বিয়ে কিছুতেই করবে না।’

কথা শেষ করে খুশিতে আবার ছুটে যায় বারান্দায়। এমন দিনে লিখনের উপস্থিতি পদ্মজাকে অপ্রস্তুত করে তুলে। গলা শুকিয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। লিখন বাড়িতে ঢুকে অবাক হয়ে সব দেখে। কত আয়োজন! কত মানুষ! তার স্বপ্নের রানি পদ্মজার বিয়ে। কিন্তু তার সাথে না। ভাবতেই, লিখনের বুক ছ্যাঁত করে উঠল। মেয়েরা খুব আগ্রহ নিয়ে সুদর্শন লিখনকে দেখছে। লিখন পূর্ণাকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে আসল। প্রশ্ন করল, ’কেমন আছো পূর্ণা?’

পূর্ণা খুশিতে উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয়, ’ভালো,খুব ভালো। ভাইয়া আপনি...’

পূর্ণা থেমে গেল। অনেকে তার উচ্চ গলার স্বর শুনে তাকিয়ে আছে। তাই পূর্ণা চুপসে গেল। আস্তে আস্তে বলল, ’এতো দেরিতে আসলেন কেন? আপার তো বিয়ে। আপনি

আপাকে নিয়ে পালিয়ে যান।'

পূর্ণার এহেন কথায় লিখন হাসে। আদুরে কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আন্টি কোথায়?'

পূর্ণা ঝটপট করে বলল, 'আপনি আসুন ঘরে। আমি আম্মাকে নিয়ে আসছি।'

লিখনকে সদর ঘরে বসিয়ে পূর্ণা ছুটে গেল রান্নাঘরে। হেমলতা রান্না করছিলেন। পাশে অনেকে আছে। পূর্ণা ইশারায় বাইরে আসতে বলে। হেমলতা হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে, 'লিখন ভাই আসছে।'

'কোথায়? বসতে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, দিছি। তুমি আসো।'

হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে সদর ঘরে আসেন। এসে দেখেন দুজন বয়স্ক মহিলা অনবরত লিখনকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে কই থেকে এসেছে? এই বাড়ির কী হয়? পদ্মজার মতো চোখ কেন? পদ্মজার আসল বাপের ছেলে নাকি। এমন আরো যুক্তিহীন কথাবার্তা। হেমলতা সবাইকে উপেক্ষা করে লিখনকে বললেন, 'লিখন তুমি আমার সাথে আমার ঘরে আসো।'

লিখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। হেমলতার পিছু পিছু চলে যায়। অনেকের নজরে তা আসে। একজন আরেকজনকের সাথে আলোচনা করতে থাকে লিখন শাহকে নিয়ে। সবাই ভেবে নিয়েছে পদ্মজা যার সন্তান এই ছেলেও তার সন্তান। এজন্যই সবার মাঝ থেকে তুলে নিয়েছে। নয়তো তো কথায় কথায় ধরা পড়ে যাবে। লিখনকে মোড়ায় বসতে দিলেন হেমলতা। লিখন কীভাবে কী শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হেমলতা শুরু করলেন, 'আমি জানি তুমি কী বলবে। তোমার দুইটা চিঠি আমি পড়েছি।'

লিখন চমকে তাকাল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। হেমলতা বলেন, 'দেখো লিখন,পরিস্থিতি আর হাতে নেই। অন্য সময় হলে আমি পদ্মজাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম। তুমি নম্র-ভদ্র বুদ্ধিমান ছেলে। কমতি নেই কিছুতেই। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। তবুও পদ্মজা তোমাকে নিজের মুখে যদি চায় আমি তাৎক্ষণিক তাকে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু সে চাইবে না। কারণ,সে তোমাকে ভালোবাসে না। আমার কথাগুলো শুনে কষ্ট পেয়ো না। আমি সরাসরি কথা বলি। পদ্মজার দৃষ্টি,অনুভূতি আমার চেনা। সে তোমাকে ভালোবাসেনি কখনো। তোমার মন ভাঙবে ভেবে মায়া হচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কষ্ট হবে ভেবেই বলছি ফিরে যাও।'

লিখন কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকে। চোখের দৃষ্টি রাখা মাটিতে। বলল, 'আন্টি মেয়ের ভালোবাসা দেখছেন, অন্যের সন্তানেরটা দেখবেন না?'

'অন্যের অনেক সন্তানই আমার মেয়েকে ভালবাসে। সবার কথা ভাবা কী সম্ভব?'

হেমলতার কথায় ভীষণ আহত হয় লিখন। তার মনে হচ্ছে সে কঠিন পাথরের সাথে কথা বলছে। দুই চোখ জ্বলছে ভীষণ। এখুনি কান্নারা ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসবে। ছেলে হয়ে কাঁদা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। লিখন নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। হেমলতা কঠিন স্বরে বললেন, 'তুমি পদ্মজার রূপের প্রেমে পড়েছো লিখন।'

লিখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকায়। বলে, 'আন্টি ক্ষমা করবেন কিছু কথা বলি। পৃথিবীতে যে কয়টা সফল প্রেমের গল্প আছে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ সৌন্দর্যের টান দিয়ে শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে ভালোবাসা গভীর হয়। মানুষটাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে,মানুষটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে ভালোবাসাটা আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। সময়ের ব্যবধানে সে মানুষটা শিরা উপশিরায় বিরাজ শুরু করে। তখন তার অন্যান্য গুণ চোখে ভাসে। ভালবাসা আরো বাড়ে। কারো কারো তো দোষও ভালো লেগে যায়। তখন অবস্থা এরকম হয় যে, রূপ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষটাকে আমার চাই। এজন্যই বুড়ো বয়সেও কুঁচকে যাওয়া মানুষটাকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। অথচ শুরুটা হয় সৌন্দর্য দিয়ে। আন্টি,আমি পদ্মজার রূপে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম এটা সত্যি। কিন্তু গত কয়েক মাসে সারাক্ষণ পদ্মজাকে ভাবতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যি পদ্মজাকে ভালোবেসে ফেলেছি। পদ্মজার রূপ আগুনে ঝলসে গেলেও এমন করেই

বাসবো। প্লীজ আন্টি কথাগুলো শুটিংয়ের ডায়লগ ভেবে উড়িয়ে দিবেন না। বাস্তব জীবনে মুখস্থ ডায়লগ আমি আওড়াই না।'

লিখনের কণ্ঠ গম্ভীর কিন্তু চোখে জল ছলছল করছে। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে যান। কী জবাব দিবেন? ভালোবাসার বিরুদ্ধে কোন শক্তি কাজে লাগে? আদৌ কী ভালবাসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়? তিনি সময় নেন। এরপর বলেন, 'আমার পদ্মজা তোমার কাছে খুব ভাল থাকতো লিখন। কিন্তু কিছু সমস্যা সমাজে আছে। যার মুখোমুখি আমি হয়েছি। জেনেশুনে আমার মেয়েকে সেসবের মুখোমুখি কি করে হতে দেই?'

লিখন হাতজোড় করে বলল, 'প্লীজ আন্টি!'

হেমলতা একদৃষ্টে লিখনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এমন তো কখনো হয় না। পদ্মজার জন্মের পর সিদ্ধান্তহীনতায় তিনি কখনো ভুগেননি। যেকোনো একটাই বেছে নিয়েছেন। আর তাতেই মঙ্গল হয়েছে। এবার কেন এমন হচ্ছে? কেন তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন। পদ্মজার জীবন নিয়ে তিনি যেন মাঝ নদীতে ভেসে আছেন। চারদিকে স্রোত। মাঝি নেই, বৈঠা নেই। আমির না লিখন? কার কাছে ভাল থাকবে পদ্মজা? হেমলতার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। তিনি দূর্বল কণ্ঠে বলেন, 'এতো বুঝো যখন নিজেকেও সামলাতে পারবে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'আন্টি, আমার বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে।'

'পদ্মজার সাথে যা হয়েছে তবুও সে বেঁচে আছে। আর তুমি এইটুকু মানিয়ে নিতে পারবে না?'

লিখন আর কথা খুঁজে পেল না। আহত মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেমলতা দাঁড়াতে বললেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, তবুও হেঁটে এগিয়ে আসেন। লিখনের সামনে এসে দাঁড়ান। বললেন, 'নিজেকে শক্ত রেখো। অনেক দূর চলা বাকি। কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। সব যেহেতু আয়োজন হয়ে গেছে আর ভেবে লাভ নেই। তবে, কবুল বলার আগেও যদি পদ্মজা বলে, তার তোমাকেই চাই। আমি সব ভেঙেচুরে পদ্মজাকে নিয়ে ছুটে যাব তোমার বাড়ি। আমি আমার মেয়েটাকে ভীষণ ভালোবাসি বাবা। এই মেয়েটার সুখের জন্য আমি স্বার্থপর হয়েছি। অন্যের সন্তানের কষ্ট চোখে ভেসেও, ভাসছে না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

হেমলতার চোখে জলের ভীর। লিখন ভীষণ অবাক হয়ে দেখে এই কঠিন মানুষটাকে। হেমলতা নিজের দূর্বলতা, নিজের কান্না কেন দেখাল লিখনকে? লিখন জবাব খুঁজে পেল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল হেমলতার কাছে জীবন মানে পদ্মজা। লিখন ভাঙা গলায়'আসি'বলে চলে গেল। হেমলতা সব কাজ ভুলে গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। মনের শক্তি কমে গেছে। দূর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। নিজের উপর বিশ্বাস, আস্থা পাচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা খুঁজে পাচ্ছেন না।

পর্ব ২৪

বারান্দার গ্রিলে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে পদ্মজা।

তার পরনে শাড়ি রয়ে গেছে। আকাশের বুকে থালার মতো একখান চাঁদ। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝিকমিক করছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। খুব সুন্দর দৃশ্য।

'পদ্ম...'

পদ্মজা কেঁপে উঠে,পিছনে ফিরে তাকাল। মোর্শেদকে দেখতে পেয়ে গোপনে হাঁফ ছাড়ল । মোর্শেদ বললেন, 'তোর মায়ে কী আর উঠে নাই?'

'না, আব্বা।'

মোর্শেদ চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছু ভাবলেন। তারপর বলেন, 'তুই হজাগ ক্যান? যা ঘরে গিয়া ঘুমা। আমি ঘাটে যাইতাছি।'

'আচ্ছা, আব্বা।'

মোর্শেদের যাওয়ার পানে পদ্মজা তাকিয়ে রইল। সে কী যেন ভাবছে কিন্তু কী ভাবছে ধরতে পারছে না। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে উদাসীনতা কেটে গেল। শাড়ির আঁচল টেনে সাবধানে হেঁটে সদর ঘরে ঢুকল। সদর ঘরে পাটি বিছিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়রা ঘুমাচ্ছে। তাদের ডিঙিয়ে পদ্মজা হেমলতার ঘরে আসে। হেমলতা ঘুমাচ্ছেন বেঘোরে। শুনেছিল,লিখন শাহ কে নিয়ে তার মা নিজ ঘরে এসেছিলেন। এরপর কী হলো কে জানে! সন্ধ্যার পর পূর্ণা গিয়ে জানাল,আম্মা ঘুমাচ্ছে। হেমলতা কখনো সন্ধ্যা সময় ঘুমান না। তাই পদ্মজা ঘোমটা টেনে হেমলতার ঘরে ছুটে আসে। হেমলতাকে এত শান্তিতে ঘুমাতে কখনো দেখেনি পদ্মজা। তাই আর ডাকেনি। কেউ ডাকতে আসলে, তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমাচ্ছে যখন ঘুমাক না। এখন মধ্য রাত। পদ্মজা হেমলতার মুখের সামনে মাটিতে বসে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। গলা কাঁপছে তার। শ্বশুর বাড়ি কীভাবে থাকবে সে! মাকে ছাড়া দুইদিন থাকতে গিয়ে এতো বড় ঝড় বয়ে গেল। আর এখন সারাজীবনের জন্য মায়ের ছায়া ছেড়ে দিতে হবে। এই মুখটা না দেখলে তার দিন কাটে না। এই মানুষটার আদুরে,শাসন ছাড়া দিন সম্পূর্ণ হয় না। পদ্মজা বিছানায় মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে উঠল। অস্ফুট করে ডাকল, 'আম্মা।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা চোখ খুলেন। পদ্মজা খেয়াল করল না। সে কাঁদতে কাঁদতে চাপা স্বরে বলছে, 'তোমাকে ছাড়া কেমনে থাকব আম্মা! বিয়ে করাটা কী খুব দরকার ছিল।'

'ছিল।'

পদ্মজা চমকে উঠে মাথা তুলল। গলার স্বর আগের অবস্থানে রেখে বলল, 'কেন আম্মা?'

'সব জানতে নেই মা।'

পদ্মজা মাথা নত করে নাক টানে। হেমলতা বললেন, 'বিয়ে হতেই হবে। বর বদল হলে সমস্যা নেই। তোর কী আর কাউকে পছন্দ?'

হেমলতার প্রশ্নে পদ্মজা বিব্রত হয়ে উঠল। হেমলতাও প্রশ্নটা করতে গিয়ে অস্বস্থি বোধ করেন। পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়িয়ে জানাল, তার আলাদা করে কাউকে পছন্দ নেই। হেমলতা উঠে বসেন। চুল খোঁপা করতে করতে প্রশ্ন করেন, 'রাত কী খুব হয়েছে? মানুষের সাড়া নেই।'

'মাঝ রাত।'

'আর তুই জেগে থেকে কাঁদছিস?'হেমলতা বললেন। মৃদু ধমকের স্বরে।

পদ্মজা নিরুত্তর। হেমলতা জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন,চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। চাঁদের আলো গলে ঘরের মেঝেতে পড়ছে। জ্যোৎস্না রাত। তিনি বিছানা থেকে নামতে নামতে পদ্মজাকে তাড়া দেন, 'শাড়ি পাল্টে সালোয়ার-কামিজ পরে নে।'

‘কেন আম্মা?’

‘যা বলছি কর।’

পদ্মজা ঘরে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। উঠানে এসে দেখে,হেমলতার হাতে বৈঠা। পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ’আম্মা,তুমি নৌকা চালাবা?’

‘পূর্ণারে নেব? নেওয়া উচিত। যা ওকে ডেকে নিয়ে আয়। প্রান্ত,প্রেমা যেন টের না পায়।’

পদ্মজা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। হেমলতা তাড়া দেন, ’যাবি তো।’

পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্ণাকে নিয়ে ফিরল। পূর্ণা ঘুমে ঢুলছে। হেমলতা ঘাটে এসে দেখেন মোর্শেদ নৌকায় বসে বিড়ি ফুঁকছেন।

‘নৌকা ছাড়ো।’

মোর্শেদ দুই মেয়ে আর বউকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে হেমলতা যেভাবে বললেন,নৌকা ছাড়ো, আরো ভড়কে গেলেন। চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন, ’ক্যান? কিতা অইছে?’

মোর্শেদের জবাব না দিয়ে পদ্মজা,পূর্ণাকে নিয়ে হেমলতা নৌকায় উঠে পড়েন। স্থির হয়ে বসেন। বৈঠা মোর্শেদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলেন, ’জ্যোৎস্না রাতের নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা। তুমি এখন আমাদের মাঝি।’

হেমলতা থামেন। এরপর আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, ’লও মাঝি বৈঠা লও। ছাড়ো তোমার নৌকা। যত সিকি চাইবা তুমি ততই পাইবা।’

একসাথে চারটা দুঃখী মানুষ হেসে উঠে। মোর্শেদ বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা ছাড়েন। হুট করেই যেন অনুভব করছেন, যুবক কালের রক্ত শরীরে টগবগ করছে। এইতো তার সংসার, এইতো তার আনন্দ।

রাতের নির্মল বাতাস। মাদিনী নদীর স্বচ্ছ জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি। কচুরিপানারা ভেসে যাচ্ছে। সবকিছু সুন্দর মুগ্ধকর। পূর্ণার বুকের ভারটা খুব হালকা লাগছে। পদ্মজা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। রগে রগে শান্তি ঢুকে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেকোনো দুঃখী মানুষকে সুখী অনুভব করানোর মন্ত্র ঢেলে দিয়েছেন।

‘মোর্শেদ নাকি গো?’

হিন্দুপাড়া থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে ডাকল। মোর্শেদ এক হাত তুলে জবাব দিলেন, ’হ দাদা আমি।’

‘রাইতের বেলা যাইতাছ কই?’

‘মেয়ে-বউ লইয়া জ্যোৎস্না পোহাইতে বাইর হইছি দাদা।’

‘তোমাদেরই দিন মিয়া।’

মোর্শেদ আর কিছু বললেন না। হাসলেন। ওপাশ থেকেও আর কারো কথা শোনা গেল না। নৌকা আটপাড়া ছেড়ে হাওড়ে ঢুকে পড়েছে। সাঁ,সাঁ করে বাতাস বইছে। গায়ের কাপড় উড়ছে। হেমলতা দুই মেয়ের মাঝে এসে বসেন। তিনি চাদর নিয়ে এসেছেন। দুই মেয়েকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে চাদরে ঢেকে দেন। বাতাসে চাদর উড়ে আরো আওয়াজ তুলছে। চাঁদটা একদম মাথার উপর। তাদের সাথে সাথে ঘুরছে! মোর্শেদ মনের সুখে গান ধরেন-

লোকে বলে বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূণ্যেরও মাঝার।।
ভালা কইরা ঘর বানাইয়া
কয়দিন থাকমু আর
আমি কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি

পাকনা চুল আমার।
লোকে বলে ও বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

পাকনা চুল আমার বলতেই পূর্ণা ফিক করে হেসে ফেলল। পদ্মজাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আব্বা বোধহয় এখনো জোয়ান থাকতে চায়।'

পদ্মজা হেসে চাপা স্বরে বলে, 'চুপ থাক। আব্বা কী সুন্দর গায়।'

মোর্শেদ গেয়ে যাচ্ছেন-

এ ভাবিয়া হাসন রাজা
হায়রে,ঘর-দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়
তাই ভাবিয়া কান্দে।।
লোকে বলে ও বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

জানত যদি হাসন রাজা
হায়রে,বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা
করিয়া রঙিন।।
লোকে বলে ও বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

মোর্শেদ থামেন। তিন মা-মেয়ে একসাথে হাতের তালি দিল। হাতের তালিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠল। এতো সুন্দর সময়! এতো সুন্দর রাত বার বার ফিরে আসুক। মোর্শেদ হা করে তাকিয়ে থাকেন সামনে থাকা তিনটা মানুষের দিকে। তাদের চোখেমুখে খুশি ঝিলিক মারছে। অথচ,তিনি জানেন একেকজন কতোটা দুঃখী। মোর্শেদ ঢোক গিলে লুকায়িত এক সত্যের কষ্ট লুকিয়ে যান। হেমলতা আর তিনি ছাড়া এই কলিজা ছেঁড়া কষ্ট কেউ জানে না। মোর্শেদ হেসে বললেন,

'এই অভাগা মাঝিরে কী আপনারা আপনাদের মাঝে জায়গা দিবেন?'

মোর্শেদের কণ্ঠে শুদ্ধ ভাষায় মিষ্টি আবদার শুনে পদ্মজা পুলকিত হয়ে উঠল। ইশ! আজ সব কিছু কত সুন্দর! পূর্ণা বলে, 'দেব। এক শর্তে, নৌকা চালানোর বিনিময়ে সিকি যদি না নেন।'

মোর্শেদ মেয়ের রসিকতা দেখে হা হা করে হাসেন। সেই হাসি বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে কানে। তিনি বৈঠা রেখে এগিয়ে আসেন। হেমলতার সামনে বসেন। নৌকা নিজের মতো যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলছে। মোর্শেদ হেমলতাকে বলেন, 'দুইডা ছেড়িরে খালি তুমি ধইরা রাখবা? ছাড়তো এইবার। আয়রে তোরা আমারে ধারে আইয়া ব।'

পদ্মজা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। হেমলতা যেতে বলেন। পদ্মজা মোর্শেদের ডান পাশে বসে,আর পূর্ণা বাম পাশে। মোর্শেদ পূর্ণাকে এক হাতে, পদ্মজাকে আরেক হাতে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠেন। অপরাধী স্বরে বলেন, 'আমি বাপ হইয়া পারি নাই আমার ছেড়িদের বেইজ্জতির হাত থাইকা রক্ষা করতে। আমারে মাফ কইরা দিস তোরা।'

মোর্শেদ কখনো এতো আদর করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেননি। এই প্রথম ধরেছেন। আবার কাঁদছেন। পদ্মজার কোমল,নরম মন ব্যথিত হয়ে চোখ বেয়ে জল রূপে বেরিয়ে আসে। হেমলতা মোর্শেদের পায়ের কাছে বসেন। মোর্শেদের হাঁটুতে মাথা রেখে, দুই মেয়ের

হাত চেপে ধরে রাখেন। কেটে যায় অনেক মুহূর্ত। নৌকা হাওড়ের পানির স্রোতে একবার এদিক তো আরেকবার ওদিক যাচ্ছে। বাতাসে চার জনের চোখের জল শুকিয়ে ত্বকের সাথে মিশে গেছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে পদ্মজা বলল, 'জানো আম্মা, আজ আমি বুঝলাম, জীবনে সুখ বা দুঃখ কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়। দুঃখে মর্মাহত না হয়ে সুখের সময়টা তৈরি করে নিতে হয়। তাহলেই জীবনে সুখকর মুহূর্ত আসে। আবার সুখ সর্বক্ষণ সাথে থাকে না। দুনিয়ার লীলাখেলার শর্তে দুঃখ বার বার ফিরে আসে।'

হেমলতা পদ্মজার দিকে না তাকিয়ে,পদ্মজার ডান হাতে চুমু দেন। চাঁদটা অর্ধেক হয়ে এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি আকাশে মিলিয়ে যাবে।

হাওরে বিশাল জলরাশি। কখনো ঢেউয়ে উথাল-পাতাল, আবার কখনো মৃদু বাতাসে জলের ওপর চাঁদের প্রতিচ্ছবির খেলা। নৌকা বাজারের দিকে যাওয়ার পথ ধরেছে। তাই মোর্শেদ নিস্তব্ধ বৈঠক ভেঙে বৈঠা নিয়ে বসেন। নৌকা নিয়ন্ত্রণে এনে রাধাপুর হাওড়ের দিকে যেতে থাকেন। ওড়নার ঘোমটার আড়ালে কখন খোঁপা খুলে গেছে পদ্মজা খেয়াল করেনি। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজার চুল হাওড়ের জলে ডুবে আছে। তিনি মৃদু স্বরে পদ্মজাকে বললেন, 'চুল ভিজে যাচ্ছে পদ্ম।'

পদ্মজা দ্রুত সামলে নিল। খোঁপা করে ঘোমটা টেনে নিয়ে বলল, 'কখন খুলে গেছে খেয়াল করিনি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। হেমলতা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন এক মনে। পদ্মজা ডাকল, 'আম্মা?'

হেমলতা অশ্রুভরা চোখে তাকালেন। পদ্মজা কিছু বলার আগে তিনি বললেন, 'পূর্ণা গল্প শুনবি?'

পূর্ণা গল্প বলতে পাগল। সে গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল, 'শুনব।'

'কষ্টের গল্প কিন্তু।'

'গল্প হলেই হলো।'

হেমলতা হাসেন। পদ্মজা নড়েচড়ে বসে। সে আন্দাজ করতে পারছে তার মা কোন গল্প বলবে। হেমলতা দু'হাতে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে নেন। এরপর একবার মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে হাসেন। পিছন ঘুরে বসে প্রশ্ন করেন, 'মুখ না দেখে গল্প শুনতে ভাল লাগবে?'

পূর্ণা মুখ গোমড়া করে না বলতে যাচ্ছিল। পদ্মজা এক হাতে খপ করে ধরে আটকে দিল। মাকে বলল, 'সমস্যা নেই আম্মা। যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

হেমলতা বড় করে দম নিয়ে বলা শুরু করলেন, 'আব্বার প্রথম স্ত্রী মারা যায় অল্প বয়সে। আব্বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একজন বুদ্ধিমান, উদার মনের মানুষ ছিলেন। আম্মাকে যৌতুকের জন্য ধাক্কা মেরে বের করে দিল তার প্রথম স্বামী। মুখে তালাক দিল। বাপের সংসারে এসে সমাজের তোপে পড়তে হয় আম্মাকে। আব্বার উদার মন অবলা, অসহায় আম্মাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আমার নানার কাছে প্রস্তাব রাখেন। নানা সানন্দে রাজি হয়ে যান। রাজি হবেনই না কেন? স্বামীর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া বিবাহিত নারীকে কে ই বা বিয়ে করতে চায়? আম্মা,আব্বার বিয়ের বছর দেড়েক হতেই হানি আপার আগমন। তার দুই বছরের মাথায় আমার আগমন ঘটে।'

'সেদিন নিশ্চয় গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।'পদ্মজা বলল, পুলকিত হয়ে।

হেমলতা ম্লান হাসেন। বলেন, 'শুনেছি আমার গায়ের রং দেখে আম্মা নাক কুঁচকেছিলেন। আমার বয়স যখন তিন মাস আম্মার আগের স্বামী আম্মাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। আব্বার তখন আর্থিক সমস্যা বেশি ছিল। দিনে দুই বেলা খাওয়া সম্ভব ছিল না। বিপদে পাশে থাকা আমার আব্বাকে ছেড়ে,দুই বছরের এক মেয়ে আর তিন মাসের এক মেয়েকে ছেড়ে স্বার্থপর মা পালিয়ে গেল প্রথম স্বামীর কাছে। আব্বা ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে মাঝ নদীতে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ সহায় ছিলেন। আব্বার ফুফু চলে আসেন আমাদের কাছে। আপা আর আমার দায়িত্ব নেন। হুট করেই আব্বার আর্থিক অবস্থা উন্নত হতে থাকে। গৃহস্থিতে রহমত ঝরে পড়ে। পাঁচ বছর পর আম্মা ফিরে আসেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। ফর্সা মুখ মারের চোটে দাগে দাগে বিশ্রি হয়ে গেছে। শুধু একা আসেনি। দুই বছরের এক ছেলে নিয়ে ফিরেন। তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরের বদলে বিশাল বাড়ি হয়েছে। আব্বা প্রথম মানেননি। আম্মা আব্বার পায়ে পড়ে কাঁদেন। ক্ষমা চান। আব্বা আবার আগের ভুল করেন। মেনে নেন আম্মাকে। আম্মার ছেলের নাম বিনোধ ছিল, আব্বা নতুন নাম দেন হানিফ। আম্মা আমাকে

সহ্য করতে পারতেন না। আব্বার চোখের মণি ছিলাম। আব্বার আড়ালে আম্মার দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকি। ছয় বছর হতেই স্কুলে ভর্তি করে দেন আব্বা। হানি আপা তখন স্কুলে পড়ে। আমি…”

‘থামলে কেন আম্মা?’বলল পদ্মজা, অধৈর্য্য হয়ে।

হেমলতা ভ্রুকুটি করে বলেন, ’আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আম্মার ব্যাপারে। আম্মা অনুতপ্ত এখন। আফসোস করেন। কাঁদেন। বলতে ভাল লাগছে না।’

শীতল বাতাসে সবার শরীর কাঁটা দিচ্ছে। চাঁদটা ছোট হয়ে গেছে অনেক। মোর্শেদ এক ধ্যানে বৈঠা দিয়ে জল ঠেলে দিচ্ছেন দূরে নৌকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। হেমলতা আবার বলতে শুরু করেন, ’মেট্রিক দেয়ার পর আম্মা পড়াতে চাইছিল না। আব্বার জন্য ঢাকার কলেজে পড়ার সুযোগ পাই। হোটেলে উঠি। আব্বা নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। জানিস পদ্ম, কলেজে আমি সবার ছোট ছিলাম। সবাই হা করে তাকিয়ে থাকতো। শাড়ি পরতাম বলে একটু বড় লাগতো অবশ্য। সবসময় সুতি শাড়ি পরে বেণী বেঁধে রাখতাম। কারো সাথে মিশতাম না। ভয় পেতাম খুব। ভীষণ ভীতু ছিলাম। রিমঝিম নামে খ্রিষ্টান এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়। মেয়েটা এতো সুন্দর ছিল দেখতে। ঠিক পদ্মজার মতো সুন্দর। চোখের মণি ছিল ঘোলা। তার নাকি শ্যামলা মানুষ ভাল লাগে তাই নিজে যেচে আমার সাথে বন্ধুত্ব করে। কয়েকদিনের ব্যবধানে আমরা খুব ঘণিষ্ঠ হয়ে পড়ি। ইংলিশে যাকে বলে,বেস্ট ফ্রেন্ড। রিমঝিমের সাথে মাঝে মাঝে ওর বড় ভাই আসতো। নাম ছিল যিশু। যিশু একদম রিমঝিমের আরেক রূপ।চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ছিল দুই ভাই-বোনের। যিশু ভাইয়া বলে ডাকতাম তাকে। যিশু ভাইয়া মজা করে বলতেন, ’ধর্ম এক হলে হেমলতাকেই বিয়ে করতাম।’পূর্ণা,পদ্মজা খারাপ লাগছে শুনতে?’

‘না আম্মা।’এক স্বরে বলল দুজন। পদ্মজা বলল, ’পরে কী হয়েছে আম্মা?’

‘তখন অলন্দপুর থেকে দুই সপ্তাহ লাগতো রাজধানীতে চিঠি পৌঁছাতে। কলেজ ছুটির পথে হানি আপার চিঠি পাই। পাশে রিমঝিম ছিল। যিশু ভাইয়া সবেমাত্র এসেছেন রিমঝিমকে নিয়ে যেতে। চিঠি পড়ে জানতে পারি,আব্বা হাওড়ে গিয়েছিলেন মাছ ধরতে। আব্বার পাশের নৌকায় সুজন নামে এক ছেলে ছিল। আব্বার নৌকায় চেয়ে কয়েক হাত দূরে। তখন ভারী বর্ষণ হচ্ছিল। বজ্রপাত হচ্ছিল একটার পর একটা। একটা বজ্রপাত সুজনের উপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুজন ঝলসে যায়। আব্বা ছিটকে পড়েন জলে। দূর থেকে এক দল জেলে ঘটনাটি দেখতে পায়। তারা আব্বাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়িতে। এরপর থেকেই আব্বা কানে শুনতে পায় না। ঠিক করে হাঁটতে পারে না। মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে। এই খবর শোনার পর হাউমাউ করে কান্না শুরু করি। যিশু ভাই সব শুনে,আমার কান্না দেখে বলেন,বিকেলের ট্রেনে অলন্দপুর নিয়ে যাবেন। আমি তখনও কাঁদছিলাম। একবার শুধু অলন্দপুর যেতে চাই। আব্বাকে দেখতে চাই। যদিও জানতাম,অনেকদিন হয়ে গেছে এই দূর্ঘটনার।

আটপাড়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যায়। বাড়ি এসে দেখি সদর ঘরের দরজায় তালা মারা। কেউ নেই বাড়িতে। মুরগি আর গরু-ছাগল ছাড়া। বারান্দার ঘরে দরজা ছিল না। ঘরও বলা যায় না। শুধু একটা চৌকি ছিল। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। চৌকিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে আম্মার চেঁচামেচিতে। যিশু ভাই নিজের অজান্তে আমার পাশে কখন ঘুমিয়ে পড়েন বুঝেননি। তিনি আমার মতোই ক্লান্ত ছিলেন। আমার জন্মদাত্রী মা গ্রামবাসী ডেকে চেঁচাতে থাকেন। হাতেনাতে ধরার মতো অবস্থা ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে ভড়কে যাই। কিছু বলতে পারিনি। যিশু ভাই সবাইকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে, কেউ বুঝেনি। তখন নিয়ম খুব কঠিন ছিল। যিশু ভাই খ্রিষ্টান শুনে সবাই আরো ক্ষেপে যায়। আব্বার সামনে আমাদের দুজনের মাথা ন্যাড়া করে দিল গ্রামবাসী। কোমর সমান চুল ছিল আমার। মাথা ন্যাড়া করতে গিয়ে মাথার চামড়া ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত আসে গলগল করে।

আম্মার তখন হুঁশ আসে। আমাকে বাঁচাতে আসে,পারেনি। গায়ের রং কালো তার উপর রক্তাক্ত ন্যাড়া মাথা। কী যে বিশ্রি রূপ হয়েছিল। আমি আমার একমাত্র ভরসা আব্বাকে চিৎকার করে ডেকে কেঁদেছি। আব্বা শুনেনি। আমার দিকে হা করে শুধু তাকিয়েছিল। যিশু ভাইয়াকে অনেক মারধর করে। সেদিন রাতেই আহত যিশু ভাইয়াকে ছুঁড়ে ফেলে আসে নদীর পাড়ে। গরুর ঘরে গোবরের উপর বেঁধে রাখে আমাকে। দূরদূরান্তরের মানুষ দেখতে আসে। আমি তখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিজের মৃত্যু কামনা করেছি। একবার বাঁধনছাড়া হলে আত্মহত্যা করব ভাবি। হাত বাঁধা ছিল। দাঁত দিয়ে নিজের হাঁটুতে বোকার মতো কামড় দিতে থাকি একটার পর একটা, যাতে মরে যাই। যে ই দেখতে আসতো সেই বিশ্রি গালি দিয়ে যেত। কেউ কেউ লাথি দিয়েছে। রাধাপুরের হারুন রশীদ আছে না? উনার আব্বা তখন অলন্দপুরের মাতব্বর ছিলেন। উনার গোয়ালঘরেই বন্দি ছিলাম।।দুই দিন পর আমাকে ছাড়ে। ছাড়া পেয়েই ইচ্ছে হচ্ছিল, গলায় কলসি বেঁধে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেই। কিন্তু পারিনি। শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। দৌড়ে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি গোয়ালঘরের বাইরে। ধারালো কিছু একটা ছিল মাটিতে। মাটিতে পড়তেই হাতের বাহু ছিঁড়ে গলগল রক্তের ধারা নামে। এই যে আমার বাহুর দাগটা। এটা সেদিনই হয়েছে।'

হেমলতা মেয়েদের দাগটা দেখানোর জন্য ঘুরে তাকান। দেখেন তার দুই মেয়ে মুখে হাত চেপে কাঁদছে। হেমলতা হাসার চেষ্টা করে বললেন, 'তোরা মরাকান্না শুরু করেছিস কেন?'

হেমলতার কথা শেষ হতেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুই মেয়ে ছুটে আসে তার দিকে। নৌকা দুলে উঠে। হেমলতা চমকে গিয়ে দ্রুত নৌকা ধরেন। চিৎকার করে উঠেন, 'আরে...'

কথা শেষ করতে পারেননি। তার পূর্বেই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই মেয়ে। জড়িয়ে ধরেই আম্মা আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। দুই মেয়ে এতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যে,হেমলতার মনে হচ্ছে এখুনি দম বেরিয়ে যাবে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। হেমলতা দুজনের পিঠে হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারা কেঁদে চলেছে। হেমলতা মোর্শেদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নৌকা ঘুরাও। এদের আর কিছু বলব না। আর ঘুরব না।'

পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকে বলল, 'আর কাঁদব না। পূর্ণা আর কাঁদিস না। কিন্তু তোমাকে জড়িয়ে রাখব।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় চুমু দিয়ে বললেন, 'আমাদের এক ঘরে করে দেওয়া হলো। বাজারে ভেষজ উপায়ে আব্বার চিকিৎসা চলছিল। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আমার পরিবারের মুখও দেখতে চায় না। দেখলেই এটা ওটা ছুঁড়ে দিত। বলা হয়নি,সেদিন রাতে আব্বা,আম্মা,হানিফ মামার বাড়ি ছিল। মামার বাড়ির পাশের বাড়িতে ডাক্তার ছিল একজন। আব্বাকে দেখাতে গিয়েছিল। হানি আপার বিয়ে দেয়ার জন্য আম্মা উঠেপড়ে লাগে। তখন হিমেল আম্মার পেটে। সাত মাস চলে। আমার উপর আম্মার মার প্রতিদিন চলতেই থাকে। আমার জন্য পরিবারের এতো ক্ষতি হলো। হানিফ স্কুলে যেতে পারে না। সবাই দূর দূর করে। হানি আপার বিয়ে হয় না। আব্বার চিকিৎসা হয় না। বিপদ-আপদে কেউ পাশে আসে না। ওদিকে হিমেল আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। কোনো দাত্রী আসেনি। আম্মা একা যুদ্ধ করে হিমেলকে জন্ম দিল। সব মিলিয়ে জীবনটা নরক হয়ে উঠে আমার। বছর দুয়েকের মধ্যে আব্বা কিছুটা সুস্থ হয় আল্লাহর রহমতে। হাঁটাচলা করতে পারেন। আগের মতো সবকিছু না বুঝলেও মোটামুটি বুঝতেন। হানি আপার বিয়ে ঠিক হলো। বনেদি ঘর থেকে প্রস্তাব আসে। শর্ত পাঁচ বিঘা জমি দিতে হবে। আমাদের জমি ছিল সাড়ে পাঁচ বিঘা। আম্মা পাঁচ বিঘা জমি দিয়েই হানি আপার বিয়ে দিলেন। সবকিছু স্বাভাবিক হয়। যদিও মাঝে মাঝে অনেকে কথা শুনিয়েছে। একসময় আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তোদের আব্বার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে জানতে পারি তোদের আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী আমি।'

শেষ কথাটা হেমলতা মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে বলেন। মোর্শেদ চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নত হন। পূর্ণা খুব অবাক হয়ে মোর্শেদের দিকে তাকাল। হেমলতা পূর্ণাকে নিজের দিকে

ফিরিয়ে বলেন, 'আব্বাকে ভুল বুঝিস না মা। ভালোবাসার উপর কিছু নেই। ভালোবেসে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আমাকে জানতে দেয়নি। একসময় বিরক্ত হয়ে অনেক মারধোর করে। ভীষণ বদমেজাজি আর জেদি ছিল তোদের আব্বা। জোর করে তোদের দাদা বিয়ে করিয়েছেন। তাই রাগ মেটাতো আমার উপর। আচ্ছা বাদ সেসব কথা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জান বাঁচানোর তাগিদে মানুষ পালাতে থাকে। অলন্দপুরে পাকিস্তানি ক্যাম্প তৈরি হয়। শহর থেকে একটা দল আসে যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে। তোদের আব্বা তার প্রথম স্ত্রীর কাছে বেশি থাকতো। আর তোর দুই চাচা যুদ্ধে চলে যায়। আমি একা ছিলাম খালি বাড়িতে। চারিদিকে অত্যাচার, জুলুম। ইচ্ছে করে দেশের জন্য কিছু করতে। মনে সাহস নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি কমান্ডার আবুল কালামের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। প্রধান শিক্ষক গোপনে গ্রামের যুবক-যুবতীদের অনুপ্রেরণা দিতেন যুদ্ধের জন্য। এ খবর একসময় পাকিস্তানিরা পেয়ে গেল। তিনি শহিদ হলেন। ট্রেনিং-এ জয়েন করি। হয়ে উঠি একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম অপারেশনে আমরা সফল হই। অলন্দপুরের ক্যাম্প উড়িয়ে দেই। এরপর চলে যাই আরেক এলাকায়। হাতে রাইফেল নিয়ে পরবর্তী অপারেশনে নামি। তখন ধরা পড়ে যাই পাকিস্তানিদের হাতে। বন্দি করে কারাগারে। স্বচক্ষে দেখি ধর্ষণ, শারিরীক অত্যাচার। কী বর্বরতা তাদের! রড দিয়ে পিটিয়েছে। পিঠের দাগগুলো এখনো আছে। আরো কয়দিন থাকলে হয়তো আমিও ধর্ষণ হতাম। তার আগেই আবুল কালামের বুদ্ধির কাছে হেরে গেল তারা। ফেরার আগে চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে দুইজনকে ছুরি দিয়ে মৃত্যুর দোয়ারে পাঠিয়ে আসি। দেশ স্বাধীন হয়। চারিদিকে স্বাধীনতার উল্লাস। হাসপাতালে তখন ভর্তি আমি। আরো অনেকে ছিল। সেই হাসপাতালেই ভর্তি ছিল যিশু। সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। রিমঝিমের সাথে ফের দেখা হলো। এক মাস লাগলো সুস্থ হতে। ফেরার সময় সাথে আসে রিমঝিম আর যিশু ভাইয়া। পথে বার বার করে বলি, তোমাদের মতো দেখতে যেন আমার একটা মেয়ে হয়। অলন্দপুরের বাজারে নামিয়ে দিয়ে ওরা আর আসেনি। ফের যদি গ্রামের লোক দেখে ফেলে। কিন্তু আশঙ্কাই ঠিক হলো। অনেকে যিশু ভাইয়ের সাথে আমাকে দেখে ফেলে। বাড়িতে ফিরে তোর আব্বাকে দেখি। তিন মাস পর জানতে পারি আমার পদ্ম আমার পেটে। মনে প্রাণে একটা সুন্দর মেয়ে চাইতে থাকি আল্লাহর কাছে। ঘুমালে স্বপ্ন দেখি রিমঝিমকে। আমার মন খুব চাইতো রিমঝিমের মতো সুন্দর মেয়ে। ঠিক তাই হলো। কিন্তু বদনাম রটে গেল। অনেকে বলে তারা যিশুর সাথে আমাকে দেখেছে। এতদিন যিশুর কাছে ছিলাম।।তারই সন্তান পদ্মজা। এজন্যই এত সুন্দর। আর এতো মিল। তোদের আব্বাও বিশ্বাস করল। আল্লাহ চাইলে সব পারে কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু জানিস পদ্ম? তুই জন্মের পর থেকেই আমি অলৌকিক ভাবে খুব শক্ত আর কঠিন হয়ে পড়ি। কেউ কিছু বললে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দেই। তোর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে আসলে দা নিয়ে তেড়ে যাই। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। তার মধ্যে কমান্ডার আবুল কালাম আসেন অলন্দপুরে। গ্রামের অনেকে যুদ্ধে গিয়েছিল। আমি ছাড়া আর একজন ফিরেছিল। বদর উদ্দিন নাম। বদর উদ্দিন এবং আবুল কালামের কাছ থেকে গ্রামবাসী জানতে পারে আমিও যুদ্ধ করেছি। হেমলতা একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ খবর শোনার পর থেকে সবাই মোটামুটি সমীহ করে চলতে থাকে। একটা শক্ত জায়গা দখল করে বাঁচতে থাকি। প্রতিটি ঘটনা আমাকে ভেতরে ভেতরে শক্ত করেছে। তুই জন্মের পর বুঝেছি, আমি অনেক কিছু পারি। একা চলতে পারি।'

কথা শেষ করে হেমলতা হাঁফ ছাড়েন। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আযান পড়বে। পদ্মজা,পূর্ণা স্তব্ধ।

'এই দুনিয়ায় বাঁচার দুটি পথ- চুপ থাকো, নয় প্রতিবাদ করো। কিন্তু আমার নিয়ম বলে, সামনে চুপ থেকে আড়ালে আবর্জনাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যাতে এই আবর্জনার প্রভাবে আর কিছু না পঁচে।'

কী জানি কেন হেমলতার শেষ কথাগুলো পদ্মজার রগে রগে শিহরণ জাগায়। সে দূরে চোখ রেখে কিছু ভাবতে থাকে। মানুষের জীবনে কত গল্প! কত যন্ত্রনা! হেমলতা নৌকা ঘুরাতে বলেন। মোর্শেদ নৌকা ঘুরায়। বাড়ি ফিরতে হবে। আজ পদ্মজার গায়ে হলুদ। নৌকা চলছে ঢেউয়ের তালে তালে। আগের উত্তেজনাটা আর কাজ করছে না। একটা ইঞ্জিন ট্রলারের শব্দ পাওয়া যায়। চার জন চকিতে সেদিকে তাকায়। ট্রলারে একজন লোক। আরেকজন ট্রলারের ভেতর থেকে সাদা কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। আবছা আলোয় সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি দেখে পূর্ণার পিলে চমকে উঠল। মানুষ মরার পর সাদা কাপড়ে যেভাবে মোড়ানো হয়,ঠিক তেমন। পর পরই লোক দুটি মোড়ানো বস্তুটি ছুঁড়ে ফেলে পানিতে। মোর্শেদ চেঁচিয়ে উঠেন, 'কে রে?'

লোক দুটি তাকায় বোধহয়। এরপর দ্রুত ট্রলারের ভেতর চলে যায়। মোর্শেদ বৈঠা দ্রুত চালিয়েও ধরতে পারল না। ট্রলারটি চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি ফেলা হয়েছে,সেখানে মোর্শেদের নৌকাটি পৌঁছাতেই হুট করে পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে। হেমলতা আকস্মিক ঘটনায় চমকে যান। আতঙ্ক নিয়ে ডাকেন, 'পদ্ম...”

পদ্মজার দেখা নেই। তিনি নৌকা থেকে ঝাঁপ দিতে যাবেন তখনি পদ্মজা ভেসে উঠে। হাতে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি। পদ্মজা মুখ তুলেই হেমলতাকে বলল, 'আম্মা,আমি ঠিক ভেবেছি। এটা লাশ।'

পূর্ণা লাশ শুনেই কাঁপতে থাকে। অথচ পদ্মজা স্থির,ঠান্ডা।এই শেষ রাত্রিরে নদীর জলে ভেসে আছে দু'হাতে মৃত মানুষ জড়িয়ে ধরে!

লাশটি নৌকায় তুলতেই পূর্ণা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। মোর্শেদের পাশ ঘেঁষে বসে। তার মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে প্রেতাত্মারা তাকিয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঘাড় মটকে দেবে। ঘাড় মটকানোর কথা ভাবতেই পূর্ণার ঘাড় শিরশির করে উঠল।'ভূত,ভূত'বলে চেঁচিয়ে উঠে। হঠাৎ পূর্ণার চিৎকার শুনে মোর্শেদ ভয় পেয়ে যান। এমনিতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে লাশ দেখে। তিনি পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কোনহানে ভূত? ডরাইস না।'

মাথার কাছে বাঁধা দড়িটা খুলে কাপড় সরাতেই একটা মৃত মেয়ের মুখ ভেসে উঠে। হেমলতা,পদ্মজা দুজনই ভেতরে ভেতরে চমকে যায়। কিন্তু প্রকাশ করল না। হেমলতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে মানুষের উপস্থিতি দেখেন। এরপর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলেন, 'চিনি না তো। তুই চিনিস?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে জানাল, সে চিনে না। পরপরই মোর্শেদকে ডাকল পদ্মজা, 'আব্বা,দেখো তো তুমি চিনো নাকি?'

মোর্শেদ উঠে আসতে চাইলে পূর্ণা ধরে রাখে। মোর্শেদ পূর্ণাকে নিয়েই এগিয়ে আসেন। মৃত মেয়েটার মুখ দেখে বলেন, 'না,চিনি না।'

হেমলতা চিন্তায় পড়ে যান। শরীরের পশম কাঁটা দিচ্ছে। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা। হীমশীতল বাতাস। আর সামনে সাদা কাপড়ে মোড়ানো এক মেয়ের লাশ। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'কোন মায়ের বুক খালি হলো কে জানে!'

পদ্মজা বিড়বিড় করে, 'আমার এক জনকে চেনা লাগছে আম্মা।

হেমলতা ধৈর্য্যহারা হয়ে প্রশ্ন করেন, 'কে? চিনেছিস? নাম কী? জানিস?'

পদ্মজা ভাবছে। গভীর ভাবনায় ডুবে কিছু ভাবছে। হেমলতার প্রশ্নের জবাবে বলে, 'নাম জানি না আম্মা। দাঁড়াও আমি বলি লোকটা কেমন!'

পদ্মজা চোখ বুজে। কিছুক্ষণ আগের মুহূর্তে ফিরে যায়। চোখ বুজা অবস্থায় রেখে বলে, 'আব্বা যখন বললো, কে রে? তখন একটা লোক আমাদের দিকে তাকায়। লোকটার চোখগুলো ভীষণ লাল। অনেক মোটা, খুব কালো। মাথার চুল ঝুটি বাঁধা ছিল। এমন একজন লোক আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেকবার দেখেছি।'

কথা শেষ করেই পদ্মজা চোখ খুলে। খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'লোকটার দেখা পেলে আমি ঠিক চিনে ফেলব আম্মা।'

'চিনে কী হবে? প্রমাণ তো নেই। আর মেয়েটা মারা গেছে নাকি খুন সেটা তো জানি না।'

'প্রমাণ নেই তা ঠিক। কিন্তু মেয়েটা খুন হইছে আম্মা। এই দেখো, মেয়েটার গলায় কত দাগ। আর পেটের কাছে দেখো রক্তের দাগ। নদীর পানি পুরোটা রক্ত মুছে দিতে পারেনি।'

হেমলতা অবাক হয়ে পদ্মজার কথামতো খেয়াল করে দেখেন। সত্যি তো! তিনি বিস্ময় নিয়ে বলেন, 'একটার পর একটা খুন! হানিফের পর প্রান্তর বাপ এরপর এই মেয়ে। আমি বুঝে উঠতে পারছি না কে বা কারা এমন করছে।'

'ওই লোকটার দেখা যদি আরেকবার পাই,আমি ঠিক এর রহস্য বের করবই আম্মা।'বলল পদ্মজা।

মৃত মেয়েটার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল পদ্মজা। এরপর দড়ি দিয়ে আগের মতো বেঁধে, মোর্শেদকে বলল, 'আব্বা কলাপাড়ার দিকে যাও।'

'ওখানে কী?'হেমলতা বললেন।

পদ্মজা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কলা গাছের ভেলা বানিয়ে লাশ ভাসিয়ে দেব আম্মা। পানিতে ফেললে কেউ পাবে না। ভাসিয়ে দিলে কেউ না কেউ পাবে। মেয়েটার পরিবার খুঁজে পাবে। আমাদের বাড়িতে এখন লাশ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অনেক মানুষ আছে। সবাই ভয়

পাবে। বিয়ের আমেজটা চলে যাবে। এক সপ্তাহও হয়নি ওই ঘটনাটা পার হওয়ার। আম্মা বুঝছো আমি কী বলতে চাইছি?'

হেমলতা কিছু মুহূর্তকাল পদ্মজার চোখে চোখ রেখে বসে রইলেন। পদ্মজার কথার উত্তর না দিয়ে, মোর্শেদকে বললেন, 'কলাপাড়ার দিকে যাও।'

সকাল সকাল গায়ে হলুদ করার কথা ছিল। কিন্তু বউ এখনো ঘুমে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। কলাগাছের ছাদ বানিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে। হেমলতা কিছুতেই পদ্মজাকে ডাকতে দিচ্ছেন না। দুপুরের আযান পড়তেই পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে। মনে পড়ে,আজ তার গায়ে হলুদ। সেই কাকডাকা ভোরে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। বালিশের পাশে হলুদ শাড়ি রাখা। পদ্মজা দ্রুত শাড়িটা পরে নেয়। এরপর পূর্ণাকে ডাকে। বাহিরের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। পদ্মজা দরজা খুলতেই, নয় বছর বয়সী একটা মেয়ে চেঁচিয়ে বাইরে খবর দিল, 'পদ্ম আপার ঘুম ভাঙছে।'

হানি উঠান থেকে পদ্মজার ঘরের সামনে আসেন। হেমলতা রান্নাঘরের সামনে বসে মুরগি কাটছিলেন। হানি হেমলতাকে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলেন, 'এবার নিয়ে যেতে পারি তোর চাঁদরে?'

'যাও।'বললেন হেমলতা।

হানি,মনজুরা,সম্পর্কে ভাবি হয় এমন আরো দুজন পদ্মজাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। গায়ে হলুদের স্থান বাড়ির পিছনে। মোর্শেদ এসে পথ আটকান। গামছা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলেন, 'আমার ছেড়িরে আমি লইয়া যামু ছাদনাতলায়।'

কথা শেষ করে মোর্শেদ পদ্মজাকে পাজাকোলে তুলে নেন। হানি চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'আরে মিয়া করেন কি? দুলাভাইরা কোলে নেয় তো।'

'বাপ নিলে বিয়া অশুদ্ধ হইয়া যাইব না।'

মোর্শেদ বাইরে পা রাখেন। পদ্মজা লজ্জায় শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। অজানা অনুভূতিতে হাত পা কাঁপছে। মানুষের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে যায়। প্রেমা,প্রান্ত খুশিতে লাফাচ্ছে। একজন আরেকজনকে রঙ দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। কলা গাছের ছাদের নিচে খাটের ছোট চৌকিতে পদ্মজাকে দাঁড় করিয়ে দেন মোর্শেদ। সামনে সাতটা বদনা,দশটা কলসি ভর্তি পানি। একটা খোলায় দূর্বা,ধান,হলুদ বাটা,হলুদ শাড়ি, ব্লাউজ, তোয়ালে,সাবান,। কাছে কোথাও একদল নেচে নেচে গীত গাইছে। ছেলেমেয়েরা একজন আরেকজনকে জোর করে ধরে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে। পদ্মজার জন্য রাখা হলুদ অনেকেই নিতে চাইছে। হানির জন্য পারছে না। হানি পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হানির ছেলে অনন্ত এসে হলুদ চাইলে,হানি মার দিবে বলে তাড়িয়ে দিলেন। হেমলতা এসে ভীর কমিয়ে দেন। চারিদিকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দেন। এরপর ৬-৭ জন মহিলাকে নিয়ে হলুদের গোসল শেষ করেন। এজন্য অনেকে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। গায়ে হলুদ করতে হয় সবাইকে নিয়ে,সবার সামনে। আনন্দ করতে করতে। হেমলতা কেন শুধুমাত্র ৬-৭ জন নিয়ে করছেন। হেমলতা তার জবাব দিলেন না। অবুঝদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই। গোসল শেষ করে মসলিন কাপড়ের হলুদ শাড়ি পরানো হয় পদ্মজাকে। কানের কাছে মনজুরা গুনগুন করে কাঁদছেন। পদ্মজার শুনতে ভাল লাগছে না। বিয়ে হলে নাকি এক সপ্তাহ আগে থেকে কান্নাকাটি শুরু হয়। গায়ে হলুদের দিন আত্মীয়রা কাঁদায় গড়াগড়ি করে কাঁদে। অথচ, পদ্মজা,হেমলতা শান্ত!

পদ্মজাকে গায়ে হলুদের খাবার দেয়া হয়। বিশাল এক থালা। তাতে কয়েক রকমের পিঠা,আস্তো একটা মুরগি,পোলাও,শাক। পদ্মজা খাওয়ার আগে অন্যরা কেড়ে নিয়ে যায় সব। ভীর কমতেই হেমলতা আলাদা করে প্লেটে করে ভাত আর হাঁসের মাংস নিয়ে আসেন। নিজ হাতে খাইয়ে দেন। খাওয়ার মাঝে পদ্মজার মনে পড়ে মনজুরা তখন বলেছিলেন, 'বিয়ের পর মেয়েরা পর হয়ে যায়। মা-বাবা পর হয়ে যায়। স্বামী আর স্বামীর বাড়িই সব। মা-

বাপের সাথে দেখা করতেও তাদের অনুমতি লাগবে।'

পদ্মজা হেমলতার দিকে তাকিয়ে ভাত চিবোয়। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজা তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। চোখের পলকই ফেলছে না। চোখে জল চিকচিক করছে। তিনি পদ্মজাকে বলেন, 'খাওয়ার সময় কাঁদতে নেই।'

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে খাবার শেষ করে। চোখের জলে বুক ভিজে একাকার। হেমলতা ঘরের বাইরে এসে হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছেন। কী যে যন্ত্রনা হচ্ছে বুকে! কাঁদতে পারলে বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু কাঁদার সময় কোথায়? সবার সামনে যে তিনি আর কাঁদতে পারেন না। ভীর কমলে কাঁদবেন। অনেক কাঁদবেন। জীবনে শেষ বারের মতো কাঁদবেন। এরপর আর কখনো কাঁদবেন না। কোনোদিনও না।

পদ্মজার দু'হাতে গাছের মেহেদী লাগানো হচ্ছে। উঠানে বড় চৌকি রেখে চারিদিকে রঙিন পর্দা টাঙানো হয়েছে। কাগজের ফুল মাথার উপর ঝুলানো। চারিদিকে ঘিরে মেয়েরা। সামনের খালি জায়গায় চলছে নাচ। তখন উপস্থিত হয় হাওলাদার পরিবার। লাবণ্য,রানী এবং তাদের আত্মীয়। সাথে নিয়ে এসেছে বউয়ের বেনারসি,গহনা। হানি ছুটে এসে সবার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। শেষে বাড়িতে ঢুকে আমির। বিয়ের আগের দিন রাতে বরের আগমন সবাইকে খুব হাসালো। কেউ কেউ বলল,এতো সুন্দর বউ দূরে রাখার আর তর সইছে না। তাই চলে এসেছে। আমির সেসব পাত্তা দিলো না।সোজা হেমলতার কাছে গেল। গিয়ে বলল, 'আম্মা,পদ্মজার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

আমিরের অকপট অনুরোধ। হেমলতা ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন আমিরের দিকে। এমন ছেলে তিনি দুটো দেখেননি। আমির আবার বলল, 'বেশিক্ষণ না,একটু সময়।'

আমিরের কণ্ঠ পরিষ্কার। অথচ মাথা নিচু। পরিবারের ভাল শিক্ষাই পেয়েছে। তবে লাজলজ্জা একদমই নেই। হেমলতা মৃদু হেসে বলেন, 'ঘরে গিয়ে বসো। পদ্ম আসছে।'

আমির হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করে পদ্মজার ঘরের দিকে চলে গেল। হেমলতা পদ্মজাকে ডেকে নিয়ে আসেন। বলেন,আমির কথা বলতে চায়। ব্যাপারটা লোকচক্ষুর। কিন্তু না তো করা যায় না। কোনো বিশেষ দরকার হয়তো। পদ্মজা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে তাকায়। হেমলতা ইশারায় যেতে বলেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে আমিরের দিকে তাকায়। আমিরকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত। আমির পদ্মজাকে দেখেই হাসল। বলল, 'বসো।'

পদ্মজা বিছানার এক পাশে বসে। অন্য পাশে বসে আমির। প্রশ্ন করে, 'পদ্মজা যা প্রশ্ন করি সত্যি বলবে।'

পদ্মজা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমি মিথ্যে বলি না।'

আমির অসহায়ের মতো বলল, 'তুমি এই বিয়েতে মন থেকে রাজি তো পদ্ম?'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। আবার চোখ সরিয়ে নিল।বলল, 'আম্মা যখন যা করেছেন তাই আমি মন থেকে মেনে নিতে পেরেছি।'

আমির আবার প্রশ্ন করল, 'লিখন শাহ তো তোমাকে পছন্দ করে।'

'জানি। আর আপনিও জানেন সেটাও জানি।'

'আমি আমাদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর জেনেছি। তুমি...মনে কিছু নিও না, বলতে চাইছি যদি তোমার আমাকে অপছন্দ হয় আর লিখন শাহকে পছন্দ করে থাকো বলতে পারো। আমি বিয়ে ভেঙে দেব।'

পদ্মজা অপমানে থমথম হয়ে উঠল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'অবিশ্বাস থাকলে বিয়ে না হওয়াই ভাল। আপনি ভেঙে দিতে পারেন।'

আমিরের চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। পদ্মজা এত কথা বলতে পারে ভাবতেও পারেনি। আমির ইতস্তত করে বলল, 'আমার কোনো অবিশ্বাস নেই। তোমার মনে

কেউ না থাকলে বিয়ে আমার সাথেই হবে। আর কারোর সাথে হতে দেব না।'

পদ্মজা কিছু বলল না। উঠে যেতে চাইলে আমির বলল, 'একবার হাত ধরা যাবে?'

'আগামীকাল থেকে হাত ধরে দিনরাত বসে থাকিয়েন।'বলল পদ্মজা। সাথে হাসলও। আমির তা খেয়াল করে বলল, 'সুবহানআল্লাহ।'

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। পদ্মজা বধূ সেজে বসে আছে। দুই পাশে বসে আছে পূর্ণা ও প্রেমা। কাজী বিয়ে পড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে পদ্মজাকে কবুল বলতে বলছেন। পদ্মজা কিছুতেই বলছে না। সে নিজ মনে হেমলতাকে খুঁজছে। বউ কবুল বলছে না শুনে অনেকে ভীড় জমিয়েছে। হেমলতা ভীড় ভেঙে ঘরে ঢুকেন। হেমলতাকে দেখে পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে। ছলছল চোখ নিয়ে তিনবার কবুল বলে। হেমলতার দুই চোখে পানি। কিন্তু ঠোঁটে হাসি। পদ্মজাকে বধূ সাজাবার পর মাত্র দেখলেন তিনি। লাল বেনারসিতে পদ্মজার রূপ যেন গলে পড়ছে। পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে! হেমলতা দেখতে যান।

আয়না দেখানো শুরু হয়। আয়নায় তাকাতেই আমির চোখ টিপল। পদ্মজা লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিল। আমির সবার চোখের আড়ালে পদ্মজার এক হাত খপ করে ধরে ফেলে। পদ্মজা কেঁপে উঠে ভয়ে। আমির ফিসফিস করে বলল, 'এইযে ধরলাম মৃত্যুর আগে ছাড়ছি না।'

বিয়ে বাড়ির ভীড় কমে গেছে। বিদায়ের পালা চলছে। করুণ কান্নার স্বরে চারিদিক হাহাকার করছে। মনজুরা, হানি কেঁদে কুল পাচ্ছে না। মোর্শেদ নদীর ঘাটে বসে গোপনে চোখের জল ফেলছেন। পূর্ণা পদ্মজার গলা জড়িয়ে সেই যে কান্না শুরু করেছে থামছেই না। প্রেমা, প্রান্ত কাঁদছে। কাঁদছে আরো মানুষ। একটা মেয়ের বিয়ের বিদায় কতটা কষ্টের তা শুধু সেই মেয়ে আর তার পরিবার জানে। পদ্মজা কাঁদছে। পূর্ণার মাথায়,পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বার বার বলছে, 'বোন,বোন আমার। মন খারাপ করে থাকবি না কিন্তু। একদম কাঁদবি না। আমি আসব। তুইও যাবি। আমার খুব কষ্ট হবে রে বোন। আর কাঁদিস না। এভাবে কাঁদলে অসুস্থ হয়ে যাবি।'

রিদওয়ান তাড়া দেয়, 'সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করুন।'

পদ্মজা আকুল হয়ে কেঁদে ডাকে, 'আম্মা কই? আমার আম্মা কই? আম্মা,ও আম্মা।'

হেমলতা লাহাড়ি ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পদ্মজার ডাকে হেঁটে আসেন। একেকটা পা মাটিতে ফেলছেন আর বুক ব্যথায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তবুও হাসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। যে মেয়ের জন্য তিনি নতুন করে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই মেয়ের আজ বিদায়। সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে যাবে। হেমলতাকে দেখেই পদ্মজা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দ্রুত চোখের জল মুছে, পদ্মজাকে আদুরে কণ্ঠে বললেন, 'এভাবে কাঁদতে নেই মা। বিয়ে তো হবারই কথা ছিল।'

'আম্মা, আমি তোমাকে ছাড়া থাকব কেমন করে?'

'সবাইকেই থাকতে হয়। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে মা।'

হেমলতা পদ্মজার কপালে চুমু খান। পদ্মজার দুই চোখের জল মুছে দিয়ে বলেন, 'শ্বশুর বাড়ির সবার সাথে মিলেমিশে থাকবি। নিজের খেয়াল রাখবি।'

পদ্মজা হেমলতাকে জোরে চেপে ধরে বলে, 'আম্মা,আমি যাব না। আম্মা যাব না আমি।'

হেমলতা পদ্মজার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না। ভাঙা গলায় আমিরকে ডেকে বলেন, 'নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। খেয়াল রেখো। ওর আব্বা ঘাটে বসে আছে। ডাকতে হবে না, একা থাকুক। তোমরা পদ্মকে নিয়ে যাও। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে।'

আর কিছু বলতে পারলেন না। চোখ বেয়ে টুপটুপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে

পড়ে মাটিতে,পদ্মজার বেনারসিতে।

আমির পদ্মজাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। পদ্মজা আকুতিভরা কণ্ঠে হেমলতাকে ডেকে অনুরোধ করে,তাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে। হেমলতা রাখেননি। মুখ ঘুরিয়ে নেন। পূর্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। পদ্মজাকে পালকিতে বসিয়ে দেয় আমির। এরপর দু'হাত পদ্মজার গালে রেখে বলল, 'একদিন পরই আসব আমরা।'

পদ্মজা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে। সব কিছু শূন্য লাগছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে গেছে। পালকি ছুটে চলছে শ্বশুরবাড়ি। পূর্ণা হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আম্মা,কেন বিয়ে দিলা আপার। তোমার কী কষ্ট হচ্ছে না?'

হেমলতা হাঁটুভেঙে মাটিতে বসে পড়েন। পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে গগণ কাঁপিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেন। উপস্থিত সবার কান্না থেমে যায়। হেমলতা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি যদি পারতাম আমার পদ্মকে বিয়ে দিতাম না পূর্ণা। ও যে আমার সাত রাজার ধনের চেয়েও বেশি কিছু।'

হানি বরাবরই কাঁদুক স্বভাবের। হেমলতা কখনো কাঁদে না। সেই হেমলতাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কান্না লুকিয়ে রাখতে পারল না। হেমলতার মাথা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, 'এটাই তো নিয়ম। কেঁদে আর কী হবে।'

হেমলতা মুহূর্তে ছোট বাচ্চা হয়ে যায়। হানিকে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে।বলে, 'আপা,আপা ওরা আমার মেয়ে নেয়নি। আমার কলিজা ছিঁড়ে নিছে। আপা,কেন বিয়ে হলো আমার পদ্মের।'

মনজুরা হেমলতার মাথায় হাত রেখে স্বান্তনা দেন, 'দেখিস পদ্ম খুব ভালো থাকবে। ও খুব ভালো মেয়ে।'

হেমলতা হানিকে ছেড়ে মনজুরাকে জড়িয়ে ধরেন। হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আম্মা, আম্মা তুমি কখনো আমাকে কিছু দেওনি। এইবার আমার এই মরণ কষ্টটা কমিয়ে দাও। আম্মা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বিশ্বাস করো আম্মা। আম্মা,আমার পদ্মকে ছাড়া আমি কেমনে থাকব।'

মনজুরার বুক ধুকপুক করছে। জন্মের পর হেমলতা কী কখনো এভাবে কেঁদেছে? মনে পড়ছে না। তিনি পারেননি হেমলতার এই কষ্ট কমাতে। শুধু বুকের সাথে চেপে ধরে রাখলেন। এভাবে যদি ছোট থেকে আগলে রাখতেন,হেমলতার জীবনটা এত কষ্টের হতো না।

পদ্মজা ছটফট করছে। কিছু ভাল লাগছে না। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে যেতে মায়ের কাছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। এখুনি মারা যাবে হয়তো। পদ্মজা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে, 'থামো তোমরা,থামো। আল্লাহর দোহাই লাগে থামো।'

পালকি থেমে যায়। পদ্মজা পালকি থেকে মাটিতে পা রেখেই মোড়ল বাড়ির দিকে ছুটতে থাকল। কেউ আটকে রাখতে পারেনি। সবাইকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে ছুটে চলেছে সে মায়ের বুকে। আমির শুধু চেয়ে রইল। সন্ধ্যা নামার পূর্ব মুহূর্তে একটা লাল বেনারসি পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছুটছে। দেখতেও ভাল লাগছে।

পর্ব ২৭

পদ্মজার কণ্ঠে আম্মা ডাকটি হেমলতার অস্তিত্ব মাড়িয়ে দিয়ে গেল। হেমলতা থমকে গিয়ে তাকান। উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত হতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে হেমলতার বুকে। হেমলতা টাল সামলাতে না পেরে আবার মাটিতে বসে পড়েন। পদ্মজা নিরবচ্ছিন্ন কাঁদতে থাকল। হেমলতা সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে,কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। নির্বাক,স্তব্ধ থেকে পদ্মজার কান্না অনুভব করেন। কান্নার দমকে পদ্মজার শরীর ঝাঁকি দিচ্ছে বারংবার। পূর্ণা পদ্মজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আর যাবা না আপা।'

পদ্মজা অনুরোধ স্বরে হেমলতাকে বলল, 'আম্মা,আমি যাব না।'

হেমলতার দুই চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। প্রতি ফোঁটা জল পদ্মজার বুকে সাইক্লোন, টর্নেডো,ঘূর্ণিঝড়,ভূমিকম্প সহ সব ধরণের দূর্যোগ বইয়ে দিচ্ছে। হেমলতা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন পদ্মজাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'কোথাও যেতে হবে না তোর।'

হেমলতার এহেন কথা শুনে হানি,মনজুরার মাথায় বাজ পড়ল। সেকী কথা! হেমলতা একবার যখন বলেছে তাহলে সত্যি যেতে দিবে না। তাহলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কী দরকার ছিল! হানি শক্ত কিছু কথা শোনানোর জন্য প্রস্তুত হয়। তখনই হেমলতা পদ্মজাকে সরিয়ে দেন নিজের কাছ থেকে। চোখে মুখ শক্ত করে কাঠ কাঠ কণ্ঠে বলেন, 'এটা ঠিক হয়নি পদ্ম! এভাবে চলে আসা মোটেও ভদ্রতা নয়। আবেগকে এতো প্রশ্রয় দিতে নেই। বিয়ে দিয়েছি এবার শ্বশুর বাড়ি যেতেই হবে। ওইতো আমির এসেছে।'

হেমলতা হাত ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ান। পদ্মজা হা করে তাকিয়ে আছে হেমলতার দিকে। চোখের পলকে কী রকম রূপ পাল্টে ফেলল। এইতো মাত্রই কাঁদছিল!

পদ্মজা নিজের চুলে আঙ্গুল পেঁচাতে পেঁচাতে হাসছে। তুষার রয়ে সয়ে প্রশ্ন করল, 'হাসছেন কেন?'

পদ্মজা নাটকীয়ভাবে ব্যথিত স্বরে বলল, 'আপনি কাঁদছেন তাই।'

তুষার দ্রুত চোখের জল মুছল। মৃদু হেসে বলল, 'কাঁদছি নাকি!'

পদ্মজা হঠাৎ গুনগুনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তুষার জানতে চাইল, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

মুহূর্তে পদ্মজা দাঁত কেলিয়ে হেসে উঠে। চোখে জল ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলে, 'মনে চাইলো। আম্মা বলতেন,যখন যা ইচ্ছে হয় করে ফেলতে। তাতে কারো ক্ষতি বা নিজের কোনো ক্ষতি না হলেই হলো।'

'আপনার মায়ের খবরটা গতকাল শুনলাম। জানেন, সারারাত ঘুমাতে পারিনি।'

'আপনার মনটা খুব নরম স্যার। কিন্তু কঠিন ভাব নিয়ে থাকেন, আমার আম্মার মতো।'

'তারপর কী হলো?'

পদ্মজা চেয়ার ছেড়ে ফ্লোরে বসে বলল, 'আর তো বলব না।'

তুষার শ্বাসরূদ্ধকর কণ্ঠে বলল, 'কেন?'

পদ্মজা ঘাড়ে এক হাত রেখে ক্লান্তভঙ্গিতে বলল, 'এমনি।'

'হেয়ালি করবেন না পদ্মজা। আপনি ছাড়া এই রহস্যের কিনারা অসম্ভব। আপনার পুরো গ্রাম আপনার বিপক্ষে। খুনের কারণ ও কেউ বলতে পারছে না। আমরা তদন্ত করেও কুল পাচ্ছি না।'

পদ্মজা চোখ গরম করে তাকায়। কটমট করে বলল, 'বলব না মানে বলব না।'

তুষার দ্বিগুণ গলা উঁচিয়ে বলল, 'তাহলে এতটুকু কেন বললেন?'

'আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই।'

'আপনার ইচ্ছায় সব হবে না।'

'যা খুশি করে নিতে পারেন।'

পরিস্থিতি বিগড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামলাতে তুষার দুই হাতে মুখ ঢেকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর ধীরেসুস্থে বলে, 'দেখুন আপনি যদি সব খুলে না বলেন আমি আপনাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব না। আর আমার মন বলছে,আপনি দোষ করতে পারেন না।'

'সবসময় মন সঠিক কথা বলে না।'বলল পদ্মজা, করুণ স্বরে।

'তাহলে বলছেন, আপনি নির্দোষ না?'

পদ্মজা চোখ সরিয়ে নিল। হাসল। কী যন্ত্রনা! কত কষ্ট সেই হাসিতে! চোখ ভর্তি জল নিয়ে আবার তাকাল তুষারের দিকে। বলল, 'আমি খুন করেছি। একই রাতে,একই প্রহরে,একই জায়গায় একসাথে পাঁচ জনকে। আপনার আইন যা শাস্তি দেয় আমি মাথা পেতে নেব।'

তুষার অধৈর্য্য হয়ে বলে, 'আপনার ফাঁসির রায় হবে পদ্মজা। আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার আপনাকে বাঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'ওপারে যাওয়া আমার জরুরি। আমি সব রায় মেনে নেব।'

'আমি মানতে পারব না।'তুষারের অকপট কথা। কথাটা মুখ থেকে বের হওয়ার পর তুষার বুঝলো সে অচেনা এবং ভয়ংকর অনুভূতি নিয়ে খেলছে। পদ্মজার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। পদ্মজা তুষারকে পরখ করে নিয়ে হাসে। শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'এতো ব্যকুল কেন হচ্ছেন?'

বেশ অনেকক্ষণ তুষার গাঁট হয়ে বসে রইল। উপর থেকে অর্ডার এসেছে,আসামী পদ্মজা কেন এতোগুলি খুন করেছে তার রহস্য উদঘটন করতে। না পারলে চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি চলে যাক সমস্যা নেই, নিজের শান্তির জন্য আত্মতৃপ্তির জন্য হলেও পদ্মজার পেছনের ছয়টি বছরের গল্প জানতেই হবে। এই কেস হাতে পাওয়ার পর থেকে তার ঘুম হচ্ছে না রাতে। সারাক্ষণ মস্তিষ্ক কিলবিল করে। এতো জটিল কেস কখনো ফেস করতে হয়নি। অলন্দপুর পুরোটা ঘেঁটেও কিছু জানা যায়নি। যারা খুন হয়েছে তারা আর পদ্মজা ছাড়া হয়তো কেউ জানেও না। তুষার আবার বলল, 'আপনার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ। আপনার বিরুদ্ধে সবাই সাক্ষী দিচ্ছে। আপনি কী..."

কথার মাঝপথে তুষারকে থামিয়ে দিয়ে পদ্মজা বলল, 'খুনগুলো তো সত্যি আমি করেছি। তাহলে প্রমাণ আমার বিরুদ্ধেই তো থাকবে।'

তুষারের মন বিরক্তে তেঁতো হয়ে পড়ে। পদ্মজার সামনে কয়েকবার পায়চারি করে বেরিয়ে যায়। সিগারেট ফুঁকে মাথা ঠান্ডা করে। ফাহিমা চা নিয়ে আসে। তুষার বলল, 'মেয়েটাকে তোমার অপরাধী মনে হয়?'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না স্যার। মেয়েটাকে দেখলে আমার হাত পা অবশ হয়ে পড়ে। এতো মেরেছি শুরুতে। কিছুতেই টু শব্দও করেনি। এরপর থেকে আমি রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি।'

'পৃথিবীটা রহস্যে ঘেরা ফাহিমা। একজন নারী পাঁচ জনকে কীভাবে খুন করতে পারে? আবার একসাথে? সেই সাহস কী করে পেল?'

'সেটা আমিও ভাবছি স্যার। কীভাবে খুন করেছে সেটা ধারণা করা যাচ্ছে। কিন্তু এতো সাহস, ধৈর্য্য কীভাবে কোনো নারীর থাকতে পারে!'

'নারীরা চাইলে সব পারে। কথাটা শুনে এসেছি। এবার স্বচক্ষে দেখছি।'

'জি স্যার।'

'কত আসামী পায়ে পড়ে জীবন ভিক্ষা চেয়েছে। কিছুতেই মন গলেনি। মন কাঁদেনি। এই মেয়েটা জীবন চায় না, তবুও আমার ইচ্ছে হচ্ছে জীবন দিতে, নির্দোষ প্রমাণ করে বাঁচাতে।'

ফাহিমা চকিতে তাকাল তুষারের দিকে। তুষার সবসময় হু, হ্যাঁ এর বাইরে কিছু বলে না। খুব কঠিন,কাঠখোট্টা একটা মানুষ। অনুভূতি বলতে নেই। তার মুখে এত কথাবার্তা শুনে

অবাক হচ্ছে ফাহিমা।

'পরিস্থিতি হাতের বাইরে স্যার। পদ্মজার ফাঁসি দেখার জন্য দেশ উতলা হয়ে আছে।'

'কেন এমন হচ্ছে ফাহিমা?'

'আজ যদি হেমলতা উপস্থিত থাকতেন গল্পটা অন্যরকম হতো স্যার।'

তুষার আবার ফিরে আসে। পদ্মজার সামনে চেয়ারে বসে। ধীরকণ্ঠে বলে, 'আজই শেষ দিন। এরপর আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। দ্রুত তুষারের পায়ের কাছে এসে বসল। বলল, 'আপনার আম্মা আপনাকে বিয়ে করতে চাপ দেয় তাই না?'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'সেদিন দেখলাম ফোনে কাউকে আম্মা ডেকে রেগে বলছিলেন, বিয়ে করব না।'

'আমি তো অনেক দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। আপনার শ্রবণ শক্তি তো প্রখর।'তুষার বলল। এরপর থামল। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলল, 'আপনার মা বিশ্বাসঘাতকতা কী কথা লুকিয়ে করেছেন?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'কিছু তথ্য পেয়েছি গতকাল। এইটুকুর জন্য বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিতে পারেন না। উনি আপনার ভালোর জন্যই..."

পদ্মজা চুপ থেকে হুট করে ফোঁস করে জ্বলে উঠে বলল, 'আপনি বুঝবেন না আমার কষ্ট। আমার না পাওয়া দামী সময়টাকে আমি কতবার মনে করে বুক ভাসিয়ে কেঁদেছি। বুঝবেন না আপনি।'

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল। পরপরই হেসে আবার করুণস্বরে কান্না শুরু করল। গা কাঁপিয়ে তোলার মতো কান্না। মনে হয় কোনো অশরীরী কাঁদছে। কী বিশ্রি,ভয়ংকর সেই কান্নার ছন্দ। তুষারের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে।

চিন্তায় মাথার রগ দপদপ করছে। আগামীকাল ভোরে পদ্মজাকে কোর্টে তোলা হবে,রায় হবে। পদ্মজার ফাঁসি চাই বলে,রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন। রেডিওতে আন্দোলন। কিন্তু তুষারের মন যে কিছুতেই মানতে পারছে না এই আন্দোলন। এমন নিষ্পাপ মনের, অপরূপ সুন্দরীর বিরুদ্ধে পুরো পৃথিবী! কী আশ্চর্য তাই না!

বাঁকা রাস্তা পেরিয়ে পালকি চলছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার আযান পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। দিনের আলো কিছুটা এখনও রয়ে গেছে। দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসছে হাওয়া। শীতল, নির্মল পরিবেশ। পদ্মজার বুক ধুকপুক করছে। নতুন মানুষ নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে তো! একবার সে হাওলাদার বাড়ি গিয়েছিল। অন্দরমহল নামে এক বিশাল বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে মেয়েরা,বউরা থাকে। এখন কী সেও থাকবে? পদ্মজা পর্দার ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে চোখ মেলে তাকায়। আমির হাতে পাগড়ী নিয়ে তার বড় ভাইয়ের সাথে কী যেন আলোচনা করছে। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। পদ্মজা চোখ সরিয়ে নিল। মায়ের কথা,পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে।

পালকি থামে। আমির থামিয়ে দিল। অন্দরমহলে মেয়েরা অপেক্ষা করছে নতুন বউয়ের জন্য। আর আমির গেটের সামনেই পালকি থামিয়ে দিল। জাফর বিরক্তিতে'চ'এর মতো শব্দ করে বলল, 'এইখানে আবার থামালি কেন?'

আমির পাগড়ী রিদওয়ানের হাতে দিয়ে বলল, 'আমার বউ আমার কোলে চড়ে অন্দরমহলে যাবে।'

পদ্মজা কথাটা শুনেই কাচুমাচু হয়ে গেল। আমির পালকির পর্দা সরিয়ে হাত বাড়িয়ে পদ্মজাকে নামতে ইশারা করে। পদ্মজার নাক অবধি টানানো ঘোমটা। আমির সরাতে গিয়েও সরাল না। মুখে বলল, 'কী হলো? নেমে আসো।'

পদ্মজা লজ্জায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। সে গাঁট হয়ে বসে থাকে। আমির হেসে এক

হাতে নিজের কপাল চাপড়াল। এরপর নিজেই টেনে নামাল পদ্মজাকে। তখনো পদ্মজার নাক অবধি ঘোমটা। আমির চট করে পদ্মজাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। পদ্মজা কুঁকড়ে যায়। ভয়ে দুই হাতে আমিরের গলা জড়িয়ে ধরে। আমির যত এগোচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তার গায়ের উষ্ণতা পদ্মজার শাড়ি ভেদ করে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। অচেনা,অজানা অনুভূতি চারিদিকে যেন জেঁকে বসেছে। মরণ প্রেমের সূত্রপাত হয়তো এখান থেকেই শুরু হয়!

অন্দরমহলের সদর দরজায় গ্রামের মেয়েদের ভীড়। তারা সবাই নতুন বউ দেখতে এসেছে। আমিরের কোলে পদ্মজাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। ফিসফিসিয়ে একজন আরেকজনকে কিছু বলছে। ফরিনা ধমক দিয়ে কোলাহল থামিয়ে দেন। আমির দরজার সামনে উপস্থিত হতেই আনিসা বলল, 'এইবার বউকে নামান ছোট ভাই। বড় আম্মার পা ছুঁয়ে সালাম করে,এরপর ঘরে ঢুকেন।'

আনিসা আমিরের চাচাতো ভাইয়ের বউ। জাফরের স্ত্রী। দেশের বাইরে থাকে। ঢাকার প্রফেসরের মেয়ে আনিসা। বিয়ের পরপরই স্বামী নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমায়। দুই সপ্তাহ আগে ছুটি কাটাতে শ্বশুরবাড়ি আসে। আনিসার কথামতো আমির পদ্মজাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। এরপর দুজন নত হয়ে ফরিনাকে সালাম করল। ফরিনা হেসে ছেলে এবং ছেলের বউকে চুমু খান। আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'সুখী হ বাবা। বউয়ের খেদমতে ভালা থাক জীবনভর। আমার কইলাম বছরের মধ্যেই নাতি চাই।'

লাবণ্য মাঝে ফোঁড়ন কাটল, 'পদ্ম আমার লগে শহরে যাইব আম্মা। আমরা একলগে কলেজে পড়বাম। নাতি-টাতি পরে পাইবা।'

ফরিনা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো তেড়ে এসে লাবণ্যর গালে চড় বসিয়ে দেন। উঁচু কণ্ঠে বললেন, 'আমার কথার পিছে কথা কওনের সাহস দেখাবি না।'

আকস্মিক ঘটনায় সবাই হকচকিয়ে যায়। পদ্মজা অবাক চোখে তাকায়। সামান্য কথার জন্য কোনো মা এতো মানুষের সামনে যুবতী মেয়েকে মারে? লাবণ্য লজ্জায়, অপমানে কাঁপতে থাকে। চোখে টলমল জল নিয়ে স্থান ত্যাগ করে। একরকম পালিয়েই গেল। ফরিনার চোখেমুখে কাঠিন্যতা ফুটে আছে। পদ্মজা ভয়ে চোখের দৃষ্টি মাটিতে রাখে। ফরিনা পদ্মজার হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে যান।যেতে যেতে বলেন, 'মুখে মুখে কথা কইবা না কুনুদিন। যা কই মাইন্যা চলবা। শ্বশুর বাড়ির সব মানুষ হইতাছে গিয়া দেবতার লাহান। তাগোরে সেবা করলেই জান্নাত পাওন যাইবো। নইলে কুনুদিন জান্নাতে পাও দিতে পারবা না। হুনছি তো,তুমি হইছো গিয়া অনেক বাধ্য ছেড়ি। কামে কাজেও দেখাইবা। মনে রাখবা আমার কথা গুলান।'

পদ্মজা মাথা নাড়ায়। মুসলমানদের দেবতার সাথে তুলনা করাটা পদ্মজার ভালো লাগেনি। কিছু কথা গলায় এসে আটকে গেছে। বলার সাহস পাচ্ছে না। ফরিনা আবার বলেন, 'হুনো বউ, স্বামীর উপরে কিচ্ছু নাই। স্বামীরেই দুনিয়া ভাববা। মা-বাপ,ভাই-বোন হইছে গিয়া পর। স্বামী আপন। স্বামীর বাইরে কিছু ভাববা না। স্বামী যা কয় তাই মানবা। স্বামীর পা ধুইয়া দিবা নিজের হাতে। স্বামী বইতে কইলে বইবা,উঠতে কইলে উঠবা। হুত্তে কইলে হুইবা। স্বামী যহন কাছে ডাকব না করবা না। আল্লাহ বেজার হইবো। ফেরেশতারা অভিশাপ দিব। দুনিয়াত স্বামীর আদরের থাইকা মধুর আর কিছু নাই। মনে রাখবা।'

পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। লজ্জায়,আড়ষ্টতায় সারা শরীর তীব্র গরমে ঘামছে। আনিসা ফরিনাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বড় আম্মা, মানুষ আছে তো অনেক। পরেও বলতে পারতেন।'

আনিসার কথা পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন ফরিনা। তিনি পদ্মজাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, 'খালি স্বামী লইয়াও পইড়া থাহন যাইব না। তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি জীবিত আছে। তাগোর সেবা করবা। যহন যা করতে কই করবা। না পারলে কইবা শিখাইয়া দিমু। প্রত্তিদিন ভোরে উঠবা। নামায পইড়া রান্ধাঘরে যাইবা। তহন বাকিসব ভুইলা রান্ধনে মন দিবা।'

আমির কপালের চামড়া কুঁচকে মায়ের কথা শুনছিল। এবার সে ধৈর্য্যহারা হয়ে বলল, 'রান্নাবান্না করার জন্য অনেক মানুষ আছে আম্মা। পদ্মজার রাঁধতে হবে না। আর আমার এতো সেবাও লাগবে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। ভীড় কমাও। আর নিয়মনীতি শেষ করো।

এরপর আমার বউ আমার ঘরে ছেড়ে দেও।'

আমিরের কথা শেষ হতেই হাসির রোল পড়ে যায়। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসল। ফরিনা কিছু কঠিন কথা বলতে প্রস্তুত হোন। আনিসা আমিরকে রসিকতা করে বলল, 'আজ তো একসাথে থাকা যাবে না। আরো একদিন ধৈর্য্য ধরেন।'

আমির প্রবল বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন? বিয়ে তো হয়ে গেছে।'

কেউ আমিরের জবাব দিল না। উল্টা সবাই হাসতে থাকল।

'আইজ কাইলরাত্রিরে হতচ্ছাড়া!'বলল শাহানা। জাফরের বড় বোন। আমিরের বিয়ে উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসেছে। সাথে নিয়ে এসেছে পুরো শ্বশুরবাড়ি। আমির শাহানাকে প্রশ্ন করল, 'কালরাত্রি তো হিন্দুদের নিয়ম। আমি মানি না। আমার বউ আমার ঘরে দিয়ে আসা হোক।'

'সবসময় ত্যাড়ামি করিস কেন? আমরাও তো নিয়ম মেনেছি।'বলল জাফর। কণ্ঠে তার গম্ভীর্যতা। তাতেও লাভ হলো না। আমির কিছুতেই এই নিয়ম মানবে না। ফরিনা,শাহানা,শিরিন,আনিসা,আমিনাসহ অনেকে আমিরকে মানানোর চেষ্টা করল। কারো কথা আমিরের কর্ণগোচর হলো না। তার মধ্যে রিদওয়ান আমিরের সাথে তাল দিল। বলল, 'কালরাত্রি-টাত্রি বাদ। এসব নিয়ম মেনে লাভটা হবে কী? যার বউ তাকে তার বউ দিয়ে দেও।'

'তুই চুপ থাক। আগুনে ঘি ঢালবি না।'বললেন আমিনা।

রিদওয়ান চুপসে গেল। থামলো না শুধু আমির। ফরিনাও জেদ ধরে বসে আছেন। তিনি আমির-পদ্মজাকে আজ কিছুতেই একসাথে থাকতে দিবেন না। যেমন মা তেমন তার ছেলে। মজিদ হাওলাদার অনেকক্ষণ যাবৎ এসব দেখছেন। চেঁচামিচি আর নেয়া যাচ্ছে না। তিনি উপর থেকে নেমে আসেন। অন্দরমহল তিন তলার। তৃতীয় তলায় কেউ থাকে না। শুধু ছাদ আছে। ঘর বানানো হয়নি। অসমাপ্ত ইটের পুরনো বাড়ি। চিন্তাভাবনা চলছে,তৃতীয় তলাটা থাকার জন্য উপযুক্ত করার। মজিদকে দেখে সবাই থেমে গেল। তিনি পদ্মজার পাশে চেয়ার নিয়ে বসেন। পদ্মজা একটু নড়েচড়ে বসে। মজিদ পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুকি কী চাও মা? আজ শ্বাশুড়ির সাথে থাকবে? নাকি আমার পাগল ছেলের সাথে? ভেবে বলো। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

পদ্মজা উসখুস করতে করতে বলল, 'জি, আম..আম্মার সাথে থাকব।'

ফরিনার ঠোঁটে বিশ্বজয়ের হাসি ফুটে উঠে। তিনি আমিরের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে হাসেন। পরপরই পদ্মজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। চুমুতে পদ্মজা গাল ভরিয়ে দেন। একবার আড়চোখে আমিরকে দেখল পদ্মজা। আমির তাকিয়েই ছিল। পদ্মজা তাকাতেই আমির চোখ রাঙানি দিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। বিয়ের বাকি সব নিয়ম শুরু হয়। উপর থেকে নেমে আসেন নূরজাহান। তিনি এই বাড়ির প্রধান কর্তী। মজিদ হাওলাদারের জন্মদাত্রী।

'কইরে...কইরে আমার নাত বউডা কই?'বলতে বলতে ছুটে আসেন তিনি। উপস্থিত সবাই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নূরজাহানের দিকে তাকাল। নূরজাহান পদ্মজার সামনে এসে বসেন। পদ্মজার মুখখানা দুই হাতে ধরে দেখেন। এরপর মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'বাবু দেহি চাঁদ লইয়া আইছে! এই ছেড়ি তোর জন্যি আমার জামাই তো এহন আমার দিকে চাইবোই না।'

নূরজাহান কেন এ কথা বললেন,পদ্মজা ঠাওর করতে পারল না। আমির যখন হেসে বলল, 'আরে বুড়ি,তুমি তো আমার প্রথম বউ। ভুলি কীভাবে?'তখন পদ্মজা নূরজাহানের কথার মানে বুঝল। বুঝতে পেরে ঠোঁট চেপে হাসল। নূরজাহান আমিরের থুতুনিতে চিমটির মতো ধরে বললেন, 'আমার চান্দের টুকরা। বউরে আদর কইরো ভাই। বকাঝকা কইরো না। ছেড়িডা জন্ম ঘর ছাইড়া আইছে। তুমি এখন সব। তুমি যেমনে রাখবা তেমনেই থাকব। স্বামী হাত ছাইড়া দিলে শ্বশুরবাড়ির আর কেউই বউদের আপন হয় না। বুঝছো ভাই?'

আমির নূরজাহানের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল, 'বুঝছি জান।'

নূরজাহান মন খারাপের নাটক করে বললেন, 'এইডা ঠিক না ভাই।'
'কোনটা?'
'এহন থাইকা জান ডাকবা বউরে। আমি হইলাম দুধভাত।'
আমির একটু জোরেই হাসল। সাথে আরো অনেকে হাসল। পদ্মজা নত হয় নূরজাহানের পা ছুঁয়ে সালাম করার জন্য। নূরজাহান দ্রুত আটকালেন পদ্মজাকে। জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'রূপে যেমন গুণেও তেমন থাইকো বইন।'
'রাইত বাড়তাছে। সব নিয়ম তো শেষ। যাও যের ঘরে যাও। এই তোরা বাড়িত যাইতে পারবি? রাইতের বেলা আইছিলি কেন? বউতো কাইলও দেহন যাইতো। জাফর ছেড়িগুলারে দিয়া আইতে পারবি? মদন কই? মগা কই? কামের বেলা দুইডারে পাওন যায় না।'কথাগুলো একনাগাড়ে বললেন ফরিনা বেগম। তিনি নূরজাহানের উপস্থিতি যেন উপেক্ষা করতে চাইছেন। মদন ছুটে আসে বাইরে থেকে। মাথা নত করে ফরিনাকে বলল, 'আইছি খালাম্মা।'
'থাহস কই? যা এদের দিয়া আয়। আমরার বাড়িত যহন আইছে এরা এহন আমরার দায়িত্বে। সুন্দর কইরা বাড়িত দিয়া আইবি।'
'আচ্ছা খালাম্মা। আপারা চলেন!'
মেয়েগুলো সারাক্ষণ হাসছিল। যাওয়ার সময়ও হাসতে হাসতে গেল। মেয়েগুলোর উদ্দেশ্যে রানি ঠোঁট বাঁকায়। তা খেয়াল করল রিদওয়ান। সে রানির মাথায় গাট্টা মেরে বলল, 'সারাক্ষণ মুখ মুরাস কেন? একদিন দেখবি আর মুখ সোজা হচ্ছে না। বিয়েও হবে না।'
'না হলে নাই। ছেড়িগুলারে দেখছো বড় ভাই? কেমনে হে হে কইরা হাসতাছিল।'
'তাতে তোর কী?'
নূরজাহান পদ্মজাকে বললেন, 'হ মেলা রাইত হইছে। আইয়ো বনু আমার ঘরে আইয়ো। আইজ আমার লগে থাকবা।'
'আপনার লগে ক্যান? পদ্মজায় আমার লগে আমার ঘরে থাকব। হেইডাই তো কথা হইছে। পদ্মজায়ও এইডাই চায়।'
'দেহো বউ, তর্ক কইরো না। নাত বউ আমার পছন্দ হইছে। আমি আমার লগে রাখুম।'
'এই পদ্মজা তুমি কার লগে থাকবা?'ফরিনা কিঞ্চিৎ রাগান্বিত স্বরে প্রশ্ন করেন। পদ্মজার অবস্থা দরজার চাপায় পড়ার মতো। এ কোন জগতে এসে পড়লো সে! পদ্মজা গোপনে ঢোক গিলল। নূরজাহান আমিরকে আদেশ করলেন, 'খাড়ায়া রইছস কেন? বউরে কোলে লইয়া আমার ঘরে দিয়া যা।'
আমির পদ্মজাকে কোলে তুলতে গেলে ফরিনা বললেন, 'বাবু, আমি তোর মা। তোরে জন্ম দিছি আমি। আমার কথাই শেষ কথা মানবি। আমার ছেড়ার বউ আমার ঘরে থাকব। আমার কথা অমান্য করলে জান্নাত পাইবি না।'
নূরজাহান পদ্মজাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'দেখছোনি বনু? এমন কইলজা বড় বউ কেউ ঘরে রাহে? আমি মানুষ ভালা বইলা এই বউরে বাইর কইরা দেই নাই। সহ্য কইরা কইরা এহন মরার পথে আছি।'
'তোমাদের কারোর সাথে থাকতে হবে না। আমার বউ আমার ঘরেই চলুক।'বলল আমির। কণ্ঠে তার খুশির মেলা। সুযোগ বুঝে নিজের জিনিষ নিজে বুঝে নিতে চাইছে। ফরিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমিরের দিকে তাকান। নূরজাহানকে বললেন, 'আপনার ঘরেই লইয়া যান।'
ফরিনার কথা শুনে আমিরের মুখটা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। নূরজাহান হাসলেন। এই হাসি বিজয়ের হাসি।
'ভাই, বউরে কোলে লও। লইয়া আও আমার ঘরে।'নূরজাহান বললেন।
'আমি হেঁটে যেতে পারব। একটু হাঁটা দরকার।'মিনমিনিয়ে বলল পদ্মজা।
'আইচ্ছা তাইলে হাঁটো। ধরো আমার হাত ধরো।'নূরজাহান হাত বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা

নূরজাহানের হাত শক্ত করে ধরে মৃদু করে হাসলো। নূরজাহান এবং পদ্মজার সাথে আমির আসে। সে দাদীর ঘর অবধি যাবে। পদ্মজাকে তার মোটেও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

নূরজাহানের ঘরে যাওয়ার পথে পদ্মজা কান্নার সুর শুনতে পায়। কে যেন কাঁদছে। কী করুণ সেই কান্নার স্বর! এদিক-ওদিক দৃষ্টি মেলে তাকাল পদ্মজা। আরেকটু এগোতেই খুব কাছে জোরে একটা আওয়াজ হয়। পদ্মজা কেঁপে উঠে। দ্রুত সেদিকে তাকায়। তার চেয়ে দুই হাত দূরে একটা দরজা। ভেতর থেকে কেউ দরজায় ধাক্কাচ্ছে আর কাঁদছে। পদ্মজাকে ভয় পেতে দেখে আমির বলল, 'ভয় পাচ্ছো?'

'কে ওখানে? এভাবে কাঁদছে কেন? দরজা খুলে দিন না!'

পদ্মজা ভয় এবং ব্যথিত কণ্ঠে বললো। তার কথায় আমির বা নূরজাহান কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। পদ্মজাকে নিয়ে পাশ কেটে চলে গেল।

পর্ব ২৯

নূরজাহান শক্ত করে পদ্মজার হাত ধরেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ঘরে আহো, পরে কইতাছি।'

কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। নূরজাহান পদ্মজাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেন। আমির চেয়ার টেনে বসার জন্য প্রস্তুত হতেই নূরজাহান হইহই করে উঠলেন, 'তুই বইতাছস ক্যান?'

আমির হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'মানে?'

'বউয়ের ধারে আর থাহন যাইবো না। আইজ কাইলরাত্রি।'

'মুসলমানদের কালরাত্রি পালন করতে নেই। গুনাহগার হবেন।'বলল পদ্মজা। তার মাথা নত। প্রথম দিন এসেই কথা বলা ঠিক হলো নাকি ভাবছে।

মুখের উপর কথা শুনে নূরজাহান কড়া চোখে তাকান। পদ্মজা দেখার পূর্বে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে চোখের দৃষ্টি শীতল রূপে নিয়ে আসেন। তিনি পদ্মজাকে প্রশ্ন করলেন, 'গেরামের রেওয়াজ ফালাইয়া দেওন যাইব?'

নূরজাহানের কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা নির্ভয়ে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'যা পাপ তা করতে নেই দাদু। জেনেশুনে ভুল রেওয়াজ সারাজীবন টেনে নেওয়া উচিত না। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না।'

'তুমি কী আইজ জামাইয়ের লগে থাকতে চাইতাছো?'নূরজাহানের কণ্ঠ গম্ভীর। এমন প্রশ্নে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায় এবং লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে। আমতা আমতা করে বলল, 'ন...ন...না! তে...তেমন কিছু না।'

পদ্মজা আড়চোখে আমিরকে দেখে আবার চোখের দৃষ্টি নত করে ফেলল। আমির নূরজাহানকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি যাচ্ছি বুড়ি।'এরপর পদ্মজার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে কোমল কণ্ঠে বিদায় জানাল, 'আল্লাহ হাফেজ পদ্মবতী।'

পদ্মজা নতজানু অবস্থায় মাথা নাড়াল। আমির ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে নূরজাহানকে দেখে। ঢোক গিলে বলে, 'রাগ করেছেন দাদু?'

নূরজাহান হাসলেন। পদ্মজার এক হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে যান। বললেন, 'আমার বইনে তো ঠিক কথাই কইছে। গুসা করতাম কেরে?'

পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। নূরজাহান বললেন, 'তুমি বও। আমি জোসনার মারে ভাত দেওনের কথা কইয়া আইতাছি।'

'আমি খেয়েছি দাদু। তখন খাওয়ালেন আম্মা।'

'ব্যাগডা কই? শাড়িডা খুইলা আরেকটা পরো। সিঁদুর রঙেরডা পরবা।'বলতে বলতে নূরজাহান ব্যাগ থেকে সিঁদুর রঙের শাড়ি বের করলেন। পদ্মজার দিকে এগিয়ে দিলেন। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে শাড়ি নিলো। জানতে চাইল, 'কোথায় পাল্টাব?'

'খাড়াও দরজা লাগায়া দেই। ঘরেই পাল্ডাও। আমারে শরমাইয়ো না বইন। তোমার যা আমারও তা।'

পদ্মজা শাড়ি হাতে নিয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে শাড়ি পাল্টানোর মতো উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে। পালঙ্কের পিছনে চোখ পড়ে। পদ্মজা সেদিকে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। এরপর নূরজাহানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'দাদু,তখন কাঁদছিল কে?'

নূরজাহান বিছানায় বসতে বসতে জবাব দেন, 'আমার খলিলের বড় ছেড়ার বউ।'

পদ্মজা দুই কদম এগিয়ে আসে। আগ্রহভরে জানতে চায়, 'কেন কাঁদছিল? উনাকে কি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে?'

'বও। আমার ধারে বও।'

পদ্মজা নূরজাহানের সামনে ঝুঁকে বসে। নূরজাহান বললেন, 'তোমার চাচা হউরের(শ্বশুর) বড় ছেড়ার বউ রুম্পার গত বৈশাখো মাথা খারাপ হইয়া যায়। এরে ওরে

মারতে আসে। কেউরে চিনে না। নিজের সোয়ামিরেও চিনে না। আলমগীর তো এহন ঢাহাত থাহে। আমির তো গেরামে আইছে অনেকদিন হইলো। আলমগীর শহরে আমিরের কামডা করতাছে। এর লাইগগাই তো আলমগীর বিয়াতে আছিল না। রুম্পা তোমার হউরিরে দা নিয়া মারতে গেছিল।'

'এজন্য আপনারা ঘরে আটকে রাখেন উনাকে? হুট করে কেন এমন হলেন?'পদ্মজা আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসা করল।

নূরজাহান এদিকওদিক তাকিয়ে কী যেন দেখলেন! এরপর সতর্কতার সাথে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'বাড়ির পিছে বড় জঙ্গলা আছে। দোষী জায়গা। ভুলেও ওইহানে যাইয়ো না। রুম্পা শনিবার ভরদুপুরে গেছিল। এর পরেরদিন জ্বর উডে। আর এমন পাগল হইয়া যায়। এগুলো তেনাদের কাজ! রাতে নাম লওন নাই। তুমি মাশাল্লাহ চান্দের টুকরা। ভুলেও ওইদিকে যাইয়ো না। ক্ষতি হইব।'

নূরজাহানের কথা শুনে পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, অবিশ্বাস্য! ভয় পেয়ে কারো মাথা খারাপ হয়ে যায়?

পদ্মজা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'উনাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'

'হ। দেহানো হইছে তো। শহরে দুইবার লইয়া গেছে। কবিরাজ আইলো। কেউই ভালা কইরা দিতে পারে নাই। আইচ্ছা এসব কথা বাদ দেও এহন। এই বাড়িত যহন বউ হইয়া আইছো সবই জানবা। খালি বাইরে কইয়ো না এই খবর। গেরামের কেউ জানে না। রাইত অইছে ঘুমাও।'

নূরজাহান শুতে শুতে বললেন, 'হুনো জামাইয়ের কাছে কইলাম যাইবা না।'

'না, না...যাব না।'

'বুঝলা বইন, তোমার দাদা হউরে বিয়ার প্রত্তম রাইতে লুকাইয়া আমারে তুইলা নিজের ঘরে লইয়া গেছিল। আদর-সোহাগ কইরা ভোর রাইতে পাডাইয়া দিছিল। আমি ছুডু আছিলাম। তাই ডরে কইলজা শুকায়া গেছিল।'

বলতে বলতে নূরজাহান জোরে হেসে উঠেন। পদ্মজা মৃদু করে হাসে। নূরজাহান ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়েন। পদ্মজা ধীরে ধীরে এক কোণে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ে। কী অদ্ভুত সব! সাধারণত বিয়ের রাতে নতুন বউরা ঘুমানোর সুযোগ পায় না। জামাইয়ের বাড়ির মানুষেরা সারাক্ষণ ভীড় করে ঘেঁষে থাকে। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। হারিকেনের আগুন নিভু নিভু করে জ্বলছে। নিভে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। কেটে যায় অনেকক্ষণ। ঘুম আসছে না। দেহ অচেনা অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। আচমকা পদ্মজা ভ্রু কুঁচকে ফেলে। কান খাড়া করে ভাল করে শোনার চেষ্টা করে। আবার কাঁদছে! রুম্পা মিনমিনিয়ে কাঁদছে। পদ্মজা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। সাথে সাথে নূরজাহান পদ্মজার দিকে ফিরেন। জানতে চান, 'ডরাইতাছো?'

'উনি আবার কাঁদছেন।'

'সারাবেলাই কান্দে। এইসবে কান দিও না। ঘুমাইয়া পড়ো।'

পদ্মজা উসখুস করতে করতে শুয়ে পড়ে। হারিকেন নিভে যায়। নূরজাহান ঘুমে তলিয়ে যান। নাক ডাকছেন তিনি। নাক ডাকার তীব্রতা অনেক। যা পদ্মজাকে বিরক্ত করে তুলে। পদ্মজা ঘুমানোর চেষ্টা করে। হাজার ভাবনার ভীড়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতে ঘুমের ঘোরে অনুভব করে, হাঁটুতে কারো হাতের ছোঁয়া। পদ্মজা চোখ খুলে। মুখের সামনে কেউ ঝুঁকে রয়েছে। পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ অবয়বটি ছুটে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা কাঁপতে থাকল। শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। ভয়ে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। সে নূরজাহানকে ভয়ার্ত স্বরে ডাকে, 'দাদু...দাদু।'

নূরজাহান একটু নড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পদ্মজা আর ডাকল না। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে। তার চোখের দৃষ্টি দরজার বাইরে। মস্তিষ্ক ভাবছে, দরজা তো লাগানো ছিল। বাইরে থেকে কেউ কীভাবে ঢুকলো? নাকি এর মাঝে দাদু

টয়লেটে গিয়েছিলেন? পদ্মজার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। সে জিহ্বা দিয়ে শুকনা ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো। একটু ভয় ভয় করছে। কে এসেছিল! এভাবে গায়ে হাত দিচ্ছিলো কেন? পদ্মজা চোখ খিঁচে ছিঃ বলে আগন্তুকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। বাকি রাতটুকু আর ঘুম হলো না তার। ভয়টা কমেছে। এই জায়গায় পূর্ণা থাকলে হয়তো পুরো বাড়ি চেঁচিয়ে মাথায় তুলে ফেলতো। পদ্মজা মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে,এরকম ঘটনা পূর্ণার জীবনে যেন না আসে। একদম গুড়িয়ে যাবে। উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পূর্ণার কথা মনে পড়তেই পদ্মজার বুকটা হু হু করে উঠল। কান্না পায়। অন্যদিন পাশে পূর্ণা থাকে। আজ নেই!

ফজরের আযান পড়তেই নূরজাহান চোখ খুলেন। বিছানা থেকে নেমে দেখেন,পদ্মজা জায়নামাজে দাঁড়াল মাত্র। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ওযু করলা কই?'

'জি, কলপাড়ে।'

'চিনছো কেমনে?'

পদ্মজা হাসলো। বলল, 'খুঁজে বের করেছি।'

নূরজাহান চোখমুখ শক্ত করে বলেন, 'নতুন বউ রাইতের বেলা একলা ঘুরাঘুরি কইরা কল খোঁজার কী দরকার আছিল? আমারে ডাকতে পারতা।'

পদ্মজার মাথা নত করে অপরাধী স্বরে বলল, 'ক্ষমা করবেন দাদু।'

'কি কাল আইলো। আইচ্ছা, পড়ো এহন। নামায পড়ো।'

নূরজাহান অসন্তুষ্ট ভাব নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

পদ্মজার দুই চোখ ছলছল করে উঠে। যখন টের পেল এখুনি সে কেঁদে দিবে,দ্রুত ডান হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। এরপর নামাযে মন দিল।

পদ্মজাকে কাতান শাড়ি পরানো হয়েছে। বউভাতের অনুষ্ঠান চলছে। সে এক বিশাল আয়োজন। বিয়ের চেয়েও বড় করে বউভাতের অনুষ্ঠান হচ্ছে। অলন্দপুরের বাইরে থেকেও মানুষ আসছে পদ্মজাকে দেখার জন্য। আটপাড়ার প্রতিটি ঘরের মানুষ তো আছেই। পদ্মজার চারপাশে মানুষের গিজগিজ। রাতে ঘুম হয়নি। পরনে ভারী শাড়ি,গহনা। এতো মানুষ চারিদিকে। সব মিলিয়ে পদ্মজার নাজেহাল অবস্থা। মাথা নত করে বসে আছে সে।

'আপা।'

পূর্ণার কণ্ঠ শুনে মুহূর্তে পদ্মজার ক্লান্তি উড়ে যায়। চকিতে চোখ তুলে তাকায়। পূর্ণা, প্রেমা, প্রান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মজার উপর। পূর্ণা আওয়াজ করে কেঁদে উঠে বলল, 'রাতে আমার ঘুম হয়নি আপা।'

পদ্মজার গলা জ্বলছে। প্রেমা, পূর্ণা, প্রান্তকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। চাপা কণ্ঠে বলে, 'আমারো ঘুম হয়নি বোন।'

'আপা চল, বাড়ি চল।'

'কাইল যাইব। আইজ না। এহন পদ্মজা আমরার বাড়ির ছেড়ি।'লাবণ্য বলল। সে সবেমাত্রই এই ঘরে ঢুকল। পদ্মজার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। পূর্ণা রাগ নিয়ে বলে, 'আমার বোন আমি নিয়ে যাবো।'

'আমাদের আপা আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।'বলল প্রান্ত।

রানি প্রান্তর কান টেনে ধরে বলল, 'পেকে গেছিস তাই না?'

'উ! ছাড়ো রানী আপা। ব্যথা পাচ্ছি।'

'ওরেম্মা! তুই শুদ্ধ ভাষাও শিইখা লাইছস?'রানি অবাক হয়ে জানতে চাইল। প্রান্ত অভিজ্ঞদের মতো হেসে বলল, 'ইয়েস।'

যারা যারা প্রান্তকে চিনে সবার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। প্রান্ত একটি ইংরেজি শব্দ বলেনি যেন মাত্রই এখানে বজ্রপাত ঘটাল। রানি চোখেমুখে বিস্ময়ভাব রেখে বলল, 'এইটা মুন্না না অন্য কেউ।'

'আমি মুন্না না আমি প্রান্ত। প্রান্ত মোড়ল।'প্রান্তের বলার ভঙ্গী দেখে সবাই হেসে উঠল। পদ্মজা হাসতে হাসতে রানিকে বলল, 'প্রান্ত অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ শিখেছে।'

'বউ মানুষ কেমনে দাঁত বাইর কইরা হাসতাছে দেখছো? বেহায়া বউছেড়া।'কথাটি দরজার পাশ থেকে কেউ বলল। অন্য কেউ শুনতে না পেলেও পদ্মজা শুনতে পেল। সে সেদিকে তাকাল।

অল্প বয়সী দুজন মহিলা এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন পদ্মজাকে চোখ দিয়ে গিলে খাবে। পদ্মজা তাদের উদ্দেশ্যে হাসে। পদ্মজার হাসি দেখে মহিলা দুজন থতমত খেয়ে গেল। দুজন চাওয়াচাওয়ি করে আবার পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজা ততক্ষণে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

অতিথি আপ্যায়ন চলছে ধুমধামে। রমিজ আলী, কামরুল ,রজব সবাই উপস্থিত রয়েছে। খাওয়া শেষে তারা আড্ডা শুরু করে।

রমিজ বললেন, 'মনজুর ছেড়া, জলিল, ছইদ এরা কী আইছে?'

কামরুল দাঁতের ফাঁক থেকে যত্ন করে গরু মাংস বের করেন। এরপর উত্তর দেন, 'না আহে নাই। হেদিন ছইদের বাপে আমার কাছে গেছিল।'

'কেরে গেছিল?'

'ছইদরে যাতে মাতব্বরের হাত থাইকা বাঁচায়া দেই।'

'হেরা এহন কই আছে?'

'আছে কোনহানে। কয়দিন পর পরই তো উধাও হইয়া যায়। এহনের ছেড়াদের দায়-দায়িত্ব নাই বুঝলা। আমার যহন দশ বছর তহন ক্ষেতে কাজ করতে যাইতাম।'

কামরুলের কথা উপেক্ষা করে রমিজ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন, 'ক্ষমতা যার বেশি হের সুখ বেশি। আমার মাইয়াডা নির্দোষ আছিল। তবুও কেমনডা করছিল সবাই? আইজ মাতব্বরের ছেড়া বলে কিচ্ছুই হইল না। বদলা আমরা বিয়া খাইতে আইছি।'

রমিজের অসহায় মুখখানা দেখে কামরুল,রজব,মালেক হো হো করে হেসে উঠলেন। রমিজের দৃষ্টি অস্থির। পেট ভরে খাওয়ার লোভে এখানে এসেছেন তিনি। নয়তো এখানে আসার এক ফোঁটাও ইচ্ছে ছিল না।

পদ্মজা কিছুতেই খেতে পারছে না। অথচ ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। চোখের সামনে এতো মানুষ থাকলে কী খাওয়া যায়। পূর্ণা ব্যাপারটা ধরতে পেরে লাবণ্যকে বলল। লাবণ্য সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলে। কেউ শুনে না। তাই সে ফরিনা বেগমকে নিয়ে আসে। ফরিনা বেগম সবাইকে বের করে, দরজা ভিজিয়ে দিয়ে যান। ঘরে শুধু রানি,লাবণ্য,পদ্মজা,প্রেমা,পূর্ণা এবং প্রান্ত। পদ্মজা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পূর্ণা বলে, 'আপা আমি তোমাকে খাইয়ে দেই?'

পদ্মজা অবাক হয়ে তাকাল। ঠোঁটে ফুটে মিষ্টি হাসি। পূর্ণা অনুমতির অপেক্ষা না করে এক লোকমা ভাত বাড়িয়ে দিল। পদ্মজার দুই চোখ ছলছল করে উঠে। পূর্ণা কখনো খাইয়ে দেয়নি। এই প্রথম খাওয়াতে চাইছে। পদ্মজা হা করে। লাবণ্য হেসে বলল, 'আমার এমন একটা বইন যদি থাকতো।'

'আমি তোর বইন না?'বলল রানি।

লাবণ্য চোখমুখ শক্ত করে বলল, 'জীবনে খাইয়ে দিছস? আবার বইন কইতে আইছস যে।'

'তুই খাইয়ে দিছস? পূর্ণা তো ছুটু। তুইও তো ছুটু।'

'আগে পদ্মজা খাওয়াইছে। এরপর পূর্ণা।'

'আইচ্ছা ভাত লইয়া আয়। খাওয়াই দিমু।'রানি বলল।

‘এহন পেট ভরা।’

‘হ, এহন তো তোর পেট, নাক, মাথা সবই ভরা থাকব।’

দুই বোনের ঝগড়া দেখে পূর্ণা,পদ্মজা হাসে। কী মিষ্টি দুজন। ঝগড়াতেও যেন ভালোবাসা রয়েছে। লাবণ্যের চেয়ে রানি বেশি সুন্দর। তবে,লাবণ্যকে দেখলে বেশি মায়া লাগে। লাবণ্য যে রাগী দেখলেই বোঝা যায়। গতকাল কি রাগটাই না দেখাল! ঘরে ঢুকল আমির। আমিরকে দেখেই পদ্মজা সংকুচিত হয়ে গেল। রানি প্রশ্ন করল, ’এইহানে কী দাভাই?’

‘পদ্মজাকে নিয়ে যেতে হবে। ওহ খাচ্ছে। আচ্ছা, খাওয়া শেষ হলে নিয়ে যাবো।’বলতে বলতে আমির পদ্মজার সামনে বসল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, ’কই নিয়ে যাবা?’

‘আম্মার ঘরে।’

‘কেন?’

‘আম্মা বলছে নিয়ে যেতে।’

‘আম্মা একটু আগেই দেইখা গেল।’

আমির হকচকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, ’ওহ তাই নাকি?’

রানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিরকে পরখ করে নিয়ে বলল, ’দাভাই,মিথ্যে বলছো কেন?’

‘মি...মিথ্যে আমি? অসম্ভব। আম্মা না দাদু বলছে নিয়ে যেতে। এই তোরা যা তো। তোদের বান্ধবিরা আসছে। যা। হুদাই ঘেনঘেন শুরু করেছিস।’

লাবণ্য কথা বাড়াতে চাচ্ছিল। রানি টেনে নিয়ে যায়। প্রেমা,প্রেমাও বেরিয়ে যায়। তারা বাড়ি থেকে পরিকল্পনা করে এসেছে, একসাথে পুরো হাওলাদার বাড়ি ঘুরে দেখবে। পূর্ণা খাইয়ে দিচ্ছে। পদ্মজা আমিরের উপস্থিতিতে বিব্রত হয়ে উঠেছে। খাবার চিবোতে পারছে না। আমির পদ্মজাকে বলল, ’বড় ভাবি বলল,রাতে নাকি ঘুমাওনি।’

‘না। হ্যাঁ। আসলে ঘুম আসেনি।’

‘ঘুমাবে এখন?’

‘না,না। কী বলছেন? বাড়ি ভর্তি মানুষ।’পদ্মজা দ্রুত বলল। আমিরের চোখের দিকে তাকিয়ে। কথা শেষ হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

আমির বলল, ’আচ্ছা,খাও। আমি আসছি।’

‘আপনি কী রাতে দাদুর ঘরে এসেছিলেন?’

আমির চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনে চমকে তাকাল। পদ্মজার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলো, ’কেন? কেউ কী এসেছিল তোমার ঘরে?’

আমিরের এমন ছটফটানি দেখে পদ্মজা খুব অবাক হলো। সে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, ’হ্যাঁ, এসেছিল। শেষ রাত্রিরে।’

‘আচ্ছা।’বলেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল আমির। পদ্মজা পিছনে ডাকল, শুনল না আমির। হুট করে আমিরের পরিবর্তন পদ্মজাকে ভাবাতে লাগল।

পর্ব ৩০

পদ্মজাকে নতুন করে আবার সাজানো হয়েছে। বাসর রাত নিয়েও হাওলাদার বাড়ির হাজারটা রীতি। সেসব পালন হচ্ছে। পদ্মজা নিয়ম-রীতি পূরণ করছে ঠিকই,তবে মন অন্য জায়গায়। বিকেলে সে দেখেছে, আমির রিদওয়ানের পাঞ্জাবির কলার দুই হাতে ধরে কিছু বলছে। খুব রেগে ছিল। তবে কী রিদওয়ানই এসেছিল রাতে?

'ও বউ উডো। এহন ঘরে গিয়া খালি দুইজনে মিললা দুই রাকাত নফল নামায পইড়া লইবা। আনিসা যাও লইয়া যাও। দিয়া আও ঘরে।'বললেন ফরিনা। পদ্মজা কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তবে ফিরে আসে। খলিল হাওলাদারের দুই মেয়ে শাহানা,শিরিন এবং আনিসা পদ্মজাকে নিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠে। আমিরের ঘরে ঢুকতে আর কয়েক কদম বাকি। পদ্মজা ঘোমটার আড়াল থেকে চোখ তুলে তাকায়। দরজা গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। টকটকে লাল গোলাপ। হাওলাদার বাড়ির গোলাপ বাগান অলন্দপুরে খুবই জনপ্রিয়। পদ্মজার শুভ্র, শীতল অনুভূতি হয়। কত সুন্দর দেখাচ্ছে! ঘরে ঢুকতেই তাজা গোলাপ ফুলের ঘ্রাণে শরীর-মন অবশ হয়ে আসে। শুধু বিছানা নয়,পুরো ঘর লাল গোলাপ দিয়ে সাজানো।

শাহানা পদ্মজাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। এরপর বলল, 'ডরাইবা না। রাইতটা উপভোগ করবা। এমন রাইত জীবনে একবারই আসে।'

পদ্মজার লজ্জায় মরিমরি অবস্থা! সারা দেহ থেকে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। আনিসা সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছে। একসময় বলল, 'আমার বাসর রাতটাও হুবুহু এই রকম ছিল। চারিদিকে গোলাপের ঘ্রাণ। ফুলের ঘ্রাণে ভালোবাসা আরো জমে উঠেছিল।'

'এই বাড়ির বউদেরই কপাল। আমরা এই বাড়ির ছেড়ি হইয়াও জামাইর বাড়িতে বাসর রাইতের ঘর কাগজের ফুল দিয়ে সাজানি দেখতে হইছে।'বলল শিরিন। আনিসা কণ্ঠে অহংকার ভাব নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলল, 'এসব পেতে যোগ্যতা লাগে। যোগ্যতা ছাড়া ভালো কিছু পাওয়া যায় না। আমি উচ্চশিক্ষিত এবং সুন্দরী ছিলাম। ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য ছিলাম তাই পেয়েছি। আর পদ্মজা যথেষ্ট সুন্দরী, গ্রামে থেকেও পড়ালেখায় খুব ভালো। তাই সেও যোগ্য। তোমাদের না আছে পড়াশোনা না আছে কোনো ভাল গুণ। গায়ের রঙও ময়লা। কাগজের ফুলই তোমাদের জন্য ঠিক ছিল।'

আনিসার কথাগুলো শুনতে পদ্মজার খুব খারাপ লাগে। কোনো মানুষকে এভাবে বলা ঠিক না। শিরিন হইহই করে উঠল, 'এই রূপ বেশিদিন থাকব না ভাবি। এতো দেমাগ ভালা না। বিয়ার এতদিন হইছে একটাও বাচ্চা দিতে পারছো? পারো নাই। তাইলে এই গরিমা (অহংকার) দিয়া কী হইবো? সন্তান ছাড়া নারীর শোভা নাই।'

আনিসা রেগেমেগে ফুঁসে উঠে। গলা উঁচু করে বলে, 'সমস্যা আমার নাকি তোমাদের পেয়ারের ভাইয়ের সেটা খোঁজ নাও আগে। আমি এখুনি জাফরকে সব বলছি। এতদিন পর বাড়িতে এসেছি এসব নোংরা কথা সহ্য করতে? অপমান সহ্য করতে? কালই চলে যাব আমি।'

আনিসা রাগে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হতবাক। শাহানা শিরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এত কিছু কেন কইতে গেলি? জানস না,এই ছেড়ি কেমন? আমি হের বড় হইয়াও হেরে কিছু কই না। এহন আরেক ভেজাল হইবো।'

'যা হওয়ার হইয়া যাক। আমরারে কেমনে পায়ে ঠেলতাছিল দেহো নাই? এইডা তো আমরার বাপের বাড়ি। এতো কথা কেন হুনতে হইবো?'শিরিনের কণ্ঠ কঠিন। সে আজ এর শেষ দেখেই ছাড়বে।

'নতুন বউডার সামনে এমনডা না করলেও হইতো। ও পদ্ম তুমি বেজার হইয়ো না। এরা সবসময় এমনেই লাইগা থাহে।'

পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে। শাহানা দরজার বাইরে থাকিয়ে দেখে আমির আসছে নাকি। রাত তো কম হলো না। শাহানা আরো অনেকক্ষণ সময় নিয়ে পদ্মজাকে বুঝালো। কী কী

করতে হবে, কীভাবে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে রাখতে হয়। পদ্মজা সব মনোযোগ সহকারে শুনে।

আমির ঘরে ঢুকতেই শাহানা,শিরিন বেরিয়ে গেল। আমির দরজা লাগিয়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। পদ্মজা পালঙ্ক থেকে নেমে আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে। আমির দুই হাতে পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড় করায়। অনুভব করে পদ্মজা কাঁপছে। প্রচন্ড শীতে মানুষ যেভাবে কাঁপে,ঠিক তেমন। আমির দ্রুত ছেড়ে দেয়। বলে, 'পানি খাবে?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে জানায়, সে পানি খাবে। আমির এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেয়। পদ্মজা এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে পানি শেষ করে। সারা শরীর কাঁপছে। শাহানা,শিরিন বের হতেই বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়। ঘরে চারটা হারিকেন জ্বালানো। যেদিকে চোখ যায় সেখানেই গোলাপ ফুল। ফুলের ঘ্রাণে চারিদিক মৌ মৌ করছে। এমন পরিবেশে বিয়ের প্রথম রাতে পর পুরুষকে স্বামী রূপে দেখা কোনো সহজ অনুভূতি নয়। আমির গ্লাস নিতে এগিয়ে আসলে পদ্মজা আঁতকে উঠে,এক কদম পিছিয়ে যায়। আমির একটু শব্দ করেই হাসে। পদ্মজা ভীতু ভীতু চোখে তাকায়। আমির বলে, 'হাতে গ্লাস নিয়ে সারারাত কাটাবে নাকি? দাও আমার কাছে।'

আমির গ্লাস টেবিলের উপর রেখে আসে। পদ্মজা পালঙ্কের এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। তার ডান পা অনবরত কাঁপছে। মনে মনে দোয়া করছে, মাটি যেন ফাঁক হয়ে যায়। আর সে তার ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পাতালে হারিয়ে যেতে চায়। নয়তো লজ্জা,আড়ষ্টতায় প্রাণ এখুনি গেল বুঝি! আমির দূরত্ব রেখে পদ্মজার সোজাসুজি বসে। পদ্মজার এক পা যে কাঁপছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার দৃষ্টি অস্থির। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। আমির মজা করে জানতে চাইল, 'পালানোর পথ খুঁজছো নাকি?'

'না..না তো।'বলল পদ্মজা।

'তাহলে কী খুঁজছো?'

পদ্মজা নিরুত্তর রইল। আমির পদ্মজার আরো কাছে এসে বসে। এক হাতে পদ্মজার এক হাত ছুঁতেই পদ্মজা, 'ও মাগো!'বলে চিৎকার করে উঠে। আমির পদ্মজার আকস্মিক চিৎকারে থতমত হয়ে গেল। পদ্মজা ভয়ে ঢোক গিলে। সময়টা যেন যাচ্ছেই না। সে যদি পারতো পালিয়ে যেতো। ভয়ংকর অনুভূতিদের খেলা চারিদিকে! আমির হা করে পদ্মজার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর দূরে গিয়ে বসে,পদ্মজাকে বলল, 'আমার সাথে সহজ হওয়ার চেষ্টা করো। আমার দিকে ফিরে বসো। গল্প করি।'

পদ্মজা আমিরের দিকে ফিরে বসে। তবে দৃষ্টি বিছানার চাদরে নিবদ্ধ। আমির প্রশ্ন করে, 'আমার সম্পর্কে কতটুকু জানো?'

'খুব কম।'মিনমিনিয়ে বলল পদ্মজা।

'আমি তোমার চেয়ে বারো বছরের বড়। জানো?'

'এখন জানলাম। তবে আপনার আচরণ ছোটদের মতো।'পদ্মজা মৃদু হেসে আমিরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। আমির বলল, 'আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আরো আছে।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনার কথাবার্তা এখন বড়দের মতো মনে হচ্ছে।'

'ঢাকা আমার ব্যবসা আছে।'

'শুনেছি।'

'আমার সাথে তোমাকেও ঢাকা যেতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'এই বাড়ির চেয়েও বিশাল বড় বাড়িতে আমি একা থাকি। যতক্ষণ বাইরে থাকব তোমাকে একা থাকতে হবে। ভয় পাওয়া যাবে না।'

'আমি ভয় পাই না।'

'আমাকে তো ভয় পাচ্ছো।'আমির হেসে বলল। পদ্মজা নিরুত্তর।

'কথা বলো।'

'কী বলব?'

'আচ্ছা, আসো একটা মজার খেলা খেলি।'

পদ্মজা উৎসুক হয়ে তাকাল। আমির বলল, 'দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। যার চোখের পলক আগে পড়বে সে হেরে যাবে।'

পদ্মজা খেলতে রাজি হয়। এই খেলাটা সে পূর্ণার সাথেও খেলেছে। পদ্মজা অনেকক্ষণ এক ধ্যাণে তাকিয়ে থাকতে পারে। তাই তার আত্মবিশ্বাস আছে, সেই জিতবে। বরাবরই জিতে এসেছে। আমির এক,দুই, তিন বলে খেলা শুরু করে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে একধ্যাণে। পদ্মজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমিরকে পরখ করে। আমিরের চুল খাড়া করে উল্টা দিকে ফিরানো। থুতুনির নিচে কাটা দাগ। গালে হালকা দাঁড়ি। শ্যামলা গায়ের রঙ। ঘন ভ্রু,চোখের পাঁপড়ি। পরেছে সাদা পাঞ্জাবি। এতো বেশি ভালো লাগছে দেখতে। আমির পদ্মজার রূপে আগে থেকেই দিওয়ানা। তার উপর এতক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনুভূতির দফারফা অবস্থা। সে মুগ্ধ হওয়া কণ্ঠে বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারী আমার বউ। কী ভাগ্য আমার!'

'আপনিও সুন্দর।'কথাটা মুখ ফসকে বলে উঠল পদ্মজা। যখন বুঝতে পারল লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। আমির খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল, 'তোমার পলক পড়েছে। আমি জিতে গেছি।'

পদ্মজা লজ্জায় নখ খুঁটতে থাকে। আমির নিজের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আমি জানি আমি কতোটা সুন্দর! রঙটা একটু কালো হতে পারে। তবে আমি সুন্দর। তোমার মুখে শোনার পর থেকে ধরে নিলাম,পৃথিবীর সেরা সুন্দর পুরুষের নাম আমির হাওলাদার।'

পদ্মজার দুই ঠোঁট নিজেদের শক্তিতে আলগা হয়ে গেল। সে আমিরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, মানুষ নিজের প্রশংসা নিজে কীভাবে করতে পারে। আমিরের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে সত্যিই পৃথিবীর সেরা সুন্দর পুরুষ। পদ্মজা ফিক করে হেসে দিল। আমির তাকাল। বলল, 'হাসছো কেন?'

পদ্মজা হাসি চেপে বলল, 'কই না তো। আপনার আম্মা বলেছিলেন, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতে।'

'আমার আম্মা তোমার আম্মা না?'

'হুম।'

'এখন থেকে আপনার আম্মা না শুধু আম্মা বলবে। গয়নাগাটি নিয়েই নামায পড়বে? অস্বস্তি হবে না? খুলো এবার।'

পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'শিরিন আপা বললেন, গয়নাগাটি নাকি স্বামি খুলে দেয়। তাহলে?'

আমির তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে বলল, 'তাই নাকি? দাও খুলে দেই।'

পদ্মজা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল। আমতাআমতা করে বলল, 'এ..এটা বোধহয় নিয়ম না। তাই আপনি জানতেন না। আমি…আমি পারব।'

দুই রাকাত নফল নামাযের সাথে তাহাজ্জুদের নামাযটাও পড়েছে দুজন। আমির তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জানে না। পদ্মজা হাতে কলমে শিখিয়েছে। আমিরও মন দিয়ে শিখেছে এবং নামায পড়েছে। এরপর পদ্মজা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সামনে বিশাল বড় জঙ্গল। সে আমিরকে প্রশ্ন করল, 'এই জঙ্গলে নাকি কী আছে?'

আমির পদ্মজার প্রশ্ন শুনেনি। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। গায়ে কোনো অলংকার নেই। খোলা চুল কোমর অবধি এসে থেমেছে। মধ্য রাতের বাতাসে তার চুল মৃদু দুলছে। আমির অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয়। পদ্মজার কোমর পিছন থেকে দুই হাতে

জড়িয়ে ধরে,পদ্মজার কেঁপে উঠে বড় করে নিঃশ্বাস নেয়া অনুভব করে গভীরভাবে। পদ্মজার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। পায়ের তলার মাটি শিরশির করে উঠে। তবে,অদ্ভুত বিষয় শুরুর মতো আমিরের স্পর্শ অস্বস্তি দিচ্ছে না তাকে। বরং ধারালো কোনো অজানা অনুভূতিতে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমির পদ্মজার ঘাড়ে থুতুনি রেখে বলল, 'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই মনে মনে পণ করি তোমাকেই বিয়ে করব। তবে ভাবিনি প্রথম দিনই আমার কারণে এতোটা অপদস্থ হতে হবে তোমাকে। অনেক চেষ্টা করেছি সব আটকানোর, পারিনি। সেদিনই বাড়ি ফিরে আব্বাকে বলি,আমি বিয়ে করতে চাই পদ্মজাকে। প্রথম প্রথম কেউ রাজি হচ্ছিল না। পরে রাজি হয়ে যায়। মনে হচ্ছে,চোখের পলকে তোমাকে পেয়ে গেছি।'

পদ্মজা নিশ্চুপ। সে অবাধ্য, অজানা অনুভূতিদের সাথে যুদ্ধ করবে নাকি সখ্যতা করবে ভাবছে। আমির পদ্মজাকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফেরায়। পদ্মজা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। আমির বলল, 'তোমায় আমি পদ্ম ফুল দিয়ে একদিন সাজাব। নিজের হাতে সাজাব।'

'কথা বলো। আল্লাহ, আবার কাঁপছো! আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, স্থির হতে পারবে। এই কী হলো?'

পদ্মজা শরীরের ভার ছেড়ে দিয়েছে আমিরের উপর। আমির দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখে। সেদিন রাতে জান্নাতের সুবাস এসেছিল ঘরে। পদ্মজা নিজের অস্তিত্বের পুরো অংশ জুড়ে স্বামীরূপে একজন পুরুষকে অনুভব করে। ভালোবাসাটা শুরু হয় সেখান থেকেই। মন মাতানো ছন্দ এবং সুর দিয়ে শুরু হয় জীবনের প্রথম প্রেম,প্রথম ভালবাসা।

পর্ব ৩১

সকাল থেকে বাতাস বইছে। কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে এমন আমেজ সেই বাতাসে। একটু শীতেল চারপাশ। গরু গাড়ি চড়ে পদ্মজা যাচ্ছে বাপের বাড়ি। পাশে আছে আমির এবং লাবণ্য। পদ্মজার পরনে সবুজ শাড়ি। ভারী সুতার কাজ। গা ভর্তি গহনা। এসব পরে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু ফরিনা বেগমের কড়া নিষেধ, কিছুতেই গহনা খোলা যাবে না। আমির পদ্মজার এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই যেন হারিয়ে যাবে। আমিরের এহেন পাগলামি পদ্মজাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে। সে চাপা স্বরে বলল, 'কোথাও চলে যাচ্ছি না,আস্তে ধরুন।'

আমির চটপট করে নরম স্পর্শে পদ্মজার হাত ধরল। পদ্মজা বলল, 'মনে আছে তো কি বলেছিলাম?'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজা হায় হায় করে উঠল, 'ওমনি ভুলে গেছেন?'

আমির শূন্যে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখল, পদ্মজা নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমির মিষ্টি করে হেসে ডাকল, 'এদিকে আসো।'

পদ্মজা ছোট ছোট করে পা ফেলে আমিরের পাশে দাঁড়ায়। আমির খপ করে পদ্মজার হাত ধরে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কখন উঠেছো?'

'যেভাবে টান দিলেন। ভয় পেয়েছি তো।'

'এতো ভীতু?'

'কখনোই না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'উঠুন। আম্মা আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কেন? জরুরি দরকার নাকি?'

'আমি জানি না। উঠুন আপনি।'

'এই তুমি তো কম লজ্জা পাচ্ছো ।'

পদ্মজার মুখ লাল হয়ে উঠে। সে বিছানা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। মাথা নত করে বলল, 'আপনি লজ্জা দিতে খুব ভালোবাসেন।'

আমির হাসতে হাসতে বিছানা থেকে নামল। বলল, 'তোমার চেয়ে কম ভালোবাসি। আচ্ছা, তুমি কবে ভালোবাসবে বলো তো?'

পদ্মজা পূর্ণ-দৃষ্টিতে আমিরকে দেখল। আমির আবার হাসল। তারপর পদ্মজার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'যেদিন মনে হবে তুমিও আমাকে ভালোবাসো,বলবে কিন্তু। সেদিনটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হবে।'

পদ্মজা তখনও এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমির হাত নাড়িয়ে পদ্মজার পলক অস্থির করে বলল, 'কী ভাবছো?'

'কিছু না।'

'কিছু বলবে?'

'আজ ওই বাড়ি যাব আমরা।'

'এটাই তো নিয়ম।'

'আপনি একটু বেশরম।'

আমির চকিতে তাকাল। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হেসে চোখ সরিয়ে নিল। আমির আমতাআমতা করে বলল, 'তা..তাতে কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'কি বলতে চাও, বলো তো।'

'বড়দের সামনে আমাকে নিয়ে এতো কথা বলবেন না। মানুষ কানাকানি করে।

আপনাকে বেলাজা,বেশরম বলে।'

'আমার বউ নিয়ে আমি কী করব, আমার ব্যাপার।'

'কিন্তু আমাকে অস্বস্তি দেয়।'পদ্মজা করুণ স্বরে বলল।

আমির নিভল, 'আচ্ছা,ঠিক আছে। নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করব।'

'সত্যি? আমার আম্মার সামনে ভুলেও পদ্মজা, পদ্মজা করবেন না।'

'ইশারা দিতেই চলে আসবে। তাহলে ডাকাডাকি করব না।'

পদ্মজা হাসল। আমির ইষৎ হতচকিত। বলল, 'হাসছো কেন?'

'এমনি। মনে রাখবেন কিন্তু।'

'তুমিও মনে রাখবে।'

সকালের দৃশ্য থেকে বেরিয়ে আসে আমির। পদ্মজাকে বলল, 'মনে আছে। তোমার অস্বস্তি হয় এমন কিছুই করব না।'

আমিরের কথায় পদ্মজা সন্তুষ্ট হয়। নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে। উত্তেজনায় কাঁপছেও। মা-বাবাকে দেখবে দুই দিন পর। দুই দিনে কী কিছু পাল্টেছে? পদ্মজা মনে মনে ভাবছে, 'আম্মা বোধহয় শুকিয়েছে। আমাকে ছাড়া আম্মা নিশ্চয় ভালো নেই।'

পদ্মজার খারাপ লাগা কাজ করতে থাকে। ছটফটানি মুহূর্তে বেড়ে গেল। আমির জানতে চাইল, 'পদ্মজা, শরীর খারাপ করছে?'

'না।'

'অস্বাভাবিক লাগছে।'

'আম্মাকে অনেকদিন পর দেখব।'

'অনেকদিন কোথায়? দুই দিন মাত্র।'

'অনেকদিন মনে হচ্ছে।'

'এইতো চলে এসেছি। ওইযে দেখো, তোমাদের বাড়ির পথ।'

আমির আঙ্গুলে ইশারা করে। আমিরের ইশারা অনুসরণ করে পদ্মজা সেদিকে তাকাল। ওই তো তাদের বাড়ির সামনের পুকুর দেখা যাচ্ছে। আর কিছু সময়,এরপরই সে তার মাকে দেখবে। পদ্মজা অনুভব করে তার নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। সে আমিরের এক হাত শক্ত করে ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

হেমলতা নদীর ঘাটে মোর্শেদের সাথে কথা বলছেন। তিনি মোর্শেদকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন। মোর্শেদ কিছু জিনিষ ভুলক্রমে আনেননি। তা নিয়েই আলোচনা চলছে। ঠিক আলোচনা নয়। হেমলতা বকছেন,মোর্শেদ নৌকায় বসে শুনছেন। তিনি কথা বলার সুযোগই পাচ্ছেন না। হেমলতা নিঃশ্বাস নিতে চুপ করেন। তখনি মোর্শেদ বললেন, 'অহনি যাইতাছি। সব লইয়া হেরপর আইয়াম।'

'এখন গিয়ে হবেটা কী বলো তো? হঠাৎ ওরা চলে আসবে।'

'আমি যাইয়াম আর আইয়াম।'বলতে বলতে মোর্শেদ নৌকা ভাসিয়ে দূরে চলে যান। হেমলতা ক্লান্তি ভরা দৃষ্টি নিয়ে স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পূর্ণার চিৎকার ভেসে আসে কানে। তিনি চমকে ঘুরে তাকান। পূর্ণা, আপা আপা বলে চেঁচাচ্ছে বাড়িতে। হেমলতা বিড়বিড় করেন, 'এসে গেছে আমার পদ্ম।'

তিনি ব্যস্ত পায়ে হেঁটে বাড়ির উঠোনে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা হামলে পড়ে বুকের উপর। আম্মা,আম্মা বলে জান ছেড়ে দেয়। হেমলতার এতো বেশি আনন্দ হচ্ছে যে, হাত দুটো তোলার শক্তি পাচ্ছেন না। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দুই হাতে শক্ত করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেন। শূন্য বুকটা চোখের পলকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পদ্মজা নিশ্চয় বুঝে যাবে, দুই রাত তার আম্মা ঘুমায়নি। চোখদ্বয় নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারেনি। বুঝতেই হবে পদ্মজাকে। পদ্মজা ঘন ঘন লম্বা করে নিঃশ্বাস টানছে।

স্পষ্ট একটা ঘ্রাণ পাচ্ছে সে। মায়ের শরীরের ঘ্রাণ। পারলে যেন পুরো মাকেই এক নিঃশ্বাসে নিজের মধ্যে নিয়ে যেত সে।

হেমলতা পদ্মজার মাথায় আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, 'আর কাঁদিস না। এই তো,আম্মা আছি তো।'

'তোমাকে খুব মনে পড়েছে আম্মা।'

'আমারও মনে পড়েছে।'হেমলতার চোখের জল ঠোঁট গড়িয়ে গলা অবধি পৌঁছেছে। তিনি অশ্রুমিশ্রিত ঠোঁটে পদ্মজার কপালে চুমু দেন। আমির হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করতে নেয়। হেমলতা ধরে ফেলেন। আমিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'লাগবে না বাবা।'

আমির বিনীত কণ্ঠে বলল, 'ভালো আছেন আম্মা?'

'ভালো আছি। তুমি ভালো আছো তো? আমার মেয়েটা কান্নাকাটি করে জ্বালিয়েছে খুব?'

'ভালো আছি আম্মা। একটু-আধটু তো জ্বালিয়েছেই।'কথা শেষ করে আমির আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজা ফোঁপাচ্ছে। হেমলতা অনেকক্ষণ চেষ্টা করে পদ্মজাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। বাড়িতে মনজুরা,হানি সহ হানির শ্বশুরবাড়ির অনেকেই ছিল। তারা আগামীকাল ঢাকা ফিরবে। জামাই স্বাগতমের বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ণা পদ্মজা, লাবণ্যকে টেনে নিয়ে যায় ঘরে। হানির স্বামী আমিরকে নিয়ে গল্পের আসর জমান।আমির আসার সময় গরু গাড়ি ভরে বাজার করে নিয়ে এসেছে। হেমলতা সেসব গুছাচ্ছেন। তিনি বার বার করে মজিদ মাতব্বরকে বলে দিয়েছিলেন, ফের যাত্রায় বাজার না পাঠাতে। তবুও পাঠিয়েছেন। ফেলে তো দেওয়া যায় না।

রাতের খাবার শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। পূর্ণাকে আমির ছোট আপা ডাকে। শালির চোখে একদমই দেখছে না। তেমন রসিকতাও করছে না। আমিরের ব্যবহারে পূর্ণা ধীরে ধীরে আমিরকে বোন জামাই হিসেবে পছন্দ করছে। না হোক নায়কের মতো সুন্দর। মন তো ভালো। হানির বড় ছেলে,লাবণ্য,আমির আর পূর্ণা লুডু খেলছে। পদ্মজা কিছুক্ষণ খেলে উঠে চলে এসেছে। হেমলতা,মোর্শেদ বারান্দার বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। পদ্মজা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। মোর্শেদ দেখতে পেয়ে ডাকলেন, 'কী রে মা? আয়।'

পদ্মজাকে দুজনের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'হউরবাড়ির মানুষেরা ভালা তো?'

পদ্মজা নতজানু হয়ে জবাব দিল, 'সবাই ভালো।'

'একটু আধটু সমস্যা থাকবেই, মানিয়ে নিস। জয় করে নিস। সব কিছুই অর্জন করে নিতে হয়।'বললেন হেমলতা। পদ্মজা হেমলতার দিকে তাকিতে মৃদু করে হাসলো। হেমলতা আবার বলেন, 'তোর শ্বাশুড়ি একটু কঠিন তাই না? চিন্তা করিস না। যা বলে করবি। পছন্দ-অপছন্দ জানবি। সেই মতো কাজ করবি। দেখবি, ঠিক মাথায় তুলে রেখেছে।'

'আচ্ছা, আম্মা।'বলল পদ্মজা।

'সব শ্বাশুড়ি ভালো হয় না লতা। আমার শ্বাশুড়িরে আজীবন তেল দিলাম। কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হয়নি।'বললেন হানি। তিনি ঘর থেকে সব শুনছিলেন। কথা না বলে পারলেন না।

হেমলতা এক হাতে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর হানির উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার পদ্মর কপাল এতো খারাপ নিশ্চয় হবে না।'

'পদ্মর অবস্থা আমার মতো হয়েছে যদি শুনি, পদ্মকে তুলে নিয়ে যাব আমার কাছে। তুই মিলিয়ে নিস।'

'আহ! থামো তো আপা। আমির, লাবণ্য শুনবে। কী ভাববে?'

হানি আর কিছু বললেন না। চারজন মানুষ নিশ্চুপ বসে রইল অনেকক্ষণ। একসময় হেমলতা রান্নাঘরের দিকে যান। রান্নাঘর গুছানো হয়নি। মোর্শেদ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান। সারাদিন অনেক ধকল গেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। হানি পদ্মজার পাশে বসেন। বললেন, 'শোন মা, শ্বাশুড়িরে বেশি তেল দিতে গিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করবি না। তোর মায়ের অনেক জ্ঞান,অভিজ্ঞতা মানি। কিন্তু লতার শ্বাশুড়ি নিয়ে সংসার করতে হয়নি। তাই সে জানে না। আমি জানি শ্বাশুড়িরা কেমন কালসাপ হয়। এরা সেবা নিবে দিনরাত। বেলাশেষে ভুলে যাবে। নিজের কথা আগে ভাববি। শ্বাশুড়ি ভুল বললে জবাব দিবি সাথে সাথে। নিজের জায়গাটা বুঝে নিবি। পড়াশোনা থামাবি না। পড়বি আর আরামে থাকবি। আমরা বান্দি পাঠাইনি। সাক্ষাৎ পরী পাঠাইছি। শুনছি, আমিরের টাকাপয়সা, জমিজমা অনেক আছে। তাহলে তোর আর চিন্তা কীসের? জামাই হাতে রাখবি। তাহলে পুরো সংসার তোর হাতে। আমার কপালে এসব ঠেকেনি। বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির মানুষের মন রাখতে রাখতে কখন বুড়ি হয়ে গেছি বুঝিনি। বুঝছিস তো?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল, 'মেজো আপা আসে নাই কেন? বিয়ে কবে আপার?'

'ওর তো পরীক্ষা সামনে। পড়াশোনা শেষ করুক। এরপর বিয়ে দেব।'

'বিয়ে না ঠিক হওয়ার কথা ছিল। হয়নি?'

'কবে?'বললেন হানি। পদ্মজা হানির প্রশ্নে খুব বেশি অবাক হলো। কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'আম্মা না কয়দিন আগে তোমাদের বাড়ি গেল। বড় আপার বিয়ে ঠিক করতে।'

হানি হা হয়ে তাকিয়ে রইলেন পদ্মজার দিকে। তিনি কিছুই বুঝছেন না। তার মেয়ের বিয়ে আবার কবে ঠিক হওয়ার কথা ছিল? পদ্মজা বিয়ে করে কী আবোলতাবোল বকছে! তিনি বললেন, 'কী বলিস?'

হানির সহজ সরল মুখখানার দিকে পদ্মজা একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে ভাবছে, 'আম্মা রাজধানীতে তাহলে কেন গিয়েছিল? মিথ্যে কেন বলেছে? সেদিন রাজধানীতে গিয়েছিল বলেই, এতো বড় অঘটন ঘটেছিল। না! অঘটন ভাগ্যেই লেখা ছিল। কিন্তু মিথ্যে কেন বলল আম্মা?'

পর্ব ৩২

মাদিনী নদীর বুকে কুন্দ ফুলের মতো জোনাকি ফুটে রয়েছে। পদ্মজা তা এক মনে চেয়ে দেখছে। রাত অনেকটা। আমির ঘুমাচ্ছে। তিন দিনে আমিরের সাথে পূর্ণা-প্রেমার খুব ভাব হয়েছে। সারাক্ষণ আড্ডা,লুডু খেলা। পদ্মজা যত দেখছে তত আমিরের প্রেমে পড়ছে। আমিরের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পদ্মজার মনে পড়ল, আগামীকাল ফিরে যেতে হবে শ্বশুরবাড়ি। মা-বাবা,ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে আবার চলে যেতে হবে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে আসে। মন ভালো করতে চলে আসে নদীর ঘাটে। জোনাকিদের কুরুক্ষেত্র দেখতে দেখতে কেটে যায় অনেকক্ষণ। আঁধার ভেদ করে একটা আলোর ছোঁয়া লাগে চারপাশে। এসময় কে এলো? পদ্মজা ঘাড় ঘুরে তাকাল। মাকে দেখে একগাল হাসল। হেমলতা হারিকেন হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। কিঞ্চিৎ রাগ নিয়ে বললেন, 'এতো রাতে একা ঘাটে এসেছিস কেন? মার খাসনি অনেকদিন। বিয়ে হয়েছে বলে আমি মারব না নাকি?'

হেমলতার ধমকে পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে থতমত হয়ে দাঁড়াল। মা শেষ কবে মেরেছেন পদ্মজা মনে করতে পারছে না। তিনি যেভাবে বললেন মনে হলো, না জানি কত মেরেছেন। তাই সে ও ভয় পাওয়ার ভান ধরল।

'যাচ্ছি ঘরে।'পদ্মজার গলা।

'কী জন্য এসেছিলি? ঘুম আসছে না?'হেমলতার কণ্ঠটা নরম শুনাল।

'কাল চলে যেতে হবে, তাই মন খারাপ হচ্ছিল।'

হেমলতা হারিকেন মাটিতে রাখেন। তারপর দুহাতে পদ্মজাকে বুকে টেনে নেন। পদ্মজার কান্নারা বাঁধন ছেঁড়া হলো। মায়ের বুকে মুখ চেপে পিঠটা বারংবার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ এভাবেই পার হলো।

'এতো সহজে কাঁদিস কেন? মা-বাবার কাছে সারাজীবন মেয়েরা থাকে না মা।'

'তুমি সাথে চলো।'

'পাগল মেয়ে! বলে কী! কান্না থেমেছে?'

পদ্মজা দুহাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'হু।'

'আমির তো ঘুমে। তুইও ঘুমিয়ে পর গিয়ে।'

পদ্মজা মাথা নাড়াল। দুই কদম এগিয়ে আবার চটজলদি পিছিয়ে আসে। মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি ঘুমাবে না আম্মা?'

'ঘুমাব, চল।'

'আম্মা?'

হেমলতা হারিকেন হাতে নিয়ে পদ্মজার চোখের দিকে তাকালেন। পদ্মজা বলল, 'তোমার জীবনের সবটা আমাকে বলেছো। কিছু আড়ালে থাকলে সেটাও বলো আম্মা।'

'কেন মনে হলো, আরো কিছু আছে?'হেমলতার কণ্ঠটা অন্যরকম শুনাল।

'মনে হয়নি। এমনি বলে রাখলাম।'

পদ্মজা নতজানু হয়ে নিজের নখ খুঁটাচ্ছে। হেমলতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেটে যায় অনেকটা সময়। তিনি ঢোক গিলে গলা ভেজান। তারপর বললেন, 'তাই হবে।'

পদ্মজা খুশিতে তাকাল। নিশ্চয় এখন সব বলবেন আম্মা। হানি খালামনির বাড়ির কথা বলে সেদিন কোথায় গিয়েছিলেন? এখনই জানা যাবে। হেমলতা আশায় পানি ঢেলে দিলেন, 'এখন ঘুমাতে যা। অনেক রাত হয়েছে।'

পদ্মজার চোখমুখের উজ্জ্বলতা নিভে গেল। মা কাঙ্ক্ষিত প্রসঙ্গটি কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন? পদ্মজা সরাসরি জিজ্ঞাসা করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারছে না। জড়তা ঘিরে রেখেছে তাকে। মা সবসময় নিজ থেকে সব বলেন। নিশ্চয় কোনো কারণে এই বিষয়ে চুপ আছেন। পদ্মজা মনে মনে নিজেকে স্বান্তনা দিল, 'একদিন আম্মা বলবে। অবশ্যই

বলবে।'

কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন হেমলতা। সন্ধ্যার আযান পড়বে। চারপাশে এক মায়াবী ঘনছায়া। মন বিষাদময়। পদ্মজা দুপুরে মোড়ল বাড়ি ছেড়েছে। বিদায় মুহূর্তটা একটুও স্বস্তির ছিল না। মেয়েটা এতো কাঁদতে পারে! তবে হেমলতার চোখ শুকনো ছিল। মায়ের চোখ শুকনো দেখে কি পদ্মজা কষ্ট পেয়েছিল? কে জানে! হেমলতা বারান্দা ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন শক্তির অবস্থান শূন্যে। তিনি আবার বসে পড়েন। হেসে ফেললেন। পদ্মজা ছাড়া এতো দূর্বল তিনি! এটা ভাবতে অবশ্য ভালো লাগে। হেমলতা আকাশের দিকে তাকান। চোখ দুটি জ্বলছে। জলভরা চোখ নিয়ে আবার হাসলেন। কী যন্ত্রণাময় সেই হাসি! মাটিতে হাতের ভর ফেলে উঠে দাঁড়ান তিনি। এলোমেলো পায়ে লাহাড়ি ঘর ছাড়েন। উঠোনে এসে থমকে দাঁড়ান। বাড়ির গেইট খোলা ছিল।পাতলা অন্ধকার ভেদ করে একটি নারী অবয়ব এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। হেমলতা নারী ছায়াটির স্পষ্ট মুখ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন। গেইটের কাছাকাছি আসতেই হেমলতা আন্দাজ করতে পারেন কে এই নারী! তিনি মৃদু হেসে এগিয়ে যান।

'অনেক দেরি করলেন আসতে।'

বাসন্তী উঠোনে পা রেখে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনেন?'

হেমলতা জবাব না দিয়ে বাসন্তীর ব্যাগ নিতে হাত বাড়ালেন। বাসন্তী ব্যাগ আড়াল করে ফেললেন। তিনি খুব অবাক হচ্ছেন। মনে যত সাহস নিয়ে এসেছিলেন সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। হেমলতা বললেন, 'আপনি এই বাড়িতে নির্দ্বিধায় থাকতে পারেন। আমি বা আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই।'

'আ...আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?'

'সে যেভাবেই চিনি। জেনে কী লাভ আছে? আপনি প্রথম দিনই একা আসতে পারতেন। লোকজন না নিয়ে।'

বাসন্তীর এবার ভয় করছে। শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। একটা মানুষ সতিন দেখে এতো স্বাভাবিক কী করে হতে পারে? তিনি তো ভেবেছিলেন যুদ্ধ করে স্বামীর বাড়িতে বাঁচতে হবে। বাসন্তীর ধবধবে সাদা চামড়া লাল বর্ণ ধারণ করে। হেমলতার কথা,দৃষ্টি এতো ধারালো মনে হচ্ছে তার! হেমলতা বাসন্তীকে চুপ দেখে বললেন, 'আপনি বিব্রত হবেন না। এটা আপনারও সংসার। আসুন।'

হেমলতা আগে আগে এগিয়ে যান। বারান্দা অবধি এসে পিছনে ফিরে দেখেন, বাসন্তী ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। হেমলতা কথা বলার জন্য প্রস্তুত হোন,তখনই একটা পুরুষালি হুংকার ভেসে এলো, 'তুমি এইহানে আইছো কেন?'

মোর্শেদের কণ্ঠ শুনে বাসন্তী কেঁপে উঠলেন। মোর্শেদকে এড়িয়ে একজন বনেদি লোকের প্রতি ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এরপর থেকেই মোর্শেদ এবং তার সম্পর্কে ফাটল ধরে। মোর্শেদ ত্যাগ করে তাকে। কিন্তু তিনি এক সময় বুঝতে পারেন, কোনটা ভুল কোনটা সঠিক। সংসারের প্রতি টান অনুভব করে,ফিরে আসতে চান। মোর্শেদ জায়গা দিলেন না। ততদিনে মোর্শেদ দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি করে ফেলন। মোহ ছেড়ে ফিরে আসেন হেমলতার কাছে। নিজের সন্তানদের কাছে।

'বাইর হইয়া যাও কইতাছি। বাইর হও আমার বাড়ি থাইকা।'

মোর্শেদ বাসন্তীকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। বাসন্তী হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। চোখ গরম করে মোর্শেদের দিকে তাকান। বললেন, 'এইটা আমারও ছংছার। আমি যাব না।'

'বাসন্তী ভালাই ভালাই কইতাছি, যাও এন থাইকা। নইলে তোমার লাশ ফালায়া দিয়াম

আমি।'

বাসন্তী কিছু কঠিন কথা শোনাতে গিয়েও শুনালেন না। হেমলতা উঠোনে নেমে আসেন, 'যখন বিয়ে করেছো তখন হুঁশ ছিল না। এখন সংসার দিতে আপত্তি?'

'তুমি জানো না লতা, এই মহিলা কত্তডা খারাপ। এই মহিলা লোভী। লোভখোরের বাচ্চা। মাদারির বাচ্চা।'

'কী সব বলছো? মুখ সামলাও।'

মোর্শেদের কপালের রগ দপদপ করছে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে। বাসন্তীকে পিটাতে হাত নিশপিশ করছে। তবুও হেমলতার কথায় তিনি থামেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন বাসন্তীর দিকে। হেমলতা বললেন, 'আপনি ঘরে যান। এই ঘর আপনারও। উনার কথা মনে নিবেন না।'

'আমার ঘরে এই মহিলায় ঢুকলে খারাপি হইয়া যাইবো।'

হেমলতা মোর্শেদের চোখের দিকে তাকান। ইশারায় কিছু একটা বলেন। এরপর বাসন্তীকে বললেন, 'আপনি যান। সদর ঘরের ভেতরের দরজার বাম দিকে যে ঘরটা সেখানেই যান। দেখিয়ে দিতে হবে?'

বাসন্তী কিছু না বলে গটগট আওয়াজ তুলে বারান্দা পেরিয়ে সদর ঘরে ঢুকেন। হাত-পা কাঁপছে তার। হেমলতার ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও অস্বাভাবিক ঠেকছে। সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে ফেরার জন্য জ্বরে বিছানায় পড়েন। গত কয়দিন জ্বরে এতোই নেতিয়ে গিয়েছিলেন যে,উঠার শক্তিও ছিল না। শরীরটা একটু চাঙ্গা হতেই আবার আসেন। এতো সহজে সব পেয়ে যাবেন জানলে, জ্বর নিয়েই চলে আসতেন। মোর্শেদ অসহায় চোখে তাকালেন হেমলতার দিকে। বললেন, 'কেন এমনডা করলা? আমি এর সাথে থাকতে পারবাম না।'

'ঠান্ডা হও তুমি। তুমি কিছুই জানো না, যেদিন আমরা ঢাকা থেকে ফিরি সেদিন উনি এসেছিলেন। লোকজন নিয়ে এসেছিলেন। এরপরই আমার মেয়েদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। পরিস্থিতি হাতের নাগালে চলে যাওয়াতে উনি সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বেয়াই সব বললেন। বেয়াইয়ের কাছে কামরুল মিয়া অভিযোগ করেন। বেয়াই কামরুল ভাইকে বলেন, ব্যাপারটা এখন ছড়াছড়ি না করতে। এতে উনার সম্মান নষ্ট হবে। যে বাড়িতে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন সেই বাড়ির কর্তার প্রথম বউ আছে,বউ আবার একজন পরনারীর মেয়ে। অধিকার নিতে লোকজন নিয়ে বৈঠক বসাবে এসব সত্যিই অসম্মানজনক। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন, ব্যাপারটা যেন নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেই। আর বাসন্তী আপার তো দোষ নেই। সবচেয়ে বড় কথা,আমার সংসারের হাল ধরার জন্য একজন দরকার। খুব দরকার।'হেমলতার শেষ কথাগুলো করুণ শুনাল। মোর্শেদ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। বাসন্তী এতো কিছু করেছে ভাবতে পারছেন না। মোর্শেদ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, 'তারে আমি মানতে পারতাছি না। বুঝায়া শুনায়া বাইর কইরা দেও।'

'তুমি আমার কথাগুলো শুনো, থাকতে দাও উনাকে। ক্ষমা করে দাও। আমি জানি না সে কী করেছে। যাই করুক, ক্ষমা করে দাও।'

মোর্শেদের মাথায় খুন চেপেছে। তিনি কী করবেন, কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্রোধে-আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বাড়ির পিছনে চলে যান। নৌকা নিয়ে বের হবেন। রাতে বোধহয় ফিরবেন না আজ। আযান পড়ছে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসেন বারান্দায়। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বুক মুচড়ে একটা কান্না ছিটকে এলো গলায়,সেইসঙ্গে চোখ ছাপিয়ে জল। কোন নারী সতিন মানতে পারে? বাধ্য হয়ে মানতে হচ্ছে। ভাগ্য বাধ্য করছে। নয়তো তিনি এতো উদার নন। কখনোই অন্যকে নিজের সংসারের ভাগ দিতেন না। সেই প্রথম থেকে মনে পুষে রেখেছেন, কখনো মোর্শেদের স্ত্রী এই সংসার চাইলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবেন। যার জন্য তিনি একাকীত্বে ধুঁকেছেন,যার জন্য মোর্শেদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন,যার জন্য মোর্শেদের মার খেয়েছেন তাকে কখনোই এতো সহজে সুখ দিতেন না। কখনোই না। হেমলতার শরীরে

কাঁটা ফুটছে। তিনি কোনমতে কান্নাটাকে গিলতে চাইলেন। বাসন্তীর গলা কানে এলো, 'আপনি কাঁদতাছেন?'

হেমলতা চমকে তাকান। লজ্জায় চোখের জল মুছার সাহস পাননি। চোখে জল নিয়েই হাসলেন। বাসন্তী হতবাক! কী অসাধারণ নারী! কত অদ্ভুত সে। বাসন্তী প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলেন, 'ছেলেমেয়েরা কই?'

'বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে আছে। আজই ফের যাত্রা শেষ করে শ্বশুর বাড়ি গেল। মেজো, আর ছোটটা তাদের নানাবাড়ি গেছে। বড়টার জন্য কান্নাকাটি করছিল তাই আম্মা নিয়ে গেছে।'

'ঘরে একটা ছোটু ছেড়া ঘুমাচ্ছে। কে ছে?'

'প্রান্ত। আমারই ছেলে।'

'হুনছিলাম তিন মেয়ে হুধু।'

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আপনি কলপাড়ে যান। কাপড় পাল্টে নেন। আমি খাবার বাড়ছি।'

পদ্মজা মুখ ভার করে বসে আছে। রাতের খাবারের সময় ফরিনা বেগম খুব কথা শুনিয়েছেন। কঠিন স্বরে বলেছেন, 'বাপের বাড়ির আহ্লাদ মিটায়া আইছোনি তে? আর কোনোদিন যাইতে কইবা না। এইডাই তোমার বাপের বাড়ি,স্বামীর বাড়ি। আর তোমার ভাই বইনদের কইবা সবসময় আনাগোনা না করতে। বাড়ির কাছে বইলা সবসময় আইতে হইবো এইডা কথা না। চোক্ষে লাগে।'

পদ্মজা বুঝতে পারছে না, তার ভাই বোন তো শুধু বৌভাতের দিন এসেছে। দাওয়াতের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে। এজন্য এভাবে কেন বলতে হবে। কান্না পাচ্ছে খুব। আম্মার কথা মনে পড়ছে। পূর্ণা কী করছে? আসতে তো নিষেধ দিয়ে দিল। তাহলে কীভাবে দেখা হবে? আমির ঘরে ঢুকতেই পদ্মজা দ্রুত চোখের জল মুছল। পদ্মজার ফ্যাকাসে মুখ দেখে আমির প্রশ্ন করল, 'আম্মা কিছু বলছে?'

'না,না।'

'তাহলে কাঁদছো কেন?'

'আম্মার কথা মনে পড়ছে।'

'যেতে চাও? চলো।'

'ওমা কী কথা! এতো রাতে। আর দুপুরেই না আসলাম।'

'তাহলে মন খারাপ করো না। আমরা আবার যাব। কয়দিনের মধ্যে।'

বাইরে অনেক হাওয়া বইছে। পদ্মজা জানালা লাগাতে গেল। তখন একটা চিৎকার শুনতে পেল। আমির তা লক্ষ করে বলল, 'বড় ভাবির চিৎকার। রুম্পা ভাবি। পাগলের মতো আচরণ তার। পাগলই বলে সবাই।'

পদ্মজা কৌতূহল নিয়ে আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল, 'আপনার মনে হয় কেউ ভয় পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে?'

'অসম্ভবের কী আছে?'

'আমার কাছে খটকা লাগছে। উনার সাথে অন্য কিছু হয়েছে?'

'আমিতো এতটুকুই জানি।'আমির চিন্তিত হয়ে বলল।

পদ্মজা বলল, 'আপনি উনার সাথে দেখা করাবেন আমার?'

'আঘাত করবে তোমাকে।'

'বাঁধাই তো থাকে। অনুরোধ করছি।'

পদ্মজাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করতে দেখে আমির সায় দিল, 'আচ্ছা ভোরে নিয়ে যাব। তখন সবাই ঘুমে থাকে।'

‘জানেন, আপনাদের এই বাড়িটা রহস্যজনক। কোনো গোলমাল আছে।’

‘সত্যি নাকি? আমার তেমন কিছু মনে হয় না।’

‘আপনি কয়দিনের জন্য আসেন গ্রামে। আর এসব সবাই বুঝে না।’

‘ওরে আমার বুঝদার। তবে জিন আছে শুনেছি। আমার এক ফুফু বাড়ির পিছনের পুকুরে ডুবে মরেছিলেন।’আর চাচীরে মাঝে মাঝেই জিনে ধরে।’

‘সেকী!’

‘তবে আমি বিশ্বাস করি না এসব। তুমি বিশ্বাস করো?’

‘না। আচ্ছা…’

পদ্মজা কথা শেষ করতে পারল না। আমির পদ্মজাকে টেনে বিছানায় নিয়ে আসে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলল, ’আর কথা না। ঘুমাও।’

‘আমি ভর্তা হয়ে যাচ্ছি।’

‘এইযে আস্তে ধরলাম।’

‘শুনুন না?’

‘কী?’

‘আমি পড়তে চাই।’

‘পড়বে।’

‘আম্মাকে অসন্তুষ্ট রেখে জোর করে পড়তে মন মানবে না।’

‘আম্মাকে রাজি করাবো।’

পদ্মজা খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। সে ও আমিরকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল।

পর্ব ৩৩

ফজরের আযান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই পদ্মজা চোখ খুলে। বিছানা থেকে নামার জন্য উঠার চেষ্টা করল,পারল না। আমির দুই হাতে জাপটে ধরে রেখেছে। পদ্মজা আমিরকে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'এইযে, শুনছেন?'

আমির সাড়া দিল না। আবার ডাকল পদ্মজা। আমির ঘুমের ঘোরে কিছু একটা বিড়বিড় করে আবার ঘুমে তলিয়ে যায়। এবার পদ্মজা উঁচু স্বরে ডাকল, 'আরে উঠুন না। ফজরের নামায পড়বেন। এই যে...'

আমির পিটপিট করে তাকায়। দুই হাতের বাঁধন আগলা করে দেয়। পদ্মজা আমিরকে ঠেলে দ্রুত উঠে বসে। বিছানা থেকে নামতে নামতে বলে, 'অজু করতে আসুন। আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন আজ থেকে নামায পড়বেন।'

পদ্মজা কলপাড় থেকে অজু করে আসে। এসে দেখে আমির বালিশ জড়িয়ে ধরে আয়েশ করে ঘুমাচ্ছে। মৃদু হেসে কপাল চাপড়াল পদ্মজা। এরপর আমিরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমিরের চুলে বিলি কেটে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, 'উঠুন না। নামায পড়ে আবার ঘুমাবেন। মসজিদে যেতে হবে না। আমার সাথেই পড়ুন। এই যে, শুনছেন? এইযে, বাবু..."

পদ্মজা দ্রুত জিভ কাটল। মুখ ফসকে আমিরের ডাক নাম ধরে সে ডেকেছে। পদ্মজা সাবধানে পরখ করে দেখল,আমির শুনলো নাকি। না শুনেনি। পদ্মজা মনে মনে বলল, 'উফ! বাঁচা গেল।'

আরো এক দফা ডাকার পর আমির উঠে বসে। কাঁদোকাঁদো হয়ে বার বার অনুরোধ করে, 'কাল থেকে পড়ব। আজ ঘুমাতে দাও।'

পদ্মজা শুনলো না। তার অনুনয়ের কাছে আমির হেরে গেল। বউ যদি সুন্দরী হয় তার অনুরোধ কী ফেলা যায়? আমির কলপাড় থেকে অজু করে আসে। দুজন পাশাপাশি দুই জায়নামাযে নামায সম্পন্ন করে।

নামায শেষ হতেই পদ্মজা বলল, 'এবার চলুন।'

আমির টুপি বিছানার উপর রেখে জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'এমনভাবে বলছেন, যেন জানেন না।'একটু অভিনয় করেই বলল পদ্মজা।

আমিরের সত্যি কিছু মনে পড়ছে না। এখনো চোখে ঘুম ঘুম ভাব বলেই হয়তো। সে মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়তেই বলল, 'ওহ! দাঁড়াও। চাবি নিয়ে আসছি।'

আমির বেরিয়ে গেল। পদ্মজা অপেক্ষা করতে থাকল। জানালার পাশে দাঁড়াতেই ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে সর্বাঙ্গ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বাইরে সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। পদ্মজা চমৎকার চাহনিতে দেখছে বাড়ির পিছনের জঙ্গল। কী সুন্দর সবকিছু! এতো এতো গাছ। অযত্নে গড়ে উঠা বন-জঙ্গল যেন একটু বেশি আকর্ষণীয় হয়।

প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে আচমকা চোখে পড়ল রানিকে। রানির পরনে আকাশি রঙের সালোয়ার-কামিজ। সে জঙ্গলের ভেতরে যাচ্ছে। চোর চুরি করার সময় যেভাবে চারপাশ দেখে রানিও ঠিক সেভাবেই চারপাশ দেখে দেখে এগোচ্ছে। পদ্মজা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুরো দৃশ্যটা দেখল। রানি গভীর জঙ্গলের আড়ালে চলে যায়। তখনি আমির আসে, 'পদ্মবতী?'

আমিরের ডাকে পদ্মজা মৃদু কেঁপে উঠল। আমির কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কিছু কী হয়েছে?'

'না, কী হবে। চলুন আমরা যাই।'

পদ্মজা যে কোনো কথা এড়িয়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারল আমির। তবে প্রশ্ন করল না। পদ্মজা আমিরকে রানির কথা বলতে গিয়েও পারল না। সে ভাবছে, 'আগে রানি আপাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এখনি বলা ঠিক হবে না। উনি কী ভাবেন আবার।'

রুম্পার ঘরের দরজা খুলতেই ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হয়। পদ্মজা ঘরে ঢুকে আগে জানালা খুলে দেয়। তারপর পালঙ্কের দিকে তাকাল। পালঙ্ক শূন্য। পদ্মজা আমিরের দিকে জিজ্ঞাসু হয়ে তাকায়। আমির ইশারা করে পালঙ্কের নিচে দেখতে। পদ্মজা ঝুঁকে পালঙ্কের নিচে তাকাল। কেউ একজন শুয়ে আছে। চুল দিয়ে মুখ ঢাকা। হাতে পায়ে বেড়ি বাঁধা।

আমির পদ্মজার পাশে বসে বলল, 'উনিই রুম্পা ভাবি।'

'উনাকে ডাকবেন একটু?'

'রেগে যায় যদি?'

'তবুও ডাকুন না।'

আমির লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে ডাকল, 'ভাবি? ভাবি? শুনছেন ভাবি?"

রুম্পা নড়েচড়ে চোখ তুলে তাকায়। দুই হাত দূরে একটা ছেলে ও মেয়ে বসে আছে। তাদের মুখ স্পষ্ট নয়। আলো ভালো করে ঘরে ঢুকেনি। রুম্পা শান্ত চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার হাতে ধরে বেরিয়ে আসুন।'

রুম্পা বাঁধা দুই হাতে পদ্মজার হাত ধরার চেষ্টা করে,পারল না। পদ্মজা আরেকটু এগিয়ে যায়। রুম্পার দুই হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। রুম্পা কাছে আসতেই দুর্গন্ধে পদ্মজার বমি চলে আসে। গলা অবধি এসে বমি আটকে গেছে। না জানি কতদিন গোসল করেনি রুম্পা! দাঁত মাজেনি। এই বাড়ির কেউ কী একটু পরিষ্কার করে রাখতে পারে না রুম্পাকে? পস্রাবের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘরেই পস্রাব-পায়খানা করে।

রুম্পা মলিন মুখে চেয়ে থাকে পদ্মজার দিকে। শান্ত,স্থির দৃষ্টি। আমির গর্ব করে রুম্পাকে বলল, 'আমার বউ। বলছিলাম না, সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা আমার বউ হবে। দেখিয়ে দিলাম তো?'

রুম্পা হাসে। ময়লাটে মলিন মুখের হাসি বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাসি। অনেকদিন গোসল না করার কারণে চেহারা, হাত,পা ময়লাটে হয়ে গেছে। নখগুলো বড় বড়। নখের ভেতর ময়লার স্তূপ যেন। ঠোঁট ফেটে চৌচির। টলমল করা চোখ। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি চোখ দিয়ে বর্ষণ বইবে। রুম্পা পদ্মজাকে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এ তো ম্যালা সুন্দর ছেড়ি। তোমার নাম কিতা?'

পদ্মজা খুশিতে জবাব দিল, 'উম্মে পদ্মজা।'

'ছুডু ভাই, এতো সুন্দর ছেড়ি কই পাইলেন? এ...এ যে চান্দের লাকান মুখ।'

রুম্পার আরো কাছে এসে বসল পদ্মজা। দুর্গন্ধটা আর নাকে লাগছে না। মানুষটাকে তার বেশ লাগছে। রুম্পার চুল লম্বা। মাটিতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি চুল লুটিয়ে আছে। কুচকুচে কালো চুল। অনেকদিন চুল না ধোয়ার কারণে চুলগুলো জট লেগে আছে কিন্তু সৌন্দর্য এখনো রয়ে গেছে। যখন সুস্থ ছিল নিশ্চয় অনেক বেশি সুন্দর চুলের অধিকারিণী ছিল।

পদ্মজা বলল, 'আমি আপনাকে তুমি বলি?'

রুম্পা দাঁত বের করে হেসে মাথা নাড়াল। পদ্মজা হেসে বলল, 'কিছু বলবেন?'

রুম্পা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে পদ্মজার দিকে। কোনো জবাব দেয় না। সেকেন্ড কয়েক পর রুম্পার চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। হাসি মিলিয়ে মুখ মলিন হয়ে আসে। পদ্মজা অবাক হয়ে রুম্পার পরিবর্তন দেখে। আকস্মিক পদ্মজাকে আক্রমণ করে বসল রুম্পা। খামচে ধরে পদ্মজার পা। আমির লাফিয়ে উঠে। রুম্পার হাত থেকে পদ্মজাকে ছুটাতে চেষ্টা করে। রুম্পা পা ছেড়ে পদ্মজার শাড়ি কামড়ে ধরে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকে। আমির ধমকে বলে, 'ভাবি ছাড়ো বলছি। পদ্মজা তোমার ক্ষতি করতে আসেনি। ভাবি ছাড়ো।'

পদ্মজা স্তব্ধ হয়ে দেখছে। তার চোখেমুখে কোনো ভয়ভীতি নেই। কী যেন খুঁজছে রুম্পার মধ্যে। খুঁজে কূলকিনারা পাচ্ছে না। রুম্পা শাড়ি ছেড়ে দিতেই পদ্মজা একটু পিছিয়ে যায়। দরজায় চোখ পড়ে। দেখতে পায়, কেউ একজন সরে গিয়েছে। কী আশ্চর্য! হুট করেই পদ্মজার বুক কাঁপতে থাকে। নূরজাহান নিজ ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। এসেই

বলেন, 'তালা খুলছে কেডায়? বাবু, নতুন বউরে নিয়া এইহানে আইছোস কেন?'

আমির দ্রুত রুম্পার কাছ থেকে সরে আসে। নূরজাহানকে কৈফিয়ত দেয়, 'ভাবলাম, বাড়ির সবাইকে পদ্মজা দেখেছে। রুম্পা ভাবিকেও দেখুক। ভাবতে পারিনি ভাবি এমন কাজ করবে। ভাবি তো এখন আরো বেশি বিগড়ে গেছে দাদু।'

'তুই আমারে কইয়া আইবি না? তোর চিল্লানি হুইননা আমার কইলজাডা উইড়া গেছিলো। বউ তোমারে দুঃখ দিছে এই ছেড়ি?'

পদ্মজা বলল, 'না,না। কিছু করেনি আমার।'

আমির চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বলছো? কিছু করেনি মানে? হাত দেখি?'

আমির পদ্মজার দুই হাত টেনে নিয়ে দেখে। বাম হাতে নখের জখম। আমির ব্যথিত স্বরে বলল, 'ইশ! কতোটা আঘাত পেয়েছো। ঘরে চলো। দাদু এই নাও চাবি। তালা মেরে দিও।'

আমির পদ্মজাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বেরোবার আগ মুহূর্তে পদ্মজা রুম্পার দিকে তাকাল। দেখতে পেল, রুম্পা আড়চোখে তাকে দেখছে। সে চোখে স্নেহমমতা! একটু হাসিও লেগে ছিল। পদ্মজার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল।

ঘরে এসে আমিরকে বলল, 'উনার যত্ন কেউ নেয় না কেন?'

'দেখোনি কী রকম করল? এই ভয়েই কেউ যায় না। শুরুতে তোমাকে দেখে যদি রেগে যেতো তখনি তোমাকে নিয়ে চলে আসতাম। সবাইকে ভাবি তুই করে বলে। তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতে দেখে ভাবলাম, বোধহয় তোমাকে পছন্দ হয়েছে। তাই আঘাতও করবে না। কিন্তু ধারণা ভুল হলো।'

'আপনি অকারণে চাপ নিচ্ছেন। নখের দাগ বসেছে শুধু।'

'রক্ত চলে এসেছে।'

'এইটুকু ব্যাপার না।'

আমির তুলা দিয়ে পদ্মজার হাতের রক্ত মুছে দিল। তারপর বলল, 'আর ওইদিকে পা দিবে না।'

'আম্মার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।'

'লাবণ্যকে ঘুম থেকে তুলছে। লাবণ্য ফজরে উঠতেই চায় না।'আমির হেসে বলল।

'আমি যাই।'

'কোথায়?'

'আম্মা, সকাল সকাল রান্নাঘরে যেতে বলেছিলেন।'

'তুমি রান্না করবে কেন?'

'অনুরোধ এমন করবেন না, আমি আমার বাড়িতেও রান্না করেছি। টুকটাক কাজ করেছি। এখন না গেলে, আম্মা রেগে যাবেন। রাগানো ঠিক হবে না।'

'এসব ভালো লাগে না পদ্মজা।'

'আমি আসছি।'

পদ্মজা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। আমিরকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে।

পর্ব ৩৪

বাইরে বিকেলের সোনালি রোদ, মন মাতানো বাতাস। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে নূরজাহানের ঘরের দিকে যাচ্ছে পদ্মজা। বাতাসের দমকায় সামনের কিছু চুল অবাধ্য হয়ে উড়ছে। এতে সে খুব বিরক্ত বোধ করছে। এক হাতে দই অন্য হাতে পিঠা। চুল সরাতেও পারছে না। তখন কোথেকে উড়ে আসে আমির। এক আঙুলে উড়ন্ত চুলগুলো পদ্মজার কানে গুঁজে দিয়ে আবার উড়ে চলে যায়। পদ্মজা চমৎকার করে হাসে। আমিরের যাওয়া দেখে,মনে মনে বলল, 'চমৎকার মানুষ।'

নূরজাহানের ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা ভিজানো। পদ্মজা অনুমতি না নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। তার চক্ষু চড়কগাছ। পালঙ্কে ভুরি ভুরি সোনার অলংকার। জ্বলজ্বল করছে। চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। পদ্মজাকে দেখে নূরজাহান অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

তা পদ্মজার চোখে পড়েছে। নূরজাহান ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলেন, 'তুমি এই নে কেরে আইছো? আমি কইছি আইতে?'

নূরজাহানের ধমকে থতমত খেয়ে গেল পদ্মজা। দইয়ের মগ ও পিঠার থালা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'আম্মা বললেন দই,পিঠা দিয়ে যেতে।'

'তোমার হউরি কইলেই হইবো? আমি কইছি? আমারে না কইয়া আমার ঘরে আওন মানা হেইডা তোমার হউরি জানে না?'

'মাফ করবেন।'মাথা নত করে বলল পদ্মজা।

'যাও। বাড়াইয়া যাও।'

পদ্মজা বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ায়। ছোট কারণে এতো ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া কেন দেখালেন তিনি? পদ্মজার মাথায় ঢুকছে না। পদ্মজা আনমনে হেঁটে নিজের ঘরে চলে আসে। সে ভাবছে। এই বাড়িতে আসার পর থেকে কী কী হয়েছে সব ভাবছে। প্রথম রাতে কেউ একজন তার ঘরে এসেছিল। নোংরা স্পর্শ করেছে। সেটা যে আমির নয় সে শত ভাগ নিশ্চিত। এরপর ভোরে রানিকে দেখল চোরের মতো বাড়ির পিছনের জঙ্গলে ঢুকতে। তারপর রুম্পা ভাবির সাথে দেখা হয়। তিনি শুরুতে স্বাভাবিক ছিলেন। শেষে গিয়ে পাগলামি শুরু করেন। দরজার ওপাশে কেউ ছিল। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে মুখে'চ'কারান্ত শব্দ করল। সব ঝাপসা।

ফরিনা বলেছিলেন, দই,পিঠা দিয়েই রান্নাঘরে যেতে। পদ্মজা বেমালুম সে কথা ভুলে গিয়েছে। যখন মনে পড়ল অনেক সময় কেটে গিয়েছে। সে দ্রুত আঁচল টেনে মাথা ঘুরে ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে। এসে দেখে ফরিনা এবং আমিনা মাছ কাটছেন। পদ্মজা পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকে। ভয়ে বুক কাঁপছে। কখন না কঠিন কথা শোনানো শুরু করে দেন।

'অহন আওনের সময় হইছে তোমার? আছিলা কই?'বললেন ফরিনা।

'ঘরে।'নতজানু হয়ে বলল পদ্মজা।

'আমির তো বাইরে বাড়াইয়া গেছে অনেকক্ষণ হইলো। তুমি ঘরে কি করতাছিলা? স্বামী বাড়িত থাকলে ঘরে থাহন লাগে। নাইলে বউদের শোভা পায় খালি রান্ধাঘরে।'

চুলার চেয়ে কিছুটা দূরত্বে কয়েকটা বেগুন রাখা। এখানে আসার পর থেকে সে দেখছে প্রতিদিন বেগুন ভাজা করা হয়। পদ্মজা দা নিয়ে বসে বেগুন হাতে নিল। ফরিনা বলেন, 'বেগুন লইছো কেরে?'

'আজ ভাজবেন না?'

'জাফর আর হের বউ তো গেলোই গা। এহন কার লাইগা করাম? আর কেউ খায় না বেগুন।'

পদ্মজা বেগুন রেখে দিল। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, 'কী করব?'

ফরিনা চোখমুখ কুঁচকে মাছ কাটছেন। যেন পদ্মজার উপস্থিতি তিনি নিতে পারছেন না।

পদ্মজার প্রশ্নের জবাব অনেকক্ষণ পর কাঠ কাঠ গলায় দিলেন, 'ঘরে গিয়া বইয়া থাহো।'

পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। ঢোক গিলে বলল, 'আর হবে না।'

'তোমারে কইছে না এইহান থাইকা যাইতে? যাও না কেরে? যতদিন আমরা আছি তোমরা বউরা রান্ধাঘরের দায়িত্ব লইতে আইবা না।" আমিনার কণ্ঠে বিদ্রুপ।

পদ্মজা আমিনার কথায় অবাক হয়ে গেল। সে কখন দায়িত্ব নিতে এলো? ফরিনা আমিনার কথা শুনে চোখ গরম করে তাকালেন। বললেন, 'আমার ছেড়ার বউরে আমি মারব,কাটব,বকব। তোমরা কোনোদিন হের লগে উঁচু গলায় কথা কইবা না। বউ তুমি ঘরে যাও।'

পদ্মজার সামনে এভাবে অপমানিত হয়ে আমিনা স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি সেই শুরু থেকে ফরিনাকে ভয় পান। তাই আর টুঁ শব্দ করলেন না। পদ্মজা ফরিনার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। কী যেন দেখতে পেল। মনে হচ্ছে এই মানুষটারও দুই রূপ আছে। এই বাড়ির প্রায় সবাইকে তার মুখোশধারী মনে হচ্ছে। কেউ ভালো কিন্তু খারাপের অভিনয় করে। আর কেউ আসলে শয়তান কিন্তু ভালোর অভিনয় করে। কিন্তু কেন? কীসের এতো ছলনা!

'খাড়াইয়া আছো কেন? যাও ঘরে যাও।'

'গিয়ে কী করব? কোনো সাহায্য লাগলে বলুন না আম্মা।'

'তোমারে যাইতে কইছি। যাও তুমি।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। ধীর পায়ে জায়গা ত্যাগ করল। এদিক-ওদিক হেঁটে ভাবতে থাকে,কার ঘরে যাবে। লাবণ্যের কথা মনে হতেই লাবণ্যের ঘরের দিকে এগোল সে। লাবণ্য বিকেলে টিভি দেখে। নিশ্চয়ই এখন টিভি দেখছে। লাবণ্যের ঘরে ঢুকেই লিখন শাহর কণ্ঠ শুনতে পেল পদ্মজা। টিভির দিকে তাকাল। দেখল,ছায়াছবি চলছে। লিখন শাহর ছায়াছবি। পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায় চলে যেতে। লাবণ্য ডাকল, 'ওই ছেমড়ি যাস কই? এইদিকে আয়।'

পদ্মজা ঘরে ঢুকে, লাবণ্যর পাশে পালঙ্কে বসল। লাবণ্য দুই হাতে পদ্মজার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'সারাদিন দাভাইয়ের সাথে থাকস কেন? আমার ঘরে একবার উঁকি দিতে পারস না?'

'তোর দাভাই আমাকে না ছাড়লে আমি কী করব?'

'ঘুষি মেরে সরাইয়া দিবি।'

'হ্যাঁ, এরপর আমাকে তুলে আছাড় মারবে।'

'দাভাইকে ডরাস?'

'একটুও না।'

'সত্যি?'

'মিথ্যে বলব কেন?'

'একদিন রাগ দেখলে এরপর ঠিকই ডরাইবি।'

'আমি রাগতেই দেব না।'

লাবণ্য হাসে। এরপর টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, 'লিখন শাহর মতো মানুষরে ফিরাইয়া দেওনের সাহস খালি তোরই আছে। আমার জীবনেও হইতো না।'

পদ্মজা কিছু বলল না। লাবণ্যই বলে যাচ্ছে, 'এই ছবিটা আমি এহন নিয়া ছয়বার দেখছি। লিখন শাহ তার নায়িকারে অনেক পছন্দ করে। কিন্তু নায়িকা পছন্দ করে অন্য জনরে। অন্য জনরে বিয়া করে। বিয়ার অনেক বছর পর লিখন শাহর প্রেমে পড়ে নায়িকা। ততদিনে দেরি হয়ে যায়। লিখন শাহ মরে যায়। এই হইলো কাহিনি। আইচ্ছা পদ্মজা, যদি এমন তোর সাথেও হয়?'

পদ্মজা আঁতকে উঠে বলল, 'যাহ কী বলছিস! বিয়ের আগে ভাবতাম যার সাথে বিয়ে হবে তাকেই মানব। কিন্তু এখন আমার তোর ভাইকেই দরকার।'

'ওরেএ! লাইলি হয়ে যাইতাছস। যাহ,আমিও মজা করছি। আমি কেন চাইব আমার

ভাইয়ের বউ অন্যজনরে পছন্দ করুক। লিখন শাহ আমার। শয়নে স্বপনে তার লগে আমি সংসার পাতি।'

পদ্মজা হাসল। লাবণ্যর পিঠ চাপড়ে বলল, 'আব্বারে বল,লিখন শাহকে ধরে এনে তোর গলায় ঝুলিয়ে দিবে।'

'বিয়া এমনেও দিয়া দিব। কয়দিন পর মেট্রিকের ফল দিব। আমি তো ফেইল করামই। দেহিস।'

'কিছু হবে না। পাশ করবি। রানি আপা কই?'

'কী জানি কই বইয়া রইছে। চুপ থাক এহন। টিভি দেখ। দেখ, কেমনে কানতাছে লিখন শাহ। এই জায়গাটা আমি যতবার দেহি আমার কাঁনদন আইসা পরে।'বলতে বলতে লাবণ্য কেঁদে দিল। ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল।

পদ্মজা টিভির দিকে মনোযোগ সহকারে তাকাল। দৃশ্যে চলছে, লিখন শাহ ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। ঘোলা চোখ দুটি আরো ঘোলা হয়ে উঠেছে। ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করছে। তার মা,বোন,ছোট ভাই ভয়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। এক টুকরো কাচ ঢুকে পড়ে লিখন শাহর পায়ে। আর্তনাদ করে ফ্লোরে বসে পড়ে। তার মা দৌড়ে আসে। পাগলামি থামাতে বলে। লিখন শাহ আর্তনাদ করে শুধু বলছে, 'তুলির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আম্মা। আমি কী নিয়ে বাঁচব। কেন তুলি আমাকে ভালোবাসলো না। আমি তো সত্যি ভালোবেসে ছিলাম।'

পদ্মজা বাকিটা শুনল না। মনোযোগ সরিয়ে নিল। তার কানে বাজছে, 'পদ্মজার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আম্মা। আমি কী নিয়ে বাঁচব? কেন পদ্মজা আমাকে ভালোবাসলো না। আমি তো সত্যি ভালোবেসেছিলাম।'

পদ্মজার চোখের কার্নিশে অশ্রু জমে। সে অশ্রু আড়াল করে লাবণ্যকে বলল, 'তুই দেখ। আমি যাই।'

লাবণ্যের কানে পদ্মজার কথা ঢুকল না। সে টিভি দেখছে আর ঠোঁট ভেঙে কাঁদছে। পদ্মজা আর কিছু বলল না। উঠে দাঁড়ায় চলে যেতে। দরজার সামনে আমিরকে দেখতে পেল। তার বুক ধক করে উঠল। পরে মনে হলো, সে তো কোনো অপরাধ করেনি। তাহলে এতো আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। আমির কাগজে মোড়ানো কিছু একটা এগিয়ে দিল। বলল, 'ঘরেও পেলাম না। রান্নাঘরেও না। তাই মনে হলো লাবণ্যর ঘরেই আছো। টিভি দেখছিলে নাকি?'

পর্ব ৩৫

বাসন্তী গাঢ় করে ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছেন। প্রেমা,প্রান্ত বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছে। তারা দুজন বাসন্তীকে মেনে নিয়েছে। বাসন্তীর কথাবার্তা, চালচলন আলাদা। যা ছোট দুটি মনকে আনন্দ দেয়। আগ্রহভরে বাসন্তীর কথা শুনে তারা। লিপস্টিক লাগানো শেষ হলে বাসন্তী প্রেমাকে বলল, 'তুমি লাগাইবা?'

প্রেমা হেসে মাথা নাড়ায়। বাসন্তীর আরো কাছে ঘেঁষে বসে। বাসন্তী প্রেমার ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক গাঢ় করে ঘষে দিল। এরপর প্রান্তকে বলল, 'তুমিও লাগাইবা আব্বা?'

'জি।'বলল প্রান্ত। প্রেমাকে লিপস্টিকে সুন্দর লাগছে। তাই তারও ইচ্ছে হচ্ছে।

বাসন্তী প্রান্তর ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়ার জন্য উঁবু হোন। পূর্ণা বেশ অনেকক্ষণ ধরে এসব নাটক দেখছে। এই মহিলাকে সে একটুও সহ্য করতে পারে না। এক তো সৎ মা। বাপের আরেক বউ। তার উপর এই বয়সে এসে এতো সাজগোজ করে। প্রান্তকে লিপস্টিক দিচ্ছে দেখে তার গা পিত্তি জ্বলে উঠল। ঘর থেকে দপদপ করে পা ফেলে ছুটে আসে। প্রান্তকে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'হিজরা সাজার ইচ্ছে হচ্ছে কেন তোর? কতবার বলছি এই বজ্জাত মহিলার সাথে না ঘেঁষতে?'

বাসন্তী ভয় পান পূর্ণাকে। মেয়েটা খিটখিটে, বদমেজাজি। হেমলতা বলেছেন, সেদিনের দূর্ঘটনার পর থেকে পূর্ণা এমন হয়ে গেছে। হুটহাট রেগে যায়। কথা শুনে না। পদ্মজা যাওয়ার পর থেকে আরো বিগড়ে গেছে। এজন্য যথাসম্ভব পূর্ণাকে এড়িয়ে চলেন। তবুও এসে আক্রমণ করে বসে। গত দুই সপ্তাহে মেয়েটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে জীবন। তিনি কাটা কাটা গলায় পূর্ণাকে বললেন, 'এই ছিক্ষা পাইছো তুমি? গুরুজনদের সাথে এমনে কথা কও।'

'আপনি চুপ থাকেন। খারাপ মহিলা। বুড়া হয়ে গেছে এখনও রঙ-ঢঙ করে।'

পূর্ণার কথা মাটিতে পড়ার আগে তীব্র থাপ্পড়ে সে মাটিতে উল্টে পড়ল। চোখের দৃষ্টি গরম করে ফিরে তাকায় সে, দেখার জন্য, কে মেরেছে তাকে! দেখল হেমলতাকে। হেমলতা অগ্নি চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন চোখের দৃষ্টি দিয়ে পূর্ণাকে পুড়িয়ে ফেলবেন। পূর্ণার চোখ শিথিল হয়ে আসে। সে চোখ সরিয়ে নেয়। হেমলতা বললেন, "নিজেকে সংশোধন কর। এখনও সময় আছে।'

পূর্ণা নতজানু অবস্থায় বলল, 'আমি এই মহিলাকে সহ্য করতে পারি না আম্মা।'

'করতে হবে। উনার অধিকার আছে এই বাড়িতে।'

'আমি খুন করব এই মহিলাকে।'পূর্ণার রাগে শরীর কাঁপছে।

পূর্ণার অবস্থা দেখে হেমলতার দৃষ্টি গেল থমকে। পূর্ণা কেন এমন হলো? তিনি কী এক মেয়ের শূন্যতার শোক কাটাতে গিয়ে আরেক মেয়েকে সময় দিচ্ছেন না। বুঝিয়ে, শুনিয়ে পূর্ণাকে আবার আগের মতো করতে হবে। তিনি কণ্ঠ খাদে নামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এরপর পূর্ণা যা বলল তিনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। পূর্ণা বাসন্তীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বেশ্যার মেয়ে বেশ্যাই হয়। আর বেশ্যার সাথে এক বাড়িতে থাকতে ঘৃণা করে আমার।'

হেমলতা ছুটে যান বাইরে। বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ফিরে আসেন। বাসন্তী দ্রুত আগলে ধরেন পূর্ণাকে। হেমলতাকে অনুরোধ করেন, 'এত বড় ছেড়িডারে মাইরো না। ছোট মানুষ। বুঝে না।'

'আপা, আপনি সরেন। ও খুব বেড়ে গেছে।'

বাসন্তীর স্পর্শ পূর্ণার ভালো লাগছে না। সে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পূর্ণার পিঠে বারি মারলেন। পূর্ণা আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। হেমলতা আবার মারার জন্য প্রস্তুত হোন, বাসন্তী পূর্ণাকে আগলে বসেন। অনুরোধ করেন, 'যুবতি

ছেড়িদের এমনে মারতে নাই। আর মাইরো না।'

প্রেমা,প্রান্ত ভয়ে গুটিয়ে গেছে। হেমলতার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। তিনি বাঁশের কঞ্চি ফেলে লাহাড়ি ঘরের দিকে যান। বারান্দায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মনে মনে মোর্শেদের উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। মোর্শেদ চিৎকার করে করে বাসন্তীর সম্পর্কে সব বলেছে বলেই তো পূর্ণা জেনেছে। আর তাই এখন পূর্ণা কারো অতীত নিয়ে আঘাত করার সুযোগ পাচ্ছে। মোড়ল বাড়ির ছোট সংসারটা কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। হেমলতা আকাশের দিকে তাকিয়ে হা করে নিঃশ্বাস নেন। সব কষ্ট,যন্ত্রণা যদি উড়ে যেত। সব যদি আগের মতো হয়ে যেত। সব কঠিন মানুষেরাই কী জীবনের এক অংশে এসে এমন দূর্বল হয়ে পড়ে? কোনো দিশা খুঁজে পায় না?

আমির বিছানায় বসে উপন্যাসের বই পড়ছে। ছয়দিন পর পদ্মজার মেট্রিকের ফলাফল। এরপরই ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে। যদিও ফরিনা বেগম রাজি নন। কিন্তু আমির মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে পদ্মজাকে রাজধানীতে নিবেই। পদ্মজার কথা মনে হতেই আমির বই রেখে গোসলখানার দরজার দিকে তাকাল। তার ঘরের সাথে আগে গোসলখানা ছিল না। পদ্মজার জন্য করা হয়েছে। সে বই রেখে সেদিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। তখনি পদ্মজা চিৎকার করে উঠল। তাই দ্রুত দৌড়ে গেল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পদ্মজা শাড়ি দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছে। কিছুটা কাঁপছে। আমির দ্রুত কাছে এসে বলল, 'কী হয়েছে?'

'ওখানে, ওখানে কে ছিল। আ...আমাকে দেখছিল।'

পদ্মজার ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমির সেদিকে তাকাল। গোসলখানার ডান দেয়ালের একটা ইট সরানো। সকালে তো সরানো ছিল না! পদ্মজা কাঁদতে থাকল। কাপড় পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ে দেয়ালে। আর তখনই দুটি চোখ দেখতে পায়। সে তাকাতেই চোখ দুটি দ্রুত সরে যায়। পদ্মজার পিল চমকে উঠে। আমির পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'শুকনো কাপড় পরে আসো। কেঁদো না।'

কথা শেষ করেই সে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার তাড়া দেখে মনে হলো, অজ্ঞাত আগন্তুককে আমির চিনে। পদ্মজা দ্রুত কাপড় পরে নিল। এরপর আমিরকে খুঁজতে থাকল। আমির সোজা রিদওয়ানের ঘরের দিকে যায়। রিদওয়ান পানি পান করছিল। আমির গিয়ে রিদওয়ানের বুকের শার্ট খামচে ধরে। চিৎকার করে বলল, 'তোকে সাবধান করেছিলাম। দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছিলাম।'

'শার্ট ছাড়।'

'ছাড়ব না। কী করবি? তুই আমার বউয়ের দিকে কু-নজর দিবি আর আমি ছেড়ে দেব?'

'প্রমাণ আছে তোর কাছে?'

'কুত্তার বাচ্চা, প্রমাণ লাগবে? আমি জানি না?'

'আমির মুখ সামলা। গালাগালি করবি না।'

'করব। কী করবি তুই?'

'আবার বলছি, শার্ট ছাড়।'

আমির ঘুষি মারে রিদওয়ানের নাকে। রিদওয়ান টাল সামলাতে না পেরে পালঙ্কের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিৎকার, চেঁচামিচি শুনে বাড়ির সবাই রিদওয়ানের ঘরে ছুটে আসে।

পর্ব ৩৬

পদ্মজা ঘরের চৌকাঠে পা দিল মাত্র। আমির রিদওয়ানকে টেনে হিঁচড়ে তুলে বলল, 'তোকে না করেছিলাম। বার বার না করেছি। তবুও শুনলি না।'

রিদওয়ান শক্ত দুই হাতে আমিরকে ধাক্কা মেরে ছুঁড়ে ফেলে দূরে। আমির আলমারির সাথে ধাক্কা খেয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠে। রিদওয়ানের দিকে তেড়ে আসে। নূরজাহান দৌড়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ান। চিৎকার করে বললেন, 'কী অইছে তোদের? তোরা এমন করতাছস কেন?'

'দাদু, সরে যাও। মাদা** বাচ্চারে আমি মেরে ফেলবো।'

'তুই কী ভালা মানুষের বাচ্চা?'তেজ নিয়ে বলল রিদওয়ান।

আমির নূরজাহানকে ডিঙিয়ে রিদওয়ানকে আঘাত করতে প্রস্তুত হলো। তখন মজিদ হাওলাদারের কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে, 'যে যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

আমির মজিদ হাওলাদারকে এক নজর দেখে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করল। পরেই জ্বলে উঠে বলল, 'আব্বা,আপনি জানেন না ও কী করছে? পদ্মজা গোসল করছিল,ও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল।'আমিরের কণ্ঠ থেকে যেন অগ্নি ঝরছে।

ফরিনা,আমিনা,রানি সহ হাওলাদার বাড়িতে কাজ করা দুজন মহিলা ছিঃ ছিঃ করে উঠল। রিদওয়ান সাবধানে প্রশ্ন করল, 'তোর কাছে কী প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ লাগবে? আমি জানি এটা তুই ছিলি। বিয়ের রাতেও তুই পদ্মজার কাছে গিয়েছিলি।'

'অপবাদ দিবি না।'

'তুই ভালো করেই জানিস আমি অপবাদ দিচ্ছি না।'

'তুমি কী করে শত ভাগ নিশ্চিত হতে পারছো ছেলেটা রিদওয়ানই ছিল?পদ্মজা দেখেছে? নাকি তুমি?'বললেন মজিদ।

'আব্বা, কেউ দেখেনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত ওই চরিত্রহীনটা রিদু। কারণ, আমার আগে থেকে ও পদ্মজাকে পছন্দ করতো।'

পদ্মজা বিস্ময়ে তাকাল। কী হচ্ছে,কী সব শুনছে? ফরিনার দুই ঠোঁট হা হয়ে গেল। মুখে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। আমিনা বললেন, 'আপা,আমি আগেই কইছিলাম এই ছেড়ি বিনাশিনী। এই ছেড়ির রূপ আগুনের লাকান। এই ছেড়ির জন্যে এখন বাড়ির ছেড়াদের ভেজাল হইতাছে।'

আমির আমিনার কথা শুনেও না শোনার ভান করল। মজিদকে বলল, 'আব্বা,আপনি এর বিচার করবেন? না আমি ওরে মেরে ফেলব? আর আম্মা, এরপরও বলবা এই বাড়িতে রেখে যেতে পদ্মজাকে। আমাকে তো ফিরতেই হবে ঢাকা। পদ্মজাকে রেখে আমি কিছুতেই যাব না। মনে রেখো। আব্বা তুমিও কথাটা মনে রেখো, আমি তোমার ব্যবসায় আর নেই। যদি পদ্মজা আমার সাথে ঢাকায় না যায়।'

'তুমি যেখাবে যাবা তোমার বউতো সেখানেই যাবে। বউ রেখে যাবা কেন? আর রিদওয়ান তুমি আমার সাথে আসো। তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে।'

মজিদ হাওলাদার বেরিয়ে যান। আমির পদ্মজার হাতে ধরে পদ্মজাকে বলল, 'আর কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না।'

খুশিতে পদ্মজার চোখের তারায় অশ্রু জ্বলজ্বল করে উঠে। সে আমিরের এক হাত শক্ত করে ধরে বোঝায়, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি। বিশ্বাস করি।'

সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্ত। এমন সময় হাওলাদার বাড়ির রাতের রান্না করা হয়। মগা এক ব্যাগ মাছ দিয়ে গেছে। লতিফা মাছ কাটছে। লতিফা এই বাড়ির কাজের মেয়ে। সবাই ছোট করে লুতু ডাকে। ফরিনা ভাত বসিয়েছেন। আর অনবরত বলে চলেছেন, 'আমি এই বাড়ির

বড় বান্দি। দাসী আমি। বাবুর বাপ দাসী পুষে রাখছে। দাসী পালে। সারাদিন কাম করি। অন্যরা হাওয়া লাগাইয়া ঘুরে। মরণ হয় না আমার। মরণই আমার একমাত্র শান্তি।'

পদ্মজা গুনগুন করে গান গাচ্ছে আর রান্নাঘরের আশেপাশে ঘুরছে। ফরিনার সব কথাই তার কানে আসছে। তার গায়ে লাগছে না। বরং হাসি পাচ্ছে। সে বহুবার রান্নাঘরে গিয়েছে কাজ করার জন্য। ফরিনা তাড়িয়ে দিয়েছেন। কাজ করতে হবে না বলেছেন। আর এখন বলছেন,কেউ সাহায্য করে না। পদ্মজা পা টিপে টিপে রান্না ঘরে ঢুকল। বলল, 'আম্মা, আমি সাহায্য করি?'

'এই ছেড়ি তুমি এতো বেয়াদব কেরে? কতবার কইছি তোমার সাহায্য করতে হইব না।'

'না...মানে আপনি বলছিলেন, কেউ সাহায্য করে না।'

'তোমারে তো বলি নাই। তোমার গায়ে লাগে কেন?'

'মেঝে ঝাড়ু দিয়ে দেই?'

'তোমারে কইছি আমি? তুমি যাও এন থাইকা। যাও কইতাছি।'

পদ্মজা বেরিয়ে আসে। বাসায় লাবণ্য নেই,আমির নেই। কার কাছে যাবে? রানি আছে! রানির কথা মনে হতেই পদ্মজা রানির ঘরের দিকে এগোল। যাওয়ার পথে সন্ধ্যার আযান ভেসে আসে কানে। তাই আর সেদিকে এগুলো না। নিজের ঘরের দিকে হেঁটে গেলো। নামায পড়তে হবে।

নামায পড়ে, সূরা ইয়াসিন একবার পড়ল। এরপর জানালা লাগাতে গিয়ে রানিকে দেখতে পেল। সেদিনের মতো জঙ্গলের ভেতর ঢুকছে। আর কিছু মুহূর্ত পার হলে চারিদিক রাতের গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। এমন সময় কী করতে যাচ্ছে ওখানে? এতো সাহসই কী করে হয়? পদ্মজা হুড়মুড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়। আজ সে এর শেষ দেখে ছাড়বে। লাবণ্য সবে মাত্র সদর ঘরে ঢুকেছে। পদ্মজাকে তাড়াহুড়ো করে কোথাও যেতে দেখে বলল, 'কী রে, কই যাস?'

পদ্মজা চমকে উঠল। এরপর বলল, 'এইতো...এইখানেই। কই ছিলি? আচ্ছা, পরে কথা বলব আসি এখন।'

লাবণ্য ঠোঁট উল্টে পদ্মজার যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকে। এরপর মনে মনে ভেবে নিল, দুই তলা থেকে হয়তো দেখেছে দাভাই আসছে। তাই এগিয়ে আনতে যাচ্ছে। সে নিজ ঘরের দিকে চলে গেল। পদ্মজা কখনো বাড়ির পিছনের দিকে যায়নি। এই প্রথম যাচ্ছে। বাড়ির ডান পাশে বিশাল পুকুর। কালো জল। অথচ,বাড়ির সামনের পুকুরের জল স্বচ্ছ।

দুই মিনিট লাগে শাক-সবজির ক্ষেত পার হতে। বাড়ির পিছনে এরকম শাক-সবজির বাগান আছে সে জানতো না। এরপর পৌঁছালো জঙ্গলের সামনে। সেখান থেকে অন্দরমহলের দিকে তাকাল। ওইতো তাদের ঘরের জানালা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা জানালাও দেখা যাচ্ছে। পদ্মজা কপাল কুঁচকে খেয়াল করল, সেই জানালার গ্রিল ধরে কেউ তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ঠাওর করার চেষ্টা করল এটা কার ঘর। মনে হতে বেশি সময় লাগল না। এটা রুম্পা ভাবির ঘর। তবে কী তিনিই তাকিয়ে আছেন? পদ্মজা আবার তাকাল। রুম্পা জানালার পর্দা সরিয়ে হাত নাড়ায়। পদ্মজা মৃদু হেসে হাত নাড়াল। দূর থেকে রুম্পার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে,সে কিছু বলতে চায় পদ্মজাকে। তার ভেতর লুকানো আছে কোনো এক রহস্যময় গল্প।

'ভাবি এইনে কী করেন রাইতের বেলা?'

ভূমিকম্পে ভূমি যেভাবে কেঁপে উঠে,পদ্মজা ঠিক সেভাবেই কেঁপে উঠল। তাকিয়ে দেখল, মদনকে। সে জঙ্গলের ভেতর থেকেই এসেছে। পদ্মজা আমতাআমতা করে বলল, 'হা...হাঁটতে এসেছিলাম।'

'এই রাইতের বেলা?'

'বিকেল থেকেই। এখন ফিরে যাচ্ছিলাম।'

'চলেন এক সাথে যাই। জায়গাডা ভালা না ভাবি। আপনি হইছেন সুন্দরী মানুষ।

জ্বিন,ভূতের আছর পড়ব।’

‘আপনি যান। আমি আসছি।’

‘আর কী করবেন এইহানে?’

পদ্মজা জঙ্গলের দিকে তাকাল। অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়! সব জঙ্গল অযত্নে বেড়ে উঠলেও এই জঙ্গল যেন যত্নে বেড়ে উঠা। সে অন্ধকারে খোঁজার চেষ্টা করল রানিকে। পেল না। এদিকে মদনের সাথে না গেলে সে বাড়িতে যদি বলে দেয়। তাহলে অনেকের প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হবে। আর একটার পর একটা মিথ্যে বলতে হবে। পদ্মজা মনে মনে পরিকল্পনা করে, মদনের সাথে বাড়ি অবধি গিয়ে আবার চলে আসবে।

পর্ব ৩৭

মদন কিছুতেই যাচ্ছে না। আর পদ্মজা অন্দরমহলের ভেতর ঢুকতে চাইছে না। সে বার বার বলছে, 'আমি একটু হাঁটব এদিকে। আপনি যান।'

'রাইতের বেলা একলা থাকবেন। আমার কাম আপনারারে দেইখা রাখা।'

'এদিকে তো আলো জ্বলছে। উনিও আসবেন এখন। আপনি যান। আর আপনার পা তো কাদামাখা। বেশিক্ষণ এভাবে না থেকে ধুয়ে আসুন।'

মদন পায়ের দিকে তাকাল। লুঙ্গি হাঁটু অবধি তুলে বেঁধে রাখা। সে হেসে বলল, 'আইচ্ছা তাইলে আমি ধুইয়া আইতাছি। বেশিখন(বেশিক্ষণ) লাগব না।'

'আচ্ছা, আসুন।'

মদন চলে যেতেই পদ্মজা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। গলার মাঝে যেন কাঁটা বিঁধে ছিল। বাড়ির পিছনে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দেখলে পেল আমিরকে। আমির আলগ ঘর পেরিয়ে এদিকেই আসছে। পদ্মজা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। আলগ ঘরের দিকে চেয়ে রইল। আমির পদ্মজাকে দেখতে পেয়ে লম্বা করে হাসল। বলল, 'পদ্মবতী কী আমার জন্য অপেক্ষা করছে?'

'বোধহয় করছি।'

আমির ভ্রুকুটি করে বলল, 'বোধহয় কেন?'

'ঘরে একা ভালো লাগছিল না। তাই হাঁটতে বের হয়েছিলাম। আপনি নামায পরেছেন?'

'এইযে মাথায় টুপি। মসজিদ থেকে আসলাম।'

পদ্মজা আড়চোখে অন্দরমহলের ডান দিকে তাকায়। সেখানে কী সে যেতে পারবে না? পদ্মজা উসখুস করতে থাকল। আমির পদ্মজাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। আমিরের কাজে পদ্মজা হতভম্ব হয়ে গেল। দ্রুত এদিকওদিক তাকিয়ে দেখল,কেউ আছে নাকি। এরপর আমিরের হাতের বাঁধন ছুটানোর চেষ্টা করতে লাগল। আর বলল, 'ছাড়ুন,কেউ দেখবে।'

'কেউ দেখবে না। এদিকে কেউ নেই।'আমিরের কণ্ঠ মোহময়। সে পদ্মজার ঘাড়ে থুতুনি রাখল। এরপর ঠোঁটের ছোঁয়া লাগাতেই পদ্মজা কেঁপে উঠল। জোর করে আমিরের হাতের বাঁধন ছুটিয়ে সরে গেল। বলল, 'আপনি ঘরে যান।'

'আচ্ছা, চলো।'

'আপনি যান, আমি আসছি।'

'কেন? তুমি কোথায় যাবে?'

পদ্মজা নিচের ঠোঁট কামড়ে কিছু ভাবল। এরপর বলল, 'আলগ ঘরে যাব। আপনি ঘরে যান। নয়তো আম্মা আমাকে খুঁজবে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসব। এরপর সব বলব।'

'আরে, কী করবে বলবে তো।'

'আপনি যান না।'

পদ্মজা ঠেলে আমিরকে অন্দরমহলের দিকে পাঠাল। আমির অসহায় মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমিও থাকি?'

'আপনি ঘরে গিয়ে বসবেন আর আমি চলে আসব।'

পদ্মজার অনুরোধ ফেলা যাচ্ছে না। আমির না চাইতেও অন্দরমহলে চলে গেল। পদ্মজা এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে অন্দরমহলের ডান পাশে চলে আসে। সঙ্গে,সঙ্গে রানির মুখোমুখি হয়। রানি ও পদ্মজা একসাথে কেঁপে উঠল। দুজন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। রানিই আগে কথা বলল, 'রাইতের বেলা এমনে ছুটতাছো কেন?'

পদ্মজার মাথা থেকে ঘুমটা পরে গেছে সেই কখন। দৌড়ে আসাতে চুলের খোঁপাও খুলে গেছে। গাছ-গাছালির বাতাসে তিরতির করে চুল উড়ছে। তবুও সে ঘামছে।

আমতাআমতা করে বলল, 'আ...আমি তো হাঁটতে বের হয়েছি। জোনাকি দেখলাম এদিকে। তাই নিতে এসেছি।'

'ওহ। কই জোনাকি। নাই তো।'

'একটু আগেই ছিল।'

'এহন তো নাই। রাইতের বেলা একলা থাকবা কেন। আসো ঘরে যাই।'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে রানি আপা? সন্ধ্যার আযানের আগে তোমার ঘরে গেলাম। পেলাম না। এদিক দিয়ে কোথাও ছিলে? কিন্তু এদিকে তো ঝোপঝাড়,জঙ্গল।'

পদ্মজার প্রশ্নে রানির মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠে মুখ। সে অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। কী বলবে খুঁজছে যে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পদ্মজা অপেক্ষা করছে,রানি কী বলে শোনার জন্য। পদ্মজা ডাকল, 'আপা?'

'আরে আমি ঔষধ খুঁজতে আসছিলাম।'

'কী ঔষধ?'

'তুমি চিনবা না। আসো বাড়িত যাই। মেলা রাইত হইয়া গেছে।'

রানি পদ্মজাকে রেখে এগোতে থাকল। এটাকে পালিয়ে যাওয়া বলে। পদ্মজা আর থেকে কী করবে! সেও রানির পিছু পিছু অন্দরমহলে চলে আসে। ঘরে ঢুকতেই আমির হামলা করে, 'এবার কাহিনি কী বলো তো।'

'বিশ্বাস করবেন?'

'তোমার কথা বিশ্বাস করব না, এ হয়?'

'রানি আপা প্রায় জঙ্গলের ভেতর যায়। আমি জানালা থেকে দেখি। উনি এমন ভাবে যান যেন চুরি করতে যাচ্ছেন।'

আমির শুনে অবাক হলো। সে চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'সত্যি! প্রায়ই যায়?'

'আমি সত্যি বলছি।'

আমির চিন্তিত হয়ে কিছু ভাবে। কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে। গভীর ভাবনায় বিভোর সে। পদ্মজা বলল, 'আমি আজ অনুসরণ করে জঙ্গল অবধি গিয়েছিলাম। মদন ভাইয়ার জন্য ভেতরে ঢুকতে পারিনি। এরপর আপনি এলেন। পরে আবার যেতে চেয়েছি। কিন্তু ততক্ষণে রানি আপা চলে এসেছে। সরাসরি প্রশ্নও করেছি, কেন জঙ্গলে গিয়েছিল। বলল, ঔষধ আনতে। মানে কোনো ঔষধি পাতা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। প্রায়ই কেন কেউ ঔষধি পাতা আনতে যাবে? আবার ভোরে আর রাতে।"

পদ্মজা এক দমে কথা গুলো বলল। আমির বলল, 'আব্বাকে বলতে হবে।'

'আগে শুনুন?'

'বলো?'

'এখন কাউকে বলবেন না।'

'বলা উচিত। ব্যাপারটা জটিল মনে হচ্ছে।'

'আমরা আগে বের করি কী হয়েছে? কী করতে যায়। এরপর নিজেরা সমাধান করতে পারলে করব। নয়তো বড়দের বলব। যদিও আমরা নিশ্চিত না কোনো সমস্যা আছে।'

'অবশ্যই সমস্যা আছে। তুমি জানো, ওদিকে কোনো মহিলা ভুলেও যায় না। যেতে চায় না ভয়ে। সেখানে রানি যায়। বড় কোনো কারণ আছে।'

'আমরা বের করি সেটা?'

'কীভাবে?'

'আমার মনে হচ্ছে আবার যাবে। কাল-পরশুর মধ্যে। আমরা পিছুপিছু যাব।'

'খারাপ বলোনি।'

'কাউকে বলবেন না এখন, অনুরোধ।'

আমির হাসল। পদ্মজার কোমর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বলব না।'

'আপনি কারণে-অকারণে ছোঁয়ার বাহানা খুঁজেন।'

‘এতে পাপ তো নেই।’

‘খাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন। ঠিক সময়ে না গেলে আম্মা চিল্লাবেন।’

‘আম্মারা চিল্লায়ই। তোমাকে খয়েরি রঙে বেশি সুন্দর লাগে।’

‘আমি তো খয়েরি শাড়ি পরিনি।’

‘পুরো কথা বলতে দাও।’

‘আচ্ছা, বলুন।’

‘আর, কালো রঙে আবেদনময়ী লাগে। আকর্ষণীয়।’আমির ফিসফিসিয়ে কথাটা বলল। পদ্মজার কানে,ঘাড়ে আমিরের নিঃশ্বাস ছিটকে পড়ে। সে ঘুরে আমিরের দিকে তাকায়। আবার চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, ’আপনি সবসময় আকর্ষণীয়।’

আমির হইহই করে উঠল, ’সত্যি? কত,কত দিন পর একটু প্রশংসা করলে। আল্লাহ!’

পদ্মজা মৃদু আওয়াজ করে হাসল। বলল, ’প্রশংসা শুনতে খুব ভালোবাসেন?’

‘অবশ্যই। তবে বউয়ের প্রশংসা করতে আরো বেশি ভালবাসি।’আমির আরো শক্ত করে পদ্মজার কোমর আঁকড়ে ধরে। পদ্মজা আমিরের দুই হাতে ধরে বলল, ’আপনি সবসময় এতো শক্ত করে কেন ধরুন? গায়ের জোর দেখান?’

‘কেন? ভালো লাগে না?’

‘মোটেও না। আদর করে ধরবেন।’

আমির হাতের বাঁধন কোমল করে দিয়ে বলল, ’লজ্জার ছিটেফোঁটাও গিলে ফেলছো দেখছি।’

‘বিয়ের এতদিন পরও কোন মানুষটা লজ্জা পায় আমাকে দেখাবেন। আমি অতো ভং ধরতে পারব না।’

‘কী ঝাঁঝ কথায়।’

‘এবার ছাড়ুন।’

‘ইচ্ছে হচ্ছে না।’

‘আবার শক্ত করে ধরেছেন।’

‘যদি দৌড়ে পালাও?’

‘পালিয়ে আর যাব কতটুকু?’

আমির পদ্মজাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে এক হাতে কোমর চেপে ধরল। তখনই লতিফা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে। পদ্মজা,আমির দুজন দুদিকে ছিটকে যায়। আমির ধমকে উঠল, ’লুতু,কতবার বলছি না বলে ঘরে ঢুকবি না। আমাদের তো নতুন বিয়ে হয়েছে নাকি?’

পদ্মজা খেয়াল করে আমির কথাগুলো রাগে বলার চেষ্টা করলেও রাগের মতো হয়নি। পদ্মজার হাসি পেল। লতিফার মুখের অবস্থা দরজার চিপায় পড়ার মতো। সে আমিরকে ভীষণ ভয় পায়। কাচুমাচু হয়ে বলল, ’খালাম্মা খাইতে যাইতে কইছে।’

পর্ব ৩৮

পদ্মজা নূরজাহানের পা টিপে দিচ্ছে। তার মূল উদ্দেশ্য রুম্পার ঘরে যাওয়া। সকাল থেকে বারংবার রুম্পার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। পারেনি। মদন কিছুতেই ঢুকতে দেয়নি। তার এক কথা, নূরজাহান না বললে ঢুকতে দিবে না। অগত্যা পদ্মজা নিরাশ হয়ে নূরজাহানের ঘরে এসে পা টিপা শুরু করে। যদি একটু পটানো যায়। ঘন্টাখানেক ধরে সে নূরজাহানের পা টিপছে। হাত ব্যাথায় টনটন করছে। নূরজাহান আয়েশ করে ঘুমাচ্ছেন। কখন যে ঘুম ভাঙবে! এভাবে কেটে যায় আরো অনেক সময়। নূরজাহান চোখ মেলে তাকান। পদ্মজাকে বললেন, 'এহনো আছো?'

পদ্মজা মৃদু হাসলো। নূরজাহান বললেন, 'অনেকক্ষণ হইছে। যাও, এহন ঘরে যাও।'

পদ্মজার চোখে মুখে আঁধার নেমে আসে। পরক্ষণেই মিষ্টি করে হেসে বলল, 'আপনার ভালো ঘুম হয়েছে?'

'সে হয়েছে।'

'দাদু একটা প্রশ্ন করি?'

'করো।'

'রুম্পা ভাবিকে যেদিন দেখেছিলাম অনেক নোংরা দেখাচ্ছিল। উনাকে পরিষ্কার রাখার জন্য একটা মেয়ে দরকার। কিন্তু সবসময় মদন ভাইয়া পাহারা দেন।'

'ষাড়ের লাকান শক্তি ওই ছেড়ির। হের লগে ছেড়িরা পারব না। সবাই ডরায়।

'তাই বলে, এভাবে অপরিষ্কার থাকবে সবসময়।'

'সবাই ডরায়। কেউ যাইব না সাফ কইরা দিতে। তুমি বেহুদা কথা বলতাছো।'

নূরজাহানের কঠিন কণ্ঠের সামনে পদ্মজার আসল কথাটাই মুখে আসছে না। সে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় আমি পারব। ভাবি আমাকে আঘাত করবে না। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিতেন যদি।'

'পাগল হইছো ছেড়ি? কেমনে খামচাইয়া ধরছিল মনে নাই? আর কথা কইয়ো না। যাও এন থাইকা।'

পদ্মজা আর কিছু বলার সাহস পেল না। সে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দুই তলার বারান্দা থেকে আলগ ঘরের সামনের খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে। সেখানে গ্রামের মানুষের ভীড়। মজিদ হাওলাদার তার লোকজন নিয়ে গ্রামের মানুষদের সমস্যা শুনছেন। কাউকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন, কাউকে বা ধান দিয়ে। এই ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে। পদ্মজার খুব ভালো লাগে। গর্ব হয়।

পূর্ণা ঘাটে বসে আছে। মাদিনী নদীর জলের স্রোতে তার দৃষ্টি স্থির। প্রান্ত,প্রেমা স্কুলে গিয়েছে। সে যায়নি। ইদানীং সে স্কুলে যায় না একদমই। ভালো লাগে না। পদ্মজা যাওয়ার পর থেকে সব যেন থমকে গেছে। পদ্মজার শূন্য জায়গাটা কিছুতেই পূর্ণা মানতে পারছে না। বাড়ির প্রতিটি কোণে সে পদ্মজার স্মৃতি খুঁজে পায়। এইতো এই ঘাটে বসে দুজন কত সময় পার করতো। কত গল্প করতো। আজ পদ্মজার জায়গা শূন্য। পূর্ণা অনুভব করে,সে তার মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে পদ্মজাকে। পদ্মজার প্রতিটি কথা কানে বাজে। এতদিন হয়ে গেল,তবুও এই শোক,এই শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। পূর্ণার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। সে নিচের ঠোঁট কামড়ে দুইবার ডাকল, 'আপা...আপারে।'

বাসন্তী দূর থেকে পূর্ণাকে দেখতে পেলেন। জুতা খুলে পা টিপে হেঁটে আসেন। পূর্ণার পাশে বসেন। পূর্ণা এক ঝলক বাসন্তীকে দেখে দ্রুত চোখের জল মুছল। এরপর বলল, 'আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে পূর্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বাসন্তীর দিকে তাকাল। দেখতে পেল, বাসন্তীকে আজ অন্যরকম লাগছে। আরেকটু খেয়াল করে বুঝতে পারল অন্যরকম কেন লাগছে।

আজ বাসন্তীর ঠোঁটে লিপস্টিক নেই,কপালে টিপ নেই,চোখে গাঢ় কাজল নেই। থুতুনির নিচে সবসময় কালো তিনটা ফোঁটা দিতেন সেটাও নেই। পূর্ণা বাসন্তীর হাতের দিকে তাকাল। হাতেও দুই-তিন ডজন চুড়ি নেই। দুই হাতে শুধু দুটো সোনার চিকন চুড়ি। পূর্বের প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করে পূর্ণা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি আজ সাজেননি?'

'না ছাজলে ভালো লাগে না?'বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন বাসন্তী।

পূর্ণা বাসন্তীর চোখেমুখে স্নিগ্ধতা খুঁজে পেল। মায়াবী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চকচকে গাল। চল্লিশের উপর বয়স মনেই হয় না। কিন্তু মুখে কিছু বলল না পূর্ণা। সে চোখ সরিয়ে নিল। বাসন্তী বললেন, 'আমার সাথে গপ করবা?'

'আমার ঠেকা পড়েনি।'পূর্ণার ঝাঁঝালো স্বর।

বাসন্তী পূর্ণার পাশ ঘেঁষে বসেন। পূর্ণা বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। কিছু কঠিন কথা শোনানোর জন্য প্রস্তুত হলো সবেমাত্র। তখন বাসন্তী বললেন, 'আম্মা, আমি তোমার আব্বারে ভালোবাছছিলাম ছত্যি। তবুও ছেছ বয়ছে আইছছা একটা ভুল করে ফেলি। ভুল যখন বুঝতে পারি তোমার আব্বারে বলি। কিন্তু তোমার আব্বা মুখ ফিরাইয়া নিল। আমার তোমার আব্বা ছাড়া আর গতি ছিল না। তাই গ্রামের মানুছ নিয়া আছছিলাম। আমার এই কাজের জন্যে তোমাদের এতো বড় ক্ষতি হবে জানলে এমন করতাম না। যাক গে ছেছব কথা। তোমার আব্বা আমারে আজও মেনে নেয় নাই। তাতে আমার দুঃখ নাই। তোমার আম্মার মতো একটা ছোট বইন পাইছি। তোমার দুইডা ভাই বইনের মতো ছন্তান পাইছি। আমি নিঃছন্তান। আমার কোনো ছন্তান নেই। কখনো হবেও না। ছন্তানের ছূন্যতা আমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খায়। তোমাদের বাড়িতে আছার পর থেকে সেই দুঃখ ঘুচে গেছে। প্রান্ত,প্রেমা যখন আমারে বড় আম্মা কইয়া ডাকে,আমার খুছিতে কান্দন আইছছা পড়ে। ছুধু ভালো লাগে না তোমার গুমট মুখটা। বিছ্বাস করো আম্মা,তোমার মারে আমি তাড়াতে আছি নাই। ছে হইছে গিয়া হীরার টুকরা। তার মতো মানুছ হয় না। আমি যা চেয়েছি তার চেয়েও বেছি পাইছি। ছেটা তোমার আম্মা দিছে। আমি চাই না আমার জন্যে তুমি কছ্ট পাও। আমি তোমারে বলব না আমারে আম্মা ডাকতে। আমি ছুধু চাই তুমি আমাকে মেনে নাও। ভালো থাকো। হাছিখুছি থাকো। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তোমরা যেমনে বলবা আমি তেমনেই চলব। এইযে দেখো,তোমার ছাজগোজ পছন্দ না বলে আমি আজ ছাজি নাই। আর কোনোদিনও ছাজব না। আমি কী কম ছুন্দর নাকি যে ছাজতেই হবে।'

পূর্ণার মন ছুঁতে পেরেছে বাসন্তীর কথা। পূর্ণা বরাবরই কোমল মনের। তবুও শক্ত কণ্ঠেই বলল, 'আমি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আপনি আপনার মতো থাকুন প্রেমা,প্রান্তকে নিয়ে। আমি আমার মতো থাকব আমার মাকে নিয়ে। আমার আর কারোর বন্ধুত্ব দরকার নেই।'

বাসন্তীর চোখ ছলছল করছে। তবুও তিনি হাসতে কার্পণ্য করলেন না। বললেন, 'তোমার চুল অনেক ছুন্দর আর লম্বা। এখন তো ভরদুপুর। বাইন্ধা রাখো।'

পূর্ণা চুলগুলো হাত খোঁপা করে নিল। এরপর বলল, 'আম্মা এখনও ঘুমে?'

'হ।'

'আম্মার কী যে হয়েছে। কখনো একদমই ঘুমায় না। আর কখনো ঘুম ছেড়ে উঠতেই পারে না।'

'পদ্মজার জন্যে কান্ধে দেখি। ছরীর দূর্বল হয়ে পড়ছে। এজন্যই ঘুমাচ্ছে।'

পূর্ণা উঠে দাঁড়ায়। বাসন্তী বললেন, 'আমি রানছি বলে ছকালে খাইলা না। এখন নিয়া আছি ভাত?'

'পরে খাব।'বলে পূর্ণা দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

হেমলতার ঘরে এসে দেখল,তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চুল ছড়িয়ে আছে বালিশে। কেমন শুকিয়ে গেছেন। এতক্ষণ না খেয়ে থাকলে তো আরো শুকাবে। ডাকা উচিত। পূর্ণা ডাকল, 'আম্মা....আম্মা।'

হেমলতা সাড়া দিলেন না। পূর্ণা ঝুঁকে হেমলতার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'ও আম্মা। উঠো এবার। দুপুর হয়ে গেছে। আম্মা...ও আম্মা।'

হেমলতা চোখ খুলেন। চোখের মণি ফ্যাকাসে। তিনি উঠতে চাইলে হুট করে হাত কাঁপতে থাকল। পূর্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী হয়েছে আম্মা?'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। পূর্ণা হেমলতাকে ধরে উঠাল। হেমলতা পূর্ণার দিকে চেয়ে থেকে ক্ষীন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?'

পর্ব ৩৯

হেমলতার এহেন প্রশ্নে পূর্ণা চমকে উঠল। চাপা স্বরে অবাক হয়ে উচ্চারণ করল, 'আম্মা!'

সেকেন্ড কয়েক পর পূর্ণার উপর থেকে হেমলতা চোখ সরিয়ে নিলেন। পূর্ণা বলল, 'আমাকে চিনতে পারছো না?'

হেমলতা বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন, 'ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। তাই এমন হয়েছে। সবার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?'

পূর্ণা তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। হেমলতা পূর্ণার দিকে তাকান। জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে? কিছু জিজ্ঞাসা করেছি না?'

'হয়েছে। দুপুরের আযান পড়বে।'

'এতক্ষণ ঘুমিয়েছি! আরো আগে ডাকতে পারলি না?'

'ঘুমাচ্ছিলে আরাম করে। তাই ডাকিনি।'

'ফজরের নামাযটা পড়া হলো না। এখন কাযা পড়তে হবে। তুই নামায পড়েছিলি তো?'

'পড়েছি।'

'খেয়েছিস?'

'না।'

'এরকম করে আর কতদিন চলবে? যা খেয়ে নে।'

পূর্ণা বাধ্য মেয়ের মতো হেঁটে চলে গেল রান্নাঘরে। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। কতক্ষণ না খেয়ে রাগ করে থাকা যায়? হেমলতা খোলা চুল হাত খোঁপা করে নেন। এরপর কলপাড়ের দিকে যান। অযু করে ঘরে ঢোকার সময় দেখেন,পূর্ণা খাচ্ছে। তিনি পূর্ণার উদ্দেশ্যে বললেন, 'খাওয়া শেষ করে ঘরে আসিস।'

পূর্ণা খেয়েদেয়ে থালা ধুয়ে গুছিয়ে রাখে। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দেখে, চারা গাছ লাগানোর জন্য বাসন্তী উঠানের এক কোণে বসে মাটি খুঁড়ছেন। পূর্ণা দৃষ্টি সরিয়ে হেমলতার ঘরে আসে। এসে দেখে হেমলতা জায়নামাজে অসম্ভব উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন। পূর্ণা ডাকল, 'আম্মা?'

হেমলতা চমকে তাকান। পূর্ণা দ্বিতীয়বারের মতো অবাক হয়। চমকানোর কী এমন হলো? হেমলতা স্বাভাবিক হয়ে বসেন। জায়নামাজ ভাঁজ করেন ধীরেসুস্থে। এরপর পূর্ণাকে কাছে এসে বসতে বলেন। পূর্ণা পাশে এসে বসে। হেমলতা ভারী কণ্ঠে বললেন, 'আপার(বাসন্তী) প্রতি তোর এতো রাগ কেন? আম্মাকে বল?'

'এখন রাগ নেই।'

'প্রেমা-প্রান্তের মতো মিলেমিশে থাকতে পারবি না? ওরা বড় আম্মা ডাকে। তুই শুধু খালাম্মা ডাকবি।'

'মাত্র উঠলে ঘুম থেকে। আগে খাও। এরপর কথা বলব।'

'আমি এখনই বলব। কথাগুলো বলব বলব করে বলা হয়নি। দেখ পূর্ণা, আপা অন্য পরিবেশে বড় হয়েছে, থেকেছে তাই একটু অন্যরকম। তাই বলে মানুষটা তো খারাপ না। আপা সত্যি একটা সংসার চায়। পরিবারের একজন সদস্য ভাবতে দোষ কোথায়? বাকি জীবনটা কাটাক না আমাদের সাথে। আমার কাজকর্মের একজন সঙ্গীও হলো। বয়স তো হচ্ছে,একা সব সামলানো যায়? আপারও বয়স হচ্ছে। কিন্তু দুজনে মিলে তো কাজ করতে পারব। কয়দিন পর তোর বিয়ে হবে,প্রেমার বিয়ে হবে। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি। তখন আমার একজন সঙ্গী থাকলো। আর এমন নয় যে,আপার মনে বিষ আছে। আপারও ভালো সঙ্গ দরকার। ভালো পরিবেশ, ভালো সংসার। আমি দেখেছি, আপা কত সুখে আছে এখানে। প্রেমা-প্রান্তর জন্য জান দিয়ে দিতে প্রস্তুত। নিঃসন্তান বলেই হয়তো এমন। আপা কিন্তু এখন আমাদের ছাড়া অসহায়। উনার মা মারা গেছে। বাবা তো নেই। আত্মীয়-স্বজন নেই। এই

বয়সে যাবে কই? আমরা একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারি না? সতিন হলেই সে খারাপ হবে,সৎ মা হলেই সে খারাপ হবে এমন কোনো বাণী আছে?'

পূর্ণা বেশ অনেকক্ষণ চুপ রইল। এরপর বলল, 'কিন্তু উনি অনেক সাজগোজ করেন। যদিও আমাকে কিছুক্ষণ আগে বলেছেন,আর সাজবেন না। তবে,উনার কথার ধরণ আমার ভালো লাগে না। স কে ছ উচ্চারণ করেন। শুদ্ধ-অশুদ্ধ মিলিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়ে কথা বলেন।'

হেমলতা পূর্ণার কথায় হাসলেন। পূর্ণা ওড়নার আঁচল আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। হেমলতা পূর্ণার মাথায় হাত রাখেন। বললেন, 'তোর আপা যদি প্রান্তকে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করিয়ে দিতে পারে। তুই তোর বাসন্তী খালাকে স উচ্চারণ শিখাতে পারবি না?'

'উনি শিখবেন?'

'বললে, অবশ্যই শিখবেন।

'সত্যি?'

'বলেই দেখ।'

'এখন যাব?'

'যা।'

'যাচ্ছি।'

পূর্ণা ছুটে বেরিয়ে গেল। হেমলতা মৃদু হেসে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। সেলাই মেশিনের সামনে বসেন। অনেকগুলো কাপড় জমেছে। সব শেষ করতে হবে।

উঠানে বাসন্তীকে পেল না পূর্ণা। এদিকওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকল। বাসন্তী কলপাড় থেকে হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা কথা বলতে গিয়ে দেখে জড়তা কাজ করছে। দুই তিনবার ঢোক গিলে ডাকল, 'শুনুন?'

বাসন্তী দাঁড়ালেন। পূর্ণাকে দেখে হাসলেন। পূর্ণা এগিয়ে এসে বলল, 'আপনাকে আমি পড়াব।'

'কী পড়াইবা?'

'লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় আসেন আগে।'

বাসন্তী কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। তবুও পূর্ণার পিছু পিছু গেলেন। বারান্দার চৌকির উপর পূর্ণা বসল। পূর্ণার সামনে বাসন্তী বসেন উৎসুক হয়ে। পূর্ণা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে দন্ত-স উচ্চারণ শেখাব আমি।'

'দন্ত-ছ উচ্চারণ তো আমি পারি।'

'আপনি দন্ত-স না বলে দন্ত-ছ বলেন। শুনতে ভালো লাগে না। বলুন, দন্ত-স।'

বাসন্তী থতমত খেয়ে যান। চোখ ছোট ছোট করে বললেন, 'দন্ত-ছ।'

'হয়নি। বলুন, দন্ত-স।'

'দন্ত-ছ।'

'আবারও হয়নি। আচ্ছা বলুন, সংসার।'

'ছংছার।'

'স-ং-সা-র।'

'ছ...সওও-ং-চ..সার।'

সংসার উচ্চারণ করতে করতে পূর্ণার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েন বাসন্তী। পূর্ণা বলল, 'উপরে চলে আসছেন কেন? দূরে বসুন।'

বাসন্তী দ্রুত সোজা হয়ে বসেন। পূর্ণা বলল, 'এবার বলুন, সন্তান।'

'স..সন্তান।'

'ফাটাফাটি! হয়ে গেছে। এবার বলুন,আসছে।'

'আছছে।'

'আরে, আবার ছ উচ্চারণ করছেন কেন? বলুন, আসছে। আ-স-ছে।'

'আ-স-ছে।'

'হয়েছে। এবার বলুন, সাজগোজ।'

'সাজগোছ।'

হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা একসাথে বসেছে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। আলমগীর, খলিল সবাই আজ উপস্থিত আছে। আমির দুই দিন পর শহরে ফিরবে। তাই আলমগীর চলে এসেছে। অতিরিক্ত গরম পড়েছে। বাড়ির চারপাশে এতো গাছপালা তবুও একটু বাতাসের দেখা নেই। আমিনা,লতিফা বাতাস করছে। পদ্মজা,ফরিনা,রিনু খাবার বেড়ে দিচ্ছে। পদ্মজা আমিরের থালায় মাংস দিতেই আমির বলল, 'তুমি কখন খাবে?'

পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। বলল, 'আম্মার সাথে।'

'এখন বসো না।'

'জেদ ধরবেন না। অনুরোধ।'ফিসফিসিয়ে বলল পদ্মজা।

এরপর মাছের তরকারি আনার জন্য রান্না ঘরে যায়। বাটিতে করে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে আসে। আমিরের দিকে চোখ পড়তেই আমির চোখ টিপল। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে হাসে। আলমগীরের থালায় মাছের ঝোল দেওয়ার সময় খেয়াল করল, আলমগীর বেশ ফুর্তিতে আছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হবে। এসে একবারও রুম্পার কথা জিজ্ঞাসা করল না। কী অদ্ভুত! বউয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া,ভালোবাসা নেই যে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

রানি,লাবণ্য ছুটে এসে বাপ-চাচার মাঝে বসে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সবাই বিভিন্ন রকম আলোচনা করছে। রানির বিয়ে নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে। খুব দ্রুত রানির বিয়ে দিতে চান তারা। আচমকা রানি গড়গড় করে বমি করতে আরম্ভ করল। সবাই বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। প্রতিটি খাবারের থালা নষ্ট হয়ে যায়। আমিনা দ্রুত রানিকে ধরে কলপাড়ে নিয়ে যান। লাবণ্য,পদ্মজা,নূরজাহান, ফরিনা ছুটে যান পিছু পিছু। বাড়ির পুরুষেরা হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। মুহূর্তে একটা হইচই লেগে গেল।

রানি বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কলপাড়ে বসে পড়ে। আমিনা হায় হুতাশ করে বিলাপ করছেন, 'আমার ছেড়িডার কী হইলো? কয়দিন ধইরা খালি বমি করতাছে। জ্বীনের আছড় লাগল নাকি। কতবার কইছি যহন তহন ঘর থাইকা বাইর না হইতে।'

লাবণ্য তথ্য দিল, 'আপা রাতেও ছটফট করে। ঘুমাতে পারে না।'

আমিনা কেঁদে কূল পাচ্ছেন না। রানির চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। তিনি রানিকে প্রশ্ন করলেন, 'আর কী কষ্ট হয় তোর? ও আম্মা কবিরাজ ডাকেন। আমার ছেড়িডার কী হইলো।'

রানি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'মাথাডা খালি চক্কর মারে।'

নূরজাহান চোখ দু'টি বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন, 'এই ছেড়ি তোর শরীর খারাপ শেষ কবে হইছে?'

'দুই মাস হবে।'কথাটা বলে রানি চমকে উঠল। সবাই কী ধারণা করছে? সে চোখ তুলে উপরে তাকায়। সবাই উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে। রানির শরীর কাঁপতে থাকে। আমিনা মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এমন কিছু হয় নাই আম্মা। আপনি ভুল বুঝতাছেন। আমার ছেড়ি এমন না।'

'হেইডা কবিরাজ আইলে কওয়া যাইব। এই ছেড়ির জন্যে যদি এই বাড়ির কোনো অসম্মান হয় কাইট্টা গাঙে ভাসায়া দিয়াম। মনে রাইখো বউ।'নূরজাহান বললেন রাগী স্বরে। রানির গলা শুকিয়ে কাঠ! হৃৎপিণ্ড দ্রুত গতিতে চলছে। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। একসময় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল আমিনার কাঁধে। আমিনা চিৎকার করে উঠলেন, 'ও রানি...'

পর্ব ৪০

রানির অবস্থা বেগতিক। খলিল হাওলাদার দরজা বন্ধ করে এলোপাথাড়ি মেরেছেন। কারো কথা শুনেননি। রিদওয়ান বাড়ির কাজের মানুষদের হুমকি দিয়েছে, রানি গর্ভবতী এই খবর বাইরে বের হলে সব কয়টাকে খুন করবে। মগা,মদন,লতিফা,রিনু ভয়ে আধমরা। তারা নিঃশ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে। কেউ যদি বাইরে এই খবর বের করে, নিশ্চিত সবাই তাদেরই ভুল বুঝবে। রানি মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সারা গায়ে মারের দাগ। ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। আমিনা রানিকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছেন। খলিল হাওলাদারকে বার বার পাষাণ বাপ বলে আখ্যায়িত করছেন। পদ্মজা পরিষ্কার কাপড়,পানি এনে ফরিনার হাতে দিল। ফরিনা রানির মুখে পানি ছিটিয়ে দেন। রানি কিছুতেই চোখ খুলছে না। লাবণ্য ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রানির সাথে তার সবসময় ঝগড়া হয় ঠিক। তবে ভালোও তো বাসে। দরজা বাইরে থেকে শুনেছে রানির চিৎকার। রানি চিৎকার করে ডাকছিল, 'আম্মা,দাভাই,লাবণ্য কই তোমরা? আব্বা মাইরা ফেলতাছে। বাঁচাও তোমরা আমারে। লাবণ্য কই তুই? আম্মা....।'

দরজায় সবাই মিলে অনেক ধাক্কা দিয়েছে,ডেকেছে, খলিল হাওলাদার সাড়া দেননি। এক নিঃশ্বাসে মেরে গেছেন। রানিকে মাটিতে ফেলে জোরে জোরে লাথি মেরেছেন। রাগের বশে রানির তলপেটে বেশি আঘাত করেছেন। আর রানি আকাশ কাঁপিয়ে কেঁদেছে। কেউ পারেনি ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে। পদ্মজা আমিরের পাঞ্জাবি দুই হাতে খামচে ধরে কান্নামাখা কণ্ঠে অনুরোধ করেছে, 'আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি এসব থামান। চেষ্টা করুন।'

আমির অনেক চেষ্টা করেছে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করার। পারেনি। যখন করাত আনার জন্য প্রস্তুত হয় তখন খলিল হাওলাদার বেরিয়ে আসেন। রানির গলার স্বর থেমে যায়। আর শোনা যাচ্ছে না। সবাই ভেতরে প্রবেশ করে দেখে, রানি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শরীর রক্তাক্ত। আমিনা'রানি'বলে চিৎকার করে উঠেন। ছুটে আসেন রানির কাছে। মগাকে পাঠানো হয়েছে আবার কবিরাজকে নিয়ে আসতে। এতো কিছু হয়ে যাচ্ছে,নূরজাহান একবারও নিচে নেমে আসেননি। রানি গর্ভবতী শুনে সেই যে উপরে গিয়েছেন তো গিয়েছেনই! আর আসার নাম নেই। এতো চেঁচামিচি শুনেও কী আসতে ইচ্ছে হয়নি? এতোই কঠিন মন!

কবিরাজ আসার অনেকক্ষণ পর রানি চোখ খুলে। ফরিনা আমিনাকে বললেন, 'ছেড়ির বিয়া দিতে কইছিলাম। দিলি না। ছেড়ির কথা হুনছিলি তোরা। এহন তো মজা বুঝতেই হইবো। বিশ বছরের যুবতী ছেড়ি এখন বাপের ঘরে থাহে?'

আমিনা কিছু বলতে পারলেন না। আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন। মজিদ ঘরে প্রবেশ করেন। ফরিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েকে জিজ্ঞাসা করো,এই আকামের সাথী কে?'

পদ্মজা ধীরপায়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা টানা। ফরিনা রানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাচ্চার বাপ কেডায়?'

রানি কিছু বলছে না। ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। ফরিনা তেজ নিয়ে বললেন, 'কী রে ছেড়ি? এহন কথা আয় না কেন? বাচ্চার বাপের নাম কিতা? কইবি তো। বিয়া তো দেওন লাগব।'

তবুও রানি চুপ। তার কান্নার বেগ বেড়ে গেছে। মজিদ হাওলাদার লাবণ্যকে ডাক দিলেন, 'লাবণ্য?'

লাবণ্য কেঁপে উঠল। মজিদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর তো জানার কথা। একসাথে থাকিস। কার সাথে রানির সম্পর্ক ছিল?'

লাবণ্য মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। আড়চোখে রানিকে দেখে। রানি অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। লাবণ্য বুঝে উঠতে পারছে না,তার কী বলা উচিত? মজিদ ধমকে উঠলেন, 'লাবণ্য, সত্য বল। কিছু লুকানোর চেষ্টা করবি না। তাহলে তোরও এই দশা হবে।'

লাবণ্য ভয়ের চোটে গড়গড় করে বলতে থাকল, 'আপার সাথে আবদুল ভাইয়ের প্রেম আছে। দুইজনে প্রায়ই দেখা করে বাড়ির পিছনে। খালের পাড়ে। অনেক বছর হইছে প্রেমের।'

রানির কান্নার শব্দ বেড়ে যায়। ফরিনা ঝাঁঝালো কণ্ঠে রানিকে বলেন, 'এই ছেড়ি চুপ কর! এহন মেলাইতাছস কেরে? কুকাম করার সময় মনে আছিলো না? আমরারে কইতে পারলি না তোর আবদুলরে পছন্দ। আর আবদুলই কেমন ধাঁচের মানুষ? প্রস্তাব লইয়া আইতে পারে নাই? তোরে ডাইকা লইয়া কুকাম কইরা বেড়াইছে।'

'নিজের বাড়ি বানায়া প্রস্তাব লইয়া আইবো কইছিল।'রানি কাঁদতে কাঁদতে বলল। ফরিনা পাল্টা বললেন, 'কয়দিন তর সয় নাই? শরীর গরম হইয়া গেছিল বেশি? খারাপ ছেড়ি কোনহানের।'

আমির ঘরে ঢুকতেই মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আবদুলরে ধরে নিয়ে আয়।'

আমির অবাক হয়ে বলল, 'আবদুল করছে এই কাজ? ও তো এমন না।'

'মুখ দেখে বোঝা যায় কে কেমন?'

আমির উত্তরে কিছু বলল না। রানি আহত দূর্বল শরীর নিয়ে দ্রুত বিছানা থেকে নামে। আমির ঘর থেকে বেরোনোর জন্য পা বাড়িয়েছে সবেমাত্র। রানি আমিরের পায়ে ধরে বসে পড়ে। আকুতি করে বলল, 'দাভাই, উনারে কিছু কইরো না। উনারে মাইরো না। আমি তোমার পায়ে পড়ি। ও কাকা,আমারে মারো। উনারে মাইরো না।'

'কী পাগলামি করছিস? পা ছাড়,রানি।'

'দাভাই, দোহাই লাগে।'

আমির রানিকে দুই হাতে তুলে দাঁড় করাল। এরপর কোমল কণ্ঠে বলল, 'কিছু করব না। শুধু নিয়ে আসব। বিয়ে পরিয়ে দেব।'

'সত্যি দাভাই?'

'সত্যি।'

রানি হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। আমির বেরিয়ে যায়। মজিদ চোখমুখ কঠিন অবস্থানে রেখে ঘর ছাড়েন। রানি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেতে নিলেই পদ্মজা ধরে ফেলে। আমিনা,ফরিনা এগিয়ে আসেন। তারপর রানিকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বিয়ে হবে শুনে ভেতরে ভেতরে রানির খুব আনন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগের সব মার, ব্যাথা তুচ্ছ মনে হচ্ছে। রানি আবদুলকে এতো বেশি ভালোবাসে যে,আবদুলের এক কথায় সে বিয়ের আগে ঘনিষ্ঠ হতে রাজি হয়। যখন যেখানে যেতে বলেছে,তখন সেখানেই গিয়েছে। দ্বিতীয়বার ভাবেনি। অন্ধভাবে ভালোবেসেছে। কতদিনের স্বপ্ন! কত আশা! পূরণ হবে অবশেষে। রানি নিজের অজান্তে বাঁকা হাসে। তৃপ্তিকর হাসি! কিছু পাওয়ার হাসি! উপস্থিত আর কেউ খেয়াল না করলেও, সেই হাসি পদ্মজা খেয়াল করে।

এই হাসি বেশিক্ষণ থাকল না। বিকেলবেলা আমির দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরল। আবদুল খুন হয়েছে গত রাতে! মাদিনী নদীতে লাশ পাওয়া গেছে। আবদুলের বাড়িতে পুলিশের ভীড়! রানির কানে কথাটা আসতেই এক চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।জীবনের সুখের আলো নিভে যায়। নিভে যায় স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছের প্রদীপ।

পদ্মজা এই খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিটা মৃত দেহ নদীতেই কেন পাওয়া যায়? এতে কী প্রমাণ পানির সাথে ধুয়ে যায়? আগের খুন গুলোর খুনি কী এই আবদুলের খুনি? পদ্মজা চেয়ার টেনে বসে। মাথা ব্যাথা করছে খুব। রগ দপদপ করে কাঁপছে। চোখ বন্ধ করে ভাবে, এই অলন্দপুরে পাপের সাম্রাজ্য কারা তৈরি করেছে? ভাবতে গেলে শরীর কেমন করে! শূন্য হাত নিয়ে ভাবনা থেকে বের হতে হয়। কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

পর্ব ৪১

সূর্যমামার ঘুম ভাঙতে তখনো বাকি। তবে তার আগেই ডাকাডাকি করে সবার ঘুম ভাঙানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে পাখিরা। পদ্মজা স্বামীর বুকের ওম ঝেড়ে ফেলে অজু করে আসে। এসে দেখে তার সোহাগের স্বামী এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পদ্মজা ডেকে তুলে, একসাথে ফজরের নামায আদায় করে। নামায শেষ করেই আমির ঘুমিয়ে পড়ে। পদ্মজা রান্নাঘরে যায়। গিয়ে দেখে,ফরিনা বেগম এখনও আসেননি। আজ মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল। উত্তেজনায় পদ্মজার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সে পায়চারি করতে করতে লাবণ্যর ঘরের সামনে আসে। দরজা খোলা। পদ্মজা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, রানি মাটিতে বসে আছে। উদাস হয়ে কিছু ভাবছে। রাতে ঘুমায় না। নিজের মতো জগত করে নিয়েছে। খাবার রেখে যাওয়া হয়,যখন ইচ্ছে হয় খায়। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এরপর জায়গা ত্যাগ করল। রানি অন্য কাউকে দেখলে খুব রেগে যায়। তাই এই ভোরবেলা তার সামনে না যাওয়াই মঙ্গল। পদ্মজা সদর ঘরে পায়চারি করতে থাকল। ফরিনা বেগম তাসবিহ পড়তে পড়তে সদর ঘরে প্রবেশ করেন। পদ্মজাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'উইট্টা পড়ছ তুমি! চুলায় আগুন ধরাইছো?'

পদ্মজা অপরাধীর মতো মাথা নত করে'না'উচ্চারণ করল। ফরিনা এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না। মৃদু কণ্ঠে আদেশ করলেন, 'লাবণ্যরে ডাইককা তুলো গিয়া। ছেড়িডা আইজও মানুষ হইলো না। ভোরের আলো ফুইটা গেছে। হে এহনও ঘুমায়।'

'আচ্ছা, আম্মা।'

পদ্মজা আবার লাবণ্যর ঘরের সামনে আসল। এবার আর বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে চলে যায়নি। ভেতরে ঢুকল। পদ্মজা আওয়াজ করে দরজা খুলে। তাও রানির ভাবান্তর হলো না। সে যেভাবে মাটিতে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল,সেভাবেই রয়েছে। পদ্মজা রানির দিকে চেয়ে চেয়ে পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর লাবণ্যকে ডাকল, 'এই লাবণ্য। লাবণ্য?'

লাবণ্য আড়মোড়া ভেঙে ঘুমু ঘুমু চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, 'উ?'

'আজ ফলাফল। আর তুই ঘুমাচ্ছিস।'

পদ্মজার কথা বুঝতে লাবণ্যর অনেক সময় লাগল। যখন বুঝতে পারল লাফিয়ে উঠে বসল। বুকে হাত রেখে, হাসঁফাঁস করতে করতে বলল, 'কী বললি এটা! দেখ কলিজাডা লাফাইতাছে। কী ভয়ানক কথা মনে করায়া দিলি, উফ!'

পদ্মজা হাসল। বলল, 'কলিজা লাফায় না,বুক ধুকপুক করে।'

'হ, ওইটাই...ওইটাই। আমি ফেইল করব। রানি আপার মতো মাইর খাব দেখিস। আমার শ্বাস কষ্ট হইতাছে।'লাবণ্য ভয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সে আতঙ্কে আছে। এই চিন্তায় রাতে ঘুম আসেনি। ঘুমাতে ঘুমাতে মাঝরাত হয়ে গেছে। পদ্মজা লাবণ্যর ছটফটানি দেখে ভয় পেয়ে যায়। স্বান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এমন কিছুই হবে না, দেখিস। বেহুদা চিন্তা করছিস। সূর্য উঠে যাবে। নামায পড় জলদি। আল্লাহর কাছে দোয়া কর।'

লাবণ্য হুড়মুড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে,কলপাড়ে ছুটে যায়। এইবার পদ্মজা হেসে ফেলল। রানির দিকে চোখ পড়তেই হাসিটা মিলিয়ে যায়। রানি কাঁদছে। পদ্মজা দুই পা রানির দিকে এগিয়ে আবার পিছিয়ে যায়।

আবার এগিয়ে যায়। রানির পাশে বসে ডাকল, 'আপা?'

রানি চোখ ভর্তি অশ্রু নিয়ে তাকায়। পৃথিবীর সব কষ্টরা বুঝি এক জোট হয়ে রানির চোখে ভীড় জমিয়েছে। রানি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'প্রিয় মানুষ হারানোর কষ্ট এতোডা যন্ত্রনা কেন দেয় পদ্মজা? তুমি তো অনেক জ্ঞানী। সবাই তোমারে বুদ্ধিমতী কয়। তুমি একটা বুদ্ধি দেও না। এই কষ্টের পাহাড় কমানোর বুদ্ধি। আমারে দেখায়া দিবা শান্তির পথ?'

মানুষের কতটা কষ্ট হলে এভাবে শান্তি খুঁজে? পদ্মজার চোখ টলমটল করে উঠে। সে

ঢোক গিলে বলল, 'পুরনো স্মৃতি মুছে সামনের কথা ভাবো। নামায পড়ো, হাদিস পড়ো,কোরআন পড়ো। একদিন ঠিক শান্তি খুঁজে পাবা।'

'আমার মতো পাপীরে আল্লাহ কবুল করব?'

'আল্লাহ তায়ালার মতো দয়াবান, উদার আর কেউ নেই। পাপ মুছার জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেজদা দিয়েই দেখো না আপা। ক্ষমা চেয়ে দেখো। আল্লাহ ঠিক তোমার জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। সেদিন বুঝবে,আল্লাহ তোমার সেজদা কবুল করেছেন।'

রানি জানালার বাইরে তাকায়। আমগাছের ডালে চোখ রেখে বলল, 'কেন এমনডা হইলো আমার সাথে?'

"ব্যভিচার করেছো আপা। বিয়ের আগে এভাবে...! আপা এসব ভেবো না আর। যা হওয়ার হয়েছে।'

'দুনিয়াত আর চাওনের বা পাওনের কিচ্ছু নাই আমার।'

'আখিরাতের জন্য সম্পদ জমাও এবার।'

রানি অন্যরকম দৃষ্টি নিয়ে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজা মাথায় সোজা সিঁথি করে সবসময়। এক অংশ সিঁথি দেখা যাচ্ছে। বাকিটুকু শাড়ির আঁচলে ঢাকা। মেয়েটা এত স্নিগ্ধ, এতো সুন্দর, এতো পবিত্র দেখতে! দেখলেই মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পদ্মজা বলল, 'আখিরাতের সম্পদ এবাদত, খাঁটি এবাদত।'

'তুমি খুব ভালো পদ্মজা।'রানি মৃদু হেসে বলল। তার চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। বলল, 'এখন নামায আদায় করতে পারবে? তাহলে পড়ে নেও।'

'ওইদিনডার পর আর গোসল করি নাই।'

'আজ করবে কিন্তু।'

'করব।'

'আসি?'

'আসো।'

পদ্মজা বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে পা রাখতেই রানির কান্নার স্বর কানে আসে। পদ্মজা থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে একবার রানিকে দেখে। রানি হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। পদ্মজা মনে মনে প্রার্থনা করে, 'আল্লাহ,ক্ষমা করে দাও রানি আপাকে। শান্তির পথে ফিরে আসার রহমত দাও।'

বাড়ির সবাই মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমির সেই সকাল দশটায় বের হয়েছে। এখন বাজে,দুপুর তিনটা। লাবণ্য মিনিটে মিনিটে গ্লাস ভরে পানি খাচ্ছে। আর বার বার টয়লেটে যাচ্ছে। পদ্মজা ঝিম মেরে বসে আছে। হেমলতা সবসময় পদ্মজাকে বলতেন, মেট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার জন্য। পদ্মজার একবার মনে হচ্ছে সে ফার্স্ট ডিভিশন ফলাফল করবে। আরেকবার মনে হচ্ছে, সেকেন্ড ডিভিশনে চলে যাবে। সে এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের তালু চুলকাচ্ছে। এই মুহূর্তে মাকে খুব মনে পড়ছে। কতদিন হলো,দেখা হয় না। প্রথম প্রথম মায়ের জন্য প্রায় কাঁদতো সে। এখন অবশ্য মানিয়ে নিয়েছে। আছরের আযান পড়ছে। এখনও ফিরেনি আমির। পদ্মজা নামায পড়তে চলে যায়। নামায পড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এরপর যা দেখল, খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। আমিরের সাথে হেমলতা, পূর্ণা এসেছে। দুজনের পরনে কালো বোরখা। তিনজন আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে আসছে। মাথার উপর কড়া রোদ নিয়ে মরুভূমিতে সারাদিন হাঁটার পর পথিক তৃষ্ণার্ত হয়ে পানির দেখা পেলে যেমন আনন্দ হয়,ঠিক তেমন আনন্দ হচ্ছে পদ্মজার। ইচ্ছে হচ্ছে দুই তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যেতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। পদ্মজা উন্মাদের মতো দৌড়াতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার

সময় উল্টে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। তবুও দৌড় থামল না। সদর ঘরের সবাইকে তোয়াক্কা না করে বাড়ির বউ ছুটে বেরিয়ে যায়। হেমলতা কিছু বুঝে উঠার আগেই তার নয়নের মণি ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। পদ্মজার ছোঁয়ায় চারিদিকে যেন বসন্ত শুরু হয়। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে, ফোঁপাতে থাকল। পদ্মজা হেমলতার বুকে মাথা রেখে পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'এতদিনে আসতে মনে হয়েছে তোমাদের? এভাবে পর করে দিলে আম্মা? আর পূর্ণা,তুইতো আসতে পারিস। বোনকে মনে পড়ে না?'

শাড়ির আঁচল টেনে পদ্মজার মাথার চুল ঢেকে দিলেন হেমলতা। এরপর বললেন, 'মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আসা কী এতই সোজা?'

'তাহলে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর কী দরকার? যদি মা-বাবা সহজে না আসতে পারে।'

'আপা, আমার তোমাকে খুব মনে পড়ে।'পূর্ণা বাচ্চাদের মতো করে কাঁদছে। পদ্মজা পূর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, 'আমারও মনে পড়ে।'

হেমলতা পদ্মজার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, '৭৫০ মার্ক পেয়েছিস। স্টার মার্ক। ফার্স্ট ডিভিশন। এই খুশিতে আর কাঁদিস না।'

পদ্মজার চোখভর্তি জল। গাল,ঠোঁট চোখের জলে ভেজা। এমতাবস্থায় হাসল। তাকে মায়াবী ভোরের শিশিরের মতো দেখায়। হেমলতা অন্দরমহলের সদর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন, হাওলাদার বাড়ির বাকিরা তাকিয়ে আছে। তিনি পদ্মজাকে সরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসেন। ফরিনা বেগমের মুখ দেখে পদ্মজার ভয় হচ্ছে। উনার মুখ আগে আগে ছুটে। আম্মাকে কিছু বলবেন না তো?

হেমলতা সবাইকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আমির ধরে নিয়ে আসলো।'

মজিদ হাওলাদার বিনীত স্বরে বললেন, 'এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আজ আসবেন আগে জানলে, গরু জবাই করে রাখতাম।'

হেমলতা হাসলেন। বললেন, 'বলেছেন, এই অনেক।'

'বললেই হবে না। করতে হবে। কয়দিন কিন্তু থেকে যাবেন।'

'এটা বলবেন না। আজই ফিরতে হবে আমার। কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাব।'

'প্রথম বার আসলেন আর কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাবেন?'

'আবার আসব। অনেকদিন থেকে যাবো।'

'আজকের রাতটা থেকে যান।'

'আম্মা আজ থেকে যাও, আমার সাথে।'পদ্মজা অনুরোধ করে বলল।

হেমলতা হাসলেন। ফরিনা কিছু বলছেন না। ভ্রুকুটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হেমলতাকে ভেতরে ভেতরে ভয় পান। কেমন ধারালো চোখের দৃষ্টি। যেন, একবার তাকিয়েই ভেতরের সব দেখে ফেলতে পারে। আর চোখমুখের ভাব দেখলে মনে হয়, কোন দেশের রাজরানি। তার উপর আমির দরদ দেখিয়ে শ্বাশুড়ি নিয়ে এসেছে। ফরিনা বিরক্ত হচ্ছেন। হেমলতা ফরিনার দিকে তাকাতেই ফরিনা চোখ সরিয়ে নেন। হেমলতা ফরিনাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপা,কথা বলছেন না যে? আমার উপস্থিতি বিরক্ত করেছে খুব?'

হেমলতার কথার ফরিনা সহ উপস্থিত সবাই অস্বস্তিতে পড়ে যায়। ফরিনা হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'কী বলছেন আপা? বিরক্ত হইতাম কেরে? এই পরথম আইছেন। খুশিই হইছি।'

'তাই বলুন।'

'দরজায় দাঁড়ায়া গপ আর কতক্ষণ হইবো। ঘরে আহেন।'ফরিনা দ্রুত সটকে পড়েন। সদর ঘরে আগে আগে হেঁটে আসেন। হাঁপাতে থাকেন। বিড়বিড় করেন, 'মহিলা এত্ত চালাক। সত্যি সত্যি সব বুইঝা ফেলে।'

হেমলতা সবার আড়ালে শাড়ির আঁচল মুখে চেপে সেকেন্ড দুয়েক হাসলেন। হেমলতাকে হাসতে দেখে, পদ্মজাও হাসল। সবাই সদর ঘরে এসে বসে। লাবণ্য ও পদ্মজার

ফলাফল দেওয়ার উপলক্ষে শিরিন,শাহানাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তারা এখন হাওলাদার বাড়িতেই আছে। দুই বোন হেমলতা,পূর্ণার জন্য নাস্তা তৈরি করতে রান্নাঘরে গেল। লাবণ্য দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। আমির এখনও লাবণ্যর ফলাফল কাউকে বলেনি। সে সদর ঘর থেকে লাবণ্যকে ডাকল, 'লাবণ্য? এই লাবণ্য? শুনছিস? এদিকে আয়। আজ তোর খবর আছে।'

আমিরের কথা শুনে লাবণ্যর বুকের ধুকপুকানি থেমে যায়। এখুনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে অবস্থা। নিশ্চিত ফেইল করেছে! লাবণ্য চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকে,কখন সে মারা যাবে। আমির আবার ডাকল, 'বেরিয়ে আয় বলছি। নয়তো দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকব। তখন কিন্তু গায়ে মার বেশি পড়বে।'

লাবণ্য তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নামে। গায়ের ওড়না ঠিক করে দরজা খুলে। সদর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নামাযের সব সূরা পড়তে থাকে।

আমির চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই লাবণ্য কেঁপে উঠে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আগামী বছর মেট্রিকে পাশ করাম, কসম!'

'এই বছরই তো পাশ করেছিস! তাহলে আগামী বছর আবার মেট্রিক দিবি কেন?'

লাবণ্য চকিতে তাকাল। তার মুখটা হা হয়ে যায়। লাবণ্যর মুখের ভঙ্গি দেখে সবাই হাসল। লাবণ্য খুশিতে কেঁদে দিল। আমির লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে,মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আরেকটুর জন্য ফেইল করিসনি।'

লাবণ্য হাসতে হাসতে কাঁদছে। লাবণ্যর পাগলামি দেখে আমিরও হাসছে। তখন সদর ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান হাওলাদার। হেমলতা রিদওয়ানের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকান। হেমলতার চোখে চোখ পড়তেই রিদওয়ান বিব্রত হয়ে উঠে। চোখ সরিয়ে নেয়। একটু পর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে,হেমলতা তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। রিদওয়ান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এ যেন সাপুড়ে ও সাপের খেলা।

রাতের খাবার শেষ হয়েছে সবেমাত্র। এশার আযান পড়েছে অনেক আগে। পূর্ণা পদ্মজা ও লাবণ্যকে পেয়ে পুলকিত। আনন্দ বয়ে যাচ্ছে মনে। একটু পর পর উচ্চস্বরে হাসছে। হেমলতা একবার ভাবলেন নিষেধ করবেন,এতো জোরে হাসার জন্য। এরপর কী ভেবে আর নিষেধ করলেন না। তিনি বাড়ির বড়দের সাথে কথা বলছেন। আমির সবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বলল, 'আমার একটা কথা ছিল।'

সবাই আমিরের দিকে তাকাল। আমির নির্দ্বিধায় বলল, 'আগামীকাল ফিরব আমি।'

হেমলতা বললেন,

'ঢাকায়?'

'জি। পদ্মজাকে নিয়েই যাব। সাথে লাবণ্যও যাবে। দুজনকে কলেজে ভর্তি করে দেব।'

লাবণ্য পূর্ণার পাশ থেকে উঠে এসে,আমিরের পাশে দাঁড়াল। আবদার করে বলল, 'দাভাই,তুমি কইছিলা আমি পাশ করলে,আমারে দেশের বাইরে পড়তে পাঠাইবা।'

'ছেড়ি মানুষ বাইরে যাইতি কেন? কইলজাডা বড় হইয়া গেছে?'রেগে বললেন ফরিনা।

লাবণ্য মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে আমিরকে বলল, 'কথা রাখতে হইবো তোমার।'

আমিরে একবার মজিদকে দেখল। এরপর লাবণ্যকে বলল, 'সত্যি যেতে চাস?'

'হ।'

লাবণ্যর মাথায় গাট্টা মারল আমির। এরপর বলল, 'আগে শুদ্ধ ভাষাটা শিখ। এরপর দেশের বাইরে পড়তে যাবি।'

লাবণ্য আহ্লাদিত হয়ে বলল, 'পদ্মজা শিখায়া দিব।এইডা কোনো ব্যাপার না দাভাই।'

'আপাতত ঢাকা চল। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে অভ্যস্ত হ। এরপর সত্যি পাঠাব।'

'তুই পাগল হইয়া গেছস বাবু? এই ছেড়িরে একা বাইরে পাডাইয়া দিবি?'

'জাফর ভাই আছে, ভাবি আছে। সমস্যা নেই আম্মা। একটাই তো বোন আমার। নিজের মতো পড়াশোনা করুক।'

ফরিনা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। মজিদ কথা বলছেন না। মানে তিনিও আমিরের দলে। তাহলে আর কথা বলে কী হবে? এই সংসারে এমনিতেও তার দাম নেই। কেউ কথা শুনে না। নিজের মতোই বকবক করেন। ফরিনা উঠে চলে যান। হেমলতা বললেন, 'কালই চলে যেতে হবে? দুই-তিন দিন পর হবে না?'

আমির নম্র ভাবে বলল, 'না আম্মা। আমি আট বছর হলো ঢাকা গিয়েছি। এর মধ্যে এই প্রথম তিন মাসের উপর গ্রামে থেকেছি। ব্যবসা ফেলে এসেছি। আমার অনুপস্থিতিতে আলমগীর ভাইয়া সামলে ছিল। এখন তো ভাইয়াও চলে এসেছে। আর আমার ব্যবসা আমারই সামলানো উচিত। যত দ্রুত সম্ভব যেতে চাই। আপত্তি করবেন না।'

হেমলতা পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন, 'তাহলে আগামীকালই যাচ্ছো?'

'জি। আব্বা, আম্মাকে তো অনেক আগেই বলেছি। পদ্মজাও জানে। কিন্তু পদ্ম ভাবেনি সত্যি সত্যি যাব। দেখুন, কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কাল চলে যাব বলেই আজ আপনাকে নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা মেয়ের সাথে থাকেন। আবার কবে দেখা হয়!'

হেমলতা বেশ অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের কীসের ব্যবসা আজও জানলাম না।'

মজিদ অবাক হয়ে বললেন, 'আত্মীয় হলেন এতদিন এখনও জানেননি মেয়ের জামাই কীসের ব্যবসা করে! বাবু, এটাতো বলা উচিত ছিল?'

'আমিতো ভেবেছি জানেন। তাই বলিনি। আম্মা, আমাদের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস। মানে মালামাল বিভিন্ন দেশে আমদানি -রপ্তানি করা হয়। এ কাজে আব্বা, রিদওয়ান, ভাইয়া, চাচা আছে। তাছাড়া, নিম্নমানের দেশগুলো থেকে কম দামে পণ্য এনে

উন্নত দেশগুলোতে বেশি মূল্যে বিক্রি করি। সব পণ্য গোডাউনে রাখা হয়। আমাদের অফিসও আছে। গোডাউন আর অফিসের সব কাজ আমাকে সামলাতে হয়। বলতে পারেন, আমারই সব।'

'অনেক বড় ব্যাপার।'হেসে বললেন হেমলতা। তিনি জানতেন না আমির এতোটা বিত্তশালী। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস কম কথা নয়। এ সম্পর্কে মোটামুটি তিনি জানেন। কলেজ থাকাকালীন জেনেছেন।

পদ্মজাকে পূর্ণা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। পদ্মজা বলল, 'কথা বলছিস না কেন?"

'কাল চলে যাবা আপা?'

'তাই তো কথা হচ্ছে।'

'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে।'

'কাঁদছিস কেন? আসব তো আমি।'

'সে তো অনেক অনেক মাস পর পর।'

পদ্মজা কিছু বলতে পারল না। হেমলতা কথা বলছেন আমির আর মজিদের সাথে। খলিল,আলমগীর নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। বিকেল থেকে রিদওয়ানের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার উপর চোখ রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল, 'আম্মা খুব শুকিয়েছে। খায় না?'

'না। মাঝে মাঝে সারাদিন পার হয়ে যায় তবুও খায় না।'

'জোর করে খাওয়াতে পারিস না?'

'ধমক মারে। শুনে না কথা।'

'আম্মা ঘাড়ত্যাড়া।"

'ঠিক বলেছো।'

'উনি কেমন? ঝগড়া করে আম্মার সাথে?'

'উনিটা কে?'

'আব্বার প্রথম বউ।'

'তুমিতো দেখতেও যাওনি।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে চাইলেই যাওয়া যায় না। বল না, কেমন? আদর করে তোদের?'

'ভালো খুব। সহজ, সরল। আম্মাকে খুব মানে। প্রেমা-প্রান্তকে অনেক আদর করে। দেখতেও খুব সুন্দর। আগে সাপুড়ের বউদের মতো সাজতো। আমার পছন্দ না বলে এখন আর সাজে না।'

'তুই নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করিস?'

'এখন করি না। তুমি কাকে দিয়ে এতো খোঁজ রাখো?'

'সে তোর জানতে হবে না। তাহলে উনি ভালো তাই তো?'

'হুম।'

'মিলেমিশে থাকিস তাহলে।'

'ঢাকা যাওয়ার আগে দেখে যাও একবার।'

'বাপের প্রথম বউকে দেখার ইচ্ছে নেই আমার।'পদ্মজা থমথমে স্বরে বলল।

পূর্ণা বলল, 'আচ্ছা। আমি আজ তোমার সাথে ঘুমাব।'

'হুম ঘুমাবি। আম্মার খেয়াল রাখবি। আম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে,কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করে। সারাক্ষণ ভাবে। তুই কথা বলবি,সময় দিবি।'

'আমি তোমার মতো সব সামলাতে পারি না।'

'চেষ্টা করবি। ভোরে উঠে মগা ভাইয়াকে পাঠাব। আব্বা আর প্রেমা-প্রান্তকে নিয়ে আসতে। সবাইকে চোখের দেখা দেখে যাব।'

পূর্ণা পদ্মজাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কান্না পাচ্ছে খুব। কত দূরে চলে যাবে তার আপা! পদ্মজা অনুভব করে পূর্ণার ভেতরের আর্তনাদ। সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে

বলল, 'খুব দ্রুত আসব।'

পদ্মজা মাঝে শুয়েছে। তার দুই পাশে হেমলতা আর পূর্ণা। পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। আর পদ্মজা হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। হেমলতা নিরবতা ভেঙে পদ্মজাকে বললেন, 'পদ্ম?'

'হু, আম্মা?'

'শহরে নিজেকে মানিয়ে নিবি। শক্ত হয়ে থাকবি। আর মনে রাখবি, কেউ কারোর না। সবাই একা। সবসময় নিজের উপর বিশ্বাস রাখবি,নিজের উপর আস্থা রাখবি। সৎ পথে থাকবি। কখনো কারো উপর নির্ভরশীল হবি না। যদি তুই কারো উপর ভালো থাকার দায়িত্ব দিয়ে দিস,কখনো ভালো থাকবি না। নিজের ভালো থাকার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়। নিজেকে কখনো একা ভাববি না। যেখানেই থাকি আমি, আমার প্রতিটা কথা তোর সাথে মিশে থাকবে। ছায়া হয়ে থাকবে। আল্লাহ সবাইকে কোনো না কোনো উদেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হলে আর বেঁচে থাকার মানে থাকে না। মৃত্যুতে ঢলে পড়ে। আমার ইদানীং মনে হয়, আমার দায়িত্ব ছিল তোকে জন্ম দেয়া,বড় করে তোলা,বাস্তবতা দেখানো। সেই দায়িত্ব কতটুকু রাখতে পেরেছি জানি না। কিন্তু তোর দায়িত্ব অনেক বড় কিছু!'

পদ্মজা চাপা স্বরে বলল, 'কী সেটা?'

'জানি না।'

'তুমি এতো কী ভাবো আম্মা? মুখটা এরকম ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করবে। আমি পরেরবার এসে যেন দেখি,মোটা হয়েছো।

হেমলতা হাসলেন। সাদা ধবধবে দাঁত ঝিলিক মারে। তিনি পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'পরেরবার যখন আসবি একদম অন্য রকম দেখবি।'

'কথা দিচ্ছো?'

'দিচ্ছি।'

পদ্মজা হাসল। পূর্ণা বলল, 'আমাকেও জড়িয়ে ধরো আপা।'

পদ্মজা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে। আর হেমলতা দুই মেয়েকে একসাথে জড়িয়ে ধরেন। তারপর বললেন, 'এবার চুপচাপ ঘুম হবে। কোনো কথা না।'

মাঝরাতে হেমলতার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ খুলে কান খাড়া করে শুনেন,কেউ হাঁটছে। কাঁথা গা থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামেন। সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন। পায়ের শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে যান। সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা পুরুষের অবয়ব দেখতে পান। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলেন, 'রিদওয়ান?'

রিদওয়ান কেঁপে উঠে পিছনে ফিরল। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে,দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হেমলতা প্রশ্ন করলেন, 'এত রাতে এখানে কী করছো?'

'জ...জি হাঁটছিলাম।'

'এতো রাতে?'

'প্রায়ই হাঁটি। জিজ্ঞাসা করতে পারুন অন্যদের।'

হেমলতা রিদওয়ানকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে নিয়ে বলল, 'কোনোভাবে আমাকে খুন করতে এসেছো কী?'

রিদওয়ান থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'ন..না না! আপনাকে কেন খ..খুন করতে যাবো?'

'প্রমাণ সরাতে।'হেমলতার সহজ কথা।

রিদওয়ান হঠাৎই অন্যরকম স্বরে কথা বলল, 'সে তো আমিও একজন প্রমাণ। স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্বলন্ত প্রমাণ। আপনিও আমাকে খুন করে প্রমাণ সরাতে পারেন। যেহেতু দুজনই

একই পথের। কাউকে কারোর খুন করার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে অন্য কাজে এসেছি।'

হেমলতা কঠিন চোখে তাকান। পরপরই চোখ শীতল করে নিয়ে বললেন, 'শুভ রাত্রি।

রিদওয়ান হেসে হেলেদুলে হেঁটে চলে যায়। হেমলতা ঘরের ঢুকার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। হাঁটার পূর্বেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। ভাগ্যিস আওয়াজ হয়নি! তিনি হাতে ভর দিয়ে উঠার চেষ্টা করেন। বাম হাতের মাংস পেশি শক্ত হয়ে আছে। হাত নাড়াতে কষ্ট হয়। ভর দিয়ে উঠা আরো কষ্টদায়ক। তিনি ওভাবেই বসে থাকলেন অনেকক্ষণ।

পর্ব ৪৩

পাখিদের কলতানে পদ্মজার ঘুম ভাঙল। পদ্মজা জানালার ফাঁক গলে আসা দিনের আলো দেখতে পেল। সে তড়িঘড়ি করে উঠে বসে। অন্যদিন ফজরের আযানের সাথে সাথে উঠে পড়ে। আজ দেরি হয়ে গেল!

'পূর্ণাকে তুলে নিয়ে যা। একসাথে অযু করে নামায পড়তে বস।'

হেমলতার কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ঘুরে তাকাল। তিনি কোরআন শরীফ পূর্বের জায়গায় রেখে বললেন, 'পূর্ণাকে একটু বুঝ দিস। নামায পড়তে চায় না।'

'আচ্ছা, আম্মা।'

পদ্মজা পূর্ণাকে ডেকে নিয়ে কলপাড়ে যায়। এরপর দুই বোন একসাথে নামায পড়তে বসল। নামায শেষ করে হেমলতার সামনে এসে দাঁড়াল পদ্মজা। হেমলতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা হেমলতার চোখ দেখে বলল, 'আম্মা, তোমার চোখ এমন লাল হলো কেন?'

হেমলতা দুই চোখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'রাতে ঘুমাইনি তাই।'

পদ্মজা উৎকণ্ঠা, 'কেন? কেন ঘুম হয়নি? কীরকম দেখাচ্ছে তোমাকে। বিছানায় পড়াটাই শুধু বাকি।'

কিছু চুল পদ্মজার মুখের উপর চলে এসেছে। হেমলতা তা কানে গুঁজে দিয়ে আদরমাখা কণ্ঠে বললেন, 'আজ আমার মেয়ে চলে যাবে। তাই আমি সারারাত জেগে আমার আদরের মেয়েকে দেখেছি।'

হেমলতার কথা শুনে পদ্মজা আবেগী হয়ে উঠে। হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে কান্নামাখা কণ্ঠে বলল, 'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে। চলো আমার সাথে। একসাথে থাকব। তোমার না ইচ্ছে ছিল,আমাকে নিয়ে শহরে থাকার।

'পাগল হয়ে গেছিস! মেয়ের জামাইর বাড়িতে কেউ গিয়ে থাকে? ২-৩ দিন হলে যেমন তেমন।'

হেমলতার শরীরের উষ্ণতা পদ্মজাকে ওম দিচ্ছে। মায়ের উষ্ণতায় কী অদ্ভুত শান্তি! পদ্মজা কান্না করে দিল। হেমলতা পদ্মজার মুখ তুলে বললেন, 'সকাল সকাল কেউ কাঁদে? বাড়ির বউ তুই, শ্বাশুড়ি কী করছে আগে দেখে আয়। যা।'

পদ্মজা আরো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছছে। আবার ভিজে যাচ্ছে। বুকটা হাহাকার করছে। কত দূরে চলে যাবে সে!

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। পিছন থেকে শোনা যায়,হেমলতা বলছেন,

'বাচ্চাদের মতো করছিস কিন্তু।'

পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে। ঢোক গিলে নিজেকে শক্ত করল। এরপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। পদ্মজা ঘর ছাড়তেই হেমলতার চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্রুত জল মুছেন। পালঙ্কের দিকে চেয়ে দেখেন,পূর্ণা চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে। কখন ঘুমাল? হেমলতার হাসি পেয়ে গেল। তিনি কাঁথা দিয়ে পূর্ণাকে ঢেকে দিলেন।

পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকতেই ফরিনা মুখ ঝামটালেন, 'আইছো ক্যান? যাও ঘুমাও গিয়া।'

'কখন এতো দেরি হয়ে গেছে বুঝিনি।'মিনমিন করে বলল পদ্মজা'

'বুঝবা কেন? মা আইছে তো। হউরির লগে তো আর মায়ের মতো মিশতে মন চায় না।'

পদ্মজা অবাক হয়ে তাকাল। আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আমিতো মিশতেই চাই। আপনি সবসময় রেগে থাকেন।'

'মুখের উপরে কথা কইবা না। যাও এহন।'

পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায় চলে যাওয়ার জন্য। ফরিনা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'কইতেই যাইবাগা নাকি? জোর কইরা তো কাম করা উচিত। এই বুদ্ধিডা নাই?'

পদ্মজা স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন সে কাজ করার জন্য জোরাজুরি করে,কিন্তু ফরিনা করতে দেন না। এজন্যই সে এক কথায় চলে যাচ্ছিল। আর এখন কী বলছেন! সে ব্যাপারটা হজম করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। ফরিনা গলার স্বর পূর্বের অবস্থানে রেখেই বললেন, 'হইছে,কাম করতে হইব না। এরপর তোমার মায়ে কইবো দিনরাত কাম করাই তার ছেড়িরে। যাও। বারায়া যাও।'

পদ্মজা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লতিফা ঠোঁট চেপে হাসছে। ফরিনার এমন ব্যবহারের সাথে সে অভ্যস্ত। বেশ অনেকক্ষণ পর পদ্মজা বলল, 'আম্মা,আমি করবটা কী?'

পদ্মজা মাথা থেকে ঘোমটা সরে গেছে। মুখটা দেখার মতো হয়েছে। ফরিনা পদ্মজার মুখ দেখে হেসে ফেললেন। আবার দ্রুত হাসি লুকিয়েও ফেললেন। এই মেয়েটাকে তিনি অনেক আগেই ভালোবেসে ফেলেছেন। এতো শান্ত,এতো নম্রভদ্র! হেমলতাকে হিংসে হয়। হেমলতার গর্ভকে হিংসে হয়। পদ্মজার ঢাকা যাওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম ঘোর আপত্তি ছিল ফরিনার। কিন্তু এখন নেই। উপর থেকে যাই বলুন না কেন, তিনি মনে মনে চান পদ্মজা পড়তে যাক। অনেক পড়ুক। অনেক বেশি পড়ুক। এই মেয়ের জন্ম রান্নাঘরে রাঁধার জন্য নয়। রানীর আসনে থাকার জন্য। পদ্মজা ফরিনার দুই সেকেন্ডের মৃদু হাসি খেয়াল করেছে। সে সাহস পেল। ফরিনার কাছে এসে দাঁড়ায়। ফরিনা চোখমুখ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'ঘেঁষতাছো কেন?'

পদ্মজা শিমুল তুলোর ন্যায় নরম স্বরে বলল, 'আমার খুব মনে পড়বে আপনাকে। আপনার বকাগুলোকে। আপনি খুব ভালো।'

ফরিনা তরকারিতে মশলা দিচ্ছিলেন। হাত থেমে যায়। পদ্মজার দিকে তাকান। পদ্মজা বলল, 'আমি আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরব আম্মা?'

ফরিনা কিছু বলতে পারলেন না। এই মেয়েটা এতো অদ্ভুত, এতো ভালো কেন? পদ্মজার চোখের দিকে চেয়ে অনুভব করেন, কয়েক বছরের লুকোনো ক্ষত জ্বলে উঠেছে। ক্ষতরা পদ্মজার সামনে উন্মোচন হতে চাইছে। কোনোভাবে কী যন্ত্রনাদায়ক এই ক্ষত সারাতে পারবে পদ্মজা? ভরসা করা যায়? পদ্মজার মায়ামাখা দুটি চোখ দেখে বুকে এমন তোলপাড় শুরু হয়েছে কেন? ৩২ বছর আগের সেই কালো রাত্রির কথা কেন মনে পড়ে গেল? যে কালো রাত্রির জন্য আজও এই সংসার, এই বাড়িকে তিনি আপন ভাবতে পারেন না। প্রতিটি মানুষের সাথে বাজে ব্যবহার করেন। সেই যন্ত্রণা কেন বুক খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

উত্তরের আশায় না থেকে পদ্মজা জড়িয়ে ধরল ফরিনাকে। ফরিনা মৃদু কেঁপে উঠলেন। এরপর পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার বুকে মাথা রাখতেই টের পেল,ফরিনার বুক ধুকধুক, ধুকধুক করছে।

হাওলাদার বাড়ির থেকে ডানে দুই মিনিট হাঁটার পর ঝাওড়া নামের একটি খালের দেখা পাওয়া যায়। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাওলাদার বাড়ির সবাই। ট্রলার নিয়ে মাঝি অপেক্ষা করছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। পদ্মজা পরনে কালো বোরকা। লাবণ্য যাবে না। সকাল থেকে তার ডায়রিয়া শুরু হয়েছে। তিন-চার দিন পর আলমগীর ঢাকা নিয়ে যাবে। আজ আমির আর পদ্মজা যাচ্ছে। প্রেমা,প্রান্ত,মোর্শেদ,বাসন্তী সবাই সকালেই এসেছে। সবার সাথে কথা হয়েছে। পূর্ণা হেঁচকি তুলে কাঁদছে। হেমলতা পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক মতো পড়বি,খাবি। স্বামীর খেয়াল রাখবি। কাঁদবি না কিন্তু। একদম কাঁদবি না।'

'তুমি কাঁদছো কেন আম্মা?'

'না, না কাঁদছি না।'বলেও হেমলতা কেঁদে ফেললেন। পদ্মজার কান্নার বেগ বেড়ে যায়। বোরকা ভিজে একাকার। একদিকে মা অন্যদিকে তিন ভাই-বোন কেঁদেই চলেছে। হেমলতা নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন, পারছেন না। পদ্মজা বলল, 'আর কেঁদো না আম্মা। তুমি

অসুস্থ।'

হেমলতা ঢোক গিলেন কান্না আটকাতে। তারপর বললেন, 'কাঁদব না। সাবধানে যাবি। দেরি হচ্ছে তো। আমির,নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। যা মা। সাবধানে যাবি। নিয়মিত নামায পড়বি।'

পদ্মজা হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। পদ্মজার দেখাদেখি আমিরও করল। বাড়ির সব গুরুজনদের সালাম করে ট্রলারে পা রাখতেই হেমলতার কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দমালা ভেসে আসে, 'আমার প্রতিটা কথা মনে রাখবি। কখনো ভুলবি না। আমার মেয়ে যেন অন্য সবার চেয়ে গুণেও আলাদা হয়। শিক্ষায় কালি যেন না লাগে।'

পদ্মজা ফিরে চেয়ে বলল, 'ভুলব না আম্মা। কখনো না। তুমি চোখের জল মুছো। আমাদের আবার দেখা হবে।'

হেমলতা তৃতীয় বারের মতো চোখের জল মুছেন। এরপর হাত নেড়ে বিদায় জানান। ট্রলার ছেড়ে দেয়। পদ্মজা এক দৃষ্টে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমলতা চেয়ে থাকেন পদ্মজার দিকে। দুজনের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় বর্ষণ হচ্ছে। কাঁদছেন মোর্শেদ। তবে পদ্মজার জন্য কম,হেমলতার জন্য বেশি। হেমলতার দিনগুলো এখন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আরো কাঁদছেন ফরিনা। প্রতিদিন বাড়িজুড়ে একটা সুন্দর মুখ,সুন্দর মনের জীবন্ত পুতুল মাথায় ঘোমটা দিয়ে আর হেঁটে বেড়াবে না। আবারও মরে যাবে তার দিনগুলো। হারিয়ে যাবে সাদা কালোর ভীড়ে।

মাদিনী নদীর ঠান্ডা আদ্রতা বাতাসে মিশে ছুঁয়ে দিচ্ছে পদ্মজার মুখ। জল শুকাতে শুকাতে আবার ভিজে যাচ্ছে। আমির পদ্মজার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এবার তো থামো।'

আমিরের আলত ছোঁয়ায় পদ্মজা আরো প্রশ্রয় পেয়ে কাঁদতে থাকল। আমির বলল, 'এ তো আরো বেড়ে গেছে! থামো না। আমি আছিতো। আমরা ছয় মাস পর পর আসব। অনেকদিন থেকে যাবো।'

'সত্যি তো? কাজের বাহানা দেখাবেন না?'

'মোটেও না।'আমির পদ্মজার চোখের জল মুছে দিল। এরপর চোখের পাতায় চুমু দিল। পদ্মজা নুয়ে যায়। বলল, 'নদীর পাড় থেকে কেউ দেখবে।'

'কেউ দেখবে, কেউ দেখবে, কেউ দেখবে! এই কথাটা ছাড়া আর কোনো কথা পারে আমার বউ?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বলল, 'আমরা ট্রলার দিয়ে ঢাকা যাব?'

'সেটা সম্ভব না। কিছুক্ষণ পরই ট্রেনে উঠে যাবো।'

আমির পদ্মজাকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, আমিরকে হতবাক করে দিয়ে পদ্মজা ট্রলারের ভেতর ঢুকে গেল।

ট্রেনের বগিতে হেঁটে সামনে এগোচ্ছে আমির। তার এক হাতে লাগেজ অন্য হাতে পদ্মজার হাত। শক্ত করে ধরে রেখেছে,যেন ছেড়ে দিলেই হারিয়ে যাবে। পদ্মজার মুখ নিকাবের আড়ালে ঢেকে রাখা। সে এদিকওদিক তাকিয়ে আমিরকে প্রশ্ন করল, 'খালি সিট রেখে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'কেবিনে।'

ততক্ষণে দুজন ৭৬ নাম্বার কেবিনের সামনে চলে আসে। আমির দরজা ঠেলে পদ্মজাকে নিয়ে ঢুকল। চারটা বার্থ। চারজনের কেবিন বোঝাই যাচ্ছে। পদ্মজা বলল, 'আরো দুজন আসবে কখন? ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।'

'চার বার্থই আমাদের।'

পদ্মজা ডান পাশের বার্থে বসতে বসতে বলল, 'অনেক খরচ করেছেন।'

আমির লাগেজ জায়গা মতো রেখে পদ্মজার পাশে বসল। বলল, 'নিকাব খুলো এবার। কেউ আসছে না।'

পদ্মজা নিকাব খুলল। ঝমঝম শব্দ তুলে ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। আমির জানালা খুলে দিতেই পদ্মজার চুল তিরতির করে উড়তে থাকল। পদ্মজা দ্রুত দুই হাত মুখের সামনে ধরে, বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আমির বাম পাশের বার্থে বসে হাসল। বলল, 'হাত সরাও। দেখি একটু বউটাকে।'

পদ্মজা দুই হাত সরাল। ঠোঁটে আঁকা হাসি। চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে। চুল অবাধ্য হয়ে উড়ছে। আমির এক হাতের উপর থুতুনির ভর দিয়ে বলল, 'এই হাসির জন্য দুনিয়া এফোঁড় ওফোঁড় করতে রাজি।'

পদ্মজা দাঁত বের করে হাসল। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। আমির পদ্মজার পাশে এসে বসে,পদ্মজার চুল খোঁপা করে দিল। তারপর বলল, 'এবার বোরকাটা খুলে ফেল। গরম লাগছে না?'

পদ্মজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। আমির বলল, 'কেউ আসবে না পদ্মবতী। পৌঁছাতে বিকেল হবে। নিশ্চিন্তে শুধু বোরকা খুলতে পারো। আর কিছু খুলতে হবে না।'

পদ্মজার কান রি রি করে উঠে। আমিরের উরুতে কিল দিয়ে বলল, 'ছিঃ।'

আমির উচ্চস্বরে হেসে উঠল। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে বোরকা খুলে। এরপর জানালার ধারে বসে বলল, 'আমরা যে বাড়িতে যাচ্ছি,আর কে কে থাকে?'

'একজন দারোয়ান আর একজন বুয়া আছে। যে বাড়ি না তোমার বাড়ি।"

'উনারা বিশ্বস্ত?'

'নয়তো রেখে এসেছি?'

পদ্মজা কিছু বলল না। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে বসল। পদ্মজার কানের দুলে টোকা দিয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে বসে। শীতল একটা অনুভূতি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে স্বভাববশত বলে উঠে, 'কেউ দেখবে!'

আমির ভ্রুকুঞ্চন করে চোখ তুলে তাকায়। পদ্মজা বুঝতে পারে, সে ভুল শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেছে। জিহ্বা কামড়ে আড়চোখে আমিরকে দেখে হাসার চেষ্টা করল। আমির বেশ অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, পদ্মজার ঘাড়ে নাক ডুবিয়ে বলল, 'দেখুক। যার ইচ্ছে দেখুক।'

দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ। শব্দে পদ্মজার ঘুম ছুটে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে,মনে পড়ছে না। আমিরের কোলে তার মাথা ছিল। মানুষটা এতক্ষণ বসে ছিল? পদ্মজাকে এভাবে উঠতে দেখে আমির ইশারায় শান্ত হতে বলল। পদ্মজা দ্রুত নিকাব পড়ে নেয়। এরপর আমির দরজা খুলল। ঝালমুড়ি নিয়ে একজন লম্বা ধরণের লোক দাঁড়িয়ে আছে। নাকটা মুখের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। আমির বলল, 'এভাবে অনুমতি না

নিয়ে টোকা দেয়া অভদ্রতা। আমাদের দরকার পরলে আপনাদের এমনিতেই খুঁজে নিতাম। আর এমন করবেন না। আপনার জন্য আমার বউয়ের ঘুম ভেঙে গেছে। নিন টাকা। ঝালমুড়ি দেন।'

লোকটি বেশ আনন্দ নিয়ে ঝালমুড়ি বানিয়ে দিল। বোধহয় আর বিক্রি হয়নি। হতে পারে আমিরই প্রথম কাস্টমার। লোকটি চলে গেল। আমির কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপর পদ্মজাকে বলল, 'একজন লোক ঝালমুড়ি বিক্রি করতে এসেছিল। এই নাও খাও। এরপর আবার ঘুমাও।'

দুজনে একসাথে ঝালমুড়ি খেতে খেতে সুখ-দুঃখের গল্প শুরু করে। আমির তার শহুরে জীবনের গতিবিধি বলছে। কখন কখন বাসায় থাকে। কীভাবে ব্যবসায় সময় দেয়। পদ্মজা মন দিয়ে শুনছে। একসময় পদ্মজা বলল, 'একটা কথা জানার ছিল।'

'কী কথা?'

"আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের বাড়িতে লুকোনো কোনো ব্যাপার আছে। শুধু মনে হচ্ছে না, একদম নিশ্চিত আমি।'

আমির উৎসুক হয়ে ঝুঁকে বসল। আগ্রহভরে জানতে চাইল,"কীরকম?'

পদ্মজা আরো এগিয়ে আসে। আকাশে দুপুরের কড়া রোদ। ছলাৎ করে রোদের ঝিলিক জানালায় গলে কেবিনে ঢুকে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। বাতাস ভ্যাপসা গরম। মাঝে মাঝে শীতল,ঠান্ডা। সেসব উপেক্ষা করে পদ্মজা তার ভেতরের সন্দেহগুলো বলতে শুরু করল, 'রুম্পা ভাবিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি নিশ্চিত। কেন বন্দি করে রাখা হয়েছে সেটা দাদু জানেন। উনি সবসময় রুম্পা ভাবির ঘরের দরজায় নজর রাখেন। আমি অনেকবার ঢুকতে চেয়েছি,পারিনি। বাড়ির পিছনের জঙ্গলে কিছু একটা আছে। সেটা ভূত,জ্বীন জাতীয় কিছু না। অন্যকিছু। এমনটা মনে হওয়ার তেমন কারণ নেই। আমার অকারণেই মনে হয়েছে, জঙ্গলটা আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি আর ভয়ংকরও হয়নি। কেউ বা কারা এই জঙ্গলটিকে যত্ন করে তৈরি করেছে। ভয়ংকর করে সাজিয়েছে। এছাড়া, বাড়ির সবাইকে আমার সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

আমির একটুও অবাক হলো না,মুখের প্রকাশভঙ্গী পাল্টালো না। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'জানি আমি এসব।'

পদ্মজা আমিরের দুই হাত খামচে ধরে এক নিঃশ্বাসে বলল, 'আমাকে বলুন। অনুরোধ লাগে,বলুন। আমি শুনতে চাই। অনেকদিন ধরে নিজের ভেতর পুষে রেখেছি।'

আমির অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'আমার ধারণা তোমার ধারণা অবধিই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে কিছু জানি না। এই রহস্য খুঁজে বের করার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও আমি হজম করেছি। আমার ইচ্ছে মাটি চাপা দিয়েছি।'

আমিরের গলাটা কেমন শুনাল। পদ্মজা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, 'কেন? কেন দিয়েছেন?'

আমির হাসল। বলল, 'ধুর! এখন এসব গল্প করার সময়? শুনো, এরপর কী করব....'

পদ্মজা কথার মাঝে আটকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কথা ঘুরাবেন না। আমি খেয়াল করেছি,হাওলাদার বাড়ির প্রতি আপনি উদাসীন। কোনো ব্যাপার পাত্তা দেন না। সবসময় বাড়ির চেয়ে দূরে দূরে থাকেন। কোনো ঘটনায় নিজেকে জড়ান না। কেন নিজেকে গুটিয়ে রাখেন?'

আমিরের দৃষ্টি অস্থির। সে এক হাতে বার্থ খামচে ধরার চেষ্টা করে। ঘন ঘন শ্বাস নেয়। পদ্মজা খুব অবাক হয়! আমিরের এতো কষ্ট হচ্ছে কেন?

পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'কী হলো আপনার? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'

'না! কিছু হয়নি। এই পদ্মজা?'

আমির চট করে পদ্মজার দুই হাত শক্ত করে ধরল। চোখ দুটিতে ভয়। পদ্মজা আমিরের চোখের দিকে তাকাল। আমির বলল, 'আমার তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে।

অনেকবার বলতে গিয়েও পারিনি। আজ যখন কথা উঠেছে...আচ্ছা পদ্মজা, আমার পরিচয় জেনে আমাকে ছেড়ে যাবে না তো? আমি তোমাকে হারালে একাকীত্বে ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ হয়ে যাব। আমার জীবনের একমাত্র সুখের আলো তুমি।'

পদ্মজার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। সে পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারছে না। আমির উত্তরের আশায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ধীর কণ্ঠে বলল, 'লুকোনো সব কথা বলুন আমাকে। আপনি আমার স্বামী। আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনো ভাবি না আমি। বিশ্বাস করুন!'

আমির নতজানু হয়ে বলল, 'আমি আমার আব্বার অবৈধ সন্তান। আমার জন্মদাত্রী জন্ম দিয়েই মারা যায়। দিয়ে যায় অভিশপ্ত জীবন।'

পদ্মজা দুই পা কেঁপে উঠে। মাথা ভনভন করে উঠে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত গড়িয়ে যায়। আমির ঢোক গিলে আবার বলল, 'আমার জন্মদাত্রী মারা যাওয়ার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আমার বর্তমান আম্মা আমাকে দেখে খুব রেগে যায়। কিছুতেই আমাকে মানতে চায়নি। তখন ছেলেমেয়ে ছিল না আম্মার। তাই মাস ঘুরাতেই আমাকে মেনে নিল। ছেলের মতো আদর শুরু করল। এসব দাদুর মুখে পরে শুনেছি। আব্বা আমাকে তুলে এনে জায়গা দিলেও সন্তানের মতো ভালোবাসেননি কখনো। যখন আমার এগার বছর আমি আর রিদওয়ান একসাথে জানতে পারি,আমি আব্বার অবৈধ সন্তান। আব্বা আবার রিদওয়ানকে খুব আদর করতেন। রিদওয়ান ছোট থেকেই আমার সাথে ভেজাল করতো। ঝগড়া করতো। যখন এমন একটা খবর জানতে পারল,ও আরো হিংস্র হয়ে উঠে। আমি তখন অনেক শুকনো আর রোগা ছিলাম। রিদওয়ান স্বাস্থ্যবান, তেজি ছিল। আব্বার এমন ছেলেই পছন্দ। কেন পছন্দ জানি না। উনিশ থেকে বিশ হলেই রিদওয়ান খুব মারতো। আব্বার কাছে বিচার দিলে রিদওয়ান আরো দশটা বানিয়ে বলতো। তখন আব্বা আমাকে মারতেন। রিদওয়ান একবার আমাকে জঙ্গলে বেঁধে ফেলে রেখেছিল। দেড় দিন পড়ে ছিলাম। রাতে ভয়ে প্যান্টে প্রস্রাব করে দিয়েছি। মুখ বাঁধা ছিল। তাই এতো চিৎকার করেছি তবুও কেউ শুনেনি। ভয়ে বুক কাঁপছিল। মনের ভয় মিশিয়ে ভয়ংকর ভয়ংকর ভূত,দানব দেখেছি। বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না। দেড়দিনের সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন,ফকির মিয়া নামে একজন,উনি আমাকে জঙ্গলে বাঁধা অবস্থায় পান। বাড়িতে বৈঠক বসে। রিদওয়ানকে দুটো বেতের বারি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। রিদওয়ান এক তো বলিষ্ঠবান তার উপর আমার দুই বছরের বড়। কিছুতেই পেরে উঠতাম না।পানিতে ঠেসে ধরে রেখেছে অনেকবার। ওর মস্তিষ্ক অসুস্থ। আমার জীবন জাহান্নাম হয়ে উঠে। আম্মাকে বললেও আম্মা বাঁচাতে পারতেন না। সবসময় নিশ্চুপ। কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যখন আমার পনেরো বয়স শীতের রাতে পালিয়ে যাই। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। এরপরদিন চোখ খুলে দেখি,আমি হাওলাদার বাড়িতে। আমার সামনে রিদওয়ান, আব্বা,চাচা,আম্মা সবাই। বুঝে যাই,আমার কোনো জায়গা নাই আর। এখানেই থাকতে হবে। যতই কষ্ট হউক থাকতে হবে।'

আমিরের কণ্ঠে স্পষ্ট কান্না। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা হেঁচকি তুলে কাঁদছে। আমির অশ্রুসজল চোখ মেলে পদ্মজার দিকে তাকাল। হেসে ফেলল। পদ্মজার দুই চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, 'আরেএ পাগলি! কাঁদছো কেন? এসব তো পুরনো কথা। আমার পড়াশোনাটা আবার চলছিল ভালোই। আমি ভালো ছাত্র ছিলাম। এ দিক দিয়ে বুদ্ধিমান ছিলাম। সবসময় ভালো ফলাফল ছিল। এজন্য কদর একটু হলেও পেতাম। যখন আমার আঠারো বয়স বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করি। রাত করে অদ্ভুত কিছুর শব্দ শুনি। জঙ্গলে আলো দেখতে পাই। চাচাকে প্রায় রাতে জঙ্গলে যেতে দেখি। রিদওয়ান আর চাচা মিলে কিছু একটা নিয়ে সবসময় আলাপ করতো। ওদের চোখেমুখে থাকতো লুকোচুরি খেলা। আমি একদিন রাতে চাচাকে অনুসরণ করি। প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর চাচা দেখে ফেলে। এই ভুলের জন্য কম মার খেতে হয়নি সেদিন! তবুও বেহায়ার মতো কয়দিন

পর আবার অনুসরণ করি। রিদওয়ান পিছনে ছিল দেখিনি। আব্বা সেদিন অনেক মারল। দা ছুঁড়ে মারেন। এই যে থুতুনির দাগটা,এটা সেই দায়ের আঘাত। একসময় আব্বা আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। বললেন, আমাকে শহরে পাঠাবেন। পড়ালেখার জন্য। কোনো ব্যবসা করতে চাইলে তারও সুযোগ করে দিবেন। আমি যেন এই বাড়ি আর বাড়ির আশপাশ নিয়ে মাথা না ঘামাই। আমি মেনে নেই। রিদওনায়ের সাথে থাকতে হবে না আর। এর চেয়ে আনন্দের কী আছে? চলে আসি ঢাকা। শুরু হয় নিজের জায়গা শক্ত করার যুদ্ধ। এখানে এসেও অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। তবুও থেমে যাইনি। যুদ্ধ করে চলেছি। আমাকে বাঁচতে হবে। মানুষের মতো বাঁচতে হবে। কারো লাথি খেয়ে না। যখন আমার তেইশ বছর,তখন থেকে আমার কদর বেড়ে যায়। ব্যবসায় মোটামুটি সফল হয়ে যাই। ভাগ্য ভালো ছিল আমার। অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে নিরাশ করেনি। তখন আব্বা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রিদওয়ান আগের মতো হাত তুলার সাহস পায় না। সেই আমি আজ এই জায়গায়। এখন আমার যে অবস্থান হাওলাদার বাড়ির কারোর সাহস নেই আমার চোখের দিকে তাকানোর। আমি চাইলেই শোধ নিতে পারি। কিন্তু নেব না। তারা থাকুক তাদের মতো। রিদওয়ান ছোটবেলা যা করেছে, মেনে নিয়েছি। এখন তোমার দিকেও নজর দিয়েছে। ওর নজর আমার বাড়িগাড়ি,অফিস-গোডাউনেও আছে। আমি টের পাই। ও পারলে আমাকে খুন করে দিত। কিন্তু পারে না। আমার ক্ষমতার ধারেকাছেও ওর জায়গা নেই। এখন আমার নিজের এক বিশাল রাজত্ব আছে। আমার অহংকার করার মতো অনেক কিছু আছে। হাওলাদার বাড়ির কেউ কেউ মিলে আমাকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করছে। আমি নিশ্চিত। তাই হাওলাদার বাড়িতে আমি থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। আম্মা ছাড়া ওই বাড়ির সবার ভালোবাসা মুখোশ মাত্র। আমার দরকার ছিল একজন ভালো মনের সঙ্গিনী। আমি পেয়ে গেছি আর কিছু দরকার নেই। আমি আমার অর্ধাঙ্গিনীকে তার আসল সংসারে নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমার মন শান্ত। কোনো চিন্তা নেই। খুব বেশি সুখী মনে হচ্ছে।'

আমির পদ্মজার হাতে চুমু খেল। পদ্মজা তখনও কাঁদছে। সে আচমকা আমিরকে জড়িয়ে ধরল। গভীরভাবে,শক্ত করে। এরপর কান্নামাখা কণ্ঠে বলল, 'আমি কখনো আপনাকে কষ্ট দেব না। কোনোদিন না। কেউ আপনাকে ছুঁতে আসলে আমি তার গর্দান নেব। আমি উন্মাদ হয়ে তাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করব।'

'কারো সেই ক্ষমতা নেই আর। মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো।'

পদ্মজা আরো শক্ত করে ধরার চেষ্টা করে। আমির পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'এই প্রথম আমার বউয়ের গভীর আলিঙ্গন পেলাম। ভালো লাগছে। ছেড়ো না কিন্তু।'

প্লাটফর্মে হাঁটছে ওরা। আমির পদ্মজার এক হাত ধরে রেখেছে। খুব দ্রুত হাঁটছে। পদ্মজা তাল মেলাতে পারছে না। চেষ্টা করছে। মোটরগাড়ি নিয়ে একজন কালোচশমা পরা লোক অপেক্ষা করছিল। আমির সেখানে গিয়ে থামে। লোকটা সালাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ব্যাগ জায়গামতো রাখে। আমির আগে পদ্মজাকে উঠতে বলল। পদ্মজা অবাক হয়। এরকম গাড়ির সাথে সরাসরি পরিচয় নেই তার। কিন্তু প্রকাশ করল না। আমিরের কথামতো গাড়িতে উঠে বসল। এরপর আমির উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করে। আমির পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাদের নিজস্ব গাড়ি। কথা ছিল কিন্তু, আমার গাড়ি দিয়ে রাতবেরাতে যখন তখন ঘুরতে বের হবো।'

পদ্মজা কিছু বলল না। সে উপভোগ করছে নতুন জীবন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে। কালো চশমা পরা লোকটা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে আমিরের ডান পাশের দরজা খুলে দিল। আমির পদ্মজাকে নিয়ে নামল। পদ্মজা বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হয়। দ্বৈত(ডুপ্লেক্স) বাড়ি। একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে সালাম দিল। পদ্মজার সাথে পরিচিত হলো। এরপর আসে একজন মধ্যবয়স্ক নারী। ইনি বোধহয় বাড়ির কাজের লোক। সবাই

একসাথে বাড়ির ভেতর ঢুকল। পদ্মজা তার নতুন বাড়ি মন দিয়ে দেখছে। পূর্ব দিক থেকে সদর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল বিশাল বৈঠকখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ পাশে বারান্দা তাতে নানা ধরনের ফুল ফুটে আছে টবের মধ্যে, মনে হবে যেন একটা ছোটোখাটো বাগান। বৈঠকখানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণার দিকে বেশ বড় শোবার ঘর। পদ্মজা প্রশ্ন করার আগে আমির বলল, 'না,এটা আমাদের ঘর না।'

উত্তর পশ্চিম কোণার দিকে রান্নাঘর এবং টয়লেট। আর এই দুয়ের মাঝে মানে বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের মাঝখানটায় খাওয়ারঘর(ডাইনিং)। বৈঠকখানার মাথার উপর দিকে তাকালে সেখানে সোনালী কালারের ঝাড়বাতি ঝুলছে। বৈঠকখানার উত্তর দিকে একটা সিঁড়ি সাপের মত পেঁচিয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে সেদিকে হাঁটে। সিঁড়ি পেরুনোর পর হাতের বাঁ দিকে অনেক বড় একটা শোবার ঘর। দামী,দামী জিনিসে সৌন্দর্য আকাশছোঁয়া। দুজন একসাথে ঢুকে। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে সবকিছু দেখছে। আমির বলল, 'গোসল করে নাও?'

পদ্মজা বোরকা খুলে কলপাড় খুঁজতে থাকল। আমির গোসলখানার দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'এইযে এদিকে।'

দুজন একসাথে ফ্রেশ হয়ে রুম থেকে বের হলো। পদ্মজা দুই তলাটা আরেকটু দেখার জন্য ডানদিকে মোড় নিল। প্রথমে চোখে পড়ল বড় ব্যালকনি। এরপর আরেকটা শোবার ঘর। ব্যালকনিতে লতাপাতার ছোট ছোট টব।

বিরাট অট্টালিকায় সুখের সাথে কেটে যায় পাঁচ মাস। লাবণ্য দেশ ছেড়েছে দুই মাস হলো। বুয়া কাজ ছেড়েছে তিন মাস। পদ্মজা আর কাজের লোক নিতে দিল না। সে এক হাতেই নাকি সব পারবে। তবুও আমির একটা ১২-১৩ বছর বয়সী মেয়ে রেখেছে সাহায্যের জন্য। ভোরের নামায পরে রান্নাবান্না করে পদ্মজা। এরপর শাড়ি পাল্টে নেয়। কলেজে যাওয়ার জন্য। আমিরকে ব্লেজার,টাই পরতে সাহায্য করে। প্রথম যেদিন আমিরকে ব্লেজার পরতে দেখেছিল,অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই পোশাকের নাম কী? আপনাকে খুব বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

আমির হেসে জবাব দিয়েছিল, 'ব্লেজার। বাইরে থেকে আনা।'

এমন অনেক কিছুই পদ্মজার অজানা ছিল। সবকিছু এখন তার চেনাজানা। এই বিলাসবহুল জীবন বেশ ভালো করেই উপভোগ করছে। মানুষটা সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তবুও ফাঁকেফাঁকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। পদ্মজাকে নিয়ে গোডাউন দেখিয়েছে,অফিস দেখিয়েছে। সবকিছু সাজানো, গোছানো। গোডাউনে বিভিন্ন ধরণের পণ্য। কত কত রকমের দ্রব্য। পদ্মজা জীবনে ভালোবাসা এবং অর্থ দুটোই চাওয়ার চেয়েও বেশি পেয়েছে।

সকাল নয়টা বাজে। আমির তাড়াহুড়ো করছে, তার নাকি আজ দরকারি মিটিং আছে। পদ্মজা শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে দৌড়ে দৌড়ে খাবার পরিবেশন করছে। আমির দুই তলা থেকে নেমেই বলল, 'আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলেজ চলে যেও।'

'আরেএ, খেয়ে যাবেন তো।'

'সময় নেই। আসছি।'

'খেয়ে যান না।'

'বলছি তো, তাড়া আছে। জোরাজুরি করছো কেন?'

আমির দ্রুত বেরিয়ে যায়। পিছু ডাকতে নেই,তাই পদ্মজা ডাকল না। মনাকে ডেকে বলল, 'খেয়ে নাও তুমি।'

মনা পদ্মজার সাহায্যকারী। পদ্মজার ছোটখাটো ফরমায়েশ পালন করে। পদ্মজা বৈঠকখানায় গিয়ে বসে। আজ কলেজে যেতে ভালো লাগছে না। ভোরে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝুম বৃষ্টি। অকারণে মন

বিষণ্নতায় চেয়ে আছে। অকারণেও না বোধহয়! আমির বিরক্ত হয়ে কথা বলেছে,এজন্যই বোধহয় মন আকাশে বৃষ্টি নেমেছে। পদ্মজা পুরোটা দিন উপন্যাস পড়ে কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে কলিং বেল বাজে। পদ্মজা দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিল। আমির দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে বাতাস। পদ্মজা বলল, 'আসুন।'

আমির ভেতরে আসে না। সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। পদ্মজা কপাল কুঁচকাল। বলল, 'কী হলো? আসুন।'

আমির চট করে পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। পদ্মজা চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কেউ দেখবে।'

আমির মনাকে ডাকল, 'মনা? কই রে? দেখে যা।'

'আপনি ওকে ডাকছেন কেন?'

'এবার কাউকে দেখাবই।'

'উফফ! আল্লাহ,ছাড়ুন।'

'মনা? মনা?'

মনা দুই তলা থেকে নেমে আসে। আমির মনাকে দেখে বলল, 'এই দেখ তোর আপারে কোলে নিয়েছি। দাঁড়া,তোর সামনে একটু আদর করি।'

পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। চাপাস্বরে বলল, 'মনা কী ভাববে! আমি আর বলব না,কেউ দেখবে। ছেড়ে দিন।'

আমির পদ্মজাকে নামিয়ে দিল। মনা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। আমির বলল, 'যা ঘরে যা।'

মনা যেন এইটা শোনার অপেক্ষায় ছিল। দৌড়ে চলে যায়। পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমিরকে গুরুজনদের মতো বলল, 'আক্কেলজ্ঞান কখন হবে আপনার? বয়স তো কম হলো না।'

অবিকল পদ্মজার কথার ধরণ অনুসরণ করে আমির বলল, 'আর কতদিন কেউ দেখবে কথাটা মুখে থাকবে? বিয়ের তো কম দিন হলো না।'

'আপনি...আপনি কালাচাঁদ না কালামহিষ।'

'এটা পূর্ণা বলতো না? হেহ,আমি মোটেও কালো না।'

'তো কী? এইযে দেখুন,দেখুন। আমার হাত আর আপনার হাত।'

পদ্মজা হাত বাড়িয়ে দেখায়। আমির খপ করে পদ্মজার হাত ধরে চুমু খেয়ে বলল, 'এই হাতও আমার।'

পদ্মজা বলল, 'ঠেসে ধরা ছাড়া আর কিছু পারেন আপনি? ছাড়ুন।'

আমির পদ্মজার হাত ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকল।

দেখতে দেখতে চলে এসেছে শীতকাল। সকাল দশটা বাজে। অথচ,কুয়াশার চাদরে চারিদিক ঢাকা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। মনটা কু গাইছে। বুকে অজানা একটা ঝড় বইছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। ঢাকা আসার পর থেকে নিয়মিত পূর্ণার লেখা চিঠি পেত। প্রায় চার মাস হলো বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসছে না। পদ্মজা নয়টা চিঠি পাঠিয়েছে। একটারও উত্তর আসেনি। বাড়ির সবার কথা খুব মনে পড়ছে। ব্যালকনি ছেড়ে রুমে চলে আসে পদ্মজা। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে। হাওলাদার বাড়িতে টেলিফোন এনেছে। পূর্ণা হাওলাদার বাড়িতে এসে পদ্মজার সাথে যোগাযোগ করে। পদ্মজা কথা বলতেই ওপাশ থেকে পূর্ণার উল্লাস ভেসে আসল, 'আপা? আপা আমি তোমার গলার স্বর শুনতেছি। তুমি শুনছো?'

'শুনছি। কেমন আছিস? আম্মা কেমন আছে? বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'সবাই ভালো। তুমি কেমন আছো? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার গলার স্বর শুনছি!'

'আচ্ছা, শোন?'

'বলো আপা।'

'আশেপাশে কেউ আছে?'

'খালাম্মা আছে।'

'এই বাড়িতে আর আসবি না। আমি যতদিন না আসব। মনে রাখবি?'

'কেন? কেন আপা?'

'মানা করেছি, শুনবি।'

'আচ্ছা, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এবার প্রতিদিন দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসব। আর তোমার সাথে কথা বলব। ধুর!'

'আবার যখন আসব আমাদের বাড়িতে টেলিফোন নিয়ে আসব। এরপর প্রতিদিন আমাদের কথা হবে। এখন আমার মানা শোন।'

'টাকা কই পাবে?'

'সেদিন উনি বলেছেন, নিয়ে আসবেন। আমি মানা করেছিলাম। বললেন, তুমি আনন্দে থাকলেই আমার সুখ। তোমার সুখের জন্যই এখন আমার সব। আর কী বলার?'

'দুলাভাই খুব ভালো তাই না আপা?'

'হুম। আম্মার শরীর সত্যি ভালো আছে?'

'আছে। আগের চেয়ে ভালো।'

'খেয়াল রাখিস আম্মার।'

'রাখব।'

বাতাসটা বেড়েছে। পদ্মজার গা কাঁটা দিচ্ছে। আচমকাই ঘুমটা ভেঙে যায়। চট করে উঠে বসে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল,টেলিফোন নেই। একদম বাস্তবের মতো অনুভূতি হচ্ছিল। পদ্মজা দেয়াল ঘড়িতে দেখে, এগারোটা বাজে। টেলিফোন পুরো দেশে হাতেগোনা কয়জনের বাসায় আছে। সেখানে গ্রামে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে ভাবা হাস্যকর।

পদ্মজা বিছানা ছেড়ে ড্রয়িংরুমে চলে আসে। কপালে হাত দিয়ে দেখে গায়ে জ্বর এসেছে।পূর্ণার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। রান্নাঘরে যেতে যেতে ডাকল, 'মনা?'

পরক্ষণেই মনে পড়ল,মনা বাসায় নেই। দুইদিন আগে বাড়িতে গিয়েছে। খুব একা লাগছে তার। সবকিছুই রান্না করা আছে। আর কী রাঁধবে? এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া যায়। পদ্মজা এক কাপ চা নিয়ে ড্রয়িংরুমের জানালার পাশ ঘেঁষে বসল। গ্রামের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। মোর্শেদ প্রথম যেদিন সোয়েটার কিনে দিয়েছিলেন সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। সকাল সকাল উঠে খেজুরের রস দিয়ে পিঠা খাওয়া। কত

লোভনীয় সেই দিনগুলো। কলিং বেল বেজে উঠল।

অসময়ে কলিং বেল শুনে পদ্মজা অবাক হলো। আমিরতো এখন আসবে না। দুই ঘন্টা আগেই বের হলো। তাহলে কে এসেছে? গায়ে শাল টেনে নিল সে। এরপর দরজা খুলল। দরজার সামনে আমির দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'এতো দ্রুত?'

'তৈরি হও, বাড়িতে যাব।'

পদ্মজা চোখের পলক ফেলে আবার তাকাল। বলল, 'বাড়িতে মানে অলন্দপুর?'

আমির দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'হুম। দ্রুত যাও। শাড়ি পাল্টাও।'

পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'হুট করে যে! কোনো খারাপ খবর?'

আমির হেসে বলল, 'তেমন কিছুই না। কয়দিন ধরে দেখছি মন খারাপ করে বসে থাকো। তাই হুট করে যাওয়ার কথা ভাবলাম। তোমার কলেজ তো শীতের বন্ধই আছে। আমি এক সপ্তাহর জন্য ম্যানেজারকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আলমগীর ভাইয়া এসেছে। কোনো চিন্তা নেই। এবার দ্রুত যাও। ট্রেন বারোটায়। আজকের শেষ ট্রেন কিন্তু এটাই। আমি তৈরি আছি। শুধু লাগেজে দুই তিনটা শার্ট ঢুকিয়ে নিলেই হবে।'

পদ্মজা আর কিছু বলল না। ছুটে যায় দুই তলায়। তার হৃৎপিণ্ড খুশিতে দামামা বাজাচ্ছে। দশ মিনিটের ব্যবধানে শাড়ি পাল্টে, লাগেজও গুছিয়ে ফেলে। দুজন বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্য অলন্দপুর। দীর্ঘ আট মাস পর জন্মস্থান, জন্মদাত্রী, জন্মদাতা,ভাই-বোন সবাইকে দেখতে পাবে পদ্মজা। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা এতোটাই কাজ করছে যে,শীতের প্রকোপ টের পাচ্ছে না সে।

কেবিনে ঢোকার পর থেকে বার বার এক কথাই বলে চলেছে পদ্মজা, 'কতদিন পর যাচ্ছি! আম্মা হুট করে আমাকে দেখে জ্ঞান না হারিয়ে ফেলে। পূর্ণা নিশ্চিত জ্ঞান হারাবে।'

আমির হাসল। পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, 'আসো গল্প করি।'

পদ্মজার তাকাল। তার চোখ দুটি হাসছে। চিকমিক করছে। সে প্রশ্ন করল, 'আলমগীর ভাইয়া আমাদের বাসায়ই উঠবেন?'

'না। অফিসেই থাকবে।"

'রানি আপা ভালো আছে? কিছু বলছে?'

আমির চুল ঠিক করতে করতে ব্যথিত স্বরে বলল, 'ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাচ্চা নষ্ট করতে দিল না। এরপর মৃত বাচ্চা জন্ম দিল। এখন অবস্থা আরো করুণ। ঘরেই বন্দী।'

'ইশ! খারাপ লাগে ভাবলে। মানুষের কপাল এতো খারাপ কী করে হয়!'

মোড়ল বাড়ির সড়ক দেখা যাচ্ছে। পদ্মজা খুশিতে আত্মহারা। দ্রুত হাঁটছে। সে কখনো বাহারি শাড়ি, বোরকা পরে না। আজ পরেছে। শাড়ি বোরকা দুটোতেই ভারী কাজ,চকচক করা ছোট-বড় পাথর।। দেখলে মনে হয়,হীরাপান্না চিকচিক করছে। সে তার মাকে দেখাতে চায়,সে কতোটা সুখী। কোনো কমতি নেই তার জীবনে। মোড়ল বাড়ির গেইট ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সব আনন্দ,উল্লাস নিভে যায়। পূর্ণা,প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকে চেনা যাচ্ছে না। শুকিয়ে কয়লা হয়ে গেছে।

চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গাল ভাঙা। গায়ে শুধু হাড্ডি। মনে হচ্ছে কতদিন অনাহারে কাটিয়েছে। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই'আপা'বলে কেঁদে উঠল। ছুটে না এসে মাটিতে দপ করে শব্দ তুলে বসে পড়ল। প্রেমা দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে থাকল। পদ্মজা বাকরুদ্ধ। অজানা আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ দুটো খুঁজতে থাকল মাকে। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের চোখ অস্থির। পদ্মজা প্রেমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আড়চোখে দেখে,পূর্ণা হাউমাউ করে কাঁদছে। কেন আসছে না ছুটে? কীসের এতো কষ্ট ওর?

পদ্মজা এগিয়ে আসে। পূর্ণাকে টেনে তুলে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'এতো শুকিয়েছিস কেন?

আম্মা…আম্মা ভালো আছে?'

'আপা…আপারে।'বলে পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পূর্ণা। পদ্মজা ঘরের ভেতর তাকায়। কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। অজ্ঞাত ভয়ে গলা দিয়ে কথা আসছে না তার। পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর ঢুকল পদ্মজা। সদর ঘরে চেনা অনেকগুলো মুখ। প্রতিবেশী সবাই। আপন মানুষগুলো কোথায়? পদ্মজা আরো দুই পা এগিয়ে আসে। উঠান থেকে মনজুরার কণ্ঠ ভেসে আসে, 'পদ্ম আইছে,পদ্ম…'

সদর ঘরের মধ্যখানে পাটিতে শুয়ে আছেন হেমলতা। গায়ের উপর কাঁথা। মেরুদণ্ড সোজা করে শুয়ে আছে। গোলাপজলের ঘ্রাণ চারপাশে। পদ্মজার বুকের হাড়গুলো যেন গুড়োগুড়ো হতে শুরু করল। বুকে এতো ব্যাথা হচ্ছে! সে হেমলতার পাশে বসল। নিস্তরঙ্গ গলায় ডাকল, 'আম্মা? ও আম্মা?'

হেমলতা পিটপিট করে তাকান। চোখ দুটি ঘোলা। গাল ভেঙে গেছে। চোখ দুটি গভীর গর্তের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার পথে। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। চিনতে পারলেন না। পদ্মজা হেমলতার এক হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল। দুই ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে হেমলতার হাতে। তাতেও হেমলতার ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিজের মতো ঘরের ছাদে তাকিয়ে আছেন। মনজুরা সদর ঘরে ঢুকেই বিলাপ শুরু করেন মাত্র,পদ্মজা জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ করো। কেউ কাঁদবে না। চুপ করো।'

সবার কান্না থেমে যায়। পদ্মজা হেমলতাকে বলল, 'ও আম্মা? কথা বলো? আমি… আমি তোমার পদ্মজা। তোমার আদরের পদ্মজা।'

'আম্মা চারমাস ধরে কাউকে চিনে না আপা।'পূর্ণা ডুকরে কেঁদে উঠল। পদ্মজার চোখ পড়ে সদর ঘরের কোণে। মোর্শেদ কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না একদমই। পিঠের হাড্ডি ভেসে আছে। পদ্মজা বাকহীন হয়ে পড়েছে। কিছু বলবে নাকি কাঁদবে? বুকে কেমন যেন হচ্ছে! শরীরের শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। পদ্মজা দুই হাতে হেমলতার মাথা তুলে ধরল। হেমলতা তাকান। নিষ্প্রাণ চাহনী। হেমলতার মাথাটা পদ্মজা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। আকুল ভরা কণ্ঠে বলল,একবার কথা বলো আম্মা? একবার দুই হাতে জড়িয়ে ধরো।'

হেমলতার হাত দুটো নেতিয়ে আছে মাটির উপর। পূর্ণা খেয়াল করে হেমলতার হাত দুটি কাঁপছে। চেষ্টা করছে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরার কিন্তু পারছেন না। তাহলে কী পদ্মজাকে চিনতে পেরেছেন? পদ্মজা কাঁদতে থাকল। অনেকে অনেক কিছু বলছে। কারো কথা কানে ঢুকছে না। শুধু বুঝতে পারছে,এই পৃথিবীর বুক থেকে তার মা হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে হেমলতা। হারিয়ে যাচ্ছে তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানী। স্বপ্ন তো সব পূরণ হয়নি! এ তো কথা ছিল না। তবে কেন এমন হচ্ছে? পদ্মজার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে। কাঁপা ঠোঁটে হেমলতার পুরো মুখে চুমু খেল পদ্মজা। ভারি করুণ ভাবে বলল, 'ও আম্মা? কোথায় হারালো তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঝাঁঝালো কণ্ঠ?'

কেটে যায় অনেকটা মুহূর্ত। কাছের মানুষেরা ছাড়া আর কেউ নেই। কারো মুখে রা নেই। হেমলতার মতোই সবাই বাকহীন, স্তব্ধ। কেউ খায়নি। বাসন্তী গুপ্ত ব্যাথা নিয়ে রেঁধেছেন। প্রেমা-প্রান্ত,আমির ছাড়া কেউ খেল না। পদ্মজাকে অনেক জোরাজুরি করেছে আমির। পদ্মজা খেল না। আমিরও আর ঘাঁটল না। পদ্মজা জানতে পারল, দুই মাস ধরে হেমলতা বিছানায় পড়ে আছেন। এক দুটো কথা বলেন মাঝে মাঝে। চারদিন ধরে তাও বলেন না। গতকাল ভোরে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়েছে। এমন অবস্থা হয়েছিল, সবাই ভেবেছিল আত্মাটা বেরিয়েই যাবে। হাওলাদার বাড়ি থেকে সবাই দেখতে আসে। তখন জানা যায়,আলমগীর ঢাকা যাচ্ছে। মোর্শেদ অনুরোধ করে বলে,পদ্মজা আর আমিরকে খবর দিতে। ওরা যেন দ্রুত চলে আসে। রাতের ট্রেনে সকালে গোডাউনে পৌঁছে আলমগীর। আমিরকে সব বলে। আমির সব শুনে আর দেরি করেনি। পদ্মজাকে নিয়ে চলে আসে। পথে

কান্নাকাটি করবে,তাই কিছু বলেনি। পদ্মজা এতসব জেনে কিছু বলল না। অভিমানের পাহাড় তৈরি হয়েছে মনে। কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। সারাক্ষন চেষ্টা করছে,হেমলতার সাথে কথা বলার। হেমলতা কিছুতেই কথা বলছেন না। একটু-আধটু পানির বেশি আর কিছুই খাচ্ছেন না। গায়ে মাংস বলতে নেই। চামড়া ঝুলে গেছে। পদ্মজা হেমলতার পুরো শরীর মুছে দিয়ে কাপড় পাল্টে দিল। এরপর শোয়া অবস্থায় অযু করাল। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে আরো একবার আকুতি করল, 'একবার কথা বলো আম্মা। একবার ডাকো পদ্মজা বলে।'

হেমলতা তাকালেন। কিছু বললেন না। তাকিয়েই রইলেন। মাঝরাতে সবাই যখন ঘুমে,পদ্মজা জেগে। ক্লান্ত হয়ে সবার চোখ দুটি লেগে গেলেও,তার চোখ দুটি পলকও ফেলছে না। মনে হচ্ছে,কে যেন চারপাশে ঘুরছে তার মাকে নিয়ে যেতে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শেয়ালের হাঁক ছাপিয়ে সে যেন কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অবচেতন মন, আজরাইলের উপস্থিতি অনুভব করছে। পদ্মজার বুকে ভয় জেঁকে বসে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। এদিকওদিক তাকিয়ে কেঁদে অনুরোধ করে, 'অনুরোধ করছি,আমার মাকে কষ্ট দিবেন না।'

মুখে হাত চেপে কান্না আটকানোর প্রচেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হতে থাকল পদ্মজা। কাঁদতে কাঁদতে কণ্ঠ নিভে এসেছে। ঠান্ডায় শরীর জমে গেছে। চোখটা লেগেছে মাত্র,তখনি দপদপ একটা শব্দ ভেসে আসে। পদ্মজা চমকে তাকাল। হেমলতা হাত দিয়ে মাটি থাপড়াচ্ছেন। শরীর কাঁপছে। পদ্মজার নিঃশ্বাস থেমে যায়। হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'আম্মা,আম্মা যেও না আমাকে ছেড়ে। ও আম্মা। আম্মা...আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? আম্মা পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে যেও না। আম্মা...আম্মা।'

পদ্মজা দ্রুত হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সবার ঘুম ছুটে যায়। একসাথে করুণ কান্নার স্বরে ভেসে উঠে মোড়ল বাড়ি। পদ্মজা কাউকে অনুরোধ করে বলে, 'নিয়েন না আমার আম্মাকে। কষ্ট দিচ্ছেন কেন এতো? আমার আম্মার কষ্ট হচ্ছে। আম্মা। ও আম্মা। আম্মা আমাকে ছেড়ে যেও না।'

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে সূরা ইয়াসিন পড়া শুরু করল। হেমলতা শেষবারের মতো উচ্চারণ করেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মাটা বেরিয়ে যায়। শরীরের কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। দেহটা শুধু পড়ে রয় পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো। পদ্মজা দেহটাকে খামচে জড়িয়ে ধরে আম্মা বলে চিৎকার করে উঠল। আশেপাশের সব বাড়ি থেকে মানুষ ছুটে আসে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারায়। ফজরের আযান পড়ছে। আমির পদ্মজাকে হেমলতার থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। কিছুতেই প্রাণ বিহীন দেহটা পদ্মজা ছাড়তে চাইল না। যেন তার ডাকেই ফিরে আসবে হেমলতা। এমন কী হতে পারে না? হেমলতা কথা বলে উঠলেন। আবার হাঁটলেন। পদ্মজাকে ধমকে বললেন, 'চুপ! এতো কীসের কান্না? আমার মেয়ে হবে শক্ত আর কঠিন মনের। এতো নরম হলে চলবে না।'

এটা শুধুই কল্পনা। আত্মা একবার দেহ ছেড়ে দিলে আর ফিরে আসে না। আপন ঠিকানায় ফিরে যায়। হেমলতা নামে মানুষটার আয়ুকাল এতটুকুই ছিল। তিনি উড়াল দিয়েছেন পরকালে। রেখে গেছেন আদরের তিন কন্যা। আদরের কন্যাদের ছেড়ে তো কখনো দূরে থাকতে পারতেন না! এবার কীভাবে চলে গেলেন? তিনি নিশ্চয় মৃত্যুর সাথে কঠিন যুদ্ধ করেছেন! পেরে উঠেননি।

ভোরের আলো ফুটতেই পদ্মজা নিজেকে শক্ত করল। গোসল করে এসে কোরআন শরীফ নিয়ে বসল। হেমলতা বলতেন, 'মা-বাবা মারা গেলে কান্নাকাটি না করে লাশের পাশে বসে কোরআন শরীফ পড়া ভালো। এতে করে কবরে আযাব থাকলে কম হয়। (এই কথার কোনো সত্যতা নেই। তবে অনেক গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।)

সে প্রতিটা অক্ষর পড়ছে আর কাঁদছে। জীবনের আকাশের সাতরঙা রংধনু নিভে গেছে। আর কখনো উঠবে না। কোনোদিন না। মোর্শেদ পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখের জল মুছছেন। আবার ভিজে যাচ্ছে। গোসলের পর হেমলতার মুখটা উজ্জ্বল হয়েছে। ঠোঁটের কোণে যেন হাসি লেগে আছে। পদ্মজা হেমলতার মৃত দেহের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাদা কাপড়ে মোড়ানো লম্বা দেহটা দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি জানি,তোমার রুহ আমার পাশেই আছে। এভাবে কথা না ভাঙলেও পারতে আম্মা। বলেছিলে, কখনো কিছু লুকোবে না! বেহেশতে ভালো থেকো আম্মা। আমি পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্তকে দেখে রাখব।'

এরপর হাটুভেঙে খাঁটিয়ার সামনে বসল। হেমলতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আল্লাহকে বলে খুব দ্রুত আমাকে নিতে এসো কিন্তু।'

আমির,হিমেল সহ আরো দুইজন খাঁটিয়া কাঁধে তুলে নিল। কালিমা শাহাদাঁত বলতে বলতে তারা সামনে এগোয়। পূর্ণাকে তিনজন মহিলা ধরে রেখেছে। সে হাত পা দিয়ে ঝাঁপিয়ে চেষ্টা করছে ছোটার। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃত দেহটাই আঁকড়ে ধরে রাখতে। পদ্মজা মাটিতে বসে পড়ে। কী যেন বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! আম্মা...আম্মা বলে দুই হাতে মাটি খামচে ধরে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, বিড়বিড় করে, 'আমার আম্মাকে কষ্ট দিও না মাটি। একটুও কষ্ট দিও না। আমার আম্মাকে যত্নে রেখ। হীরের টুকরো তোমার বুকে ঘুমাতে যাচ্ছে। কষ্ট দিও না...কষ্ট দিও না।'

হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপছে পদ্মজা। সন্ধ্যে থেকে খুব ঠান্ডা পড়েছে। এক কাপড়ে মাটিতে মা একা আছে ভেবে পদ্মজার অশান্তি হচ্ছিল। তাই কম্বল নিয়ে রাতের বেলা ছুটে আসে মায়ের কবরে। সদ্য হওয়া কবরের কাঁচা মাটির ঘ্রাণ আসছে। পদ্মজা কম্বল দিয়ে মায়ের কবর ঢেকে দিল।এরপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আম্মা...মনে আছে তোমার? যখন আমি ছোট অনেক। আব্বা আমার গায়ের কম্বল নিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি তোমার শাড়ির আঁচল দিয়ে সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলে? মনে আছে? আমাকে কেন সেই সুযোগ দিলে না? কেন বললে না,তুমি মরণ রোগে আক্রান্ত। আমার জীবনে অভিশপ্ত আক্ষেপ কেন দিয়ে গেলে আম্মা? কেন পেলাম না আমার মাকে সন্তানের মতো আদর করার সুযোগ ? কোন দোষে আমার সঙ্গ তুমি নিলে না?

মৃত্যুর আগে নিজের মেয়ের সাথে এতো বড় অনাচার করে গেলে আম্মা! বিশ্বাসঘাতকতা করলে। আমিতো তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতাম। কখনো কোনো বিষয়ে জোর করিনি। জোর করে জানতে চাইনি। আমি বিশ্বাস করতাম তুমি সব বলবে আমায়। তুমি নিজে আমাকে বার বার বলেছো,তোমার জীবনের এক বিন্দু অংশ থাকবে না যা আমাকে বলবে না। তবে কেন সেই কথা রাখতে পারলে না? আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তুমি অনুভব করছো? আমি তোমার বুকে শুয়ে অভিযোগ তুলছি, তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো! আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো দশ মাস। তুমি পারতে,আমাকে বলতে। তুমি পারতে আমাকে বিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রাখতে। তুমি পারতে আমাকে আরো দশ মাস আমার মায়ের সঙ্গ দিতে। আমি এতো আক্ষেপ নিয়ে কী করে বাঁচবো আম্মা?'

কয়েকটা শেয়াল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝরাতে কবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কাঁদতে পারে,এমন হয়তো কখনো দেখেনি তারা। পদ্মজা হেমলতার কবরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর অশ্রু বিসর্জন করছে। আত্মহত্যা পাপ না হলে হয়তো এই পথই বেছে নিত সে। মোর্শেদ,আমির টর্চ নিয়ে পদ্মজাকে খুঁজতে খুঁজতে কবরে আসে। হেমলতার কবর দেখে মোর্শেদ দুর্বল হয়ে পড়েন। পদ্মজার সাথে সাথে তিনিও কাঁদতে থাকেন। আমিরের শব্দভাণ্ডারে স্বান্ত্বনা মজুদ নেই। সে সাহস করতে পারল না কথা বলার। কান্না থামিয়ে

পদ্মজা মুখস্থ সূরা ইয়াসিন পড়তে থাকল। সে চায় না তার মায়ের বিন্দুমাত্র কষ্ট হউক কবরে। সন্তানের আমল নাকি পারে,মৃত মা-বাবার শাস্তি কমাতে। যদি কোনো পাপের শাস্তি হেমলতার আমলনামায় থেকে থাকে তা যেন মুছে যায় পদ্মজার কণ্ঠের মধুর স্বরে। ধীরে ধীরে পদ্মজার কণ্ঠ কমে আসে। ঠান্ডায় জমে যায়। চোখের মণির রং পাল্টে যায়। আমির দ্রুত পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। এরপর মোর্শেদকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। হেমলতা পড়ে রইলেন একা একা। শেয়ালগুলি একসাথে চেঁচিয়ে উঠল। মৃত্যুর মতো সত্য আর নেই। জন্মালে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতেই হবে।

হেমলতার ঘরে পদ্মজা আর পূর্ণা বসে আছে, দরজা বন্ধ করে। পুরো বিছানা জুড়ে হেমলতার পরনের কাপড়চোপড়। এসবই শেষ স্মৃতি। পূর্ণা দুটো শাড়ি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা মাটিতে বসে আছে। উসকোখুসকো চুল। পূর্ণা আর কাঁদতে পারছে না। বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও শব্দ বেরোচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে বলল, 'আম্মা বলে এখন কাকে ডাকব? পূর্ণা আমাদের আম্মা কই গেলো?'

পূর্ণা বিছানা থেকে নেমে আসে। পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা স্বরে বলল, 'আল্লাহ কেন এমন করলো আপা? আমাদের প্রতি একটু দয়া হলো না।'

'এই ঘরটায় আর আসবে না আম্মা!'

'আপা, আম্মা আসে না কেন? আপা...আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাকে মেরে ফেলো।'

'কাঁদিস না বোন। আমাদের সবার আবার দেখা হবে পরকালে। এরপর আর মৃত্যু নেই। অনন্তকাল একসাথে থাকব। ঠিক দেখা হবে।'

পালঙ্কের উপর একটা পুরনো খাতা। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে নিল। পূর্ণা এই খাতার প্রতিটি অক্ষর আগেই পড়েছে। তাই আর ঘাঁটল না। সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা খাতার পৃষ্ঠা উল্টায়,

আমার আদরের পদ্মজা,

আজ পনেরো দিন তোর বিয়ের। প্রতিটা রাত আমার নির্ঘুমে কাটে। পুরো বাড়িজুড়ে তোর স্মৃতি। স্মৃতিগুলো আমায় বিষে জর্জরিত করে দেয়। মেয়ে হয়ে জন্মালে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। তবুও মানতে কষ্ট হচ্ছে,আমার মেয়ে সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে গিয়েছে। বলেছিলাম,আমার জীবনের বিন্দুমাত্র অংশ তোর অজানায় রাখব না। সেই কথা রাখতে আমি লিখতে বসেছি। স্বপ্ন ছিল,তোকে অনেক পড়াব। অনেক... অনেকদিন নিজের কাছে রাখব। কিন্তু মানুষের সব স্বপ্ন কী পূরণ হয়? দীর্ঘ দুই বছর আমার শরীরে বাসা বেঁধে ছিল এক রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু পাত্তা দেইনি। যখন তোর মেট্রিক পরীক্ষার জন্য আকবর ভাইজানের বাড়িতে গেলাম তখন একজন ভালো ডাক্তারের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আকবর ভাইজানের বন্ধু। দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তুই পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিলি। উনার নাম আসাদুল জামান। বিলেত ফেরত ডাক্তার। কথায় কথায় আমার সমস্যাগুলোর কথা বলি। তিনি খালি চোখে আমাকে দেখেন। কিছু প্রশ্ন করেন। উনার ধারণা জানান, আমি পারকিনসন্স ডিজিস নামক প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। যার ৮০ ভাগ লক্ষণ আমার সাথে মিলে যায়। তিনি দ্রুত আমাকে পরীক্ষা করতে বলেন। এই রোগের চিকিৎসা তো দূরে থাক দেশে এই রোগ পরীক্ষার কেন্দ্রও হাতেগোনা ১-২ টা আছে। সেদিনটা আমার জীবনের বড় ধাক্কা ছিল। আমি দিকদিশা হারিয়ে ফেলি। আমি মারা গেলে আমার তিন মেয়ের কী হবে? কী করে বাঁচবে? ভয়ানক এই রোগ নিয়ে তোর সামনে হাসতে আমার ভীষণ কষ্ট হতো। তবুও হাসতে হতো। মুহিব খুব ভালো ছেলে। তাই তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেইনি। আমি মারা যাওয়ার আগে তোর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। বিয়ে ঠিক করে ফিরে আসি গ্রামে। প্রতিটা দিন,প্রতিটা মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রনায় কাটতে থাকে।

আসাদুল জামান ঢাকার এক হাসপাতালের নাম লিখে দিয়েছিলেন। যেখানে এই রোগের পরীক্ষা করা হয়। ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করানোটা জরুরি। তার জন্য কেউ একজনকে দরকার পাশে। তোর আব্বাকে সব বলি। সব শুনে তোর আব্বা হাউমাউ করে বাচ্চাদের মতো কেঁদেছে! আল্লাহর উপর ভরসা রেখে,চলে যাই ঢাকা। আমি তখন হুঁশে ছিলাম না। মৃত্যু আমার পিছনে ধাওয়া করছিল। তাই মাথায় আসেনি,আমি না থাকলে আমার মেয়েদের কোনো ক্ষতি হতে পারে। ঢাকা যাওয়ার পথে আল্লাহর কাছে আকুতি করি,যেন পরীক্ষায় কিছু ধরা না পড়ে। বিয়েটা ভেঙে দিতে পারি। আর আমার মেয়েদেরকে নিয়ে আরো কয়টা বছর বাঁচতে পারি। কিন্তু আল্লাহ শুনলেন না। তিনি দয়া করলেন না মা! জানতে পারি,আমার হাতে সময় কম। এ রোগের নিরাময় নেই। যেকোনো বছরে যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। এই কথা শোনা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোদের কথা মনে পড়তেই আবার নিজেকে শক্ত করে নিয়েছি। যতদিন বাঁচব শক্ত হয়ে বাঁচব। তোর জীবন গুছিয়ে দিয়ে যাব। আমি পেরেছি। তোর বিয়ে হয়েছে। ভালো ছেলের সাথে। সুখে আছিস। এইতো শান্তি। আমার ভাবতে কষ্ট হয়, একদিন তোকে, তোদের সবাইকে আমি ভুলে যাব। এখন তো কথা ভুলে যাই। তখন নিজের নাড়ি ছেড়া সন্তানদের মুখও অচেনা হয়ে যাবে। কী নির্মম তাই না মা?

তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস অনেকদিন হলো। আমার মনে হচ্ছে,আমাদের আর দেখা হবে না। আমার শরীরের অবস্থা ভালো না। আজ নাকি প্রান্তকে চিনতে পারিনি আমি। বেশ অনেক্ষণ ওর চেহারাটা আমার অচেনা লেগেছে। কী অদ্ভুত! ভুলে যেয়ে আবার মনে পড়ে। হাত, পা, মাথা মুখের থুতনি, চোয়াল মাঝে মাঝে খুব কাঁপে। ধীরে ধীরে শরীরের ভারসাম্য একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম,হুট করে চৌকির উপর থেকে পড়ে গিয়েছি। পূর্ণার সে কী কান্না! মেয়েটা খুব কাঁদুনে হয়েছে। একদমই হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শক্তি কুলোয় না। তোর কথা খুব মনে পড়ে। বৃদ্ধ হয়ে তোর শরীরে ভর দিয়ে হাঁটার ইচ্ছে ছিল মনে। পেটের চামড়ার ফোস্কার মতো কী যেন হয়েছে। চুলকায়, ব্যাথা করে। রাতে ঘুম হয় না যন্ত্রনায়। তোর আব্বা আমার অশান্তি দেখে ঘুমাতে পারে না। বাসন্তী আপা সব জানে। মানুষটা অনেক ভালো। ভুল তো সবাই করে। এমন কেউ আছে? যে জীবনে ভুল করেনি। বাসন্তী আপার রান্না নাকি অনেক মজার হয়। খুব ভালো ঘ্রাণ হয়। প্রান্ত,প্রেমা সারাক্ষণই বলে। কিন্তু আমি সেই ঘ্রাণ পাই না। ঘ্রাণশক্তিটাও লুপ্ত হয়ে গেছে। কয়দিন ধরে টয়লেটও হচ্ছে না। খাবার গিলতে পারি না। কোন পাপে এমন করুণ দশা হলো আমার? বোধহয়, আর শক্তি পাবো না লেখার। পুরনো সবকিছু স্থায়ীভাবে ভুলতে আর কতক্ষণ? সব লক্ষণ তো জেঁকেই বসেছে শরীরে। বাকি শুধু দুনিয়াটাকে ভুলে যাওয়া। আজ সারারাত জেগে আরো কিছু কথা লিখতে চাই। সেদিন আমি জলিল আর মজনুর ছেলেকে খুন করেছি। ছইদ তার আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল। আটপাড়ার বড় বিলের হাওড়ের টিনের ঘরে ওরা তিনজন সবসময় জুয়া খেলে,গাঁজা খায়। সেদিনও গাঁজা খেয়ে পড়েছিল। গিয়ে দেখি ছইদের লাশ এক কোণে পড়ে আছে। দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে তোর দেবর রিদওয়ান। ও আমাকে দেখে পালিয়ে যায়। এরকম দৃশ্য দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি তবুও থেমে থাকিনি। ঘুমন্ত জলিল আর মজনুর ছেলেকে বেঁধে....। বাকিটুকু বললাম না। শুধু এইটুকু বলব, আমি যখন জলিল আর মজনুর ছেলেকে কোপাচ্ছিলাম তখন রিদওয়ান ঘরের এক পাশে লুকিয়ে ছিল। সে সব দেখেছে। আমি বের হতেই সে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করে। আজও জানতে পারিনি,সে কেন ছইদকে খুন করেছে। তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস ভেবে শান্তি লাগছে। রিদওয়ান ভয়ংকর মানুষ। তার খুন করার হাত বলছে,এটা তার প্রথম খুন নয়। সাবধানে থাকবি। আমিরকে সাবধানে রাখবি। তোর শ্বাশুড়িকে কাঁদতে দেখেছি। উনাকে আপন করে রাখবি।

আর লেখা যাচ্ছে না। হাত কাঁপছে। কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিক। এই খাতাটা প্রান্তের। লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। আমার সব শাড়ির সাথে ট্রাঙ্কের ভেতর যত্নে রাখছি। আমার

অনুপস্থিতিতে যখন পড়বি কাঁদবি না একদম। জীবনে বড় হবি। আমি না থাকলে মৃত্যুর কামনা করবি না। এটাও এক ধরণের পাপ। আল্লাহর যখন ইচ্ছে হবে মৃত্যু দিবেন। তিনি যে কারণে সৃষ্টি করেছেন,তা পূরণ হলেই মৃত্যু ধেয়ে আসবে। শুধু মৃত্যুর কথা স্বরণ রাখবি। কোরআনের পথে চলবি। কোনো পাপে জড়াবি না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবি না। আমাদের আবার দেখা হবে। আমার মায়ের সাথে আবার দেখা হবে। তুইতো আমার মা। আমার পদ্মজা। আমার সাত রাজার ধন। আমার তিন কন্যা আমার অহংকার। আমার বেহেশত। ভালো থাকবি। খুব ভালো থাকবি। মা কিন্তু দেখব। কান্নাকাটি করতে দেখলে ওপারে আমার শান্তি হবে না। তাই কাঁদবি না। আল্লাহ হাফেজ।'

পড়া শেষ হতেই খাতাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে পদ্মজা। হাতপা ছুঁড়ে আম্মা,আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। তার আর্তনাদে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে যায়।

....

পদ্মজার মাথার ছায়া এভাবেই হারিয়ে যায়। পদ্মজা কী হয়ে উঠতে পারে নিজের ছায়া নিজে? পারবে ভাই-বোনদের আগলে রাখতে? বাকি রহস্যের কিনারায় পৌঁছাতে? সব প্রশ্নের উত্তর আছে দ্বিতীয় খন্ডে। খুব দ্রুত নিয়ে আসব ২য় খন্ড। জানিয়ে দেব কবে আসবে আমি পদ্মজার পরবর্তী খন্ড। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে। নিজের দায়িত্ব নিজের। ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য হেমলতা হয়ে উঠুন। অস্থায়ী সময়ের জন্য বিদায়।

প্রথম খন্ড সমাপ্ত

পর্ব ৪৬

১৯৯৬ সাল। ঘনকুয়াশার ধবল চাদর সরিয়ে প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁচের জানালার পর্দা সরাতেই এক টুকরো মিষ্টি পেলব রোদ্দুর পদ্মজার সুন্দর মুখশ্রীতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নীচ তলা থেকে মনার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আপামনি।'

মিষ্টি রোদের কোমল ছোঁয়া ত্যাগ করে ঘুরে দাঁড়াল পদ্মজা। আমির আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে লেপের ওম ছেড়ে উঠে বসল। দরজার বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল পদ্মজাকে। ধনুকের মতো বাঁকা শরীরে সবুজ সুতি শাড়ি। মাথায় লম্বা বেনুনি, চওড়া পিঠের ওপরে সাপের মতন দুলছে। পাতলা কোমর উন্মুক্ত। আমির চমৎকার করে হেসে ডাকল, 'পদ্মবতী।'

পদ্মজা ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিল, 'অপেক্ষা করুন,আসছি।'

আমির মুখ গুমট করে বলল, 'ইদানীং আমাকে একদমই পাত্তা দিচ্ছো না তুমি। বুড়ো হয়ে গেছি তো।'

ওপাশ থেকে আর সাড়া আসল না। আমির অলস শরীর টেনে নিয়ে বারান্দায় গেল। পদ্মজা বৈঠকখানায় এসে দেখে,মনা সোফায় পানের কৌটা নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। নয় বছরের মনা এখন চৌদ্দ বছরের ছটফটে কিশোরী। পদ্মজা গম্ভীর স্বরে বলল, 'পান খাওয়ার অনুমতির জন্য ডেকেছিস?'

মনা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নত অবস্থায় রেখেই চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে পদ্মজাকে দেখল একবার। এরপর আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'অনেকদিন খাই না। আপামনি একটা খেতে দাও না?'

মনা চাইলে লুকিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু সে পদ্মজাকে ডেকে অনুমতি চাইছে। পদ্মজা মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। সোফায় বসে প্রশ্ন করল, 'পান কে দিয়েছে? আবার সাথে পানের কৌটাও!'

'আব্বা আসছিল।'ভীতু কণ্ঠে বলল মনা।

'কখন?'

'ভোরবেলা।'

'বাসায় আসেনি কেন?'

'কাজে যাচ্ছে তাই।'

'উনি এমনি এমনি কেন আনবেন পানের কৌটা? তুই স্কুল থেকে ফেরার পথে বস্তিতে গিয়েছিলি, তাই না?'

মনা জবাব দিল না। তার চুপ থাকা প্রমাণ করছে,পদ্মজার ধারণা সত্য। পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বলল, 'একটা পান খাবি। কৌটাসহ বাকি পান,সুপারি রহমত চাচাকে দিয়ে তোদের বস্তিতে পাঠিয়ে দেব।'

পদ্মজা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুই নাকি গণিতে ফেইল করেছিস?'

পদ্মজার প্রশ্নে মনা চোরের মতো এদিকওদিক চোখের দৃষ্টি দৌড়াতে থাকল। পদ্মজা ধমকে উঠল, 'বলছিস না কেন? আমি প্রতিদিন রাতে সময় নিয়ে তোকে গণিত বুঝিয়েছি। তবুও ফেইল করলি কী করে?'

মনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'পরীক্ষার আগের দিন পড়িনি। পরীক্ষায় গিয়ে সব ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছিল।'

'কেন পড়িসনি? সেদিন আমি অসুস্থ ছিলাম না? তাই আমি দুই তলায় ছিলাম নিচে একবারও আসতে পারিনি। এই সুযোগে পড়া রেখে টিভি দেখেছিলি তাই তো?'

মনা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। পদ্মজা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। বেহায়ার

মতো আবার স্বীকারও করছে,পড়া রেখে টিভি দেখেছে! ঢাকা আসার পরের বছরই মনাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল সে। এখন মনা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মাথায় বুদ্ধি বলতে নেই। সারাক্ষণ টিভি, টিভি আর টিভি! এতো পড়ানোর পরও কিছু মাথায় রাখতে পারে না। পদ্মজা বিরক্তি নিয়ে জায়গা ছাড়ল। শোবার ঘরে ঢুকতেই আমির আক্রমণ করে বসল। পদ্মজার কোমরের উন্মুক্ত অংশে হাত রাখতেই পদ্মজা'উফ! ঠান্ডা।'বলে ছিটকে সরে গেল। আমির হতভম্ব হয়ে গেল। দুই পা এগোতেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রিনরিনে কণ্ঠে ধমক বেরিয়ে আসল, 'একদম এগোবেন না। এই শীতের মধ্যে ভেজা হাতে ছুঁলেন কীভাবে? আচ্ছা,আপনি আমার কালো সোয়েটারটা দেখেছেন? পাচ্ছি না। শীতে জমে যাচ্ছি একদম।'

আমির কিছু বলল না। সে পদ্মজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা এদিকওদিক তার কালো সোয়েটারটা খুঁজল। এরপর আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। বলল, 'এভাবে সঙের মতো খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

আমির কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। পদ্মজা পাশের ঘরে চলে গেল। কালো সোয়েটারটা খুঁজে বের করতেই হবে। এ সোয়েটারটা পরে সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমির টেলিফোন রেখে পদ্মজাকে ডেকে জানাল, সে বের হবে। জরুরি দরকার। পদ্মজা সোয়েটার খোঁজা রেখে তাড়াতাড়ি করে খাবার পরিবেশন করল। গরুর মাংস গরম করল। আমির খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিয়মমতো পদ্মজার কপালে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল। পদ্মজা তৈরি হয় রোকেয়া হলে যাওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে রোকেয়া হলের অনেক মেয়েকেই চিনে। আজ মনার স্কুল নেই। সে একাই বাসায় থাকবে। পদ্মজা হলে যাচ্ছে এক ছোট বোনের সাথে দেখা করার জন্য। আমিরের তো কখনোই ছুটি নেই। নিজের ব্যবসা। যখন তখন কাজ পড়ে যায়।

রোকেয়া হলের চারপাশ সবুজ গাছে আবৃত। পদ্মজা গেইটের বাইরে গাড়ি রেখে এসেছে। হিম শীতল বাতাসে চোখজোড়া ঠান্ডায় জ্বলছে। তার পরনে বোরকা। মুখে নিকাব। রোকেয়া হলের'ক'ভবনে এসে জানতে পারল যার খুঁজে সে এসেছে সে নেই। চারিদিক নিরিবিলি। প্রায় সবাই ক্যাম্পাসে। নির্জন পরিবেশে এমন ঠান্ডা বাতাস রোমাঞ্চকর অনুভূতি। রোকেয়া হলে এ নিয়ে অনেকবার এসেছে সে। পদ্মজা'ক'ভবনের নিচ তলার শেষ মাথার কাছাকাছি অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তখন অতি সূক্ষ্ম একটা শব্দ কানে ভেসে আসে। পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। দুই পা পিছিয়ে চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করল। শব্দটা তীব্র হয়েছে! যেন কাছে কোথাও ধস্তাধস্তি হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকায়। একটা মেয়ের চাপা কান্নার শব্দ কর্ণকুহরে পৌঁছাতেই পদ্মজা দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো ছুটে আসে শেষ কক্ষের দরজার সামনে। পৌঁছেই দেখতে পেল অর্জুন এবং রাজু একটা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে কক্ষ থেকে বের করতে চাইছে। ক্যাম্পাসের ছাত্রসংগঠনের নেতা এরা। ছয় মাস হলো ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে এসেছে। আর এখনই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছে। পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে অর্জুন,রাজু তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। পদ্মজাকে দেখে মেয়েটা ছুটে আসতে চাইলে অর্জুন ধরে ফেলে। পদ্মজা বেশ শান্তভাবেই বলল, 'ক্ষমতার অপব্যবহার করতে নেই। ছেড়ে দাও মেয়েটাকে।'

পদ্মজার কণ্ঠ মেয়েটা চিনতে পারল। অস্ফুটভাবে ডাকল, 'পদ্ম আপা।'

এরপর বলল, 'পদ্ম আপা,আমি মিঠি। পদ্ম আপা ওরা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।'

পদ্মজা ভালো করে খেয়াল করে চিনতে পারল মিঠিকে। অর্জুন মিঠির গালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মেরে রাজুকে বলল, 'এরে ঘাড়ে উঠা। এই আপনি সরেন। মাঝে হাত ঢুকাবেন না। বিরক্ত করা একদম পছন্দ না আমার।'

পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'দেখো, মা জাতিকে এভাবে অপমান করতে নেই। হাতে ক্ষমতা পেয়েছো সৎভাবে চলো। সবার ভালোবাসা পাবে। এভাবে নিজেরা অন্যের

ইজ্জত নষ্ট করছো সেই সাথে নিজেদের পাপী করছো।'

'এই ফুট এখান থেকে। নীতি কথা শোনাতে আসছে।'

'ভালোভাবে বলছি, ভেজাল না করে ছেড়ে দাও। নারীকে নারীরূপে থাকতে দাও। শক্ত হতে বাধ্য করো না।'

অর্জুন রাগে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলল, 'আর একটা কথা বললে জামাকাপড় খুলে মাঠে ছেড়ে দেব।'

কথাটা শেষ করে অর্জুন চোখের পলক ফেলতে পারল না। তার আগে পদ্মজার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় তার ফর্সা গালে। অর্জুন রক্তিম চোখে কিড়মিড় করে তাকায়। মিঠিকে ছেড়ে পদ্মজার গলায় চেপে ধরে। পদ্মজা সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। অর্জুন কোঁকিয়ে উঠল। অণ্ডকোষে দুই হাত রেখে বসে পড়ল। রাজু বিশ্রি গালিগালাজ করে পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে। পদ্মজা মেঝে থেকে ইট তুলে রাজুর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। মিঠি ভয়ে চোখ খিঁচে ফেলে। রাজুর কপাল ফেটে রক্তের ধারা নামে। অর্জুন আকস্মিক তেড়ে এসে পদ্মজার নিকাব টেনে খুলে। ঘোলা চোখের ভয়ংকর চাহনি,রক্তজবার মতো ঠোঁটের কাঁপুনি অর্জুনের অন্তর কাঁপিয়ে তুলে। তবুও দমে থাকেনি। পদ্মজাকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। পদ্মজা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে অর্জুনের গলায় টান বসায়। এই দৃশ্য দেখে মিঠির শরীর কাঁপতে থাকে। অর্জুন চিৎকার করে বসে পড়ে। গলায় হাত দিয়ে দেখে গলাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। চামড়া ছিঁড়েছে শুধু। তার হৃৎপিণ্ড যেন মাত্রই মৃত্যু সাক্ষাৎ পেল। পদ্মজার অভিজ্ঞ হাত তার কলিজা শুকিয়ে দিয়েছে। মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা ছুরির রক্ত অর্জুনের গেঞ্জিতে মুছে বলল, 'তোমাদের ভাগ্য ভালো পদ্মজার হাতে পড়েছো। হেমলতার হাতে পড়োনি।'

এরপর মিঠিকে প্রশ্ন করল, 'আমার জানামতে তুমি ১ম বর্ষে আছো। আর হলে দ্বিতীয় তলায় থাকার কথা। এখানে আসলে কী করে?'

মিঠির ভয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি গত কয়দিন অসুস্থ ছিলাম। ক্যাম্পাসে যেতে পারিনি। অর্জুন দাদা নাজমাকে দিয়ে আমাকে ডেকেছিল।'

'ওমনি চলে এসেছো? কয়দিন আগে ৩য় বর্ষের একটা মেয়ের কী হাল হয়েছে দেখোনি,শুনোনি? এরপরও এদের ডাকে সাড়া দিলে কেন?'

'না দিয়েও উপায় নাই।'

পদ্মজা আর কিছু বলতে পারল না। মিঠিকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর নিকাব পরতে পরতে বলল, 'এসব বেশিদিন সহ্য করা যায় না। মেয়েরা হলে এসে থাকে পড়াশোনার জন্য। আর এসব নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। তোমার চেনাজানা আরো যারা মানসিক,শারিরীকভাবে ভুক্তভোগী আছে সবার নামের তালিকা আমাকে দিতে পারবে?'

মিঠি জানতে চাইল, 'কেন?

'সবাইকে নিয়ে প্রশাসনের কাছে যাব। তাদের নিরবতা আর মেনে নেব না। ক্যাম্পাসে আসার পর থেকে নেতাদের অপকর্ম দেখছি। থামানোর চেষ্টা করেছি। একজন, দুজন থামে আরো দশজন বাড়ে। এইবার আমাদের আন্দোলন করতে হবে।'

মিঠি মিনমিনিয়ে বলল, 'কেউ ভয়ে আন্দোলন করতে চায় না। অনেকবার দিন তারিখ ঠিক হয়েছে শুনেছি। এরপর যাদের আসার কথা ছিল তাদের মধ্যে আশি ভাগই আসতো না। অনেককে বাসায় আক্রমণ করা হয়েছে।'

পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজে মেয়েরা এতো দূর্বল! তাদের দেহের লুকায়িত আকর্ষণীয় ছন্দগুলো না থাকলে হয়তো তারাও সাহসী হতো। ছন্দ হারানোর ভয় থাকত না। কাউকে ভয় পেতে হতো না। পদ্মজা মিঠিকে বলল, 'তুমি বরং কয়দিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসো। এখানে থাকা তোমার জন্য এখন বিপদজনক। আমি আগামীকাল গ্রামে

যাচ্ছি। আমার আম্মার মৃত্যুবার্ষিকী। ছোট বোনের মেট্রিক পরীক্ষা দেড় মাস পর। আরেক বোনের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। দেড়-দুই মাসের মতো গ্রামে থাকব। এরপর এসে এই নেতাদের ব্যবস্থা করব। তোমাদের বর্ষের শিখা আছে না? বেশ সাহসী মেয়েটা। ওর মতো আরো কয়টা মেয়ে পাশে থাকলেই হবে। তুমি যাও এখন। দ্রুত বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো। যতক্ষণ এখানে আছো একা চলাফেরা করো না। শিখাও তো মনে হয় হলেই থাকে?'

'জি।'

'ওর সাথে থেকো।'

'কখনো কথা হয়নি।'

'এখনতো ক্যাম্পাসে বোধহয়। আচ্ছা বিকেলে আমি আবার আসব। ওর সাথে কথা বলব। আমি আসছি এখন।'

'পদ্ম আপা?'

পদ্মজা তাকাল। মিঠি পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ভেজাকণ্ঠে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'বাঁচার সংগ্রামে ভীতু হলে চলে না মিঠি।'

'ভেবেছিলাম জীবনটা শেষ হয়েই গেল বুঝি।'

'কখনো এমন ভাববে না। বিপদে সামর্থ্য মতো যা পারো করবে। শরীরের শক্তি নিশ্চয় কম নয়। মনের জোরটা কম। সেই জোরটা বাড়াবে। মনের জোর বাড়াতে টাকা লাগে না। কঠিন জীবন সহজ করে তোলার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়।'

মিঠি মাথা তুলে তাকাল। একটু সরে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল। এরপর বলল, 'দ্রুত ফিরবে পদ্ম আপা। আমরা আমাদের নিরাপত্তার যুদ্ধে নামব।'

পদ্মজা হেসে বলল, 'ফিরব। দ্রুত ফিরব।'

গাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছে। বাড়ির নাম আগে ছিল,আমির ভিলা। বছর ঘুরতেই আমির বাড়ির নাম পাল্টে দিল,পদ্ম নীড়। পদ্মজা জানালার কাচ তুলে বাইরে তাকাল। রাস্তাঘাটে মানুষজন কম। ঠান্ডা বাতাস। সূর্যের আলোয় একদমই তেজ নেই। যেন থুড়থুড়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। পদ্মজা আকাশপানে তাকিয়ে তিনটা প্রিয় মুখকে খোঁজে। চোখ দুটি টলমল করে উঠে। কোথায় আছে তারা? আবার কবে হবে দেখা? পদ্মজা কাচ নামিয়ে দিল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

নিস্তব্ধ বিকেল ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে অলন্দপুরের আটপাড়া। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় নূপুরধ্বনিতে। পূর্ণার চঞ্চল কাদামাখা দুটি পা দৌড়ে ঢুকে মোড়ল বাড়ি। পায়ের নূপুরজোড়া রিনঝিন রিনঝিন সুর তুলে ছন্দে মেতেছে। পরনে লাল টুকটুকে শাড়ি। আঁচল কোমরে গোঁজা। শাড়ি গোড়ালির অনেক উপরে পরেছে। । বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'বড় আম্মা। ও বড় আম্মা।'

বাসন্তী রান্নাঘর ছেড়ে দৌড়ে আসেন। হাতের চুড়িগুলো ঝনঝন করে উঠে। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। তাও কিঞ্চিৎ। পূর্ণাকে এভাবে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'বাড়িতে ডাকাত পরছে?'

'আপার চিঠি।'পূর্ণা হাতের খামটা দেখিয়ে বলল।

আপার চিঠি শুনে প্রেমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সে পড়ছিল। ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা। ষোড়শী মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সবার চেয়ে আলাদা হয়েছে। খুব ভীতু এবং লাজুক সে। পূর্ণা বড় বোন হয়ে সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর সে ঘরে বসে পড়ে,বাড়ির কাজ করে। স্কুলে যায়। পদ্মজার কথামতো প্রতিদিনের রুটিন অনুসরণ করে। সে বলল, 'কী বলছে আপা? চিঠি দাও।'

পূর্ণা কপাল কুঁচকে বলল, 'তোর পড়তে হবে না। বলছে,মাঘ মাসের ১৯ তারিখ

আসছে। অনেকদিন থেকে যাবে।"

'আজ কত তারিখ?'প্রশ্ন করলেন বাসন্তী।

পূর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, '১৯ শে মাঘ।'

বাসন্তীর চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বিস্ফোরিত কণ্ঠে বললেন, 'আজই! বিকেল তো হয়ে গেছে।'

পূর্ণা অস্থির হয়ে বাসন্তীর কাছে দৌড়ে আসে। দুই হাতে ধরে করুণ স্বরে বলল, 'তাড়াতাড়ি সালোয়ার কামিজ বের করো আমার। এই রূপে দেখলে একদম মেরে ফেলবে আপা।'

বাসন্তী আরোও করুণ স্বরে বললেন, 'মা, আমি আগে আমার রূপ পাল্টাই। তুমি তোমারটা খুঁজে নাও।'

কথা শেষ করেই বাসন্তী ঘরের দিকে যান। বুক দুরুদুরু কাঁপছে। পরনে ঝিলমিল, ঝিলমিল করছে টিয়া রঙের শাড়ি। দুই হাতে তিন ডজন চুড়ি। কপালে টিপ,ঠোঁটে লিপস্টিক। এ অবস্থায় পদ্মজা দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তিনি সাজগোজ পূর্ণার কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর পূর্ণার কথায়ই দুজন মিলে আবার শুরু করেছেন। পদ্মজা এক-দুই দিনের জন্য প্রতি শীতে বাড়ি আসে তখন সব রঙ-বেরঙের জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়। পূর্ণা চিঠি প্রেমার হাতে দিয়ে ঘরে যায়। ট্রাঙ্ক খুলে সাদা-কালো রঙের সালোয়ারকামিজ দ্রুত পরে নেয়। হাতের চুড়ি খুলতে গিয়ে কয়টা ভেঙে যায়। অন্যবার দুই-তিন দিন আগে চিঠি আসে। আর আজ যেদিন পদ্মজা আসছে সেদিনই চিঠি আসতে হলো! দশ দিন আগে চিঠি পাঠিয়েছে পদ্মজা। ডাকঘর থেকেই দেরি করেছে। পূর্ণা মনে মনে ডাকঘরের কর্মচারীদের গালি দিয়ে চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। সে দ্রুত জুতা পরে বারান্দায় আসে। প্রেমাকে তাড়া দিল, 'জলদি পানি নিয়ে আয়।'

প্রেমার বেশ লাগছে। সে মনেপ্রাণে দোয়া করছে,পদ্মজা এখুনি এসে যাক আর দেখুক পূর্ণার সাজগোজ। কিন্তু প্রকাশ্যে পূর্ণার আদেশ রক্ষার্থে কলসি নিয়ে কলপাড়ে গেল। পূর্ণা মনে মনে আয়তুল কুরসি পড়ছে! এই বুঝি পদ্মজা এসে গেলো! গতবার মার তো খেয়েছেই। তার সাথে পদ্মজা রাগ করে তিন মাস চিঠি লিখেনি। বাতাসের বেগে পাতায় মড়মড় আওয়াজ হচ্ছে। আর পূর্ণার মনে হচ্ছে, এইতো তার রাগী আপা হেঁটে আসছে। নাহ পানির জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। পূর্ণা কলপাড়ে ছুটে যায়। কলসি থেকে পানি নিয়ে পায়ের কাদা,ঠোঁটের লিপস্টিক ধুয়ে ফেলে। কপালের টিপ খুলে কলপাড়ের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে। হাতের চুড়ি, গলার হার,কানের বড় বড় দুল ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে এসেছে। পায়ের দিকে আবার চোখ পড়তেই, সে আঁতকে উঠল। নূপুরজোড়া হাঁটার সময় অনেক আওয়াজ তুলে। এ রকম নূপুর পরা নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ। আবার দৌড়ে গেল ঘরে। দৌড়ার সময় বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। নূপুর দুটো খুলে ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে দিয়ে মাটিতে ধপ করে বসে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'বাঁচা গেল!'

এরপর হাঁটুতে থুতুনি রেখে মিষ্টি করে হাসল। আজ তার আপা আসবে। তার জীবনের সবচেয়ে দামী এবং ভালোবাসার মানুষটা আসবে। ঈদের আনন্দের চেয়েও বেশি এই আনন্দ। পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে যায়। প্রায় বছর খানেক পর আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে সে। বাসন্তী সাদা রঙের শাড়ি পরেছেন। তাড়াহুড়ো করে এটা ওটা রাঁধছেন। পূর্ণা সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াল। বাসন্তী বললেন, 'প্রান্তরে বল গিয়ে লাল রঙের দাগ দেয়া রাজহাঁসটা ধরতে।'

পূর্ণা চুলায় লাকড়ি আরেকটা দিয়ে লাহাড়ি ঘরের দিকে যায়। প্রান্তকে লাহাড়ি ঘরেই বেশি পাওয়া যায়। প্রেমা পদ্মজার জন্য হেমলতার ঘরটা গুছাচ্ছে।

পর্ব ৪৭

ইট-পাথরের শহরের সবই কৃত্রিম। কৃত্রিমতা ছেড়ে ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা গ্রাম, আঁকা-বাঁকা বয়ে চলা নদী-খাল, সবুজ শ্যামল মাঠের প্রাকৃতিক রূপ দেখে তৃষ্ণার্ত নয়নের পিপাসা মিটাতে গিয়ে পদ্মজা আবিষ্কার করল,তার চোখে খুশির জল! সবেমাত্র অলন্দপুরের গঞ্জের সামনে ট্রলার পৌঁছেছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। আলমগীর ও মগা উপস্থিত রয়েছে। তারা দুজন ট্রলার নিয়ে রেলস্টেশনের ঘাটে অপেক্ষা করছিল। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল, 'ইচ্ছে হচ্ছে জলে ঝাঁপ দেই।'

আমির আঁতকে উঠল, 'কেন?'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এরপর বলল, 'অল্পতে ভয় পেয়ে যান কেন? বলতে চেয়েছি,অনেকদিন পর চেনা নদীর জল দেখে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডুব দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

আমির এক হাতে পদ্মজার বাহু চেপে ধরে নিজের সাথে মিশিয়ে বলল, 'তাই বলো!'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের গাল ভর্তি দাঁড়ি। ঘন হয়েছে খুব। চোখের দৃষ্টি গাঢ়,তীক্ষ্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ! অথচ,একটা সন্তান নেই। বাবা ডাক শুনতে পারে না। মানুষটার জন্য দুঃখ হয়। পদ্মজা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আযান পড়ছে। ট্রলার মোড়ল বাড়ির ঘাটে ভীড়ে। প্রথমে পদ্মজার চোখে পড়ে রাজহাঁসের ছুটে চলা। ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চারিদিক মুখরিত। ট্রলারের শব্দ শুনে পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত,ছুটে আসে ঘাটে। আগে আগে আসে পূর্ণা। পদ্মজা প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই পূর্ণা জান ছেড়ে ডেকে উঠল, 'আপা।'

পূর্ণাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। সাবধান করে, 'আস্তে পূর্ণা।'

বলতে বলতে সিঁড়িতে পূর্ণার পা পিছলে গেল। পদ্মজা দ্রুত আঁকড়ে ধরে। এখুনি অঘটন ঘটে যেত! পদ্মজা পূর্ণাকে ধমক দিতে প্রস্তুত হয়, তখনই পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পদ্মজাকে। বুকে মাথা রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করল, 'আপা! আমার আপা!'

পদ্মজার বুক বিশুদ্ধ ভালোলাগায় ছেয়ে গেল। মৃদু হেসে পূর্ণাকে কিছু বলার জন্য আবার প্রস্তুত হয়,তখন প্রেমা,প্রান্ত এসে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা টাল সামলাতে না পেরে শেষ সিঁড়ি থেকে নদীর জলে পড়ে যাচ্ছিল,ট্রলারের আগায় দাঁড়িয়ে থাকা আমির দুই হাতে দ্রুত পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে তার খুঁটি হলো। পদ্মজা চোখ খিঁচে ফেলে। যখন বুঝতে পারল সে পড়েনি,তার ভাইবোনেরাও পড়ে যায়নি তখন চোখ খুলল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার সহধর্মীর মুখ দেখে হাসল। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পূর্ণা, প্রেমা হেঁচকি তুলে কাঁদছে! খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদে? তবে পদ্মজার ভালো লাগছে। বাসন্তীকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পদ্মজা তার ভাই-বোনদের বলল, 'আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি না তোরা?'

পূর্ণা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'চলো।'

পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে বাসন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা রঙের শাড়ি পরে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকা এই মানুষটার প্রতি পদ্মজার অনেক ঋণ। হেমলতা মারা যাওয়ার ছয় মাসের মাথায় মোর্শেদ পৃথিবী ছাড়েন।

শোকে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফেলে যান কিশোরী দুই মেয়ে,বউ এবং এক ছেলেকে। অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। সংসার চলে না। আমির সাহায্য করতে চেয়েছিল। পদ্মজার আত্মসম্মানে লাগে। সে কিছুতেই স্বামীর টাকায় বাবার বাড়ির সংসার চালাবে না। নিজেরও কাজ করার উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় বাসন্তী চাইলে ফেলে চলে যেতে পারতেন। তিনি যাননি। এক পড়ন্ত বিকেলে পদ্মজাকে বললেন, 'নকশিকাঁথা সেলাই করতে পারি আমি। শখে সেলাই করতাম। দুই তিনজন পয়সা দিয়ে কিনতে চাইত। টাকার

দরকার ছিল না,তাই বিক্রি করিনি। তুমি বললে,আমি নকশিকাঁথা গঞ্জে বেঁচার চেষ্টা করতাম।'

পদ্মজা সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। বাসন্তী ছুটে ঘরে যান। একটা নকশিকাঁথা নিয়ে আসেন। পদ্মজাকে দেখান। অসম্ভব সুন্দর হাতের কাজ! আমির নকশিকাঁথা দেখে মুগ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বলল,বড় ভাইয়া যখনি ঢাকা যাবে নকশিকাঁথা দিয়ে দিবেন। শহরে নকশিকাঁথার চাহিদা রয়েছে অনেক। আপনাদের সমস্যা কিছুটা হলেও ঘুচে যাবে। এক কাজ করলেই তো পারেন আরো দুই-তিনজনকে নিয়ে নকশিকাঁথা বানানো শুরু করেন। তাহলে অনেকগুলি হবে। তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিবেন। ঢাকা বিক্রির পর দ্বিগুণ টাকা আসবে।'

এ প্রস্তাবে পদ্মজা অমত করল না। সেদিন থেকে বাসন্তী দুই হাতে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। পূর্ণাকে মেট্রিক অবধি পড়ালেন। প্রেমা,প্রান্তকে এখনও পড়াচ্ছেন। পূর্ণার যেকোনো আবদার পূরণ করে চলেছেন। বাসন্তীর পা ছুঁয়ে পদ্মজা সালাম করল। এরপর বলল, 'কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো আছি মা। তুমি, জামাইবাবা সবাই ভালো আছোতো?'

'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আগের চেয়ে শুকিয়েছেন। ত্বক ময়লা হয়েছে। নিজের যত্ন নেওয়া ভুলে গিয়েছেন?'

বাসন্তী চোখ নামিয়ে হাসেন। এক হাতে নিজের মুখশ্রী ছুঁয়ে বলল, 'সেই বয়স কী আর আছে? বিধবা মানুষ!'

'পূর্ণা খুব জ্বালায় তাই না? বাধ্য করে রঙিন শাড়ি পরতে,সাজতে।'

বাসন্তী চমকে তাকালেন। পদ্মজা হাসছে। পূর্ণা মাথায় ব্যাগ নিয়ে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। আহ্লাদী হয়ে অভিযোগ করল, 'আপা তুমি নাকি মুচির সাথে আমার বিয়ে দিতে এসেছো?'

পদ্মজা হাসি প্রশস্ত হয়। আমিরের দিকে তাকিয়ে এরপর পূর্ণার দিকে তাকাল। বলল, 'কে বলেছে? তোর ভাইয়া?'

পূর্ণা আমিরকে ভেংচি কেটে পদ্মজাকে বলল, 'আর কে বলবে? আপা আমি মুচি বিয়ে করব না। আমার ফর্সা, চকচকে জামাই চাই।'

মগা পূর্ণাকে রাগানোর জন্য বলল, 'মেট্রিক ফেইল করা ছেড়িরে ধলা জামাই হাঙ্গা করব না।'

পূর্ণা কিড়মিড় করে তাকাল। পদ্মজা পূর্ণার গাল টেনে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা,এসব নিয়ে পরে আলোচনা হবে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। বাড়িতে চল।'

তারপর দুই হাতে দুই বোন-ভাইকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির উঠানে পা রাখে সে। সতেজ হয়ে জামাকাপড় পাল্টে নেয় আমির ও পদ্মজা। এরপর রাজহাঁস ভূনা আর গরম গরম ভাতের ভোজন হয়। আলমগীর, মগাও ছিল। আলমগীর বাড়ি ফেরার আগে আমির-পদ্মজাকে বলে যায়, 'আগের স্মৃতি আর কতদিন বুকে রাখবি তোরা? দাদু মরার পথে। চাচি আম্মা আত্মগ্লানি আর তোদের না দেখার শোকে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে।

এবার অন্তত বাড়িতে আসিস। অনুরোধ রইল আমার। পদ্মজা তুমি আমিরকে বুঝিয়ো।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল, 'এবার বাড়ির সবাইকে গিয়ে দেখে আসব। আপনি নিশ্চিন্তে যান।'

'অপেক্ষায় থাকব।"

'আসব ভাইয়া।'বলল পদ্মজা।

আলমগীর, মগা চলে গেল। আমির পদ্মজাকে বলল, 'আমি যাব না।'

'এবার যাওয়া উচিত। অনেক তো হলো। চার বছর কেটেছে। ভয়ংকর রাতটা আজীবন বুকে তাজা হয়ে থাকবে। তাই বলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। ইসলামে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।'

'ওই বাড়িতে গেলে আমার দমবন্ধকর কষ্ট হয় পদ্মজা।'

'সে তো আমারও হয়। কিন্তু আম্মার কথা খুব মনে পড়ে। আম্মারতো কোনো দোষ ছিল না। তবুও শাস্তি পাচ্ছেন।'

'ছিল দোষ।'

'যে আসল দোষী তার দেখা আজও পেলাম না। অথচ, যিনি দোষী না তিনি সবার চোখে দোষী।'

'আম্মা সেদিন কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? এটাই আম্মার দোষ।'

'জোর করে ঘুম আটকিয়ে রাখা যায়? আমরা আগামীকাল যাচ্ছি,এটাই শেষ কথা।'

'পদ্মজ....'

আমিরের বাকি কথা পদ্মজা শুনল না। সে হেমলতার ঘরের দিকে এগুলো। হেমলতার ঘরের দরজা খুলতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শিহরিত হয়ে কেঁপে উঠে সে। ছয় বছর আগের মতোই সব। নেই শুধু মা! পদ্মজা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে। আলমারি খুলে হেমলতার শাড়ি বের করে ঘ্রাণ শুঁকে। বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হাউমাউ করে কান্নাটা আসে না অনেকদিন। কষ্টগুলো চেপে থাকে বুকের ভেতর। পূর্ণা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আপাকে দেখছে। পদ্মজা বার বার নাক টানছে। অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে মায়ের শাড়ি। যেন সে শাড়ি না তার মাকেই চুমু দিচ্ছে। পূর্ণার মন ব্যথায় ভরে উঠে। তার কী মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে নাকি আপার কান্না দেখে কষ্ট হচ্ছে? জানে না পূর্ণা। শুধু উপলব্ধি করছে,তার কান্না পাচ্ছে।

কান্নার শব্দ শুনে পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পূর্ণাকে কাঁদতে দেখে,দ্রুত চোখের জল মুছে হাতের শাড়ি আলমারিতে রাখল। এরপর পূর্ণাকে ডাকল, 'আয় এদিকে।'

পূর্ণা ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগিয়ে আসে। পদ্মজা বিছানায় বসল। পূর্ণা পদ্মজার কোলে মাথা রেখে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ল। পদ্মজা বলল, 'বয়স একুশের ঘরে। মনটা তো সেই চৌদ্দ-পনেরো বছরেই পড়ে আছে।'

পূর্ণা পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, 'আমার খুব কান্না পাচ্ছে।'

'কাঁদিস না।'

'ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসছে তো।'

'থামানোর চেষ্টা কর।'

'থামছে না।'

'তুই তো আরো কাঁদছিস।'

'বেড়ে যাচ্ছে তো।'

পদ্মজা ঠাস করে পূর্ণার গালে থাপ্পড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। চোখ বড় বড় করে তাকায়। পদ্মজা আওয়াজ তুলে হেসে উঠে। পূর্ণা দ্রুত উঠে বসে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে বলল, 'থেমে গেছে।'

পদ্মজার হাসি বেড়ে গেল। মুখে হাত চেপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করে।

হাসির ঠ্যালায় চোখে জল চলে আসে। পূর্ণা কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। থামাতে বললে,আরো বেড়ে যায়। ব্যাপারটা যে কেউ উপভোগ করে। প্রেমা ঘরে ঢুকে অভিমানী কণ্ঠে বলল, 'আমাকে ছাড়া কী নিয়ে কথা বলে হাসা হচ্ছে?'

পদ্মজা হাসতে হাসতে বলল, 'পূর্ণা কাঁদছিল। থামাতে পারছিল না।'

প্রেমা হেসে বিছানায় উঠে বসে। দুই পা ভাঁজ করে বসে বলল, 'বড় আপা,ছোট আপা নামায পড়ে না।'

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী রে? তুই নামায পড়িস না কেন? চিঠিতে তো বলিস অন্য কথা।'

পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে প্রেমাকে লবণ,মরিচ দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে কাঁচা আমের মতো কামড়ে খেতে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সামলাতে হবে। সে পদ্মজাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, 'আপা,বিশ্বাস করো শুধু এক ওয়াক্ত পড়িনি। আর...আর প্রেমাকে আমি আমার...হ্যাঁ

আমার চুড়ি দেইনি বলে...'

'মিথ্যে বলবি না। কতবার বলেছি, মিথ্যা কথা ছাড়তে। সত্য স্বীকার কর। কীসের কাজ তোর? পড়ালেখা ছেড়েছিস,চার বছর। মেট্রিকটা আবার পড়লি না। বিয়ে করতে চাস না বলে বিয়ের জন্যও জোর করিনি। তার মূল্য এভাবে কথা না শুনে দিবি? এটা তো আমারও কথা না। যিনি সৃষ্টি করেছেন উনার আদেশ।'

পূর্ণা মাথা নত করে রাখে। পদ্মজা বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'ঘুমাব না তোদের সাথে।'

প্রেমা আর্তনাদ করে উঠল, 'আপা,আমার দোষ কী?'

পূর্ণা পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে। কিছুতেই যেতে দিবে না। পদ্মজা বলল, 'ছাড় বলছি।'

পূর্ণা আকুতি করে বলল, 'যেও না। এখন থেকে প্রতিদিন পড়ব। সত্যি বলছি।'

'সত্যি তো?'বলল পদ্মজা।

'সত্যি।'

পদ্মজা বিছানায় পা তুলে বসল। পূর্ণা আড়চোখে প্রেমাকে দেখল। দৃষ্টি দিয়ে যেন হুমকি দিল, 'আমারও দিন আসবে!'

গ্রামে আসলে আমির প্রান্তর সাথে ঘুমায়। পদ্মজাকে তার বোনদের সাথে ছেড়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই বোনকে নিয়ে শুয়ে পড়ে পদ্মজা। কত কত গল্প তাদের! পদ্মজা শুধু শুনছে আর হাসছে। প্রেমার মুখ দিয়ে সহজে কথা আসে না,পদ্মজা আসলে কথার ঝুড়ি নিয়ে বসে। পূর্ণা নিজের বিয়ে নিয়ে বেশি কথা বলছে। পরিকল্পনা করছে। তখন প্রেমা ব্যাঙ্গ করে বলল, 'ছোট আপার লজ্জার লেশমাত্র নেই।'

তখন পূর্ণা ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তুই যে প্রান্তরে বলছিলি শহরে গিয়ে সাহসী পুলিশ বিয়ে করবি। আমি কাউকে বলেছি? বলেছি,তোর লজ্জা নাই?

প্রেমা লজ্জায় জবুথবু হয়ে যায়! তার বড় আপার সামনে ছোট আপা কী বলছে! লজ্জায় কান দিয়ে ধোয়া বেরোতে থাকে। পদ্মজা হাসল। প্রেমাকে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। অভিভাবকদের নিজের পছন্দ জানানো উচিত। তোর বিয়ে পুলিশের সাথেই হবে। আর পূর্ণার বিয়ে হবে পূর্ণার পছন্দমত।'

পদ্মজার কথায় পূর্ণা ভারি খুশি হলো। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, 'নায়কের মতো জামাই চাই। একদম লিখন ভাইয়ার মতো। ওহ আপা, জানো লিখন ভাইয়া এখানে শুটিং করতে আসছে। এক সপ্তাহ হলো।'

পদ্মজা জানতে চাইল, 'কার বাড়ি?'

'সাতগাঁয়ের হান্নান চাচার বাড়ি। বিশাল বড় টিনের বাড়ি।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এই মানুষটা শুধুমাত্র তার স্মৃতি। কিন্তু মানুষটার জীবনের পুরোটা জুড়ে সে। এইতো মাস চারেক আগে, পদ্মজা পত্রিকা পড়তে বসেছিল। তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখন শাহর ছবি সাথে উপরের শিরোনাম দেখে বেশ অবাক হয় পদ্মজা। শিরোনামে লেখা, 'লিখন শাহর পদ্ম ফুল'। পদ্মজা আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়ে। সাংবাদিক লিখনকে প্রশ্ন করেছেন, 'ত্রিশ তো পার হয়েছে। বিয়ে করবেন কবে?'

লিখন জানিয়েছে, 'সে যখন আসবে।'

'আমরা কী জানতে পারি, কে সে? যদি দ্বিধা না থাকে।'

'জানাতে আমার বাধা নেই। সে পদ্ম ফুল। আমার সাতাশ বছরের কঠিন মনে তোলপাড় তুলে দিয়েছিল। সেই তোলপাড়ের তাণ্ডব বুকের ভেতর আজও হয়। সেই ফুলের সুবাস নাকে আজও লেগে আছে। শুধু আমি তাকে জয় করতে পারিনি।'

লিখন শাহর সাক্ষাৎকারের কথোপকথন বেশ তোলপাড় তুলে ঢাকায়। এরকম একজন সুদর্শন পুরুষকে কোন নারী অবহেলা করেছে? তা নিয়ে মানুষের কত কল্পনা-জল্পনা, আলোচনা -সমালোচনা। পদ্মজার অস্বস্তি হয় খুব।

পূর্ণা পদ্মজাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'ঘুমিয়ে গেলে আপা?'

'না। তারপর বল।'নিস্তরঙ্গ গলায় বলল পদ্মজা।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শিয়ালের হাঁক ভেসে আসছে কানে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। তবুও কথা শেষ হচ্ছে না পূর্ণা-প্রেমার। পদ্মজাও মানা করছে না। বরং অবাক হচ্ছে,তার বোনেরা কত কথা লুকিয়ে রেখেছে তার জন্য!

কাক ডাকা ভোর। ঘন কুয়াশায় চারপাশ ডুবে আছে। বাতাসের বেগ বেশি। ঠান্ডায় ঠোঁট কাঁপছে। পদ্মজার পরনে দামী,গরম সোয়েটার। আবার শালও পরেছে। বাসন্তী সুতি সাদা শাড়ি পরে রান্না করছেন। মাঝে মাঝে কাঁপছেন। পদ্মজা দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে ঢুকল। বাসন্তী পদ্মজাকে দেখে হেসে বললেন, 'কিছু লাগবে?'

পদ্মজা খেয়াল করে দেখল বাসন্তীর মুখটা ফ্যাকাসে। ঠান্ডায় এমন হয়েছে। সে শক্ত করে প্রশ্ন করল, 'আপনার শীতের কাপড় নেই?'

বাসন্তী হেসে বলল, 'আছে তো।'

'তাহলে এভাবে শীতে কাঁপছেন কেন? নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। বয়স হয়েছে তো। যান ঘরে যান।'

'ভাত বসিয়েছি।'

'আমি দেখব।'

'সারারাত তো সজাগ ছিলে আম্মা। তুমি ঘুমাও। আমি রাতে ঘুমিয়েছি।'

'তাহলে সোয়েটার পরে আসেন।'

বাসন্তী মাথা নত করে বসে রইলেন। পদ্মজা বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর নিজের গায়ের শাল বাসন্তীর গায়ে দিয়ে বলল, 'নিজের জন্যও কিছু কেনা উচিত। পূর্ণা বয়সে বেড়েছে বুদ্ধিতে না। ও পারে না কিছু সামলাতে। শুধু আবদার করতে পারে। যতদিন বেঁচে আছেন নিজের যত্ন নিন। আমি ঘরে যাচ্ছি।'

পদ্মজা রান্নাঘর ছেড়ে বারান্দার গ্রিলে ধরে বাইরে তাকাল। কুয়াশার জন্য বাড়ির গেইটও দেখা যাচ্ছে না। সে ঘুরে দাঁড়াল ঘরে ঢোকার জন্য। তখন মনে হলো, উঠানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আবার ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল,তার শ্বাশুড়ি ফরিনাকে। তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে আছে। শুকিয়েছে খুব বেশি। গায়ে লাল-সাদা রঙের মিশ্রণে শাড়ি। ফরিনার চারপাশে উড়ো কুয়াশা। কুয়াশার দেয়াল ভেদ করে যেন তিনিই শুধু আসতে পেরেছেন। পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে বের হলো। কাছে এসে দাঁড়াতেই বুকটা হুহু করে উঠল। ফরিনা পদ্মজাকে দেখে কেঁদে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর ফরিনার ঠান্ডা দুই হাত ধরে বলল, 'এতো সকালে কেন আসতে গেলেন? আমরা তো যেতামই।'

'এতো রাগ তোমার?'

'না, আম্মা। আপনার প্রতি কোনো রাগ নেই আমার। আট মাস আপনি আমার যে যত্ন নিয়েছেন মায়ের অভাববোধ করিনি। মনে হয়েছিল, আমার মা ছিল আমার পাশে।'

'তাইলে কেরে যাও না আমার কাছে? আমার ছেড়ায় কেন মুখ ফিরায়া নিছে আমার থাইকা?'

'উনি পাগল। আম্মা, আপনি কেমন আছেন? দেখে বোঝা যাচ্ছে,ভালো নেই। আম্মা বিশ্বাস করুন,আপনার প্রতি আমাদের রাগ নেই। ওই বাড়িটা দেখলে খুব কষ্ট হয় আম্মা। খুব যন্ত্রনা হয়। এজন্য যাই না। আপনাকে অনেকবার চিঠি লিখেছি, যেন ঢাকা গিয়ে কয়দিন থেকে আসেন। গেলেন না কেন?'

ফরিনা অবাক হয়ে বললেন, 'আমার কাছে তো কুনু চিডি আসে নাই।'

'সেকী! আমি তো এই চার বছরে ছয়টা চিঠি লিখেছি আপনার নামে। পাঠিয়েছিও।'

'আমি তো পাই নাই।'

ফরিনা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পদ্মজা বলল, 'আচ্ছা এ ব্যাপারে কথা বলব উনার সাথে। আমি যখন আম্মার কবর জিয়ারত করতে আসি তখনও তো এসে আমাকে আর উনাকে দেখে যেতে পারতেন আম্মা।'

'তোমরা বাড়িত যাও না বইলা, আমি ভাবছি আমারে ঘেন্না করো তোমরা তাই সামনে আইতে পারি নাই। আমার জন্যও আমার নাতনিডা...'

ফরিনা হুহু করে কেঁদে উঠলেন। পদ্মজার চোখ ছলছল করে উঠল। সে ফরিনাকে বলল, 'আপনার জন্য কিছু হয়নি আম্মা। আপনি এভাবে ভাববেন না। কান্না থামান।'

'যতই বলো মা, কান্না থামাবে না। চার বছর ধরে এভাবে কাঁদছে।'

মজিদের কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা দ্রুত ঘোমটা টেনে নিল। মজিদকে সালাম করে বলল, 'ভালো আছেন আব্বা?'

'এইতো আছি কোনোমতে।'

'আম্মা, আপনি কান্না থামান। আমার খারাপ লাগছে।'

ফরিনা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। এরপর বললেন, 'আমার বাবু কই?'

'ভেতরের ঘরে ঘুমাচ্ছে। ডেকে দিচ্ছি।'

'না, থাহক। ঘুমাক।'

পদ্মজা শ্বশুর, শ্বাশুড়িকে সদর ঘরে নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে সবার ঘুম ভাঙে। আমির যত যাই বলুক, মাকে দেখেই নরম হয়ে যায়। জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ ছেলে আর ছেলের বউকে ছাড়া কিছুতেই বাড়ি যাবেন না। কম হলেও চার-পাঁচ দিন থেকে আসতে হবে। অবশেষে, আমির রাজি হলো। প্রেমার সামনে পরীক্ষা তাই প্রেমাকে সাথে নিল না। বাসন্তী, প্রেমা,প্রান্ত বাড়িতে রয়ে যায়। পূর্ণা সাথে যায়।

হাওলাদার বাড়ির গেইট পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই পদ্মজার সর্বাঙ্গ অদ্ভুত ভাবে কেঁপে উঠে। সূর্য উঠেনি। দমকা বাতাস হচ্ছে। সেই বাতাসে সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে বাজপাখি উড়ে যায়। সেই পাখির ডাক অদ্ভুত হাহাকারের মতো। যেনও মনের চেপে রাখা কষ্ট ও ক্ষোভ নিয়ে কেউ আত্মচিৎকার করছে। নাকি এটা নিছকই পদ্মজার ভাবনা? চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চার বছর পূর্বেই তো এখানে এই জায়গাটায় তার আদরের তিন মাসের কন্যা পারিজার রক্তাক্ত লাশ পড়ে ছিল! পদ্মজার বুক কেমন করে উঠল! বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমির উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, 'খারাপ লাগছে?'

পদ্মজা স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'না।'

থামল, নিঃশ্বাস নিল। এরপর বলল, 'পূর্ণাকে দেখুন,কেমন পাগল।'

আমির সামনে তাকাল। পূর্ণা মাথার উপর ব্যাগ নিয়ে সবার আগে বড়ই খেয়ে খেয়ে কোমর দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! অন্দরমহলের সামনে এবং আলগ ঘরের পিছনের মধ্যিখানে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। হেমন্তকালে ধান কাটা হয়েছে,তখন কামলারা আলগ ঘরে থেকেছে। তাদের জন্যই এই টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। টিউবওয়েলের চারপাশে গোল করে সিমেন্ট দিয়ে মেঝেও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা কলপাড় তৈরি হয়েছে। পূর্ণা নারিকেল গাছের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। কলপাড়ে এক সুদর্শন যুবক পিঁড়িতে বসে গোসল করছে। পরনে লুঙ্গি। রানি গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন বলছে। পূর্ণা ব্যাগ রেখে হা করে সেই যুবককে পরখ করে। সুঠম,সুগঠিত শরীর,মায়াবী- ফর্সা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক। প্রশস্ত বুকে ঘন পশম। চওড়া পিঠ। শক্তপোক্ত দেখতে দুই হাত। ডান হাতে ছোট কলস নিয়ে মাথায় পানি ঢালছে। সেই জল চুল থেকে কপাল,কপাল থেক ঠোঁট,ঠোঁট থেকে বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ চুল ঝাঁকি দিয়ে উঠল। জলের ছিটা ছড়িয়ে পড়ে

চারিদিকে। রানি যুবকটিকে বকতে বকতে দূরে সরে দাঁড়ায়। যুবকটি আবারও মাথায় পানি ঢেলে চুল ঝাঁকায়। উদ্দেশ্য, রানিকে ভিজিয়ে দেয়া। পূর্ণা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দ্রুত ব্যাগ মাটিতে রেখে দিল। ওড়না ঠিক করে,চুল ছেড়ে দিল। এরপর কলপাড়ের দিকে হেঁটে গেল। ঠোঁটে তার হাসি। চোখের দৃষ্টি দেখলে যে কারো মনে হবে, পূর্ণা অপরিচিত এই যুবকটিকে চোখ দিয়ে পিষে ফেলছে। কলপাড়ের পাশে ভেজা কাদা ছিল। পূর্ণা পা রাখতেই পিছলে পড়ে যায়। ধপাস শব্দ শুনে যুবকটি লাফিয়ে উঠে ভরাট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'বোয়াল মাছ! বোয়াল মাছ!

পর্ব ৪৮

ঘটনাটি পদ্মজার চোখে পড়তেই ছুটে আসে। রানি আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব। সে পূর্ণাকে তুলতে দৌড়ে আসতে গিয়ে শাড়ির সাথে পা প্যাঁচ লাগিয়ে পূর্ণার চেয়ে ঠিক এক হাত দূরে ধপাস করে পড়ল! এ যেন ধপাস করে পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুবকটি হাসবে নাকি সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সেকেন্ড দুয়েক ভেবে মনস্থির করল, হাসা ঠিক হবে না। সাহায্য করা উচিত। কলপাড় থেকে এক পা নামাতেই পদ্মজা চলে আসে। পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। যুবকটি রানিকে সাহায্য করে উঠার জন্য। পদ্মজা উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল, 'খুব ব্যথা পেয়েছিস?'

পূর্ণার মুখ ঢেকে আছে রেশমি ঘন চুলে। আড়চোখে একবার যুবকটিকে দেখল। এরপর মিনমিনিয়ে বলল, 'না।'

ফরিনা ছুটে এসে বললেন, 'এইডা কেমনে হইলো। এই ছেড়ি এমনে আইলো কেন? ও ছেড়ি কোনহানে দুঃখ পাইছো?'

পূর্ণা নরম কণ্ঠে বলল, 'চাচি,ব্যাথা পাইনি।'

'পাওনি মানে কী? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছো না। পদ্মজা,ওকে নিয়ে যাও। কাদা মেখে কী অবস্থা!'বলল আমির।

রানি পদ্মজা আর আমিরকে দেখে প্রচন্ড অবাক হয়েছে! খুশিতে তার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল, 'দাভাই? তুমি আইছো! পদ্মজা, এতোদিনে আমরারে মনে পড়ছে?'

পদ্মজা মৃদু হেসে বলল, 'তোমাকে সবসময়ই মনে পড়ে আপা। আমরা পরে অনেক গল্প করব। পূর্ণাকে নিয়ে এখন ভেতরে যাই।'

পদ্মজা এবং ফরিনা পূর্ণাকে ধরে ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। পিছু পিছু রানিও গেল। যুবকটি আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম আমির ভাই। চিনতে পারতাছেন?'

আমির যুবকটিকে চেনার চেষ্টা করল। এরপর বলল, 'মৃদুল না?'

'জি ভাই।'

আমিরের হাসি প্রশস্ত হলো। মৃদুলের সাথে করমর্দন করে বলল, 'সেই ছোটবেলায় দেখেছি। কতবড় হয়ে গেছিস। চেনাই যাচ্ছে না।'

'আমার ঠিকই আপনারে মনে আছে।'

আমির মৃদুলের বাহুতে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'ছোটবেলা তো তুমি করে বলতি। এখন আপনি আপনি বলছিস কেন?'

মৃদুল এক হাতে ঘাড় ম্যাসাজ করে হাসল। এরপর বলল, '১৬-১৭ বছর পর দেখা হইছে তো।'

'তো কী হয়েছে? তুমি বলে সম্বোধন করবি। গোসল করছিলি নাকি?'

'জি।'

'কাপড় পাল্টে আয়, অনেক আলাপ হবে।'

'আচ্ছা ভাই।'

আমির নারিকেল গাছের পাশে তাদের ব্যাগ দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা নিল,এরপর অন্দরমহলের দিকে গেল।

বৈঠকখানায় পদ্মজা বসে আছে। পূর্ণার কোমরে,পায়ে গরম সরিষা তেল মালিশ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছে। হুমকিও দিয়ে এসেছে,ঘর থেকে বের হলে একটা মারও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা মুখ দেখে মনে হয়েছে,আর বের হওয়ার সাহস করবে না। বেশ জোরেই পড়েছিল। পা,কোমর লাল হয়ে গেছে। এই বাড়িটা মৃতপ্রায়। আগে তাও মানুষ আছে বলে মনে হতো। এখন মনেই হয় না এই বাড়িতে কেউ থাকে। নির্জীব, স্তব্ধ। রান্নাঘর থেকে বেশ

কিছুক্ষণ পর পর টুংটাং শব্দ আসছে। ফরিনা এবং আমিনা তাড়াহুড়ো করে রান্না করছেন। আমির বের হয়েছে। বাড়িতে মাত্রই এলো আর কীসের কাজে বেরিয়েও পড়ল। স্তব্ধতা ভেঙে একটা ছোট বাচ্চা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে। বাচ্চাটার কোমরে, গলায় তাবিজ। তাবিজের সাথে ঝনঝন শব্দ তোলা জাতীয় কিছু গলায় ঝুলানো। পদ্মজা বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। রানি বৈঠকখানায় এসে বাচ্চাটিকে বলল, 'আলো আম্মা,এদিকে আয়। তোর গায়ে ময়লা। পদ্ম মামির কাপড়ে লাগব।'

পদ্মজা আলোর গাল টেনে বলল, 'কিছু হবে না। থাকুক।'

এরপর আলোর গালে চুমু দিল। আলোর দুই বছর। রানির মেয়ে হয়েছে শুনেছিল পদ্মজা। কিন্তু আসতে পারেনি দেখতে। এবারই প্রথম দেখা। পদ্মজা বলল, 'আলো ভাগ্যবতী হবে। দেখতে বাপের মতো হয়েছে।'

বাপের মতো হয়েছে কথাটি শুনে রানির মুখ কালো হয়ে যায়। তার প্রথম বাচ্চা মারা যাওয়ার এক বছরের মাথায় সমাজের নিন্দা থেকে বাঁচাতে খলিল হাওলাদার রানির জন্য পাত্র খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু কেউই রানিকে বিয়ে করতে চায় না। সবাই জেনে গিয়েছিল,রানি অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছে। এরপর বাচ্চাটা মারাও গেল। কোনো পরিবার রানিকে ঘরের বউ করতে চাইছিল না। এদিকে বিয়ে দিতে না পেরে সমাজের তোপে আরো বেশি করে পড়তে হচ্ছিল। খলিল হাওলাদার পিতা হয়ে রানিকে ফাঁস লাগিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তখন মজিদ হাওলাদার মদনকে ধরে আনলেন। মদন,মগার বাবা মা নেই। দুই ভাই এই বাড়িতেই ছোট থেকে আছে। এই বাড়ির সেবার কাজে নিযুক্ত। বাধ্য হয়ে মদনের সাথে বাড়ির মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। মদন কামলা থেকে ঘর জামাই হয়। রানি মন থেকে মদনকে আজও মানতে পারেনি। কখনোও পারবেও না। ঘৃণা হয় তার। মাঝে মাঝে আলোকেও তার সহ্য হয় না। আলোর মুখটা দেখলেই মনে হয়, এই মেয়ে মদনের মেয়ে। কামলার মেয়ে!

আলো আধোআধো স্বরে বলল, 'নান্না,নান্না।'

পদ্মজা আদুরে কণ্ঠে বলল, 'নানুর কাছে যাবে?'

আলো পদ্মজার কোল থেকে নামতে চাইল। পদ্মজা নামিয়ে দিল। আলো দৌড়ে রান্নাঘরে যায়। রানি বলল, 'আম্মার জন্য পাগল এই ছেড়ি। সারাবেলা আম্মার লগে লেপ্টায়া থাকে।'

'তুমি নাকি আলোকে মারধোর করো?'

রানি চমকাল। প্রশ্ন করল, 'কেলা কইছে?'

'শুনেছি। আলো একটা নিষ্পাপ পবিত্র ফুল। ওর কী দোষ?'

রানি চুপ করে রইল। পদ্মজা বলল, 'সব রাগ এইটুকু বাচ্চার উপর ঝাড়া ঠিক না আপা।'

'আমার কষ্টডা বুঝবা না পদ্মজা।'

'বুঝি। এতোটা অবুঝ না আমি। আলো মদন ভাইয়ার মেয়ে এটা ঠিক। কিন্তু তোমারও তো মেয়ে। তোমার গর্ভে ছিল। তোমার রক্ত খেয়েছে দশ মাস।'

'আমি কী আমার ছেড়িরে ভালোবাসি না? বাসি। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। জানো পদ্মজা,আবদুল ভাইয়ের কথা মনে হইলে আমার সব অসহ্য লাগে। একলা একলা কাঁনদি। তহন আলো কানলে...আমি ওরে এক দুইডা থাপ্পড় মারি। পরে আফসোস হয় কেন মানলাম ছেড়িডারে। ও তো আমারই অংশ।'

'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো। নিয়তির উপর কারো হাত নেই। অতীত ভুলতে বলব না। কিছু অতীত ভুলা যায় না। কিন্তু চাইলেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে বাঁচা যায়। নিজেকে মানিয়ে নাও। আলোর প্রতি যত্নশীল হও। মানুষের মতো মানুষ করো। একটা মেয়েকে নিয়ে সমাজে বাঁচা যুদ্ধের মতো। গোড়া থেকে খেয়াল দাও।'

'তোমার কথা হুনলে বাঁচার শক্তি পাই পদ্মজা।'

পদ্মজা হাসল। বৈঠকখানায় আমির এসে প্রবেশ করল। তার পিছু পিছু মৃদুল। মৃদুলকে দেখে রানি হাসল। পদ্মজাকে দেখিয়ে বলল, 'এইযে এইডা হইছে,পদ্মজা। তোর ভাবি।'

মৃদুল পদ্মজাকে সালাম করার জন্য ঝুঁকতেই পদ্মজা বলল, 'না,না। কোনো দরকার নেই। বসুন আপনি।'

মৃদুল বসল। এরপর পদ্মজাকে বলল, 'আপনের কথা কথা অনেক শুনছি। আজ দেখার সৌভাগ্য হলো।'

আমির পদ্মজাকে বলল, 'ওর নাম মৃদুল। রানির মামাতো ভাই। ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে কয়দিন পর পর আসতো। যখন আট-নয় বছর তখন দূরে চলে যায়। আর দেখা হয়নি। চাইলেই দেখা হতো। কেউ চায়নি। তাই দেখাও হয়নি।'

'কোথায় থাকেন?'জানতে চাইল পদ্মজা।

'জি ভাবি, রামপুরা।'

রামপুরার কথা পদ্মজা শুনেছে। তাদের জেলার শহর এলাকার নাম রামপুরা। সবাই চিনে এই এলাকা। ছেলেটার চেহারা উজ্জ্বল, চকচকে। হাসিখুশি! আলাপে আলাপে জানতে পারল,মৃদুল পদ্মজার চেয়ে দুই বছরের বড়। মেট্রিক ফেইল করার পর আর পড়েনি। মিয়া বংশের ছেলে। কথাবার্তায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ দুই রূপই আছে। আর ভীষণ রসিক মানুষও বটে!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা দোতলায় গেল। সাথে আমির রয়েছে। নূরজাহান বেশ কয়েক মাস ধরে অসুস্থ। শরীরের জায়গায় জায়গায় ঘা। চামড়া থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। সারাক্ষণ যন্ত্রনায় আর্তনাদ করেন। নূরজাহানের ঘরে ঢুকতেই নাকে দূর্গন্ধ লাগে। পদ্মজা নাকে রুমাল চেপে ধরে। নূরজাহান বিছানার উপর শুয়ে আছেন। সময়ের ব্যবধানে একেবারে নেতিয়ে গিয়েছেন। বয়সটা যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। হাড্ডি ভেসে আছে। লজ্জাস্থান ছাড়া পুরো শরীর উন্মুক্ত। এক পাশে লতিফা দাঁড়িয়ে আছে। নূরজাহানের মাথার কাছে একজন কবিরাজ বসে রয়েছেন। একটা কৌটা থেকে সবুজ দেখতে তরল কিছু নূরজাহানের ক্ষত স্থানগুলোতে লাগাচ্ছেন। পদ্মজা নূরজাহানের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নাক থেকে রুমাল সরিয়ে দূর্গন্ধের সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ডাকল, 'দাদু? দাদু... শুনছেন।'

নুরজাহান ধীরে ধীরে চোখ খুলেন। পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'খুব কষ্ট হয়? কোথায় কোথায় বেশি যন্ত্রণা হয়?'

নূরজাহান শুধু তাকিয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজার বুকটা হাহাকার করে উঠল। বয়স্ক একজন বৃদ্ধা কত কষ্ট করছে! লতিফা বলল, 'দাদু কথা কইতে পারে না। খালি কান্দে।'

নূরজাহানের অসহায় চাহনি দেখে পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। সে নূরজাহানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'আল্লাহর নাম স্বরণ করেন। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য্য ধরুন।'

তারপর লতিফাকে বলল, 'ভালো করে খেয়াল রেখো উনার।'

আমির বেশ অনেকক্ষণ নূরজাহানের সাথে কথা বলল। নূরজাহান জবাব দেন না,শুধু উ,আ শব্দ করেন। আমিরের দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে। পদ্মজার ভালো লাগে না দেখতে। সে আমিরকে বুঝিয়ে,শুনিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। বারান্দা পেরোনোর পথে রুম্পার ঘরের দরজা খোলা দেখল পদ্মজা। যাওয়ার সময় তো বন্ধই ছিল। পদ্মজা ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। দেখল,কেউ নেই। পালঙ্কও নেই। সে আমিরকে প্রশ্ন করল, 'রুম্পা ভাবি কোথায়?'

আমিরও এসে উঁকি দিল। খালি ঘর। সে অবাক স্বরে বলল, 'জানি না তো।'

পদ্মজা চিন্তায় পড়ে গেল। হেমলতা মারা যাওয়ার পর গ্রামে আর থাকেনি। শহরে ফিরে যায়। এক মাসের মাথায় জানতে পারল, সে গর্ভবতী। গর্ভাবস্থার প্রথম পাঁচ মাস খুব খারাপ যায়। প্রতি রাতে হেমলতাকে স্বপ্নে দেখতো। ছয় মাসের শুরুতে ফরিনা নিয়ে আসেন গ্রামে। এ সময় পদ্মজার একজন মানুষ দরকার। কাছের মানুষদের দরকার। তাই আমিরও

নিষেধ করেনি। তার মধ্যে আবার মারা গেলেন মোর্শেদ। পদ্মজা আরো ভেঙে পড়ে। কাছের মানুষদের সহযোগিতায়, বাচ্চার কথা ভেবে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে। সফলও হয়। তখন পদ্মজা অনেকবার চেষ্টা করেছে রুম্পার সাথে দেখা করার। মদন আর,নূরজাহানের নজরের বাইরে গিয়ে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। এরপর কোল আলো করে এলো ফুটফুটে কন্যা। পদ্মজা তারপরও চেষ্টা চালিয়ে গেল। রুম্পাকে নজরবন্দি করে রাখাটা খটকা বাড়িয়ে দেয়।

একদিন সুযোগ আসে। সেদিন রাতে নূরজাহান, মদন, আমির,রিদওয়ান,আলমগীর সবাই যাত্রাপালা দেখতে যায়। বাড়িতে বাকিরা থাকে। দুই তলায় শুধু পদ্মজা তার মেয়ে পারিজা আর ফরিনা ছিল। ফরিনার দায়িত্বে পারিজাকে রেখে রুম্পার ঘরে যায় পদ্মজা। রুম্পা তখন প্রস্রাব,পায়খানার উপর অচেতন হয়ে পড়েছিল। পদ্মজা নাকে আঁচল চেপে ধরে সব পরিষ্কার করে। রুম্পার জ্ঞান ফেরায়। জানতে পারে তিন দিন ধরে রুম্পাকে খাবার দেয়া হচ্ছে না। পদ্মজা খাবার নিয়ে আসে। রুম্পাকে খাইয়ে দেয়। কথা বলার সুযোগ হওয়ার আগেই ফরিনার চিৎকার ভেসে আসে। ফরিনার কাছে পারিজা আছে! পদ্মজার বুক ধক করে উঠে। ছুটে বেরিয়ে আসে। ঘরে এসে দেখে ফরিনা নেই। ফরিনার আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা সেই আর্তনাদের সাথে দুমড়ে,মুচড়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে উল্টিয়ে পড়ে। তবুও ছুটে যায়। ফরিনার কান্নার চিৎকার অনুসরণ করে অন্দরমহলের বাইরে বেরিয়ে আসে। চাঁদের আলোয় ভেসে উঠে তার তিন মাসের কন্যার রক্তাক্ত দেহ। ফুটফুটে কন্যা! ছোট ছোট হাত,পাগুলো নিথর হয়ে পড়ে আছে। সময় থেমে যায়। মনে হয়, নিশুতি রাতের প্রেতাত্মারা একসঙ্গে, একই স্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়। কোন পাষাণ মানবসন্তান তিন মাসের বাচ্চার গলায় ছুরি চালিয়েছে? তার কী হৃদয় নেই? পদ্মজা মেয়ের নাম ধরে ডেকে চিৎকার দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

পুলিশ আসে,তদন্ত হয়। ফরিনা দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হাত বাড়িয়ে দেখেন,পারিজা নেই। দ্রুত উঠে বসেন। পদ্মজা নিয়ে গেল নাকি খুঁজতে থাকেন। বারান্দা থেকে বাইরে চোখ পড়তেই দেখলেন,একজন মোটা, কালো লম্বা চুলের লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। খালি জায়গায় কাঁথায় মোড়ানো কিছু একটা পড়ে আছে। ফরিনা ছুটে বাইরে আসেন। নাতনির রক্তাক্ত দেহ দেখে চিৎকার শুরু করেন। পুলিশ কোনো কিনারা খুঁজে পায়নি। এরপরের দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠে। পদ্মজা মাঝরাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। খাওয়া-দাওয়া একদমই করতো না। মাঝরাতে মেয়ের কবরে ছুটে যেত। আমির পদ্মজাকে নিয়ে হাওলাদার বাড়ি থেকে দূরে সরে আসে। প্রায় এক বছর পদ্মজা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এরপর বুকে ব্যথা নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে,একদিন ফিরবে অলন্দপুর। সেই নিষ্ঠুর খুনিকে শাস্তি দিবেই। জানতে চাইবে,কীসের দোষে তার তিন মাসের কন্যা বলি হলো?

কেউ জানুক আর নাই বা জানুক,পদ্মজা জানে হাওলাদার বাড়িতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য,পারিজার খুনিকে বের করা। সে শতভাগ নিশ্চিত এই বাড়ির কেউ না কেউ জড়িত এই খুনের সাথে। শুধু বের করার পালা। পুরনো কথা মনে পড়ে পদ্মজা দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকল। আমির জল মুছে দিল। এরপর বলল, 'বোধহয় তিন তলায় রাখা হয়েছে।'

পদ্মজা তিন তলার সিঁড়ির দিকে তাকাল। শুনেছে,তিন তলার কাজ নাকি সম্পূর্ণ হয়েছে। অনেকগুলো ঘর হয়েছে। সে আর কথা বাড়াল না। এখন গোসল করা উচিত। আযান পড়বে। আজ রাত থেকেই সে নিশাচর হবে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে,সব রহস্যের জাল কাটতে হবে। এটাই তার নিজের সাথে নিজের প্রতিজ্ঞা। আমির ডাকল, 'কী হলো? কী ভাবো?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু না।

ঘরে চলুন।'

'কিছু তো ভাবছিলে।'

'এতদিনের জন্য আসছি গ্রামে। চাকরিটা থাকবে তো?'

'থাকবে না কেন? রফিক কতোটা সম্মান করে আমাকে দেখোনি? আর তোমার যোগ্যতার কী কমতি আছে? যেখানে ইচ্ছে সেখানেই চাকরি হবে।'

পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে চাকরি করতে দিবেন?'

আমির হেসে ফেলল। বলল, 'তা অবশ্য দেব না।'

পর্ব ৪৯

পড়ন্ত বিকেলের শীতল বাতাসে শরীর কাঁটা দিচ্ছে। পদ্মজা শাল গায়ে জড়িয়ে নেয়। নিচতলায় এসে ফরিনার ঘরে যায়। ফরিনা কাঁথা সেলাই করছিলেন। পদ্মজাকে দেখে দুই পা ভাঁজ করে বসলেন। বললেন, 'তুমি আইছো!'

পদ্মজা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'জি আম্মা। কাঁথা সেলাই করছিলেন নাকি। আমি সাহায্য করি?'

'না, না তুমি এইসব পারবা না। সুঁই লাগব হাতে।'

'কিছু হবে না আম্মা। প্রতিদিনই সেলাই করা হয়।'

ফরিনা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'তুমি কাঁথা সিলাও?'

পদ্মজা হেসে বলল, 'ওই একটু।'

'কেরে? আমরা থাকতে তুমি সিলাও কেরে? তোমার সৎ আম্মায় তো নকশিকাঁথা সিলায়। হে থাকতে তোমার সিলাই করা লাগে কেরে?'

পদ্মজা ফরিনার হাত থেকে সুঁই টেনে নিয়ে বলল, 'আব্বা মারা যাওয়ার পর দুই বছর আমি কেমন অবস্থা ছিলাম জানেনই তো। সে অবস্থায় আমার পক্ষে আমার পরিবারের জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। তখন উনি(বাসন্তী) পর হয়েও,সৎ মা হয়েও নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব তুলে নিলেন। কিন্তু উনি যতটুকু করতেন ততটুকুতে পরিবার চলতে গিয়ে হিমশিম খেতো। তাই আমিও চেষ্টা করেছি একটু যদি নকশিকাঁথার পরিমাণটা বাড়ানো যায়।'পদ্মজার ফুলের পাপড়ির মতো ফোলা ফোলা দুটি ঠোঁটে অল্প হাসি। সেই হাসিতে পরমা সুন্দরীর মুখমন্ডল অল্প আভায় আলোকিত। ফরিনা অবাক হয়ে সেই হাসি দেখেন। মন দিয়ে কাঁথায় ফুল তুলছে পদ্মজা। দাঁত দিয়ে সুতা কেটে ফরিনার দিকে তাকাল সে। পদ্মজার নিখুঁত চোখ-নাক। ফরিনা তাকিয়েই আছেন। পদ্মজা ডাকল, 'আম্মা?'

ফরিনার সম্বিৎ ফিরল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নাকি শহরে কাম করো?'

পদ্মজা হাসল। বলল, 'হুম,করা হয়। প্রেমা,প্রান্ত দুইজনই পড়াশোনা করে। পড়ালেখার কত খরচ! আর পূর্ণা তো পড়ালেখার চেয়ে বেশি খরচ করে ফেলে শাড়ি-অলংকার কিনতে গিয়ে। আম্মা নেই। বাধা দিতে কষ্ট হয়। আর উনি নিজের সব সঞ্চয় উজার করে দেন আমার তিন ভাই বোনকে। টাকা তো থাকে না। তাই চাকরি নিতে হলো। দুই বোনের বিয়ে দিতে হবে না? আমার তো ফরজ কাজ বাকি। তার জন্য টাকা জমাতে হচ্ছে। আর,উনার নকশিকাঁথার টাকার সাথে বেতনের কিছুটা অংশ মিলিয়ে পাঠিয়ে দেই। বেশ ভালোই চলছে। উনি আছেন বলেই আমার মাথার উপরের চাপটা কমেছে।'

'হ, বাসন্তী অনেক ভালা।আমি হের চেয়ে চার বছরের বড়। মেলা সম্মান করে আমারে। আচ্ছা,আমির তোমারে বাইরে কাম করতে দিছে?'

এ প্রশ্নে পদ্মজা কপাল চাপড়ে বলল, 'আর বলবেন না আম্মা! কী যে যুদ্ধ করতে হয়েছে। শেষমেশ রাজি হয়েছেন। কিন্তু উনার অফিসে নাকি চাকরি করতে হবে। উনার অফিসে চাকরি নিলে উনি আমাকে কোনো কাজ করতে দিতেন? টাকা ঠিকই মাস শেষে দিতেন। ঘুরেফিরে, স্বামীর টাকায় বাপের বাড়ি খায় কথাটা আত্মসম্মানের সাথে লেগে যেত। এ নিয়ে তিনদিন আমাদের ঝগড়া ছিল। আলাদা থেকেছি,কেউ কারো সাথে কথা বলিনি।'

ফরিনা বেশ আগ্রহ পাচ্ছেন। উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন, 'এরপরে কী হইলো? কাম করতে দিছে কেমনে?'

'এরপর... তিন দিন পর এসে বলল, চাকরি পেয়েছে একটা। ছয় ঘন্টা কাজ। হিসাব রক্ষকের পদ। বেতন ভালো। জানেন আম্মা, আমি ভীষণ অবাক হয়েছি! এতো কম সময়ের চাকরি আবার বেতনও তুলনায় বেশি। এরপর জানতে পারি,উনার পরিচিত একজনের অফিসে চাকরি বন্দোবস্ত উনিই করেছেন। উনি চান না আমি বেশি সময় বাইরে থাকি। আবার জেদ ধরেও বসে ছিলাম। এভাবেই সব ঠিক হয়। ইনশাআল্লাহ আম্মা,পূর্ণার বিয়েটা

ধুমধামে হয়ে যাবে। প্রেমার তো দেরি আছে। অনেক পড়বে ও।'

ফরিনা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহ হাজার বছর বাঁচায়া রাখুক।'

'আম্মা, রুম্পা ভাবি কী তিন তলায়?'

'হ।'

'আজ দেখতে যাব ভাবছি। চাবি কার কাছে?'

ফরিনা মুখ গুমট করে বললেন, 'হেই ঘরে যাওনের দরকার নাই। রিদওয়ান চাবি দিব না। ওরা আর আমারারে দাম দেয় না। যেমনে ইচ্ছা চলে।'

'দিবে না মানে কী? আপনি গুরুজন আপনাকে দিতে বাধ্য।'

'চাইছিলাম একবার, যা ইচ্ছা কইয়া দিছে।'ফরিনার মুখে আধার নেমে আসে। তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার বললেন, 'চাবি চাওনের লাইগগা রিদওয়ান হের আম্মারেও মারছে।'

পদ্মজার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়, 'সেকী! মায়ের গায়ে হাত তুলছে?'

ফরিনা কাঁথা সেলাই করতে করতে বললেন, 'নিজের মা আর কই থাইকা! এই ছেড়ার মাথা খারাপ। অমানুষ।'

'বাড়ির অন্যরা কিছু বলেনি?'

'অন্যরা কারা?'

'আব্বা, চাচা, বড় ভাই কেউ কিছু বলেনি?'

'বাকিদের কথা জানি না। তোমার শ্বশুর তো নিজেই শকুনের বাচ্চা।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। ফরিনাও চকিতে চোখ তুলে তাকান। তিনি মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। দুজন দুজনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পদ্মজা প্রশ্ন করার আগে ফরিনা বললেন, 'পূর্ণায় গাছে উঠছে। সকালে আছাড়ডা খাইল বিকেল অইতেই গাছে উইট্টা গেছে। ছেড়িডারে কয়ডা মাইর দিও।'

পদ্মজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে,তার শ্বাশুড়ি আগের কথাটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। সে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারল না। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি আসি আম্মা।'

'যাও।'

পদ্মজা দরজা অবধি এসে ফিরে তাকাল। ফরিনা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। পদ্মজা ঘর ছাড়তেই তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পদ্মজা উদাসীন হয়ে হাঁটছে। ফরিনা কেন নিজের স্বামীকে শকুনের বাচ্চা বললেন? পদ্মজা দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। এখন এসব ভাবা যাবে না। রিদওয়ানের কাছ থেকে চাবি নিতে হবে। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে রিদওয়ানের ঘরের সামনে আসে। দরজায় শব্দ করতেই ওপাশ থেকে রিদওয়ানের কণ্ঠ ভেসে আসে, 'কে?'

পদ্মজা জবাব না দিয়ে,আরো জোরে শব্দ করল। রিদওয়ান কপাল কুঁচকে দরজা খুলল। পদ্মজাকে দেখে কপালের ভাঁজ মিলিয়ে যায়। ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। মোটা হয়েছে আগের চেয়ে। গালভর্তি ঘন দাঁড়ি। এক দুটো চুল পেকেছে। সে খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'আরে বাপরে,পদ্মজা আমার দুয়ারে এসেছে!'

পদ্মজা সোজাসুজি বলল, 'রুম্পা ভাবির ঘরের চাবি দিন।'

রিদওয়ান দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। বলল, 'এতদিন পর এসেছো আবার আমার ঘরের সামনে। ভেতরে আসো,বসো। এরপর কথা বলি।'

'আমি আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি। দয়া করে চাবিটা দিন।'

'চাবি তো দেব না।'

'কী সমস্যা?'

রিদওয়ান পদ্মজার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আরে,ঘরে আসো তো আগে।'

পদ্মজা এক ঝটকায় রিদওয়ানের হাত সরিয়ে দিল। চোখ গরম করে তাকিয়ে বলল, 'চাবি দিন।'

'চোখ দিয়ে তো আগুন ঝরছে। কিন্তু আমি তো ভয় পাচ্ছি না। চাবি আমি দেব না।'

‘দেবেন না?’

রিদওয়ান আড়মোড়া ভেঙে আয়েশি ভঙ্গিতে বলল, ‘না।’

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। চলে গেল। রিদওয়ান পিছু ডেকেছে। সে শুনেনি। মগাকে দিয়ে পাথর নিয়ে তিন তলায় আসে। মদন একটা ঘরের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে ছিল। পদ্মজা বুঝতে পারে,তাহলে এই ঘরেই রুম্পা আছে। সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই মদন বলল, ’কিছু দরকার ভাবি?’

পদ্মজা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ’তালা ভাঙব। মগা,তালা ভাঙ।’

মদন দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে, ’রিদওয়ান ভাইয়ের কাছে চাবি আছে। তার কাছ থাইকা লইয়া আসেন। তালা ভাইঙেন না।’

‘উনি আমাকে চাবি দেননি। তাই আমি তালা ভাঙব। আপনি সরে দাঁড়ান।’

‘না ভাবি, এইডা হয় না। আমার উপরে এই ঘরডার ভার দিছে ।’

‘আপনি সরে দাঁড়ান।’পদ্মজা কথাটা বেশ জোরেই বলল। মদন হাওলাদার বাড়ির বউয়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পাচ্ছে না। সে দৌড়ে নিচে যায়। বাড়ির সবাইকে গিয়ে বলে পদ্মজা তালা ভাঙছে।

খলিল,আলমগীর, আমির,রিদওয়ান,ফরিনা,আমিনা ছুটে আসেন। ততক্ষণে পদ্মজা তালা ভেঙে ফেলেছে। আমির হন্তদন্ত হয়ে এসেই প্রশ্ন করল, ’তালা ভাঙলে কেন?’

‘আপনার ভাই আমাকে চাবি দেননি। আমার রুম্পা ভাবির সাথে দেখা করার ইচ্ছে হচ্ছিল তাই ভেঙেছি।’

‘এইডা অসভ্যতা। তোমারে ভালা ভাবছিলাম। ছেড়ি মানুষের এতো তেজ, অবাধ্যতা ভালা না।’

পদ্মজা এক নজর খলিলকে দেখল। এরপর রুম্পার ঘরে ঢুকল। রুম্পা ঘরের মাঝে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লম্বা চুল এখন ঘাড় অবধি! কে কেটে দিয়েছে? যেন চুল না ময়লা ঝাড়ু। পদ্মজা দৌড়ে রুম্পার পাশে এসে বসে। রুম্পার শাড়ি ঠিক করে দিয়ে ডাকল, ’ভাবি? ভাবি? শুনছো ভাবি?’

রুম্পার সাড়া নেই। গলায়,হাতে,পায়ে মারের দাগ। ফরিনা দেখে চমকে যান। রুম্পার এক হাত চেপে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, ’কেলায় মারছে বউডারে? আল্লাহ গো,কেমনে মারছে। রক্ত শুকায়া পাথথর হইয়া গেছে। এর লাইগগা আমরারে রুম্পার কাছে আইতে দেও না তোমরা? বউডা তোমরারে কী করছে? পাগল মানুষ।’ফরিনা বাড়ির পুরুষদের দিকে চেয়ে কেঁদে বললেন।

আমিনা দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বরাবরই অন্যরকম মানুষ। অহংকারী, হিংসুক। অন্যদের ভালো দেখতে পারেন না। রানির জীবনটা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আরো বেশি খামখেয়ালি হয়ে উঠেছেন। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, ’আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? অন্যরা পাষাণ। আপনি তো পাষাণ না। ভাবিকে বিছানায় তুলে দিন।’

পদ্মজার কথায় আমির রুম্পাকে কোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমির, ফরিনা ছাড়া বাকি সবাই বিরক্তিতে কপাল ভাঁজ করে চলে যায়। তারা অসন্তুষ্ট। খলিল যাওয়ার আগে বিড়বিড় করে পদ্মজাকে অনেক কিছু বললেন। পদ্মজা সেসব কানে নেয়নি। সে শুধু অবাক হয়। মানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা হয়। সে রুম্পার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে। আমিরকে বলে,কবিরাজ নিয়ে আসতে। আমির চলে যায়। ফরিনার কাছ থেকে পদ্মজা জানতে পারল,তিনি দুই বছর পর রুম্পাকে দেখছেন! কী অবাক কান্ড! কখন চুল কাটা হয়েছে জানেন না। পদ্মজা জানতে চাইল, ’কেন এতো ভয় পান বাড়ির পুরুষদের? একটু শক্ত করে কথা বলে ভাবিকে দেখতে আসতে পারলেন না? ভাবির মা বাপের বাড়ি কোথায়? উনারা মেয়ের খোঁজ নেন না?’

‘রুম্পার মা বাপ নাই। ভাই আছে দুইডা। ভাইগুলা আগেই খোঁজ নিত না। পাগল হুনার

পর থাইকা নামও নেয় নাই।'

'মানুষ এতো স্বার্থপর কী করে হয় আম্মা?'

ফরিনা রুম্পার শাড়ির ময়লা ঝেড়ে দেন। ঘরদোর পরিষ্কার করেন। রুম্পার জ্ঞান ফিরে। কিন্তু কথা বলার শক্তিটুকু নেই। সে ড্যাবড্যাব করে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন পদ্মজার জন্য অপেক্ষায় ছিল। পদ্মজার জন্যই বেঁচে আছে! কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কতদিন ধরে তাকে পানি ছাড়া কিছু দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষুধার চোটে বালি খেয়েছে। ঘরের এক কোণে বালির বস্তা রাখা। পেট খারাপ হয়ে পুরো ঘর নষ্ট করেছে। বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গতকাল থেকে সে অজ্ঞান। তবুও কেউ এসে দেখেনি। পদ্মজার চোখের জল আপনাআপনি পড়ছে। রুম্পার কষ্ট তাকে দুমড়েমুচড়ে দিচ্ছে। সে মনে মনে শপথ করে,রুম্পাকে নিয়ে যাবে শহরে। ফরিনা ও পদ্মজা মিলে রুম্পাকে গোসল করাল। এরপর নতুন শাড়ি পরিয়ে,গরম গরম ভাত খাওয়াল। চুলে তেল দিয়ে দিল। খাওয়া শেষে রুম্পা বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। শরীরের শক্তিটুকু আসতে সময় লাগবে। একটু ঘুমালেই হতো। পদ্মজা রুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ঘুমাও ভাবি।'

রুম্পার দূর্বল দুটি হাত পদ্মজার হাত শক্ত করে ধরতে চাইছে। পদ্মজা টের পেল। সে রুম্পার দুই হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যাব না। থাকব আমি।'

রুম্পার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা মুছে দিল। ফরিনাকে বলল, 'আম্মা আমি আমার ঘর থেকে আমার কোরআন শরীফ আর জায়নামাজ নিয়ে আসি। আর উনাকে বলে আসি আপাতত আমি রুম্পা ভাবির সাথে থাকব।'

'যাও তুমি। আমি এইহানে আছি।'

পদ্মজা বেরিয়ে গেল। বারান্দা পেরোবার সময় আলগ ঘরের সামনের উঠানে চোখে পড়ল। সেখানে পূর্ণা,রানি বাচ্চাদের নিয়ে গোল্লাছুট খেলছে। পূর্ণার পরনে শাড়ি! মেয়েটা এতো দস্যি হলো কী করে? সে চোখ সরিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল। সন্ধ্যার আযান পড়ার বেশি দেরি নেই।

রানি এক দলের নেতা,পূর্ণা অন্য দলের। দুই দলের নাম শাপলা আর গোলাপ। প্রতি দলে ছয়জন করে। বাচ্চাগুলোর বয়স ৯-১০ এরকম।

আলো আলগ ঘরের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে। মৃদুল আলগ ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, 'এই বাচ্চারা আমিও খেলতাম।'

রানি বলল, 'না,না। তোরে নিতাম না।'

পূর্ণা মৃদুলকে দেখেই অন্যদিকে চাইল। তার ভীষণ লজ্জা করছে,মৃদুলের সামনে পড়তে! মৃদুল আরেকটু এগিয়ে এসে বলল, 'ডরাইতাছোস? ডরানিরই কথা। এই মৃদুলের সাথে কেউ পারে না। আর তুই তো মুটকি। কেমনে পারবি?'

'আমি তোর চার মাসের বড়। সম্মান দিয়া কথা ক। মাঝখান থাইকা সর। খেলতে দে।'

'ধুর, তোর ছেড়ির এখন খেলার সময়। আর তুই খেলতাছস। সর। এই এই, বোয়াল মাছ। তোমার দলের একটারে বাদ দিয়া আমারে লও। এই মুটকিরে একশোটা গোল্লা না দিলে আমি বাপের ব্যাঠা না।'

পূর্ণা হা করে তাকায়। তাকে বোয়াল মাছ ডাকা হচ্ছে! এজন্য তার দিকে তাকিয়ে বাচ্চারাও হাসছে! দেখতে চকচকে সুন্দর হয়ে গেছে বলে কী,যা ইচ্ছে ডাকার অধিকার বাঘিনী পূর্ণা দিয়ে দিবে? কখনো না। সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, 'আমাকে আপনার কোন দিক দিয়ে বোয়াল মাছ মনে হচ্ছে?'

পূর্ণাকে কথা বলতে দেখে মৃদুল হাসল। রসিকতা করে বলল, 'আরে কালি বেয়াইন দেখি কথা কইতেও পারে।'

পূর্ণা আহত হলো। এক হাতে নিজের গাল ছুঁয়ে ভাবল,সে কী কালি ডাকার মতো

কালো? বাঘিনী রূপটা মুহূর্তে নিভে গেল। তার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। যাকে পছন্দ করলো,সে-ই কালি বলছে। পূর্ণা থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। রানি বলল, 'মৃদুইললে সর কইতাছি। খেলতে দে।'

'আমিও খেলাম। এই আন্ডা তুই বাদ। তোর বদলে আমি বেয়াইনের দলের হয়ে খেলাম।'

মৃদুলের এক কথায় ন্যাড়া মাথার ছেলেটি সরে দাঁড়ায়। মৃদুল খেলার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল। এরপর পূর্ণাকে বলল, 'কালি বেয়াইন তুমি আগে যাইবা? নাকি আমি আগে যামু?'

পূর্ণা মিনমিনিয়ে বলল, 'আমি খেলব না।'

রানি দূর থেকে বলল, 'দেখছস মৃদুইললা তুই খেলার মাঝে ঢুকছস বইললা পূর্ণা খেলত না। সবসময় কেন খেলা নষ্ট কইরা দেস তুই?'

মৃদুল সেসব কথায় ভ্রুক্ষেপও করল না। সে রসিকতার স্বরেই বলল, 'আরে বেয়াইনের শক্তি ফুরায়া গেছে। আর খেলতে পারব না। এই আন্ডা তুই আয়। বেয়াইন খেলব না। তুই আইজ হারবিরে আপা।'

রানি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'আমার দলই জিতব।'

'আগে আগে চাপা মারিস না। আমার মতো দেখায়া দে। এই পেটওয়ালা তুই আগে যা।'

পূর্ণা ব্যথিত মন নিয়ে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের পথে পা রাখে। সে কালো সে জানে! কিন্তু কেউ কালি বললে তার খুব খারাপ লাগে। আল্লাহ কেন তাকে সৌন্দর্য দিলেন না? একটু ফর্সা করে দিলে কী হতো? তার আপার মতো কালো রঙে সবাই সৌন্দর্য কেন খোঁজে পায় না? পূর্ণা দুই হাত দিয়ে দুই চোখের জল মুছে। অভিমানী মন থেমে থেমে কাঁদছে। এই শাড়ি তো মৃদুলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই পরেছিল সে। দরকার নেই এই চকচকে পুরুষ। কেউ তাকে কালি বললে সে ভীষণ রাগ করে! ভীষণ।

পর্ব ৫০

সুনসান নিরবতা চারিদিকে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পদ্মজা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে কখন রুম্পা চোখ খুলবে। বিভোর হয়ে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। দরজায় কেউ টোকা দিতেই পদ্মজা সাবধান হয়ে গেল। রুম্পার নিরাপত্তা নিয়ে তার মন অস্থির হয়ে আছে। সে গম্ভীরকণ্ঠে জানতে চাইল, 'কে কে ওখানে?'

'আমি।'

আমিরের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। এরপর দরজা খুলল। আমিরের চুল এলোমেলো। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে পদ্মজাকে দেখে বলল, 'ঘুম ভেঙে গেল। তোমাকে মনে পড়ছে।'

'আমি তো এখন যেতে পারব না।'

'আমি থাকি তাহলে।'আমিরের নির্বিকার কণ্ঠ।

পদ্মজা চোখ রাঙিয়ে বলল, 'শীতের রাতে মাটিতে থাকবেন? রুম্পা ভাবি বিছানায় ঘুমাচ্ছে। এই ঘরে থাকলে মাটিতেই থাকতে হবে। ঘরে যান।'

'মাটিতেই থাকব।'

'ধুর! আপনি সবসময় ঘাড়ত্যাড়ামি করেন। আপনাকে তো আমি বলে এসেছি কতোটা দরকার রুম্পা ভাবির সাথে থাকা।'

'গত দিনও বোনদের সাথে ছিলে। আজ রুম্পা ভাবির সাথে।'

'কয়টা দিনই তো। আজীবন একসাথেই থাকব।'

'আচ্ছা যাচ্ছি, এখনও ঘুমাওনি কেন?'

পদ্মজা একবার রুম্পাকে দেখে নিয়ে বলল, 'এইতো ঘুমাব।'

আমির চারপাশ দেখে বলল, 'আর,সাবধানে থাকবে। রিদওয়ান দোতলায় ঘুরঘুর করছে। ভয় পাবে না। আমি আছি।'

পদ্মজা চিন্তিত আমিরের চোখের দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি আমার সাথে থাকতে নয়,দেখতে আসছেন আমি ঠিক আছি নাকি তাই না? ভয় পাবেন না তো একদম।'

আমির দুই হাতে পদ্মজার দুই গাল ধরল, 'আমি তো জানি আমার পদ্মবতী কতোটা সাহসী! এজন্যই এই বাড়িতে আসার সাহস করতে পেরেছি।'

'আহ্লাদ হয়েছে? এবার যান।'

আমির হেসে চলে গেল। পদ্মজা অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় তাকিয়ে রইল। এরপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমিরকে সে কতোটা ভালোবাসে সে নিজেও জানে না! আমিরের প্রতিটি স্পর্শ,কথায় ছন্দে হৃদয় স্পন্দিত হয়। আমিরের পাগলামি,খেয়াল রাখা,দায়িত্ববোধ সবকিছু পদ্মজাকে মুগ্ধ করে। একজন আদর্শ স্বামী বোধহয় একেই বলে। আমিরের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়ল। ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে ভাবা সময়টা জাদুর মতো। চোখের পলকে নির্ঘুম রাত কেটে যায় নয়তো নিজের অজান্তে আবেশে ঘুম চলে আসে।

সকালে উঠেই পূর্ণাকে গিয়ে ডেকে তুলল পদ্মজা। এরপর রুম্পার ঘরে এসে নামায পড়ল। কোরআন পড়ল। রুম্পার ঘুম আরো কিছুক্ষণ পর ভাঙে। রুম্পাকে ধরে ধরে টয়লেটে নিয়ে যায় পদ্মজা। এরপর রুম্পাকে রেখে রান্নাঘর থেকে খাবার আনতে যায়। ফরিনা মাত্র চুলা থেকে খিচুড়ি নামিয়েছেন।

'আম্মা, ভাবির জন্য খিচুড়ি নিয়ে যাই?'বলল পদ্মজা।

ফরিনা হেসে বললেন, 'এইডা আবার কওন লাগে। লইয়া যাও। তুমি খাইবা কুনসময়?'

'ভাবিকে খাইয়ে এসে তারপর উনাকে নিয়ে খাব। আম্মা, রাতের হাঁসের মাংস আছে না?'

'হ আছে তো। ওইযে ওই পাতিলডায়।'

পদ্মজা গরম গরম খিচুড়ি হাঁসের মাংসের ভুনা দিয়ে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকে দেখল,রুম্পা মেঝেতে পড়ে আছে। পদ্মজা থালা বিছানার উপর রেখে রুম্পাকে তোলার চেষ্টা করে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'ভাবি মেঝেতে পড়লেন কীভাবে?'

রুম্পা কিছু বলছে না। সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছটফট করছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পদ্মজাকে দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। পদ্মজা খুব বিস্মিত। রুম্পা এমন করছে কেন? সে রুম্পাকে প্রশ্ন করেই চলেছে, 'কেউ এসেছিল ঘরে? কে এসেছিল? ভয় দেখিয়েছে? ভাবি...ভাবি বলো আমাকে। ভাবি...ধাক্কাচ্ছো কেন? আমি তোমার জন্য খাবার এনেছি।'

খাবারের কথা শুনে রুম্পা থমকে গেল। পদ্মজার দিকে এক নজর তাকিয়ে বিছানার দিকে তাকাল। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের উপর। এতো গরম খাবার গাপুসগুপুস করে খেতে থাকল। পদ্মজা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এমনভাবে রুম্পা খাচ্ছে যেন আর কোনোদিন খাওয়া হবে না। সুযোগ আসবে না। পদ্মজা পানি এগিয়ে দিল। রুম্পা অল্প সময়ের ব্যবধানে পুরো থালার খিচুড়ি এবং এক বাটি হাঁসের মাংস ভুনা খেল।

খাওয়া শেষে পদ্মজা নমনীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'ভাবি আমার সাথে একটু কথা বলবেন?'

রুম্পা দূরে সরে যায়। দেয়াল ঘেঁষে বসে। মাথা দুইদিকে নাড়িয়ে ইশারা করে,সে কথা বলবে না। পদ্মজা তবুও আশা ছাড়ল না। সে রুম্পার পাশে গিয়ে বসল। রুম্পার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে আমার সাথে ঢাকা নিয়ে যাব। যাবে?'

রুম্পা এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। পদ্মজাকে ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে বলল, 'বাইর হ আমার ঘর থাইকা। বাইর হ তুই।'

রুম্পার ব্যবহারে পদ্মজা আহত হলো, 'ভাবিই! আমি তোমার ভালো চাই।'

'বাইর হ কইতাছি। বাইর হ।'

শীতের ঠান্ডা হিম বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকছে। শীতের দাপট বেড়েছে। এবারের শীত বোধহয় মানুষ মারার জন্য এসেছে! এতো ঠান্ডা! রুম্পার পরনে শাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। ঠান্ডায় তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। পদ্মজা রুম্পার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করল। রুম্পার চোখ বার বার দরজার দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল না অবধি, ছুটে আসে দরজার কাছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুক ছুটে পালাতে চায়। পদ্মজা জোরালো কণ্ঠে ডেকে উঠল, 'লতিফা বুবু।'

লতিফা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পদ্মজাকে দেখল। এরপর সিঁড়িভেঙে নিচে নেমে যায়। তার চোখে ভয় ছিল। একটা ঝনঝন শব্দ হয়। পদ্মজা চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। রুম্পা পাগলামি শুরু করেছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ছে। পদ্মজা রুম্পাকে থামানোর চেষ্টা করে। অনেক বোঝায়। কিছুতেই রুম্পা থামে না। রুম্পার হাত থেকে স্টিলের গ্লাস পদ্মজার কপালে এসে পড়ে। পদ্মজা'আহ'বলে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রুম্পা পাগলামি থামিয়ে দিল। ছুটে এসে পদ্মজার আহত স্থানে হাত রাখে, উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, 'আমি তোমারে ইচ্ছা কইরা দুঃখ দেই নাই বইন। বেশি বেদনা করতাছে?'

আঞ্চলিক ভাষায় রিনঝিনে কণ্ঠ! পদ্মজা দুই চোখ মেলে তাকায়। রুম্পা পদ্মজার কপালের ফোলা অংশে ফু দিচ্ছে। সে ভীষণ অস্থির হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে,পদ্মজাকে অনেক পছন্দ করে রুম্পা। মুখোশ খুলে বেরিয়ে এসেছে আসল রূপে। সে কঠিন নয়,পাগল নয়। বরং বড্ড নরম,কোমল। পদ্মজা শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, 'কেন পাগলের অভিনয় কর ভাবি?'

রুম্পার হাত থেমে যায়। সে ধরা পড়ে গেছে।

কুয়াশার স্তর ভেদ করে একটা নৌকা খালে ঢুকে। নৌকা চালাচ্ছে মৃদুল। গতকাল যে

ছেলেটাকে মৃদুল আন্ডা ডেকেছিল সেই ছেলেটাও নৌকায় আছে। তার ভালো নাম,জাকির। মৃদুলের সাথে বাচ্চাকাচ্চাদের অনেক খাতির। পূর্ণা খালের ঘাটে বসে ছিল। সে ফজরের নামায পড়ে,খিচুরি খেয়ে এখানে চলে এসেছে। মন খারাপের সময় ঘাটে বসে থাকতে তার ভালো লাগে। গতকাল রাতে খাওয়ার সময় মৃদুল কম হলেও বিশ বার তাকে কালি ডেকেছে। অন্ধকারে নাকি দেখাই যায় না। এমন অনেক কথা বলেছে। কালো রঙের মেয়ে হওয়া বোধহয় পাপ! আবার পদ্মজাও রাতে তার সাথে থাকেনি। পুরো রাত সে কেঁদেছে। কেউ কেন তাকে কালি বলবে! আবার তার আপাও তাকে সময় দিল না। শ্বশুরবাড়ির অন্য বউকে নিয়ে ব্যস্ত। পূর্ণার খুব অভিমান হয়েছে। বয়স বিশ পার হলেও রয়ে গেছে সেই ছোট্ট কিশোরী মেয়েটি। মৃদুল নৌকা থামিয়ে পূর্ণাকে ডাকল, 'কালি বেয়াইন।'

পূর্ণা তাকাল না। মৃদুল আবার ডাকল, 'বেয়াইন গো।'

তাও পূর্ণা সাড়া দিল না। মৃদুল জাকিরকে বলল, 'কী রে ব্যাঠা, বুঝছিস কিছু? এই ছেড়িরে ভূতে ধরল নাকি?'

জাকির দাঁত বের করে শুধু হাসল। মৃদুল জোরে বলল, 'আরে বেয়াইন কী কানে শুনে না? কাল তো ঠিকই শুনছিল। ঠান্ডা কী কানের ভেতরে ঢুইকা গেছে? ও কালি বেয়াইন। বেয়াইন...'

পূর্ণা হুট করে উঠে দাঁড়াল। আঙুল শাসিয়ে মৃদুলকে বলল, 'আপনার কী মা বাপ নাই? থাকলেও শিক্ষা দেয়নি যারে তারে যা ইচ্ছে ডাকা উচিত না। অসভ্যতা অন্য জায়গায় করবেন আমার সামনে না। আমি কালো আমি জানি। আপনাকে কালি বলে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি আপনাকে অনুমতি দেইনি আমাকে কালি ডাকতে বা বেয়াইন ডাকতে। আমি আপনার বেয়াইনও না। আমার ধুলাভাইয়ের আপন ভাই না আপনি। কোথাকার কে আপনি? এই ফর্সা চামড়ার দেমাগ দেখান? আরেকবার আমাকে কালি বললে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।'

কথা শেষ করেই পূর্ণা কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যায়। রেখে যায় অপমানে থমথম করা একটা মুখ। মৃদুল ঘোর থেকে বেরোতে পারছে না। তাকে একটা মেয়ে এভাবে বলেছে? তার মতো সুন্দর ছেলের জন্য গ্রামের সবকটি মেয়ে পাগল। আর এই কালো মেয়েটা তাকে এভাবে অপমান করলো! মৃদুল রাগে বৈঠা ছুঁড়ে ফেলে খালে। নৌকা থেকে রাগে নামতে গেলে তার এক পায়ে নৌকা ধাক্কা খেল। ফলে নিমিষে দূরে চলে যায় নৌকাটি। নৌকায় থাকা ছেলেটি চিৎকার করল, 'মৃদুল ভাই। আমি আইয়াম কেমনে? বৈডাডাও ফালায়া দিছো।'

মৃদুল বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকাল। সত্যি নৌকা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এই ঠান্ডার মধ্যে ছোট বাচ্চাটা সাঁতরে পাড়ে আসবে কীভাবে!

মৃদুল রাগ এক পাশে রেখে বরফের মতো ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দিল।

রুম্পা থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা অনবরত প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে ভীষণ অস্থির। একজোড়া পায়ের শব্দ ভেসে আসতেই রুম্পার কান্না থেমে গেলে। যেন এই পায়ের শব্দগুলো সে চিনে। রুম্পা কাঁপতে থাকল। রুম্পার অবস্থা দেখে পদ্মজার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত গড়িয়ে যায়। রুম্পা পদ্মজার এক হাত ধরে চাপাস্বরে দ্রুত বলল, 'এহান থাইকা চইলা যাও বইন। আর আগাইয়ো না। ওরা পিশাচের মতো। ছিঁইড়া খাইয়া ফেলব। ওদের দয়ামায়া নাই। তুমি অনেক ভালা। তোমারে কোনোদিন ভুলতাম না আমি। তুমি এইহানে থাইকো না। তুমি এই বাড়ির কেউয়ের লগে যোগাযোগ রাইখো না।'

'ওরা কী করেছে? ভাবি, অনুরোধ করছি আমাকে বলুন। ভাবি অনুরোধ করছি।'

রুম্পা সেকেন্ডে সেকেন্ডে ঢোক গিলছে। পায়ের শব্দটা যত কাছে আসছে তার কাঁপুনি তত বাড়ছে। সে ছলছল চোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে কোনোমতে বলল, 'পিছনে...

উত্তরে...ধ রক্ত।'

পরমুহূর্তেই দরজা ঠেলে রুমে ঢুকে খলিল হাওলাদার। এতো জোরে দরজা ধাক্কা দিয়েছেন যে, বিকট শব্দ হয়। হুংকার ছেড়ে পদ্মজাকে বললেন, 'তুমি এই ঘর থাইকা বাইর হও। অনেক অবাধ্যতা দেখাইছো আর না।'

খলিলের চোখ দুটি দেখে পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। গাঢ় লাল। সে দুই হাতে রুম্পাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি রুম্পা ভাবির সাথে থাকব।'

'থাকবা না তুমি।'

'কেন জানতে পারি?'

'একটা পাগলের সাথে কীসের থাকন?'

'রুম্পা ভাবি পা...'পদ্মজা কথা শেষ করতে পারল না। বুকে মুখ লুকিয়ে রাখা রুম্পা পিঠে চিমটি দিয়ে ভেজাকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কইও না। আমি পাগল না কইও না। দোহাই লাগে।'

পদ্মজা থেমে গেল। খলিল বললেন, 'বাড়ায়া যাও বউ।'

পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে বলল, 'যাব না আমি। রুম্পা ভাবির সাথে থাকব আমি।'

রুম্পা পদ্মজাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার পাগলামি শুরু করে। খলিল রুম্পাকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হতেই পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'নিজের মেয়েকে অমানুষের মারতে পারেন বলে সবার মেয়েকে মারার অধিকার পাবেন না।'

পদ্মজার কথা মাটিতে পড়ার আগে খলিলের শক্ত হাতের থাপ্পড় পদ্মজার গালে পড়ে। পদ্মজা ব্যথায়'মা'বলে আর্তনাদ করে উঠল।

পর্ব ৫১

ভোর হয়েছে আর কতক্ষণই হলো! দু ঘন্টার মতো। এর মধ্যেই মেঘলা আকাশ বেয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে। পূর্ণা আলগ ঘরের সামনে থাকা বারান্দার চেয়ারে মুখ ভার করে বসে আছে। তার গায়ে সোয়েটার,সোয়েটারের উপরে তিন তিনটে কাঁথা। তবুও পাতলা ঠোঁট জোড়া ঠান্ডায় কাঁপছে। বসে থাকতে থাকতে একসময় বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কোথাও যাওয়ার মতো অবস্থা নেই। তার চেয়ে বরং আপার সাথে আড্ডা দেয়া যাক। চৌকাঠে পা রাখতেই মৃদুলের কণ্ঠস্বর কানে এলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মৃদুল কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে আসছে। শরীর ভেজা। রানি আপা,রানি আপা বলে ডাকছে। কিন্তু এখানে তো রানি নেই। মৃদুল বারান্দায় পা রেখেই পূর্ণার মুখটা দেখতে পেল। তার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে, সঙ্গে মৃদুলের কপালে ভাঁজ পড়ে। এই মেয়ের জন্যই তো এমন ঘটনা ঘটলো। এখন ঠান্ডায় কাঁপতে হচ্ছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। শার্ট খুলে দড়িতে মেলে দিয়ে ডাকল, 'কইরে রানি আপা। শীতে মইরা যাইতেছি। কাপড় নিয়ে আয়। ভেজা শরীর নিয়া ঘরে কেমনে ঢুকব?'

পূর্ণা কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'রানি আপা এইখানে নাই। হুদাই চেঁচাচ্ছেন।'

মৃদুল পূর্ণার স্বরেই পাল্টা জবাব দিল, 'তোমারে কইছি আমার উত্তর দিতে? আমার ইচ্ছে হইলে আমি চেঁচাব। তোমার ভালা না লাগলে কানে ফাত্তর ঢুকায়া রাখো।'

পূর্ণা দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে তাকিয়ে থাকে। মৃদুল আড়চোখে পূর্ণাকে দেখে। আবার চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। বাতাস বেড়েছে। খালি গায়ে কাঁপুনি শুরু হয়। মৃদুলকে এভাবে কাঁপতে দেখে পূর্ণার মায়া হচ্ছে। সে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, 'আমি আপনার কাপড় নিয়ে আসব?'

মৃদুল চোয়াল শক্ত রেখেই আবারও আড়চোখে তাকাল। কিন্তু উত্তর দিল না। সে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণাকে উপেক্ষা করছে। পূর্ণা জবাবের আশায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর চলে যায়। পূর্ণা চলে যেতেই মৃদুল শীতের তীব্রতায় মুখ দিয়ে 'উউউউউউ' জাতীয় শব্দ করে কাঁপতে থাকল। যতক্ষণ না প্যান্ট শুকাবে ঘরের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তার ঘরে যাওয়ার পথে ধান ছড়ানো আছে। এদিক দিয়ে গেলে ধান ভিজে নষ্ট হবে। সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নেই। কেউ যদি কাপড় দিয়ে যেত! পূর্ণা আলগ ঘরের পিছনে উত্তর দিকে যে বারান্দা আছে সেখানে মগাকে পেল। মগা ঝিমুচ্ছে।

'মগা ভাইয়া?'

মগা তাকাল। পূর্ণা বলল, 'মৃদুল ভাইয়ের ঘর কোনটা?'

মগা আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিল। পূর্ণা মৃদুলের ঘরে গিয়ে একটা লুঙ্গি আর শার্ট নিয়ে বেরিয়ে আসে। মৃদুল পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা শীতের কাতরতা বন্ধ করে দিল। পূর্ণা মৃদুলের চেয়ে এক হাত দূরে এসে দাঁড়ায়। লুঙ্গি,শার্ট এগিয়ে দেয়। মৃদুল ঘুরে তাকায়। আর রাগ দেখানো সম্ভব নয়। রগে, রগে ঠান্ডার তীব্রতা ঢুকে গেছে। রক্ত শীতল হয়ে এসেছে। সে পূর্ণার হাত থেকে নিজের কাপড় নিতে নিতে হৃদয় থমকে দেয়ার মতো একটা মায়াবী মুখশ্রী আবিষ্কার করলো। টানা টানা চোখ,চোখের পাঁপড়িগুলো এতো ঘন যে মনে হচ্ছে কোনো বিশাল বটবৃক্ষ ছায়া ফেলে রেখেছে,পাতলা ফিনফিনে ঠোঁট,ত্বকে তেলতেলে ভাব। চকচক করছে। লম্বা এলো চুল বাতাসে উড়ছে। শ্যামবর্ণের মুখ এতো আকর্ষণীয় হয়? কিছু সৌন্দর্য বোধহয় এভাবেই খুব কাছে থেকে চিনে নিতে হয়। মৃদুলের দৃষ্টি শীতল হয়ে আসে। সে আগে লুঙ্গি নিল। পূর্ণা অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি দেখছি না। আপনি পাল্টে ফেলুন।'

মৃদুল মোহময় কোনো টানে আবার ফিরে তাকায়। তবে মুখটা আর দেখতে পেল না। মায়াবী মুখটা অন্যদিকে ফিরে আছে। সে লুঙ্গি পাল্টে মিনমিনিয়ে বলল, 'শার্টটা?'

পূর্ণা হেসে শার্ট এগিয়ে দিল। মৃদুলের এলোমেলো দৃষ্টি। হুট করেই বুকে ঝড়ো বাতাস

বইছে। কী আশ্চর্য! পূর্ণা গর্বের সাথে বলল, 'আমাকে কালি বলে কষ্ট দিলেও আমি আপনার কষ্ট দেখতে পারিনি। আমি এমনই মহৎ।'

অন্যসময় হলে হয়তো মৃদুলও পাল্টা জবাব দিত। কিন্তু এখন ইচ্ছে হচ্ছে না। মোটেও ইচ্ছে হচ্ছে না। পূর্ণা কিছু না বলে আলগ ঘরে ঢুকে যায়। মৃদুল দ্রুত পায়ে দুই পা এগিয়ে আসে। আবার পিছিয়ে যায়। আজকের দিনটা অন্যরকম লাগছে। আচ্ছা,দিনটা অন্যরকম নাকি অনুভূতি অন্যরকম?

পদ্মজা নিজেকে ধাতস্থ করার আগেই খলিল পদ্মজাকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দেন। এরপর দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। পদ্মজা গালে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। চোখের জল বিসর্জন হচ্ছে আঘাতের কষ্টে? নাকি কারো হাতে থাপ্পড় খাওয়ার অপমানে? কে জানে! খলিল কপাল কুঁচকে আরো কী কী যেন বলে চলে যান। পদ্মজা ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আকস্মিক ঘটনাটি হজম করতে পারছে না। দিকদিশা যেন হারিয়ে ফেলেছে। ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ পেয়ে পদ্মজা সম্বিৎ ফিরে পেল। সে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কীভাবে সামলানো উচিত তার মাথায় আসছে না। একটু দূরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল,লতিফাকে। পদ্মজাকে তাকাতে দেখেই লতিফা আড়াল হয়ে যায়। পদ্মজা সে জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই তীব্র শীতে আবার বৃষ্টি হবে নাকি! ভাবতে ভাবতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামে। পদ্মজার গা কেঁপে উঠে ঠান্ডার তীব্রতায়।

সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে। সুপারি গাছগুলো একবার ডানে দুলে পড়ছে তো আরেকবার বামে। আলগ ঘরের পিছনের বারান্দায় মগা গায়ে কাঁথা মুড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে। পদ্মজা শাড়ির আঁচল ভালো করে টেনে ধরে শীত থেকে বাঁচতে। আবহাওয়ার অবস্থা ভালো না তার মধ্যে বৃষ্টি আর বাতাস! সামান্য শাড়ির আঁচলে কী ঠান্ডার তীব্রতা আটকানো যায়!

ইচ্ছেও করছে না ঘরে যেতে। সে এদিকওদিক চেয়ে দেখল। শেষ কর্ণারে একটা চেয়ার দেখতে পেল। চেয়ারটা আনার জন্য এগোয়। তখন নাকে একটা বিশ্রি বোটকা গন্ধ আসে। পদ্মজার স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠে। যত এগোচ্ছে গন্ধটা তীব্র হচ্ছে! সে সাবধানে এক পা এক পা করে ফেলছে।

এরিমধ্যে আমিরের চেঁচামেচি কানে আসে। পদ্মজা থমকে যায়। উলটো ঘুরে বাইরে উঁকি দেয়। বাইরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। সবার আগে চোখে পড়ে আমিরকে। পদ্মজা সবকিছু ভুলে ছুটে নেমে আসে নিচ তলায়। এরপর বাইরে আসে। আমির তার চাচাকে মারছে! যেভাবে পারে কিল,ঘুষি দিচ্ছে। আমির এতোটাই রেগে গিয়েছে যে,নিজের আপন চাচাকে মারছে! মজিদ হাওলাদার, রিদওয়ান, আমিনা,রানি, সবাই আটকানোর চেষ্টা করছে। কেউ পারছে না। আমির খলিলকে ছেড়ে রিদওয়ানকে ধাক্কা মেরে কাঁদায় ফেলে দিল। আমিরের আচরণ উন্মাদের মতো। সে বিশ্রি গালিগালাজ করতে করতে রিদওয়ানের পেটে লাথি বসায়। রিদওয়ান কুঁকিয়ে উঠল। আমিনা আমিরকে কিল,থাপ্পড় দিয়ে আঘাত করছেন। তাতেও কাজ হচ্ছে না। এমন বেয়াদব তো আমির না! পদ্মজা দৌড়ে আসে। আমিরকে চিৎকার করে বলে, 'কী করছেন আপনি? পাগল হয়ে গেছেন? ছাড়ুন।'

আমির পদ্মজার জবাব দেয় না। খলিলকে থাবা মেরে ধরে। খলিলের নাক বেয়ে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থায়ই মুখে আরেকটা ঘুষি মারে। রানি, আমিনা হাউমাউ করে কাঁদছে। মৃদুল,পূর্ণা,মগা,মদন সবাই ছুটে আসে। মৃদুল,পদ্মজা দুই হাতে আমিরকে টেনে সরাতে চায়। কিন্তু পারল না। আমিরের শরীরে যেন কয়েকটা বাঘের শক্তি ঢুকেছে। সে কিছুতেই ক্লান্ত হচ্ছে না। মৃদুল দুই হাতে জাপটে ধরে আমিরকে দূরে সরিয়ে আনে। আমির হিংস্র বাঘের

মতো হাত পা ছুড়তে ছুড়তে বলে, 'কুত্তার বাচ্চারা অনেক কিছু করছস করতে দিছি। আমার বউয়ের গায়ে হাত দেস কোন সাহসে। মৃদুল ছাড়। আমি ওদের আজরাইলের মুখ দেখিয়ে ছাড়ব।'

মৃদুলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আমির। ছুটে এসে রিদওয়ানকে ধরে। পদ্মজা হতভম্ব হয়ে পড়েছে! রিদওয়ান গতকাল তার কাঁধে হাত দিয়েছিল, আর আজ খলিল থাপ্পড়ে মেরেছে। এসব কে বলেছে আমিরকে? থাপ্পড়টা লতিফা দেখেছিল। তাহলে কী লতিফা বলেছে?

আমিনা পদ্মজার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। পদ্মজা দ্রুত সরে যায়, 'চাচি কী করছেন!'

আমিনা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'থামাও এই কামড়াকামড়ি। আল্লাহর দোহাই লাগে।'

পদ্মজা কী করবে বুঝতে পারছে না। আমির তার কথা শুনছেই না। আর আমিরের এমন রাগ সে দেখেনি! গুরুজনদের গায়ে হাত তোলার মতো রাগ আমিরের হতে পারে এটাও ধারণার বাইরে। পদ্মজা আমিরের সোয়েটার খামচে ধরে কণ্ঠ কঠিন করে বলল, 'ছাড়ুন বলছি। ছাড়ুন।'

আমির তাও শুনলো না। সে ধাক্কা মেরে পদ্মজাকে সরিয়ে দিল। দুই হাত দূরেই নারিকেল গাছ ছিল। সেখানে পড়লে নিশ্চিত কোনো অঘটন ঘটে যেত,অঘটন ঘটার পূর্বেই দুটো হাত পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে। পদ্মজা কৃতজ্ঞতা নজরে তাকায়। ফরিনাকে দেখতে পেল। পদ্মজা অবাক হয়। ফরিনা এরকম ধস্তাধস্তি দেখেও চুপ করে আছেন। থামানোর চেষ্টা অবধি করছেন না। পদ্মজা আবার আমিরকে থামানোর চেষ্টা করল। মৃদুল চেষ্টা করল। কিছুতেই কিছু হয় না। আমির খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে,অনেক বছরের রাগ একসাথে মিটিয়ে নিচ্ছে। পদ্মজা আমিরকে অনুরোধ করে সরে আসতে। সেই অনুরোধ আমিরের কর্ণকুহর অবধি পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ! পদ্মজা অসহায় মুখ করে সরে যাবে তখনই দুটি শক্তপোক্ত হাত আমিরকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সেই হাতে খুব দামী ঘড়ি। হাতের মালিককে দেখার জন্য পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। মুখ দেখে চমকে উঠে! দীর্ঘ সময় পর আবার সেই মানুষটির সাথে দেখা। যে মানুষটি তার প্রথম ভালোবাসা না হলেও প্রথম আবেগমাখা অনুভূতি ছিল। সে লিখন শাহ! পদ্মজা দূরে সরে দাঁড়ায়। মৃদুল,লিখন মিলে আমিরকে তুলে অনেকটা দূরে নিয়ে আসে। আমির ছটফট করছে ছোটার জন্য। অথচ ছুটতে পারছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে লিখনকে দেখে সে স্থির হয়ে যায়। লিখন হেসে বলল, 'এবার থামুন। অনেক শক্তি ফুরিয়েছেন।'

আমির কিছু বলতে চাইল তখনই রিদওয়ান সবার অগোচরে ইট দিয়ে আমিরের ঘাড়ে বারি মারে। আমির আর্তনাদ করে বসে পড়ে। লিখন রিদওয়ানকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। পদ্মজা উৎকর্ণ হয়ে দৌড়ে আসে। আমিনা,রানি খলিল এবং রিদওয়ানকে নিয়ে দ্রুত আলগ ঘরে চলে যায়। দরজা বন্ধ করে দেয়। মজিদ মগাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি যা গঞ্জে। বিপুল ডাক্তাররে নিয়ে আয়। আমার বাড়িতে এসব কী হচ্ছে!'

ফরিনা তখনও দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। এই ঘটনা তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি! যেন এই ঘটনার জন্য তিনি খুশি। কী চলছে তার মনে?

পর্ব ৫২

ফরিনা তাড়াহুড়ো করে খোশ মেজাজে রান্না করছেন। সাহায্য করার মতো পাশে কেউ নেই। একাই দৌড়ে দৌড়ে সব করছেন। হাওলাদার বাড়িতে অতিথি এসে একদিন না থেকে যেতে পারে না। এতে নাকি গৃহস্থ বাড়ির অমঙ্গল হয়। তাই মজিদ লিখনকে থেকে যেতে জোর করেছেন। পদ্মজা নিজের ঘরে স্বামী সেবায় ব্যস্ত। আমিরের ঘাড়ের চামড়া ফুলে গেছে। হাড়ে বিষের মতো যন্ত্রণা। বিপুল ডাক্তার ঔষধপত্র দিয়েছেন। পদ্মজা অশ্রুসজল নয়নে আমিরের মুখের দিকে চেয়ে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ স্বামীর যন্ত্রণা দেখেছে। সহ্য করতে হয়েছে। মাত্রই আমির চোখ বুজেছে। সে মনে মনে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছে,দ্রুত যেন আমিরের ব্যথাটা সেড়ে যায়। নয়তো তাকে যেন দিয়ে দেয়। ঘাড়ের আহত অংশে পদ্মজা আলতো করে ছুঁয়ে দেয়। নীল হয়ে আছে। লতিফা নিরবে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। পদ্মজা কারো উপস্থিতি টের পেয়ে জলদি চোখের জল মুছল। তারপর লতিফাকে দেখে বলল, 'লুতু বুবু!'

লতিফা বলল, 'খাইবা না? খালাম্মা খাইতে ডাকতাছে।'

পদ্মজা গম্ভীরকণ্ঠে বলল, 'আম্মা নিজের ছেলেকে কেন দেখতে আসেননি?'

'খালাম্মায় লিখন ভাইজানের লাইগে রাঁনতাছিল।'

পদ্মজা ক্ষিপ্ত হয়, 'নিজের ছেলেকে না দেখে উনি কীভাবে অতিথির জন্য ভোজ আয়োজন করছেন? আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

লতিফা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পদ্মজা অনেকক্ষণ ক্ষিপ্ত নয়নে মেঝেতে চোখ নিবদ্ধ করে রাখল। এরপর আমিরকে এক ঝলক দেখে, লতিফাকে বলল, 'তুমি যাও,আমি আসছি।'

লতিফা দুই পা এগোতেই পদ্মজা ডেকে উঠল, 'লুতু বুবু।'

লুতু দাঁড়াল। পদ্মজা বলল, 'তুমি আমার উপর নজর রাখছিলে কেন? আর আমাকে না জিজ্ঞাসা করে থাপ্পড়ের কথাই বা কেন বলেছো উনাকে?'

লতিফার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সে নত হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আরো দুই বার প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পেল না। তাই বলল, 'নিষেধাজ্ঞা আছে নাকি?'

এইবার লতিফা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। সে কিছু একটা ভাবল। এরপর মুখ তুলে দেখল পদ্মজা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। লতিফা অপ্রতিভ হয়ে উঠে। বলে, 'আমি যাই। নইলে খালাম্মায় চেতব।'

পদ্মজার উত্তরের আশায় থাকেনি লতিফা। তড়িঘড়ি করে চলে যায়। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে দরজার বাইরে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি প্রশ্ন যেন আলাদা আলাদা। অথচ তার মনে হয় সব প্রশ্নের এক উত্তর,এক যোগসূত্র। এখন সেসব ভাবার সময় না। আমিরের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। পদ্মজা আমিরের কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা অনুমান করে। ভীষণ গরম। জ্বর উঠছে নাকি!

লিখন,মৃদুলের আড্ডা জমে উঠেছে। দুজন জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। লিখনের নায়িকা তিন দিন আগে ঘাট থেকে পিছলে নদীতে পরে গেছে। সাঁতার জানে না তাই প্রচুর পানি খেয়েছে। সেই সাথে পা মচকে গেছে। কোমরেও ব্যথা পেয়েছে। এই কথা শুনে মৃদুল হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। পূর্ণা দূর থেকে কটমট করে মৃদুলের দিকে তাকিয়ে আছে। কত অসভ্য এই লোক! মানুষের আঘাতের কথা শুনে হাসে! তার গা জ্বলে যাচ্ছে মৃদুলের হা হা করে হাসা দেখে। লিখন আরো জানাল,সে এবং তার দল গত তিনদিন নায়িকা ছাড়া দৃশ্যগুলোর শুটিং করেছে। বাকি যা দৃশ্য আছে সবকিছুতে নায়িকার উপস্থিতি থাকতেই হবে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। আশা করা যাচ্ছে, তিন-চার দিনের মধ্যে নায়িকা সুস্থ হয়ে যাবে। পূর্ণাকে দূরে বসে থাকতে দেখে লিখন ডাকল। পূর্ণা খুশিতে গদগদ হয়ে দৌড়ে আসে। ঘন্টা দুয়েক আগে একটু কথা হয়েছিল। আর হয়নি। লিখন প্রশ্ন করল,

'ভেতরের অবস্থা কেমন? আমির হাওলাদার আগের চেয়ে কিছুটা ভালো অনুভব করছেন?'

'হু, ঘুমাচ্ছে দেখে এলাম। আপা আছে পাশে।'

'তোমার আপা পাশে থাকলে আর কী লাগে!'লিখনের কণ্ঠটা করুণ শোনায়। পূর্ণা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'ভাইয়া, আপনি কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন। তখন বললাম, কিছুই বললেন না।'

'আচ্ছা, যাব।'

'প্রান্ত অনেক খুশি হবে।'

'প্রান্ত যেন কে?'

'আমার ভাই। ওইযে খুন-

'মনে পড়ছে। কী যেন নাম ছিল... মুন্না বা এরকম কিছু নাম ছিল না?'

'জি ভাইয়া।'

'সবাই কত বড় হয়ে গেছে। পড়াশোনা আর করোনি কেন?'

পূর্ণা বাম হাত চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'মেট্রিক ফেইল করাতে আর পড়তে ইচ্ছে করেনি।'

মৃদুল ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, 'তুমিও মেট্রিক ফেইল?'

পূর্ণা আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল, 'কেন? আরো কেউ আছে এখানে?'

মৃদুল মুচকি হেসে চুল ঠিক করতে করতে চমৎকার করে বলল, 'আমিও মেট্রিক ফেইল।'

মৃদুলের কথা শুনে লিখন সশব্দে হেসে উঠল। পূর্ণা সরু চোখে তাকিয়ে আছে মৃদুলের দিকে। মজা করলো নাকি সত্য বলল? লিখন ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বলল, 'মৃদুল মজা করছো নাকি সত্যি?'

মৃদুল গুরুতর ভঙ্গিতে বলল, 'আচ্ছা,মিথ্যা কইতে যামু কেন? এতে আমার লাভডা কী?'

মৃদুলের ভঙ্গি দেখে লিখন চারপাশ কাঁপিয়ে হাসল। সাথে তাল মিলাল পূর্ণা ও মৃদুল। লিখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। দেখতে কত ভালো দেখাচ্ছে। কী অপূর্ব মুখ। বলিষ্ঠ শরীর। পূর্ণা কেন জানি আজও মনে হচ্ছে,লিখনের পাশেই পদ্মজাকে মানায় বেশি। পরক্ষণেই পূর্ণা নিজেকে শাসাল, 'চুপ থাক পূর্ণা! আমির ভাইয়ার মতো ভালো মানুষ দুটি নেই। আপার জন্য উনি সেরা।'

তবুও মন বুঝে না। হয়তো সৌন্দর্যের মিলটার জন্যই লিখন,পদ্মজা দুটি নাম তার ভাবনায় একসাথে জোড়া লেগে যায়। অথচ,বিবেক দিয়ে ভাবলে মনে হয় আমিরের জায়গা কেউ নিতে পারবে না। কেউ না। সে অনন্য।

হাসিখুশি মুহূর্ত উবে যায় খলিলের কর্কশ কণ্ঠে, 'বেহায়া,বেলাজা ছেড়ি। পর পুরুষের সামনে কেমনে দাঁত মেলায়া হাসতাছে। ঘরে বাপ মা না থাকলে এমনই হয়। এই ছেড়ি ঘরে যাও।'

লিখন,মৃদুলের সামনে এভাবে কটু কথা শুনে পূর্ণা বুক ফেটে কান্না আসে। সে এক পলকে লিখন,মৃদুলকে দেখে আলগ ঘরের ভেতর চলে যায়। লিখন,মৃদুল হতভম্ব। খলিলের মাথায়,হাতে ব্যান্ডেজ। নাকের নিচে চামড়া উঠে গেছে,মাংস দেখা যাচ্ছে। তবুও তেজ কমে না। তিনি পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'মা ডা মইরা যাওয়ার পর থেকে এই ছেড়ি দস্যি হইয়া গেছে। এত বড় ছেড়ি,বুড়া হইতাছে। বড় বইনে বিয়া দেয় না। কোনদিন কোন কাম ঘটায় আল্লায় জানে। তা লিখন দুপুরের খাবার খাইছো?'

লিখনের ইচ্ছে হচ্ছে না এই কুৎসিত ভাবনার লোকটার জবাব দিতে। যেহেতু সে এই বাড়ির অতিথি। তাই মনের কথা শুনতে পারল না। বলল, 'জি না।'

মৃদুল খলিলকে উপেক্ষা করে আলগ ঘরে ঢুকে পড়ে। পূর্ণা আলগ ঘরের পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মৃদুল পিছনে এসে দাঁড়াল। কোমল স্বরে বলল, 'খালুর কথায় কষ্ট

পাইছো?'

পূর্ণা মৃদুলের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল, 'আপনি কারো কষ্টের কথা ভাবেন দেখে ভালো লাগলো।'

'সবসময় ত্যাড়া কথা কেন কও? আমি যদি আগে জানতাম,তোমারে কালি কইলে তোমার এত্ত কষ্ট হয়। আমি কইতাম না।'

পূর্ণা তাকাল। পূর্ণার দৃষ্টি দেখে মৃদুলের মন কেমন করে উঠল। এ দৃষ্টির নাম বোধহয়'মন কেমন করা দৃষ্টি'। পূর্ণা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মাফ চাইছেন?'

মৃদুলের জোড়া ভ্রু কুঁচকে আসে। দুই পা পিছিয়ে যেয়ে বলে, 'জীবনেও না।'

পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো রান্নাঘরে ঢুকে ফরিনাকে বলল, 'আম্মা,কী হয়েছে আপনার?'

ফরিনা প্রবল বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, 'কেন? কী হইব আমার?'

ফরিনার ব্যবহারে পদ্মজা খুব অবাক। সে কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিনা নিশ্চিন্ত মনে চুলা থেকে পাতিল নামালেন। তারপর বললেন, 'ও পদ্মজা,মগারে একটু কইবা লিখন,মৃদুলরে ডাইকা আনতে। লিখন ছেড়াডা কহন আইছে। এহনও খায় নাই।'

পদ্মজা আর ঘাঁটল না ফরিনাকে। সে বুঝে গেছে কোনো জবাব পাবে না। সদর ঘরে পার হতেই সদর দরজায় মৃদুল এবং লিখনের দেখা পেল। পদ্মজা চট করে আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে নিল। তারপর বলল, 'আপনারা এখানে এসে বসুন। আম্মা,আপনাদেরই খোঁজ করছিলেন।'

কথা শেষ হতেই পদ্মজা সদর ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে চলে গেল। লিখন আবিষ্ট হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সেই পুরনো দিনের মতোই তার স্বপ্নের প্রেয়সী এক ছুটে পালিয়ে বেড়ায়। পার্থক্য শুধু এটাই,আগে লজ্জায় পালাত,এখন অস্বস্তিতে। লিখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজাকে এক ঝলক দেখার জন্য এই বাড়িতে সে পা দিয়েছে। যাকে ভালোবাসে তার স্বামীর বাড়িতে আসা কতটা কষ্টের তা শুধু তার মতো অভাগারাই জানে। মৃদুল লিখনের দৃষ্টি খেয়াল করে কিছু একটা আন্দাজ করে বলল, 'পদ্মজা ভাবিকে চিনেন?'

'চিনব না কেন-

লিখন থেমে গেল। সে নিজের অজান্তেই কী বলে দিচ্ছিল! হেসে বলল, 'এতসব জেনে কী হবে? আসো গিয়ে বসি। তারপর বলো,কখনো প্রেমে পড়েছো?'

'না মনে হয়।'উদাসীন হয়ে বলল মৃদুল।

'নিশ্চিত হয়ে বলো।'

মৃদুল ভাবল। কোন নারীর প্রতি তার আকর্ষণ বেশি কাজ করেছে। উত্তর পেয়েও গেল। সকালেই সে পূর্ণার মধ্যে অদ্ভুত কিছু পেয়েছে। অজানা অনুভূতি অনুভব করেছে। এটা কী প্রেম? মৃদুল নিশ্চিত নয়। তাই সে বলল, 'না,পড়ি নাই।'

'আচ্ছা, সেসব বাদ। বিয়ে করছো কবে সেটা বলো।'

'উমম, হুট করে একদিন। আমার ইচ্ছে, আমি হুট করে একদিন বিয়ে করে আম্মারে চমকে দেব।'

লিখন সশব্দে হাসল। বলল, 'জানো মৃদুল,মানুষের সব চাওয়া পূরণ হয় না। প্রতিটি মানুষের জীবনের কোনো না কোনো পাশে অপূর্ণতা থাকে।'

'তাহলে বলছেন, আমার এই ইচ্ছে পূরণ হইব না?'

'না তা বলছি না। হুট করে বিয়ে করে ফেলা আর কেমন অসম্ভব কাজ? মেয়ে রাজি থাকলেই হলো। মেয়ে বেঁকে গেলে কিন্তু কিচ্ছা খতম।'

লিখন আবার সশব্দে হাসল। মৃদুলও অকারণে তাল মিলিয়ে হাসে আর ভাবে,একটা মানুষ এতো হাসতে পারে কীভাবে? এতো সুখী লিখন শাহ?

সে তো আর জানে না দুঃখীরা পাহাড় সমান কষ্ট লুকোয় হাসির আড়ালে।

আস্তে আস্তে বাড়ির সবাই আসে। আমির ছাড়া। রিদওয়ান, খলিল এত শান্তভাবে

আছে যে মনেই হচ্ছে না সকালে এতো বড় ঘটনা ঘটে গেছে। বাড়ির মহিলারা দৌড়ে দৌড়ে খাবার পরিবেশন করছে। পদ্মজা খুব অবাক হয়ে প্রতিটি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করছে। লিখনও এতে কম অবাক হয়নি। কত শান্ত পরিবেশ! ঝগড়ার পর মান-অভিমান,তর্ক-বিতর্ক থাকে। সেসব কিছুই নেই। পদ্মজা সবার সামনে আলাদা প্লেটে খাবার নিয়ে ফরিনাকে বলল, 'আম্মা,আমি উনার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙেছে হয়তো।'

পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। লিখন সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। পদ্মজার হাঁটার ছন্দ দৃপ্ত ও সাবলীল। মাথায় শাড়ির আঁচলে ঘোমটা টানা। স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বামীটা কী সে হতে পারত না? এতোটাই অযোগ্য ছিল! অযোগ্য নাকি নিয়তির খেলা? কেন ভোলা যায় না এই নারীকে?

লিখনের বোন লিলি আর পদ্মজা একই ক্যাম্পাসের হওয়া সত্ত্বেও লিখন কখনো পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। পদ্মজার অস্বস্তি হবে ভেবে। সে পদ্মজার চোখে ভালোবাসা দেখতে চায়,বিব্রতভাব বা অস্বস্তি দেখতে চায় না। এ যে বড় যন্ত্রণার। এতোদিনেও বুকের ভেতর কীভাবে পুষে আছে এক পাক্ষিক ভালোবাসা? কোনোভাবে কী এই ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে! আসবে কী সেই সুদিন? লিখনের শুষ্ক চক্ষু সজল হয়ে উঠে। সে ভাবতে পারে না, পদ্মজা বিবাহিত! লিখনের সম্মূখ বরাবর মৃদুল ছিল। মৃদুল লিখনের প্রতিক্রিয়া দেখে অনেক কিছুই বুঝে নিল। নিশ্চিত হওয়া যাবে পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে পূর্ণার সাথে কথা বলতে হবে। মৃদুল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পূর্ণাকে খোঁজে।

পদ্মজা আমিরকে ধরে ধরে বসাল। ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা। টিকে থাকা যাচ্ছে না। রাগে কিড়মিড় করছে এখনও। পদ্মজা শান্ত করে। তারপর খাইয়ে দিল। খাওয়া শেষে আমির ম্লান হেসে বলল, 'লিখনের সাথে কথা হয়েছে?'

পদ্মজা নিষকম্প স্থির চোখে তাকাল, 'উনার সাথে কেন কথা হতে যাবে আমার?'

'উনি তো তোমার জন্যই এসেছেন।'

'আপনাকে বলেছে? অন্য দরকারেও আসতে পারে।'

আমির হাসল। বলল, 'সে আজও তোমাকে পছন্দ করে। আশা করে তুমি তার কাছে যাবে।'

'অসম্ভব। যা তা বলছেন। আপনি এসব বললে আমার খারাপ লাগে।'

পদ্মজা থামল। আমির মৃদু হাসছে। পদ্মজা আমিরের কোলে মাথা রেখে আদুরে কণ্ঠে বলল, 'আপনি জানেন না আপনাকে কত ভালোবাসি আমি। আমি আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও ভাবতে পারি না।'

'তাহলে বাচ্চার জন্য বিয়ে করতে বলো কেন?'

'বন্ধ্যা নারীর কত যন্ত্রণা বুঝবেন না।'

'আমাদের একটা মেয়ে হয়েছিল।'

'আর হবে না, তাই বলি।'

'হবে, আল্লাহ চাইলে হবে। তাছাড়া আমার কাছে তো ফুটফুটে একটা বউই আছে। আর কী লাগে?'

পদ্মজা আমিরের কোল থেকে মাথা তুলে বসে। তারপর চিরুনি দিয়ে আমিরের চুল আঁচড়ে দিয়ে বলল, 'চুলগুলো বড় হয়েছে অনেক।'

'হু, আচ্ছা এদিকে আসো।'

আমির পদ্মজাকে এক হাতে টান দিতে গিয়ে ঘাড়ে চাপ খেয়ে'আহ'করে উঠল। পদ্মজা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'খুব লেগেছে? আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন এমন করেন আপনি!'

চারপাশ অনেকটা ফর্সা হয়েছে। দুপুরের সূর্যটা একটু দেখা যাচ্ছে। তাও তেজ নেই। কিছুক্ষণ পর আবার ডুবেও যাবে। পূর্ণা লবণ দিয়ে টক বড়ই খাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে,অমৃত খাচ্ছে। মৃদুল পূর্ণার পাশে এসে বসল।পূর্ণা চমকে উঠে। মৃদুলকে দেখে বুকে থুথু দেয়।

তারপর বাজখাঁই কণ্ঠে বলল, 'হুট করে এভাবে কেউ আসে?'

'আর কথা কইও না। তোমারে সারা দুনিয়া খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছি। মাত্র মগা কইল,তুমি নাকি ছাদে।'

'কেন? আমাকে খুঁজছেন কেন?'

'এমনে খ্যাঁট খ্যাঁট কইরা কথা কইতাছ কেন? একটু ভালো কথা আহে না মুখ দিয়ে?'

পূর্ণা একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর হেসে বলল, 'দুঃখিত। এবার বলুন কী দরকার।'

'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতাম আর কী!'

'আমার ব্যক্তিগত কোনো তথ্য নেই।'

'তোমার না, তোমার বড় বইনের। পদ্মজা ভাবির।'

পূর্ণা উৎসুক হয়ে তাকাল। মৃদুল উশখুশ করতে করতে বলল, 'পদ্মজা ভাবি আর লিখন ভাইয়ের মধ্যে কী কোনো সম্পর্ক ছিল?'

পূর্ণা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে,মৃদুল কোনো ফালতু প্রশ্ন করেছে। এরপর নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'না। তবে,লিখন ভাই আপারে পছন্দ করতো। আপার সাথে ভাইয়ার বিয়েটা কেমনে হইছে জানেন?'

'আমির ভাইয়ের কথা বলছো?'

'আমার আপার কী আর কোথাও বিয়ে হয়েছে?'

'সোজা উত্তর দিতে পারো না? তারপর বলো।'

'ওই ঘটনাটা না হলে হয়তো লিখন ভাইয়ের সাথেই আপার বিয়েটা হতো। কিন্তু হয়নি। এতটুকুই।'

'লিখন ভাইরে দেখলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কোনো গভীর সম্পর্ক ছিল। তারপর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ভাই অনেক ভালোবাসতে পারে।'

'হু।'পূর্ণা বড়ই খাচ্ছে তৃপ্তি করে।

মৃদুল বিরক্তি নিয়ে অনেকক্ষণ পূর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। চারপাশ দেখে। পূর্ণা বাঁকা চোখে মৃদুলকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে নেয়। মৃদুলের উপস্থিতি তার হৃদ স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করে। কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস হয় না। পূর্ণা আরেকটা বড়ই হাতে নিল। তখন মৃদুল ডাকল, 'বেয়াইন।'

পূর্ণা তাকায়। মৃদুল ঝুঁকে ছাদের মেঝেতে কিছু দেখছে। পূর্ণা উৎসুক হয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। মৃদুল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'রক্ত না?'

পূর্ণা মৃদুলের মতো ঝুঁকে ভালো করে খেয়াল করল। তারপর বিস্ফোরিত কণ্ঠে বলল, 'তাই তো।'

'মানুষের রক্ত না পশুর রক্ত নিশ্চিত হইতাম কেমনে?'

'পশুর রক্ত এইখানে আসবে কেন?'

'মানুষের রক্তই কেন আসবে?'

'তাই তো।'

দুইজন চিন্তিত হয়ে ভাবতে থাকল। পূর্ণা বলল, 'মনে হয় কোনো পাখি শিকার হয়েছে। আর রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে এসে পড়েছে।'

'তাহলে মরা পাখিটা কই?'

'ধরুন, আহত হয়েছে কিন্তু মরেনি। এরপর চলে গেছে।'

সন্ধ্যারাত। জোনাকিপোকারা ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস। সেই বাতাসে পাতলা শার্ট পরে লিখন নারিকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। জোনাকি পোকা দেখছে। মাঝেমধ্যে অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে কাউকে চোখ দুটি খুঁজছে। সেদিন হেমলতা ফিরিয়ে দেয়ার পর সারা রাত বাড়ি ফেরেনি সে। ক্ষেতে বসেছিল। আকাশ কাঁপিয়ে কেঁদেছে। কেউ শুনেনি। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো কষ্ট দুটো নেই। স্বপ্নে সাজানো সংসার ভেঙে চুরমার হওয়ার দিন

ছিল সেদিন। এক সময় ইচ্ছে হয়েছিল পদ্মজাকে তুলে নিয়ে পালাতে। কিন্তু বিবেক সাড়া দেয়নি। পরদিন সকালে উঠেই মা-বাবাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রতিটা মুহূর্তে আফসোস হয়,শুরুতে কেন হেমলতার কাছে প্রস্তাব দিতে পারল না সে! পরবর্তী কয়েকটা মাস ঘোরের মধ্যে কেটেছে। সিনেমা জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এরপর জীবনের গতিটা স্বাভাবিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু মন...মন তো ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। আজও জোড়া লাগেনি। পদ্মজা কী কখনো জানবে,ঢাকায় কতবার পদ্মজার পিছু নিয়েছে সে। জানবে কী তার ভালোবাসার গভীরতা?

লিখন আনমনে হেসে উঠল। চোখে জল ঠোঁটে হাসি! এ হাসি সুখের নয়,যন্ত্রণার।

পূর্ণা অন্দরমহলে আসেনি। পদ্মজা ভীষণ রেগে আছে। আলগ ঘরের বারান্দায় সারাক্ষণ কী করে এই মেয়ে? এর আগেও যখন পারিজা তার পেটে ছিল। পূর্ণা এই বাড়িতে অনেকদিন ছিল। তখনও মাঝ রাত অবধি আলগ ঘরের বারান্দায় বসে থাকত। পদ্মজা শাল গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসে অন্দরমহল থেকে। সারাদিন পূর্ণার খোঁজ নেয়া হয়নি। এখন ধরে ঘরে নিয়ে যাবে। নির্জন,থমথমে পরিবেশ। তখন লিখনের কণ্ঠ ভেসে আসে, ’পদ্মজা?’

পদ্মজা কণ্ঠটি শোনামাত্র ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠে। অপ্রতিভ হয়ে উঠে। একটা মানুষ কেন তাকে এত বছর মনে রাখবে? কেন অনুচিত আশা করে বসে থাকবে! পদ্মজার রাগ হয়,অস্বস্তি হয়। কষ্টও হয়। প্রার্থনা করে, এই মানুষটার জীবনে কেউ আসুক। এসে তার জীবনটা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিক। ভুলিয়ে দিক অতীত। পদ্মজা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ’এভাবে রাতের বেলা ডাকবেন না।’

পদ্মজা লিখনকে উপেক্ষা করে দুই পা এগিয়ে যায়।

‘জীবন থেকে তো সরেই গিয়েছো। আমি তোমাকে বিব্রত করতে চাই না। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সামনে আসিনি। আজ যখন এসেই পড়েছি কয়েক হাত দূরে থেকেই একটু কথা বললে কী খুব বড় দোষ হয়ে যাবে?’

লিখনের করুণ কণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে পদ্মজা। লিখন হাসল। সুরগুলি যেন ফিরে এসে প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে। পদ্মজার উপস্থিতি এভাবে কাঁপন ধরাচ্ছে কেন! আজকের এই সময়টা সুন্দর, ভারি সুন্দর!

পর্ব ৫৩

কোনো সাড়া নেই। পদ্মজা পিছনে ফিরে তাকাল। লিখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে কী দেখছে! পদ্মজা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। কাটা কাটা গলায় বলল, 'কিছু বলার যখন নেই,আসি আমি।'

'ভুলে গেছো আমায়? মনে পড়ে না?'লিখনের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

পদ্মজার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, 'না ভুলবার মতো কোনো সম্পর্ক কী আমাদের ছিল? ছিল না। আর এভাবে নির্জনে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। আপনি বুঝদার মানুষ,জ্ঞানী মানুষ। এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝবেন।'

লিখন ম্লান হেসে বলল, 'আচ্ছা,আজ আসো।'

'একটা অনুরোধ ছিল।'

'কী?'

পদ্মজা ফের আবার তাকাল। সরাসরি লিখনের চোখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লিখনের বুক কেঁপে উঠে। সে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। পদ্মজা বলল, 'নিজেকে এবার গুছিয়ে নিন। মরীচিকার পিছনে অনেক দৌড়েছেন,আর না। এবার নিজের জীবনটা নতুন করে সাজান। আপনার মনের জোর বাড়ান। মানুষ দ্বিতীয় প্রেমেও পড়ে। দ্বিতীয় বার কাউকে ভালোবাসে। মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসে। আপনি চেষ্টা করুন। আপনিও পারবেন। কেউ না কেউ আপনার জন্য অবশ্যই আছে।'

'পদ্ম ফুল।'

পদ্মজা একটু সময়ের জন্য হলেও থমকায়। লিখন বলল, 'এভাবেই ভালো আছি আমি। তুমিও এভাবেই সারাজীবন ভালো থেকো।'

পদ্মজা কী প্রতিক্রিয়া দিবে বুঝে উঠতে পারছে না। এই লিখন শাহ তো এক ধ্যানেই পড়ে আছে। সে আর কথা বাড়াল না। যে বুঝেও বুঝতে চায় না,তাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। সে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'শুভ রাত্রি।'

লিখন পদ্মজার যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকে। তার অশ্রুসজল চাহনি। তবে বুকে প্রশান্তি। জীবনের খরতাপ দহনে মায়াময় পদ্মজার কণ্ঠ,একটু দেওয়া সময় তার বুকে প্রশান্তির ঢেউ তুলেছে। এই...এইটুকু সময়ের স্মৃতি নিয়েই কয়েকটা রাত আরামে ঘুমানো যাবে। সে বিড়বিড় করল, 'আমি মানতে পারি না তুমি অন্য কারো। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

শেষের শব্দ তিনটে ঘোর লাগা কণ্ঠে ভেঙে ভেঙে বলল।

পূর্ণাকে ঘরে এনে পদ্মজা ধমকে বলল, 'এই ঠান্ডার মধ্যে সোয়েটার না পরে কীভাবে থাকিস? বাইরে বাতাসও হচ্ছে। আমার কোনো কথাবার্তাই কী শুনবি না?'

পূর্ণা অপরাধী স্বরে বলল, 'আর হবে না আপা। আগামীকাল সন্ধ্যার আযানের সাথে সাথে ঘরে চলে আসব।'

'জি, না। বিকেল থেকেই ঘরে থাকবেন। এমনিতেই এই বাড়ির অবস্থা ভালো না। তুই দুই দিন পর বাড়িতে চলে যাবি।'

'তুমি যাবে না?'

পদ্মজা আনমনে কিছু ভাবল। তারপর বলল, 'যাব। কয়দিন পর। আচ্ছা,শোন রাতে টয়লেটে যেতে ভয় পেলে আমাকে ডাকবি। চেপে রাখবি না।'

'আচ্ছা।'

পূর্ণা খুক খুক করে কাশতে থাকল। পদ্মজা বিচলিত হয়ে বলল, 'কাশিও হয়ে গেছে! কত ঠান্ডা বাঁধিয়েছিস। জ্বরও আছে নাকি দেখি।'

পদ্মজা পূর্ণার কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা অনুমান করে বলল, 'আছেই তো। তুই কী নিজের যত্ন নেয়া শিখবি না? সারাদিন নতুন শাড়ি পরে, সাজগোজ করে ঘুরে বেড়ালেই নিজের যত্ন

নেয়া হয়ে যায়? স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে তো।'

পূর্ণা বাধ্য মেয়ের মতো বলল, 'আচ্ছা,নেব।'

'তা তো সবসময় বলিস। তুই বস, আমি কুসুম গরম পানি নিয়ে আসছি। গড়গড়া কুলি করে এরপর ঘুমাবি।'

'আপা-

'তুই চুপ থাক। চুপচাপ লেপের ভেতর শুয়ে থাক। আমি আসছি।'

পদ্মজা রান্নাঘরে এসে দেখে বালতিতে পানি নেই। বাড়ির সবাই যার যার ঘরে আছে। হয়তো ঘুমিয়েও গেছে। আমির তো সেই কখন ঘুমিয়েছে। পদ্মজা ছোট বালতি হাতে নিয়ে কলপাড়ে আসে। চারিদিক নির্জন,থমথমে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। পদ্মজা আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিল। ঝাপসা আলোয় পুরো বাড়িটাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। যদিও এই বাড়িতে সবসময়ই রহস্য বিদ্যমান! পদ্মজা বালতি রেখে,কল চাপতে যাবে তখনই কানে একটা ঝনঝন শব্দ আসে। স্টিলের কিছু কাছে কোথাও পড়েছে। পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। কান খাড়া করে বুঝতে পারল শব্দটা রানির ঘর থেকে আসছে। রানি আপার কোনো বিপদ হলো না তো? পদ্মজা ছুটে আসে রানির ঘরের সামনে। কানে ক্রোধ মেশানো চাপা কণ্ঠ ভেসে আসে, 'তোমার লগে কয়বার হুতছি বইললা ভাইবো না সবসময় হুইতে দিয়াম। মাডিতে যেভাবে এতদিন ছিলা,আজও থাকবা। বিছানাত উঠার জন্য গাঁইগুঁই করবা না।'

'মাডিত অনেক ঠান্ডা লাগে। আমারে এক কোণাত জায়গা দেও।'

'তুমি মাডিত থাকবা মানে মাডিত থাকবা। কামলা হইয়া মালিকের ছেড়ির লগে হুইবার সাহস আর করবা না।'

'আমি বিছানাত ঘুমাইয়াম। তুমি আমার বউ লাগো।'

'তুমি মাডিত ঘুমাইবা। আমি তোমারে জামাই মানি না।'

'দেহো রানি-

এরপরই একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে। রানি-মদন তর্ক করছে। নিশ্চয় রানি মদনকে ধাক্কা দিয়েছে। আর মদন ব্যথা পেয়েছে। পদ্মজা একবার ভাবল,দরজায় কড়া নাড়বে। এরপর ভাবল,স্বামী-স্ত্রীর অনেক কথা সে শুনে ফেলেছে। আর না শোনাই ভালো। যেহেতু তারা কারো সামনে ঝগড়া করে না, রাতে নিজ ঘরে সবার অগোচরে ঝগড়া করে। তাহলে ব্যপারটা ব্যক্তিগত। পদ্মজা সরে আসে। তবে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। এই দাম্পত্য সংসারে কী ভালোবাসা, সুখ আসবে না? মদন তো দেখতে খারাপ না। শুধু এতিম আর এই বাড়ির একজন বাধ্য ভৃত্য। এ ছাড়া তো ভীষণ সহজ-সরল। সবার সাথে হেসেখেলে কথা বলে। ঠোঁটে হাসি সবসময় থাকে।

লিখন, মৃদুল একই ঘরে একই বিছানায় শুয়েছে। লিখনের জন্য আলাদা ঘর ছিল। কিন্তু সে মৃদুলের সাথেই শুয়েছে। ছেলেটাকে খুব ভালো লেগেছে তার। সোজাসুজি কথা বলে। মনে কিছু চেপে রাখতে পারে না। এতক্ষণ বকবক করেছে। সবেমাত্র অন্যপাশে ফিরে চোখ বুজেছে। বোধহয় ঘুম পেয়েছে। লিখনের মনটা আনচান আনচান করছে। ইচ্ছে হচ্ছে,পদ্মজাকে দেখতে। একসাথে বসে গল্প করতে। কিন্তু এ তো সম্ভব নয়। এই বাড়িতে আর আসা যাবে না। পদ্মজার সামনে এলেই মন বেপরোয়া হয়ে যায়। কত-শত ইচ্ছে জেগে উঠে। লিখনের ব্যাক্তিত্ব ভীষণ শক্ত। শুধু এই একটা জায়গাতেই সে দূর্বল। এভাবে চলতে পারে না। নিজের জায়গায় নিজেকে শক্ত থাকতে হবে। লিখন জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। মৃদুল ফিরে তাকাল। বলল, 'ভাইয়ের ঘুম পাইতাছে না?'

'হু। তুমি ঘুমাও।'

মৃদুল মেরুদণ্ড সোজা করে শুয়ে বলল, 'আপনি –

'আপনি না তুমি। একটু আগেই না আমাদের কথা হলো। তুমি আমাকে তুমি বলবে।'

মৃদুল হাসল। বলল, 'তুমি যে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছো,সে মেয়েটা পদ্মজা ভাবি। তাই না?'

লিখন অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। পদ্মজা যে বাড়ির বউ সে বাড়ির আত্মীয়র সাথে এসব নিয়ে কথা বলাটা নিশ্চয় অনুচিত! এতে পদ্মজার অসম্মান হবে। সে তো চায় না,পদ্মজা কষ্ট পাক। তাকে নিয়ে কেউ দুই লাইন বেশি ভাবুক। পদ্মজা সবসময় ভালো থাকুক। লিখন জোরপূর্বক হাসল। তারপর বলল, 'কী বলছো! তেমন কিছুই না। ঘুমাও এখন। আমারও অনেক ঘুম পাচ্ছে।'

লিখন অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে পড়ে। মৃদুল হতাশ হয়ে চোখ বুজে।

পদ্মজা অন্ধকারে ধীরে ধীরে হাঁটছে। হাতে কাঁচের গ্লাস। তাতে কুসুম গরম পানি। সিঁড়িতে পা রাখতেই কারো পায়ের আওয়াজ কানে আসে। পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে,আলমগীর চোরের মতো চারপাশ দেখে দেখে সদর দরজার দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা দ্রুত সিঁড়ি থেকে নেমে চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। গ্লাস রেখে দেয় এক পাশে। তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে আলমগীরকে পরখ করছে। আলমগীরের পরনে পাঞ্জাবি। বাড়িতে ভদ্রলোকের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। শান্তশিষ্ট,চুপচাপ। মাঝেমধ্যে ঢাকা যায়। দেখা হয়,তবে কথা হয় না। কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। নিজ ইচ্ছায় কথা বলে না। আলমগীর সদর দরজা পেরিয়ে যায়। পদ্মজা সাবধানে আলমগীরের পিছু নেয়। পায়ের জুতাগুলো হাঁটার তালে মৃদু শব্দ তুলছে। তাই পদ্মজা জুতাজোড়া খুলে দরজার পাশে রেখে দিল। আলমগীর অন্দরমহলের ডান দিকে এগোচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক চারিদিকে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। গা ছমছমে পরিবেশ। এদিকওদিক কোনো মৃদু শব্দ হতেই পদ্মজা উৎকর্ণ হয়ে উঠছে। কেমন গা কাটা দিচ্ছে। এতো রাতে দীর্ঘদেহী এই লোক যাচ্ছে কোথায়? হাঁটতে হাঁটতে তারা বাড়ির পিছনে চলে আসে। আলমগীর অন্দরমহলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে এটাই তার গন্তব্য। পদ্মজা কলাগাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। বাতাসে গা কাঁপুনি দিচ্ছে। আলমগীর টর্চ জ্বালিয়ে চারপাশ দেখে নিল। তারপর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। মনে হচ্ছে,কাউকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। পদ্মজার রগে রগে দামামা শুরু হয়। কী হতে চলেছে? আজ সে কী দেখবে?

পূর্ণা বিরক্ত হয়ে শোয়া থেকে উঠে বসে। এতক্ষণ হয়ে গেল তার আপা আসছে না কেন? সে জুতা পরে বেরিয়ে আসে। নেমে আসে নিচ তলায়। রান্নাঘরে যাওয়ার পথে পায়ে কাঁচের গ্লাস লেগে পড়ে যায়। পূর্ণা ভয় পেয়ে যায়। এখানে গ্লাস কে রাখল! আংশিক পানি তার পায়ে লাগে। মনে হচ্ছে, পানিটা গরম। এই রাতের বেলা গরম পানি এখানে...কীভাবে? পূর্ণা ভাবে, তার আপার পানি গরম করার কথা ছিল। কিন্তু গরম করে এখানে কেন রাখবে? ঘরে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। পূর্ণা রান্নাঘরে এসে দেখে পদ্মজা নেই। সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দরজার পাশে পদ্মজার জুতা দেখে ভয়টা আরো বেড়ে যায়। সে দৌড়ে আমিরের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল,আমির ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা নেই। পূর্ণা এবার ঘামতে থাকল। সে শুনেছে,এই বাড়িতে ভূত-জ্বীন আছে। এরা মানুষের ক্ষতি করে। বিশেষ করে সুন্দর মানুষদের। তার মানে তার আপার গুরুতর বিপদ! পূর্ণা এক দৌড়ে রান্নাঘরে আসে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে নেয়। অন্যসময় হলে ভয় কাজ করত। আজ করছে না। সে তার আপাকে জান দিয়ে হলেও বাঁচাবে। মনে হয়,কোনো শয়তান জ্বীন তার বোনকে ধরেছে এবং পুকুরপাড়ে নিয়ে গেছে। পূর্ণা ঝটপট বেরিয়ে পড়ে। কাউকে ডাকার বুদ্ধি অবধি মাথায় আসেনি। সে আতঙ্কে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। আয়তুল কুরসি পড়তে পড়তে পুকুরপাড়ের পথ ধরে।

পদ্মজাকে চমকে দিয়ে তৃতীয় তলার একটা জানালা হাট করে খুলে যায়। সেখান থেকে একটা মোটা দড়ি আলমগীরের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। পদ্মজার ওষ্ঠদ্বয় নিজেদের শক্তিতে আলাদা হয়ে যায়। দুই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। আলমগীর সেই দড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় উঠে যায়। দড়ি বেয়ে উপরে উঠার দ্রুততা দেখে মনে হলো,এর আগে বহুবার আলমগীর দড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে আলমগীর কার ঘরে গিয়েছে? তৃতীয় তলায় সে একবার গিয়েছে তাই জানেও না কোন ঘরে

কী আছে। পায়ের গোড়ালিতে ঠান্ডা শিরশিরে অনুভব হচ্ছে। পদ্মজা এক হাত দিয়ে ছুঁতেই বুঝতে পারে জোঁকে ধরেছে। জোঁকে তার খুব ভয় আছে। কিন্তু এখন ভয় করছে না। এখন তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে অন্যকাজে। সে জোঁক ছাড়িয়ে নিল। অনেকক্ষণ পার হয়ে যায় আলমগীরের দেখা নেই। দড়ি তো ঝুলছে। মানে নামবে আবার। পদ্মজা কোমরে এক হাত রেখে তাকিয়ে রইল। আচমকা মনে পড়ে,তৃতীয় তলায় রুম্পা আছে। ডান দিকের কোনো এক ঘরে। আর আলমগীর ডান দিকের কোনো ঘরের জানালা দিয়েই ঢুকেছে। মানে কী রুম্পার কাছে গিয়েছে? পদ্মজা বারংবার শুধু চমকাচ্ছে। আলমগীর দড়ি বেয়ে নেমে পড়ে। তারপর ইশারায় অন্য কাউকে নামতে বলে। কাঙ্ক্ষিত সেই মুখটি দেখে পদ্মজার পিল চমকে উঠে। রুম্পা! শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে দড়ি বেয়ে নামছে। বার বার দড়ি থেকে হাত ছুটে যাচ্ছে। আলমগীর দুই হাত বাড়িয়ে রেখেছেন যাতে রুম্পা পড়ে গেলে তিনি ধরতে পারেন। পদ্মজার বুক দুরুদুরু করছে,যদি রুম্পা পড়ে যায়! এতো ঝুঁকি কেন নিয়েছে?

রুম্পার পা মাটিতে পড়তেই আলমগীর শক্ত করে রুম্পাকে জড়িয়ে ধরে। রুম্পার কান্নার সুর ভেসে আসে। তাৎক্ষণিক আলমগীর রুম্পার মুখ চেপে ধরে কিছু বলল। তারপর টর্চের আলো দিয়ে চারপাশ দেখে, রুম্পাকে এক হাতে শক্ত করে ধরে হাঁটা শুরু করল। তখন কোথেকে উদয় হয় একজন অদ্ভুত লোকের। লোকটা কালো,মোটা,লম্বা চুল। এক হাতে রাম দা, অন্য হাতে লাঠি। অজানা বিপদের আশঙ্কা পেয়ে পদ্মজার ভয় হলো। পা থেকে কিছুটা দূরে থাকা কয়েকটা পাথরের মধ্যে বড়সড় দেখে একটা পাথর হাতে নিল। যেন বিপদে কাজে লাগানো যায়। আলমগীর আর অজ্ঞাত লোকটির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। একসময় তা হাতাহাতিতে চলে যায়। রুম্পা ভয়ে জুবুথুবু হয়ে গেছে। অজ্ঞাত লোকটি রুম্পাকে ধরতে চাইছে। কিন্তু আলমগীর তা হতে দিচ্ছে না। পদ্মজার মনে হচ্ছে,এখন তার সামনে যাওয়া উচিত। আল্লাহর নাম নিয়ে সে কলাগাছের পেছন থেকে বেরিয়ে আসে। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির হাত থেকে রামদা নিয়ে দূরে ফেলে দিল। তখনই সে পদ্মজাকে দেখতে পেল। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'বোন,সাহায্য করো।'

অজ্ঞাত লোকটি পদ্মজাকে দেখে আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠল। সে ছুটে এসে ছোঁ মেরে রুম্পাকে ধরতে চাইল। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই হাতে ঝাপটে ধরে রেখে রুম্পাকে বলে, 'তুমি যাও রুম্পা।'

রুম্পা দৌড়ে পদ্মজার কাছে আসে। সে হাঁপড়ের মতো হাঁপাচ্ছে। ভয়ে ঘামছে। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটিকে আটকে রাখতে পারছে না। সে অনেক কষ্টে অনুরোধ করে, 'আমার রুম্পারে ওরা মেরে ফেলবে। তুমি ওরে খালপাড়ে নিয়ে যাও বোন। আমি আজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব।'

পদ্মজা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে রুম্পাকে। আলমগীরের হাত থেকে পড়ে যাওয়া টর্চের আলো অজ্ঞাত লোকটির মুখে পড়তেই পদ্মজার খুব চেনা মনে হয়। আবার পারিজার খুনির বর্ণনাও ঠিক এমনই। ভাবতেই, পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। সেই মুহূর্তে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আবির্ভাব ঘটে পূর্ণার। সে পুকুরপাড়ে যাচ্ছিল। টর্চের আলো পেয়ে সে এদিকে ছুটে এসেছে। অজ্ঞাত লোকটি রুম্পার উদ্দেশ্যে হাতের লাঠি ছুঁড়ে মারে। পদ্মজা দ্রুত রুম্পাকে নিয়ে সরে যায়। লাঠি গিয়ে সোজা পূর্ণার কাঁধে পড়ে। সে আপা বলে আর্তনাদ করে বসে পড়ে। পদ্মজা দিকদিশা হারিয়ে ফেলে। কী করবে সে? মনে হচ্ছে রুম্পাকে কেউ খুন করতে চাইছে তাই আলমগীর তাকে নিয়ে পালাচ্ছে। আর এই নাম না জানা লোক,রুম্পাকে আঘাত করতে চাইছে। আবার পূর্ণাও আঘাত পেয়েছে। কী করবে পদ্মজা? রুম্পাকে নিয়ে খালের দিকে যাবে? পূর্ণাকে এই ভয়ংকর পরিবেশ থেকে নিরাপদে নিয়ে যাবে? নাকি পারিজার খুনিকে ধরবে?

থেকে থেকে দূরে হুতুম প্যাঁচা ডাকছে। যা ভুতুড়ে শোনাচ্ছে। গা কাঁপুনি ঠান্ডা। সময়টা যেন থমকে দাঁড়িয়ে চড়ছে দণ্ড শূলে। পদ্মজা ছুটে আসে পূর্ণার কাছে। পূর্ণা উবু হয়ে শুয়ে পড়েছে। কাঁদছে মা,মা করে। পদ্মজা এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে রুম্পাকে। আরেক হাতে পূর্ণার কাঁধে ছুঁয়ে দেখল কোথায় আঘাত পেয়েছে। ঠান্ডায় তার ঠোঁট কাঁপছে। কানে ভেসে আসছে দুজন পুরুষের ধস্তাধস্তির দুপদাপ শব্দ। পদ্মজার ঠান্ডা হাতে পূর্ণার আহত স্থানের রক্ত লাগতেই সে আঁতকে উঠল। রুম্পাকে ছেড়ে পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরল। পাশে তাকিয়ে দেখল,যে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে সে লাঠির আগায় কাঁচি বাঁধা। পূর্ণার ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পূর্ণার পুরো শরীর। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির সাথে আর পারছে না। সে আকুতি, মিনতি করে পদ্মজাকে বলছে, 'পদ্মজা,পদ্মজা, বোন সহায় হও।'

টানাপোড়নে পদ্মজার হাত পা কাঁপতে থাকল। সে পূর্ণাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। পূর্ণা কিছুতেই উঠতে পারছে না। যন্ত্রনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে সে। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজার বুক ব্যথায় বিষে যাচ্ছে। এই রাত, রাতের আঁধার এতো পাষাণ কেন হলো! আলমগীরের আর্তনাদ ভেসে আসে। পদ্মজা চমকে ফিরে তাকাল। অজ্ঞাত লোকটি আলমগীরের স্পর্শকাতর স্থানে অস্বাভাবিকভাবে আঘাত করেছে। ফলে সে দূর্বল হয়ে আর্তনাদ করে উবু হয়ে ছটফট করছে। অজ্ঞাত লোকটি দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে ছুটে এসে রুম্পাকে ধরতে চাইল। পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। অজ্ঞাত লোকটি কর্কশ কণ্ঠে পদ্মজাকে হুংকার দিল, 'আমার কাম আমারে করতে দে।'

একটা মানুষের কণ্ঠস্বর এতো ভয়ংকর কী করে হয়! এই কণ্ঠস্বর যে কাউকে কাঁপিয়ে তুলবে। পদ্মজা কিঞ্চিৎ চমকালেও থেমে থাকল না। উত্তরে হাওয়ায় তার চুল এলোমেলো হয়ে উড়ছে। সে অজ্ঞাত লোকটির মতোই হুংকার দিয়ে বলল, 'নিজের ভালো চান তো আত্মসমর্পণ করুন।।

পদ্মজার কথা শুনে লোকটি ব্যঙ্গ করে হাসল। খুব কাছ থেকে অজ্ঞাত লোকটির মুখ দেখে পদ্মজা কপাল কুঁচকে ফেলল। লোকটির মুখ থেকে বিশ্রি একটা দূর্গন্ধ আসছে। স্বাস্থ্যবান দেহ,গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। সাদা দাঁতকপাটি আর লাল ভয়ংকর চোখ দুটিই আগে নজর কাড়ছে। পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই অজ্ঞাত লোকটি পদ্মজাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এরপর লাঠি হাতে তুলে নিল। রুম্পা ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু পারল না। অজ্ঞাত লোকটি তার গলা চেপে ধরল।

পদ্মজা দৌড়ে এসে অজ্ঞাত লোকটির পিঠে কিল ঘুষি দিল। তাও কাজ হলো না। পদ্মজার গায়ের শক্তি লোকটিকে এক চুলও নাড়াতে পারেনি। রুম্পা গোঙাচ্ছে। পূর্ণা যন্ত্রনায় কাঁদছে,ভয়ে জুবুথুবু হয়ে আছে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। নিশাচর পাখিরা আজ যেন অদ্ভুত স্বরে ডাকাডাকি করছে। কেমন গা কাঁপিয়ে তোলা! ঝিঁঝিঁপোকাদের ডাক বেড়েছে,কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে বাতাসের বেগ।

অজ্ঞাত লোকটির হিংস্র থাবা রুম্পাকে গ্রাস করে নিয়েছে। লোকটি পা দিয়ে মাটি থেকে লাঠি তুলল। তারপর লাঠির আগা থেকে কাঁচি হাতে নিল।

আর একটু ক্ষণ তাহলেই সেই ধারালো কাঁচি রুম্পার গলার রগ টেনে নিবে। উড়ে যাবে রুম্পার রুহ। আলমগীর নিজের যন্ত্রণা ভুলে ছুটে আসে তার সহধর্মিণীর প্রাণ বাঁচাতে। তার আগেই ঘটে যায় ভয়ংকর এক দৃশ্য। পদ্মজা অজ্ঞাত লোকটির পড়ে থাকা রামদা তুলে তার পিঠেই কোপ বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত লোকটি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ফলে রাম দা আরো গভীরে প্রবেশ করে। গরু জবাইয়ের পর গরু যেভাবে কাতরায় অজ্ঞাত লোকটি সেভাবে কাতরাতে থাকল। রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার শাড়িতে,মুখমণ্ডলে। কাতরাতে থাকা দেহটি ডিঙিয়ে আলমগীর রুম্পার কাছে যায়। তারপর পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজার বুক

হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। চোখে যেন ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায় দেহটি। নিস্তেজ হয়ে পড়ে পদ্মজাও। সে এলোমেলো পায়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। তার শরীর কিঞ্চিৎ কাঁপছে। এটা সে কী করেছে! এ যে অচিন্তনীয় কাজ! সব এলোমেলো লাগছে। মাথা ভনভন করে ঘুরছে। গা গুলিয়ে উঠছে।

পূর্ণা এই দৃশ্য দেখে নিজের রক্তক্ষরণ ভুলে যায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে। নাভি উল্টে বমি বেরিয়ে আসে। আলমগীর তাড়াহুড়ো করে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। পদ্মজার বুকে বইছে অপ্রতিরোধ্য তুফান! সে নিষকম্প চোখে তাকিয়ে আছে নিথর দেহটির দিকে। আলমগীর একটা চাবি পদ্মজার হাতে গুঁজে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলল, 'ভয় পেয়ো না। এই বাড়িতে দিন দুপুরে খুন হলেও তা বাইরের কেউ জানবে না। সকালে উঠে দেখবে এখানে বাবলুর লাশও নেই রক্তও নেই। কেউ না কেউ সরিয়ে দিবে। সব দুঃস্বপ্ন মনে হবে। দ্রুত ঘরে ফিরে যাও। আমার অনেক কথা বলার আছে। আমি চিঠি লিখব। তোমার বাপের বাড়ির ঠিকানায়। আসছি।'

রুম্পা দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। তার বুকটা হাহাকার করছে। পদ্মজার কথা খুব মনে পড়বে। আলমগীর অস্থির হয়ে চারিদিক দেখছে। আতঙ্কে সে কাঁপছে। এই বুঝি কেউ এসে গেলো। আর রুম্পাকে আবার বন্দি করে দিল। এমন অশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আতঙ্কে যেকোনো মুহূর্তে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রুম্পা পদ্মজাকে কিছু বলতে চেয়েছিল,আলমগীর বলতে দিল না। তার আগেই টেনে নিয়ে দৌড়াতে থাকল। পদ্মজা তাদের যাওয়ার পানে চেয়ে থাকল। ঝিঁঝিঁপোকাদের আলোর ভীড়ে দুজন হারিয়ে যাচ্ছে। তারা বাঁচার আশায় দৌড়াচ্ছে। না হওয়া সংসার পাতার স্বপ পূরণ করতে দৌড়াচ্ছে। দুজন আড়াল হয়ে যেতেই পদ্মজা দুই হাতে নিজের মুখ ছুঁলো। এরপর দুই হাত সামনে এনে দেখল,টকটকে লাল রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে বমি করতে থাকল। তারপরপরই সম্বিৎ ফিরল। সে পূর্ণাকে খুঁজতে থাকল। একটু দূরে পূর্ণা ঘাসের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। পদ্মজা দৌড়ে আসে। পূর্ণা পিটপিট করে তাকায়। পূর্ণাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ের শরীর তো কম ভারি নয়। পদ্মজার শক্তিতে কুলোচ্ছে না। সে পূর্ণাকে আকুতি করে বলল, 'উঠার চেষ্টা কর বোন।'

পূর্ণার শরীরে ভূমিকম্প বয়ে যাচ্ছে। সে পুরো ভর পদ্মজার উপর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। পদ্মজা শরীরের পুরোটা শক্তি দিয়ে পূর্ণাকে আগলে ধরে সামনে হাঁটা শুরু করে। পদ্মজার পা জোড়া ঠকঠক করে কাঁপছে। সে জানে না এটা শীতের কাঁপুনি নাকি ভয়ংকর কোনো কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার উত্তেজনা। মনে হচ্ছে যেন ভয়ংকর একটা ঝড় হুট করে শুরু হয়ে হুট করে থেমে গেছে। আর রেখে গেছে নিঃশ্বাস থামিয়ে দেওয়া নিস্তব্ধতা। পদ্মজা ঘামছে, কাঁপছে। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে,এই বুঝি মৃত বাবলু উঠে দাঁড়াল। অনেক অনেক প্রেতাত্মা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই বোনের উপর!

জঙ্গলের গাছপালা থেকে প্যাঁচাদের দল তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে,সদ্য খুন হওয়া একটা মৃত দেহ পড়ে আছে ঘাসের উপর। আরেকটু দূরে ছিমছাম গঠনের শাড়ি পরা একটা মেয়ে চুল খোলা রেখে এলোমেলো পায়ে আরেকটা দূর্বল দেহকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভেতর! দুজনের গায়ে তাজা লাল রক্ত। এই দৃশ্য তো রাতের আঁধারের চেয়েও ভয়ংকর! যার স্বাক্ষী হয়ে রইল রাতের আঁধার আর নিশাচর পাখিরা।

প্রতিদিনের মতোই ভোরের আলো নিকষকালো রাতকে ঠেলে দূরে সরিয়ে পৃথিবীটাকে আলোকিত করে তুলেছে। পাখিরা কিচিরমিচির করে ডাকছে। নতুন করে শুরু হয়েছে আরেকটা দিন। শুধু পদ্মজার সময়টা থমকে গেছে। সে তার গোসলখানায় বসে আছে। কনকনে ঠান্ডায় গোসল করেছে। এরপর থেকেই উদাসীন হয়ে ভেজাকাপড়ে বসে আছে। পূর্ণা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা রাতে ধীরেসুস্থে পূর্ণার ক্ষত সামলেছে। বুঝতে দেয়নি,সে মনে মনে কতোটা ভেঙে পড়েছে। যখন রাতে তারা দুই বোন দুই তলায় উঠছিল,তখন পিছনে কেউ যেন ছিল! এতো চিৎকার, চেঁচামিচি হয়েছে আর কেউ শুনেনি? অন্দরমহলের

রিদওয়ান এবং মজিদের ঘরের মানুষদের তো শোনার কথা ছিল। কারণ তাদের ঘর ডান দিকে,আর ডান দিকেই এতো বড় ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। পূর্ণা জোরে জোরে কেঁদেছে,আলমগীর চেঁচিয়েছে। বাবলু নামের সেই লোকটি খুন হওয়ার সময় আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করেছিল। দুপদাপ শব্দ তুলে কাতরেছিল। তবুও কেউ আসেনি! কেন? তার কেন মনে হচ্ছে,সবাই শুনেছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। পদ্মজার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে। সবকিছু কেমন ওলটপালট লাগছে। কাউকে খুন করার মতো সাহস কী করে হলো? এ কী মা হেমলতার গুণ! পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। চোখ পড়ে আলমগীরের দেয়া চাবিটার দিকে। চাবিটা দেখতে অনেক বড়। সে অপলক চোখে চাবির দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমির ঘুম থেকে উঠে পদ্মজাকে দেখতে না পেয়ে গোসলখানায় উঁকি দিয়ে পদ্মজাকে দেখে সে চমকে উঠল। পদ্মজার শাড়ি হাঁটু অবধি তোলা। আঁচল বুকে নেই। চুল এলোমেলো। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। থেমে থেমে কাঁপছে। তাতেও পদ্মজার ভ্রুক্ষেপ নেই। আমির হন্তদন্ত হয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করল। পদ্মজার দুই বাহু দুই হাতে চেপে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, 'পদ্মবতী, কী হয়েছে? এ কী অবস্থা তোমার।'

পদ্মজা কিছু বলল না। সে আমিরের চোখের দিকে নিজের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল। আমির দ্বিগুণ বিচলিত হয়ে বলল, 'এই পদ্ম, তুমি কাঁপছো তো। কী হয়েছে?'

পদ্মজার ঠোঁট দুটি ভেঙ্গে আসে। আর চোখ ছাপিয়ে জল। আমির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা আচমকা আমিরকে জড়িয়ে ধরল। আমিরের পুরো শরীর মুহূর্তে ঠান্ডা বরফ হয়ে যায়। পদ্মজা বাঁধভাঙা নদীর মতো হু হু করে কাঁদতে থাকল। আমির শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বলো না কী হয়েছে? আমার চিন্তা হচ্ছে।'

পদ্মজা আরো শক্ত করে আমিরকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি... আমি খ..খুন করেছি।'

'কী...কী বলছো! এই পদ্মজা।'

পদ্মজা আমিরের পিঠ খামচে ধরে বলল, 'আ...আমি..এটা কেমনে করলাম!'

আমির পদ্মজাকে নিজের সামনাসামনি বসিয়ে বলল, 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সব বলো না আমাকে! কান্না থামাও।'

পদ্মজা মেঝেতে দৃষ্টি রেখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে পুরো ঘটনাটা বলল। সে নিজের কাজে নিজে অবাক। আমির পদ্মজাকে শান্ত করার জন্য বুকের সাথে চেপে ধরে বলল, 'কিছু হয়নি। শান্ত হও। কান্না থামাও।'

পদ্মজার কান্না থামে। সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তার মাথা কাজ করছে না। মস্তিষ্ক শূন্যের কোঠায়। আমির তা বেশ বুঝতে পেরেছে। আলমারি থেকে শাড়ি,ব্লাউজ নিয়ে আসল। নিজে পদ্মজাকে পরিয়ে দিল। পদ্মজার পুরো শরীর যেন শরীর না, বরফ। এতোই ঠান্ডা! আমির পদ্মজার চুল মুছে দিয়ে বলল, 'ঘরে চলো। না, থাক। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

পদ্মজা তরঙ্গহীন স্বরে বলল, 'তোমার ঘাড়ে টান পড়বে। আমি যেতে পারব।'

আমির পদ্মজাকে ধরে ধরে নিয়ে আসে। পদ্মজাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লেপ জড়িয়ে দিল গায়ে। তারপর বলল, 'আমি থাকতে তোমার কিছু হবে না। ডান দিকে তো?'

পদ্মজা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। আমির সোয়েটার পরে বেরিয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বলল, 'কই কোথাও তো কিছু পাইনি।'

পদ্মজা চমকে গেল। দ্রুত উঠে বসল। তারপর চোখ বড়বড় করে জানতে চাইল, 'লাশ বা রক্ত কিছুই নেই?'

আমির নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'না তো। তুমি রাতে স্বপ্ন দেখেছো বোধহয়।'

পদ্মজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। অস্থির হয়ে পড়ে। এটা কী করে সম্ভব! এই কাকডাকা ভোরে লাশ থাকবে না কেন! আলমগীরের বলা কথাগুলো মনে পড়তেই পদ্মজা সব বুঝতে পারে। ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে। তার ঠোঁট দুটি তিরতির করে

কাঁপছে!

অন্ধকার নেমে এসেছে। সন্ধ্যা তার ঝাঁপি থেকে অন্ধকার নিয়ে এসে ঝপ করে রাত নামিয়ে দিল। বিদ্যুৎও চলে গেল। পদ্মজা হারিকেন জ্বালিয়ে প্রেমার ঘরে এলো। প্রেমা পড়ছিল। পূর্ণা শুয়ে আছে। পদ্মজাকে দেখে প্রেমা এগিয়ে এসে হারিকেন নিল। এরপর বলল, 'আপা সন্ধ্যার নামায পড়েনি।'

'তুই পড়। আমি দেখছি।'

পদ্মজা পূর্ণার শিয়রে বসে কাশি দিল,পূর্ণার মনোযোগ পেতে। পূর্ণার সাড়া পাওয়া যায়নি। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সেদিনের ঘটনার ছয় দিন কেটে গেছে। পূর্ণার স্বাভাবিক হতে দুইদিন লেগেছিল। দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি। কিন্তু কাঁধের ক্ষতটা শীতের কারণে পেকেছে। খুব জ্বালাতন করে। আপা,আপা করে কাঁদে। পদ্মজার ভালো লাগে না সেই কান্না শুনতে। কষ্ট হয়। পদ্মজার বুক ভারি হয়ে আসে। পূর্ণার গায়ে লেপ জড়িয়ে দিল। তারপর পূর্ণার মাথায় কিছুক্ষণ বিলি কেটে দিয়ে প্রেমাকে প্রশ্ন করল, 'প্রান্ত কোথায়?'

'লাহাড়ি ঘরে।'

'কী করে ওখানে?'

'কী হিবিজিবি বানায়। বিজ্ঞানী হয়ে যাবে দেখো।'

'মজা করে বলছিস কেন? হিবিজিবি বানাতে বানাতেই একদিন চমকে দেয়ার মতো কিছু বানিয়ে ফেলবে। বিরক্ত করিস না। ওকে ওর মতো সময় কাটাতে দিস।'

'কে যায় ওরে বিরক্ত করতে। আমি আমার পড়া নিয়েই আছি।'কথা শেষ করেই প্রেমা পড়ায় মনোযোগ দিল। পদ্মজা মুচকি হাসল। প্রেমাকে খুব ভালো লাগে তার। মেয়েটা লাজুক না শুধু, ভীষণ বুদ্ধিমতীও বটে। চাল চলন আকর্ষণ করার মতো।

বাসন্তী এই রাতের বেলা হারিকেন জ্বালিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন। পদ্মজা রাগী স্বরে বলার চেষ্টা করল, 'রাতের বেলা কী করছেন আপনি? বিশ্রাম নিন এখন।'

বাসন্তী পদ্মজার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, 'কিছুক্ষণ আগেই তো সন্ধ্যা হলো।'

'সারাদিন কাজ করেন। এখনও করবেন? বিকেলে এতোসব রান্নাও করলেন। যতদিন গ্রামে আছি আমি এই সেলাই-টেলাই যেন আর না দেখি।'

বাসন্তীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে পদ্মজা কাঁথা কেড়ে নিল। বাসন্তীর কোনো কথা শুনেনি। আলমারির ভেতর কাঁথা,সুতা,সুঁই রেখে বলল, 'যতদিন আছি আমি এগুলো বের করতে যেন না দেখি। বুঝছেন?'

'আমার কী আর কিছু বলার আছে?'

পদ্মজা হেসে ফেলল। সাথে বাসন্তীও। আমিরের আগমন ঘটে তখনি। পরনে বেশ দামী জ্যাকেট। পায়ে বুট। সে বাইরে গিয়েছিল,হেমলতার মিলাদের ব্যবস্থা করতে। পদ্মজা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'সব ঠিক হয়েছে? আর একদিন পরেই কিন্তু-

'কোনো চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে গেছে। পেটে ইদুর দৌড়াচ্ছে। খেতে দাও।'

বাসন্তী বিছানা থেকে দ্রুত নামলেন, 'দিতেছি বাবা।'

'আমি যাচ্ছি তো।'বলল পদ্মজা।

'তুমি জামাইকে নিয়ে কলপাড়ে যাও। দেখ, জুতায় কাদা লাগিয়ে আসছে।'

সাথে সাথে পদ্মজা আমিরের পায়ের দিকে তাকাল। আমিরও তাকাল। পদ্মজা আক্ষেপের সুরে বলল, 'এতো কাদা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন কেন!'

আমির তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। অপরাধী স্বরে বলল, 'দুঃখিত আমি।'

'আসুন কলপাড়ে।'

কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। কুয়াশার স্তর এতোই ঘন যে পাঁচ-ছয় ফুট দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। পদ্মজা কল চাপছে, আমির জুতা থেকে কাদা ধুয়ে ফেলছে। কলের

পানি কুসুম গরম। শীতের সময় কল থেকে গরম পানি আসার ব্যাপারটা দারুণ। আমির বলল, 'পূর্ণা কী ঘুমিয়ে গেছে?'

'হু।'

'হু, ঘুমাবেই তো। প্রতিদিন সন্ধ্যার আযান পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর ফজরের আযানের আগ থেকে উঠে পকপক শুরু করে। ঘুমাতে পারি না।'

পদ্মজা শব্দ করে হাসল। বলল, 'ঠিকই তো করে। ফজরে কীসের ঘুম?'

'বোনের পক্ষই তো নিবে।'

ক্ষণকাল পিনপতন নিরবতা। আমিরের জুতা ধোয়া শেষ। পদ্মজা শুকনো কণ্ঠে বলল, 'ওই বাড়ির মানুষদের আসতে বলেছেন?'

ওই বাড়ির নাম উঠতেই আমির জ্বলে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ওই বাড়ির নাম নিতে নিষেধ করেছি।'

'তবুও-

'না বলিনি। আর বলবও না।'

আমির পায়ে গটগট শব্দ তুলে চলে যায়। পদ্মজা আমিরের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল। সে রাতের পর ওই বাড়িতে তারা তিন দিন ছিল। তারপরই আমির চাপ দিতে থাকে,ওই বাড়ি ছাড়তে। সে সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকে। এভাবে আতঙ্ক নিয়ে বাঁচা যায় না। আমির রাতে ঘুমায় না, ছটফট করে। এই বুঝি পদ্মজার কিছু হয়ে গেল। পদ্মজা খেয়াল করেছে, আমির রাতে কপালের উপর হাত রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকে। তাছাড়া এইভাবে লাশ অদৃশ্য হয়ে গেল। পর পর তিন দিন কেটে যায় তবুও কেউ কিছু বলেনি। কারো মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। ব্যাপারটা ভয়ংকর। পূর্ণার ওখানে থাকা বিপদজনক। সে বিপদকে ভয় পায় না। কিন্তু পূর্ণার কিছু হলে সে মানতে পারবে না। আবার পূর্ণা একা এই বাড়িতে আসবে না। তাই বাধ্য হয়ে তিনজন একসাথে চলে এসেছে। তবে পদ্মজা আবার যাবে ওই বাড়িতে। যেতে তাকে হবেই। হাওলাদার বাড়ির প্রতিটি কোণার রহস্য সে নিজের নখদর্পণে আনবেই। এটা তার শপথ।

অনেক রাত হয়েছে। রাতের খাবারের সময় পূর্ণাকে ডেকে তোলা হয়। একবার ঘুম ভেঙে গেলে পূর্ণা আর ঘুমাতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায়। প্রেমা এখনও পড়ছে। পূর্ণা বিরক্তি নিয়ে প্রেমার দিকে তাকাল। মনে মনে বলে,এই মেয়ে কী বিশ্ব জয় করে ফেলবে পড়ে? এতো তো আপাও পড়েনি।

'বাত্তিডা নিভিয়ে এসে ঘুমা। অনেক পড়ছস।'কিড়মিড় করে বলল পূর্ণা।

প্রেমা গুরুজনদের মতো করে বলল, 'বাত্তিডা না বাতিটা হবে।'

'থাপ্পড় দিয়ে দাঁত গাছে তুলে দেব, আমাকে কিছু শেখাতে আসলে।'

প্রেমার মুখে আঁধার নেমে আসে। সে থমথমে মুখ নিয়ে বই বন্ধ করে। ঝিম মেরে বসে থাকে। পূর্ণা সন্তুষ্ট হয়ে বলে, 'এবার হারিকেনের আগুন নিভা। এরপর শুয়ে পড়।'

প্রেমা হারিকেনের আগুন নিভাতে প্রস্তুত হতেই,পূর্ণা বলল, 'না,থাক নিভাতে হবে না। ভয় করে। তুই শুয়ে পড়।'

প্রেমা বাধ্যের মতো এসে শুয়ে পড়ে। লেপের ভেতর ঢুকে। তার ঠান্ডা পা জোড়া পূর্ণার পায়ে লাগতেই,পূর্ণা হইহই করে উঠে, 'ও মাগো কী ঠান্ডা! দূরে যা।'

প্রেমা রাগী চোখে তাকাল। পূর্ণা ধমক দিয়ে বলল, 'কি হইছে? এমনে তাকাস কেন? খেয়ে ফেলবি?'

পূর্ণার সাথে কথা বলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারতে ইচ্ছে হচ্ছে না প্রেমার। পূর্ণার কথাবার্তাকে পাত্তা দিলে প্রেমার ঘুম নষ্ট হবে,সকালে উঠে নামায পড়াও হবে না,বই পড়াও হবে না। এটা ভেবে প্রেমা পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও যায়। পূর্ণা মাথা তুলে দেখে প্রেমা ঘুমালো নাকি। যখন বুঝলো ঘুমিয়ে গেছে,তখন লেপ দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিল প্রেমাকে। এরপর জড়িয়ে ধরল। যেন দ্রুত প্রেমার ঠান্ডা শরীর গরম হয়ে

আসে। এই বোনটাকে সে ভীষণ ভালোবাসে। খুব বেশি। শুধু ভালোবাসাটা প্রকাশ করতে পারে না কেন জানি! প্রেমার ঘুম খুব পাতলা। পূর্ণা তাকে জড়িয়ে ধরতেই তার ঘুম ছুটে যায়। ঠোঁটে ফুটে উঠে মুচকি হাসি। প্রায় এরকম হয়। সে ঘুমালে পূর্ণা তার কপালে চুমু দেয়,চুলে বিলি কেটে দেয়। হাত-পায়ের নখ কেটে দেয়। ভালোবাসার অনেক রূপ হয়! তেমনি এই দুই বোনের ভালোবাসাটা অন্যরকম। লুকিয়ে একজন আরেকজনকে ভালোবাসে। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। দুজনই টের পায়। কিন্তু প্রকাশ্যে সাপে-নেউলে যুদ্ধ চলে!

পূর্ণার কিছুতেই ঘুম আসছে না। হারিকেনের আলো নিভু,নিভু। পূর্ণা উঠে বসে। আবার শুয়ে পড়ে। নিভু, নিভু আলোর দিকে চেয়ে মৃদুলের কথা ভাবে। মানুষটার কথা ইদানীং উঠতে বসতে মনে পড়ে তার। কাঁধে আঘাত পাওয়ার পর পূর্ণা দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি। তাই মৃদুল বার বার পূর্ণার ঘরে উঁকি দেয়। পদ্মজা সারাক্ষণ থাকতো তাই ঢোকার সাহস পায়নি। দুই দিন পর পূর্ণা ছাদে যায়। পিছু পিছু মৃদুলও আসে। পূর্ণার পিছনে দাঁড়িয়ে কাশে। পূর্ণা ফিরে তাকায়। মৃদুলকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়। পূর্ণা প্রশ্ন করল, 'কিছু বলবেন?'

মৃদুল বলল, 'কেমন আছো ? হুনলাম,রাইতে রান্নাঘরে নাকি পইড়া গেছিলা।'

'হু। ভালো আছি।'

'তোমার কি ধপাস, ধপাস কইরা পইড়া যাওয়ার ব্যামো আছে?'

পূর্ণা কিছু বলেনি। পদ্মজা নিষেধ করেছে,সেদিনের রাতের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে। মৃদুল দেখল,পূর্ণা কপাল কুঁচকে,কাঁধে হাত বুলাচ্ছে। সে বিচলিত হয়ে জানতে চাইল, 'বেদনা করে? দা'য়ের উপর পড়ছো কত্তটা কাটছে কে জানে! তার উপরে শীতের দিন এই ঘা সহজে ভালা হইব না। এইখানে তো বাতাস হইতাছে। ঘরে যাও। ঘা বাড়াইও না।'

'না। এইখানেই থাকব।'

মৃদুল আর জেদ ধরেনি। পূর্ণা যতক্ষণ ছিল, সেও ছিল। এরপরদিন একটু পর পর পূর্ণার খোঁজ নিয়েছে। পূর্ণা খুব সুন্দর একটা অনুভূতির সাক্ষাৎ পায়। শুরুতে মৃদুলকে দেখে শুধুই ভালো লাগলেও,আস্তে আস্তে মৃদুলের বিচরণ শুরু হয়েছে তার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে। মৃদুলের কথা বলা,দুষ্টুমি,হাসি সব ভালো লাগে। মনের অনুভূতিগুলো হাটি হাটি পা করে গুরুতর সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মৃদুলও যে তার ব্যাপারে আগ্রহী পূর্ণা টের পায়। এই বাড়িতে আসার পরদিন মৃদুল আমিরের সাথে দেখা করার অজুহাতে পূর্ণার সাথে দেখা করতে আসে। সবার অগোচরে বলে যায়, তার সাথে পরের দিন দুপুরে উত্তরের ঘাটে দেখা করতে। পূর্ণা বলেছিল যাবে। কিন্তু পূর্ণা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যায়। তাই আর যাওয়া হয়নি। গতকাল পদ্মজা বের হতেই দিল না। পূর্ণার মন কেমন কেমন করছে। খুব মনে পড়ছে মৃদুলকে। হারিকেনের আলো নিভে যায়,তখনই জানালায় টোকা পড়ে। পূর্ণা ভয় পেয়ে যায়। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ভূত এলো নাকি! পূর্ণা ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে নামে। আবারও সেই ডাক ভেসে আসে। কণ্ঠটা পরিচিত। পূর্ণা ভ্রুকুঞ্চন করে টিনের দেয়ালে কান পাতে। আবারও ভেসে আসে চেনা স্বর, 'এই পূর্ণা।'

কণ্ঠটা চেনার সাথে সাথে পূর্ণা জানালা খুলল। মৃদুলের মুখটা ভেসে উঠে। পূর্ণার বুক ধক করে উঠল। সর্বাঙ্গে একটা উষ্ণ বাতাস ছুঁয়ে যায়। সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'পাশের ঘরে আপা,ভাইয়া। আপনি ঘাটে যান। আমি আসছি।'

'আচ্ছা।'

মৃদুল চলে যায়। পূর্ণা তাড়াহুড়ো করে সোয়েটার পরে। শাল দিয়ে মাথা ঢাকল। তারপর হারিকেনে নতুন আগুন জ্বালিয়ে, হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভালোবাসার কথা বলা হয়নি। কোনো সম্পর্ক নেই দুজনের। তবুও পূর্ণা কোনো এক বশীকরণের জাদুতে ছুটে যাচ্ছে মৃদুলের কাছে। কলপাড় অবধি গিয়ে আবার ছুটে আসে ঘরে। আয়না,কাজল বের করে। চোখে কাজল দেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। ব্যস্ত পায়ে ঘাটে আসে। চারিদিকে জোনাকিপোকা। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। একটু দূরেই মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণার হাঁটার গতি কমে যায়। সে অকারণে লজ্জা পাচ্ছে। মৃদুল এগিয়ে আসে। তার গলায় মাফলার। মাথায়

টুপি। পরনে সোয়েটার। শীতল জলোবাতাসে শীত যেন আরো বেশি জেঁকে ধরছে। পূর্ণা মৃদুলের দিকে না তাকিয়ে, বিনিদ্র আরক্ত চোখে হারিকেনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চেয়ে বলল, 'কেন ডেকেছেন?'

'কেমন আছো?'

পুরুষালি ভরাট কণ্ঠটি পূর্ণাকে কাঁপিয়ে তুলে। অন্যবেলা তো এমন হয় না। এখন এরকম হওয়ার কারণ কী, রাতের অন্ধকার এবং নির্জনতা?

পূর্ণা বলল, 'ক্ষতস্থান পেকেছে। তাই একটু যন্ত্রণা হয়। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো নেই।'মৃদুলের কণ্ঠটি করুণ শোনায়।

পূর্ণা মৃদুলের দিকে চোখ তুলে তাকায়। চোখাচোখি হয়। হারিকেনের আলোয় পূর্ণার কাজল কালো চোখ দুটি তীরের বেগে মৃদুলকে ঘায়েল করে। পূর্ণা সাবধানে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'জানি না।'

'এতো রাতে আসা ঠিক হয়নি।'

'এতো রাইতে আমার ডাকে তুমি কেন সাড়া দিলা?'

'জানি না।'

দুজনের কেউই কথা খোঁজে পাচ্ছে না। দুজনের কেউই জানে না তারা কেন দেখা করেছে। মৃদুল জানে না, সে কেন এতো রাতে,তীব্র শীতে এখানে ছুটে এসেছে। পূর্ণা জানে না,সে কেন পর পুরুষের ডাকে সাড়া দিল। শুধু এইটুকু জানে,তাদের অশান্ত মন শান্ত হয়েছে। খালি খালি জায়গাটা পূর্ণ হয়েছে। তবে, হৃদস্পন্দন ছন্দ তুলে নৃত্য করছে। পূর্ণার কাঁধের ব্যথা বাড়ে। তাই তার ভ্রু দুটি বেঁকে গেল। কাঁধে এক হাত রাখে। মৃদুল ব্যথিত স্বরে জানতে চাইল, 'আবার বেদনা করে? দেখি কেমনে কী হইছে।'

মৃদুল দুই পা এগিয়ে আসে। পূর্ণা পিছিয়ে যায়। লাজুক ভঙ্গিতে বলল, 'অবিবাহিত মেয়ের কাঁধ দেখতে চাওয়া অন্যায়।'

'সে তো দেখা করাও অন্যায়। সব অন্যায় কী মানা যায়?'

'অনেকে তো মানে।'

'আমি পারি না।'

'আপনি অন্যরকম।'

'ব্যথা কমেছে?'

'হু, হুট করে ব্যথা বেড়ে যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে কমেও যায়।"

'পাকলে এরকম হয়।'

'হু।'

'ভয় হচ্ছে না?'

পূর্ণা কেমন করে যেন মৃদুলের দিকে তাকাল। মৃদুল থমকে যায়। পূর্ণা বলল, 'কার ভয়? আপনার?'

'আমার আর সমাজ। দুইটাই।'

'আপনাকে ভয় পেলে আসতাম না। আর সমাজের ভয় অনেক আগেই কেটে গেছে।'

উত্তরে বলার মতো কিছু পেল না মৃদুল। ঝিঁঝিঁপোকারা ডাকছে। আলো দিচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। তার মাঝে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী দাঁড়িয়ে আছে,বুকে ভালোবাসার উথালপাতাল ঢেউ নিয়ে। অনেকক্ষণ পর মৃদুল বলল, 'আমি আসতে চাইনি।'

পূর্ণা আবারও সেই মন কেমন করা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। বলল, 'তাহলে কেন এসেছেন?'

'মনে হইতাছে, কোনো বশীকরণ তাবিজের জোরে এখানে আইসা পড়ছি।'

পূর্ণা হেসে ফেলল। হারিকেনের মায়াবী আলোয় সে হাসি কী যে ভালো দেখাচ্ছিল। তার প্রশংসা করার মতো যোগ্য শব্দ মৃদুলের ভাষার ভান্ডারে মজুদ নেই। সে গাঢ় স্বরে বলল, 'পিরিতির মায়া বড় জ্বালা।'

কপাল ইষৎ কুঁচকে পূর্ণা প্রশ্ন করল, 'কার পিরিতের দহনে জ্বলছেন?'

'তোমারে কইতে হবে?'

'না।'

'ঘরে যাও।'

পূর্ণা তার মুখের ধারে হারিকেন ধরে মৃদুলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি কাজল দিয়েছি।'

পূর্ণা ভেবেছে তার কাজল কালো চোখ মৃদুল দেখেনি। কিন্তু মৃদুল তো শুরুতেই দেখেছে। আর ঘায়েল হয়েছে। সে হেসে পূর্ণার চোখ,মুখ আবার দেখল। হারিকেনের হলদে আলোয় পূর্ণার তেলতেলে ত্বক চিকচিক করছে। মৃদুল বলল, 'দেখেছি। ভালো লাগছে।'

মৃদুলের এইটুকু প্রশংসায় পূর্ণার মন নেচে উঠল। সে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, 'সাবধানে বাড়ি যাবেন।'

পর্ব ৫৬

সুষ্ঠুভাবে হেমলতার মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ সম্পন্ন হয়। বিকেলে মোড়ল পরিবারের সদস্যরা একসাথে আটপাড়ার মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাথে বৃদ্ধা মনজুরা এবং হিমেল রয়েছে। মসজিদের কবরস্থানে পাশাপাশি শুয়ে আছেন মোর্শেদ,হেমলতা ও পারিজা। কবরের কাছে আসা নিষেধ বলে মেয়েরা দূর থেকে দুই চোখ ভরে তিনটি কবর দেখছে এবং চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছে। মৃত্যুর এতোগুলি বছর পেরিয়ে গেছে তবুও কবরের সামনে এসে দাঁড়ালে বুকে এতো কষ্ট হয়! কাছের মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ভয়ানক বিষের নাম। এই বিষ যারা পান করেছে তারাই জানে কষ্টের মাত্রা। পূর্ণা ছিঁচকাঁদুনে। সে চোখের জলে স্নান করছে। পদ্মজা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে কবরগুলোর দিকে। মা নামক মমতাময়ী মানুষটার ছায়ার অভাববোধ প্রতিটি পদক্ষেপে সহ্য করতে হয় । কত ভালোবাসতেন তিনি। মাথার উপর তার ছায়া ছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়া দায় ছিল। আর আজ এতো বছর ধরে পদ্মজা দিব্যি এই মানুষটাকে ছাড়াই বেঁচে আছে। জন্মদাতা পিতা ছোট থেকে অনেক লাঞ্ছনা-বঞ্চনা করেছে। কত আকুল হয়ে থাকত পদ্মজা, পিতার ভালোবাসা পেতে। যখন ভালোবাসা পেল বেশিদিন পৃথিবীতে রইলেন না । মা মরা মেয়েদের রেখে নিজেও পাড়ি জমালেন ওপারে। তারপর পদ্মজার কোল আলো করে এলো কন্যা পারিজা। পিতা-মাতার মৃত্যুর শোক কিছুটা হলেও লাঘব হয়। কিন্তু এই সুখও বেশিদিন টিকেনি। খুব কম আয়ুকাল নিয়েই জন্মেছিল পারিজা। পদ্মজাকে আঁধারের গহীনে ছুঁড়ে ফেলে এক এক করে চলে যায় সুখতারারা। পদ্মজা বেশিক্ষণ দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি বুকের ভেতর চেপে রাখতে পারেনি। সে মুখ এক হাতে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে। বাসন্তী পদ্মজার মাথাটা পরম যত্নে নিজের কাঁধে রাখেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কেঁদো না মা। একদিন দেখা হবে। হাশরের ময়দানে।'

সময় তার নিজের গতিতে চলে। কারো জন্য থেমে থাকে না। কেটে যায় আরো তিনটা দিন। এর মাঝে পূর্ণা মৃদুলের সাথে শুটিং দেখতে গিয়েছে একবার। গ্রামের পথে দুজন হেসেখেলে কথা বলেছে। এতেই কানাঘুষা শুরু হয়েছে। এদিকে আমিরের ভীষণ জ্বর। শুকিয়ে গেছে অনেক। ভেতরে ভেতরে কী যেন ভাবে সারাক্ষণ। খাওয়া দাওয়াও কমে গেছে। সবসময় চিন্তিত থাকে। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। এদিকওদিক ঘুরে বেড়ায়। এখন শুয়ে আছে বারান্দার ঘরে। পদ্মজা কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। আমিরের চোখ দুটি বন্ধ। পদ্মজা আদুরে গলায় ডাকল, 'শুনছেন?'

আমির চোখ বন্ধ রেখেই বলল, 'হু?'

'কী এতো ভাবেন?'

আমির চোখ খুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি ভয়ংকর লাল। রাতে না ঘুমানোর ফল। সে পদ্মজাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কী ভাবব?'

'জানি না। কিছু তো ভাবেনই। চোখ দুটি তার প্রমাণ। আপনি কোনো কিছু নিয়ে কি ভীতিগ্রস্ত?'

আমির বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল, 'তেমন কিছু না।'

'যেমন, কিছুই হউক। বলুন না আমাকে।'

'আমাদের ঢাকা ফেরা উচিত।'

'হঠাৎ?'

'জানি না কিছু। আমার প্রায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। তোমাকে হারাতে পারব না আমি।'

'আমার কিছু হবে না। আমি কারো কোনো ক্ষতি করিনি যে-

পদ্মজা থেমে গেল। সে তো একজনকে খুন করেছে! পদ্মজার দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে

আসে। আমির পদ্মজার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কী করে কাউকে খুন করতে পারলে! আমি ভাবতেই পারি না। এরপর থেকেই ভয়টা বেড়ে গেছে। আমার খুব চিন্তা হয়। ঘুম হয় না। রাত জেগে পাহারা দেই কেউ যেন আমার পদ্মবতীকে ছুঁতে না পারে।'

পদ্মজার দুই চোখ জলে ভরে উঠে। বলে, 'প্রথম তো বিশ্বাস করেননি,এটাই ভালো ছিল। এখন তো বিশ্বাস করে চিন্তায় পড়ে গেছেন। আর অসুস্থ হয়েও পড়েছেন।'

'আমি ভেবেছিলাম, স্বপ্ন দেখেছো। তাই ঘুম থেকে উঠে আবোলতাবোল বলছো। তারপর সুস্থ-স্বাভাবিক ভাবেও যখন বললে, অবিশ্বাস কী করে করি?'

'এতো ভালোবাসতে নেই। আমার কপালে সয় না।'

'ভালোবাসতে না করছো?'

'মোটেও না। মাত্রা কমাতে বলছি।'

পাশেই অজয়বাবুর আম বাগান। সাঁ সাঁ করে শীতল হাওয়া বইছে। পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। পূর্ণা মৃদুলের চেয়ে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মস্তক নত। ওড়না বেসামাল হয়ে উড়ছে। মগাকে দিয়ে পূর্ণাকে ডেকে এনেছে মৃদুল। আসার পর থেকেই ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণা। দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। মৃদুল নিরবতা ভেঙে বলল,

'আমি আগামীকাল বাড়িত যাইতেছি।'

পূর্ণা চকিতে তাকাল। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

মৃদুল মুচকি হেসে বলল, 'নিজের বাড়িত কেন যায় মানুষ? এইহানে তো বেড়াইতে আইছিলাম।'

'ওহ।'

পূর্ণা মৃদুলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কান্না পাচ্ছে তার। মৃদুল এক ধ্যানে পূর্ণার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, 'অন্যদিকে চাইয়া রইছো কেন? এদিকে চাও।'

পূর্ণা বাধ্যের মতো মৃদুলের কথা শুনে। তার দুইচোখে জল টলমল করছে। পূর্ণার মেঘাচ্ছন্ন দুটি চোখ দেখে মৃদুলের ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। সে কেমন একটা ঘোর নিয়ে জানতে চাইল, 'চলে যাব,শুইনা কষ্ট হইতাছে?'

পূর্ণা আবারও দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। অভিমানী স্বরে বলল, 'মোটেও না। চলে যান।'

'দুইদিন পরই আসতাছি।'

পূর্ণার চোখেমুখে হাসির ছটা খেলে যায়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দুই কদম এগিয়ে এসে বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি। এবার হাত ধরি?'

মৃদুলের বেশরম আবদারে পূর্ণা লজ্জা পেল। সে দুই কদম পিছিয়ে যায়। দুই হাত পিছনে লুকিয়ে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, 'বাড়ি থেকে আসার পর।'

পূর্ণা দৌড়ে পালায়। মৃদুল পিছনে ডাকে, 'এই কই যাও।'

চঞ্চল পূর্ণা না থেমে ফিরে তাকায়। তার লম্বাকেশ হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়ছে। সে মিষ্টি করে হেসে জবাব দিল, 'বাড়ি যাই। আপনি সাবধানে যাবেন। জলদি ফিরবেন।'

মৃদুল তার গোলাপি ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে হেসে মাথা চুলকাল। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে গ্রামের চঞ্চল শ্যামবর্ণের মেয়েটিকে। হাওয়ার তালে মেঠো পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। চুল আর ওড়না দুটোই হাওয়ার ছন্দে সুর তুলে যেন উড়ছে।

সকাল সকাল মগা এসে খবর দিল,রানি মদনের মাথায় আঘাত করেছে। মদন এখন হাসপাতালে ভর্তি। খলিল হাওলাদার রানিকে মেরে আধমরা করে একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছেন। এ কথা শুনে পদ্মজা অস্থির হয়ে পড়ে। খলিল হাওলাদার এতোই জঘন্য যে,

পদ্মজার মনে হয় এই মানুষটা নিজের মেয়েকে যেকোনো মুহূর্তে খুন করে ফেলতে পারে। পদ্মজা আমিরকে চাপ দেয়,ওই বাড়িতে নিয়ে যেতে। নয়তো সে একাই চলে যাবে। একপ্রকার জোর করেই আমিরকে নিয়ে আসে হাওলাদার বাড়িতে। হাওলাদার বাড়ির পরিবেশ থমথমে, নির্জন। সবসময়ই এমন থাকে। এ আর নতুন কি! অন্দরমহলে ঢুকতেই আমিনা আমিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকুতি-মিনতি করে বলে, 'বাপ,আমার মেয়েরে আমার কাছে আইননা দেও। নাইলে,ওর কাছে আমারে লইয়া যাও। তোমার দুইডা পায়ে ধরি।'

আমির আমিনাকে মেঝে থেকে তুলে আশ্বাস দেয়, 'আমি দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমির খলিলের ঘরের দিকে যায়। ফরিনা এসে বিস্তারিত বললেন, 'রাইতের বেলা মদনের চিল্লানি হুনি। দৌড়ে সবাই আইয়া দেহি মদন পইড়া আছে। মাথা দিয়া কী যে রক্ত বাইর হইতাছে। আর রানির হাতে এত্ত বড় একটা ইট। ছেড়িডারে দেইখা মনে হইতাছিল,ছেড়িডার উপরে জ্বীনে আছর করছে। আরেকটু অইলে এতিম ছেড়াডা মইরা যাইত। বাবুর বাপ আর রিদওয়ান মেইলা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল লইয়া গেছে। আর এইহানদে তোমার চাচা শ্বশুরে রানিরে মাইরা ভর্তা কইরা লাইছে। নাক মুখ দিয়া রক্ত ছুটছে। তবুও থামে নাই। আমরা অনেক চেষ্টা করছিলাম তোমার চাচাশ্বশুরের হাত থাইকা বাঁচাইতে,পারি নাই। আলোডা কি যে কান্দা কানছে! এহন ঘুমাইতাছে।"

আমির চাবি নিয়ে আসে। আমিনা সাথে যেতে চাইলে আমির বলল, 'আমি আর পদ্ম যাচ্ছি। রানিরে নিচে নিয়ে আসি। পদ্ম আসো।'

পদ্মজা ছুটে যায় আমিরের পিছু পিছু। ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই রানি তাকায়। রুম্পা যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই তাকে রাখা হয়েছে। রানি কাঁদছিল। দরজা খোলার শব্দ শুনে থেমে যায়। বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখমুখের রক্ত শুকিয়ে গেছে। আমির,পদ্মজাকে দেখে রানি দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কাউকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে নিজের জীবন নিয়ে সুখী না। পৃথিবীর সব কষ্ট যেন তার বুকে। এসব মারধোর আর গায়ে লাগে না। বাপের কথায় বাড়ির কামলা বিয়ে করল। এটা তার জন্য কতোটা অপমানের কেউ বুঝবে না। সে শুধু মানুষ ভেবেই বাড়ির কামলাকে স্বামী মানতে পারেনি। এতোটা উদার সে নয়। সে মানে সে ভালো না। বাপের জোরাজুরিতে নাতনিও দিল। তারপর থেকেই মদন পেয়ে বসে। কারণেঅকারণে তাকে ছুঁতে চায়। মদনের একেকটা ছোঁয়া রানির জন্য কতোটা বেদনাদায়ক তাও কেউ জানবে না। গতকাল রাতে মদন জোরদবস্তি করেছিল তাই রানি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

খালি ড্রামের নিচে থাকা ইট নিয়ে চোখ বন্ধ করে মদনের মাথায় আঘাত করে। এতে সে এখন মোটেও অনুতপ্ত না। পদ্মজা রানির মনের অবস্থা একটু হলেও বুঝতে পারছে। মেয়েটা হাসিখুশি থাকার জন্য বাচ্চাদের সাথে কাবাডি,গোল্লাছুট, কানামাছি কত কী খেলে! তবুও সুখী হতে পারে না। পদ্মজা সাবধানে রানির পাশে এসে বসল। বলল, 'খুব মেরেছে?'

রানি পদ্মজার দিকে তাকিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বলল, 'তুমি জাইননা কী করবা? মলম লাগাইয়া দেওন ছাড়া আর কী করনের আছে?'

আমির কিছু বলতে উদ্যত হয়। পদ্মজা আটকে দেয়। সে চমৎকার করে হেসে রানিকে বলল, 'মলম লাগানোর মানুষই বা কয়জনের ভাগ্যে জুটে আপা?'

রানির দৃষ্টি শীতল হয়ে আসে। এই মেয়েটার সাথে রাগ দেখানো যায় না।

পদ্মজার মাঝে অদ্ভুত কিছু আছে। যা রাগ দমন করতে পারে। রানি বলল, 'আমি... আমি ভালা নাই পদ্মজা। আমি একটু আরাম চাই। সুখ চাই। আর কষ্টের বোঝা টানতে পারতাছি না।'রানির কথার ধরণ এলোমেলো। সে অন্য এক জগতে আছে। বন্দি পাখির মতো ছটফট করছে। মুক্তির আশায় ডানা ঝাঁপটাচ্ছে। পদ্মজার খুব মায়া হয়। ভীষণ অসহায় লাগে। ভালোবাসার মানুষ জীবনে এসে আবার হারিয়ে গিয়ে এভাবেই জীবন এলোমেলো

করে দেয়। এতো যাতনা কেন প্রেমে? যার শূন্যতা আজও শান্তি দিল না রানিকে। প্রতিনিয়ত কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। রানির ভেতরটা যে একেবারে শূন্য। সে পিরিতের যন্ত্রনায় আজও কাতর! আচ্ছা,যদি রানিকে তার উপযুক্ত কোনো ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া হতো তবে কী সে তার ভালোবাসাকে ভুলতে পেরে একটু সুখী হতে পারত?

আমির,পদ্মজা ধরে ধরে রানিকে নিচ তলায় নিয়ে আসে। সবাই কত কী প্রশ্ন করে। রানি নিশ্চুপ। কারোর কোনো কথার উত্তর দেয়নি। সবাই যত্ন আত্তি করে। আমিনা খাইয়ে দেন। পুরো দিন রানি বিছানায় শুয়ে থাকে। আমিনা সারাদিন চেষ্টা করেছেন রানি যাতে কথা বলে। কিন্তু রানি যেন পণ করেছে,কথা না বলার। অন্যদিকে মদন ভালো আছে। কয়দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। সেলাই লেগেছে। গঞ্জের হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল এরপর সেখান থেকে শহরে। এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে। রানিকে সবাই অনেক খারাপ কথা বলছে। অভিশাপ দিচ্ছে। অনেকে বাড়ি বয়ে এসে কটু কথা বলে গেছে। বাড়ির কেউ নিষেধ করেনি। রানি চুপ করে শুনেছে। বাড়ির অবস্থার কথা ভেবে আমির মোড়ল বাড়িতে ফেরার কথা বলেনি। দিনশেষে রাত আসে। সুন্দর পৃথিবীকে জাপটে ধরে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হারিয়ে যায় রানি। সকালে চিঠি পাওয়া যায়। তাতে লেখা- “আমার আলোরে দেইখা রাইখো তোমরা।”

পর্ব ৫৭

ঘন কুয়াশা বেয়ে শীতের বিকেল নেমেছে ধীরে ধীরে। পদ্মজা আলোকে বুকের সাথে মিশিয়ে দু'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি বাড়ির গেইটের দিকে। বাড়ির সব পুরুষেরা সকালে বেরিয়েছে রানির খোঁজে। এখনও ফেরেনি। যে নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে যায় তাকে কী আর খুঁজে পাওয়া যায়? তবুও পদ্মজা চাইছে, রানিকে যেন অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায়। আলো সারাদিন মায়ের জন্য কেঁদেছে। মায়ের আদরের জন্য ছটফট করেছে। আলোর অস্থিরতা দেখে পদ্মজার দুই ঠোঁট কেঁপেছে। জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছে মায়ের মতো আদর করার। কিন্তু সে তো আলোর মা না, আলোর মায়ের গন্ধ তার গায়ে নেই। রানি মা হয়ে কী করে পারল আলোকে ছেড়ে যেতে? পৃথিবীর সব মা একরকম হয় না। সব মা সন্তানের জন্য ত্যাগ করতে জানে না। দুঃখ আপন করে নিতে জানে না। পদ্মজা আলোর কপালে চুমু দিল। মেয়েটা চুপ করে আছে। চারিদিক কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া । দিন ডুবিডুবি ৷ স্তব্ধ হয়ে আছে সময়। এক তলা থেকে আমিনার বিলাপ শোনা যাচ্ছে। তিনি এতো কাঁদতে পারেন! পদ্মজা ঘুরে দাঁড়াল ঘরে যেতে। তখনই সামনে পড়লেন ফরিনা। পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আম্মা,আপনি!'

'আলো ঘুমাইছে?'

'না, জেগে আছে।'পদ্মজা আলোর কপালে আবার চুমু দিল।

ফরিনা বললেন, 'রানিরে কি পাওন যাইব?'

'জানি না আম্মা।'পদ্মজার নির্বিকার স্বর।

'আলমগীর রুম্পারে লইয়া কই গেছে জানো তুমি? ওরা ভালো আছে তো?'

'আপনাকে সেদিনই বলেছি আম্মা, জানি না আমি।'

ফরিনা আর প্রশ্ন করলেন না। তিনি নারিকেল গাছের দিকে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। পদ্মজা সেকেন্ড কয়েক সময় নিয়ে ফরিনাকে দেখে। ফরিনা আগের মতো ছটফটে নেই। নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। আগে মনে হতো তিনি মনে মনে কোনো কঠিন কষ্ট পুঁতে রেখেছেন কিন্তু এমন কোনো শক্তি আছে যার জন্য তিনি হাসতে পারেন,বেঁচে আছেন। আর এখন দেখে মনে হচ্ছে,সেই শক্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে! জীবনের আশার আলো ডুবে গেছে। কথাগুলো ভেবে পদ্মজা চমকে উঠে! সে তো আনমনে নিজের অজান্তে এসব ভেবেছে! কিন্তু সত্যিই কি এমন কিছু হয়েছে? পদ্মজা আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা,আপনি আমাকে কিছু বলতে চান?'

ফরিনা তাকান। পদ্মজা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে রইল ফরিনার দিকে। ফরিনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। হঠাৎ যেন পাহাড়ের শক্ত মাটির দেয়াল ভেঙে ঝর্ণধারার বাঁধ ভেঙে গেল। পদ্মজা খুব অবাক হয়। ফরিনা আঁচলে মুখ চেপে ধরেন। পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'আম্মা, আম্মা আপনি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে? বলুন না আমাকে। কী বলতে চান আমাকে?'

আচমকা ফরিনার কান্নার শব্দে আলো ভয় পেয়ে যায়। সে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। পদ্মজা আলোকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বারান্দায় পায়চারি করে আদুরে কণ্ঠে বলে, 'মা,কাঁদে না,কাঁদে না। কিছু হয়নি তো। মামি আছি তো।'

আলো জান ছেড়ে কাঁদছে। কান্না থামাচ্ছে না। বেশ অনেক্ষণ পর আলো কান্না থামায়। সাথে সাথে পদ্মজা ফরিনার দিকে এগিয়ে আসল। প্রশ্ন করল, 'বলুন আম্মা। কী বলতে চান আমাকে?'

'কিচ্ছু না।'বলেই তড়িঘড়ি করে দোতলা থেকে নেমে যান তিনি। পদ্মজা আশাহত হয়ে অনেকবার ডাকে, তিনি শুনেননি। পদ্মজা বিরক্তি নিয়ে বাইরে তাকায়। দেখতে পায় মজিদ হাওলাদারকে। তিনি আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে আসছেন। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছেন। পায়ে ব্যথা পেয়েছে নাকি! পদ্মজা নিচ তলায় যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়। তখনই

মাথায় আসে, 'কোনোভাবে কী আব্বাকে দেখে আম্মা ভয় পেল? আর উত্তর না দিয়ে চলে গেল?'

পদ্মজা মিলিয়ে ফেলে উত্তর। এমনটাই হয়েছে। ঘরের গোপন খবরই দিতে চেয়েছিলেন ফরিনা। কিন্তু ঘরের মানুষ দেখে আর দিতে পারলেন না। আচ্ছা, তিনি এমন হাউমাউ করে কেন কাঁদলেন? পদ্মজার কপালের চামড়া কুঁচকে যায়।

পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়। আলোর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবে পিছনের সব অদ্ভুত ঘটনা। রুম্পা পাগলের অভিনয় করত,তাকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল অথচ বাড়ির কেউ এতে ভ্রুক্ষেপ করতো না। রুম্পা দিনের পর দিন না খেয়ে ছিল। পদ্মজা যতটুকু বুঝেছে ফরিনা খুব ভালোবাসেন রুম্পাকে, তাহলে তিনি কেন খাবার নিয়ে যেতেন না? রুম্পার ঘরে লতিফা চোখ রাখে। রুম্পা লতিফাকে দেখে ভয় পেয়েছিল। যেদিনই সে জানতে পারে রুম্পা পাগল না, সেদিন রাতেই বাবলু নামের কালো লোকটি রুম্পাকে মারতে চেয়েছিল। এতসব কার নির্দেশে হচ্ছে? কে এই বাড়ির আদেশদাতা? আর আলমগীরই কী করে জানল রুম্পা খুন হতে চলেছে? তারপর একটা খুন হলো অথচ ভোর হওয়ার আগেই সেই লাশ উধাও হয়ে গেল। কেউ খুনির খোঁজ করল না! তারপর রুম্পা বা আলমগীরের কথা রানি আর ফরিনা ছাড়া কেউ জিজ্ঞাসাও করল না! এই বাড়ির মানুষ যেন জীবিত থেকেও মৃত। কী চলছে আড়ালে! তারপর আলমগীর তাকে একটা চাবি দিল। চাবিটা কীসের? রুম্পা বলেছিল,উত্তরে জঙ্গলে,ধ রক্ত। এই কথার মানেই বা কী?

পদ্মজা দ্রুত দুই চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার মাথা ব্যথা করছে। কপালের রগ দপদপ করছে। রানির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। সে গাঢ় রহস্যের টানে উন্মাদ হয়ে উঠে। বাড়িতে খলিল,রিদওয়ান নেই। এই সুযোগে জঙ্গলে তাকে যেতেই হবে। পরিবেশে অস্পষ্টতা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল ৷ বিকেল সন্ধ্যাকে ম্লান আলোয় জড়িয়ে ধরল ৷ সন্ধ্যার আযান পড়ছে। পদ্মজা নিচ তলায় এসে আলোকে লতিফার কাছে দিয়ে নিজ ঘরে যায়। নামায আদায় করে নেয়। তারপর আলোকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। মজিদ পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। ফরিনাও ঘরে। বাড়ির বাকি পুরুষরা তখনও ফিরেনি। আমিনা সদর দরজায় বসে আছেন। চুল এলোমেলো। কপালে এক হাত রেখে বাইরে তাকিয়ে রানির অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। মানুষটার অনেক দোষত্রুটি আছে ঠিক। তবে মেয়ের জন্য পাগল! বাড়ির আরেক কাজের মেয়ে রিনু আলোর সাথে শুয়ে আছে। আলো একা ঘরে কীভাবে থাকবে,তাই পদ্মজাই রিনুকে আলোর সাথে থাকতে বলেছে। লতিফা রান্নাঘরে রান্না করছে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। মানবতাবোধ থেকেও অন্তত রানির নিখোঁজ হবার শোকে কাতর হওয়া উচিত। কিন্তু পদ্মজা কাতর হতে পারছে না। তাকে চুম্বকের মতো কিছু টানছে উল্টোদিক থেকে। পদ্মজা শক্ত করে খোঁপা বাঁধে। শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে, গায়ে জড়িয়ে নেয় শাল। হাতে নেয় টর্চ আর ছুরি। তারপর অন্দরমহলের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এক নিঃশ্বাসে ছুটে আসে জঙ্গলের সামনে। হাঁপাতে থাকে। চোখের সামনে ঘন জঙ্গল। পিছনে কয়েক হাত দূরে অন্দরমহল। হাড় হিম করা ঠান্ডা। পদ্মজার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

এই জায়গায় সে অনেকবার এসেছে,কিন্তু পা রাখতে পারেনি জঙ্গলে। কেউ না কেউ বা কোনো না কোনো ঘটনা তাকে বাগড়া দিয়েছেই। আজ কিছুতেই সে পিছিয়ে যাবে না। তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে। জঙ্গলের ঘাসে পা রাখতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। গায়ের লোমকূপ দাঁড়িয়ে পড়ে। আরো কয়েক পা এগোতেই গা হিম করা অদ্ভুত সরসর শব্দ ভেসে আসে। পদ্মজার একটু একটু ভয় করছে। গাঢ় অন্ধকারে,এমন গভীর জঙ্গলে সে একা! শীতের বাতাসে গাছের পাতাগুলো শব্দ তুলছে আর পদ্মজা উৎকর্ণ হয়ে উঠছে। ভয়-ভীতি নিয়েই সে এগোতে থাকে। চারিদিকে ঘাস। সরু একটা পথে ঘাস নেই। মানে এই পথ দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করে। পদ্মজা সেই পথ ধরেই এগোতে থাকে। সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

চারপাশ দেখছে। বড় বড় গাছ দেখে মনে হচ্ছে কোনো অশরীরী দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দেয়।

একটা সময় পথ শেষ হয়ে যায়। পদ্মজা টর্চের আলোতে পথ খোঁজে। যেদিকেই তাকায় সেদিকেই বুনো লতাপাতা। যারা এখানে আসে তারা কী এখানেই থেমে যায়? পদ্মজা ভেবে পায় না। মাথার উপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়। পদ্মজার বুক ধক করে উঠল। সে টর্চ ধরল মাথার উপর। দুটো পাখি উড়ে যায়। এরপর চোখে ভেসে উঠে চন্দ্র তারকাহীন ম্লান আকাশ।পদ্মজা লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। সে কি না কি ভেবেছিল! পদ্মজা সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশ দেখল। রুম্পা কী বলেছিল মনে পড়তেই সে উত্তরে তাকাল। বেশিদূর চোখ গেল না। ঝোপঝাড়ে ঢাকা চারপাশ। পদ্মজা মুখে অস্ফুট বিরক্তিকর শব্দ করল।

নিজে নিজে বিড়বিড় করে, 'ধুর! কোনদিকে যাব এবার।'

ছটফট করতে থাকে পদ্মজা। তার হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। ছুরি তোলার জন্য নত হয় সে। ছুরির সাথে সাথে তার হাতে ঘাস উঠে আসে। পদ্মজা অবাক হয়। কেন যেন মনে হলো,এই বুনো ঘাসের শেকড় মাটির নিচে ছিল না। পদ্মজা উত্তর দিকের আরো কতগুলো ঘাস এক হাতে তোলার চেষ্টা করল। সাথে সাথে হাতে উঠে আসে। সত্যি শেকড় নেই মাটির নিচে! কেউ বা কারা পথের চিহ্ন আড়াল করতে নতুন তাজা ঘাস দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে পথ। পথ লুকোতে কি প্রায়ই এমন করা হয়? তাহলে তো বেশ পরিশ্রম করে! পদ্মজার উত্তেজনা বেড়ে যায়। সে উত্তর দিকের পথ ধরে এগোতে থাকে। হাঁটে প্রায় দশ মিনিট। এই মুহূর্তে সে চলে এসেছে জঙ্গলের মাঝে।

সামনে ঘন ঝোপঝাড়। পরিত্যক্ত ভাব চারিদিকে। ভূতুড়ে পরিবেশ। থেকে থেকে পেঁচা ডাকছে কাছে কোথাও। পদ্মজা বিপদ মাথায় নিয়ে ঝোপঝাড় দুই হাতে সরিয়ে অজানা গন্তব্যে হাঁটতে থাকে। কাঁটা লাগে মুখে। চামড়া ছিঁড়ে যায়। পদ্মজা ব্যথায়'মা'বলে আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ব্যথা নিয়ে পড়ে থাকেনি। সে এগোতে থাকে। ঝোপঝাড় ছেড়ে বড় বড় গাছপালার মাঝে আসতেই পদ্মজার মনে হয় তার পিছনে কেউ আছে! সে চট করে ঘুরে দাঁড়াল। কেউ নেই! সে মনের ভুল ভেবে সামনে হাঁটে। কিন্তু আবার মনে হয়,পিছনে কেউ আছে। পদ্মজা থমকে দাঁড়ায়। ঘুরে তাকায়। তার মনটা আনচান, আনচান করছে। কু গাইছে। কেমন ভয়ও করছে। এই গভীর জঙ্গলে সে একা। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা হলো। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে গভীর রাত। কোনো অঘটন ঘটে গেলে কেউ জানবে না। পদ্মজার রগে রগে শিরশিরে অনুভব হয়। ভয়টা বেড়ে গেছে। ভেঙে পড়ছে সে! রাত যেন শক্তি, সাহসিকতা চুষে নিতে পারে। পদ্মজা আল্লাহকে স্বরণ করে। হেমলতাকে স্বরণ করে। চোখ বুজে হেমলতার অগ্নিমুখ ভাবে। তিনি যেভাবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেন সেভাবে পদ্মজা তাকায়। কান খাড়া করে চারপাশে যত জীব,প্রাণী আছে সবকিছুর উপস্থিতি টের পাওয়ার চেষ্টা করে। কাছে কোথাও অদ্ভুত এক জীব ডাকছে। নিশাচর পাখিদের তীক্ষ্ণ ডাকও শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁপোকারা এক স্বরে ডাকছে। সাঁ,সাঁ বাতাস বইছে। এ সবকিছুকে ছাড়িয়ে একটা মানুষের গাঢ় নিঃশ্বাস তীক্ষ্ণভাবে কানে ঠেকে। খুব কাছে,পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে! নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পদ্মজার হাত দুটো শক্ত হয়ে যায়। অদ্ভুত এক শক্তিতে কেঁপে উঠে সে। চোখের পলকে দুই পা পিছিয়ে লোকটিকে না দেখেই ছুরি দিয়ে আঘাত করে। লোকটি'আহ'করে উঠে। পদ্মজা চোখ খুলে ভালো করে দেখে,মুখটি অন্ধকারের জন্য অস্পষ্ট। তবে কণ্ঠটি পরিচিত মনে হলো। পদ্মজার ছুরির আঘাত লোকটির হাতে লেগেছে। পদ্মজা রাগী কিন্তু কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে, 'কে আপনি?'

লোকটি ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ছুটে এসে পদ্মজার গলা চেপে ধরে। পদ্মজা আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। লোকটি এতো জোরে গলা চেপে ধরেছে যে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথার উপর আরো ক'টি পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়। একটা বলিষ্ঠ হাত গাঢ়

অন্ধকারে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ের গলা টিপে ধরে রেখেছে। সুন্দরী মেয়েটি ছটফট করছে! লোকটির মুখ অন্ধকারে ঢাকা। ভয়ংকর দৃশ্য! পদ্মজা তার হাতের ছুরিটা শক্ত করে ধরে লোকটির পেটে ক্যাঁচ করে টান মারে। লোকটি আর্তনাদ করে সরে যায়। হাঁটুগেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। পদ্মজা আবারও আঘাত করার জন্য এগোয়। লোকটি ফুলে ফেঁপে উঠে দাঁড়ায়। যেন নতুন উদ্যমে শক্তি পেয়েছে। লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মজার উপর। নখের আঁচড় বসায় হাতে। কেড়ে নেয় ছুরি। পদ্মজা ছুরি ছাড়া এমন হিংস্র পুরুষের শক্তির সামনে খুবই নগণ্য। যেভাবেই হউক এর হাত থেকে বাঁচতে হবে। পদ্মজা টর্চ দিয়ে লোকটির মাথায় বারি মারে। লোকটি টাল সামলাতে না পেরে পিছিয়ে যায়। পদ্মজা উলটোদিকে দৌড়াতে থাকে। পিছনে ধাওয়া করে আগন্তুক। দুইবার ছুরির আঘাত,একবার মাথায় টর্চের বারি খাওয়ার পরও আগন্তুক লুটিয়ে পড়েনি মাটিতে। নিশ্চিন্তে সে এই রহস্যের পাক্কা খেলোয়ার। পদ্মজার শাল পরে যায় গা থেকে। তার খোঁপা খুলে রাতের মাতাল হাওয়ায় চুল উড়তে থাকে। ঝোপঝাড়ে মাঝে উদ্ভ্রান্তের মতো সে দৌড়াচ্ছে। কানে আসছে বাতাসের শব্দ! সাঁ,সাঁ,সাঁ! দুই হাতে শাড়ি ধরে রেখেছে গোড়ালির উপর। যেন শাড়িতে পা বেঁধে পড়ে না যায়। জুতা ছিঁড়ে পড়ে থাকে জঙ্গলে। কাঁটা কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পদ্মজার পা। রক্ত বের হয় গলগল করে। তবুও সে থামল না। সে এত সহজে মরতে চায় না। এই গল্পের শেষ অবধি যেতে হলে তাকে বাঁচতেই হবে।

রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলোর মাধ্যমে শুরু হয়েছে আরেকটি নতুন দিন। পূর্ণা ও মগা মেঠোপথ ধরে হাওলাদার বাড়ি যাচ্ছে। মাথার উপর আকাশ আলো করা তেজবিহীন সূর্য। পূর্ণার পায়ের গতি চঞ্চল। সে অস্থির হয়ে আছে। পাশেই কৃষকের ফসলি জমি ছেয়ে গেছে সবুজের সমারোহে। ফসলি জমির সবুজ আর ঘাস, গাছ-পালার ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দু সকালের প্রকৃতিতে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। অথচ সেই সৌন্দর্য পূর্ণাকে ছুঁতে পারছে না। অন্যবেলা হলে সে শিশিরভেজা ঘাসে গা এলিয়ে দিত। কোনো এক অদ্ভুত কারণে ঠান্ডার মধ্যেও তার শিশিরে ভিজতে ভালো লাগে। এখন সেই মন মেজাজ নেই। মগা কিছুক্ষণ আগে তাকে খবর দিয়েছে, গতকাল রাতে পদ্মজা আহত অবস্থায় জঙ্গল থেকে ফিরেছে। প্রেমা ঘরে পড়ছিল। বাসন্তী রান্নাঘরে। তাই তারা শুনতে পায়নি। পূর্ণা রোদে বসে সকালের খাবার খাচ্ছিল। যখন মগার কাছ থেকে এই খবর শুনল, খাবার রেখে মগাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কুয়াশা ঢাকা পথে উত্তরে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে পূর্ণা হাওলাদার বাড়ি আসে। এক ছুটে পদ্মজার ঘরে যায়। পদ্মজা ঘুমে। শিয়রে ফরিনা বসে আছেন। পূর্ণা করুণস্বরে জানতে চাইল, 'ও খালাম্মা,আপার কী হয়েছে?'

ফরিনা ইশারায় শান্ত হতে বললেন। তারপর মুখে ধীরেসুস্থে রাতের ঘটনা খুলে বললেন। গতকাল এশার আযানের সময় পদ্মজা কোথা থেকে দৌড়ে সদর ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ে। পা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল। অনেকগুলো কাঁটা ফুঁটে ছিল। শ্বাস নিচ্ছিল ঘন ঘন। গালের চামড়ারও একই অবস্থা। ফরিনা,লতিফা,আমিনা,রিনু পদ্মজাকে দেখে চমকে যায়। আমিনা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও,বাকি তিনজন পদ্মজাকে ধরে ঘরে নিয়ে আসে। পদ্মজা পানি খেতে চায়। পানি খাওয়ার পর বলে,সে জঙ্গলে গিয়েছিল। জঙ্গলের কথা শুনে উপস্থিত দুজন কাজের মেয়ে ও ফরিনার মুখ পাংশুটে হয়ে যায়। তারা আর প্রশ্ন করেনি। যেন বুঝে গিয়েছে কি হয়েছিল! কাঁটা বের করতে গিয়ে আরো রক্তক্ষরণ হয়েছে। পদ্মজা যন্ত্রনায় ঠোঁট কামড়ে শুয়েছিল। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়েছে। ব্যান্ডেজ করা খুব দরকার ছিল। কাটাছেঁড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ফরিনার ধারণা নেই। তাই তিনি মজিদ হাওলাদরকে গিয়ে বলেন। এই বাড়িতে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি চলে। তাই মজিদ হাওলাদারের কাছে ব্যান্ডেজ,স্যাভলনসহ বিভিন্ন জিনিসপাতি রয়েছে। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপাতি নিয়ে আসেন। তারপর পদ্মজার পা ভালো করে পরিষ্কার করিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন।

পূর্ণা পদ্মজার পায়ের কাছে বসে হাহাকার করে বলল, 'আমার আপা এতো কষ্ট পেয়েছে!'

পূর্ণার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সে ফরিনার কাছে জানতে চায়, 'ভাইয়া কোথায়?'

তাৎক্ষণিক ফরিনার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তিনি মিনমিনে গলায় বললেন, 'জানি না।'

পূর্ণা অবাক স্বরে বলল, 'ভাইয়া জানে না আপার কথা? রাতে দেখেনি?'

'বাবু তো বাড়িত আহেই নাই। রানিরে যে খুঁজতে গেল আর আইছে না।'

'রানি আপারে পাওয়া যায়নি?'

'না।'

'আচ্ছা-

পদ্মজা শরীর নাড়াচ্ছে দেখে পূর্ণা কথা থামিয়ে দিল। সে পদ্মজার পেটের কাছে এসে বসল। বলল, 'আপা।'

পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো টুপ করে পদ্মজার

চোখেমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পদ্মজা দ্রুত চোখ বুজে ফেলল। তারপর আবার ধীরে ধীরে চোখ খুলল। পূর্ণাকে দেখে অবাক হয়। উঠে বসতে চাইলে অনুভব করে পায়ে অনেক ব্যথা। সে পায়ের দিকে চেয়ে আরও অবাক হলো। পায়ে ব্যান্ডেজ এলো কী করে! মনে করার চেষ্টা করল। মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, 'রাতে এক ছুটে অন্দরমহলে চলে আসি। ভুলেও পিছনে ফিরে তাকাইনি। সদর ঘর থেকে আম্মা ঘরে নিয়ে আসেন। আব্বা ব্যান্ডেজ করে দেন। আম্মা খাইয়ে দেন। অনেক রাত হয়। উনি তখনও ফিরেননি। তাই চিন্তা হয়। আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলে আম্মা বলছিলেন,চলে আসবে। তারপর কি হয়েছিল মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়ি বোধহয়।'

পদ্মজা ভাবনা থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথমে ফরিনাকে প্রশ্ন করল, 'উনি ফিরেছেন?'

'না।'

পদ্মজা কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে অনেক্ষণ পর বলল, 'চাচা আর রিদওয়ান ভাই ফিরেছে?'

'আইছে তো। তোমার চাচা এহন কই জানি না। রিদওয়ান হের ঘরেই আছে।'

'তাহলে আপনার ছেলে কোথায় আম্মা?'পদ্মজা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পূর্ণা পদ্মজার এক হাতে চেপে ধরে অনুরোধ করে, 'আপা, শান্ত হও। খালাম্মা, রিদওয়ান ভাই আর ছোট চাচা কিছু বলেনি ভাইয়ার ব্যাপারে? আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?'

ফরিনা নির্বিকার স্বরে বললেন, 'আমি হেরার লগে কথা কই না।'

'আপনার ছেলের জন্য আপনার চিন্তা হচ্ছে না? রাতে বাড়ি ফেরেনি। আপনি তো মা না-কি?'পদ্মজার গলা কাঁপছে। তার বুকের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। আমিরের কিছু হলে সে মাঝ সমুদ্রে পড়বে। হেমলতার পর এই একটা মানুষকেই সে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে,ভালোবাসে। ফরিনা নিশ্চুপ। তিনি পদ্মজার কথা পাত্তা দিচ্ছেন না। পদ্মজার পা ব্যথায় টনটন করে উঠে। শীতের সময় কাটাছেঁড়া খুব যন্ত্রনার। যে যন্ত্রনায় পূর্ণা এখনও ভুগছে। সেদিন কাঁধে আঘাত পেল। আজও শুকায়নি ভালো করে। কিছুর ছোঁয়া লাগলেই ব্যথা করে। পূর্ণা পদ্মজাকে অনুরোধ করে বলল, 'আপা,এমন করো না। ভাইয়া চলে আসবে। রানি আপাকে খুঁজতে গেছে। এজন্যই আসতে পারেনি।'

'রানি আপার বাপ-ভাই তো চলে আসছে।'

'তুমি তো জানোই আপা, রানি আপার বাপ-ভাই কেমন। রানি আপার জন্য মায়া শুধু ভাইয়ার। তাই ভাইয়া রানি আপারে ছাড়া আসতে পারছে না।'

পূর্ণার কথাগুলো যুক্তিগত হলেও পদ্মজার মন মানছে না। গোলমাল তো আছেই। পদ্মজা পূর্ণাকে এক হাতে সরিয়ে বিছানা থেকে নামার জন্য এক পা মেঝেতে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরে একটা সূক্ষ্ম তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। ফরিনা ও পূর্ণা আঁতকে উঠল। পদ্মজাকে জোর করে শুইয়ে দিল। কিন্তু পদ্মজা নাছোড়বান্দা, সে তার স্বামীর খবর যতক্ষণ না পাবে শান্ত হবে না। ফরিনা আশ্বস্ত করে বললেন, 'ওরা বাবুর ক্ষতি করব না। বাবুর কাছে ওদের অনেক কিছু পাওনের আছে। কাগজে-কলমে এই বাড়িডার মালিক বাবু।'

পদ্মজা তীর্যকভাবে তাকাল। বলল, 'আপনি সব জানেন তাই না?'

পূর্ণা ফোড়ন কাটে, 'কী জানবে?'

পূর্ণার উত্তর না দিয়ে পদ্মজা ফরিনাকে প্রশ্ন করল, 'বলুন আম্মা।'

ফরিনা আড়চোখে দরজার দিকে তাকালেন। ফরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে পদ্মজা,পূর্ণাও তাকাল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি দেখে মনে হচ্ছে,লতিফা। পূর্ণা ডাকতে উদ্যত হয়। পদ্মজা পূর্ণার হাত ধরে ফেলে। ইশারা করে চুপ থাকতে। তারপর ফরিনাকে প্রশ্ন করে, 'তাহলে আপনি নিশ্চিত ওরা উনার ক্ষতি করবে না?'

'জানে মারব না।'

এ কথা শুনে পদ্মজা হকচকিয়ে যায়। সে উৎকর্ণ হয়ে বলল, 'এ কথা কেন বলছেন?'

ফরিনা আবার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পদ্মজার মাথার রগ রাগে দপদপ করছে। এই বাড়ির মানুষগুলোর মনের ভাবনার কিনারা এতো জটিল! কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। একেকবার একেকজনের একেক রূপ।

পদ্মজাকে সারাদিন এটা-ওটা বলে বিছানায় রাখা হয়। ফরিনা সারাদিন পদ্মজার খেয়াল নিলেন। পদ্মজা সারাক্ষণ'উনি,উনি'করে গেছে। ফরিনা কোনো জবাবই দিলেন না। আর দরজার ওপাশে সারাক্ষণ লতিফা ছিল। পূর্ণা অনেকবার লতিফাকে ধরেছে। তখন লতিফা হেসে বলেছে, পদ্ম আপা কেমন আছে, দেখতে আইছিলাম।'পূর্ণা কঠিনস্বরে অনেকবার নিষেধ করেছে,যেন আর না আসে। তবুও লতিফা এসেছে। পদ্মজা পূর্ণাকে নিষেধ করার পর পূর্ণা স্থির হয়। বিকেল হয়ে যায় তবুও আমিরের দেখা নেই। এদিকে পদ্মজা বিছানায় বসে ইশারায় ফজরের নামায কাযা করেছে। দুপুরের, আছরের নামাযও বসে বসে ইশারায় করেছে। (অসুস্থ মানুষ অজু ছাড়া কোন উপায়ে নিজেকে পবিত্র করে নামায পড়তে পারে,নামায শিক্ষা ঘাঁটলেই পাবেন।) ফরিনা দুপুরে না করেছিলেন, 'এতো কষ্ট কইরা নামাযের কী দরহার! কইরো না। আল্লাহ মাফ করব এমনিতে।'

পদ্মজা তখন মিষ্টি করে হেসে জবাব দিয়েছিল, 'যতক্ষণ হুঁশজ্ঞান আছে নামায ছাড়ার পথ নেই আম্মা। আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ মানুষকে ইশারায় নামায পড়ারও পথ দিয়েছেন। এটা কেন দিয়েছেন? নামায বাধ্যতামূলক বলে। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি আম্মা।'

ফরিনা এই কথার উপরে কিছু বলতে পারেননি। পদ্মজা ধর্মকর্ম নিয়ে খুব জানে। পদ্মজার কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। ধর্মের কথা বলার সময় পদ্মজা অন্য সবকিছু ভুলে যায়। তাই পুরোটা দুপুর তিনি পদ্মজাকে ইসলাম ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করেই গেছেন। বিকেলবেলা পূর্ণা জানাল,সে আজ এই বাড়িতে থাকবে। পদ্মজা এ কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে জোরাজুরি করে পূর্ণাকে মোড়ল বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এই বাড়ি মোটেও সুবিধার না। সে ঝুঁকি নিতে চায় না। পূর্ণা চলে যাওয়ার আগে পদ্মজা কিছু সূরার নাম বলে দেয়। একটা দুই লাইনের সূরা শিখিয়ে দেয়। যেন পড়ে ঘুমায়। তাহলে বিপদ হবে না।

পূর্ণা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আযান পড়ে সন্ধ্যার। পূর্বের নিয়মেই নামায পড়ে পদ্মজা। ফরিনা পদ্মজার ঘর ছাড়েন। রান্নাঘরে যান। পদ্মজা নামায শেষ করে বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজে। আমিরের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। দুইদিন কেটে যাচ্ছে আমিরের দেখা নেই। পদ্মজার মনের অবস্থা করুণ। বার বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। প্রহর গুণছে এই বুঝি মানুষটা চলে এলো। পদ্মবতী, পদ্মবতী বলে একাকার করে দিল ঘর। কিন্তু আসে না। পদ্মজার বুকের বাম পাশে চিনচিন ব্যথা বেড়েই চলেছে। গতকাল রাতে আক্রমণ করা লোকটিকে সে তখন চিনতে পারেনি। কিন্তু এখন আন্দাজ করতে পারছে। তবে আমিরের শূন্যতা তাকে পোড়াচ্ছে খুব। সে এমন ছটফটানি নিয়ে আর থাকতে পারছে না। আহত পা মাটিতে রাখে। ভর দিতেই আবার সেই তীব্র ব্যথা। কিন্তু এর চেয়েও গভীর ব্যথা আমিরের দেখা না পাওয়া। পদ্মজার দুই পায়ের পাতার এক পাশ অক্ষত। সে ওই এক পাশ দ্বারা মাটিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এক তলায় যায়। সোজা চলে আসে রিদওয়ানের ঘরে। দরজা একটু খোলা ছিল। পদ্মজা একবার ভাবল,কড়া নেড়ে ঘরে ঢুকবে। কী মনে করে যেন,আর কড়া নাড়ল না। সোজা দরজায় ধাক্কা মারে। তখনই রিদওয়ান চমকে ঘুরে তাকায়। পদ্মজাকে দেখে তাড়াতাড়ি শার্ট পরতে উদ্যত হয়। পদ্মকা মুচকি হেসে বলল, 'শার্ট পরে লাভ নেই। চোখে পড়ে গেছে।'

রিদওয়ান ফিরে দাঁড়াল। লম্বা করে হেসে শার্ট পরল। তারপর বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'বুদ্ধিমতী। তো দেখতে এসেছো কেমন আছি?

ভালো নেই। ছুরি এবং ছুরির মালিক দুজনেরই তেজ বেশি ছিল।'

পদ্মজা তিরস্কার করে হাসল। দুই কদম এগিয়ে এসে বলল, 'পাগলের প্রলাপ! আন্দাজ ঠিক হবে ভাবিনি। এবার বলুন,উনি কোথায়?'

রিদওয়ান ভ্রু দুটি বাঁকিয়ে বলল, 'আমির?'

পদ্মজা জবাব দিল না। রিদওয়ান বলল, 'আমি জানব কী করে,তোমার জামাই কোথায়?'

'জানেন না?'পদ্মজার কড়া প্রশ্ন।

রিদওয়ান উত্তরে হাসল। সে আলমারি থেকে একটা ছুরি বের করে দেখল। তারপর শীতল স্বরে প্রশ্ন করল, 'তোমার ছুরিটার নাম কী? কোন দেশ থেকে এনে দিয়েছে আমির?'

'ফুটপাত থেকে কেনা। ছুরির ধার থাকলেই চলে। অভিজ্ঞ হতে হয় আক্রমণকারীর হাত। তাই ছুরির নাম না খুঁজে নিজের হাতটাকে অভিজ্ঞ করুন।'পদ্মজার সূক্ষ্ম অপমান বুঝতে রিদওয়ানের অসুবিধা হয় না। সে আলমারির কপাট লাগিয়ে এগিয়ে আসে। বলে, 'ব্যঙ্গ করছ?'

পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল রিদওয়ানের দিকে। তারপর বলল, 'কী আছে জঙ্গলে?'

'তা জেনে তুমি কী করবে?'

'কোন অপরাধ চলছে?'

'তোমাকে জানতে হবে না।'

'তখনও তো মারতে এসেছিলেন। এখন তো কাছে আছি, আক্রমণ করছেন না কেন?'

রিদওয়ান হাসল। পদ্মজার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। পদ্মজার ঘাড়ে ফুঁ দেয়। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজা দূরে সরে যায়। হুমকি দিয়ে বলে, 'নোংরামি করার সাহস করবেন না। তখনের আঘাতগুলো ভুলে যাবেন না। আমি আমাকে রক্ষা করতে জানি।'

'এজন্যই পালিয়ে এসেছিলে?'

'পদ্মজা ক্ষণকালের জন্য পালিয়েছে। যা ই থাকুক আমি খুঁজে বের করবই। আর ধ্বংসও করব আমি।'

'দেখো, পদ্মজা তুমি আর এসব ঘেঁটো না। সুখে আছো সুখে থাকো। পরিণতি খারাপ হবে। ভালো করে বলছি, ঢাকা ফিরে যাও। এমুখো আর তাকিও না।'

'ভয় পাচ্ছেন?'

'কাকে? তোমাকে?'রিদওয়ান সশব্দে হাসল। রিদওয়ানের হাসি পদ্মজার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। রিদওয়ান হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাকে ভয় পাবে রিদওয়ান?'

'উনি কোথায় সত্যি জানেন না?'

'না, জানি না।'

'আমি কিন্তু-

'কী করবে? খুন করবে?'রিদওয়ান কিড়মিড় করে এগিয়ে আসে। পিছন থেকে পদ্মজার দুই হাত মুচড়ে ধরে বলল, 'ভালো করে বলছি,আর গভীরে যেও না। এককালে তোমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছিলাম বলে বলছি, আর গভীরে যেও না। তোমার করুণ দশা আমিও আটকাতে পারব না।'

'ছাড়ুন আমাকে।'

'ছাড়ব না।'রিদওয়ান পদ্মজার কাঁধে ঠোঁট ছোঁয়াতেই পদ্মজার সারা শরীর রি রি করে উঠে। মাথা দিয়ে পিছনে থাকা রিদওয়ানের মুখে আঘাত করে। রিদওয়ান কিছুটা পিছিয়ে যায়। নাকে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে। সে কিড়মিড় করে হিংস্র জন্তুর মতো তাকায়। বলিষ্ঠ, মোটাসোটা শরীরটাকে হারানো যেকোনো মেয়ের জন্য অসাধ্য। পদ্মজা নিজেকে রক্ষা করার জন্য টেবিল থেকে জগ নেয় হাতে। রিদওয়ান বলে, 'তুমি বাড়াবাড়ি করছো পদ্মজা।'

'উনি যদি জানতে পারে আপনি আমার সাথে এই অসভ্যতামি করেছেন, আপনার দেহে প্রাণ থাকবে না।'

রিদওয়ান ফিক করে হেসে দিল। যেন মাত্রই পদ্মজা মজার কথা বলল। রিদওয়ান হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, 'আগে তো ও নিজেকে বাঁচাক। তারপর আমাকে প্রাণে মারবে।'

রিদওয়ানের এই কথাটি যেন বজ্রপাত ঘটায়। পদ্মজা চিৎকার করে জানতে চায়, 'কোথায় রেখেছেন উনাকে? কী করেছেন উনার সাথে?'

'ঘরে যাও পদ্মজা।'

'আপনি বলুন, উনি কোথায়।'

'যাও ঘরে।'

'বলুন আপনি।'

'পদ্মজা-

পদ্মজা জগ ছুঁড়ে মারে রিদওয়ানের দিকে। রিদওয়ান সরে দাঁড়ায়। জগ স্টিলের থালাবাসনের উপর পড়ে। বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনে খলিল ছুটে আসেন। ছুটে আসেন মজিদ। আসেনি একজন মহিলাও।

পদ্মজা বিছানার উপর ছুরি দেখে দ্রুত হাতে তুলে নেয়। সে তার নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে রিদওয়ানকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। রিদওয়ান ছুরি সহ পদ্মজার হাত ধরে ফেলে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'তোমার তিন বছরের ছুরি চালানোর অভিজ্ঞতা আর আমার বিশ বছরের পেশা। পেরে উঠতে পারবে না।'

পদ্মজার হাত থেকে খলিল ছুরি টেনে নেয়। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনী হয়ে উঠে। আমিরের শোকে তার মাথা কাজ করছে না। দুই দিন হয়ে গেল আমিরের দেখা নেই। সারা শরীরে ব্যথা। তার নিজেকে উন্মাদ মনে হচ্ছে। সে রাগে রিদওয়ানের গলা চেপে ধরে। রিদওয়ান পদ্মজার হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে নানাভাবে আঘাত করে। পদ্মজা কিছুতেই ছাড়ে না। তার শরীরের শক্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আমির তার জীবনে কতোটা মূল্যবান তা কেউ জানে না। আমিরের জন্য সে সবকিছু করতে পারে। খলিল এক হাতে পদ্মজার চুল মুঠ করে ধরে,অন্য হাতে পদ্মজার গাল চেপে ধরে বলে, 'বে*র ছেড়ি,আমার ছেড়ারে ছাড়।'

তাও পদ্মজা ছাড়ে না। মজিদ এগিয়ে আসে। পদ্মজাকে টেনে সরায়। পদ্মজার শরীর কাঁপছে। সে চিৎকার করে বলছে, 'উনার কিছু হলে আমি কাউকে ছাড়ব না। মেরে ফেলব। মেরে ফেলব একদম।'

রিদওয়ান ছাড়া পেয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপরই তেড়ে এসে পদ্মজার গালে থাপ্পড় বসায়। পদ্মজার গালের ক্ষত থাপ্পড়ের ভার নিতে পারেনি। চামড়া অনেক বেশি ছিঁড়ে যায়। পদ্মজার দুই হাত মজিদ ধরে রেখেছেন। পদ্মজা মজিদকে খেয়াল করেনি। সে চেঁচিয়ে ফরিনাকে ডাকে, 'আম্মা,আম্মা আপনি কোথায়? আম্মা ওরা আপনার ছেলেকে মেরে ফেলবে। আম্মা...'

ফরিনা আসেন না। খলিল হুংকার ছাড়েন, 'এই খা*কির ছেড়ির আগুন বেশি গত্রে। ছেঁইড়া দে রিদু।'

পদ্মজার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে মুখভর্তি থুথু ছুঁড়ে দেয় খলিলের মুখের উপর। তাৎক্ষণিক রিদওয়ান পদ্মজার শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজারই গলা পেঁচিয়ে ধরে কিড়মিড় করে বলল, 'এই মা*র ঝি, তোরে অনেক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছিলাম। ভালো কথা কান দিয়ে ঢুকে না? মায়ের মতো হইছস? তোর মারেও মেরে দিতাম। যদি নিজে থেকে না মরতো।'

পদ্মজার চোখ উল্টে যাচ্ছে। মজিদ রিদওয়ানকে বলে, 'রিদওয়ান ওরে ছেড়ে দে। মরে যাবে।'

রিদওয়ান তাও ছাড়ে না। খলিল রিদওয়ানকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরালেন। পদ্মজার শরীরের সব শক্তি শেষ। সে কাশতে কাশতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে। কল্পনায় ভেসে উঠে,আমিরের শ্যামবর্ণের মায়াময় মুখ। আর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে ডাকে, আম্মা। তারপরই জ্ঞান হারায়। তিনজন পুরুষের মাঝে লুটিয়ে পড়ে আছে পদ্মজা। বুকে শাড়ি নেই। খয়েরি রঙের ব্লাউজ পরা। গলায় লাল দাগ। মুখে নখের আঁচড়। গালে চেপে

ধরার দাগ। চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার রক্ত। ফর্সা দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরার দাগ জ্বলজ্বল করে ভেসে আছে। চুল কয়টা ছিঁড়ে পড়ে আছে আশেপাশে। পায়ের সাদা ব্যান্ডেজ আবার লাল হয়ে উঠেছে। আগুন সুন্দরী পদ্মজার খুঁতহীন রূপে খুঁতের মেলা বসে গেছে! জানালা দিয়ে আসা উত্তরে হাওয়ায় হুঁশহারা পদ্মজার রক্ত ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে। কেউ নেই তাকে বুকে আগলে ধরার জন্য। পদ্মজার অবস্থা দেখে যেন ঘরের দেয়ালগুলোও গুমরে গুমরে কাঁদছে।

পর্ব ৫৯

মাথার উপর সূর্য নিয়ে কলসি কাঁখে পূর্ণা আজিদের বাড়িতে ঢুকে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন অথচ কাঁখে পিতলের প্রকাণ্ড কলসি! খালি কলসির ভারেই একটু বাঁকা হয়ে পড়েছে সে। পানিভর্তি কলসি নিয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে কে জানে! সকাল থেকে তাদের টিওবওয়েলে সমস্যা। পানি আসছে না। সকালে বাসন্তী আজিদের বাড়ি থেকে পানি নিয়েছেন। এখন আবার আসতে চেয়েছিলেন,পূর্ণা আসতে দিল না। সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। বাসন্তী অনেকবার বলেছেন, 'এইটুকু শরীর নিয়ে পারবি না।'

পূর্ণা অহংকার করে বলেছে, 'আমি পারি না এমন কিছু নেই। তুমি ঘরে যাও তো।'

আজিদের বাড়ির সামনে পুকুর আছে। সেখানে নতুন ঘাট বাঁধানো হয়েছে। ঘাটে গোসল করছে আজিদের বউ আসমানি। মাসেক ছয় আগেই বিয়ে হলো। আসমানির সাথে পূর্ণার অনেকবার কথা হয়েছে।

পূর্ণা আসমানিকে দেখেনি। আসমানি পূর্ণাকে দেখে ডাকল, 'কি গো পূর্ণা! ফেইরাও চাইলা না। ভাবিরে চোক্ষে পড়ে নাই?'

পূর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অপরাধী কণ্ঠে বলল, 'খেয়াল করিনি ভাবি।'

'পানি নিতে আইছো?'

'হুম, আমাদের টিউবওয়েল-

'শুনছি খালাম্মার কাছে। একটু বইসো। আমি ডুব দিয়া আইতাছি।'

'আচ্ছা ভাবি।'

পূর্ণা মুখে আচ্ছা বললেও সে মনে মনে পরিকল্পনা করে পানি নিয়ে অন্য পথ দিয়ে বাড়িতে চলে যাবে। আসমানি একবার কথার ঝুড়ি নিয়ে বসলে, কথা ফুরোয়ই না। পূর্ণা আড্ডাবাজি খুব পছন্দ করে। কিন্তু এখন তার তাড়া আছে। তাড়াতাড়ি ফেরা চাই। দুপুর হয়ে গেছে। পদ্মজাকে এখনও দেখতে যেতে পারেনি সে। গতকাল বিকেলে যে দেখে এলো,তারপর আর খোঁজ মিলেনি। চিন্তায় সারারাত ঘুম হয়নি পূর্ণার। আজিদের বাড়ির অঙ্গন শূন্য, ঘরের বাইরে কেউ নেই। পূর্ণা সোজা কলপাড়ে চলে আসে। দ্রুত কল চেপে কলসি পানি ভর্তি করে। তারপর কলসি কাঁখে তুলতে গিয়ে হয় সমস্যা। কিছুতেই তুলতে পারছে না। আসমানি গামছা দিয়ে চুল মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে। ফর্সা, সুন্দর একটা মুখ। নতুন বউ,নতুন বউ ছাপটা যেন এখনও মুখে লেগে আছে। আসমানি কাছে এসে হেসে বলল, 'এত বড় কলসি নিবা কেমনে? খালাম্মারে পাঠাইতা।'

'তুমি একটু সাহায্য করো।'

'কী কও? আমি লইয়া যামু কলসি?'

'আমি কি তা বলছি ভাবি! কাঁখে তুলতে সাহায্য করো।'

আসমানি ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলল, 'ওহ! বাড়ির বউ তো শরম লজ্জার ডরেই বাইর হই না। নয়তো বাড়ি অবধি দিয়া আইতাম।'

'বাড়ি থেকে বের হতেই লজ্জা, ভাসুরের সাথে শুতে লজ্জা নাই!'

পূর্ণা কটাক্ষ করে বলল। ঠোঁটে তিরস্কার করা হাসি। আসমানির চোখমুখের রঙ পাল্টে যায়। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে। ক্ষণমুহূর্ত পূর্ণার দিকে চেয়ে থাকে আসমানি। তারপর এদিক ওদিক দেখে পূর্ণার এক হাত চেপে ধরে চাপা স্বরে বলল, 'কী কইরা জানছো?'

পূর্ণা এক ঝটকায় আসমানির হাত সরিয়ে দিল। বলল, 'তোমার সাথে দেখা করার জন্য এসেই জানালা দিয়ে এই নোংরামি দেখেছি। আজিদ ভাই মাটির মানুষ। কত ভালো উনি। উনাকে কেন ঠকাচ্ছো ভাবি?'

আসমানি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাত দুটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। চোখ থেকে জলের ধারা নেমেছে। পূর্ণার দেখে মায়া হয়। সে কণ্ঠ নরম করে বলল, 'কাউকে

বলিনি আমি। বারো-তেরো দিন যখন চেপে রাখতে পারছি, সারাজীবন পারব। ভালো হয়ে যাও ভাবি। আজিদ ভাইকে ঠকিও না। পাপ করো না।'

আসমানি অশ্রুরুদ্ধকর কণ্ঠে বলল, 'আমারে খারাপ ভাইবো না।'

পূর্ণা কিছু বলল না। খারাপ কাজ করার পরও কী করে খারাপ না ভেবে থাকা যায়! সে আসমানিকে অগ্রাহ্য করে কলসি তোলার চেষ্টা চালালো। আসমানি দ্রুত পায়ে কলপাড় ছাড়ে। পূর্ণা কলসি কাঁখে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভার খুব বেশি। এখনই কোমর মচকে যাবে বোধহয়। পূর্ণা কলপাড় ছাড়তেই সামনে এসে দাঁড়ায় আসমানি। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে, এক নিঃশ্বাসে বলল, 'কাউরে কইয়ো না পূর্ণা। আমারে তোমার ভাই আর ঘরে রাখব না। আমি চাই নাই এমন করতে। শফিক ভাই তো আমগোর থানার পুলিশ মানুষ। আমার ছোডু বইনডা এক মাস ধইরা হারায়া গেছে। অনেক খুঁজছি পাই নাই। পুলিশ দিয়া খোঁজানোর ক্ষেমতা আমার বাপের নাই। শফিক ভাইরে কইছিলাম,তহন উনি কইছে,উনার সাথে-

আসমানি ফোঁপাতে থাকে। চোখের জলে সমুদ্র বয়ে যাবে এক্ষুণি। পূর্ণা খুব অবাক হয়। একটা মানুষ কতোটা নিকৃষ্ট হলে এভাবে ছোট ভাইয়ের বউয়ের বিপদে সাহায্য করার নামে এমন কুৎসিত শর্ত রাখতে পারে? পূর্ণার রাগ হয় খুব। আসমানিকে আশ্বাস দিয়ে পূর্ণা বলল, 'ভাবি কেঁদো না। যে মানুষ এমন শর্ত দিতে পারে সে কখনোই কাউকে সাহায্য করতে পারে না। উনি তোমার বোনকে খুঁজবে না। কিন্তু আশা দেখিয়ে ভোগ ঠিকই করবে। আর সুযোগ দিও না। দোয়া করো শুধু,তোমার বোন যেন ফিরে আসে।'

আসমানি শাড়ির আঁচল দিয়ে দুই চোখ মুছে বলল, 'জানো পূর্ণা,আমি আমার বইনরে ছাড়া একটা দিনও থাকতে পারতাম না।'

'তোমার সাথে তো এক মাসে আরো দুইবার দেখা হয়েছে। কখনো তো বললে না, তোমার বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আম্মা কইছে, ছেড়ি মানুষ হারায়া গেলেও কেউরে কইতে নাই। মানুষ ভাববো ছেড়া নিয়ে পলাইছে।'

'আচ্ছা ভাবি, আমি আসি আজ। কাল এসে সব শুনব। অনেক কথা বলব।'

আসমানি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। পূর্ণা ধীর পায়ে আজিদের বাড়ির উঠোন ছাড়ে। পথে উঠতেই দেখা হয় আজিদের মার সাথে। নাম মালেহা বানু।সাথে আবার পাশের বাড়ির বৃদ্ধা জয়তুনি বেগম রয়েছেন। বৃদ্ধার মাজা বয়সের ভারে ঈষৎ ভেঙ্গে শরীর সামনে ঝুঁকে পড়েছে। পূর্ণাকে দেখে মালেহা বললেন, 'কি রে ছেড়ি, পানি নিতে আইছিলি?'

'জি, খালা।'

'কলসির ভারে দেহি সাপের লাহান বাঁইকা গেছস লো!'বললেন জয়তুনি বেগম।

পূর্ণার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে কলসি নামাল। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল। মালেহা বললেন, 'বিয়েশাদী কি করবি না? তোর বইনে না আইছে বিয়া দিব?'

'দিবে মনে হয়।'

'তোর লগে হাওলাদার বাড়ির কোন ছেড়ার নাকি ঢলাঢলি চলে?'বললেন জয়তুনি বেগম। কথা বলার ভঙ্গিটা দৃষ্টিকটু ছিল। পূর্ণার গা জ্বলে উঠে। রেগে যায়। বলে, 'আপনাকে কে বলেছে?'

'এইসব কিচ্ছা বাতাসে ছড়ে। এমন আর করিছ না পুন্না। গায়ের রঙডা ময়লা, বয়সও বেশি আবার তো আরেক কিচ্ছাও আছে। কয়েক বছর আগে বেইজ্জতি হইছিলি গ্রামবাসীর হাতে। এহন আবার এমন কিচ্ছা কইরা বেড়াইলে কেউ বিয়া করব না। এহন দেখ তোর বইনে কোনো ল্যাংড়া, লুলা দেইখা বিয়া দিতে পারেনি।'বললেন মালেহা।

পূর্ণার মাথার আগে মুখ চলে বেশি। সে কিছু কড়া কথা শোনাতে উদ্যত হয়। তার পূর্বেই একটা প্রিয় পুরুষ কণ্ঠ ধেয়ে আসে, 'পূর্ণারে কে বিয়া করব না করব সেটা তো আপনেরে দেখতে কয় নাই কেউ।'

পূর্ণা না তাকিয়েই চিনে যায় কণ্ঠটির মালিককে। বুকের বাঁ পাঁজর ছ্যাঁত করে উঠল। উপস্থিত তিনজন একসাথে ঘুরে তাকায়। কিছুটা দূরে মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় গামছা বাঁধা। পরনে কালো শার্ট আর নীল লুঙি। রোদের আলোয় গায়ের ফর্সা রঙটা চিকচিক করছে। কী সুন্দর! পূর্ণা হেসে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। মৃদুল মালেহাকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল, 'নিজের চরকায় তেল দেন। পূর্ণার গায়ের রঙ ময়লা আর আপনের কি পরিষ্কার? নিজের রঙডা আগে দেখেন।'

'এই ছেড়া তুমি কই থাইকা আইছো? বাপের নাম কিতা?'বললেন মালেহা।

'কেন? পছন্দ হইছে? ছেড়ি আছে? বিয়া দিবেন? ছেড়ির গায়ের রঙ পরিষ্কার তো?'

মালেহা বানু হকচকিয়ে গেলেন। এ কেমন জাতের ছেলে! কেমন ফটফট করে! মৃদুল যেন বিরাট রসিকতা করেছে,এমনভাবে হাসল পূর্ণা। মৃদুল কলসি কাঁধে তুলে নিল। পূর্ণাকে আদেশের স্বরে বলল, 'হাসি থামায়া,হাঁটো।'

মালেহা বানু ও জয়তুনি বেগমকে অবাক করে মৃদুল, পূর্ণা চলে যায়। কিছুটা দূর এসে পূর্ণা প্রথম মুখ খুলল, 'কখন এসেছেন?'

'কিছুক্ষণ আগে। মুখটা শুকনা দেখাইতাছে কেন?'

'আপাকে দেখেছেন আপনি?'

'না। অন্দরমহলে ঢুকি নাই।'

পূর্ণা চুপ হয়ে যায়। মৃদুল বলল, 'এতো ভার কলসি নিতে পারছো?'

'কষ্ট হয়েছে।'

'তো নিতে গেলা কেন?'

পূর্ণা আবার চুপ হয়ে গেল। মৃদুল দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এক মিনিট হাঁটলেই মোড়ল বাড়ি। সে পূর্ণার মুখের দিকে চোখ রেখে বলল, 'খুশি হও নাই?'

'কী জন্য?'পূর্ণা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'এইযে আইয়া পড়ছি।'

পূর্ণা চোখ নামিয়ে ফেলে। মুচকি হাসে। চোখেমুখে লজ্জা ফুটে উঠে। মৃদুলও হাসল। সে যা বোঝার বুঝে যায়। আশেপাশে অনেক গাছপালা। বড় একটা গাছের ছায়ায় তারা দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের কেউ দেখে ফেলবে,এই ভয় দুজনের কারোর মধ্যে নেই। পূর্ণার পরনের কাপড়খানি ভেজা। কলসি থেকে পানি পড়েছে বোধহয়। কিছু অংশ পেট ও এক পাশের কোমড়ের সাথে কাপড় লেপ্টে আছে। মাথায় ঘোমটা নেই। গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে এক ঝলক রোদ পূর্ণার মুখ ঘেঁসে কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে পড়ে। সবকিছু মৃদুলের খেয়ালে চলে আসে। সে চমৎকার করে পূর্ণাকে বলল, 'ঘোমটা দিয়ে পথে হাঁটবা। বুঝছো ডাগরিনী?'

পূর্ণা ঠোঁটে হাসি রেখেই বাধ্যের মতো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। তারপর চট করে ঘোমটা টেনে নিল। মৃদুলের ডাগরিনী শব্দটা তার মন কাঁপিয়ে তুলেছে। খুশিতে উড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ডাগরিনী বলেছে মানে,তার চোখ দুটি ডাগর,ডাগর যা মৃদুলের ভালো লেগেছে! তার প্রশংসা করেছে!

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সম্পন্ন করে পূর্ণা তৈরি হয় হাওলাদার বাড়ি যাওয়ার জন্য। সাথে তৈরি হয় বাসন্তী, প্রেমা ও প্রান্ত। তখন মগা আসে। পূর্ণার হাতে চিঠি দিয়ে বলে, 'তোমার বইনে দিছে।'

চিঠি হাতে নিয়ে পূর্ণা মনে মনে ভয় পেল। আপা চিঠি কেন পাঠাবে? অজানা আশঙ্কায় পূর্ণার বুক ধুকপুক করতে থাকে। মগা চলে যায়। পূর্ণা চিঠি খুলে-

আদরের বোন,

তুই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস আমি জানি। আমার সব কথাও মানিস। মাঝে মাঝে ফাঁকিবাজিও করিস তবে এখন আমি তোকে যা করতে বলব একদম অমান্য করবি না। এটা আমার অনুরোধ।

যতদিন না আমি আসছি বা চিঠি লিখছি একদম এই বাড়িতে আসবি না। কেউ যদি বলে,আমি পাঠিয়েছি তোকে আনতে। তাও আসবি না। চোখ-কান খোলা রাখবি। প্রেমাকে দেখে রাখবি। আমি ভালো আছি। পায়ে একটু আরাম পেয়েছি। একদম চিন্তা করবি না। আমি খুব দ্রুত আসব। কেন নিষেধ করেছি আসতে তা নিয়ে মাথা ঘামাস না। আমি একদিন তোকে সব বলব। এখন আমার কথাটা রাখ। এমুখো হস না। আমি ভালো আছি। আবার ভাবিস না,আমি কোনো বিপদে আছি। শুনবি কিন্তু আমার কথা। আমার কথা অমান্য করলে আমার সঙ্গ আর পাবি না,মনে রাখবি। খাওয়াদাওয়া করবি ঠিকমতো। নামায পড়বি। ঘরের কাজকর্মে হাত লাগাবি।

ইতি

তোর আপা।

লেখাগুলো এলোমেলো, অগোছালো। মনে হচ্ছে,তাড়াহুড়ো করে লিখেছে অথবা অনেক কষ্টে একেকটা অক্ষর লিখেছে। কপালে ছড়িয়ে থাকা এক গাছি চুল কানে গুঁজে পূর্ণা আবার চিঠিটা পড়ল। পড়ার পর এতটুকু নিশ্চিত হয়েছে,তার বোন ভালো নেই। বড় বিপদে আছে।

ঘুম ভাঙতেই পদ্মজা হকচকিয়ে যায়। চোখের সামনে সব কালো। কালো রঙ ব্যাতীত কিছু নেই। ঘোর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। পদ্মজা চোখ কচলে আবার তাকায়। না,কিছুই পরিবর্তন হয়নি! সবকিছু কালো। বিকেলে সে বৈঠকখানার সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। তারপর নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুম ভাঙতেই দেখছে সব অন্ধকার! পদ্মজা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় দেয়ালের সুইচ। তখন সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে একটা আলো। আলোয় ভেসে উঠে আমিরের মুখ। পদ্মজা দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আমির পদ্মজার চেয়ে দুই হাত দূরে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি আবেগপ্রবণ। পদ্মজার হৃদস্পন্দন থমকে যায়। কাচুমাচু হয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি সব বাতি নিভিয়েছেন?'

আমির জবাব না দিয়ে হাতে থাকা সুন্দর কাচের হারিকেনটি পাশে রাখল। তারপরই পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার আগে পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। পদ্মজা আমতাআমতা করে শুধু বলতে পারল, 'এ...এ...ই কি...কি?'

আমির তাদের নিজস্ব ঘরে নিয়ে আসে পদ্মজাকে। পদ্মজা ঘর দেখে অবাক হয়। ঘরের চারিদিকে অদ্ভুত সুন্দর কাচের ছোট হারিকেন। আর মাঝে এক ঝুড়ি পদ্মফুল! সময়টা শরৎকাল। দিনের বেলা শরতের সাদা মেঘ নীল আকাশে পাল তুলে, ছবির মতো ঝকঝকে সুন্দর করে তুলে আকাশ। কমে এসেছে যখন তখন বৃষ্টির জ্বালাতন। সময় বিল ঝিল ঝাপিয়ে শাপলা আর পদ্ম ফোটার। এতো পদ্ম ফুল দেখে মনে হচ্ছে বড় এক বিলের সব পদ্ম ফুল তুলে নিয়ে এসেছে আমির। পদ্মজা প্রশ্ন করার পূর্বে আমির পিছন থেকে দুই হাতে পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'মনে আছে,প্রথম রাতে বলেছিলাম একদিন পদ্ম ফুল দিয়ে আমার পদ্মাবতীকে সাজাব! সময়টা নিয়ে এসেছি। দেখো তাকিয়ে।'

পদ্মজা ঝুড়ি ভর্তি পদ্ম ফুলগুলোর দিকে তাকায়। তার চোখ দুটি জলে ছলছল করে উঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমিরের দিকে চেয়ে আবেগমাখা কণ্ঠে বলল, 'সে কথাটাও মনে রেখেছেন!'

উত্তরে আমির হেসেছিল। প্রথম রাতের চেয়ে কোনো অংশে কম সুন্দর ছিল না সেই রাত। পদ্মজা সেজেছিল পদ্ম ফুল দিয়ে। স্বামী যত্ন করে সাজিয়েছিল। সময়টাকে আরো সুন্দর করে তুলতে প্রকৃতি দিয়েছিল মৃদু শীতল বাতাস।

জানালা দিয়ে প্রবেশ করা বাতাসের দাপটে পদ্মজার ঘুম ছুটে যায়। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে আমিরকে খোঁজে। নেই,বিছানা খালি! আবার সে পুরনো দিনের আরেকটি সুন্দর মুহূর্ত স্বপ্নে দেখেছে। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠে। আজ পাঁচ দিন আমির নেই। তার কাছে তার স্বামী নেই। কোনো এক অজানা জায়গায় বন্দি হয়ে আছে। পদ্মজা এক হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। বালিশের উপর থাকা আমিরের শার্টটা হাতে নিয়ে চুমু খেল। তার চোখ দুটি আবার ভিজে উঠে। সেদিন রিদওয়ান, খলিল,মজিদ দ্বারা আহত হওয়ার পর তাকে ওখান থেকে কে এনেছে সে জানে না। চোখ খুলে ফরিনাকে দেখেছিল। তিনি ডুকরে কাঁদছেন আর চোখের জল মুছছেন। লতিফাকে জিজ্ঞাসা করে পদ্মজা জানতে পারে,সময়টা দুপুর । সর্বাঙ্গে তখন বিষধর ব্যথা। উঠার শক্তিটুকু নেই। গলায় ব্যথা একটু বেশি ছিল। প্রথমে তার মাথায় আসে আমিরের কথা। রাতের ঘটনা মনে পড়তেই বুঝে যায়,এভাবে সে এদের সাথে পারবে না। তাকে তার মায়ের মতো শান্ত হতে হবে। সময়-সুযোগ বুঝে কাজ করতে হবে। ফরিনা আদর করে খাইয়ে দেন। তিনি পদ্মজার উপর করা নির্মম অত্যাচার আটকাতে পারেননি বলে

বারবার ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি নাকি চেষ্টা করেছিলেন। কীরকম চেষ্টা করেছেন সেটা বলেননি। পদ্মজা জিজ্ঞাসাও করেনি। এরপর পদ্মজা কাঁপা হাতে পূর্ণাকে চিঠি লিখে,ফরিনার হাতে দেয়। তিনি যেন মগাকে দিয়ে দেন।

তারপরের দিনগুলো চুপচাপ কাটিয়ে দেয় পদ্মজা। আমিরের শোকে ভেতরে ভেতরে

ঝড় বইলেও সামনে সে নিশ্চুপ থেকেছে। সুস্থ হওয়াটা আসল। নয়তো কাজের কাজ কিছুই হবে না। উল্টো নর্দমার কীটগুলোর হাতে মরতে হবে। আমিরের জন্য দোয়ায় দুই হাত তুলে অঝোরে কেঁদেছে,যেন আমির ভালো থাকে। আর তার কাছে ফিরে আসে। খুব মনে পড়ে মানুষটাকে! হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে পদ্মজার। পদ্মজা আমিরের শার্ট বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। ফরিনা এসে দাঁড়ান দরজার সামনে। কেউ একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল হতেই,পদ্মজা হাতের উলটোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে তাকাল। ফরিনা ঘরে প্রবেশ করেন। গায়ে সাদা-খয়েরি মিশ্রণের শাল। পদ্মজা আমিরের শার্ট বালিশের উপর রেখে বলল, 'আছরের আযান পড়েছে আম্মা?'

মৃদুল অন্দরমহলের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। তাকে মদন কিছুতেই অন্দরমহলে ঢুকতে দিচ্ছে না। গত চারদিন ধরে সে চেষ্টা করছে অন্দরমহলে ঢোকার। গত তিন দিন ভুড়িওয়ালা একজন ঢুকতে দিত না। এখন দিচ্ছে না মদন। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে সে মৃদুলের সাথে তর্ক করছে। মৃদুল বলছে, 'দুলাভাই ঢুকতে দেন কইতাছি। সমস্যাটা কিতা ঢুকলে? সেটাই তো বুঝতাছি না।'

'দেহো মৃদুল মিয়া এইডা আমার কথা না। মজিদ চাচার কথা। উনি কইছে বাড়ির ভিতরে নতুন কেউরে ঢুকতে না দিতে।'

'আমি তো আত্মীয় নাকি? আমার সাথে এমন করা হইতাছে কেন? আগে তো ঠিকই ঢুকতে দিত। এহন দেয় না কেন?'

'হেইডা তো আমি জানি না।'

'সরেন কইতাছি। নইলে ওইযে গাছের মোড়াডা ওইডা দিয়ে আবার মাথাডা ফাডায়া দিব। একবার মারছে আপাই এহন আমি মারাম।'

'হেইডাই করো, তবুও আমি চাচার কথা অমান্য করতে পারতাম না।'

'আমার কিন্তু কইলাম, রাগ উঠতাছে। মাটির তলায় গাইরালামু।'

'মিয়া ভাই তুমি আমারে যা ইচ্ছা কইরালাও। আমি-

মৃদুলের মাথা বরাবরই চড়া! হুট করে খুন করার মতো রাগ চেপে যায় মাথায়। সে মদনের গলা চেপে ধরে। মদন কাশতে থাকল। আলো কান্না শুরু করে। আলোর কান্না শুনে খলিল বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সদর দরজার সামনে এমন দৃশ্য দেখে তিনি দৌড়ে আসেন। মৃদুলকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন। হুংকার ছাড়েন, 'তোমার এতো সাহস কেমনে হইছে? আমার জামাইয়ের গলা চাইপা ধরো!'

মৃদুলের নাক লাল হয়ে গেছে রাগে। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। রাগী মেজাজ নিয়েই দুই হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'আপনার জামাই আমারে ভেতরে ঢুকতে দেয় না।'

'তুমি মেহমান মানুষ, আলগ ঘরে থাকবা। এইহানে কী দরকার?'

'এই নিয়ম কবে করছেন আপনেরা? আগের বার যখন ছিলাম তহন তো ঠিকই ঢুকতে দিছেন।'

'এহন আর ঢুহন যাইব না। এইডা অন্দরমহল। বাড়ির বউ-ছেড়িদের জায়গা।'

'সত্যি কইরা কন তো, বাড়ির ভিতর কী চলে?'

খলিলের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে,অসভ্য ছেলেটার কানের নিচে কয়টা দিয়ে দিতে। তিনি কটাক্ষ করে মৃদুলকে বললেন, 'নিজের বাড়ি রাইখা এইহানে পইড়া রইছো কেন? মাইনষের অন্ন নষ্ট করতাছো। নিজের বাড়িত যাও।'

অপমানে মৃদুল বাকহীন হয়ে পড়ে! সে ক্ষণকাল কথা বলতে পারে না। তার আপন ফুফা এমন কথা বললো! ক্ষণমুহূর্ত পর সে জ্বলে উঠে বলল, 'আপনের বাড়ির উপর থুথু মারি। আমি ব্যাঠা মিয়া বংশের ছেড়া। শত বিঘার মালিক আমি একাই। আপনের অন্নের ঠেকা পড়ে নাই আমার। আমার বাড়িত কামলাই আছে দশ-বারো জন। আমি কাইলই চইলা যাইয়াম বাড়িত।'

মৃদুলের আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না। সে ঘুরে দাঁড়ায়। কাছেই একটা বিরাট পাতিল ছিল। কোনো কাজে হয়তো বের করা হয়েছে। সে পাতিলে জোরে লাথি মেরে হনহন করে চলে যায়। পূর্ণা তার বোনের খবর নিয়ে দিতে বলেছে বলেই,সে বার বার অন্দরমহলে ঢোকার চেষ্টা করেছে। নয়তো মৃদুলকে কেউ একবার কোনো ব্যপারে না করলে,সে দ্বিতীবারের মতো সেখানে ফিরেও তাকায় না।

পদ্মজার কথার জবাব দিলেন না ফরিনা। তিনি পদ্মজার পাশে গিয়ে বসলেন। পিছনে রিনু আসে। হাতে খাবারের প্লেট। তিনবেলা ফরিনাই খাইয়ে দিচ্ছেন। যত্ন নিচ্ছেন পদ্মজার। মায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম করছেন না। তবুও এই মানুষটা কোন কারণে সেদিন তার চিৎকার শুনেও বাঁচাতে যায়নি? ফরিনা প্লেট হাতে নিতেই পদ্মজা বলল, 'আমি এখন মোটামুটি ভালোই আছি আম্মা। আমি খেয়ে নিতে পারবো। হাঁটতেও তো পারি।'

পদ্মজার এক কথায় খাবারের প্লেট পদ্মজার হাতে তুলে দিলেন ফরিনা। আর রিনুকে চলে যেতে বললেন। পদ্মজা চুপচাপ খেয়ে নেয়। তার খেতে ইচ্ছে করে না একদমই। কিন্তু সামনের যুদ্ধটার জন্য তার খেতেই হবে। তাকে সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থতা ছাড়া যুদ্ধে সফল হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পদ্মজা খেল,ততক্ষণ ফরিনা পাশে বসে থাকলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা ফরিনাকে বলল, 'আব্বাকে খুব ভয় পান আম্মা?'

ফরিনা স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন, 'সব বউরাই স্বামীরে ডরায়।'

'না, আপনি একটু বেশি ভয় পান। যমের মতো।'

'কবিরাজের দেওয়া ঔষধডি খাও এহন।'

'আপনি কথা এড়াচ্ছেন আম্মা। আচ্ছা, ঔষধ দেন আগে।'

ফরিনা আলমারি খুলে ঔষধ বের করলেন। তারপর এগিয়ে দিলেন পদ্মজার কাছে। পদ্মজা ঔষধ খেয়ে বলল, 'কবিরাজ আনার অনুমতি ওরা দিয়েছিল ভেবে আমি অবাক হয়েছি আম্মা! ওরা কেন চায়? আমি সুস্থ থাকি?'

ফরিনা কিছু বললেন না। পদ্মজা ফরিনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মানুষটার আয়ু কী শেষের পথে? কেমন যেন মৃত, মৃত ছাপ মুখে। চোখ বুজলে মনে হবে,অনেক দিনের উপোষ করে মারা গিয়েছেন। পদ্মজার মায়া হয় মানুষটার জন্য। কোন দুঃখে তিনি ধুঁকে,ধুঁকে মরছেন! পদ্মজা বিছানা থেকে নেমে এসে ফরিনার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আম্মা, আপনি আমাকে নিজের মেয়ে ভেবে একটা আবদার রাখবেন?'

'তুমি তো আমার ছেড়িই।'

'তাহলে আবদার রাখবেন?'

'রাখাম।'ফরিনার শুষ্ক চোখ। অথচ গলা ভেজা মনে হলো!

পদ্মজা বলল, 'তাহলে আপনার সব গোপন কথা আমাকে বলুন। যা ভেবে ভেবে আপনি কষ্ট পান।'

ফরিনা দুই হাতে পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু খান। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে পদ্মজার হাতে। মমতাময়ী স্পর্শ! পদ্মজার শরীরের

লোম খাড়া হয়ে যায়। ফরিনা বললেন, 'তার আগে কও আমি সব কওয়ার পর তোমারে যা করতে কইয়াম তাই করবা তুমি।'

পদ্মজা অপলক নয়নে ফরিনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি করতে বলবেন তিনি? যদি সে সেটা করতে না পারে! সম্ভব না হয়! পদ্মজা বলল, 'আপনি যা বলবেন আমাকে তার সাথে যদি যা করতে বলাটা মানানসই হয়,যুক্তিগত হয়। আমি তাই করব আম্মা।'

ফরিনা চোখের জল মুছেন। তারপর বললেন, 'আমি বাবুর বাপরে দেইখা আইতাছি। তুমি শুইয়া থাকো।'

কথা শেষ করেই ফরিনা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যান। পদ্মজার মাঝে উত্তেজনা কাজ করছে। সে জানে না সে কী শুনতে চলেছে,তবে সেটা কোনো সাধারণ ঘটনা বা কথা হবে

না এটা নিশ্চিত। সে ঘরে পায়চারি করতে করতে জানালার ধারে আসে। দেখতে পায় রিদওয়ানকে। হাতে একটা পলিথিন নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। এই জঙ্গলের মাঝেই তো আছে তালাবন্ধ রহস্যজাল। যার চাবি বোধহয় তার কাছে আছে। আলমগীরের দেয়া চাবিটাকে পদ্মজার কোনো তালাবন্ধ রহস্যজালের চাবি মনে হয়! রিদওয়ান গত দিনগুলোতে তিন-চার বার তাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু কিছু বলেনি। রিদওয়ানের মতিগতি বোঝা যায় না। অদ্ভুত সে। রিদওয়ানকে দেখলে পদ্মজার শরীর রাগে কাঁপে।

বেশ কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আসে কানে। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে পুরুষের পায়ের শব্দ। পদ্মজা দ্রুত এসে বিছানার এক কোণে বসে। যে কোণে ছুরি রাখা আছে। ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান। পদ্মজাকে দেখেই লম্বা করে হেসে বলল, 'তারপর বলো কেমন আছো?'

পদ্মজার থেকে জবাব না পেয়ে রিদওয়ান আবার প্রশ্ন করল, 'সুস্থ আছো তো?'

পদ্মজা সাড়া দিল না। রিদওয়ান চেয়ার টেনে বসল। বলল, 'তোমাকে এত চুপচাপ দেখে অবাক হচ্ছি। কী পরিকল্পনা করছো বলোতো?'

পদ্মজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। বলল, 'কাপুরুষ বোধহয় আপনার মতো মানুষকেই বলা হয়।'

রিদওয়ানের ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। তারপর হুট করেই হেসে দিল। বলল, 'কাপুরুষের কী করেছি?'

'স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন। আবার সেই স্ত্রী অসুস্থ ছিল। এমন তো কাপুরুষরাই করে।'

'এতো কথা না বলে চুপচাপ যা বলি শুনো। আমির আমাদের ব্যপারে অনেক নাক গলিয়েছে। অনেক সমস্যা করেছে। তবুও আমরা আমিরকে এক শর্তে ফিরিয়ে দেব। যদি তুমি সেই শর্ত মানো।'

'কী শর্ত?'

'তুমি আমিরকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে। কখনো অলন্দপুরে ফিরবে না।'

'যদি না মানি?'

'অবুঝের মতো প্রশ্ন করতে বলিনি। শর্ত দিয়েছি, মানা না মানা তোমার ব্যপার।'

'আপনারা আমাকে ভয় পাচ্ছেন কেন?'

রিদওয়ান হাসল। পদ্মজা বলল, 'সেদিন মেরে আধমরা করেছেন। এবার একদম মেরে দিন। তাহলেই আপনাদের সমস্যা শেষ। বেহুদা, আমাদের মুক্তি দিয়ে ভেজাল কেন বাড়াচ্ছেন? ঢাকা ফিরে গিয়ে পুলিশ নিয়েও তো আসতে পারি।'

রিদওয়ান বিরক্তিতে'চ'সূচক উচ্চারণ করল। বলল, 'তোমাকে মারা যাবে না।'

'আমাকে দিয়ে আপনাদের কী কাজ হবে যে মারা যাবে না?'

'এতো প্রশ্ন কেন করছো?'

'মনে আসছে তাই।'

রিদওয়ান রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, 'তুমি শর্তে রাজি নাকি না?'

'আগে বলুন, কার কাজে আমি লাগব? কার খাতিরে আমাকে মারা যাবে না?'

'তুমি শর্তে রাজি নাকি সেটা বলো। এইযে আমার পাঞ্জাবিতে তাজা লাল দাগটা দেখছো এটা কিন্তু রক্তের। আর রক্তটা আমিরের।'

পদ্মজার চোখ দুটি জ্বলে উঠে। এমনিতেই এই হিংস্র মানুষটার হাসি,কথা তার গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তার উপর তার স্বামীর রক্ত দেখাচ্ছে রিদওয়ান। পদ্মজা উঁচু গলায় প্রশ্ন করল, 'উনাকে জঙ্গলেই রেখেছেন তাই না?'

'শর্তে রাজি তুমি?'

'না।'

'তোমাকে তো আমি-

রিদওয়ান রেগে তেড়ে আসে। পদ্মজা পাশের টেবিল থেকে ঔষধের কাচের বোতলটা

নিয়ে রিদওয়ানের মাথায় আঘাত করে। রিদওয়ান আকস্মিক আক্রমণে বিছানায় পড়ে যায়। পদ্মজা দ্রুততার সাথে ছুরি হাতে নেয়। রিদওয়ান বিছানায় পড়ার দুই সেকেন্ডের মধ্যে তার পিঠে ছুরি দিয়ে হেঁচকা টান মারে। রিদওয়ান আর্তনাদ করে উঠল। পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ছুরির আঘাত শরীরের মাংস অবধি চলে গিয়েছে। সুযোগ পদ্মজার হাতের মুঠোয়। সে এই সুযোগ হারাবে না। এতদিন সে এদের মানুষ ভেবে এসেছে। অথচ,এরা মানুষরূপী শয়তান। আর শয়তানকে বুঝেশুনে নয়, ইচ্ছামত আঘাত করা উচিত। পদ্মজা দ্রুত কাঠের চেয়ার তুলে নেয় হাতে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে বারি মারে রিদওয়ানের মাথায়। রিদওয়ানের কানের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা নামে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে তার শরীর। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনীর মতো হাঁপাতে থাকে। মিনিট দুয়েক পর শাড়ির আঁচল মেঝে থেকে তুলে বুকে জরিয়ে নেয়। হুট করেই যেন শান্ত সমুদ্র গর্জন তুলে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে চারপাশ।

পর্ব ৬১

ফরিনা পদ্মজার ঘরে প্রবেশ করে ঘাবড়ে গেলেন। বিছানায় রক্তাক্ত দীর্ঘদেহী একজন পুরুষ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে আছে। নাকি মরে গেছে? ফরিনা শিউরে উঠেন। পদ্মজা ফরিনাকে এক নজর দেখে জগ থেকে গ্লাসে জল নিয়ে ঢকঢক করে পান করল। ফরিনার মনে হচ্ছে বিছানায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত পুরুষ মানুষটি রিদওয়ান! যখন শতভাগ নিশ্চিত হলেন এটা রিদওয়ান, মনে তীব্র একটা ভয় জেঁকে বসে। তিনি নিঃশ্বাস আটকে পদ্মজার কাছে ছুটে আসেন। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'রিদু কি মইরা গেছে?'

পদ্মজা তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারলো না। সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে বলল, 'মরেনি বোধহয়। তবে বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে মরে যাবে।'

পদ্মজার তরঙ্গহীন গলার স্বর ফরিনার ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তিনি পদ্মজাকে আচমকা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। পদ্মজা থতমত খেয়ে গেল। ফরিনার হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি টের পায় সে। ফরিনা অস্থির হয়ে বললেন, 'ও মা-

পদ্মজা ফরিনার বুক থেকে মাথা তুলে বলল, 'কী হয়েছে আম্মা?'

ফরিনার চোখের দৃষ্টি অস্থির। তিনি ঢোক গিলে বললেন, 'তুমি পলাইয়া যাও। আর আইবা না। রুম্পার মতো চইলা যাও।'

'আম্মা, ওরা আমাকে মারবে না। রিদওয়ান ভাইয়াই বলেছে।'

'মিছা কথা...মিছা কথা কইছে।'

'আম্মা, আপনি এমন করছেন কেন?'

ফরিনা দ্রুত সংজ্ঞাহীন রিদওয়ানকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি পলায়া যাও। তোমার আব্বা,ওই শকুনের বাইচ্ছা আমার নিষ্পাপ কলিজার টুকরা বাবুরে মাইরা ফেলছে কিন্তু...'

জুতার ছপছপ আওয়াজ শুনে ফরিনা থমকে যান। এরকম আওয়াজ মজিদের জুতোয় হয়। মনে হয় জুতায় পানি নিয়ে হাঁটছে। তিনি আতঙ্কে চোখ দুটি বড় বড় করে তাকালেন। মজিদ তো ঘরে ছিল না! কখন চলে এলো? আর যতক্ষণ মজিদ ঘরে থাকে ততক্ষণ ফরিনাকেও ঘরে থাকতে হয়। তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত মজিদ এখন পদ্মজার ঘরে আসবে। আর রিদওয়ানকে দেখে ফেলবে! তিনি পদ্মজার আলমারি খুলে তালা-চাবি বের করলেন। একটা ঝড় থামতেই যেন আরেকটা ঝড় শুরু হয়েছে। পদ্মজা ফরিনাকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আম্মা,কিন্তু কী? বাবু মানে উনাকে মেরে ফেলেছে মানে? আপনি কীভাবে জানেন? আম্মা..."

ফরিনা নিজের এক হাতে পদ্মজার এক হাত শক্ত করে চেপে ধরেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। বারান্দায় পা রাখতেই মজিদের সাথে দেখা হয়। ফরিনা মজিদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে পদ্মজাকে টেনে নিয়ে যান তিন তলায়। মজিদ হতভম্ব হয়ে দেখলেন ঘটনাটা। পদ্মজা বার বার জিজ্ঞাসা করছে ফরিনাকে, 'আম্মা,আপনি এটা কী বললেন! আমার বুক কাঁপছে। আম্মা কোথায় যাচ্ছেন?'

মজিদ পদ্মজার ঘরে উঁকি দিলেন। তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। বিছানার উপর রিদওয়ানকে দেখতে না পেলেও,রিদওয়ানের পা জোড়া চোখে পড়ে যায়। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। চাদর সরিয়ে রিদওয়ানকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। এদিকে,ফরিনা পদ্মজাকে ঠেলে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেন। ঘরের দরজাটি লোহার। পদ্মজা ধাক্কা খেয়ে ঘরের মধ্যিখানে পড়ে। সে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে ফরিনা বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। পদ্মজা আচমকার ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তার মাথায় বার বার বাজছে,তোমার আব্বা,ওই শকুনের বাইচ্ছা আমার নিষ্পাপ কইলজার টুকরা বাবুরে মাইরা ফেলছে!'

পদ্মজা দুই হাতে মুখ চেপে ধরে। মনে হচ্ছে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখুনি মারা

যাবে। বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ফরিনা বলেছিলেন,সম্পত্তির জন্য হলেও আমিরকে ওরা জানে মারবে না! এজন্যই পদ্মজা ধৈর্য ধরে পাঁচটি দিন কাটাতে পেরেছে। ভেবেছিল, শরীরে একটু শক্তি জমিয়ে তারপর সে তার স্বামীকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু একটু আগে ফরিনা যা বললেন তাতে পদ্মজার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। রিদওয়ান শর্ত দিয়েছিল, পদ্মজা ঢাকা চলে গেলে আমিরকে ছেড়ে দিবে। পদ্মজা তাই মানতো। শুধু না করে আরেকটু কথা বের করতে চেয়েছিল সে। তার আগেই রিদওয়ান আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আর পদ্মজাও আঘাত করে বসে। পাঁচ দিনের সব ধৈর্য, পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেল ফরিনার এক কথায়। পদ্মজা দরজায় থাপ্পড় দিয়ে ডাকল, 'আম্মা...আম্মা কেন আটকালেন আমাকে? দরজা খুলুন। আম্মা আপনার ছেলের কী হয়েছে? কী বললেন? আম্মা...'

ফরিনা হাতের চাবিটা দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে দপদপ! তিনি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখেন,অস্বাভাবিকভাবে হাত কাঁপছে। কাঁপছে পা। মজিদ,খলিল একসাথে উঠে আসে। ফরিনার সামনে এসে দাঁড়ায়। ফরিনা ভয়ে জমে গেছেন। মজিদের চেহারা ক্ষুব্ধ। তিনি রাগে গজগজ করতে করতে প্রশ্ন করলেন, 'রিদওয়ানকে পদ্মজা আঘাত করেছে?'

ফরিনা কিছু বললেন না। মজিদের গলার স্বর শুনে পদ্মজা চুপ হয়ে যায়। ফরিনা এলোমেলো দৃষ্টি নিয়ে কাঁপছেন। খলিল বললেন, 'ভাবিরে জিগাও কেন? ওই ছেড়ি ছাড়া আর কার এতো সাহস আছে? এই ছেড়ি এই ঘরের ভিতরে?'

ফরিনা দরজার সাথে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছেন। খলিলের প্রশ্ন শুনে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। মজিদ ফরিনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। দরজায় তালা! তখনই পদ্মজা দরজায় থাপ্পড় দিয়ে ডাকল, 'আম্মা...আম্মা দরজা খুলুন। কী হচ্ছে ওখানে?'

মজিদের ক্ষুব্ধ চেহারা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠে। তিনি ফরিনার কাছে চাবি চাইলেন, 'চাবি দাও। কি বলছি,কানে যায় না? চাবি দাও।'

ফরিনা আমতাআমতা করে বললেন, 'ন...না-ই।'

মজিদ ফরিনার মুখ চেপে ধরেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, 'চাবি দাও।'

ফরিনা তাও বললেন,চাবি নেই। মজিদ আরো একবার বললেন, 'চাবি দাও বলছি। শাড়ির কোন ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছো?'

'চাবি নাই। চাবি নাই আমার কাছে।'গলা উঁচিয়ে বললেন ফরিনা।

খলিল দরজায় জোরে কয়টা লাথি দিলেন। তালা ভাঙার চেষ্টা করলেন। দুপদাপ শব্দ! সেই সাথে পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে নোংরা গালি। খলিলের মুখের ভাষা শুনে পদ্মজার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে যায়। ফরিনার উঁচুবাক্য শুনে মজিদ হাওলাদার রাগে কাঁপতে থাকলেন। ফরিনার এতো সাহস কবে হলো! তিনি ফরিনার শরীর হাতড়ে চাবি খুঁজতে খুঁজতে বললেন, 'চাবি কোথায় রাখছো? জলদি বলো। নয়তো এরপর যা হবে,ভালো হবে না।'

ফরিনার শরীর কাঁপছে ভয়ে। তিনি জানেন,এই মুহূর্তে তিনি খুন হয়ে যেতেও পারেন। তবুও চাবি দিবেন না। নয়তো ওরা পদ্মজাকে খুন করে ফেলবে। ওরা পারে না এমন কিছু নেই! মজিদের নিকৃষ্ট অনেক কাজের সাক্ষী তিনি। এই মানুষটা তার জীবনের জাহান্নাম। মজিদ রাগে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফরিনা কিছুতেই কথা মানছে না বলে, ছোট ভাইয়ের সামনে ফরিনার শাড়ি টেনে খুলে ফেললেন তিনি। আর বললেন, 'চাবি কোন চিপায় রাখছো? বলো,নয়তো মেরে পুঁতে ফেলবো।'

ফরিনা টু শব্দও করলেন না। খলিলের সামনে যুবতীকালে তাকে বিবস্ত্র করেও মজিদ মেরেছে! সম্মান-ইজ্জত কবেই হারিয়ে গেছে। নতুন করে হারানোর কিছু নেই। বয়সও অনেক হয়েছে! তবে এদের শিকার পদ্মজাকে হতে দিবেন না কিছুতেই। মজিদ কোনোভাবেই ফরিনার কাছ থেকে চাবি উদ্ধার করতে পারেননি। এদিকে রিদওয়ানের অবস্থা খারাপের দিকে। খলিল দ্রুত নিচে চলে গেলেন। মজিদ ফরিনাকে মেঝেতে ফেলে ইচ্ছেমত

লাথি,থাপ্পড় দেন,সাথে বিশ্রি গালিগালাজ। চারপাশ ফরিনার কান্নায় ভারী হয়ে উঠে। ফরিনার কান্নার স্বর পদ্মজার কানে আসতেই সে চিৎকার করে বলল, 'আব্বা,আম্মাকে মারবেন না। আব্বা...দোহাই লাগে। আম্মা লাশের মতো হয়ে গেছে। আব্বা,আম্মাকে মারবেন না। আমাকে মারেন। আব্বা। আম্মা আপনি দরজা খুলুন। আম্মাকে এভাবে কেন মারছেন আব্বা ? আপনি তো অলন্দপুরের ফেরেশতা ছিলেন আব্বা। আপনার এমন রূপ কেন? আম্মা দরজা খুলুন। আব্বা,আম্মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। অনুরোধ করছি,আর মারবেন না।'

বাইরে ফরিনার কান্না,ঘরের ভেতর পদ্মজার কান্না। আর দরজায় এলোপাথাড়ি থাপ্পড়ের আওয়াজ। সব মিলিয়ে চারপাশ যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। খলিলের ডাক শুনে মজিদ চলে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে ফরিনার পেটে বড় একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরিনার মুখ দিয়ে বমি বেরিয়ে আসে। মজিদ চলে যাওয়ার মিনিট দুয়েক পর লতিফা দৌড়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় সে দুইবার হোঁচট খেল। তারপর ফরিনার মাথা নিজের কোলে নিয়ে কেঁদে বলল, 'খালাম্মা আপনি কেন খালুর বিরুদ্ধে গেলেন। ও খালাম্মা কথা কন। খালাম্মা?'

লতিফার ব্যকুল কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা আরো জোরে থাপ্পড় দিল দরজায়। বলল, 'লুতু বুবু আম্মার কী হয়েছে? লুতু বুবু দরজা খুলো। ও লুতু বুবু।'

ফরিনা অস্পষ্ট স্বরে লতিফাকে বললেন, 'তোর খালু চইলা গেছে?'

'হ, গেছে।'

'বাড়ি থেইকা বাইর হইছে?'ফরিনার কণ্ঠ নিভে আসছে।

লতিফা ফরিনার মাথাটা সাবধানে মেঝেতে রেখে বারান্দা থেকে বাইরে উঁকি দিল। মজিদ,খলিল,মদন আর বাড়ির দারোয়ান মিলে গরু গাড়ি দিয়ে রিদওয়ানকে নিয়ে যাচ্ছে। গেইটের কাছাকাছি চলে গেছে। সে ফরিনাকে এসে বলল, 'বাইর হইয়া গেছে খাল্লাম্মা।'

পদ্মজা দরজায় এলোপাথাড়ি থাপ্পড় দিচ্ছে। বিকট শব্দ হচ্ছে! ফরিনা আঙুলের ইশারায় ডান দিকটা দেখিয়ে বললেন, 'ওইহানে খুঁইজা দেখ,চাবি পাবি একটা। দরজাডা খুইলা দে।'

লতিফা ফরিনার কথামতো চাবি খুঁজল। পেয়েও গেল। তারপর দরজা খুলতেই পদ্মজা হুড়মুড়িয়ে বের হয়। ফরিনাকে দেখে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। গায়ে শাড়ি নেই। পেটিকোট হাঁটু অবধি তোলা। মিষ্টি রঙের ব্লাউজে রক্তের দাগ। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। দুই চোখ ফুলে গেছে। হাতে,পায়ে জখম। বয়স্ক মানুষটাকেও ছাড়েনি! পদ্মজা হাঁটুগেড়ে বসে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল, 'আম্মা,আপনি কেন চাবিটা দিলেন না? এরা মানুষ? নিজের বউকে কেউ এভাবে মারে? লুতু বুবু আম্মাকে ধরো।'

লতিফা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'পদ্মজা তুমি কিচ্ছু জানো না। খালু এমনেই মারে।'

'এখন ধরো আম্মাকে।'

লতিফা,পদ্মজা দুজন মিলে ফরিনাকে ধরে ধরে তিন তলার আরেকটি ঘরে নিয়ে যায়। যে ঘরটিতে প্রথম রুম্পা ছিল,তারপর রানি। নিচ তলা অবধি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফরিনা মেঝেতে পা সোজা করে ফেলতে পারছেন না। চোখ দুটি বার বার বুজে যাচ্ছে। পদ্মজা একটা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করছে। যেমনটা তার মায়ের মৃত্যুর আগে অনুভব হয়েছিল। পদ্মজার গা কেঁপে উঠে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে। মনে মনে কেঁদে বলল, 'আল্লাহ! কেন আমার সাথে এমন হচ্ছে! কীসের পরীক্ষা নিচ্ছো তুমি? আমার চারপাশ এতো নির্মম কেন? কোথায় আছো আম্মা। কোথায় আছেন পারিজার আব্বু। আমি ভীষণ একা। ভীষণ।'

পদ্মজার হেঁচকি উঠে গেল। সে ঢোক গিলে নিজেকে সামলায়। ফরিনার যত্ন নিতে হবে তার। ফরিনাকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই তিনি থেমে থেমে বললেন, 'আমার কৈ মাছের জান। আমি মরতাম না। তুমি,তুমি পলায়া যাও।'

'আম্মা, আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। লুতু বুবু হালকা গরম পানি, আর আমার ঘরের আলমারির ডান পাশের ড্রয়ার থেকে স্যাভলন আর তুলা নিয়ে আসো।'

পদ্মজার আদেশ পাওয়া মাত্র লতিফা বেরিয়ে গেল। ফরিনা করুণ চোখে পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন, 'কান্দো কেরে? কাইন্দো না।'

পদ্মজার সুন্দর দুটি চোখে জলের পুকুর। বিরতিহীনভাবে পানি গড়িয়ে পড়ছে গলায়,বুকে। সে ফরিনার এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে হতাশ হয়ে ব্যর্থ কণ্ঠে বলল, 'আম্মা,আমি কী করব? যখনই ভাবি এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখনই ভয়ংকর সব ঘটনার সম্মূখীন হতে হয়। আমি আর পারছি না। এতো খারাপ পরিবেশ আমি আর নিতে পারছি না আম্মা। নিজেকে কিছুক্ষণ আগেও শক্তিমান মনে হয়েছে। মনে হয়েছে,আমি চাইলে সব পারব। কিন্তু এখন খুব দূর্বল মনে হচ্ছে। আমি ওদের বিরুদ্ধে পেরে উঠছি না। আপনি ভালো হয়ে উঠুন আম্মা। আপনার ছেলে কি সত্যি-"

পদ্মজা তাকিয়ে দেখল, ফরিনার চোখ বোজা অবস্থায় আছে। পদ্মজার বুক ছ্যাঁত করে উঠল। সে ফরিনার নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করল,নিঃশ্বাস নিচ্ছে নাকি। নিঃশ্বাস নিচ্ছে! সেই সময় লতিফা স্যাভলন,তুলা,আর হালকা গরম পানি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

ফরিনা ঘুমাচ্ছেন। কথা বলার অবস্থায় নেই। পদ্মজার পায়ে ঘা হয়েছে। পাঁচদিনে কি ছেঁড়াকাঁটা ভালো হয়? শীতের কারণে উলটো আরো কষ্ট বাড়ে। পায়ের অবস্থা যা তা! তাতে অবশ্য যায় আসে না পদ্মজার। সে অস্থির হয়ে আছে। বুকে এক ফোঁটাও শান্তি নেই। রিদওয়ান দুপুরে জঙ্গল থেকে ফিরেছিল। পদ্মজার ধারণা,আমির জঙ্গলের কোথাও বন্দি আছে। অথবা লাশটা হলেও আছে! ভাবনাটা পদ্মজার মাথায় আসতেই সে দ্রুত মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে, 'না! আমি কী ভাবছি! কিছু হয়নি। কারো কিছু হয়নি। সবাই ভালো আছে।'

সে লতিফার দায়িত্বে ফরিনাকে রেখে নিচ তলায় নেমে আসে। সাথে ছুরি,রাম দা নিয়েছে। আজ খোঁপা করেনি। বেণী করেছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। সব হাসপাতালে। ওরা ফিরলে সে আর আস্তো থাকবে না। তার আগেই আমিরকে বের করতে হবে। সেই সাথে লুকোনো গুপ্ত রহস্য। সদর ঘরে আমিনা ছিলেন। তিনি আলোকে খিচুরি খাওয়াচ্ছেন। নির্বিকার ভঙ্গি! কোনো তাড়া নেই,চিন্তা নেই! রিদওয়ানের অবস্থা কী দেখেনি? এই মানুষটা শুধু রানির জন্যই কাঁদেন। আর কারোর জন্য না! কিন্তু কেন? পরিবারের সবার সাথে দূরত্ব বজায় রাখেন। যদিও কথা বলেন,তা অহংকারী, কটু কথা। পদ্মজা বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার নামায পড়েই বেরিয়েছে। আজ জঙ্গলে মরবে নয়তো আগামীকাল এই বাড়ির পুরুষগুলোর হাতে! সে মনে মনে মৃত্যু মেনে নিয়েছে। ধীর পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে। বোনদের কথা খুব মনে পড়ছে। সে মারা গেলে, ওদের কী হবে? খুব কী কাঁদবে? কাঁদতে কাঁদতে জ্বর উঠে যাবে বোধহয়! পূর্ণার তো খুব কান্নার পর জ্বর হয়। প্রেমা নিজেকে সামলাতে পারবে। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় পদ্মজা মানুষের উপস্থিতি টের পেলো। ফিসফিসিয়ে কাছে কোথাও কেউ কথা বলছে। পদ্মজা এখনও ভালো করে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করেনি। সে হিজল গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে দুটি মানুষ চোখের পর্দায় ভেসে উঠে। তারা জঙ্গলের পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। অস্পষ্ট তাদের মুখ। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অন্দরমহলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। একটা মুখ চিনতে পারে পদ্মজা। মৃদুল! মৃদুলের হাতে টর্চ। সেই টর্চের আলোতে পাশের জনের হাত ভেসে উঠে। এক হাতে লাল তাজা রক্ত, অন্য হাতে রামদা। পদ্মজা শিউরে উঠে। ঘামতে থাকল। উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার উপক্রম। গলা শুকিয়ে কাঠ। মৃদুল কিছু একটা বলে। উত্তরে আগন্তুক কিছু একটা বলে। ঝাপসা আলোয় মৃদুলের সাথের লোকটার দেহ আর চুল স্পষ্ট হয়। লম্বা শরীর,মাথায় ঝাকড়া চুল। চারপাশ থমকে যায়। পদ্মজার শরীর বেয়ে যেন মুহূর্তে শীতল কিছু একটা ছুটে যায়। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারছে না।

চন্দ্র তারকাহীন ম্লান আকাশের কারণে চারপাশ অদ্ভুত ভয়ংকর হয়ে আছে। পদ্মজার মুখ ঘেঁষে একটা পাতা মাটিতে পড়লো। সাথে সাথে সে ভয় পেয়ে দুই পা পিছিয়ে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, নিজের ভয় পাওয়া দেখে নিজের উপর খুব বিরক্ত হয়। দুই পা এগিয়ে এসে অন্দরমহলের পিছনে তাকায়। আধো অন্ধকারে আবিষ্কার করলো, মৃদুল এবং আগন্তুক নেই! চোখের পলকে যেন মুহূর্তেই ভোঁজবাজির মতো নাই হয়ে গেল! পদ্মজার মস্তিষ্ক সাবধান হয়ে উঠলো। মৃদুলের মধ্যে ঘাপলা আছে ভাবতেই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সে সবকিছু ভাবতে পারে। সবকিছু! পদ্মজা তার পরিকল্পিত পথ ধরে হাঁটা শুরু করলো। মনে মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, মৃদুল জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেনি তো? আর দীর্ঘদেহী, ঝাঁকড়া চুলের আগন্তুকও কি সাথে রয়েছে? পদ্মজা এক হাতে ছুরি নিল, অন্য হাতে রাম দা। তার চোখের দৃষ্টি প্রখর। চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাবধানে এক পা,এক পা করে এগোচ্ছে। নিঃশ্বাস যেন আটকে আছে। এই বুঝি কেউ আক্রমণ করে বসল! সেদিন যতটুকু এসেছিল সে,ঠাওর করে করে নিরাপদভাবে ঠিক ততটুকুই চলে আসে পদ্মজা। সামনে বড় বড় গাছপালা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভূতুড়ে পরিবেশ। পদ্মজা কেন জানি নিশ্চিত,আজও কেউ থাকবে এখানে, অজানা রহস্যজাল পাহারা দেয়ার জন্য। আর আশেপাশেই আছে সেই গুপ্ত রহস্যজাল। পদ্মজার শিরায়,শিরায় প্রবল উত্তেজনা বয়ে যায়। কয়েকটা গাছ পেরিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। একটা শব্দ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা দুরু দুরু বুকে শব্দোৎস লক্ষ করে তাকাল। কিছুটা দূরে একজন লোক উবু হয়ে বসে আছে। সম্ভবত প্রস্রাব করছে। পদ্মজা প্রস্তুত হয় লোকটিকে পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু অগত্যা কারণে তার হাত কেঁপে উঠলো। সে কাউকে প্রাণে মারতে পারবে না। সেই সাহস হচ্ছে না। একটা খুন করেছে ভাবলেই তার গাঁ কেঁপে উঠে। সেদিনের খুনটা তার নিজের অজান্তেই হয়ে গিয়েছে। সে যেন ছিল অন্য এক পদ্মজা। সেই পদ্মজাকে সে নিজেও চিনতো না।

পদ্মজা অস্থির হয়ে কিছু একটা খোঁজে। লোকটা উঠে দাঁড়ায়। পদ্মজা দ্রুত একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। লোকটির মুখ অস্পষ্ট। অবয়ব শুধু স্পষ্ট। দুলকি চালে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে লুঙ্গি ও সোয়েটার পরা। মাথায় টুপিও রয়েছে। লোকটার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে না, সে টের পেয়েছে অন্য কারো উপস্থিতি। তবুও পদ্মজার নিঃশ্বাস আটকে যায়। সে রাম দা শক্ত করে ধরলো। লোকটি তার কাছে আসতেই সে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে মাথায় আঘাত করে। লোহার রাম দার এক পাশের আঘাতে লোকটি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। গোঙানির শব্দ করে, হাত পা ধাপড়াতে থাকলো। সেকেন্ড কয়েক পরই দেহ নিস্তেজ হয়ে যায়। পদ্মজার বুক ফুঁড়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। তবে লোকটাকে কাঁচা খেলোয়ার মনে হলো! এক আঘাতেই কুপোকাত! পদ্মজা একবার ভাবল,টর্চের আলোয় লোকটার মুখ দেখবে। তারপর মাথায় এলো,টর্চের আলো দেখে যদি ওত পাতা বিপদ তার উপস্থিতি টের পেয়ে এগিয়ে আসে! তাই আর টর্চ জ্বালাল না। সে নিথর দেহটিকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। বাতাসের সাঁ,সাঁ শব্দ,ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,আর অশরীরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা, আর রাতের অন্ধকার বার বার পদ্মজার গা হিম করে দিচ্ছে। পদ্মজা প্রমোদ গুণে নিজের মধ্যে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে। বড় বড় গাছপালা ফেলে সে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। সামনে কোনো বড় গাছ নেই। জঙ্গলের মাঝে এরকম খোলা জায়গা কেন? এতে কি কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে! একদমই খোলা তাও নয়। জংলি লতাপাতা রয়েছে। তবে একটু অন্যরকম। লতাপাতার মাঝে জোঁক বা কোনো বিষাক্ত জীব থাকতে পারে। বিপদের কথা ভেবেও পদ্মজা ঝুঁকি নিলো। সে পা বাড়াল সামনে। কয়েক কদম এগোতেই জুতা ভেদ করে কাঁটা ফুঁটে পায়ে! আঘাতে আবার আঘাত লেগেছে। ব্যথায় পদ্মজার কলিজা

যেন ছিঁড়ে যায়। সে কাঁটা বের করার চেষ্টা করে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল বেরোয়। রক্তজবা ঠোঁট দুটি জলে ভিজে যায়।

মৃদুল এদিকওদিক দেখে বলল, 'লিখন ভাই, চলো চইলা যাই।'

অসহনীয় যন্ত্রনায় লিখনের কপালে বিন্দু,বিন্দু ঘাম জমেছে। সেসবকে তোয়াক্কা করে সে বলল, 'পদ্মজার খোঁজ নিতে হবে আগে।'

মৃদুল বুঝতে পারছে না কি করবে সে! লিখনের হাত থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। দুপুরে সে পূর্ণার সাথে দেখা করতে মোড়ল বাড়িতে গিয়েছিল। পূর্ণা চোখমুখ ফুলে যা তা অবস্থা। অনেক কান্নাকাটি করে পদ্মজার জন্য। পূর্ণা আশঙ্কা করছে,তার বোন ভালো নেই। মৃদুলেরও তাই মনে হয়। সে যেতেই পূর্ণা ঝরঝর করে কাঁদতে থাকল। তখন লিখন শাহ আসে। তার শুটিং শেষের দিকে। সপ্তাহখানেক পর ঢাকা ফিরবে। তাই পূর্ণাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। পূর্ণাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে লিখন বিচলিত হয়ে পড়ে। তারপর প্রশ্ন করে বিস্তারিত জানতে পারে। লিখন,হাওলাদার বাড়িতে আসতে চাইলে,মৃদুল না করলো। সে বললো,ঢুকতে দিবে না। লিখন মৃদুলের কথা শুনে না। চলে আসে হাওলাদার বাড়িতে। পিছু পিছু আসে মৃদুল। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত দারোয়ান গেইটের ভেতরেই ঢুকতে দিল না লিখনকে। তখন মৃদুল, লিখনের সাথে পরিকল্পনা করলো, তারা বাড়ির পিছনের ভাঙা প্রাচীর পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকবে। লিখন প্রথম রাজি না হলেও,পরে রাজি হলো। সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পদ্মজার খোঁজ নেই কথাটা সে ভাবতেই পারছে না! এতো বয়সে এসেও সে একটা মেয়ের জন্য এতো ব্যকুল হয়ে পড়ছে! তাও বিবাহিত মেয়ে! এমন মেয়েকে ভালোবেসে ব্যকুল হওয়া তো সমাজের চোখে খারাপ। এই সমাজের জন্যই সে পদ্মজার থেকে নিজের এতো দূরত্ব রাখে। যাতে কোনো খারাপ কথা,কোনো দূর্নাম পদ্মজাকে ছুঁতে না পারে। পদ্মজা যেন অসুখী না হয়। সেই পদ্মজার নাকি চারদিন ধরে খোঁজ নেই! মৃদুল দেখা করতে চাইলে,তাও করতে দেয়া হচ্ছে না! লিখনের মাথার রগরগ দপদপ করতে থাকে। আঁধার নামতেই দুজনে হাওলাদার বাড়ির পিছনের ভাঙা প্রাচীর দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ে। বাড়ির পিছনে যে জঙ্গল,সেই জঙ্গলসহ পুরো বাড়ির সীমানা মিলিয়ে চারিদিকে গোল করে প্রাচীর দেয়া। তাই পিছনের প্রাচীর দিয়ে তারা আগে পশ্চিম দিকের জঙ্গলে পা রাখে। মৃদুল একবার মদনের সাথে পশ্চিম দিকে এসেছিল। একটা ঔষধি পাতা নিতে। তাই সে জানতো,এদিকে বড় বড় কাঁটা আছে। যা পথ রোধ করে। এজন্য সে রামদা নিয়ে এসেছে। যা লিখনের হাতে ছিল। লিখন অসাবধানবশত কাঁটার লতাপাতা কাটতে গিয়ে নিজের হাতে আঘাত করে বসে। ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে। গলগল করে বেরিয়ে আসে রক্ত। রক্তাক্ত হাত নিয়ে বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। মৃদুল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'ভাই, রক্ত তো বন্ধই হইতাছে না।'

'কী করা যায় বলোতো?'

'আসো চইলা যাই। বাজারে যাইবা। নয়তো ডাক্তারের বাড়িতে নিয়া যাব।'

'ব্যস্ত হয়ো না মৃদুল।'

লিখন এক জায়গায় বসল। তারা অন্দরমহলের বাম দিকে আছে। মৃদুলের হাত থেকে টর্চ নিয়ে লিখন চারিদিকে কিছু দেখল। তারপর বলল, 'ওইযে দেখা যাচ্ছে,ওই পাতাটা নিয়ে আসো।'

'আচ্ছা, ভাই।'

মৃদুল লিখনের দেখানো কয়েকটা পাতা নিয়ে আসে। তারপর কচলে নরম করে লিখনের ক্ষতস্থানে লাগায়। লিখন বলল, 'হয়েছে এবার। রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমরা চইলা যাইলেই পারতাম।'

'পদ্মজার খোঁজ না নিয়ে কীভাবে যাই?'

'পদ্মজা ভাবিরে এতো ভালোবাসো ভাই, অবাক করে আমারে।'

লিখন মুচকি হেসে বলল, 'এসব বলো না মৃদুল। এসব বলতে নেই।'
'সত্যি কথা কইতে ডর কীসের?'
লিখন ঠোঁটে হাসি রেখেই উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বিবাহিত নারী নিয়ে এসব বলতে নেই। সমাজ ভালো চোখে দেখে না।'
'সমাজরে আমি জুতা মারি।'
'তোমার বয়স বেড়েছে ঠিকই, জ্ঞান হয়নি।'বলতে বলতে লিখন অন্দরমহলের পিছনে এসে দাঁড়াল। গা হিম করা ঠান্ডা বইছে। তার পরনে শীতবস্ত্র নেই। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে সে। মৃদুল বলল, 'এই কথা আমার আম্মাও বলে।'
'এসব কথা বাদ দাও এখন। শুনো, আমরা বাড়ির সামনে যাব নাকি পিছন থেকেই কিছু করব?'লিখনের ভাবগতি বোঝা যাচ্ছে না। মৃদুল লিখনের দৃষ্টি অনুকরণ করে অন্দরমহলের দুই তলায় তাকাল। পদ্মজার ঘরের জানালার দিকে। প্রশ্ন করলো, 'পিছনে কী করার আছে?'
'পদ্মজার ঘরের জানালার পাশে রেইনট্রি গাছটা দেখেছো? গাছে উঠে উঁকি দিলেই পদ্মজাকে দেখা যাবে। কথা বলাও যাবে।'
'উঠতে পারো গাছে?'
'আরে পুরুষ মানুষ হয়েছি কীজন্যে?'
'তাইলে গাছে উঠমু আমরা?'
'একবার সামনে দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। তুমি যাও, গিয়ে দেখো ঢুকতে দেয় নাকি।'
মৃদুল মুখ কালো করে বললো, 'দিবে না। আবার অপমান হতে ইচ্ছা করতাছে না।'
'তাহলে চলো গাছে উঠি।'
মৃদুল চুল ঠিক করতে করতে গুরুতর ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি যহন কইছো, আমি যাবো।'
লিখন হাসলো। পূর্ণার মতোই মৃদুলের স্বভাব। পূর্ণাকে যে কারণে ভালো লাগে,ঠিক একই কারণে মৃদুলকেও ভালো লাগে। মৃদুল চলে যায়। লিখনের মাথাটা ব্যথা করছে। সে দু হাতে কপালের দু পাশ চেপে ধরে পদ্মজার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে ভাবে, একজন জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে এভাবে প্রাচীর ডিঙিয়ে,লুকিয়ে এক পাক্ষিক ভালোবাসার মানুষের খোঁজ নিতে আসাটাকে হয়তো কারো চোখে পাগলামি মনে হবে। কিন্তু তার চোখে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব! নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব! পদ্মজা ভালো আছে ভেবেই সে মানসিকভাবে ভালো থাকে। এ কথা ঠিক, পদ্মজার সাথে আমিরের এতো সুখ দেখে তার বুকে চিনচিন ব্যথা হয়। তবে এটাও ঠিক পদ্মজার সুখ দেখে সে শান্তিও পায়! বেঁচে থাকার মানসিক মনোবল পায়। আশা থাকে মনে, আছে! বেঁচে আছে পদ্মফুল! চাইলেই দূর থেকে দেখা যাবে। চাইলে কথা বলাও যাবে। কিন্তু যদি নাই বা থাকে? তবে-

মৃদুল এসে জানালো, 'শালার ব্যাঠা দুলাভাই নাই। কেউই নাই দরজার সামনে।'
লিখন বলল, 'তাহলে চলো। সামনে দিয়েই যাই। আমারও কেমন লাগছিল,এভাবে লুকিয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে... " লিখন হাসলো। ম্লান হাসি। সে এগিয়ে গেল। সাথে মৃদুল। দুজন অন্দরমহলে প্রবেশ করলো নির্বিঘ্নে। কোনো বাধা আসেনি। আমিনা সদর ঘরে বসে ছিলেন। তিনি লিখনকে দেখে বললেন, 'তুমি এইহানে কেরে আইছো?'
মৃদুল ঘরে ঢুকে বলল, 'ফুফুআম্মা,পদ্মজা ভাবি কই?'
আমিনা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুলের কাছে এসে আদুরে গলায় বললেন, 'কই আছিলি বাপ? তোর ফুপায় বকছে বইলা চইলা যাবি কেন? আমি তোর ফুফুআম্মা আছি না? তুই এইহানেই থাকবি। যতদিন ইচ্ছা থাকবি।'
মৃদুল কপালে ভাঁজ সৃষ্টি করে বলল, 'ধুর! বাদ দেও এসব কথা। তোমার জামাই একটা ইবলিশ। ইবলিশের ধারেকাছে মানুষদের থাকতে নাই।'
আমিনা মৃদুলের মুখ ছুঁয়ে বললেন, 'এমন কয় না বাপ।'
'আদর পরে কইরো। এখন কও তো পদ্মজা ভাবি কই?'

‘ঘরেই আছে।’

‘ভাবির কি শরীর ভালা আছে?’

আমিনা ক্ষণমুহূর্ত সময় নিয়ে লিখনকে দেখলেন। তারপর বললেন, ’হ ভালা।’

‘আচ্ছা, ফুফুআম্মা আমরা উপরে যাইতাছি।’

আমিনা লিখনের দিকে আঙ্গুল তাক করে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, ’এই ছেড়াও যাইবো?’

লিখন চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। পরপুরুষ হয়ে পদ্মজার মতো মেয়েকে দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না বোধহয়। মৃদুল তো এই বাড়ির আত্মীয়। সে গেলে সমস্যা নেই। মৃদুল কিছু বলার পূর্বে লিখন বলল, ’আমি এখানে বসি। তুমি যাও।’

‘না ভাই, তুমি আইয়ো।’

‘আরেএ, মৃদুল যাও তো।’

মৃদুল সিঁড়িতে পা রাখলো। আমিনা ভাবছেন,পদ্মজা তো ঘরেই আছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। এরকম সময়ে যদি পদ্মজার নিচে নেমে আসে? লিখনের সাথে কথা বলে! আর এ খবর কোনোভাবে খলিল হাওলাদারের কানে যায়। তবে তার রক্ষে নেই। তিনি উঁচুকণ্ঠে ডাকলেন, ‘মৃদুলরে?’

মৃদুল তাকালো। আমিনা জানেন না,পদ্মজা সত্যি যে ঘরে নেই। তিনি মিথ্যে ভেবে বললেন, ’পদ্মজায় তো ঘরে নাই।’

লিখন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো, ’কেন? কোথায় গিয়েছে?’

আমিনা নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, ’আমি কিতা কইতাম? গেছে কোনো কামে।’

মৃদুল সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসলো, ’ভাবি একলা গেছে?’

আমিনা আরেকটা মিথ্যা বললেন, ’না,একলা যায় নাই। আমিরের লগে গেছে?’

মৃদুল উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো, ’আমির ভাই বাড়িত আছিলো? আমি যে দেহি নাই। ভাবছি,জরুরি কোনো কামে ঢাকাত গেছে।আচ্ছা,ফুফুআম্মা অন্দরমহল নজরবন্দিতে আছিলো কেন? আমারে ঢুকতে দিতো না।’

আমিনা তৃতীয়বারের মতো মিথ্যে বললেন, ’আমির তো ঢাকাতই গেছিলো। কাইল রাইতে আইছে। আমির নাই এজন্যে পদ্মজার-‘

লিখন কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ’বুঝতে পেরেছি। সিকিউরিটি মানে নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছিল। আমি আছিতো গ্রামে! আমির হাওলাদার খুব ভালোবাসেন পদ্মজাকে!’শেষ শব্দ তিনটি লিখন জোরপূর্বক হেসে বলল। তার চোখের মণি চিকচিক করছে। মৃদুল আফসোস করে বললো, ’ধুর,দেখা হইলো না।’

‘আসি চাচি।’বললো লিখন।

মৃদুল,লিখন বেরিয়ে আসে। মৃদুল বললো, ’পদ্মজা ভাবির চিঠি দেখে তো মনে হয় নাই এতো সহজ ব্যপার।’

‘হু। পদ্মজা একটা রহস্যময়ী, মায়াময়ী। তাই বোধহয় রহস্য রেখে চিঠি লিখেছে। আর, মিস্টার আমির যেহেতু এখন সাথে আছে নিশ্চয় পদ্মজা ভালো আছে।’

মৃদুল গভীর মগ্ন হয়ে কিছু ভাবছে। সে লিখনের কথার জবাবে বললো, ‘উমম।’

‘তবুও, আগামীকাল পদ্মজা পূর্ণার সাথে যোগাযোগ না করলে আমরা আবার আসব না হয়।’

মৃদুল লাফিয়ে উঠে বলল, ’এটাই ভাবছিলাম।’

লিখনের হাতের রক্তপড়া বন্ধ হলেও খুব ব্যথা হচ্ছে। তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মৃদুল বললো, ’ভাই,সাইকেল নিয়া আসি। এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া ঠিক হইব না।’

লিখনও সায় দিল। মৃদুল আলগ ঘর থেকে সাইকেল নিয়ে আসে। মৃদুল সামনে, লিখন পিছনে বসলো। তাদেরকে দারোয়ান দেখে অবাক হয়। তবে বেশিকিছু বলতে পারেনি,মৃদুল হুমকি-ধামকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে লিখন অনুভব করলো,তার বুকের সূক্ষ্ম ব্যথাটা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। সে একবার ঘুরে তাকাল হাওলাদার বাড়ির গেইটের

দিকে! খ্যাতিমান, সুদর্শন, ধনী লিখন শাহ, যে সবসময় ঠোঁটে প্লাস্টিকের হাসি ঝুলিয়ে রাখে তাকে দেখে সবার কত সুখী মনে হয়! কত যুবক স্বপ্ন দেখে লিখন শাহর অবস্থানে আসার! কিন্তু তারা কী কখনো জানবে, লিখন শাহ সর্বক্ষণ বুকের ভেতর বিষাক্ত সূচ নিয়ে হাসে। যে সূচের তীব্রতা তাকে এক মুহূর্তও শান্তি দেয় না।

পদ্মজা চারিদিকে হাঁটছে। কিন্তু চোখে পড়ার মতো কিছু পাচ্ছে না। কী এমন আছে এখানে? যা পাহারা দেয়ার জন্য কেউ না কেউ থাকে। কিছুই তো নজরে আসছে না। পদ্মজা জংলি লতাপাতার উপর হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে আসে। শিশিরের জলে পায়ের তালু থেকে হাঁটু অবধি ভিজে গিয়েছে। পা জোড়া ঠান্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম। থেকে থেকে কাছে কোথাও শেয়াল ডাকছে। পদ্মজার বুক ধুকপুক,ধুকপুক করছে।

মনে হচ্ছে,কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে। ছিঁড়ে খাবে দেহ! ভাবতেই,পদ্মজার গা শিউরে উঠলো। সে ঢোক গিলল। তারপর আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। আয়তুল কুরসি যতবার সে পড়ে,ততবার নিজের মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করে। ভরসা পায়। এই মুহূর্তেও তার ব্যক্তিক্রম হয়নি। সে সামনে এগোতে এগোতে একসময় আবিষ্কার করলো,তার পায়ের নিচে মাটির বদলে অন্যকিছু আছে! চকিতে পদ্মজার মস্তিষ্ক চারগুণ গতিতে সচল হয়ে উঠলো। সে পায়ের নিচের লতাপাতা সরাতে গিয়ে দেখল, এই লতাপাতাগুলোর শেকড় নেই! পদ্মজা দ্রুতগতিতে সব লতাপাতা সরালো। তখনই আবছা আলোয় চোখে ভেসে উঠলো,লোহার মেঝে! পদ্মজার মুখে একটি গাঢ় বিস্ময়ের ছাপ প্রতীয়মান হয়ে উঠলো। তার উত্তেজনা বেড়ে যায়। শীতল শরীর উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করলো। লোহার মেঝেটা খুব একটা বড় নয়। পদ্মজা টর্চ জ্বালায়। খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে দেখে। এক পাশে ছিদ্র রয়েছে। মনে হচ্ছে,এখানে চাবি ব্যবহৃত হয়! চকিতে পদ্মজার মাথায় এলো,আলমগীরের দেয়া চাবিটার কথা। সে দ্রুত পেটিকোটের দুই ভাঁজ থেকে চাবিটি বের করলো। প্রবল উত্তেজনায় তার হাত মৃদু কাঁপছে। বিসমিল্লাহ বলে,চাবি ছিদ্রে প্রবেশ করালো। এবং কাজও করে! পদ্মজা বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে পড়ে! কী হতে চলেছে? সে লোহার এই অংশটি দুই হাতে তোলার চেষ্টা করলো। যতটা ভারী ভেবেছিল,ততটা নয়! পদ্মজা লোহার ভাবলেও,এটা বোধহয় লোহার নয়। ধীরে ধীরে পদ্মজা আবিষ্কার করলো,এটি একটা দরজা,গুপ্ত কোনো ঘরের দরজা। সে আতঙ্কে হিম হয়ে যায়। নিচের দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। পদ্মজা তার কাঁপতে থাকা পা এগিয়ে দেয় ভেতরে। সে ভয় পাচ্ছে না তা নয়! খুব ভয় হচ্ছে। এমন আচানক ঘটনার সম্মূখীন তো আগে হয়নি। সিঁড়ি ভেঙ্গে সে অনেক দূর অবধি নেমে আসে। ভীষণ ঠান্ডা এদিকে। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন! কোনো রূপকথার গল্পের রাক্ষসপুরীতে চলে এসেছে! চোখের সামনে ভেসে উঠে আরেকটি দরজা। এই দরজাটি অদ্ভুত ধরণের। তাদের ঢাকার বাড়িতে হুবুহু একইরকম দরজা আছে! এই দরজার আড়ালে যাই হয়ে যাক বাইরে শব্দ আসে না! পদ্মজা অস্পষ্ট একটা সন্দেহে বিভোর হয়ে উঠে। এই দরজাটি খুলতে আলমগীরের দেয়া চাবিটাই কাজ করে! পদ্মজা চাবিতে চুমু খায়। এতো গুরুত্বপূর্ণ চাবি আলমগীর তাকে দিল কেন? এসব ভাবার সময় এখন নয়। বাকিটুকু তাকে দেখতে হবে। দরজা খুলে অন্য একটি অংশে প্রবেশ করতেই মুখে তীব্র আলো ধাক্কা খেল। পদ্মজা কপাল কুঁচকে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আলোর গতিবেগ রোধ করে মুখে অস্ফুট বিরক্তিসূচক শব্দ করলো। তারপর ধীরে ধীরে পিটপিট করে তাকালো। চারিদিকে রঙ-বেরঙের বাতি জ্বলছে। এই বাতিগুলোও তার চেনা। তাদের বাড়িতে আছে। যখন বিদ্যুত থাকে না,ব্যাটারিচালিত এই বাতিগুলো পুরো বাড়ি আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুলে! দুইদিকে আরো দুটো দরজা। প্রথম দরজাটিতে লেখা'স্বাগতম'। দ্বিতীয়টিতে লেখা'ধ-রক্ত।'রুম্পা তো এমন কিছুই বলেছিল! পদ্মজা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। দ্বিতীয় দরজাটির দিকে হেঁটে আসে। এটার কোনো তালা নেই। তাহলে খুলবে কী করে? পদ্মজা ধাক্কা দিল। সাথে সাথে খুলেও গেল। পদ্মজার মুখ হা হয়ে যায়। তার ঠোঁট বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় এসেছে সে! আর কি ফিরতে পারবে নিজের ঘরে? আচমকা

পদ্মজার কানে ভেসে আসে মেয়েদের কান্নার চিৎকার! পদ্মজার রক্ত হিম হয়ে যায়। এরকম একটা জায়গায় এতোগুলো মেয়ে কেন কাঁদছে? কত কষ্ট,যন্ত্রণা সেই কান্নায়! কান্নার বেগ বাড়ছে। যেন কেউ বিরতিহীনভাবে আঘাত করছে। পদ্মজা দুই হাতে ছুরি ও রাম দা শক্ত করে ধরলো। তারপর সেই কান্না অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো সামনে। যত এগুচ্ছে কান্নাগুলো তীব্র ধাক্কা দিচ্ছে বুকে। পদ্মজার নিঃশ্বাস আটকে আছে। সে চলে এসেছে খুব কাছে। চোখের সামনে আরেকটা ঘরের দরজা। দরজাটি একটু খোলা। সে সাবধানে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর তাকালো। আর ঠিক তখনই তার পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু অবধি শিরশির করে উঠলো। চোখের সামনে দেখা দৃশ্যটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। মনে হচ্ছে জায়গায় জমে গেছে সে। বিবস্ত্র অবস্থায় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে হাতজোড় করে কাঁপছে,কাঁদছে। তাদের শরীর রক্তাক্ত। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা শ্যামবর্ণের দেহ। গায়ে শার্ট নেই। প্যান্ট নেমে এসেছে নাভির অনেক নিচ অবধি। তার হাতে বেল্ট! সম্ভবত বেল্ট দিয়েই,মেয়েগুলোকে আঘাত করছিল! প্রশস্ত ও তুষ্টপুষ্ট শরীরের গড়নের মানুষটিকে চিনতে পেরে পদ্মজার বুকের পাঁজর টনটন করে উঠল। তার হাত থেকে পড়ে যায় ছুরি ও রাম দা। বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ অনুসরণ করে উপস্থিতি মানুষগুলোর চোখ পড়ে দরজার দিকে। পদ্মজা ধপ করে বসে পড়ে মাটিতে। শরীরের সবটুকু শক্তি নিমিষেই কে যেন চুষে নিয়েছে! পদ্মজাকে দেখে মানুষটির চোখ হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলজ্বল করে উঠে। কপালের শিরা ভেসে উঠে,হিংস্র চাহনি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। সে ভাবতেই পারছে না, পদ্মজা এত দূর চলে এসেছে! পদ্মজা বিস্ময়ভরা ছলছল চোখ দুটি সেই মানুষটার দিকে তাক করে অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘ছিঃ!

বিছানার উপর কাঁথা মোড়ানো ফরিনার দূর্বল দেহটা শুয়ে আছে। বিদ্যুত নেই। ঘরের এক কোণে লণ্ঠন জ্বলছে। ফরিনার চোখ বোজা। লতিফা পায়ে পায়ে হেঁটে এসে নিঃশব্দে ফরিনার শিয়রে দাঁড়াল। ক্ষীণস্বরে ডাকলো, 'খালাম্মা ঘুমাইছেন?'

ফরিনা ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। চোখের দৃষ্টি ঘোলা। কিছু মুহূর্তের ব্যবধানে বয়সের তুলনায় একটু বেশিই যেন বয়স্ক দেখাচ্ছে। ফরিনা কিছু একটা বললেন। লতিফা বুঝলো না। সে নত হয়ে ফরিনার মুখের কাছে নিজের মুখ এনে বললো, 'কী কইছেন খালাম্মা?'

ফরিনা দূর্বল গলায় নিম্নস্বরে বললেন, 'পদ্মজা কই?'

'আপনের ঘরে না আইলো দেখলাম।'

'ঘুম থাইকা উইঠা তো দেহি নাই।'ফরিনা থামলেন। তারপর বললেন, 'এহন কই?'

'মনে কয় ঘরে আছে। ডাইকা দিমু?'

'না, থাকুক।'

'খাইবেন কিছু?'

'না। আরেকটা কেঁথা দে।'

লতিফা আলমারি থেকে লেপ বের করলো। তারপর ফরিনার গায়ের উপর দিল। আর বললো, 'অনেক ঠান্ডা পড়ছে খালাম্মা। কাঁথা দিয়া হইবো না।'

ফরিনা লতিফার সাথে আর কথা বাড়ালেন না। তিনি জানালার বাইরে চোখ রাখেন। রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর শীতল হাওয়া সাঁ,সাঁ করে ঘরের ভেতর ঢুকছে। তিনি আকাশের গায়ে বাবুর ছোটবেলার মুখটা দেখতে পেলেন। যখন বাবুর জন্ম হলো, আমিনা কপাল কুঁচকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেড়ায় তো সত্যি কালা হইছে। আমি ঠিকই কইছিলাম।'

আমিনার কথা শুনে ফরিনার বিন্দুমাত্র রাগ হয়নি। বাবুর নিষ্পাপ মুখটা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। সারা মুখে গুচ্ছ গুচ্ছ মায়া। এই মায়াময় শ্যামবর্ণের মুখ দেখে তিনি যেন পিছনের সব কষ্ট ধামাচাপা দিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আদর করে কোলে নিয়ে ডেকেছিলেন, 'আমার বাবু।'

মায়াময় এক রত্তি বাবুর নামকরণ হয় আমির হাওলাদার। ধীরে ধীরে বড় হয় আমির। মায়ের চুলের বেণি করে দেয়া ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। মায়ের হাতে তিন বেলা না খেলে পেটই ভরতো না। কতশত আবদার ছিল তার! আম্মা,আম্মা করে বাড়ি মাথায় তুলে রাখতো। যতবার আম্মা ডাকতো ততবার বোধহয় নিঃশ্বাসও নিতো না। ছোট থেকেই আমির স্বাস্থ্যবান,তেজি। বাবা-মায়ের আদরের একমাত্র ছেলে ছিল। যখন আমিরের বয়স চৌদ্ধ,তখন সে ফরিনাকে কোলে নিয়ে পুরো বাড়ি ঘুরেছে! ফরিনা সেদিন আবেগে আপ্লুত হয়ে ছেলেকে বকেছেন,উচ্চস্বরে হেসেছেন। জীবনে স্বর্গীয় সুখ নিয়ে এসেছিল আমির। পিছনের কথা ভেবে, ফরিনার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠলো। চোখ দুটি ভিজে উঠে জলে। এই বয়সে এসে স্মৃতির নরকীয় যন্ত্রণা হজম করা খুব কষ্টের। কম তো বয়স হলো না। পঞ্চাশের ঘরে পড়েছেন। ফরিনার চোখের দেয়াল টপকে উপচে পড়ছে নোনা জল। সেই জল দেখে লতিফা বিচলিত হয়ে উঠলো, 'খালাম্মা,ও খালাম্মা। কান্দেন কেন?'

ফরিনা ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকালেন। ভেজা কণ্ঠে বললেন, 'তুই যা লুতু।'

লতিফা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ পর বললো, 'পদ্মরে কিছু কইয়েন না খালাম্মা। কষ্টে মইরা যাইব। ছেড়িডা ভালা আছে। ভালাই থাহক। মা-বাপ নাই।'

ফরিনা লতিফার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুই সব জানতি লুতু?'

লতিফা মাথা নত করে বলল, 'হ।'

ফরিনা হিংস্র সিংহীর মতো গর্জে উঠে বললেন, 'আমারে আগে কইলি না কেন তুই? আমার বাবু কেমনে আমার হাত থাইকা ছুইটা গেলো? বাপের রক্ত কেমনে পাইলো?'

ফরিনা কাশতে থাকলেন। উত্তেজিত হওয়াতে শরীরের হাড়ে,হাড়ে তীব্র ব্যথা অনুভব

হচ্ছে। কেউ যেন কাঁটাচামচ দিয়ে একটার পর একটা ঘা দিচ্ছে। লতিফা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'খালাম্মা,আপনি চিল্লাইয়েন না। আপনের ক্ষতি হইবো।'

ফরিনা শ্বাসকষ্ট রোগীর মতো ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'আমার ক্ষতি হওনের আর কী আছেরে লুতু!'

লতিফা ভয় পেয়ে যায়। ফরিনা বিরতিহীন ভাবে কাশছেন। যেন শ্বাস নিতে পারছেন না। সে দৌড়ে দুই তলায় ছুটে যায় পদ্মজাকে আনতে। ফরিনা ছাদের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে হা করে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলেন। মনে হচ্ছে দম গলায় এসে আটকে গেছে। তিনি শূন্য! একেবারে ফাঁকা কোল! মজিদ হাওলাদার নামক নরপিশাচ তার নিষ্পাপ বাবুকে খুন করে,নিষ্পাপ বাবুর মনকে খুন করে বাঁচিয়ে রেখেছে হিংস্র আমিরকে! হাওলাদার বাড়ির রক্ত থেকে তিনি তার বাবুকে পরিষ্কার রাখতে পারেননি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলে আসা পাপের পাহাড় আমির যেন কয়েক বছরে কয়েকগুণ বড় করে তুলেছে! একজন দুঃখী মায়ের শেষ সম্বল হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে ভালোবাসারা,চলছে শুধু অভিনয়! যার কাছেই সেই অভিনয় ধরা পড়বে,তার জায়গা বন্দি ঘরে নয়তো কবরে।

বাতাসটাতে বোধহয় প্রকৃতি বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। পদ্মজার বুক জ্বলছে। বুকের ভেতরটা তীব্র দহনে পুড়ে যাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি তারই ভালোবাসার স্বামী! আমির হাওলাদার! আমিরের হিংস্র চোখ দুটি শিথিল হয়ে ভয়ে, আতঙ্কে জমে যায়। মস্তিষ্ক মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায়। হুট করে পদ্মজাকে দেখে তার চোখ দুটি স্বভাবসুলভ কারণে জ্বলজ্বল করে উঠে। যা হিংস্র দেখায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত গতিতে লাফাচ্ছে! হাত থেকে বেল্ট পড়ে যায়। আড়চোখে বিবস্ত্র মেয়েগুলোকে একবার দেখে,তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। এ কোন সময়ে পদ্মজার উপস্থিতি! পদ্মজার গাল বেয়ে জল মেঝেতে পড়ে। আমির দ্রুত পায়ে পদ্মজার কাছে আসে। পদ্মজাকে ছুঁতেই পদ্মজা ছ্যাত করে উঠল। ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় আমিরের দিকে। আমির জোর করে পদ্মজাকে তুললো। পদ্মজা জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো। সে দুই হাতে ধাক্কা দেয় আমিরকে। কিন্তু এক চুলও দূরে সরাতে পারেনি। আমির পদ্মজা দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে নিজের এক হাতে চেপে ধরে। অন্য হাতে পদ্মজার মাথা বুকের সাথে চেপে ধরে বললো, 'কিছু দেখোনি তুমি।'

তারপর উচ্চস্বরে কাউকে ডাকলো, 'আরভিদ,আরভিদ! দ্রুত মেয়েগুলোকে ঢেকে দাও।'

আমিরের ডাক শুনে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে একজন দৌড়ে আসে। দেখতে শ্বেতাঙ্গদের মতো। লাল চুল। তার হাতে কাপড়। সে দরজা পেরিয়ে মেয়েগুলোকে ঢেকে দিতে যায়। পদ্মজা কপাল দিয়ে আমিরের বুকে আঘাত করে আর্তনাদ করে বললো, 'ছাড়ুন আমাকে। আমার ঘেন্না হচ্ছে আপনাকে। কত নিকৃষ্ট আপনি!'

আমির বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। আচমকা ঘটনায় সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। পদ্মজা ধ্বস্তাধস্তি শুরু করে। তার সারা শরীরে যেন পোকারা কিলবিল করছে। মেয়েগুলোর মধ্য থেকে একজন মেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললো, 'আপা আমরারে বাঁচান। এই লোকটা আমারারে মাইরা ফেলব।'

আরভিদ নামের শ্বেতাঙ্গ লোকটি চোখের পলকে মেয়েটির গালে থাপ্পড় বসালো। মেয়েটি আম্মা বলে কেঁদে উঠে। পদ্মজার বুকের হাড়ে,হাড়ে কাঁপন ধরে। এসব কী হচ্ছে! কেন হচ্ছে! সব দুঃস্বপ্ন হয়ে যাক! হয়ে যাক! পদ্মজা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ছাড়ুন আমাকে।'

আরভিদের থেকে পাওয়া কাপড়ের একটু অংশ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে, একটা মেয়ে পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজাকে দেখে মেয়েটার মনে হচ্ছে এই মানুষটা ভালো। এখানের সবার মতো খারাপ না। তাই সে অনুরোধ করে বললো, 'আমাদের বাঁচান আপা। আমাদের অনেক মারে ওরা।'

আমির কিছুতেই পদ্মজাকে হটাতে পারছে না। যেন জায়গায় জমে আছে। মেয়েটির কথা শুনে আমিরের মাথার রক্ত টগবগ করে উঠে। সে তার রক্তচক্ষু দিয়ে ভয় দেখালো। আরভিদ মেয়েটির পেট বরাবর লাথি মারে। মেয়েটি কুঁকিয়ে উঠে কাপড়ের অংশ থেকে দূরে সরে গিয়ে দেয়ালের সাথে গিয়ে ধাক্কা খেলো। নগ্ন দেহটি দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়েই মেঝেতে পড়ে গুটিয়ে যায়। সেই গুটিয়ে যাওয়া দেহটির উপরই আরভিদ আরেকটা লাথি বসায়। মেয়েটা চিৎকার অবধি করতে পারলো না! নির্মম,পাশবিক অত্যাচার পদ্মজাকে হিংস্র করে তুললো। সে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে আমিরকে দূরে সরিয়ে দিল। আমিরের খেয়াল ছিল মেয়েগুলোর দিকে, তাই সহজেই ছিটকে যায়। পদ্মজা মেঝে থেকে তুলে নিলো ছুরি। আরভিদ কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই পদ্মজা তেড়ে এসে মুখ দিয়ে অদ্ভুত উচ্চারণ করে আরভিদকে আঘাত করলো। আরভিদের পরনে ঘন জ্যাকেট ছিল। তাই তার বেশি আঘাত লাগেনি।তবে সে আকস্মিক আক্রমণে ঘাবড়ে যায়। পদ্মজাকে আঘাত করতে চায়,আমির চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরভিদ, থামো।'

আরভিদ থামলেও পদ্মজা থামলো না। সে আবার আঘাত করতে উদ্যত হয়, ধরে ফেললো আমির। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনীর মতো ফোঁস,ফোঁস করতে থাকে। তার শরীর কাঁপছে ক্রোধে। পদ্মজার রাগ দেখে আমির প্রচণ্ড অবাক হয়। পদ্মজার রাগ সে কোনোদিন দেখেনি! ফ্রান্স থেকে তারা অনেক যন্ত্রপাতি আনে। তার মধ্যে একটি পদ্মজার হাতের ছুরি। যে ছুরির ধার বিষের চেয়েও ধারালো। সে ছুরি পদ্মজার হাতে! আমির জোরদবস্তি করে পদ্মজার হাত থেকে ছুরি ফেলে দিলো। মেয়েগুলো ভয়ে কাঁপছে। তারা এখন পদ্মজাকেও ভয় পাচ্ছে। এতো সুন্দর মেয়ের তেজি রূপ দেখে মনে হচ্ছে, হাজার বছর ধরে যুবতিদের রক্ত দিয়ে গোসল করে সৌন্দর্য রক্ষা করা এক ভয়ংকর সুন্দরী ডাইনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমির পদ্মজাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। পদ্মজা হাত পা ছুটাছুটি করছে। চিৎকার করছে। দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন লোক। তার চুলগুলো মেয়েদের মতোন অনেক লম্বা,তবে ফর্সা। এতো চেঁচামিচি শুনেও ভেতরে যায়নি। কারণ, আমির না বললে তারা এক পাও নড়ে না। আমির পদ্মজার সাথে ধ্বস্তাধস্তি করতে করতে বললো, 'মেয়েগুলোকে সামলাও,দ্রুত যাও। আরভিদকে সাহায্য করো।'

লোকটি আমিরের আদেশমতো চলে গেলো। পদ্মজা নিজের কান দুটি বিশ্বাস করতে পারে না। তার স্বামীর কণ্ঠে এ কি শুনছে সে! বুকের জ্বালাপোড়া বেড়ে চলেছে। মরে যেতে ইচ্ছে করছে তার! আমির পদ্মজাকে একটা ঘরে নিয়ে আসে। পদ্মজা নিজের মধ্যে নেই। সে কিড়মিড় করছে,কাঁদছে। আমির পদ্মজাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দ্রুত চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেললো। তখন পদ্মজার সুযোগ ছিলো আমিরকে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা করার। কিন্তু সে পারেনি! সে কার থেকে পালাবে? নিজের স্বামীর থেকে? যাকে সে ভালোবাসে। যে মানুষটা তাকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। খাইয়ে দেয়। শতশত আবদার পূরণ করে! পদ্মজা ডুকরে কেঁদে উঠলো। এক হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি মেনে নিতে পারছি না।'

আমির পদ্মজার চেয়ে কিছুটা দূরে চেয়ার নিয়ে বসলো। তার চোখেমুখে আতঙ্ক! সে চেয়ে রইলো পদ্মজার দিকে। পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। আমিরের চোখে চোখ পড়ে। সে ঠোঁট দুটি ভেঙে কেঁদে বললো, 'আপনি আমাকে বাঁধতে পারলেন?'

আমির কিছু বললো না। পদ্মজা বললো, 'আপনি ওভাবে মেয়েগুলোকে মারতেও পারলেন?'

আমির আগের অবস্থানেই রইলো। পদ্মজা নাক টেনে বললো, 'এতো খারাপ আপনি? এতো বেশি! মেয়েগুলোকে কেন মারছিলেন?'

আমির শুধু চেয়েই আছে। পদ্মজা বললো, 'এতো নিষ্ঠুর আপনি? সব দুঃস্বপ্ন হতে পারে না?'

আমির পদ্মজার প্রশ্ন উপেক্ষা করে বললো, 'রিদওয়ান কোথায়?'

পদ্মজা কান্না থামিয়ে হাসলো। ধারালো সেই হাসি। ঠোঁটে হাসি রেখেই বললো, 'আমাকে পাহারা দিতে রেখেছিলেন? মারতেও কি বলেছিলেন?'

'যা বলছি উত্তর দাও।'

পদ্মজা সেকেন্ড কয়েক আমিরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, 'মেরে দিয়েছি।'

আমির চমকে উঠলো, 'কি!'

'মরেনি। হাসপাতাল আছে।'

আবারও পিনপতন নীরবতা। পদ্মজা আমিরকে দেখছে। যে মুখে মায়া ছাড়া কিছু দেখতো না সে,আজ সে মুখটাই চিনছে না। বুকের ভেতরটা কেমন করছে! আল্লাহ যেন বুকের ভেতর জাহান্নামের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পদ্মজার মস্তিষ্কের সব প্রশ্ন উধাও হয়ে গিয়েছে। শুধু দেখছে আমিরকে, ভাবছে আমিরকে নিয়ে। পদ্মজা ম্লান হেসে জানতে চাইলো, 'এখন কী করবেন আমাকে নিয়ে? বুকে ছুরি চালাবেন? নাকি রাম দা? মারার জন্য আর কিছু কি আছে?'

আমির নিশ্চুপ। সে নিজেও জানে না সে কী করবে! পদ্মজা বললো, 'পশুরা কাউকে ভালোবাসে?'

আমির মুখ খুললো, 'বাসে বোধহয়।'

পদ্মজা হাসলো। হাসতে হাসতে চেয়ারে হেলান দিল। তারপর আবার সোজা হয়ে বসলো। গুরুতর ভঙ্গিতে বললো, 'মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন।'

'অসম্ভব।'

'আমি ঠিক ছাড়িয়ে নেব।'

'আর কিছু করো না।'

'কী করবেন? খুনই তো।'

'একটু ভয়ডর ঢুকাও মনে।'

'বিশ্বাস করুন, আপনার বুকে ছুরি চালাতে আমার খুব কষ্ট হবে।'

আমির চকিতে তাকালো। পদ্মজা কথাটা বলে কাঁপতে থাকলো। নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! কী বলাচ্ছে! এই কথাটা সে মন থেকে বলেনি। সে কিছুতেই এমন কথা বলেনি! আমির নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'ভালোই তো ছিলাম আমরা!'

'মুখোশধারীর সাথে আবার ভালো থাকা!'

'একদম মায়ের মতো হয়েছো।'

'নিঁখুত অভিনেতা!'

'বাধ্য হয়ে।'

'কে করেছে বাধ্য আপনাকে?'

'তোমার আদর্শ। তোমার পবিত্রতা।'

'আপনি কলুষিত করেছেন।'

'বিয়ে করেছি।'

'কেন করেছেন? ভোগ করে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিতেন। তাহলে ভালোবেসে আজকের নরকীয় যন্ত্রণাটা সহ্য করতে হতো না।'

'সব ভুলে যাও। রানির হালে থাকবে।'আমিরের কণ্ঠে জোর নেই। সে পদ্মজাকে চিনে। পদ্মজাকে সে এতদিন অন্ধকারে রাখলেও, পদ্মজা তাকে আলোতে রেখেছিল। সেই আলো দিয়ে আমির চিনতে পেরেছে পদ্মজাকে। পদ্মজা অন্যায় মেনে নেয়ার মেয়ে নয়। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। আজও পদ্মজা জানতে পারতো না কিছু, যদি সে ঝড়ের কবলে না পড়তো! গুটি ওলটপালট হয়ে গেছে! এরেই বোধহয় বলে চোরের দশদিন,গৃহস্থের একদিন।

পদ্মজা ছলছল চোখে আমিরকে দেখে। সে চোখের সামনে সবকিছু দেখেও যেন

বিশ্বাস করতে পারছে না। সর্বাঙ্গে যে কষ্টটা হচ্ছে,শরীর থেকে রুহ বের হয়ে যাওয়ার সময়ও বোধহয় তেমন কষ্ট হয় না। পদ্মজা ঝরঝর করে কেঁদে দিল। এ কেমন নিয়তি তার! যতক্ষণ সে সামনে থাকে ততক্ষণ প্রেমের কথা বলা মানুষটা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে ঠান্ডা মাথায় ভাবছে,তাকে নিয়ে এখন কী করা যায়! পদ্মজা তার হাতের চুড়িগুলো দিকে তাকালো। চুড়ি দুটো তার মায়ের। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে! এই পৃথিবীতে তার একমাত্র ছায়া,একমাত্র ভরসার স্থান ছিল তার মা! মা মারা গেল। তারপর সেই স্থানটা পরিবর্তন হলো আমিরের নামে। সেই মানুষটার রূপ এভাবে গিরগিটির মতো পাল্টে গেল! না,পাল্টে যায়নি। এমনই ছিল। শুধু মুখোশ পরে ছিল। ছদ্মবেশী!

মেয়েগুলোর চিৎকার ভেসে আসে। তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে খুব। কিছু একটা দিয়ে পিটাচ্ছে,ফ্যাচফ্যাচ শব্দ হচ্ছে। কোন বাবা-মায়ের চোখের মণিদের এভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে! পদ্মজা চিৎকারগুলোকে ইঙ্গিত করে বললো, 'আপনার কষ্ট হয় না? একটুও হয় না?

আমিরের ভাবান্তর হলো না। সে চিন্তায় মগ্ন। তার ছক উল্টে গেছে। এমন এক জায়গা এসে ছক উল্টেছে যে আর ঠিক করার উপায় নেই। নতুন করে সাজালে সেখান থেকে হয় পদ্মজা নয় এতো বছরের পাপের সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে হবে! তুখোড় আমির মনে মনে পরিকল্পনা করলো, আপাতত,যে কাজের জন্য তার ছুটে আসতে হয়েছে অলন্দপুরে সে কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। এই চাপটা মাথার উপর থেকে গেলে তারপর অন্যকিছু। কয়টা দিন পদ্মজাকে নজরে রাখতে হবে। কিন্তু যদি,সেই কাজ করার পথেই পদ্মজা দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়!

পদ্মজা চেয়ার থেকে ছুটতে চাইছে। ছটফট করছে। সে আমিরকে অনুরোধ করলো, 'শুনছেন আপনি, ওদের মারতে নিষেধ করুন। আপনার বুক কাঁপছে না? ওদের কান্না অনুভব করুন। ওদের কষ্ট হচ্ছে অনেক। পুরো...পুরো শরীরে রক্ত ছিল। তার উপর আবার মারছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

আমির চুপ করে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। তার চোখের পলক পড়ছে না। চাইলেও আর অজুহাত দেয়া সম্ভব নয়। অজুহাত দেয়ার মতো কিছু নেই। এবার যা হবে সরাসরি হবে। পদ্মজার কান্না বেড়ে যায়। পদ্মজা কি মেয়েগুলোর জন্য কাঁদছে নাকি নিজের স্বামীর সমর্থনে মেয়েগুলো অত্যাচারিত হচ্ছে বলে কাঁদছে? কে জানে।

পর্ব ৬৪

সময় নিজের গতিতে ছুটতে,ছুটতে মাঝরাত অবধি চলে এসেছে। সেই তখন থেকে আমির পাথরের মতো বসে আছে। কথাও বলছে না,যাচ্ছেও না। পদ্মজা হাজারটা প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তার গলা শুকিয়ে গেছে। আমির মাঝে শুধু একটা অনুরোধ রেখেছে পদ্মজার। পদ্মজা বলেছিল, সে যে আমিরের কাছে আছে সেটা যেন ফরিনাকে জানানো হয়। তিনি খুব অসুস্থ। চিন্তা করবেন। আমির পদ্মজার এই অনুরোধ রাখে। তবে ফরিনা এতো অসুস্থ শুনেও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। ঘন্টা দুয়েক পূর্বে আচমকা মেয়েগুলোর কান্না,আর্তনাদ বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েগুলোকে কেন এভাবে মারা হচ্ছে তাও আন্দাজ করতে পারছে না পদ্মজা। একবার মনে উঁকি দিয়েছিল, নারী পাচারের কথা। কিন্তু সেই সন্দেহ ধরে রাখতে পারলো না। কারণ, পাচার করার উদ্দেশ্যে থাকলে এভাবে মারতো না। পাশবিক নির্যাতন করতো না। এছাড়া সে এটাও আন্দাজ করতে পারছে না এতো রহস্যের উদ্দেশ্য কী? শুধু এতটুকু বুঝতে পারছে, তার দেখা সব খারাপের গুরু তার স্বামী! পদ্মজা তার ক্লান্ত ঘোলা চোখ দুটি আমিরের দিকে তাক করে দূর্বল কণ্ঠে বললো, 'এভাবেই বেঁধে রাখবেন? মেরে ফেলার পরিকল্পনা থাকলে মেরে ফেলুন না।'

পদ্মজা ভেবেছিল আমির বোধহয় উত্তর দিবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে আমির বললো, 'তোমার কেন মনে হচ্ছে তোমাকে মেরে ফেলা হবে?'

'কেন? কখনো কাউকে খুন করেননি? অভিজ্ঞতা নেই?'তাচ্ছিল্যের সাথে বললো পদ্মজা।

আমির শান্ত স্বরে বললো, 'অন্যরা আর তোমার মধ্যে পার্থক্য আছে।'

পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'মানে,অন্যদের খুন করেছেন?'

আমির জবাব দিল না। পদ্মজা উত্তেজিত হয়ে পড়লো, 'কাকে করেছেন? কয়জনকে করেছেন? আবদুল ভাইকে কি আপনি মেরেছিলেন?'

আমির চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললো, 'না।'

'তাহলে কাকে?'

'এতো কথা কেন বলছো?'

'মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন। কী লাভ ওদের মেরে, আটকে রেখে?'

আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে চলে গেল। পদ্মজার বুকের ভেতর হাহাকার লেগে যায়। বুকের আগুনটাকে চেপে ধরে ভাবে, তাকে স্বাভাবিক হতে হবে। মেয়েগুলোকে নিয়ে কী হচ্ছে,কেন হচ্ছে,কী কাজ চলে এখানে সেটা জানতে হবে। তারপর তার স্বামীর সাথে বোঝাপড়া হবে। কথাগুলো ভেবে পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। তখন একটা হুল্লোড় কানে আসে। অনেকগুলো মেয়ের আকুতি! আবার মারছে! না মারছে না। মেয়েগুলোর কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে তারা বাম দিকে আছে। আর দশ-বারো জন একসাথে আছে! তবে কি এরা অন্য দল? এখানে আরো মেয়ে আছে? পদ্মজা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। আমিরের কণ্ঠ ভেসে আসছে। সে মেয়েগুলোকে খাওয়ার জন্য বলছে। তারপর একজনকে আদেশস্বরে বললো, 'রাফেদ,দেখো এরা যেন ঠিক করে খায়। আর সবার বাঁধন একসাথে খুলে দিবে না। একজন একজন করে খুলবে। আর চেঁচামিচি যেন না করে। খাওয়া শেষ হতেই হাত,মুখ বেঁধে ফেলবে। আমি আরভিদকে পাঠাচ্ছি। আরভিদ কোথায়?'

উত্তরে আরেকটি পুরুষ কণ্ঠ কি বললো,পদ্মজা বুঝতে পারলো না। সেই পুরুষ কণ্ঠটি ছাপিয়ে একটি মেয়ের কণ্ঠ ভেসে আসে, 'ভাই আমারে ছাইড়া দেন। আমার কয়দিন পর বিয়া। অনেক কষ্টে আমার বাপে আমার বিয়া ঠিক করছে।'

তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ আসেনি! ঘৃণায় পদ্মজার চোখ বুজে আসে। চোখ

ছাপিয়ে জল নামে। তার কিছুক্ষণ পর আমির আসলো। পদ্মজা কান্না থামিয়ে চোখমুখ শক্ত করে অন্যদিকে চেয়ে রইলো। আমির বললো, 'খাবার আসছে। খেয়ে নাও।'

'খাবো না।'পদ্মজার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ।

'বিষ দিইনি। লতিফার রান্না। খেতে পারবে।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। আবার চোখ সরিয়ে নিল। লতিফা যে এই বাড়ির রহস্যের সাথে যুক্ত সেটা পদ্মজা আন্দাজ করতে পেরেছিল। এবার বুঝেছে লতিফার কাজ কি! আমির বললো, 'কি হলো?'

পদ্মজা বললো, 'আমার একটা উত্তর দিন।'

'তোমার তো প্রশ্নের অভাব নেই।'

'এখানে আরো মেয়ে আছে? আপনার কি নারী ব্যবসা আছে?'

শেষ প্রশ্নটা করার সময় পদ্মজার কণ্ঠ কাঁপে। আমির শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললো, 'খাবে নাকি সেটা বলো?'

'আপনি আমাকে হারাম টাকায় রানি করেছিলেন?'

'টাকা টাকাই হয়। হারাম, হালাল নেই।'

'মুসলিম তো আপনি, নাকি?'

'আমাদের কোনো ধর্ম নেই।'

'কিসব বলছেন আপনি হ্যাঁ? মাথা ঠিক আছে?'উত্তেজিত হয়ে পড়লো পদ্মজা।

'এরকম ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদার স্বভাব তো তোমার ছিল না।'

'মন আছে আপনার? পৃথিবীর বুকে এমন কোন নারী আছে যে ছয় বছর সংসার করার পর তার স্বামী নারী ব্যবসায়ী,খুনি,অত্যাচারী,নিকৃষ্ট জেনেও কষ্ট পাবে না,কাঁদবে না?'

'এজন্যই তো জানাতে চাইনি। জানতে গেলে কেন?'

'আপনি আপনার নষ্ট জীবনের সাথে আমাকে জড়ালেন কেন?'

'নষ্ট জীবন চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। তোমাকে তো ভালোটাই দেখিয়েছি। তুমি চাদর তুলতে গেলে কেন?'

'এখন সব দোষ আমার তাই না? আপনি খোলস কেন পরলেন? শয়তান শয়তানের মতোই থাকতেন।'

'নিজের জীবনকেও নরক বানালে, সাথে আমারও।'

'মেয়েগুলোকে মেরে কী শান্তি পান? কেন মারেন? এসব করে কী লাভ? ছেড়ে দিন সবকিছু। আমরা একটা ছোট ঘরে সুখে থাকবো। আমাদের ভালোবাসাগুলো তো মিথ্যে না। আমরা তো আমাদের ভালোবাসা নিয়ে ভালো ছিলাম।'

'মন থেকে এটা মানছো?'

'কোনটা?'

'আমাদের ভালোবাসা মিথ্যে ছিল না।'

পদ্মজা কি বলবে ভেবে পায় না! যে মানুষটার মনে অন্যদের জন্য মায়াদয়া নেই। পশুর মতো যার আচরণ সে কী করে কাউকে ভালোবাসতে পারে? এই সমীকরণটা কিছুতেই মানাতে পারছে না সে।

পদ্মজা ভেজাকণ্ঠে বললো, 'আপনাকে ক্ষমা করা ঠিক না। আপনাকে কোনো ভালো মানুষ ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি তো আপনাকে ভালোবাসি। আপনি সবকিছু ছেড়ে দিন। মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন। তওবা করুন। আমরা দূরে চলে যাব। সুখে-শান্তিতে থাকবো।'

অনেক আশা নিয়ে উন্মাদের মতো কথাগুলো বললো পদ্মজা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া পদ্মজার মুখে এহেন কথা আশা করেনি আমির। তবুও সে পদ্মজার মনের মতো উত্তর দিতে পারলো না। সে পদ্মজার আশায় বালি ঢেলে দিয়ে বললো, 'তুমি সব ভুলে যাও।'

পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই মানুষটার সর্বস্ব জুড়ে সে নেই। যদি

থাকতো,সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে তাকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতো। পদ্মজার বুকের ক্লান্ত সূক্ষ্ম ব্যথাটা আবার বড় আকার ধারণ করে। আমির পদ্মজার বাঁধন খুলে দিলো। পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'খুলে দিলেন যে?'

'খাবে, চলো।'.

'যদি এখন পালিয়ে যাই?'

'কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে?'

'জানেনই যখন আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই। আপনিই আমার শেষ আশ্রয়। তাহলে ফিরে আসুন না আমার কাছে!'

'আবার কাঁদছো।'

পদ্মজা লম্বায় আমিরের কাঁধ অবধি। সে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে আমিরের দিকে। রক্ত জবা ঠোঁট দুটি চোখের জলে ভিজে ছপছপ করছে। আমিরের চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রাণ নেই,নিষ্প্রাণ। শীতল। পদ্মজা আচমকা আমিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আমির দুই পা পিছিয়ে যায়। পদ্মজা জোরে,জোরে কাঁদতে, কাঁদতে বললো, 'আপনি এভাবে অচেনা হয়ে যাবেন না। আমি বেঁচে থেকেও মরে যাবো। আমার ভালোবাসাকে এভাবে পর করে দিবেন না। আপনার মনে আছে, একবার আমি রাগ করে দুই দিন কথা বলিনি। তখন আপনি বলেছিলেন, আমাকে এভাবে অচেনা হতে দেখে আপনার কষ্ট হচ্ছে। ভালোবাসার মানুষের অচেনা রূপের মতো ভয়ানক কষ্ট দুটো নেই। এখন আমার সেই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। আপনি আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন? আমি সব ভুলে যাবো। আপনি ভালো হয়ে যান। মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন। ধ্বংস করে দিন আপনার সব পাপের চিহ্ন।'

আমির এক হাত রাখে পদ্মজার মাথার উপর। পদ্মজা অশ্রুভরা চোখে তাকায়। আমির পদ্মজার চোখের জল মুছে দিয়ে বললো, 'গালে ব্যথা পেয়েছো কী করে?'

'এতক্ষণে দেখেছেন?'

'না।'

'সেদিন জঙ্গলে এসেছিলাম। কাঁটা লেগেছিল। তারপর...'

'রিদওয়ান মেরেছিল?'

'হু।'

'কেন আসতে গেলে? সাধারণ দুনিয়ার বাইরেও মানুষের বানানো আরেক জগত থাকে। সেই জগতে পবিত্র মানুষদের ঢুকতে নেই।'

'ভেঙে ফেলুন সব।'

'নিজের হাতে যত্ন করে করা সাম্রাজ্য ভাঙা যায় না।'

'পাপের সাম্রাজ্য ধরে রেখে কেন পাপ বাড়াবেন? আমাদের ভালোবাসাকে কেন বলি দিবেন?'

'আমার রক্ত ভালো না। কেউ আমাকে পশু বললে, আমার আনন্দ হয়।'

'তাহলে আপনি ছাড়বেন না কিছু?'

'না।'

পদ্মজা নিরাশ হয়ে বসে পড়ে চেয়ারে। আমির বললো, 'খাবে নাকি খাবে না?'

'আমি এখানে খেতে আসিনি!'

'তাহলে না খেয়েই থাকো।'

পদ্মজা চুপ থাকে। নিজের মস্তিষ্ককে শান্ত করার চেষ্টা করে। খেয়েদেয়ে সুস্থ থাকতে হবে। মেয়েগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এখন নিজেকে এভাবে ভেঙে যেতে দেওয়া যাবে না। সে লম্বা করে বার কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল। তারপর বললো, 'খাবো।'

আমির বের হয়ে যায় সেদিন রাতে আর ফিরে আসেনি। মেয়েদের মতো সিল্কি লম্বা চুলের লোকটি খাবার নিয়ে আসে। তার নাম রাফেদ। পদ্মজা যতক্ষণ খায়,দাঁড়িয়ে থাকে। পদ্মজার খাওয়া শেষ হতেই রাফেদ পদ্মজাকে বাঁধতে চাইলো,তখন পদ্মজা প্রশ্ন করলো,

'উনি কোথায়? আপনি কেন বাঁধছেন?'

'বাইরে গিয়েছেন। আমাকে বলেছেন, আপনার খাওয়া শেষ হলে বেঁধে রাখতে।'

'কী করতে গিয়েছে?'

'এতসব বলতে পারব না। স্যার অনেক রাগী। স্যারকে রাগাবেন না। যা বলবে মেনে নিবেন।'

'আপনার স্যার তো আমাকে ভয় পায়। আমার কথায় সারাক্ষণ এই ঘরে ছিল। ভয়ে কেঁপেছেনও। বিশ্বাস করুন।'

রাফেদ হাসলো। এই হাসিকেই বোধহয় বলে শয়তানের মতো হাসা।

'মজা করছেন?'

'আচ্ছা, ওই সাদা খরগোশটা কোথায়?'

'খরগোশ?'

'ওইযে, সাদা দেখতে। আরদিদ বা এরকম কোনো নাম।'

'তা জেনে আপনি কী করবেন?'রাফেদ এগিয়ে আসে বাঁধার জন্য। পদ্মজা আড়চোখে কিছু একটা খুঁজে। কিন্তু রাফেদকে আক্রমণ করার মতো কিছু পেল না। ঘরে কিছু বলতে দুটো চেয়ারই আছে। চেয়ার গুলো কি খুব ভারী? একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। পদ্মজা দুই পা পিছিয়ে যেয়ে বললো, 'আপনাদের বাড়িটা অনেক সুন্দর। পাতালে বাড়ি আমি কখনো দেখিনি। একটু ঘুরে দেখি? আমার উনি বানিয়েছেন তাই না?'

'এটা স্যারের বানানো না।'

'তাহলে কার?'

রাফেদ পদ্মজার ন্যাকামি বুঝে যায়। সে তেড়ে আসে। পর পুরুষের সাথে ধস্তাধস্তিতে পদ্মজার মন সায় দিচ্ছে না। এখান থেকে পালালেও বাইরে আরেক শয়তান আছে। পালিয়েও লাভ নেই। তার চেয়ে এখানে থেকেই পরিস্থিতি বোঝা উচিত। পদ্মজা দ্রুত চেয়ারে বসে পড়ে বললো, 'ধস্তাধস্তি করবেন না। আমি বসে পড়েছি। আপনি বাঁধুন।'

রাফেদ পদ্মজাকে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে চলে যায়। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে! মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করে মাটির কতোটা নিচে আছে সে। বেশ অনেকক্ষণ পার হওয়ার পর পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। পদ্মজা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমির প্রবেশ করে। তার হাতে মলম জাতীয় কিছু। পদ্মজা কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে। আমির পদ্মজার দিকে মলম এগিয়ে দিয়ে বললো, 'ঔষধপত্র নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'আমি কি জানতাম নাকি, এখানে আমার বর শয়তানের রাজত্ব নিয়ে বসে আছে?'

'খুব কথা বলছো।'

'মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন।'

'এক কথা বার বার বলো না।'

'আমাকে ভালোবাসেন না?"

পদ্মজা তার মায়াময় দৃষ্টি দিয়ে আবিষ্কার করে আমিরের চোখে প্রাণ এসেছে! সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার মনের জানালার পাল্লা খুলে গিয়ে মুঠো,মুঠো বাতাস প্রবেশ করে। অশান্তিতে অবশ হয়ে যাওয়া মন,মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠে। আমির পদ্মজার প্রশ্নের জবাবে কিছু বললো না। হাতের বস্তুটি পদ্মজার পায়ের কাছে রাখলো। তারপর পদ্মজার বাঁধন খুলে দিয়ে বললো, 'গালে,পায়ে লাগিয়ে নিও। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করো না।'

বলেই সে বেরিয়ে যায়। দরজা বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়। পদ্মজার চাঙ্গা হয়ে যাওয়া মনে আবার মেঘ জমে। সে মেঝেতে'দ'ভঙ্গিতে বসে পড়ে।

বর্তমান।

পদ্মজার কান্না যেন থেমে থেমে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তুষার কথা বলতে গেল, কিন্তু ফুটল না। পদ্মজার বিষাদভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলো। পদ্মজা দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলো। মেয়েটার কান্না রোগ বোধহয় সেদিন থেকেই হয়! যেদিন জানলো তার স্বামীর আসল পরিচয়। তুষার থামতে বললো না। পদ্মজাকে কাঁদতে দিল। অনেকক্ষণ কাঁদার পর পদ্মজা পানি খেতে চাইলো। তাকে পানি দেওয়া হলো। তারপর চুপ হয়ে যায়। নেমে আসে পিনপতন নিরবতা। যতক্ষণ না তুষার আর প্রশ্ন করবে পদ্মজা কিছু বলবে না। তাই তুষার নিরবতা ভেঙে বললো, 'তার অন্যায় জেনেও তাকে মাফ করতে চেয়েছিলেন। রাতের এইটুকু শুনে তো মনে হচ্ছে না, আপনি আমির হাওলাদারকে কখনো খুন করতে পারেন। পাগলের মতো ভালোবেসেও তার বুকে ছুরি চালানোর সাহস হলো কী করে?'

পদ্মজা তুষারের উৎসুক মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। ফিসফিসিয়ে বললো, 'মুক্তি দিয়েছি,মুক্তি!'

'আপনার বর্ণনা অনুযায়ী আপনার প্রতি আমির হাওলাদারের ব্যবহার নরম ছিল। তিনি আপনার প্রতি দূর্বল ছিলেন।'

পদ্মজা উদাসীন হয়ে কিছু একটা ভাবলো। তারপর বললো, 'দূর্বল ছিল নাকি!'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আমি উনাকে খুব ভালোবাসি স্যার।'পদ্মজার কণ্ঠটা কেমন শোনায়! সে তার স্বামীকে খুন করে এসে জেলে বসে তার জন্যই কাঁদছে। কি অবাক কাণ্ড! তুষার বললো, 'আপনার ভাষ্যমতে তিনি একজন শয়তান ছিলেন। শয়তানকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজেকে পাপী মনে হয়নি?'

'হয়েছে।'

'তাহলে সেটা কী করে ভালোবাসা হলো?'

পদ্মজা কাঁদতে থাকলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'যখন কাউকে ভালোবাসবেন তখন বুঝবেন। ভালবাসায় দোষ-গুণের স্থান নেই। ভালবাসা শুধুই ভালবাসা। ভালোবাসা গুণী-খুনী,পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ করে না।'

তুষারের মনে হচ্ছে তার বুকে যেন একটা বড়সড় পাথর। আমিরের প্রতি পদ্মজার ভালোবাসার তীব্রতা তাকে কাতর করে তুলেছে। বার বার মনে হচ্ছে, সেই মানুষটাও বোধহয় পদ্মজাকে ভালোবাসতো। কিন্তু পাপ তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সে কি কখনো পাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল? প্রশ্নটা তুষারের মনে আসতেই তার উত্তেজনা বেড়ে যায়। পদ্মজাকে প্রশ্ন করে, 'তিনি কি পাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন? তারপর আর ভালোবেসেছিলেন আপনাকে?'

তুষারের প্রশ্নে পদ্মজা থম মেরে গেল। শূন্যে দৃষ্টি রেখে আওড়াল, 'চেষ্টা কি করেছিলেন? করেছিলেন কি?'

তুষার হাঁসফাঁস করা অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরমে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। পদ্মজা তখনও শূন্যে দৃষ্টি রেখে বিড়বিড় করছে। মেয়েটা যেদিকে তাকায় সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। তুষার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ডাকলো, 'মিস পদ্মজা?'

পদ্মজা তাকাল। তার চোখ দুটি ফোলা। আর ঠোঁট দুটি সবসময় তিরতির করে কাঁপে। তুষারের তীক্ষ্ণ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে পদ্মজা বললো, 'আমার ফাঁসি কবে হবে? এত দেরি হচ্ছে কেন?'

পদ্মজার কণ্ঠে ফাঁসির জন্য আকুতি! একটা মানুষ কতোটা নিঃস্ব হলে পৃথিবী থেকে মুক্তি চায়? তুষারের ধারণা নেই। সে তার ভেতরের মায়া লুকিয়ে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো, 'আপনাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর দিলেন না তো?'

পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'কোন প্রশ্ন?'

মুহূর্তে ভুলে গিয়েছে! তুষার অবশ্য এতে রাগলো না। সে আবার প্রশ্ন করলো, 'তিনি কি পাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন? তারপর আর ভালোবেসেছিলেন আপনাকে?'

'আগে বলুন, পিশাচের মতো যাদের আচরণ তারা কাউকে ভালোবাসতে পারে?'

তুষার তার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবলো। ভেবে বললো, 'পারে। তারা কম মানুষকে ভালোবাসে। কিন্তু যাকে ভালোবাসে তার সাথে সব ভালো করে। আর যার সাথে খারাপ তার সাথে খারাপই। তবে এদের পিশাচসিদ্ধে বাঁধা পড়লে তখন ভালোবাসা থাকে কি না আমার জানা নেই।'

পদ্মজা উদাস হয়ে বললো, 'আমি সব জেনে যাওয়ার পর,কখনো মনে হতো তিনি ব্যাকুল আমার জন্য। আর কখনো মনে হতো আমার সামনে স্বয়ং শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। এই ভালো,এই খারাপ! উনি উন্মাদের মতো হয়ে যেতেন। কি করছেন না করছেন তা যেন নিজেও বুঝতেন না।'

'আই থিংক, তিনি দুটো জীবন নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। তারপর সময় চলে আসে একটা বেছে নেয়ার তখন তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলো, 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত!'

অতীত।

শিশির ভেজা ঘাসে পা দিতেই সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা পূর্ণার বেশ ভালো লাগছে। সে ভোরের নামায পড়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে এসেছে তার বোনের খবর যেন পাওয়া যায়। এখন সে উত্তরের হাওড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে মৃদুলের জন্য। ভোরের দমকা বাতাস ও কুয়াশায় তীব্র শীতে সে কাঁপছে। তবুও ভালো লাগছে। পূর্ণার শীতে কাঁপতে খুব ভালো লাগে! কি আশ্চর্য ভালো লাগা! মৃদুল কুয়াশা ভেদ করে পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণার পরনে বেগুনি রঙের সোয়েটার। তার কাঁপুনি চোখে পড়ার মতো। মৃদুল তার গায়ের শাল দিয়ে পূর্ণার মাথা ঢেকে দিল। বললো, 'এই ঠান্ডার মধ্যে টুপি ছাড়া ঘর থাইকা বাইর হইছো কেন? আর জুতা খুলছো কেন? পরো।'

'পরো'শব্দটি ধমকে উচ্চারণ করলো। পূর্ণা দ্রুত জুতা পরে নিল। বললো, 'শাল দিয়ে দিলেন যে,আপনার ঠান্ডা লাগবে না?'

'আমারে দেইখা লাগে আমার ঠান্ডা লাগতাছে? গেঞ্জি পরছি,তার উপর শার্ট, তার উপর সোয়েটার। এইযে গলায় মাফলার, মাথায় টুপি। হাত,পায়েও মোজা আছে। এরপরেও আমার ঠান্ডা লাগবো?'

পূর্ণা হেসে বললো, 'না।'

তারপর পরই বললো, 'আজ দুপুরে না আবার যাবেন বলছিলেন।'

'হু, যাব তো। লিখন ভাইরে নিয়া যাবো। পদ্মজা ভাবি আমির ভাইয়ের সাথে যখন আছে ভালোই আছে। তবুও খোঁজ নিমু আমি। এতো চিন্তা কইরো না।'

পূর্ণা অন্যমনস্ক হয়ে বললো, 'আচ্ছা।'

'খাইয়া আইছো?'

মৃদুলের ফর্সা গাল,সহজ-সরল দুটি চোখ,জোড়া-ভ্রু আর গোলাপি ঠোঁটগুলো এক নজর দেখে পূর্ণা বললো, 'হুম। আপনি খেয়েছেন?'

'আর খাওয়া।'

'কেন? খাননি?'

'জাকিররে চিনো না? জাকিরের বাড়িত উঠছি। ওর আম্মা গেছে বাপের বাড়ি। ওর আব্বা আর আমি একসাথে আছিলাম। রাঁধবো কে?'

'জাকিরের দাদি কোথায়?'

'বুড়ির অসুখ। আইচ্ছা বাদ দেও।'

'বাদ দেব কেন? ফুপা কয়টা কথা বলেছে বলে এভাবে বাড়ি ছেড়ে দিবেন? নিজেরই তো ফুপা।'

'আত্মসম্মান বলে তো একটা কথা আছে। পদ্মজা ভাবির খোঁজটা তোমারে দেওনের লাইগগাই আছি। নইলে রাইতেই যাইতামগা। আমার এতো বড় বাড়ি রাইখা আমি এইহানে কথা শুনে পইড়া থাকুম কেন?'

পূর্ণা রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'তাহলে আজ চলে যাবেন?'

মৃদুল পূর্ণার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আড়চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। পূর্ণা চোখ বড় বড় করে উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছে। মৃদুল মুচকি হাসলো। মৃদুলের হাসি দেখে পূর্ণা উশখুশ করে বললো, 'হাসার কি বললাম?'

'তুমিও চলো।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

'ধুর! এ হয় নাকি!'

মৃদুল কপালে ভাঁজ সৃষ্টি করে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো, 'সব পুরুষরা তো বিয়ে করে বউ নিয়ে নিজের বাড়িতেই যায়। তাহলে আমার বেলা এ হয় না ক্যান?'

মৃদুলের কথায় পূর্ণা বাকরুদ্ধ! মৃদুল তাকে বিয়ের কথা বলেছে! পূর্ণার শ্যামবর্ণের মায়াবী মুখটায় লজ্জারা জমে বসে। ঠোঁটে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠে। সে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করলো। মৃদুল বললো, 'চলে যাইতাছো ক্যান?'

'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।'

'আরে যাইয়ো না।'

'যাচ্ছি।'

'কথা হুনো।'

পূর্ণা থামে না। তাই মৃদুল দৌড়ে আসে পূর্ণার পাশে। হাঁপাতে, হাঁপাতে বললো, 'এতো শরম পাও ক্যান?'

পূর্ণা লজ্জাশরম আর নিতে পারছে না। মৃদুলের কথায় সে লজ্জায় ঝিমিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললো, 'আমাদের বাড়িতে চলুন। খেয়ে যাবেন।'

'উম, খাওন যায়। বাসন্তী খালার রান্না কিন্তু এক্কেরে খাঁটি।'

'আপনি তো বড় আম্মার সব রান্না খেয়ে দেখেননি। খেলে বুঝতেন কত মজা!'

'তাহলে তো এই বাড়িতে জামাই হতেই হবে।'

পূর্ণা হেসে দিল। বেশি লজ্জা পেলে মানুষ হাসি আটকে রাখতে পারে না। পূর্ণার বেলাও তাই হলো। তারা দুজন গল্প করতে করতে মোড়ল বাড়িতে আসে। পথেঘাটে অনেকের সাথে দেখা হয়। সবাই জহুরি চোখে তাদের দেখে। তাতে অবশ্য মৃদুল-পূর্ণার যায়

আসে না। দুজন একই রকম।তারা সমাজকে উপেক্ষা করে নিজেদের আনন্দ নিজেরা বুঝে নিয়েছে। কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করতে চাইলেও কি উপেক্ষা করা যায়? এই সমাজ নিয়েই বাঁচতে হয়।

দুপুরে মৃদুল লিখনের খোঁজে গেওয়া পাড়ার বড় ধানক্ষেতে আসলো। ধানক্ষেতের মাঝে শুটিং চলছে। একটা সুন্দর গ্রাম্য গানের তালে,লিখন নাচছে। মাথায় গামছা বাঁধা। পরনে লুঙ্গি,শার্ট। সব বেশভূষাতেই তাকে সুন্দর লাগে। আকর্ষণীয়! দূরের পথের বট গাছের আড়ালে কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের স্বপ্নের পুরুষকে দেখছে। যার সামনে দাঁড়ানোর সাহস এবং ক্ষমতা কোনোটাই তাদের নেই। লিখনের সাক্ষাৎ তাদের ঘুম কেড়ে নেয়। মৃদুল দাঁড়িয়ে থেকে শুটিং দেখে। লিখনের খেয়ালে মৃদুল পড়তেই সে হাত নাড়ায়। মৃদুলও হাত নাড়ালো। শুটিং শেষ হতেই লিখন আসে। মাথা থেকে গামছা সরাতেই ঝাঁকড়া চুলগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠে। সে মৃদুলের সাথে করমর্দন করে বললো, 'দুঃখিত, তোমাকে অপেক্ষা করতে হলো।'

'আমার ভালোই লাগতেছিল।'

একজন দুটো চেয়ার নিয়ে আসে। লিখন বললো, 'বসো।'

দুজন বসলো। মৃদুল বললো, 'ও বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি যাবা তো?'

'হু যাবো। তবে, আমি বাড়ির চেয়ে দূরে থাকবো। বাড়ির ভেতর বা কাছে যাব না। এটা ভালো দেখাবে না।'

'খারাপ দেখাইবো কেন?'

'আর বলো না, একজন মজার ছলে আজ আমাকে বলেছে, আমাকে হাওলাদার বাড়িতে দেখা যায় সবসময়। কার জন্য যাই? পদ্মজার জন্য নাকি? আমাদের আগে কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি। এমন অদ্ভুত কথা। কিন্তু গিয়েছি মাত্র দুই দিন। একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখে এভাবে ছড়িয়ে গেলে পদ্মজার জন্য খুব খারাপ হবে। সম্মানহানি হবে।'

'মানুষ মিথ্যা কইলেই হইবো?'

'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, পদ্মজা একবার অসম্মানিত হয়েছে। এজন্য আমার খুব ভয় করে। আমার এই একটাই ভয়। মিথ্যে হউক অথবা সত্য, পদ্মজা দুর্নামি হউক সেটা চাই না।'

'তাইলে যাওনের কি দরকার?'

লিখন হাসলো। হেসে বললো, 'রাগ করো না মৃদুল। ছয় বছর আগ থেকেই আমার নামের সাথে পদ্মজার নাম জড়িয়ে একটু কানাঘুষা আছে। এখন যদি বার বার ওই বাড়িতে যাই মানুষ অনেক কথা বানাবে।'

'বুঝছি ভাই। রাগ করি নাই।'

'তাহলে চলো। আমি কাপড় পাল্টে নিই। তারপর যাবো।'

দুজন চলে আসে হাওলাদার বাড়িতে। লিখন হাওলাদার বাড়ির চেয়ে দূরে একটা মাঠে অপেক্ষা করে। দারোয়ান মৃদুলকে ঢুকতে দিল। মৃদুল দারোয়ানের পেটে থাপ্পড় দিয়ে বললো, 'শালার পেটলা! এখন ঢুকতে দিলি ক্যান?'

'বড় চাচায় কইছে।'

মৃদুল আলগ ঘরের বারান্দায় দেখলো মজিদকে। সে দারোয়ানের মাথায় একটা টোকা দিয়ে আলগ ঘরে চলে আসে। মজিদ হাওলাদার চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। এই মানুষটা মৃদুলের খুব পছন্দের। এমন সৎ,উদার মানুষ সে দুটো দেখেনি। দেখলেই ভক্তি চলে আসে। অলন্দপুরের মানুষ সুখী এই মানুষটার জন্যেই। সবসময় বাইরে থাকেন। হুটহাট বাড়িতে পাওয়া যায়। মৃদুল মজিদের সামনে এসে দাঁড়াল।সালাম দিল, 'আসসালামু আলাইকুম মামা।'

মজিদ হাওলাদার বই থেকে চোখ তুলে উত্তর দিলেন, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম। মৃদুল নাকি?'

'জি, মামা।'

'তুমি বাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছো? রাতে দেখলাম না।'

মৃদুল মাথা নত করে বললো, 'আলম ভাইয়ের বাড়িতে। জাকিরের আব্বা।'

'তুমি আমার বাড়ি রেখে অন্যের বাড়িতে গিয়ে থাকছো, এটা ঠিক না মৃদুল। আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।'

'কেউ অপমান করলে কি আর থাকা যায়?'

'শুনছি আমি, এটা খলিলের বাড়ি নাকি আমার বাড়ি? তুমি এখানেই থাকবে।'

'আইজ চইলা যামু বাড়িত।'

'এ তো তোমার রাগের কথা। রাগের সিদ্ধান্ত। আর কয়টা দিন থেকে যাও। ফুপার কথা রাখো। তোমার আব্বা শুনলে কি বলবেন?'

'আব্বারে কইতাম না।'

'যা বলছি শুনো।'

'আচ্ছা, মামা।'

'যাও ঘরে যাও। দুপুরের খেয়েছো? না খেলে খেয়ে নাও।'

'যাইতাছি। আচ্ছা, মামা আমির ভাই কই?'

'আমিরতো ঢাকা গেছে।'

'কয়দিন ধরে?'

'গতকাল বিকেলেই গেল।'

'পদ্মজা ভাবিরে নিয়ে গেছে?'

'হুম। দুজনই গিয়েছে। চলে আসবে দুই-তিনদিনের মধ্যে।'

'আচ্ছা মামা, গত কয়দিন আমির ভাই কই আছিল?'

'ঢাকা ছিল। তারপর এসে পদ্মজাকেও নিয়ে গেছে। পদ্মজার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপার বোধহয়। এত কি আর আমাদের বলে? তুমি এতো ভেবো না। যাও খেতে যাও।'

মৃদুল মজিদের কথা বিশ্বাস করে নিল। অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। মৃদুল ভাবলো। তাহলে দাঁড়াল যে, 'আমির ভাই এতদিন ঢাকা ছিল তাই পদ্মজা ভাবিকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। এজন্য কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। আমির ভাই পদ্মজা ভাবির জন্য কেমন পাগল সবাই জানে! তাই এই পাগলামি মানা যায়। তারপর কোনো জরুরী কাজে পদ্মজা ভাবিকেও নিয়ে যাওয়া হয়। মজিদ মামার কথামতো সেই জরুরি কাজ পদ্মজা ভাবির বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপার হতে পারে। পরীক্ষা বা অন্য কিছু।'

মৃদুল মনে মনে খুশি হয়। সে মজিদকে বললো, 'মামা আমি আইতাছি।'

তারপর বেরিয়ে আসলো। লিখনকে সব বললো। তার ভাবনাও জানালো। লিখনও মেনে নিল। মৃদুল চলে যেতেই মজিদ হাওলাদার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমিনার কাছ থেকে তিনি শুনেছেন,মৃদুল,লিখন এসেছিল। আর কী কথা হয়েছিল তাও জেনেছেন। তাই গুছিয়ে ব্যাপারটাকে সামলাতে পেরেছেন।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে পদ্মজা। তাকে স্বাগতম দরজা দিয়ে এওয়ান(A1) নামে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। দুপুর অবধি সে ঘরে বন্দি ছিল। হাত-পা বাঁধা ছিল না। তারপর যখন কতগুলো মেয়ের বুকফাটা আর্তনাদ তাকে কাঁপিয়ে তুলে, বাতাস ভারি হয়ে ওঠে তখন দরজায় জোরে,জোরে শব্দ করেছে। ফলস্বরূপ তার হাত-পা বেঁধে তাকে অন্য দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। রাফেদ নিয়ে এসেছে। গত রাতের পর আমিরের সাক্ষাৎ আর মিলেনি। মানুষটা এখানেই আছে,সে কণ্ঠ শুনেছিল। শুধু তার কাছে আসেনি।

আমির পাতালঘরের দরজার সামনে বসে আছে। এক পাশে ধ-রক্ত লেখা দরজা,অন্য পাশে স্বাগতম দরজা। ধ-রক্তের ভেতর চারটি ঘর। স্বাগতমের ভেতর পাঁচটি ঘর। এ নিয়েই

পাতালঘর। সে হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে কিছু চিন্তা করছে। কপালের রগগুলো দপদপ করছে। সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষণ হলো। রিদওয়ান,খলিলের এখানে আসার কথা ছিল। সকালে মজিদ ও খলিলের সাথে তার কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আহত হলে হাসপাতালে রাখা হয় না। নিজেদের দেখাশোনা নিজেদের করতে হয়। রিদওয়ানের জ্ঞান ফিরেছে। তবে অবস্থা ভালো নয়। এতে আমিরের যায় আসে না। বেঁচে আছে তো তাকে হাসপাতালে আর থাকতে দিবে না। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য্য হয়ে আমির উঠে পড়ে। তখন ফট করে পাতাল দরজা খুলে যায়। প্রবেশ করে মজিদ,খলিল আর রিদওয়ান। রিদওয়ানের মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। মাথায় ব্যান্ডেজ। চোখ নিভু,নিভু। খলিলের হাতে বিভিন্ন ঔষধপত্র, স্যালাইন। মজিদ প্রবেশ করেই বললেন, 'তোর বউ কোথায়?'

আমির উত্তর দিল না। সে পদ্মজার ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী নয়। খলিল বললেন, 'এই ছেড়ির কইলজাডা বেশি বড়। এইহানে আইয়া পড়ছে। আমি কইতাছি ভাই, এই ছেড়িরে সময় থাকতে সরায়া না দিলে এই ছেড়ি একদিন আমরারে সরায়া দিব। বাবলুর মতো জাত খুনিরে মাইরা ফেলছে। আর আমরারে পারব না?'

আমির কারো সাথে কোনোরকম কথা না বলে, 'রিদওয়ানের শার্টের কলার চেপে ধরলো। কিড়মিড় করে চাপাস্বরে বললো, 'পদ্মজার গলায় দাগ হলো কী করে?'

রিদওয়ানের অবস্থা শোচনীয়। তাকে আরো কয়টা ঘন্টা সময় দিলে সে কিছুটা শক্ত হয়ে যেত। আমির এভাবে চেপে ধরাতে তার জান বেরিয়ে আসতে চাইছে। মজিদ আমিরকে টেনে সরিয়ে আনে। বলে, 'মারিস না,মরে যাবে।'

আমির তার ভয়ংকর চোখ দুটি রিদওয়ানের মুখের উপর রেখে বললো, 'কুত্তার বাচ্চারে আমি জবাই দেব।'

'আমির আব্বা, এখন বউয়ের প্রতি মায়া দেখানোর সময় না। মাত্র আট দিন বাকি। রিদওয়ানকে সুস্থ হতে হবে। আমাদের সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে। একুশজন মেয়ে আটদিনের মধ্যে যোগাড় করতে হবে।'

মজিদের কথা আমিরের উপর কাজ করে। সে খলিলকে বলে, এটু(A2) ঘরে রিদওয়ানকে রাখতে। খলিল রিদওয়ানকে নিয়ে যান। মজিদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিরকে দেখে বললেন, 'আমরা কিন্তু এখন বিপদের উপরে আছি। কিছুতেই মন অন্য জায়গায় দেয়া যাবে না। বিপদ থেকে রক্ষা না পেলে এতদিনের কষ্টে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য জলে যাবে। তোর হাতে সব দিয়েছি। কারণ, আমি জানি আমার ছেলে বাঘের বাচ্চা। সে সব কিছু পারে। থাবা দিয়ে সব ধ্বংস করে দিতে পারে। অর্থের উপরে কিছু নেই। অর্থ দিয়ে সব কেনা যায়।'

মজিদের কথাগুলো আমিরের উপর বিষাক্ত বিষের মতো প্রভাব ফেলে। মুহূর্তে মধ্যেই তার পূর্বের ধ্যান-জ্ঞান মস্তিষ্ক জুড়ে বসে। পদ্মজার সাথে দেখা হওয়ার পর সে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন তো হওয়া যাবে না। কিছুতেই না। নারীর আকুতি-মিনতি আর অর্থের চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমির অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকাল। তারপর মজিদকে নিয়ে ধ-রক্তে প্রবেশ করলো। ধ-রক্তের বিওয়ান(B1) ঘরে প্রবেশ করতেই মজিদের মনটা ভরে যায়। নগ্ন কতগুলো দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এক-দুটো নড়ছে। গোঙাচ্ছে! যা তাদের জন্য চক্ষু শীতল দৃশ্য। আরভিদ এসে জানালো, 'দুটো মেয়ে মারা গেছে।'

আমির ভ্রুকুটি করে জানতে চাইলো, 'কোন দুটি মেয়ে?'

আরভিদ লাঠি দিয়ে ঠেলে দুটি নিস্তেজ দেহ দেখালো। আমির বললো, 'দুটোকে আলাদা করো। আর একটা বস্তা আর ছুরি,রাম দা নিয়ে আসো। চাচারে বলবা আসতে।'

আরভিদ চলে গেল। মজিদ বললেন, 'আজ ট্রলার লাগবে?'

'লাগবে। লাশ রেখে দিলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। আর মন্তুরে বলে দিও, বড় নদীতে ফেলতে। মাদিনীতে যেন না ফেলে। শফিক বলছে, কয়দিন পর পর একই নদীতে লাশ পায় যা সন্দেহবাতিক। ওদের থানায় তদন্ত চলছে।'

মজিদ মহা বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'মন্তুরে মনে চায় জুতা দিয়ে পিটাই। বার বার বলার পরও একই ভুল করে।'

'কয়টা ঘা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাফেদ পদ্মজার জন্য খাবার নিয়ে আসে। প্লেট বিছানার এক পাশে রেখে পদ্মজার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েই রাফেদ কিছু বুঝে উঠার পূর্বে রাফেদকে জোরে ধাক্কা মারলো পদ্মজা। রাফেদ এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দুশো বছরের পুরনো পাতালঘরের দেয়ালে বারি খেতেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। ততক্ষণে পদ্মজা বেরিয়ে যায়। পদ্মজা নিশ্চিত হয়ে গেছে,তাকে কেউ আক্রমণ করবে না। আমির আক্রমণ করতে নিষেধ করেছে। তাই সে নির্ভয়ে রাফেদকে আঘাত করে বেরিয়ে আসে। এক ছুটে প্রবেশ করে ধ-রক্তে। আমিরের সাথে তার কথা আছে। সে কি চায়? জানতে চায়। এভাবে সময়টাকে থামিয়ে রাখলে চলবে না। বিওয়ান(B1) ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পদ্মজা। গতকাল দেখেনি দরজার বিওয়ান লেখাটি। আজ দেখেছে। তার বুক কাঁপছে দুরুদুরু! মজিদ হাওলাদারের হাসি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গোঙানির শব্দ। পদ্মজার লোমকূপ দাঁড়িয়ে পড়ে। সে দরজা ঠেলে উঁকি দেয়। গতকাল দৃশ্যের চেয়েও ভয়ংকর এক দৃশ্য ভেসে উঠে। মেঝেতে রক্তের বন্যা। প্রতিটি মেয়ে অচেতনের মতো পড়ে আছে। তারা চিৎকার করছে না। যেন প্রাণ যাওয়ার অপেক্ষাতেই আছে তারা। মজিদ হাওলাদার লাঠি দিয়ে মেয়েগুলোর স্পর্শকাতর স্থানে পাশবিক উল্লাসে আঘাত করছে। তার চেয়ে কিছুটা দূরে দামী একখানা চেয়ারে বসে আমির কিছু কাগজ দেখছে। পাশেই খলিল হাওলাদার বসে আছেন। একটা মেয়ের দেহ ছুরি দিয়ে কেটে বস্তায় ভরছেন। যাতে কেউ দেহ শনাক্ত না করতে পারে। সামনে রয়েছে রাম দা তিনটে। বীভৎস দৃশ্যটি যে কাউকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে। পদ্মজার বেলাও তা হয়। বমি গলায় এসে আটকে যায়। শরীর বেয়ে একটা আগুন ছুটে এসে মাথায় থেমে যায়। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। সে ঝড়ের গতিতে তেড়ে এসে বয়স্ক শয়তান মজিদকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দূরে। মজিদ হাওলাদার উঁবু হয়ে পড়ে যান। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মজিদ মেঝেতে উঁবু হয়ে পড়তেই খলিল উঠে দাঁড়ায়। পদ্মজার চুলের মুঠি টেনে ধরে। সেকেন্ড খানিক পার হতে পারেনি তার আগেই আমির খলিলকে থাবা দিয়ে সরিয়ে দেয়। এক হাতে জড়িয়ে ধরে পদ্মজাকে। আমিরের ছোঁয়া গায়ে লাগতেই পদ্মজা ছ্যাঁত করে উঠলো। এই ঘৃণ্য মানুষটিকে সে এখন সহ্য করতে পারছে না। আমিরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মেঝে থেকে রাম দা তুলে নিল। আমিরের দিকে রাম দা তাক করে সাপের মতো হিশহিশ করতে করতে বললো, 'আমি কিন্তু মেরে দেব। একদম...একদম মেরে দেব।'

পদ্মজার গলা কাঁপছে,শরীর কাঁপছে। চারপাশে রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে আছে। এক পাশে মানুষের দেহের টুকরো! সে ভেতরে ভেতরে ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশ সে নিতে পারছে না। এমন নির্দয়,বর্বর মানুষ ছিল পাক সেনারা। এই কথা সে শুনেছে তার মায়ের কাছে। সে যেন পাক সেনাদের বাঙালি রূপে দেখছে। পদ্মজা অস্থির হয়ে চারপাশ দেখে। মেয়েগুলো কীভাবে বাঁচানো যায়? জানা নেই। কোনো পথ নেই। খলিল পদ্মজার দিকে ছুরি ছুঁড়ে মারার জন্য উদ্যত হয়,তখন আমির হুংকার দিয়ে উঠলো, 'শুয়ো** বাচ্চা,হাত নামা।'

কি জঘন্য আমিরের ভাষা,চোখের দৃষ্টি,হুংকার! পদ্মজার গা রি রি করে উঠে। সে আমিরের দিকে রাম দা উঁচু করে বললো, 'যারা যারা আছে সবাইকে ছেড়ে দিন। নয়তো... নয়তো আমি...আমি আপনাকে মেরে ফেলবো।'

পদ্মজা ঘামছে। তার কথা এলোমেলো। তার শরীরে অস্থিরতা। একবার এদিকে তাকাচ্ছে,আরেকবার ওদিকে। দিকদিশা হারিয়ে ফেলেছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার মাথা কাজ করছে না। বমি ঠেলেঠুলে উপরের দিকে আসছে। আরভিদ দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। রাফেদ তার পিছনে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে কারো উপস্থিতি টের পেতেই পদ্মজা ফিরে তাকালো। সুযোগ পেয়ে আমির পিছন থেকে পদ্মজাকে জড়িয়ে

ধরলো। পদ্মজার হাত থেকে রাম দা ছিনিয়ে নিল। পদ্মজা কিড়মিড় করতে থাকে। মুখ দিয়ে ক্রোধে বের হতে থাকে অদ্ভুত কিছু শব্দ! আমির পদ্মজাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে ধমকে বললো, 'এইবার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। থামো।'

পদ্মজা অগ্নি চোখে আমিরের দিকে তাকালো। সে আমিরের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে। নিজের অজান্তে খামচে আমিরের হাত থেকে রক্ত নিয়ে আসে। ছটফট করতে থাকে। পদ্মজার গা থেকে শাড়ি পরে যায়। ভেসে উঠে শরীরের অনেকাংশ! সম্পর্কে মজিদ,খলিল যাই হোক না কেন আমির জানে তারা কতোটা নিকৃষ্ট। তাদের চরিত্র,চাহনি সব নিয়েই তার ধারণা আছে। তাই সে দ্রুত পদ্মজাকে শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিল। শক্ত করে চেপে ধরলো। আচমকা পদ্মজা বমি করতে শুরু করে। যা ছিটকে পড়ে আমিরের চোখেমুখে। সে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলে। পদ্মজার শরীর নেতিয়ে পড়ে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে এওয়ানে(A1) চলে আসে। দূর্বল শরীরেও পদ্মজার তেজ কমে না। আমিরও হারার পাত্র নয়। তার পুরুষালি শক্তির সাথে পদ্মজা পেরে উঠেনি। একসময় পদ্মজা থেমে গেল,ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমির দূরে সরে দাঁড়ায়। এ কি শুরু হয়েছে! তার এই রাজত্বে এমন বিশৃঙ্খলা কখনো হয়নি। পদ্মজার জন্য বার বার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। পদ্মজাকে অন্দরমহলে পাঠানোও সম্ভব না। পদ্মজা যেভাবে রিদওয়ানকে আঘাত করেছে,তাতে আর ভরসা নেই পদ্মজার উপর। যেকোনো মুহূর্তের পদ্মজা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। একমাত্র সে পারে পদ্মজাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আর এই মুহূর্তে তার অন্দরমহলে ফেরা যাবে না। দুই-তিনদিন লাগবে ফিরতে। আমির মনে মনে ভেবে নেয়, বাকি যেকয়টি দিন সে এখানে আছে পদ্মজাকে এক ঘরে বেঁধে রাখবে। কিছুতেই বাঁধন খোলা যাবে না। আমির পদ্মজার দিকে এগোয়। পদ্মজা চিৎকার করে উঠলো, 'খারাপ লোক! ঘেন্না হচ্ছে আমার! ঘেন্না হচ্ছে।'

পদ্মজা প্রবল আক্রোশে আমিরের পায়ের কাছে থুথু ফেললো। আমির পদ্মজার দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। বেঁধে ফেললো দড়ি দিয়ে। তারপর বিছানায় ফেলে পা বাঁধতে বাঁধতে বললো, 'ভুল করলে এখানে এসে। এতো নাক না গলালে ভালো থাকতে। সুখে থাকতে।'

পদ্মজা ক্রোধে-আক্রোশে ঘোরে আছে। হাত-পা বেঁধে ফেললেও মুখ তো আছে। পদ্মজা মুখের থুথু দিয়ে বুঝিয়ে দিল,সে আমিরকে সহ্য করতে পারছে না। আমিরের মুখে থুথু পড়তেই তার মাথা চড়ে যায়, 'পদ্মজা!'

'আমাকে ডাকবেন না আপনি। পিশাচ একটা।'

'আমি কিন্তু তোমার গায়ে হাত তুলবো।'

'আমি আশা করি না যে, আপনি আমাকে মারবেন না।'

মজিদ আয়েশি ভঙ্গিতে বসে আছেন। তিনি পদ্মজাকে নিয়ে আতঙ্কে আছেন। মনে মনে তিনি পদ্মজাকে কয়েকবার খুন করেছেন,কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়তো সম্ভব না,যতদিন পদ্মজার উপর আমিরের আকর্ষণ আছে। তিনি খলিলকে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আমিররে পদ্মজার কাছ থেকে নিয়ে আয়। ওই মা* ঝি মায়াবিনী। রূপ দিয়ে আমার সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে বশ করে নিবে।'

খলিলের কানে মজিদের কথা গেল না। তিনি রাগে ফুলে আছেন। আমির সবসময় তার সাথে এবং রিদওয়ানের সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করে। দুই বাপ-ব্যাঠা মিলে অনেকবার পরিকল্পনা করেছে,আমিরকে খুন করার। কিন্তু আমিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রখর শ্রবণশক্তি,নিজেকে রক্ষা করার মতো কৌশল ডিঙিয়ে তাকে আক্রমণ করার সাহস কখনো হয়ে উঠেনি। এছাড়া,আমিরের একেকটা চামচা তার মতোই জাত খুনি! তবে খলিল দমেও যাননি। একদিন সুযোগ হবে। সেদিন এক কোপে আলাদা করে দিবেন আমিরের মাথা। তাছাড়া মজিদকেও খলিলের পছন্দ নয়। সব সম্পত্তি আমিরের নামে করে দিয়েছে! মনের ক্রোধ মনেই রয়ে যায়। কাজ করতে হয় আমিরের হয়ে। নিজেরা আর দখল নিতে পারে না। মজিদ হাওলাদার পা দিয়ে খলিলের পিঠে ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, 'খলিল?'

খলিল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো, 'কও ভাই।'

'যা, আমিররে গিয়ে বল, রায়পুর যেতে। ওদিকে মেলা হচ্ছে।'

'মেলায় ধরা পইড়া যাইবো না?'

'এখন ঝুঁকি নিতেই হবে। সময় নেই। আর আমির পারবে।'

খলিল এওয়ানে আসে। আমিরকে বলে রায়পুরের কথা। আমির দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে মাফলার দিয়ে মুখ ঢেকে নিল। আর মজিদকে হুমকি দিয়ে বলে গেল, পদ্মজার গায়ে কোনো টোকা যেন না লাগে!

তারপর সাথে নিয়ে যায় রাফেদকে। ট্রলারে আছে মন্তু আর শ্রীভব। পদ্মজা পড়ে থাকে ঘরে। তার চোখ বেয়ে জল নেমে আসে। মাথা ঘুরাচ্ছে খুব। চোখ দুটি বার বার বন্ধ হয়ে আসছে। মন এবং শরীর দুটোর উপর দিয়েই ধকল যাচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে। চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পূর্ণা ও প্রেমার মুখ। এই পাপের কবলে যদি পূর্ণা,প্রেমা পড়ে! পদ্মজা চট করে চোখ খুলে। তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। চিন্তায় মাথা ব্যথা বেড়ে যায়।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ক্লান্ত চোখদুটি খুললো পদ্মজা। ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান। তার ঠোঁটে হাসি। পদ্মজার পাশে এসে বসে। পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। রিদওয়ান হেসে বললো, 'এই দিনটার অপেক্ষা করছিলাম অনেকদিন ধরে।'

পদ্মজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। রিদওয়ান বললো, 'আমির কি ঠকানোটাই না ঠকালো তোমাকে।'

রিদওয়ান দাঁত বের করে হাসলো। হাসি দেখে মনে হচ্ছে সত্যি আজ তার সুখের দিন। সে তো এটাই চেয়েছে। পদ্মজা জেনে যাক সব। রিদওয়ান বললো, 'তোমাকে অনেক সংকেত দিয়েছিলাম। যাতে আমিরকে চিনে ফেলতে পারো। কিন্তু তোমার আগে সেই সংকেত আমিরের চোখে পড়ে যেত। কি কপাল আমিরের! দুনিয়ায় সব সুখ নিয়েই ও জন্মেছে।'

পদ্মজা প্রশ্ন করলো, 'আপনি কেন চাইতেন? আপনি তো এই দলেরই।'

'দলের তো বাধ্য হয়ে। দেখো, আমি তোমাকে আগে পছন্দ করেছি সেই হিসেবে আমার তোমাকে পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কে পেয়েছে? আমির! যে একজন নারী অত্যাচারী, নারী ব্যবসায়ী,খুনি,শয়তান।'

'শয়তান তো আপনিও।'

'আমি শয়তান হলে তোমার কী যায় আসে? তোমার স্বামী হলে-

'এখানে কেন এসেছেন?'

'গল্প করতে।'

'মেয়েগুলোকে মারা হচ্ছে কেন?'

রিদওয়ান মুচকি হেসে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে সব বলার জন্যই এখানে এসেছে। পদ্মজা ও আমির প্রতিদ্বন্দ্বী হলে তার যে আনন্দ হবে সেই আনন্দ বোধহয় বেহেশতেও নেই। এটা রিদওয়ানের ভাবনা। তাই তো সে যখনই শুনলো,আমিরের উপস্থিতি এখন নেই। সঙ্গে,সঙ্গে অসুস্থ শরীর নিয়েই পদ্মজার কাছে চলে এসেছে। রিদওয়ান ধীরেসুস্থে জানালো এই পাতালঘরের ইতিহাস। দুশো বছর পুরনো এই পাতাল ঘর। আগে মন্দির ছিল। মন্দিরের নিচে পাতালঘর বানানো হয়েছিল। সেখানে সোনার মূর্তি ছিল। মূর্তির গায়ে ছিল হীরা,পান্না। তখনকার আমলের রাজার দায়িত্বে ছিল এই পাতালঘর। তারপর সেটা কোনোভাবে হাওলাদার বাড়ির হয়ে যায়। সোনার মূর্তিও নাই হয়ে যায়। তার খোঁজ কেউ জানে না। তখনের প্রজন্মে হাওলাদার বংশের একজন পুরুষ ছিলেন নারী আসক্ত। তিনি যখন বাড়ির পিছনে এমন একটা পাতাল ঘরের সন্ধান পেলেন,মাথাচাড়া দিয়ে উঠে নারী আসক্তি। তারপর থেকেই মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ করে, খুন করা হয়ে উঠে প্রতি দিনকার অভ্যাস। আস্তে আস্তে এই পাপ ছড়িয়ে পড়ে বংশের সব ছেলেদের মধ্যে। পাতালঘর

তাদের মনে নিষিদ্ধ, মহাপাপের বাসনা জাগিয়ে তুলে। আস্তে আস্তে ধর্ষণের সাথে সাথে নারী বিক্রি শুরু হয়। শুরু হয় পতিতাবৃত্তি। লম্পট ক্ষমতাশালীরা অর্থ দিয়ে নারী ভোগ করতে আসতো পাতালঘরে। এই পাপ মজিদ হাওলাদার অবধি একই ভাবে চলে আসে। আমির হাওলাদার সেটাকে বিদেশ অবধি নিয়ে যায়। টাকার পাহাড় গড়ে তুলে। পাতালঘরকে করে তুলে আধুনিক। বানায় আরো কয়েকটি ঘর। চারিদিকের নিরাপত্তা শক্ত করে। প্রতি বছরের শীতে এবং বর্ষাকালে কয়েকটি মেয়েকে ধরে এনে হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা নিজেদের পুরুষত্বের ক্ষমতা প্রমাণ করে। তারপর চৌদ্দ দিন ধরে একটানা তাদের করা হয় নির্মম অত্যাচার। চৌদ্দ দিনের মধ্যে অনেকে মারা যায়। আবার অনেকে বেঁচে থাকে। যারা বেঁচে থাকে তাদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর লাশের গায়ে,পাথর বেঁধে ট্রলারে করে ডুবিয়ে দেয়া হয় সব বড়,বড় নদীতে। আর বছরে চারবার নারী পাচার করা হয় বিদেশে। পুরো বছর জুড়ে খোঁজ চলে নারী শিকারের। এ পাপ হাওলাদার বাড়ির রক্তে মিশে গিয়েছে। বয়স পনেরো হতেই বাড়ির ছেলেদের জড়িয়ে দেয়া হয় এই চক্রের সাথে। এ যেন হাওলাদার বংশের রীতি! ছেলে হয়ে জন্মালে এই রীতি অনুযায়ী চলতেই হবে! সব শুনে পদ্মজা পায়ের তালু থেকে মাথার চুল অবধি কেঁপে উঠে! দুশো বছর ধরে চলছে এই পাপ! কেউ বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি! অথচ,এই হাওলাদার বাড়ির সুনাম সব জায়গায়। হিন্দুরা হাওলাদার বাড়ির পুরুষদের দেবতার সাথে তুলনা করে,আর মুসলিমরা ফেরেশতার সাথে! অথচ এদের রক্তেই শয়তানের বসবাস। এই তবে এই বাড়ির রহস্য! এজন্যই কি মেয়ে হওয়ার পর সৃষ্টিকর্তা তাকে বন্ধ্যা করে দেয়! আমির...আমিরও কী নারী আসক্ত! এটাই তো স্বাভাবিক! হাওলাদার বংশের ছেলে হয়ে নারী ভোগ করেনি এমন ভাবনা মানায় না! পদ্মজার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করতে থাকে। বার কয়েক ঢোক গিলে। রিদওয়ান পদ্মজার অস্থিরতা টের পেয়েছে। তার পৈশাচিক আনন্দ হচ্ছে। সে খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে বললো, 'এবার চলো ছয় বছর পূর্বে ফিরে যাই। সেই ঝড়ের সন্ধ্যেতে। যেদিন আমির আর তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল।'

পর্ব ৬৬

“সেই ঝড়ের সন্ধ্যেতে। যেদিন আমির আর তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল” বাক্য দুটি পদ্মজার নিঃশ্বাস থামিয়ে দিল। রিদওয়ান বিছানা ছেড়ে চেয়ার টেনে বসলো। বললো, ‘আমির সারাবছরই ঢাকা থাকে। শুধু বর্ষাকাল আর শীতকালে গ্রামে আসে। সেসময় বর্ষাকাল ছিল। মেয়ে যোগাড় হয়ে গেছে। সেই আনন্দে আমির আমার সাথে তাস খেলে। বলে, যদি ওকে আমি হারাতে পারি আমি যা চাইবো তাই দিবে। একটু প্রশংসা করি,আমির শয়তান হলেও কথা দিয়ে কথা রাখার অভ্যাসটা ভালোই ছিল। আমার সৌভাগ্য, আমির সেদিন হেরে যায়। আমাদের আটপাড়া গ্রামের মেয়েদের আমরা কখনো শিকার করি না। এটা আমাদের নিয়ম। নিজের গ্রামের মেয়ে হারালে দুর্নাম হবে বড় চাচার। কারণ তিনি মাতব্বর। আটপাড়ার কোনো মেয়ে আজও আমাদের হাতে পড়েনি। তোমাকে আমি স্কুলে যাওয়ার সময় দেখি। বিশ্বাস করো,আমি তোমাকে যেদিন দেখি সেদিন রাতে ঘুমাতে পারিনি। আব্বাকে বলছি,তোমাকে এনে দিতে। তিনি দিলেন না। আটপাড়ার মেয়ে তুলে আনা যাবে না! কড়া নিষেধ। তারপর অনুরোধ করেছি, যাতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। তখন বড় চাচা বললেন, তোমার মায়ের কথা। তিনি মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের অনেকের কাছে শুনেছেন, তোমার মা নাকি মেয়ে বিয়ে দিবেন না। দূর-দূরান্ত থেকে বনেদি ঘরের ছেলেরাও নাকি এসেছে বিয়ের জন্য তাও তিনি বিয়ে দিতে রাজি হননি। কিন্তু আমারতো তোমাকে লাগবেই। তোমার রূপ এমনই যে,সারাজীবন ভোগ করলেও পানসে লাগবে না।’

শেষ কথাটি শুনে রাগে পদ্মজার কপালের চামড়া কুঁচকে যায়। তবে টু শব্দ করলো না। রিদওয়ান বলছে, ’আমার এই বাড়ির প্রতি,এই পাতালঘরের প্রতি লোভ অনেক আগে থেকে। তবুও আমি সেসবের কিছু না চেয়ে আমিরের কাছে তোমাকে চেয়েছি। কতোটা পছন্দ করেছি ভাবো একবার? ভাবো পদ্মজা। একটু ভাবো।’

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে কাতর চোখে তাকালো। তারপর চোখেমুখে ক্রোধ এনে বললো, ’কিন্তু হলো কী? নিজে পছন্দ করে ফেললো। আমির আমার জন্য তোমাকে তুলে আনতে গিয়েছিল। আমি জানতাম,তোমার আম্মা বাড়িতে নেই। তাই এরপরদিনই আমির তোমাদের বাড়িতে যায়। কথা দিয়েছিল,এশার আযানের আগেই আমার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিবে। ধ-রক্তের বি-থ্রি ঘরে আমি অপেক্ষায় ছিলাম। মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করেছি। তারপর অন্দরমহলে চলে যাই। গিয়ে শুনি,আমির বড় চাচাকে হুমকি দিচ্ছে,তোমার সাথে বিয়ে না দিলে নাকি কাজ ছেড়ে দিবে। যদিও সবাই জানি,আমির কোনোদিন তার পেশা ছাড়বে না। তাও বড় চাচা আমিরকে অসন্তুষ্ট রাখতে চান না। তাই কথা দিলেন তোমার সাথেই বিয়ে হবে। যেভাবেই হউক। আমিরের সাথে আমার তর্ক হয়। আমাকে তখনই আদেশ দেয়া হয়, ছইদকে খুন করতে হবে। ছইদ আমিরের সাথে বেয়াদবি করেছে। যা আমিরের গায়ে লেগেছে। ও চায় না ছইদ আর বেঁচে থাকুক। আমিরের আদেশ পালন করতেই হয়। কিন্তু সেদিন আমি শুনিনি। তখন বড় চাচা বললো, ’পদ্মজা সমাজের কাছে আমিরের বউ হলেও,ঘরে তোর বউও হবে। আমি তার ব্যবস্থা করব,আমিরের সাথে কথা বলব।’

আমাকে আশা দেওয়া হয়। তাই ছইদকে সরিয়ে দেই। সব কিন্তু তোমাকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু অবাক কান্ড কি জানো? তোমার মাও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা এতো ভয়ংকর আগে বুঝিনি! মেয়ে মানুষ হয়ে কীরকম ভাবে যে নেশাগ্রস্থ দুটি মানুষকে জবাই করেছে তুমি ভাবতেও পারবে না!’

রিদওয়ান থামলো। সে অবাকচোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে জানে এই ঘটনা। চিঠিতে পড়েছে। রিদওয়ান বললো, ’তারপরদিন সালিশে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলো। তোমার আম্মাও রাজি হয়ে গেলেন। বলেছি না? আমির দুনিয়ার সব সুখ নিয়ে জন্মেছে। তোমার আম্মা আমাকে চিনতেন না। কখনো দেখলেও বা

নাম শুনলেও মুখ মনে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্তে বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিলেন। বড় চাচা সমাজের চোখে কতোটা মহান সেটা তুমিও জানো। দুই মাস অন্তর,অন্তর দান করেন। সবার অভাব দূর করেন,চিকিৎসা করান। উনার ছেলের বউ মানে অনেক কিছু! তোমার আম্মাতো আর ভেতরের খবর জানতেন না। সে যাই হোক পরের কথা বলি। আমির যখন শুনলো, তোমার আম্মা দুটো খুন করেছে, ও চিন্তায় পড়ে যায়। আমির ধূর্তবাজ, চালাক। ও মানুষ চিনে। ও তাৎক্ষণিক বুঝে গেল, তোমার আম্মা জটিল মানুষ। তাই আমাকে নিষেধ করলো,বিয়ে বাড়িতে আমার মুখ না দেখাতে। চিনে গেলে সমস্যা হবে। আমিরের সাথে তাল মিলিয়ে বড় চাচাও নিষেধ করলো। আমি তো-

পদ্মজা মাঝপথে প্রশ্ন করলো, 'আপনি এই গ্রামের ছেলে! আর আম্মাও এই গ্রামের মেয়ে,বউ। তারপরও আপনাকে চিনতেন না?'

'ওইযে বললাম, কখনো হাওলাদার বাড়ির ছেলে হিসেবে দেখলেও মনে নেই। নয়তো নাম জানতেন মুখ চিনতেন না। তাছাড়া, আমাকে সত্যি অনেকেই চিনে না। নাম জানলে মুখ চিনে না। মুখ চিনলেও, হুট করে দেখে ধরতে পারে না। সবসময় এখানে থাকি। অন্দরমহলে থাকি। রাতে বের হই। ট্রলারে থাকি। এটা খুব সহজ ব্যাপার। তোমার আম্মা চিনতেন না বললে বেমানান লাগবে না। আর শুনেছি, তোমার আম্মা নাকি সমাজের দিকে চোখ দিতেন না তেমন। নিজের সংসার আর তিন মেয়েকে নিয়েই থাকতেন।'

কথাগুলো অবহেলার স্বরে বলে রিদওয়ান থামলো। পদ্মজা কিছু বললো না। রিদওয়ান ভ্রূকুঞ্চন করে বললো, 'কোথায় যেন ছিলাম?'

পদ্মজা জবাব দিল না। রিদওয়ান মনে করার চেষ্টা করলো। মনে পড়তেই আবার বলা শুরু করলো। আমিরের কথামতো সে হেমলতাকে মুখ দেখায়নি। যায়নি ও বাড়িতে। বিয়ের দুইদিন আগে মেয়েগুলোকে ঢাকা চালান করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আলমগীর আমিরের কথামতো পাচার করে দেয় বিদেশে। মৃত মেয়েগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় বড়-বড় নদীতে। একটা মেয়ে রয়ে যায়। সে মেয়েটিকে পদ্মজা আর আমিরের বিয়ের আগের দিন রাতে হত্যা করা হয়। তারপর আমিরের কথামতো, হাবলু আর রিদওয়ান চলে আসে হাওড়ে। অন্দরমহলে তখন আমিরের গায়ে হলুদের উৎসব চলছিল। হাওড়ে তখন তীব্র স্রোত। বাড়ি ফেরার তাড়াও ছিল। আবার মেয়েটি অনেক দূরের। তাই হাবলু মেয়েটিকে নদীর শেষ মাথায় ও হাওড়ের শুরুতে ফেলে দেয়। তখনই খেয়ালে পড়ে,আরেকটি নৌকা। যেখানে মোড়ল বাড়ির পরিবার ছিল। রিদওয়ান ট্রলারের ভেতর ছিল। সে হাবলুকে তাড়া দেয় দ্রুত ট্রলার ঘুরাতে। তারপরের কাহিনি পদ্মজার জানা। পুরোটা শুনে পদ্মজা অবাক হয়ে যায়। সে হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলো, 'আর...আর হানিফ মামার ব্যাপারটা?'

রিদওয়ান খুব বিরক্তি নিয়ে বললো, 'এসব ছোটখাটো ব্যাপার। ওই শালা আমাদের সাথেরই লোক ছিল। তারপর আধিপত্য দেখানো শুরু করে। টাকা চায় অনেক। আমিরের উপর কথাবলা শুরু করে। হুমকি দেয়। তার চাহিদা বেড়ে যায়। অনেকদিন সহ্য করার পর একদম উপরে পাঠিয়ে দেই।'রিদওয়ান হাসলো। যেন খুব মহৎ একখানা কাজ করেছে। তারপর আবার বললো, 'প্রান্তর আব্বা আর আবদুল এদের নিয়েও প্রশ্ন করবে নাকি? এদের কথা জেনে তোমার লাভ নেই। দুইজনই সব জেনে ফেলার কারণে মরেছে। সহজ হিসাব। প্রান্তর বাপ আমিরের হাতে,আবদুল আমার হাতে। এসব বাদ দেও। আমরা আমিরের কথাতে যাই। তোমাকে শুধু আমিরের গল্প শোনাব।'

রিদওয়ান কাছে কথাগুলো যেন কত স্বাভাবিক! যেন মশা মারার গল্প বলছে! পদ্মজা ভীষণ অবাক হচ্ছে। এই হাওলাদার বাড়ির আঁচ তার গায়ে এতো আগে থেকেই লেগেছিল! হানিফকে খুন করতে গিয়ে তার মা খালি হাতে ফিরে আসে। তারপরদিন হানিফের লাশ পাওয়া যায়। অথচ,তার মা খুন করেনি। প্রান্তর বাপ খুন হয়। প্রান্ত মুন্না থেকে প্রান্ত হয়ে উঠে,তাদের ভাই হয়ে উঠে। আমির শিকার করতে এসে তার প্রেমে পড়ে যায়। বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের আগেরদিন রাতে নদীতে লাশ পাওয়া যায়। তারপর অবশেষে বিয়ে হয়! সবকিছু

এক সুতোয় গাঁথা! এ কেমন যোগসূত্র! পদ্মজার মাথা ভনভন করতে থাকে। এতদিন একটা চক্র তার আশেপাশে শব্দ তুলে ঘুরঘুর করছিল । সে শব্দ ঠিকই শুনেছে তবে তার উপস্থিতি ধরতে পারেনি। রিদওয়ান বললো, 'বিয়ের দিন রাতে বড় চাচার কথায় ভরসা রেখে তোমাকে ছুঁয়েছিলাম। ভেবেছিলাম,আমির কিছু বলবে না। কিন্তু হলো কি? সে তো তোমার রূপে একেবারে কুপোকাত।

তারপরের ঘটনাও বোধহয় জানো। আমির আষ্টেপৃষ্ঠে তোমাকে আগলে রাখা শুরু করে। একসময় বিভিন্ন কার্যকলাপে তোমার সন্দেহ হতে থাকে। এই ব্যাপারটা আমিরকে চিন্তায় ফেলে দেয়। পাহারাদার বাড়িয়ে দেয়। তোমার উপর নজর রাখার জন্য রেখে দেওয়া হয় লতিফাকে। তাই আমিরের সাজানো দেয়াল ভেঙে পৌঁছাতে পারোনি পাতালঘরে। তোমার আম্মা নাকি চোখের দৃষ্টি দেখে,মানুষ চিনতে পারেন? কার মুখ থেকে জানি আমির শুনেছিল। ব্যাপারটাকে গুরুতর ভাবে নিয়ে নেয় আমির। সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। তোমার আম্মাকে নিয়ে একটু ভয়েও ছিল। মহিলার চাহনি,কথাবার্তা খুব বেশি ধারালো আর সজাগ। আমির পরিকল্পনা করে,তোমার আম্মার গলাটা আলাদা করে দিবে। মাঝপথে কাঁটা রাখা ভালো না। এটা কিন্তু আমার কথা না। আমিরের কথা।'

রিদওয়ান পদ্মজার মুখের ভঙ্গি দেখার জন্য তাকালো। পদ্মজার চোখ দুটি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। আমির হাওলাদার তার মাকে খুন করতে চেয়েছিল! রিদওয়ান পদ্মজার মেজাজ আঁচ করতে পেরে বললো, 'এমনকি খুন করতেও গিয়েছিল।'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। তার চোখে জল টলমল করছে সেই সাথে লাল হয়ে উঠেছে। রিদওয়ান বললো, 'ঘটনাটা তোমার বিয়ের কয়দিন পরের। সেখানে গিয়ে জানতে পারলো,তোমার আম্মার কি এক রোগ হয়েছে। মরে যাবে,সব ভুলে যাবে। সম্ভবত তোমার আম্মা তোমার আব্বার সাথে কথা বলছিল। আমার ঠিক মনে নেই। অনেক আগের ঘটনাটা তো। তাই আমির তার পরিকল্পনা বাদ দিল। কয়দিন পর তোমাকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে । এখন আর এসব করে লাভ নেই। কয়দিন পর এমনিতেই মরে যাবে। তবে যদি না মরতো তাহলে কিন্তু আমিরই খুন করতো। এই হলো তোমার সোহাগের স্বামী।'

রিদওয়ানের ঠোঁটে তিরস্কারের হাসি। কি যে আনন্দ হচ্ছে তার! শুধু পদ্মজা জানে তার কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে। আমিরের প্রতি রাগ,ঘৃণা নিঃশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এই মুহূর্তে যদি তার হাত,পায়ের বাঁধন খোলা থাকতো তবে সে রিদওয়ানের এই গা জ্বালা হাসি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে,আমিরকে শেষ করে দিত। রিদওয়ান হইহই করে উঠলো, 'আরে আরো বাকি আছেতো। থেমে গেলেতো চলবে না। যেদিন তোমার মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল দিল,সেদিন তোমার আম্মা প্রথম আমাদের বাড়িতে আসেন। আর আমাকে দেখে চিনে ফেলেন। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী মহিলার মস্তিষ্ক নাড়া দিয়ে উঠে। তিনি তোমাকে নিয়ে ভয় পান বোধহয়। আমি রাতে দ্বিতীয় তলায় হাঁটছিলাম রুম্পা ভাবির ঘরটা নজরে রাখার জন্য। ধীরে,ধীরে হাঁটছিলাম তাও সেই শব্দ তোমার মায়ের কানে চলে যায়। তিনি বেরিয়ে আসেন। আমাদের কথা হয়। উনি তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ভেঙে পড়েন। মা হিসেবে এমনটাই হওয়ার কথা। শেষ রাতে আমি আর আমির ছাদে ছিলাম। আচমকা দেখি, তোমার আম্মা জঙ্গলের ভেতর ঢুকছেন। কত সাহস! মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে প্রথমবার এসেই সন্দেহ করে পুরো বাড়ি ঘুরা শুরু করেছেন! বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই। জঙ্গলের ভেতরই আমাদের সব। তখন এতো নিরাপত্তা ছিল না। তাই আমির ছুরি নিয়ে তোমার মায়ের পিছু ধাওয়া করে। লক্ষ্য ছিল,যখনই তোমার আম্মা টের পাবে কিছু। তখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তোমার আম্মা পুরো জঙ্গল ঘুরেও কিছু ধরতে পারেননি। এটা তোমার আম্মার ভাগ্য! নয়তো ওখানেই মরতে হতো। এখানেই কিন্তু সব শেষ নয়। তোমরা ঢাকা যাওয়ার পর উনি আরো দু-দুবার লুকিয়ে এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। দুইবারই হাবলু উনার পিছু নিয়েছে। আমি আমিরকে চিঠি লিখি। তখন আমির জানালো,আরেকবার তোমার আম্মা যদি এখানে আসে সঙ্গে সঙ্গে যেন মৃত্যু উপহার দিয়ে দেই। কিন্তু তিনি আর আসেননি। কিছু না পেয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন,এখানে কিছু

নেই। এই বাড়িতে গোপন কিছু নেই। নয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছু একটা হবে জানি না অতো। তোমার মায়েরও ভাগ্য ভালো! দুইবার মেয়ের জামাইয়ের হাতে খুন হতে গিয়েও হয়নি,দুইবার হাবলুর মতো জাত খুনির হাতে খুন হতে গিয়েও হয়নি। উনার মৃত্যুটাই লেখা ছিল রোগে। সে যাই হোক। দেখো, আমির জানতো তোমার মা তোমার কতোটা প্রিয়। তবুও কিন্তু নিজের স্বার্থ দেখেছে। তোমার মাকে খুন করতে চেয়েছে। এমন মানুষকে তুমি ভালোবেসেছো! রাগ হচ্ছে না ভেবে?'

পদ্মজা নির্বাক,বাকহারা। তার ভেতরে বিন্দুমাত্র ভালোবাসার অনুভূতি যেন নেই। রিদওয়ান আবার বলতে শুরু করলো, 'আমির তোমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আর বোনের বিয়ের জন্য এখানে আসেনি। তুমি ভেবেছো, সব কাজকর্ম ফেলে শুধু তোমার মন রাখতে এসেছে। এটা মিথ্যা। ও এখানে এসেছে বিপদে পড়ে। কুয়েত থেকে বড় অংকের টাকা অগ্রীম নিয়েছে ছয় মাস আগে। বিনিময়ে ত্রিশটা মেয়ে দিতে হবে। মেয়েগুলোর গায়ে একটু দাগও থাকতে পারবে না। মেয়ে দেয়ার কথা ছিল এক মাস আগেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি,পারিনি। সব মানুষ চালাক হয়ে গেছে। এমন কখনো হয়নি। এইবার সব ওলটপালট হয়ে গেছে। আমির এর উপর চাপ আসতে থাকে। ও টাকাগুলোও খরচ করে ফেলছে। কী করছে কে জানে। কুয়েত থেকে হুমকি এসেছে,আরো এক মাসের মধ্যে ত্রিশটা মেয়ে দিতে না পারলে আমাদের সম্পর্কে সব প্রমাণ বাংলাদেশ পুলিশ ঐক্যতে পাঠাবে। যেভাবেই হউক আমাদের ধ্বংস করবে। ওরা খুব ক্ষমতাশালী। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের সাথে তাদের চক্র শামিল আছে। আমরা সবাই এখন একটা ঝড়ে আছি। বিশেষ করে আমির আর ওর বাপ। তাই আমির এখানে এসেছে। এক মাস শেষ হওয়ার আর বারোদিন বাকি। মেয়ে পাচার করতে হবে আটদিন পরই। মেয়ে যোগাড় হয়েছে নয় জন। যেভাবেই হউক আমাদের একুশটা মেয়ে লাগবেই। তাই এখন খুব চাপ। আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে উপস্থিত তুমি!'

রিদওয়ান শব্দ করে হাসলো। তার হাসি যেন থামছে না। পদ্মজা তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'ধ্বংসের লক্ষণ শুরু হয়েছে। দুশো বছর চলেছে আর কত চলবে!'

'কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না। আমিতো দেবই না। আমার জীবনে কিছু বলতে শুধু এই অংশটাই আছে। বেঁচে থাকার একটাই অংশ।'

'যে মেয়েগুলোকে মেরেছেন তাদের না মেরে পাচার করেই দিতে পারতেন। সেটা কেন করেননি?'পদ্মজার ভেতরে অপ্রতিরোধ্য তুফান চললেও। কণ্ঠ শান্ত। রিদওয়ান স্বাভাবিক স্বরেই জানালো,কেন তারা এই মেয়েগুলোকে পাচার করতে পারছে না। মেয়েগুলো দুই মাস ধরে এখানে আছে। প্রথম পনেরো দিন বীভৎস ধর্ষণে এদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে,শরীরে বিভিন্ন দাগ বসে গেছে। তখন তারা জানতো না,তাদের মেয়ের অভাব পড়ে যাবে। তারপরও এক মাস ঔষধপত্র দিয়ে মেয়েগুলোর ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করেছে। হয়নি। তাই বিগত পাঁচদিন ধরে তারা তাদের রীতি অনুসারে মেয়েগুলিকে পিটাচ্ছে। আজ দুটো মেয়ে মারা গেছে। আগে লাশই ফেলে দেয়া হতো। পাঁচ বছর ধরে টুকরো,টুকরো করা হয়। এটাও আমিরের বুদ্ধি। যাতে কোনো মানুষের চোখে না পড়ে,আর পুলিশও শনাক্ত করতে না পারে। পুলিশরাও এখন চালাক হয়ে গেছে।

পদ্মজা বললো, 'আমি মেয়ে পাচার করতে দেব না।'

'কী করবে?'

পদ্মজা নিশ্চুপ।

'কিছুই পারবে না। আমির তোমাকে ছেড়ে দিলেও আমরা ছাড়ব না। আর আমিরও তোমাকে ছাড়বে না। ও তোমার শরীরে আকৃষ্ট। ভালোবাসে না। যেদিন তুমি রুম্পার ঘরে রাতে ছিলে সেদিন আমির তোমার খেয়াল রাখার জন্য না, তোমার উপর নজর রাখার জন্য রাতে ঘুমায়নি। রুম্পা কখন কী বলে দেয় সেই ভয়ে। রুম্পাকে খুন করার পরিকল্পনাও আমিরের। ও বাবলুকে পাঠায়। হাবলুর ভাই বাবলু। দুজনই বংশগত জাত খুনি। কিন্তু গিয়ে

দেখে আলমগীর ভাইয়া তার বউকে নিয়ে পালাচ্ছে। তবুও বাবলুর সাথে ওরা পারতো না। সেখানে তুমি বাগড়া দাও। বাবলুকে খুন করে ফেলো! কী আশ্চর্য! একদম মায়ের রূপ পেয়েছো। পুরোটা দৃশ্য কিন্তু আমির দেখেছে। ও জঙ্গলে ছিল। এতো,এতো চিন্তার মাঝে তোমার এই রূপ! তুমি যখন পূর্ণাকে নিয়ে অন্দরমহলে চলে যাও,তখন লাশ সরিয়ে দেয়া হয়। তুমি পূর্ণাকে নিয়ে ঘরে যাও তখন আমির তোমাদের ঘরে চলে যায়। এমনকি আমিরের জ্বরও হয়েছিল,মেয়ে যোগাড়ের চিন্তায়। এমন অবস্থায় তোমার খুনাখুনির কাজকর্ম আমিরকে পাগল করে তুলে। অস্থির হয়ে পড়ে। রানিকে খোঁজার নাম করে এখানে এসে পরিকল্পনা করে,তোমাকে ভয় দেখানোর। যাতে তুমি ঢাকা চলে যাও আমিরকে নিয়ে। ওর বিশ্বাস আটদিনে মেয়ে যোগাড় করে ফেলবে। কিন্তু এটা বিশ্বাস নেই যে, তুমি আট দিন পর ঢাকা যেতে রাজি হবে। তাই আগে থেকে কাজ এগিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে। এমনকি তোমাকে মারতেও বলেছে। যাতে ভয় পাও। মারার পরও যখন ভয় পাওনি। তারপর বললো,তোমাকে রক্ত দেখাতে। যদিও একটা মেয়ের রক্ত দেখিয়েছিলাম তোমাকে। ওর বিশ্বাস ছিল,স্বামীর জানের মায়ায় হলেও ছেড়ে দিবে এই গ্রাম। কিন্তু তুমিতো মুখের উপর বলে দিলে,ঢাকা ফেরত যেতে রাজি না তুমি। এই সত্যি তুমি আমিরকে ভালোবাসো? ভালোবাসা কী?'

পদ্মজা দাঁতে দাঁত চেপে চোখের জল ফেলছে। রিদওয়ান দুই হাত নাড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, এসব ভালোবাসা-টালোবাসার কথা বাদ দেও। আমির তোমাকে ভালোবাসে না। সব ওর নাটক। ও তোমার রূপকেই ভালোবেসেছে। এখনও যে রূপের শরীর তোমার! আমিই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সেখানে তো ও হালালভাবে ভোগ করার সনদ পেয়েছে। সবশেষে, ভালোভাবে বলছি পদ্মজা। কোনো বাগড়া দিও না আর। সব মেনে নাও। নয়তো তোমাকে মরতে হবে। আমির না মারলেও বড় চাচা,আব্বা আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।'

'তিনি কেন আমাকে মারবেন না? তিনিতো আমাকে ভালোবাসেন না।'

'ভালো না বাসলেও টাকার প্রতি যেমন টান ওর তেমন সুন্দরের প্রতি টান আছে। ধরে রাখতে চাইতেও পারে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, অনেক করেছো আর কিছু করো না।'

'কী পান এসব করে?'

'অর্থ পাই। শান্তি পাই।'

'মেয়েদের কষ্ট দিয়ে কীসের শান্তি? হাওলাদার বংশে ভালো ছেলে নেই? সবই খারাপ?'

'যারা ভালো হয়েছে তারা মরেছে। তবে জাফর ভাই,আলমগীর এরা তো ভালো। এদের অনেক পিটিয়েও বড় চাচা,আব্বা এই পথে আনতে পারেনি। জাফর ভাইতো এই সম্পর্কে কিছুই জানে না। জাফর ভাই একটু বোকা ধরণের। অনেক স্পর্শকাতর মন। মুরগির রক্ত দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই তাকে আর এই জগতে আনা হয়নি। আব্বার প্রথম ছেলে ছিল বলে মারেনি। রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয় পড়ার জন্য। তারপর বিয়ে করে বাইরেই চলে গেল। আর আলমগীর ভাইয়া বাধ্য হয়ে এই দলে কাজ করেছে। সুযোগ পেয়ে পালিয়েও গেছে। আমিরতো ছোট থেকেই তেজি। বড় চাচার কাছে আমির হচ্ছে সোনার টুকরা। এসব গল্প করতে ভালো লাগছে না। ঘাড়টা খুব ব্যথা করছে। এতো শক্ত আঘাত দিয়েছো। ডাইনি নাকি তুমি?'

রিদওয়ান আলতো করে ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'আচ্ছা,আসল কথা বলি, আমিরকে ছেড়ে পালিয়ে যাও। এই রাজত্বে থাবা দেয়ার কথা ভেবো না। জীবনে কিছু পাইনি। মা জন্ম দিয়ে মারা গেল। বাপের অবৈধ সন্তান আমি। ছোট থেকে আমি অত্যাচারিত। আজও আমির আমার উপর অত্যাচার করে। অনেক দূর্বল ছিলাম। পানিতে চুবিয়ে রেখেছে,শীতের রাতে উলঙ্গ করে বেঁধে রেখেছে। পিটিয়েছে। আমির মানুষকে

আঘাত করতে পছন্দ করে। মানুষের আকুতি-মিনতি ওর কাছে পরম শান্তির। তুমি ওর কাছে থেকো না। পালিয়ে যাও। পুলিশের কাছে যেও না। অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। ও এখন মায়া দেখাচ্ছে। যখন স্বার্থে বেশি টান পড়বে ঠিকই হাত তুলবে। খুন করে ফেলবে তোমাকে।'

পদ্মজা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে বললো, 'কি বলছেন! তাহলে উনি আপনার কাহিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন!'

রিদওয়ান পদ্মজার কথা বুঝতে পারলো না। সে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলো, 'কিছু বললে?'

পদ্মজা কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ থেকে জল পড়ছে। পিছনের ছয় বছর মিথ্যের জাল দিয়ে প্যাঁচানো! কিছু সত্য নয়। সব মিথ্যে। সব!

আমির মাত্রই এসেছে। এখন শেষরাত। সে পানি খেয়ে রাফেদকে বললো, 'নতুন মেয়ে তিনটাকে খেতে দিও। চিৎকার, চেঁচামেচি করলে ভুলেও মেরো না।'

রাফেদ বললো, 'আপনি ভাববেন না। সব সামলে নেব।'

আমির বিটু(B2) ঘরে বসে রয়েছে। মজিদ বললো, 'আমরা যাই তাহলে। সকালে কাজ আছে আমার।'

আমির কিছু বললো না। কপাল কুঁচকে রেখেছে। সিগারেট ধরালো। খলিল বললো, 'ওই ছেড়িরে এহন কী করবি?'

আমির বললো, 'এটা আমার ব্যাপার। আরভিদ?'উঁচু স্বরে ডাকলো।

আরভিদ সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে আসলো। আমির বললো, 'বাড়ির পিছনে যাও। লতিফা থাকবে। যা দিবে নিয়ে আসবে।'

আরভিদ চলে গেলো। আমির চেয়ারে বসে মজিদকে বললো, 'গেলে যাও। দাঁড়িয়ে আছো কেন? শফিক না আসছিল,কোথায় গেল?'

'রিদুর কাছে গেছে।'বললেন খলিল। তারপর মজিদরে বললেন, 'আইয়ো ভাই। বাড়িত যাই।'

পদ্মজা ক্লান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'ঢাকার অফিস আর গোডাউনে আমি তো অনেকবার গিয়েছি। সেখানে পণ্য দেখেছি। মেনু দেখেছি। কিছুতো মিথ্যে মনে হয়নি।'

'আমিরের সত্যি পণ্যের ইমপোর্ট ব্যবসা আছে। ও কাঁচা কাজ করে না।'

'আর আমার মেয়ে? আমার নিষ্পাপ তিন মাসের মেয়েটাকে কে খুন করেছে? বাবলু করেছে?'

রিদওয়ান এই প্রশ্নে থমকায়। পদ্মজা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে এই প্রশ্নের জবাবের জন্য। দরজায় টোকা পড়ে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে প্রবেশ করলো একটা চেনা মুখ। রিদওয়ান হেসে বললো, 'আরে শফিক। শেষরাতে এখানে?'

শফিক পদ্মজাকে জহুরি চোখে দেখলো। শফিকের এলোমেলো চুল,নোংরা চাহনি। সে রিদওয়ানকে বললো, 'হু,আসছি। আগে বল,আমিরের বউ এখানে কেন? এই মেয়েরেও চালান করে দিবে নাকি?'

'নিজে নিজেই চলে এসেছে। কোনো বিপদ? থানার কী অবস্থা?'

'তোরা কি আজমপুর থেকে কোনো মেয়ে এনেছিস? আজমপুরের মাতব্বর মামলা করেছে। তার মেয়ে হারিয়ে গেছে। বিশাল বড়লোক। বড়লোকদের ব্যাপার স্যাপার তো জানিসই। আশেপাশের সব এলাকাতেই খোঁজ চলছে। আগামীকাল অলন্দপুরেও পুলিশ আসবে। তাই তোদের জানাতে এসেছি। সাবধানে থাকিস।'

'দুনিয়ার সব ভেজাল একসাথে এইবারই আসতেছে।'ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো রিদওয়ান।

শফিক তার গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে পদ্মজাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখলো। তারপর পদ্মজার পায়ের কাছে বসলো। পদ্মজার ফর্সা পা দুটিতে তার নজর পড়ে। পায়ে

আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বললো, 'খুব সুন্দরী। কাছ থেকে প্রথম দেখলাম। মেরেই তো দিবে নাকি?'

শফিকের ছোঁয়া যেন পদ্মজার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিল। সে হুংকার ছাড়লো, 'একদম ছোঁয়ার চেষ্টা করবেন না। দূরে সরুন।'

শফিক অবাক হয়ে রিদওয়ানকে বললো, 'আরে এর তো তেজ অনেক। আমির সামলায় কেমনে?'

রিদওয়ান ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকিয়ে রেখেছে। তার সাহস হচ্ছে না পদ্মজাকে ছোঁয়ার। কিন্তু অন্য কেউ আমিরের দূর্বলতায় হাত দিচ্ছে দেখে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। সে শুধু দৃশ্যটা উপভোগ করছে। শফিক শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বললো, 'এতো সুন্দর মেয়ে হাতছাড়া করা যায় না। মেরেই যখন দেয়া হবে একটু উপভোগ করে দেখি কী বলিস?'

পদ্মজার বুক ধুকপুক করছে। শেষমেশ তার ইজ্জতেও হাত পড়ছে। সে ছটফট করতে থাকে ছোটার জন্য। পদ্মজা বাঁধা অবস্থায় উল্টা হয়ে ছিল। শফিক সোজা করে। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার মসৃণ,পাতলা পেট উন্মুক্ত হয়ে উঠে। শফিকের লোলুপ দৃষ্টি দেখে পদ্মজার শরীর রি রি করে উঠে। সে প্রাণপণে ছোটার চেষ্টা করছে। শফিক উল্লাসে বললো, 'আরে ভাই, এমন সুন্দর মেয়েমানুষ তো দুটো দেখেনি। আমিরের উচিত ছিল আমাদের সাথে ভাগ করে নেয়া। একাই ছয় বছর – আচ্ছা যাক। তুই এখানে বসে থেকে দেখবি? দেখলে দেখতে পারিস।'

শফিক আরো অশ্লীল মন্তব্য করে। যা শুনে পদ্মজার ঘৃণায় বুক ফেটে কান্না আসে। শফিক পদ্মজার উপর ঝুঁকতেই পদ্মজা চেঁচাতে থাকে। এক দলা থুথু ছুঁড়ে দেয় শফিকের মুখের উপর। শফিকের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। প্রবল আক্রোশে পদ্মজার আহত গালে থাপ্পড় বসায়। পুরনো ক্ষতস্থানের পুরো চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ব্যথায় পদ্মজার সারা শরীর টনটন করে উঠে। আর্তনাদ করে উঠে'আম্মা'বলে। তখনই দুটি পায়ের শব্দ ভেসে আসে। কেউ একজন দৌড়ে এদিকে আসছে। রিদওয়ান আমিরের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত ভয়ে চেয়ার থেকে উঠে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। ঘরে এসে প্রবেশ করলো আমির। রিদওয়ানের ধারণাই সত্যি। আমির পদ্মজার চিৎকার শুনেই চলে এসেছে। আমির এখানে আছে জানলে রিদওয়ান শফিককে নিষেধ করতো। শফিকও তো বলেনি! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়!

শফিক আমিরকে দেখে হাসলো। বললো, 'আমির এই বউ তো-

চোখের পলকে সেই হাসি মিলিয়ে যায়। কথা বলাও থেমে যায়। আমির থাবা মেরে ধরে শফিককে। রিদওয়ান দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এটু(A2) ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। শফিক কিছু বুঝে উঠার পূর্বে আমির ছুরি দিয়ে শফিকের গলার রগ কেটে ফেলে। রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার উপর। আমির নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুরি দিয়ে শফিকের দুই চোখে আঘাত করে। পেটে,বুকে আঘাত করে। শফিকের মাথা দুই হাতে ধরে দেয়ালে শব্দ তুলে আঘাত করে। শফিকের মুখ থেকে গ্যার-গ্যার ধরণের একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। সেই শব্দ আর আমিরের বিশ্রি গালিগালাজে পদ্মজা ভীত হয়ে পড়ে। রক্তে সারা ঘর রক্তপুরী হয়ে উঠেছে। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। সে কখনো আমিরকে খুন করতে দেখেনি। আজই প্রথম দেখছে। কী নির্মম তার খুন করার ধরণ। কী হিংস্র তার চাহনি,তার আক্রমণ! চোখের পলকে মানুষ খুন করে ফেলেছে! পদ্মজা চোখ বুজে জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো।আমিরের সারামুখে রক্ত। চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাপাচ্ছে না। দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো মজিদ,খলিল,রাফেদ,আরভিদ।

মুহূর্তে চারিদিক থমকে যায়। থেমে যায় সব শব্দ। শফিকের রক্তাক্ত দেহটি মেঝেতে পড়ে আছে। চোখ দুটি যেন বেরিয়ে এসেছে। গলার রগ থেকে ছিটকে রক্ত বের হচ্ছে। যেকোনো সাধারণ মানুষের কাছে এই দৃশ্য দেখা মানে ওই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করা। গড়গড় করে বমি করা। পদ্মজার সারা শরীর কাঁপছে। এমন মানুষের সাথে সে কিছুতেই পারবে না।

মুহূর্তের ঘটনায় সে হার মেনে নিয়েছে। মনেপ্রাণে নিজের মৃত্যু চাইছে। এই মুহূর্তে মনে ভয় ছাড়া আর কিছু নেই।ভালোবাসা,রাগ,ঘৃণা,ক্রোধ কিছু নেই। সে শুধু ভয় পাচ্ছে।

(অনেক হয়েছে রক্তারক্তির গল্প! এবার নতুন মোড় ধরতে হবে।)

পর্ব ৬৭

আমির হাতের ছুরি চেয়ারের উপর রাখলো। তারপর রক্তমাখা জ্যাকেট খুলে মেঝেতে ফেললো। পদ্মজা ভয়ে মিইয়ে গেছে। অস্বাভাবিকভাবে ফোঁপাচ্ছে। খলিল যত দ্রুত সম্ভব জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন। মজিদ তীব্র বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে বিকৃত রূপ ধারণ করলেন। শফিক তাদের কতো কাজে লাগতো,সেটাও শেষ! পদ্মজাকে তার শুরু থেকেই অপছন্দ। মেয়েটার রূপের আড়ালে তিনি আগুন দেখতে পান। যে আগুন আমিরকে ঘায়েল করে তাদের নিঃশেষ করে দিবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমিরকে কিছু বলে লাভ নেই। পরে সময় করে বোঝাতে হবে। মাথায় অনেক চিন্তা নিয়ে তিনিও জায়গা ত্যাগ করলেন। আমির তার গায়ের শার্ট খুলে হাত-মুখের রক্ত মুছে,পদ্মজার দিকে এগিয়ে আসলো।

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকানোর সাহস অবধি পাচ্ছে না। সে খুনের দৃশ্যটি বার বার দেখছে। মনে হচ্ছে,এই বুঝি আমির তার চোখ দুটি... না ভাবা যাচ্ছে না! পদ্মজা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো। আমির ছুঁতেই দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমির দুই সেকেন্ডের জন্য থামে। তারপর জোর করে পদ্মজাকে বসালো। পদ্মজার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজা বিছানার এক কোণে চলে গেল। সে স্থির হতে পারছে না। তার মন,শরীর ভীষণভাবে অস্থির হয়ে আছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। আমির অনেকক্ষণ পদ্মজার ভয় পাওয়া দেখলো। তারপর ডাকলো, 'পদ্মজা।'

পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখেছে। সে আমিরের ডাকে সাড়া দিল না। আমির উঁচু কণ্ঠে বললো, 'তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তোমাকে কিছু করবো না।'

তাও পদ্মজা তাকায় না। তার শরীর বিরতিহীনভাবে কাঁপছে। আমির বিছানায় উঠে আসে। জোর জবরদস্তি করে পদ্মজাকে নামিয়ে আনে বিছানা থেকে। ধমক দেয়। পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসে এফোর(A4) ঘরে। এ ঘরটা অন্যরকম। সাধারণ ঘরের মতো। পদ্মজাকে বিছানায় রাখতেই, পদ্মজা আমিরকে জোরে ধাক্কা দিল। কিন্তু অদ্ভুত! তার ধাক্কায় আমির এক আঙ্গুলও নড়েনি। আমিরকে পদ্মজার আর স্বামী মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে দানব। একটা দানব দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সে মুক্তির জন্য ছটফট করছে আর কাঁদছে। আমির পদ্মজাকে স্থির করার চেষ্টা করে। পদ্মজা কিছুতেই স্থির হয় না। সে তার মাকে খুঁজছে। মুক্তি চাইছে। ভয়ে তার শরীর শীতল হয়ে গেছে। বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো হু হু করে কাঁদছে। আমিরের ধৈর্য্য ভেঙে যায়, জোরে ধমকে উঠে, 'কান্না থামাও। থামাও বলছি।'

পদ্মজা কান্না থামানোর চেষ্টা করে। ভয়ার্ত চোখে আমিরের দিকে তাকায়। আমির আসার সময় আরভিদকে দেখেছে। আরভিদের হাতে একটা ব্যাগ ছিল। সে পদ্মজাকে রেখে দরজার কাছে এসে আরভিদকে ডেকে ব্যাগ নিল। ব্যাগে পদ্মজার ঔষধপত্র,শাড়ি,ব্লাউজ,সোয়েটার,শাল রয়েছে। যখন বের হয়েছিল তখন বাইরে লতিফা দাঁড়িয়ে ছিল। ফরিনা পাঠিয়েছেন পদ্মজার খোঁজ নিতে। নয়তো তিনি খাবেন না। তাই লতিফা বাধ্য হয়ে এসেছিল। আমির লতিফাকে দেখে রেগে যায়। লতিফাও ভয় পেয়ে যায়। তবে আমির রেগে কিছু বললো না। শুধু প্রশ্ন করলো কেন এসেছে? তারপর উত্তর দিয়ে দিল,পদ্মজা ভালো আছে। একটা ব্যাগে যেন পদ্মজার দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে দেয়া হয়। শেষ রাতে যেন বাড়ির পিছনে অপেক্ষা করে। আর দুইদিন থাকা হবে এখানে। দুটো দিন পদ্মজাকে চোখের আড়াল করা যাবে না। লতিফা শেষ রাতে ব্যাগ নিয়ে আসে। আমির লতিফার কথা ভুলে যায়। তারপর যখন মনে পড়ে,আরভিদকে পাঠায়। আমির ব্যাগ থেকে শাড়ি,ব্লাউজ বের করে বিছানার এক পাশে রাখলো। পদ্মজাকে বললো, 'তখন বমি করেছো,এখন আবার রক্তও লেগেছে। পাল্টে নাও।'

আমিরের কণ্ঠ শান্ত,স্বাভাবিক। কিছু মুহূর্ত আগের ঘটনার কোনো ছাপ নেই তার মুখে। সে পদ্মজার জবাবের জন্য অপেক্ষা করে। পদ্মজা জবাব দেয় না। তার ফোঁপানো ধীরে ধীরে

কমে আসে। ফিরে আসে তার স্থির স্বভাবে। পদ্মজার গাল থেকে রক্ত ঝরছে। আমির তুলা এনে কিছুটা বিছানায় রাখলো,আর কিছুটা দিয়ে পদ্মজার গালের রক্ত মুছার জন্য পদ্মজার এক হাত ধরে তার দিকে ফেরানোর চেষ্টা করতে চাইলো, তখনই পদ্মজা ছ্যাৎ করে উঠে দূরে সরে যায়,চোখ বড় বড় করে বললো, 'দূরে থাকুন।'

'রক্ত ঝরছে তো।'

'আমারটা আমি দেখে নিতে পারবো।'

পদ্মজা বাকি তুলাটুকু নিজের গালে চেপে ধরলো। আমিরের আর কি বলার! সে পদ্মজার সাথে কথা বাড়ানোর সাহস পায় না। বিছানার চেয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে কাঠের চেয়ারে বসলো। দুজন দুইদিকে বসে থাকে চুপচাপ। নিস্তব্ধ,শান্ত পরিবেশের জন্য পদ্মজার নিঃশব্দে কান্না করাটা শুনতে পাচ্ছে আমির। সে কথা বলতে গিয়ে দেখলো,তার কথা ফুটছে না। আরো দুইবার চেষ্টা করার পর কথা ফুটল, 'কী করবে ভেবে পাচ্ছো না? অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে?'

পদ্মজা আগুন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। কটাক্ষ করে বললো, 'আনন্দ হচ্ছে আপনার?'

'আনন্দ হওয়ার কী আছে?'

'কিছু নেই?'

'না।'

'ওই লোকটিকে খুন করে নিজেকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন?'

'নিজেকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তোমার কাছে ভালো হতে পারবো?'

পদ্মজা থমকাল। সময় নিয়ে বললো, 'আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছেন। আপনি আমাকে একটার পর একটা মিথ্যা বলেছেন। আর অন্যদের সাথে নৃশংসতার কথা না হয় বাদই দিলাম। তারপরও আমি আপনাকে ভালো মনে করব?'

'সেটাই তো বললাম।'

তীব্র ঘৃণায় পদ্মজা মুখ ফিরিয়ে নিল। আমির বললো, 'এসব কে বলেছে?'

'মিথ্যে তো বলেনি।'

'রিদওয়ান?'

'সত্য তো?'

আমির উত্তর দিল না। পদ্মজা বললো, 'আমার নিজেকে নর্দমার কীট মনে হচ্ছে। আপনার মতো একটা মানুষের সাথে এতদিন বসবাস করেছি আমি।'

'গোসল করে পরিষ্কার হয়ে যাও।'

'মজা করছেন?'

'না।'

'তারপর তো ঠিকই ছুঁবেন। জোর করে অপবিত্র করে দিবেন। পুরুষ তো আপনি। পেরে উঠবে না কোনো নারী। নারী তো ভোগের জিনিস। ভোগ করে করে ফেলে দেওয়ার জিনিস।'

আমিরের কপালে ভাঁজ পড়ে। বললো, 'কবে তোমাকে জোর করেছি?'

'আপনাকে ভালোমানুষ ভেবে, স্বামী ভেবে কখনো জোর করার সুযোগ দেইনি।'

'ভালোবেসে না?'

'দয়া করে, ভালোবাসার নাম মুখে নিয়েন না। আমার রূপে পাগল আপনি। আমার মতো সুন্দর মেয়ে আপনি দুটো দেখেননি এজন্য রেখে দিয়েছেন। বিয়ে করেছেন। হালাল সনদের অধিকারে ভোগ করেছেন। আমার এই সৌন্দর্য যদি না থাকতো, কবেই ছুঁড়ে দিতেন আবর্জনায়।'

'রূপ নিয়ে অহংকার করছো? পাগল হয়ে গেছো তুমি।'

'তাই করছি। আপনার ভাই রিদওয়ানের মনোরঞ্জনের জন্য আমাকে তুলে আনতে গিয়েছিলেন। নিজের বউকে অন্যজনের ভোগের জন্য আনতে গিয়েছিলেন।'

আমির হাসলো। হেসে বললো, 'তখন তুমি আমার বউ ছিলে? দেখার পর হয়েছো।'

আমিরের হাসি পদ্মজার রাগ আরো কয়েনগুণ বাড়িয়ে তুললো, 'আমার এই সুন্দর মুখ না থাকলে আমার জায়গা কি আপনার বিলাসবহুল বাড়িতে হতো? স্থায়ী রক্ষিতা হিসেবে?'

'তোমার মনে হচ্ছে না, তুমি বাড়াবাড়ি করছো? তোমার সাথে এমন কথাবার্তা যায় না।'

'আপনি তো আমাকে আমার জায়গায় থাকতে দিলেন না। আমাকে আপনার স্তরেই নামতে হবে এখন। নয়তো বাঁচবো কী করে? কয়দিন পরতো আমার বোনদের উপরও আপনার হাত পড়বে। ব্যবসায় বিপদে পড়েছেন তো।'

'আটপাড়ার মেয়েদের-

পদ্মজা আমিরের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'জানি আমি। কিন্তু সেই নিয়ম ভেঙে আপনি আমাকে ঠিকই তুলে আনতে গিয়েছিলেন। মেয়ের প্রয়োজনে আমার বোনদের উপর হাত দিবেন না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? যেখানে আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছিলেন।'

'তোমার বোনদের উপর কখনো কোনো আক্রমণ আসবে না। তুমি খুব বেশি কথা বলছো।

'শরীরের শক্তির সাথে তো পেরে উঠি না।'

'তাই কথা বলে মাথা খাচ্ছো?'

'আপনার মরে যেতে ইচ্ছে করে না? এতো খারাপ কাজ করার পরও নিজেকে ক্লান্ত মনে হয় না? মনে হয় না,এইবার থামা উচিত?'

আমির মেরুদণ্ড সোজা করে বসলো। বললো, 'অনেক কথা বলেছো। এইবার গোসল করে, খাওয়াদাওয়া করে আমাকে সুযোগ দাও।'

'কীসের সুযোগ?'

'তোমাকে বাঁধার। আমাকে বের হতে হবে আবার।'

পদ্মজা অন্যদিকে ফিরে বসে। যার অর্থ সে গোসল করবে না। তার অসহ্য লাগছে আমিরকে। আমিরের খুন করার অভিজ্ঞতা দেখে হাতাহাতি করার সাহস মরে গেছে। এখন থেকে যা করতে হবে,পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে। নয়তো সে কিছুতেই পারবে না। মেয়েগুলোর মুক্তির আকুতি করে যে লাভ নেই সেটাও বুঝে গেছে। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে আসলো।। খপ করে পদ্মজার হাতে ধরলো। বললো, 'যাও গোসলে।'

'ছাড়ুন!'কিড়মিড় করে বললো পদ্মজা।

'গোসলে যাও। গোসল করে খাওয়াদাওয়া করে, ওষুধপত্র খেয়ে আমাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করো।'

'নাটক করছেন কেন?'

'নাটক তো তুমিও করছো। যেভাবে কথা বলছো এটা তো তুমি না।'

'উফফ! ছাড়ুন।'

'আমাকে বাধ্য করো না, তোমাকে গোসল করিয়ে দিতে।'

পদ্মজা বিস্ফোরিত হয়ে তাকালো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'তখনই আমি মরে যাবো।'

'সেজন্যই বলছি, নিজে যাও।'

'আমি আপনার কথা শুনবো না।'

'আমার হাতের মার কিন্তু খুব শক্ত। নরম আছি নরম থাকতে দাও।'

'অন্যজনকে দিয়ে মার দিয়েছেন, এবার নিজে মারাটা বাকি। মেরে দিন না, এখুনি মেরে দিন।'

'আমি কাউকে মারতে বলিনি। কিন্তু এরকম চলতে থাকলে, তুমি আমার হাতে শক্ত আঘাত পাবে।'

পদ্মজার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে ভেজাকণ্ঠে বললো, 'সেদিনটাও যে আমাকে দেখতে হবে আমি জানি। তাহলে এখন কেন দরদ দেখাচ্ছেন? নাটক করছেন

কেন?’

‘পদ্মজা আমার দেরি হয়ে যাবে। সময়টা আমার কাছে খুব মূল্যবান। দুই দিন ধরে ঘুম হচ্ছে না। মাথা চড়ে আছে, কথা শুনো।’

পদ্মজা কিছু বলার মতো খুঁজে না পেয়ে,থুথু ছুঁড়ে মারলো। আকস্মিক ঘটনায় আমির হতভম্ব। পদ্মজা কথায়,কথায় থুথু ছুঁড়ে দিচ্ছে। যা অপমানজনক। কিন্তু আমির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে পদ্মজাকে জোর করে টেনে নামালো। বললো, ’গোসলে যাও।’

‘গায়ের জোর দেখাচ্ছেন?’

‘দেখাচ্ছি।’

‘ছয় বছর তো জোরই দেখিয়েছেন।’

‘তোমার সম্মতিতে।’

পদ্মজা আমিরের চোখের দিকে তাকালো। শান্ত,গভীর ক্লান্ত দুটি চোখ। হিংস্রতার বিন্দুমাত্র রেশ নেই। খাড়া নাক,পাতলা ঠোঁটে হালকা গোলাপি ছাপ। থুথুনিতে কাটা দাগ। এলোমেলো চুল,কপালে দারুণ দুটো ভাঁজ। উত্তপ্ত চেনা নিঃশ্বাস মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় প্রাণের স্বামীর কথা। কত কত আদর,সোহাগ,ভালোবাসার ছন্দ এই মানুষটিকে ঘিরে। ঘৃণার মোটা দেয়াল ভেঙে ভালোবাসার অনুভূতিটা কী অদ্ভুতভাবেই ছুঁয়ে ফেললো পদ্মজাকে। তখনই কানে ভেসে আসে রিদওয়ানের কথাগুলো,ভেসে আসে মেয়েদের চিৎকার। চোখের সামনের রঙিন পর্দাটা সরে গিয়ে হয়ে উঠে ক্রোধী। পদ্মজা চাপাস্বরে আমিরকে জানায়, ’শেষ অবধি আমি পদ্মজাই থাকবো।’

আমির পদ্মজার স্বরেই বললো, ’পারবে না। আমার সাথে তুমি পারবে না। বিশ্বাস করো,গায়ের জোরে,বুদ্ধির খেলায় আমার সাথে পারবে এমন মানুষ জন্মিয়েছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কোনো অনুভূতি জন্মালেও জন্মাতে পারে।’

আমিরের শেষ কথাটা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে। কোনো অনুভূতি কি তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হয়? সত্যি কি অনুভূতি কারো ধ্বংসের কারণ হতে পারে? তাহলে সেই অনুভূতি পদ্মজা কোথায় পাবে? যে অনুভূতি দিয়ে আমিরকে নিঃস্ব করে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠানো যাবে। শেষ হবে দুশো বছরের পাপ। আমিরের পদ্মবতী হয়ে উঠবে শুধুমাত্র পদ্মজা।

পর্ব ৬৮

পদ্মজার শরীর ঘামে ভিজে একাকার। প্রচণ্ড গরম লাগছে। সকালে খুব ঠান্ডা ছিল। সোয়েটার পরার পরও তার শরীর কাঁপছিল। তাই আমির পদ্মজার গায়ে শাল পেঁচিয়ে দিয়েছিল। তারপর তো আমির বেরিয়েই গেল। এখন পদ্মজা গরমে ঘামছে। সময়টা দুপুরবেলা। সূর্য আজ অনেক তেজ নিয়ে আকাশে উঠেছে। পদ্মজার হাসঁফাঁস লাগছে। গরমে মাথা ব্যথা হয়ে গেছে। বসে থাকতে থাকতে কোমরও যেন অবশ হয়ে গেছে। আশেপাশে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভোরের দিকে মেয়েদের চিৎকার কানে এসেছিল। পদ্মজার কিছু করার ছিল না। সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। খট করে দরজা খুলে যায়। পদ্মজা চোখ তুলে তাকালো। আমির এসেছে! পরনে ফুলহাতা সাদা গেঞ্জি। পদ্মজা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আমির পদ্মজার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তারপর শাল সরাতে চাইলে,পদ্মজা বাঁধা দিয়ে বললো, 'আমি পারবো।'

আমির সরে দাঁড়ালো। পদ্মজা গা থেকে শাল বিছানায় রেখে সোয়েটার খুললো। তারপর কাঠ কাঠ গলায় বললো, 'দয়া করে আমাকে আর বাঁধবেন না।'

'নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার স্বভাব আমার নেই।'

'বসে থাকতে, থাকতে আমার কোমরের হাড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।'

'দুই-তিনদিন বসে থাকলে হাড় ক্ষয় হয় না।'

পদ্মজা হতাশ হয়ে বললো,"আমার যন্ত্রণা হয়। ঝিমঝিম করে পা।'

আমির ঘরের এক কোণে থাকা কাঠের বক্সের দিকে এগোতে এগোতে বললো, 'মামার বাড়িতে আসোনি যে,যেভাবে চাইবে সেভাবেই হবে।'

'একুশটা মেয়ে কি জোগাড় হয়ে গেছে?'আচমকা পদ্মজার এমন প্রশ্ন, তাও শান্ত কণ্ঠ।

আমির বক্সের তালা খুলে একটা ছুরি বের করলো। পদ্মজার জবাব দিল স্বাভাবিককণ্ঠে, 'এতো সহজ নাকি! এতসব রিদওয়ান কেন যে তোমাকে বললো!'

'আপনি আমার মাকে কীভাবে মারতে চেয়েছিলেন?'

'পথের কাঁটা রাখতে নেই।'

পদ্মজা চমকে গেল,আহত হলো। আমির কত সহজভাবে তার মাকে উদেশ্য করে বললো'পথের কাঁটা রাখতে নেই।'পদ্মজা কথা বলার মতো আর মন পাচ্ছে না। কষ্টও যেন সয়ে গেছে। শুধু তীক্ষ্ণ চোখে আমিরের পিঠের উপর তাকিয়ে রইলো। আমির উঁবু হয়ে কী যেন খুঁজছে। দরজা খোলা। পদ্মজা পরিকল্পনা করলো,সে এখন এক দৌড়ে ধ রক্তে চলে যাবে। যে ভাবনা সেই কাজ, এক পা এক পা করে পিছিয়ে যায়। আমির না দেখেই পদ্মজার উদ্দেশ্যে বললো, 'পালাতে পারবে না।'

পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। বললো, 'পালাচ্ছি না।'

আমির উঠে দাঁড়াল। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তো কোথায় যাচ্ছো?'

পদ্মজা বিছানায় এসে বসলো। তার মাথা কোনো কাজই করছে না। এখানে কোনো পথই নেই। সব পথ যেন বন্ধ করা। সে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো, 'আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করছি না। করবও না। আমাকে বাঁধবেন না অনুরোধ।'

'ছলনার পথ নিতে চাইছো?'

'ছলনা করবো কেন? টয়লেটে যেতে পারি না,শুতে পারি না। স্বামীর নতুন বাড়িতে এসেছি তো নাকি? একটু শান্তি তো দিবেন।'

'অভিনয়ে খুব কাঁচা তুমি। হচ্ছে না। ভালো করে অভিনয় করো নয়তো যা বলার সোজাসুজি বলো।'

পদ্মজা থতমত খেয়ে গেল। সে সোজাসুজি আর কিছুই বললো না। এক রাত চলে গেছে। মানে আর সাতদিন বাকি। কিছু করতে পারবে তো! আমির বক্স থেকে একটা বস্তু হাতে নিল। পদ্মজার দিকে ফিরে বললো, 'যদি এটা ধরতে পারো তোমার বসা,শোয়া

সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।’

কথা শেষ করেই বস্তুটি পদ্মজার দিকে ছুঁড়ে মারলো। পদ্মজা ধরে ফেললো। আমির আবার বক্সের দিকে ফিরলো। বললো, ’দারুণ। আমি আমার কথা রাখবো।’

পদ্মজা বস্তুটির এক মাথা ধরে টান দিতেই একটা ছুরি বেরিয়ে আসে। সে অবাক হয়ে আমিরের দিকে তাকালো। আমির মনোযোগ দিয়ে কি যেন খুঁজেই চলেছে। পদ্মজা তাৎক্ষণিক ভাবলো,ছুরি দিয়ে সে আমিরকে ভয় দেখাবে। ভয় দেখিয়ে সবগুলো মেয়েকে বাঁচিয়ে ফেলবে। তার উত্তেজিত মস্তিষ্ক গভীরভাবে কিছু আর ভাবলো না। পরিস্থিতিকে পানির মতো সহজ ভেবে,সে ধীরে,ধীরে এগিয়ে গেল। আমির আড়চোখে খেয়াল করলো, পদ্মজা আসছে। আর তার হাতে ছুরি। তাও আমির নড়লো না। ওইভাবেই রইলো। আমির যখন একটু দূরে তখন পদ্মজা হাঁটা থামিয়ে দৌড়ে এসে আমিরের গলায় ছুরি ধরে বললো, ’সবগুলো মেয়েকে ছেড়ে দিন নয়তো আমি আপনাকে মেরে ফেলবো।’

আমির হাসলো। বললো, ’পদ্মজা,এখানে শুটিং হচ্ছে না।’

পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে আছে। তবুও সে ভাঙা গলায় হুংকার ছেড়ে বললো, ‘যা বলছি করুন।’

আমির নাছোড়বান্দা স্বরে বললো, ’করব না।’

পদ্মজার আশার পাহাড় দুই ভাগ হয়ে যায়। তবুও সে হার মানার মেয়ে নয়। বললো, ’আমাকে সহজ ভাববেন না। আমি কিন্তু স্বামী বলে ছেড়ে দেব না।’

‘এতো লম্বা হয়ে লাভ কী হলো? স্বামীর গলায় ছুরি ধরতে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিতে হচ্ছে তোমার। এবার পায়ের পাতা মাটিতে ফেলো নয়তো আঙুল ভেঙে যাবে।’

পদ্মজা দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে বললো, ’গতকাল থেকে আপনি আমার সাথে মশকরা করে যাচ্ছেন।’

আমির চমৎকার কৌশলে তার জায়গায় পদ্মজাকে নিয়ে আসে আর পদ্মজার জায়গায় সে চলে আসে। শুধু ছুরিটা আলাদা। আমির বললো, ’তোমার হাতের ছুরি দিয়ে সুতাও কাটা যাবে না। ভোঁতা ছুরি। খেয়াল না করেই আমাকে আক্রমণ করতে চলে এসেছো। মশকরা আমি করছি নাকি তুমি? বাচ্চাদের মতো আচরণ করছো। বুদ্ধি হাঁটুতে চলে এসেছে। গতকালের শফিকের মৃত্যুটা তোমাকে তোমার জায়গা থেকে নড়বড়ে করে দিল, সেখানে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছো! বোকা মেয়ে। এখন আমি যদি তোমার গলার শিরাটা কেটে ফেলি? আমার হাতের ছুরি কিন্তু ভোঁতা না।’

পদ্মজার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। আমির এমনভাবে চেপে ধরে ছুরি ধরেছে যে, মনে হচ্ছে এখুনি আমির তার প্রাণ নিয়ে নিবে। কিন্তু আমির সেটা করলো না। পদ্মজাকে আলগা করে দিল। পদ্মজা ছাড়া পেয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। আমির বললো, ’আগে ঘোর কাটিয়ে নিজের অবস্থানে ফিরে আসো।’

কথা শেষ করে যখনই আমির বের হবে তখন পদ্মজা প্রশ্ন করলো, ’এতো মন্দ ভাগ্য কেন হলো আমার?’

আমির জবাব না দিয়েই চলে গেল। পদ্মজা মেঝেতে বসে,ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে কোনদিকে যাবে,কী করবে? দিকদিশা পাচ্ছে না। এতো ভেবেও কোনো কূলকিনারা পেল না। আমির যদি তাকে বেঁধে না যায় তবে সে কিছু করার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেটা কখনোই হবে না। আমির বোকা না। সে খুব সতর্ক এবং চালাক। পদ্মজা কান্না করা ছাড়া করার মতো আর কিছু পাচ্ছে না। নিজের কপাল চাপড়ে শুধু কান্না করারই সুযোগ আছে এখানে। আমির হ্যান্ডকাপ নিয়ে আসলো। পদ্মজার হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল। পদ্মজা কিছু বললো না,আমিরও বললো না। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে আমির তার মতো চলে গেল। বের হওয়ার পূর্বে আরভিদকে বললো, ’পদ্মজার হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো আছে। যদি এখানে হাঁটাহাটি করে কিছু বলো না। আমি বড় দরজায় নতুন তালা দিয়েছি। চাবি একটা আর সেটা আমার কাছে। যা ই করুক,বের হতে পারবে না।’

আরভিদ বললো, 'যদি আমাকে আক্রমণ করে?'

'ও হাত ছাড়া কাউকে আক্রমণও করতে পারে না। তাই নির্ভয়ে থাকবে। যা ইচ্ছে করুক পাত্তা দিবে না। মনে করবে, পিঁপড়া ঘোরাঘুরি করছে।'

আরভিদ বললো, 'জি,স্যার।'

'মেয়েগুলোকে খাবার দিবে। আমার আসতে অনেক রাত হবে।'

'জি, স্যার।'

আমির রাফেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যাওয়ার পূর্বে ভালো করে সবকিছু দেখে নিলো। পদ্মজা দ্বারা তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো পথ আছে নাকি! নেই! আমির নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। আচমকা তার খেয়াল হলো,তার হাত বন্দি কিন্তু পা বন্দি না। দরজাও খোলা। সে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে আসলো বাইরে। চারিদিক নির্জন,থমথমে। সে আগে প্রতিটি ঘর দেখলো। এটুতে(A2) রিদওয়ান ঘুমাচ্ছে। বাকি ঘরগুলো খালি। সে পা টিপে,টিপে স্বাগতম দরজা পেরিয়ে ধ-রক্ত দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ধ-রক্তের মানে সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে,ধর্ষণ এবং ধ্বংস থেকে নেয়া ধ। রক্তটা বোধহয় এদের মনের আনন্দ। তাই নামকরণ হয়েছে,ধ-রক্ত। পদ্মজা দরজা ধাক্কা দিতেই আরভিদ সামনে এসে দাঁড়ালো।

মৃদুল সাইকেল নিয়ে বড় সড়কে পূর্ণার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা রায়পুর মেলায় যাবে। আজ শেষ দিন। পূর্ণার নাকি অনেকদিনের ইচ্ছে রায়পুর মেলায় যাওয়ার। কিন্তু হেমলতা কখনো মেলায় যেতে দেননি। তিনি সবসময় ভীড় থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছেন। পূর্ণা তার বন্ধুদের কাছে শুধু শুনেছেই কখনো যায়নি। কথায় কথায় যখন মৃদুলকে সে বললো তার ইচ্ছের কথা। মৃদুল তাৎক্ষণিক পূর্ণাকে জানালো, 'আমি তোমারে নিয়া যামু। কাইল দুপুরে বড় সড়কে আইসা পড়বা। বোরকা পইরা আসবা।'

মৃদুল অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠে। তখন দূরের ক্ষেতে দেখা যায় পূর্ণাকে। কালো বোরকা পরা। আপাদমস্তক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা। মাথার উপর তুলে রেখেছে নিকাব। সড়কের দুই পাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত। ক্ষেতের আইল ধরে ছুটে আসছে পূর্ণা। ওড়নার আংশিক অংশ বাতাসে উড়ছে। মৃদুল মনোমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণা মৃদুলের কাছে এসে হাঁপাতে থাকলো। হাঁপাতে,হাঁপাতে বললো, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে তাই না? বড় আম্মা আসতেই দিচ্ছিল না।'

মৃদুল পূর্ণার পাতলা ত্বকের মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললো, 'কী বইলা আইছো?'

'কিছুই না। বলেছিলাম, সুরুজ চাচার বাড়িতে যাব। তখন বললো, কোথাও যাওয়া-যাওয়ি নাই। আপা জানতে পারলে নাকি বড় আম্মার উপর রাগবে। তাই না বলেই চলে এসেছি।'

'চিন্তা করব তো।'

'না বলে কতবার বের হয়েছি। কিছু হবে না।'

মৃদুল তাড়া দিয়ে বললো, 'তাইলে তো হইলোই। তাড়াতাড়ি উঠো। যাইতে সময় লাগব।'

পূর্ণা এতক্ষণে সাইকেল খেয়াল করলো। সে বললো, 'সাইকেলে করে যাব?'

মৃদুল ফিরে তাকাল। বললো, 'তাইলে কী দিয়া যাইবা? হাঁইটা গেলে বাড়ি আইতে আইতে আজকে সারা রাইত লাগব।'

মৃদুলের পিছনে থাকা খালি জায়গাটায় পূর্ণা তাকাল। মৃদুলের খুব কাছে। আর এখানে বসলে মৃদুলের পেট জড়িয়ে ধরতে হবে। ভাবতেই পূর্ণার হাড় হিম হয়ে আসে। এতদিনের পরিচয়ে একজন আরেকজনের হাতও ধরেনি। আর আজ এতো কাছে বসে পেট জড়িয়ে ধরতে হবে! পূর্ণা ঢোক গিলে মিনমিনিয়ে বললো, 'সাইকেল দিয়ে যাব না আমি।'

মৃদুলের ভ্রুযুগল বেঁকে যায়। সে ধমকে উঠে, 'নাটক করতাছো কেন? তাড়াতাড়ি উঠো। আর মুখটা ঘুরো। মানুষ দেখব।'

সূর্যের কিরণ এসে পড়ে মৃদুলের চোখেমুখে। স্নিগ্ধ, চকচকে ফর্সা মুখের সাথে বেঁকে যাওয়া দুটি ভ্রু কী সুন্দর করেই না মানিয়েছে! পূর্ণা সেদিকে চেয়ে থেকে কিছু বলতে পারলো না। নিকাব দিয়ে মুখ ঢেকে মৃদুলের পিছনে বসলো। মৃদুল মৃদু হাসলো, যা চোখে পড়লো না পূর্ণার। মৃদুল সাইকেলের চাকায় পা দিতেই পূর্ণা খামচে ধরে মৃদুলের শার্ট। মৃদুলের সর্বাঙ্গে একটা অজানা,অচেনা সুন্দর অনুভূতির উথালপাতাল ঢেউ উঠে। পূর্ণার বুকে দ্রিম দ্রিম শব্দ হচ্ছে! নিঃশ্বাস এত বেশি এলোমেলো হয়ে পড়ে যে,পূর্ণার মনে হচ্ছে এখুনি সে মারা যাবে। মৃদুল আটপাড়া পার হয়ে, পূর্ণার উদ্দেশ্যে বললো, 'কাঁপতাছো কেন?'

পূর্ণা কিছু বলতে পারলো না। কী লজ্জা! সে কাঁপছে সেটাও মৃদুল টের পাচ্ছে। পথের দুই দিকে যতদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ মাঠ। কোথাও কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। পূর্ণা দূরে চোখ রেখে চুপ করে রয়েছে। মৃদুল বললো, 'পূর্ণা?'

এ কেমন মায়াময় ডাক! পূর্ণার হৃদয়ে উঠা অপ্রতিরোধ্য তুফান বেড়ে যায়। বুকে এতো জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে কেন? যদি মৃদুল শুনে ফেলে! সে তো লজ্জায় মরেই যাবে। মৃদুল আবার ডাকলো, 'পূর্ণা?'

পূর্ণা জুবুথুবু হয়ে উত্তর দিল, 'কী?'

'আমার হাত পা অবশ হইয়া যাইতাছে কেন?'

'আমারও।'

সাইকেল থেমে গেল। মৃদুল পূর্ণাকে বললো, 'নামো।'

পূর্ণা নামলো। মৃদুল বললো, 'সাইকেল দিয়া আর যাওয়া যাইবো না। দূরে থাকা ভালা। তোমার ছোঁয়া বিজলির মতোন বাইরিতাছে আমারে।'

মৃদুলের কথা শুনে পূর্ণার খুব হাসি পেলো। সে হাসি আটকে রাখলো না। হেসে ফেললো। যদিও হাসি দেখা যায়নি। তবে মৃদুল বুঝতে পারলো,পূর্ণা হেসেছে। সে মুখ ভার করে বললো, 'হাসো,হাসো। হাসবাই তো। আরেকটু হলে মরেই যেতাম।'

পূর্ণা সশব্দে হেসে উঠলো। মৃদুল বললো, 'হইছে আর হাসা লাগব না। হাঁটো। মাঠের মাঝখান দিয়া যাই কী বলো? তাইলে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'

পূর্ণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। বললো, 'সাইকেল কী করবেন?'

'হাত দিয়া ঠেলে নিয়া যাব।'

দুজন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রায়পুর চলে আসে। মেলায় ঢুকতেই আছরের আযান পড়ে যায়! পূর্ণার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে ভীত কণ্ঠে বললো, 'আছরের আযান পড়ে গেছে। বাড়ি কখন যাব? একটু পর তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আসুন,চলে যাই।'

'মাত্র তো আইলাম। কিছু কিইনা এরপর যামুনে।'

'দেরি হয়ে যাবে।'

'খালি চুড়ি আর লিপস্টিক হইলেও নিয়া যাবা। আসো।'

মৃদুল শক্ত করে পূর্ণার হাত ধরলো। এই প্রথম মৃদুল হাত ধরেছে! সঙ্গে,সঙ্গে পূর্ণার মনে হয়,চারিদিকের সব ভীড়,কোলাহল থমকে গেছে। থমকে গেছে নাগরদোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ! পূর্ণার মনের আঙিনা জুড়ে নৃত্য শুরু হয়। সে ভুলে যায়, তার বাড়ি ফেরার তাড়া! মৃদুল যেদিকে নিয়ে যায়,সেদিকে ছুটে যায়। চারিদিকে কত শব্দ,কত মানুষ,রঙ-বেরঙের কত শাড়ি,গহনা,চুড়ি। কিছুই পূর্ণার চোখে পড়ছে না। শুধু অনুভব করছে,একটা পুরুষালি শক্ত হাত তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মনে মনে এই মানুষটাকে সে ভালোবাসে! রঙিন,রঙিন স্বপ্ন দেখে। এই সমাজ বিয়ের বাজারে সাদা-কালোর ভেদাভেদ করবে জেনেও সে ভালোবাসে। গায়ের রঙ মেনে কী আর ভালোবাসা হয়! মৃদুল একটা চুড়ির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আট ডজন চুড়ি কিনলো। পূর্ণা মানা করেছে,মৃদুল শুনেনি। চুড়ি কেনার পর মৃদুল বললো, 'অন্যকিছু দেখো। নূপুর নিবা না?'

পূর্ণা মাথা নাড়াল। সে নূপুর নিবে। সে একটা,একটা করে নূপুর দেখা শুরু করলো। মৃদুল এক ডজন সুতার চুড়ি হাতে নিল। চুড়িগুলো নিজের চোখের সামনে ধরলো। চুড়ির গোল ফাঁকা অংশে পূর্ণার মুখটা ভেসে উঠে। নিকাব মাথার উপর তুলে রাখা। চিকন নাকে নাকফুলটা জ্বলজ্বল করছে। পূর্ণা একজোড়া নূপুর হাতে নিয়ে মৃদুলের দিকে তাকালো। মৃদুল দ্রুত চুড়ি সরিয়ে নিল। অন্যদিকে তাকালো। পূর্ণার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে।

কথা ছিল শুধু চুড়ি,লিপস্টিক কিনে চলে যাবে অথচ মৃদুল পারলে পূর্ণার জন্য পুরো মেলাটাই কিনে ফেলে। পূর্ণা মৃদুলের পাগলামি দেখে অবাকের চরম পর্যায়ে। এতকিছু নিচ্ছে! সব জিনিস রাখার জন্য বড় ব্যাগও কিনেছে! পূর্ণা মৃদুলকে চাপা স্বরে প্রশ্ন করলো, 'এত কিছু কেন নিচ্ছেন?'

মৃদুল বললো, 'জীবনে প্রথম আম্মার জন্য শাড়ি,জুতা কিনছিলাম। আজ যখন আবার সুযোগ পাইছি মেয়ে মানুষের জন্য কেনাকাটা করার,কিনতে দেও।'

সন্ধ্যার আযান কানে আসতেই পূর্ণার গলা শুকিয়ে যায়। সে খপ করে মৃদুলের হাতের বাহু খামচে ধরে, কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'আমার আর কিছু লাগবে না। জীবনে আর মেলায়ও আসব না। বাড়ি নিয়ে চলুন।'

'কাঁদতাছো কেন? আইচ্ছা আর কিছু কিনব না। বাজারে যাই। এরপরে বাড়িত যামু।'

মেলায় প্রবেশ করার পূর্বে,রায়পুরের বাজারের এক দোকানে মৃদুল তার সাইকেলটা রেখে এসেছে। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। দোকানদার মজিদ হাওলাদারের নাম শুনে,মৃদুলকে বাসায় যেতে বলেছিল। মৃদুল বলেছে,আরেকদিন যাবে। তারা মেলা থেকে বের হতে প্রস্তুত হয় তখন একজন লোক মৃদুলের পিঠ চাপড়ে বললো, 'মৃদুল না?'

মৃদুল পরিচিত কারো কণ্ঠ পেয়ে উৎসুক হয়ে ফিরে তাকালো। লোকটিকে দেখে চিনতে পারলো। বললো, 'আরে গফুর ভাই। কেমন আছেন?'

'এইতো ভালাই আছি।'

'রায়পুরে কী? মেলায় আইছেন?'

'ছোট বইনডার জামাইর বাড়ি এইহানে। তোমার সাথে কেলা এইডে? বউ নাকি? বিয়া করলা কবে?'

পূর্ণা আড়ষ্ট হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুল আড়চোখে পূর্ণাকে দেখলো। তারপর বললো'জি ভাই,বউ। মাস খানেক হইলো।'

তখনই পূর্ণা মৃদুলের পিঠে চিমটি কাটলো। মৃদুল'আউ'করে উঠে। গফুর উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তাই সে জোরপূর্বক হেসে বললো, 'আজকে অনেক শীত! শীতে চিমটি মারে! আইচ্ছা,ভাই আজ আসি।'

'রায়পুর কার বাড়িত আইছো কইলা না তো?'

'অলন্দপুরে আইছি, ফুফুর বাড়িত। এহন যাই ভাই।'

'মজিদ হাওলাদার তোমার ফুফুর ভাসুর না?'

'জি।'

'মানুষটারে দেখার অনেক ইচ্ছা আছিলো। অনেক ভালা কথা হুনি।'

মৃদুলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললো, 'চইলা আইয়েন। আমিতো আছিই। আমারে এখন যাইতে দেন।'

'যাও মিয়া।'

মেলার বাইরে এসে পূর্ণা বললো, 'বউ বললেন কেন?'

মৃদুল বললো, 'তে কী কইতাম? গ্রামে তোমারে আমারে মানুষ এক লগে কথা কইতে দেখে,হাঁটতে দেখে। এতেই নিন্দা করে। এখন যদি কেউ জানে সন্ধ্যা বেলা আমার সাথে এতো দূরে মেলায় আইছো কী হইবো জানো?'

'এইজন্য বউ বলছেন?'পূর্ণার কণ্ঠে অভিমান টের পাওয়া গেল। মৃদুল মুচকি হাসলো। বললো, 'আর কী জন্যে বলব?'

পূর্ণা কিছু বললো না। শীতে তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে,এখানে অনেক বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে মৃদুল বললো, 'ভয় হইতাছে না?'

পূর্ণা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'কীসের ভয়?'

'পর পুরুষের সাথে রাতের বেলা এতো দূরে আছো। যদি কিছু হয়ে যায়?'

মৃদুলের কথা শুনে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যায় পূর্ণা। সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মৃদুলের দিকে। মৃদুল পূর্ণার তাকানো দেখে হেসে উঠলো।

পূর্ণা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমতাআমতা করে বললো, 'হা...হাসছেন কেন?'

'তোমার ভয় পাওয়া দেইখা।'মৃদুল হো হো করে হাসতে থাকলো। পূর্ণার খুব রাগ হয়। সে মৃদুলকে ফেলে সামনে হাঁটতে থাকে। মৃদুল পিছনে ডাকে, 'আরে খাড়াও।'

বাজারে অনেক ভীড়। চিৎকার,চেঁচামেচি। মারামারি লেগেছে বোধহয়। মৃদুল,পূর্ণা রায়পুরের ছোট বাজারের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত ভেজাল দেখে মৃদুল পূর্ণাকে বললো, 'তুমি এইখানে খাড়াও। এইদিকে কেউ নাই। আমি যাইতাছি আর আইতাছি।'

পূর্ণা চারপাশ দেখলো। ঘাটে অনেক নৌকা,ট্রলার বাঁধা। কেউ নেই,সবাই বোধহয় বাজারে। মানুষ ঝগড়া করতে আর সময় পেল না! মৃদুল চলে গেল। পূর্ণা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দূর থেকে ইঞ্জিনের শব্দ আসছে। কোনো ট্রলার এদিকেই আসছে। গা হিম করা ঠান্ডা! পূর্ণা ব্যাগ থেকে নতুন কেনা শাল বের করে গায়ে জড়িয়ে নিল। এবার ঠান্ডা কম লাগছে!

ট্রলারের ছাদে বসে আমির সিগারেট ফুঁকছে। তার এক পা ঝুলছে। শীতের তীব্রতায় আমিরের রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তবুও উঠে গিয়ে শীতবস্ত্র ব্যবহার করছে না। সহ্য করছে। নদীর জলে চেয়ে থেকে কিছু ভাবছে। তার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। তিন-চার দিন ধরে সারাক্ষণ কপালের রগগুলো দপদপ করছে। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করেছে। খুব ঝুঁকি নিয়ে এইবার তারা মেয়ে শিকার করছে। কখন কোন ভুল হয়ে যায় কে জানে! সারাক্ষণ একটা আতঙ্ক কাজ করে। আমির যে ট্রলারে বসে আছে,সে ট্রলারটি ঘাটে বাঁধা। তাদের আরো চারটা ট্রলারও পাশে আছে। আমিরের ডানপাশে একটা ইঞ্জিনের ছোট নৌকা এসে থামলো। নৌকায় রয়েছে মজিদ,খলিল সাথে আরো দুজন লোক। তাদেরকে দেখে আমির দ্রুত সিগারেট ফেলে দিল। ছাদ থেকে নামলো। মজিদকে ভক্তির সাথে সালাম দিল। মজিদ গম্ভীরস্বরে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'এইখানে কী করছো?'

আমির বাধ্য ছেলের মতো বললো, 'মেলায় এসেছি। আম্মা পাঠিয়েছেন।'

'তাড়াতাড়ি ফিরো।'

'জি, আব্বা।'

মজিদের সাথে থাকা দুজন লোক মজিদের সাথে বুকে বুক মিলিয়ে বললো, 'তাইলে এহন আসি ভাই?'

মজিদ বললেন, 'জি,আসুন। শুক্রবার কিন্তু আসবেন।'

'আরে, আসব, আসব। আপনি দাওয়াত করবেন আর আমরা আসতাম না?'

মজিদ হেসে বললেন, 'সাবধানে যাবেন।'

লোক দুটি চলে যেতেই আমির ছাদে উঠে বসে আরেকটা সিগারেট ধরাল। তীক্ষ্ণ চোখে মজিদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সব চাপ কি আমার উপরেই? অন্যদের নাকে সরষে তেল দিয়ে আরাম করা হচ্ছে?'

মজিদ বললেন, 'আরে আব্বা আমার! আমরাও তো আছি।'

খলিল বাঁকা স্বরে বললেন, 'সারাবছর তো আমরাই এইহানে দৌড়াই। এই কয়দিনে তোর...'

খলিল পুরো কথা শেষ করতে পারলেন না। আমির বাঁধা দিয়ে খুব বিরক্তি নিয়ে বললো, 'তুই চুপ থাক। তোর ছেড়ারে বলবি,কাল বিছানা ছাড়তে। নয়তো ওর ইঞ্জিনে এমন

আঘাত করব, সামনে না বিয়ে করাতে যাচ্ছো সেই বিয়ে ভেস্তে যাবে।'

'আহ আমির! চাচাকে তুই-তুকারি করতে নিষেধ করেছি না অনেকবার? মানুষ শুনলে কী বলবে?'

'মানুষের জন্যই ওরে চাচা ডাকি। আর তোমার জন্যই ও বেঁচে আছে। নয়তো ওর দেহ এতদিনে পঁচে মাটির সাথে মিশে যেত।'

খলিলের মুখটা অপমানে থমথমে হয়ে যায়। প্রতিদিন আমিরের অপমান, দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হচ্ছে। বিন্দুমাত্র সম্মান করে না। খলিল মজিদের পাশ থেকে দূরে গিয়ে বসেন। মজিদ মুখ দিয়ে'চ'কারান্ত শব্দ করে বললেন, 'কেন যে তোরা নিজেদের মধ্যে ভেজাল করিস। এতে তো আমাদের দলই দুর্বল হয়ে যাবে।'

আমির নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'কাউকে লাগবে না। আমি একাই যথেষ্ট।'

'বললেই তো হবে না। একা চলা যায় না।'

'আরে যাও তো।'

আমিরের মেজাজ তুঙ্গে। মজিদ সময় নিয়ে বললেন, 'এতো রেগে আছিস কেন?'

আমির চোখ বড় বড় করে তাকালো। তার চোখ দুটি লাল। ভয়ংকর রেগে আছে সে। মজিদ আর কথা বাড়ালেন না। নৌকা ছেড়ে দেয়া হয়। চোখের পলকে দূরে হারিয়ে যায় নৌকাটি। ট্রলারের ভেতর থেকে মন্তু বেরিয়ে আসে। আমিরকে বলে, 'ভাই,ছেড়িডারে সামলানি যায়তাছে না।'

'যেভাবে সামলানো যায়, সেভাবে সামলা। চুলের মুঠি ধরে মা-বাপ তুলে গালি দিবি। মেয়েরা ছেলেদের মুখে নোংরা গালাগাল শুনলে দুর্বল হয়ে যায়। ভয় পায়। এ কথাটা কতবার বলব?'

মন্তু ভেতরে চলে যায়। আমির সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে উড়িয়ে ঘাটের উপরের ভিটায় তাকালো। একটা বোরকা পরা মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রখর দৃষ্টি মেয়েটিকে নিশানা করে। রাফেদ বাজার থেকে রঙ চা নিয়ে আসে। আমির রাফেদকে বললো, 'ঘাটের মুখে মানুষ আছে?'

'না স্যার। বাজারে এক দোকানদার আরেক দোকানদারের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্তারক্তি অবস্থা। সবাই ওখানে।'

আমির চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। কেউ নেই। রাফেদকে বললো, 'ওইযে মেয়েটিকে দেখছো? নিয়ে আসো।'

রাফেদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! এতো ঝুঁকি নিয়ে খোলা জায়গায় শিকার! সে ঢোক গিলে বললো, 'কী বলেন স্যার! এভাবে...'

'তো? সময় আছে হাতে? এখন ঝুঁকি নিতেই হবে। পারলে,মানুষের মাঝ থেকেও তুলে আনতে হবে। মন্তুরে নিয়ে যাও। কোনোরকম বিপদ ছাড়া মেয়েটিকে নিয়ে আসবে।'

'স্যা..'

আমির জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যায়। রাফেদের কথা সে শুনলো না। তার বার বার মনে হচ্ছে,পদ্মজাকে মায়া দেখিয়ে এভাবে ছেড়ে এসে সে ভুল করে ফেলেছে। কেন ভুল মনে হচ্ছে জানে না! পদ্মজা একবার খুন করেছে এছাড়া সে খুব সাহসী,বুদ্ধিমতী। সে চাইলে বুদ্ধি দিয়েও অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু কী করবে? বের হতে তো কোনোভাবেই পারবে না। মেয়েগুলোর ঘরে ঢুকতে পারবে,কথা বলতে পারবে। এর বেশি কিছু না! তবুও মনটা কু গাইছে। ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে। সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, 'আমি কি কোনো বোকামি করে ফেললাম? ওদিকে সব ঠিক আছে তো!'

রাফেদ হা করে আমিরের যাওয়া দেখলো। তারপর একটা কাচের বোতল থেকে তরল কিছু ঢেলে নিল রুমালে। মন্তুকে নিয়ে ট্রলার থেকে নামলো। তাদের লক্ষ্য অপেক্ষারত কালো বোরকা পরা মেয়েটি।

পর্ব ৬৯

অনেক্ষণ হলো তবুও মৃদুল আসছে না। পূর্ণা বিরক্ত হয়ে নিকাব মাথার উপর তুললো। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করলো। টর্চটির আলাদা বিশেষত্ব, এটি তিন রঙের আলো দেয়। তাই মৃদুল এটি প্রান্তের জন্য কিনেছে। পূর্ণা টর্চের সুইচে চাপ দেয় কিন্তু কাজ হয় না। সে ভ্রুযুগল কুঁচকে আরো দুইবার চাপ দিল। তাও হলো না। সুইচে আঙুল রেখে টর্চের মুখটা সে নিজের দিকে তাক করলো। মনে প্রশ্ন আসে,দোকানদার নষ্ট টর্চ দিয়ে ঠকালো নাকি?

তখনই টর্চের আলো জ্বলে উঠে। তীব্র তিন রঙের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণার চোখেমুখে। সাথে সাথে পূর্ণা চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওদিকে আমির হাতের সিগারেট নদীর জলে ফেলে পিছনে ফিরে তাকালো। রাফেদ কী করছে দেখার জন্য! রাফেদের বদলে পূর্ণার মুখটা ভেসে উঠে। তিন রঙের আলোয় পূর্ণার মুখটা স্পষ্ট। আমিরের চোখের দৃষ্টি থমকে যায়। রাফেদ,মস্তু পূর্ণার একদম কাছাকাছি চলে গিয়েছে। আমির তাৎক্ষণিক কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু রাফেদ,মস্তুকে আটকাতে তো হবেই। আমির ছাদ থেকে জোরে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'রাফেদ।'

আমিরের কণ্ঠস্বর শুনে রাফেদ,মস্তু পিছনে তাকায়। পূর্ণাও তাকালো। সে আমিরের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়েছে। মৃদুল মাত্র ঘাটে প্রবেশ করেছে। তার কানেও আমিরের গলা এসেছে। চারটি চোখ হা করে আমিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমির দ্রুত ট্রলার থেকে নেমে আসে। পূর্ণা অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো, 'ভাইয়া!'

আমির রাফেদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় চাপাস্বরে বললো, 'ট্রলারে যাও।'

তারপর পূর্ণার দিকে এগিয়ে আসলো। বললো, 'পূর্ণা এখানে কী করছো?'

মৃদুল আমিরের পিছনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমির পিছনে তাকালো। মৃদুলকে দেখতে পেল। আমির অবাক হয়ে উচ্চারণ করলো, 'মৃদুল?'

তারপর আবার পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণার দৃষ্টি নত। আমির দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'দুজনে একসাথে এসেছিস?'

মৃদুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'জি, ভাই। মেলায় আইছিলাম।'

আমির দুই পা পিছিয়ে গেল। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে পূর্ণা আর মৃদুলকে দেখলো। পূর্ণা আতঙ্কে বার বার মৃদুলের দিকে তাকাচ্ছে। মৃদুল ইশারায় তাকে ভরসা করতে বলছে। আমিরের কেন জানি হাসি পাচ্ছে। কিন্তু চোখেমুখে গাম্ভীর্য রেখে বললো, 'একদম ঠিক করোনি পূর্ণা। এভাবে রাতের বেলা এত দূরে চলে এসেছো। আবার অজানা,অচেনা একজন ছেলের সাথে।'

আমিরের কথা শুনে মৃদুল আহত হয়। পূর্ণার বুক ধুকপুক, ধুকপুক করছে। আমির যেহেতু জেনেছে পদ্মজাও জানবে। আর তারপর কী হবে, পূর্ণা ভাবতে পারছে না। মৃদুল পূর্ণার অবস্থা বুঝতে পেরে আমিরকে বললো, 'ভাই,ও আসতে চায় নাই। আমি জোর করছিলাম...'

আমির মৃদুলকে বাঁধা দিয়ে বললো,"পূর্ণাকে তোর চেয়ে আমি বেশি ভালো চিনি। নিজের ইচ্ছায় এসেছে নাকি কারো কথায় সেটা বুঝতে পারছি।'

ভয়ে,লজ্জায় পূর্ণার মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আমির গাম্ভীর্যতার সাথে রাগ মিশিয়ে বললো, 'এর একটা বিহিত করতেই হবে। নালিশ বসাব আমি।'

'ভাই...'

'তুই থাম মৃদুল! পূর্ণা আমার বোন। আমার বোন নিয়ে আমি কী করব সেটা আমার ব্যপার।'

আমিরের প্রতিটি কথায় পূর্ণা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে ভয়ে ভ্যাঁ,ভ্যাঁ করে কান্না করে দিল। মৃদুলের সাথে আমিরও থতমত খেয়ে গেল। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি আর আসবো না ভাইয়া।'

পূর্ণার মুখের প্রতিক্রিয়া দেখে আমির সশব্দে হেসে উঠলো। পেট চেপে ধরে হাসতে থাকলো। কতদিন পর এভাবে মন খুলে হেসেছে কে জানে! আমিরের হাসি দেখে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। মৃদুল শুধু অবাক হয়ে দেখছেই। প্রথম পূর্ণা হুট করে কান্না শুরু করে দিল,এখন আমির হুট করে পাগলের মতো হাসছে! হাসতে হাসতে আমিরের চোখে জল চলে আসে। সে অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললো, 'কাঁদতে হবে না। আমি কিছুই করব না। প্রেম করা যায় আর ধরা পড়লেই কাঁপাকাঁপি?'

পূর্ণা আড়চোখে মৃদুলকে দেখে মিনমিনিয়ে বললো, 'আমাদের মধ্যে প্রেমট্রেম নেই ভাইয়া।'

আমিরের মুখটা হা হয়ে গেল। সে বিস্ময় নিয়ে বললো, 'সেকী! কী যুগ আসলো! প্রেম,ভালোবাসা ছাড়াই ছেলেমেয়ে একসাথে রাতের বেলা মেলায় চলে এসেছে।'

মৃদুল বললো, 'বন্ধু...বন্ধু হই।'

আমির ভ্রু উঁচিয়ে বললো, 'তাই না? তোরা বন্ধু? আচ্ছা,হতেই পারে বন্ধুত্ব। শোন, পদ্মজা পূর্ণার বিয়ে ঠিক করেছে। মৃদুল,তুই কিন্তু পূর্ণার বিয়েতে আমার সাথে নাচবি।'

মৃদুলের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠে। পূর্ণা চকিতে তাকাল। গুরুতর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো, 'কবে? কোথায় ঠিক করেছে?'

'সে আমি কী বলব? তোমার বোন জানে।'

পূর্ণার কান্না পাচ্ছে। সে মৃদুলকে এক নজর দেখে আমিরকে প্রশ্ন করলো, 'তোমরা ঢাকা থেকে কবে আসছো?'

আমির প্রশ্নটা শুনে তখনই জবাব দিল না। ভাবলো,পূর্ণা বোধহয় পদ্মজার খোঁজে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। আর তখন বাড়ির কেউ হয়তো বলেছে ঢাকার কথা। আমির হেসে জবাব দিল, 'বিকেলে। কাল যেও বাড়িতে। বোনের সাথে দেখা করে আসবে।'

পূর্ণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। আমির খেয়াল করলো,মৃদুল,পূর্ণা দুজনের মুখে কালো ছায়া নেমে এসেছে। তাই সে মিথ্যের পর্দা সরিয়ে বললো, 'বিয়ে ঠিক করেনি। মজা করেছি। তারপর মেলা থেকে কী কী কেনা হয়েছে?'

আমিরের কথা শুনে মৃদুল-পূর্ণার বুকে এক পশলা বৃষ্টি নেমে আসে। বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। পূর্ণা খুশিতে গদগদ হয়ে বললো, 'অনেক কিছু কেনা হয়েছে। সব উনি কিনে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি! আমি কিছু কিনে দেব না? মৃদুল,মেলা ভেঙে গেছে?'

'না ভাই, ভেঙে যাবে।'

'তাহলে চল, যাই।'

পূর্ণা আটকাল, 'না ভাইয়া,আর কিছু লাগবে না। অনেক কিছু হয়ে গেছে।'

'এসব তো বন্ধু দিয়েছে। ভাইয়ের উপহার আলাদা। নাকি এখন শুধু পূর্ণা বন্ধুর উপহারই নিবে। বাকি সব বাদ!'

আমিরের মশকরা বুঝতে পেরে পূর্ণা বললো, 'ধুর,ভাইয়া।'

আমির হাসলো। বললো, 'কোনো কথা না। আমরা এখন মেলায় যাব। মৃদুল তোর সাইকেলটা ওইযে ছোট ট্রলারটা ওখানে রেখে আয়। পূর্ণার হাতের ব্যাগটাও নিয়ে যা। যাওয়ার সময় ট্রলার দিয়ে চলে যাবি। রাতের বেলা হাওড়ের ক্ষেত দিয়ে না যাওয়াই ভালো। সাথে যখন পূর্ণা আছে।'

'তুমি ফিরবে না ভাইয়া?'বললো পূর্ণা।

আমির বললো, 'একটু দেরি হবে। একজনের সাথে দেখা করতে এসেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে। মৃদুল যা।'

মৃদুল সাইকেল আর ব্যাগ রেখে আসে। তারপর তিন জন একসাথে মেলায় প্রবেশ করে। পূর্ণার শাড়ি বেশি পছন্দ। তাই আমির শাড়ি কিনলো বেশি। একটা শাড়িতে তার চোখ আটকে যায়। কালো রঙের রেশমি সুতার শাড়িটা চোখে পড়তেই পদ্মজার মুখটা ভেসে

উঠে। পদ্মজার কালো রঙ ভীষণ পছন্দের। ফর্সা,ছিমছাম আদুরে শরীরে যখন কালো রঙের শাড়ি লেপ্টে থাকে কী অপূর্বই না দেখায়! আমিরের তো মাঝে মাঝে মনে হয়,কালো রঙের সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র পদ্মজার রূপের ঝলকানি বুঝাতে! চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পদ্মজার ঠোঁটের নিচের সূক্ষ্ম স্থির কালো তিলটা। হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তিলটা থেকেও যেন অদ্ভুত কোনো আলো বের হচ্ছে! আমির মুচকি হেসে শাড়িটা কিনে নিল। আর কিছু কিনলো না। পদ্মজা গয়নাগাটি পছন্দ করে না। তারপর চলে এলো ঘাটে। পূর্ণা খুশিতে আটখানা। এত কিছু পেয়েছে আজ! ট্রলারে করে চলে গেল মৃদুল-পূর্ণা। সাথে গেল মন্তু। মন্তু পূর্ণাকে বাড়িতে অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আমির তার আগের জায়গায় এসে বসে। মৃদুল-পূর্ণার ব্যাপারটা অদ্ভুত শান্তি নিয়ে এসেছে বুকে! কত সুন্দর তাদের জীবন। কোনো জটিলতা নেই,কোনো দূরত্ব নেই!

আমিরের মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়, সে তো কথায় কথায় পূর্ণাকে আগামীকাল তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে! কিন্তু পদ্মজা তো সেখানে নেই! তাছাড়া বেশ কিছুক্ষণ আগেও সে পদ্মজার ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। একটু ওদিকে যাওয়া দরকার। আমির রাফেদকে ডেকে বললো, 'আমি ফিরছি। মন্তু এখুনি চলে আসবে। যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল মনে রাখবে। দুজন চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করবে। চাচাও আসবে বোধহয়। একটু দেরি হলেও, আমি আসবই।'

'জি, স্যার।'

পদ্মজা ভেবেছিল আরভিদ তার উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু করেনি। পদ্মজা বিওয়ান(B1) ঘরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দরজায় তালা দেয়া। ভেতরেও কোনো সাড়াশব্দ নেই! মেয়েগুলো বেঁচে আছে তো? যে ঘরে পাচার করার উদ্দেশ্যে কতগুলো মেয়েকে বেঁধে রাখা হয়েছে সে ঘরের দরজাটা আবার খোলা। দরজার উপর লেখা বিথ্রি(B3) পদ্মজা বিথ্রির সামনে সন্ধ্যা অবধি ঘুরঘুর করেছে। প্রবেশ করার সাহস হয়নি। তার হাত বন্দি,আবার আরভিদ সবসময় তার উপর চোখ রাখছে। কখন না ইজ্জতে হাত দিয়ে দেয়। সে ভয়ে পদ্মজা এগোয়নি। সন্ধ্যায় রিদওয়ানের সাথে দেখা হয়েছিল। সে বের হচ্ছিল। পদ্মজাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে, সে অবাক হয়েছিল। আরভিদকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী ব্যপার?'

আরভিদ বললো, 'স্যার যা বলেছেন,তাই হচ্ছে।'

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে চোখ রেখে বললো, 'আমির এই মেয়ের রূপে ডুবে আছে। কবে যে ঘোর কাটবে! দেখে রেখো। কখন কী করে বসে!'

রিদওয়ান দরজা খুলতে চেষ্টা করলো। খুলল না। আরভিদ বললো, 'চাবি স্যারের কাছে।'

রিদওয়ানের খুব বিরক্তি নিয়ে বললো, 'ধ্যাত!'

তারপর চলে এলো বিটুতে। শরীরে অনেক ক্লান্তি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।।ঘুম আসছে না। কিছুক্ষণ আগেই খাবার খেয়েছে। আজকের রাতটা এক ঘুমে কাটাতে পারলে শরীরটা প্রায় সুস্থ হয়ে যেত। রিদওয়ান অনেক ভেবেচিন্তে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেল। তারপর শুয়ে পড়লো। বেশিক্ষণ লাগেনি ঘুমাতে। পদ্মজা রিদওয়ানকে দূর থেকে দেখেছে। কথা বলতে আসেনি। সন্ধ্যার পর হতাশ হয়ে নিজ ঘরে চলে আসে। ঘরে অনেকক্ষণ পায়চারি করে। শুয়ে থাকে। এশারের দিকে আবার বেরিয়ে আসে। ভালো লাগছে না কিছু। স্বাগতম ও ধ-রক্ত দরজার মধ্যখানে থাকা সোফায় আরভিদ ঘুমাচ্ছে! আরভিদকে ঘুমাতে দেখে পদ্মজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। পা টিপে,টিপে সাবধানে ধ-রক্তে প্রবেশ করে। তারপর দ্রুত হেঁটে বিথ্রিতে চলে আসে। মেঝেতে পড়ে আছে অনেকগুলো মেয়ে। তাদের হাত,পা,মুখ বাঁধা। দুই-তিন জন ঘুমাচ্ছে। বাকিরা পদ্মজার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে গেল। চাপা স্বরে বললো, 'আমি তোমাদের কোনো

ক্ষতি করব না। ভয় পেও না।'

সবার সামনে একটা স্বাস্থ্যবান মেয়ে বসেছিল। পদ্মজা মেয়েটির পিছনে গিয়ে বসলো। মেয়েটির মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। পদ্মজার হাত পিছন থেকে হ্যান্ডকাপ পরানো। তাই সে কাপড়ের গিট্টুটি নিজের দাঁত দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো। খুব দ্রুতই সে সফল হয়। প্রতিটি মেয়ে অবাক হয়ে পদ্মজাকে দেখছে। অসম্ভব সুন্দর পদ্মজার উপর থেকে তারা চোখ সরাতে পারছে না। মনে হচ্ছে,বিধাতা কোনো দূত পাঠিয়েছেন। আসার পথে গালে ব্যথা পেয়েছে! স্বাস্থ্যবান মেয়েটির মুখ মুক্ত হতেই পদ্মজাকে বললো, 'আপনি কেলা?'

পদ্মজা ভয়ার্ত চোখে দরজার দিকে তাকালো। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমি পদ্মজা। চিনবে না আমাকে। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।'

মেয়েগুলো একজন আরেকজনের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলো। পদ্মজা স্বাস্থ্যবান মেয়েটির হাতের বাধঁন খোলার জন্য তার পিছনে গিয়ে পিঠ করে বসলো। হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো,পারলো না। হ্যান্ডকাপের মাঝের দূরত্ব খুব কম। পদ্মজা শুধু আঙুল নাড়াতে পারছে। তাই দাঁত দিয়ে দঁড়ির গিট্টু খোলার জন্য সে শুয়ে পড়লো। গালের ক্ষতস্থানে ঠান্ডা মেঝে লাগতেই শিরশির করে উঠে। যে দঁড়ি দিয়ে মেয়েটির হাত বাঁধা হয়েছে সে দঁড়িতে অনেক ময়লা ছিল। পদ্মজার মুখের ভেতর ময়লা প্রবেশ করে। পদ্মজার কষ্ট হয় তবুও সে থামেনি। ঠিক নয় মিনিট পর মেয়েটি হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়। খুশিতে মেয়েটির বুকে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। নিজের হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে। পদ্মজা অনুরোধ স্বরে বলে, 'এবার তুমি বাকিদের মুক্ত করো।'

মেয়েটি তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ায়। আরো দুটো মেয়েকে বাঁধন থেকে মুক্ত করে। তারপর তিনজন মিলে বাকিদের সাহায্য করে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। পদ্মজা সবাইকে কথা বলতে নিষেধ করেছে। সে মনে মনে প্রার্থনা করছে, কেউ যেন না আসে। আর তারা সবাই যেন বেরিয়ে যেতে পারে। আমিরের বোকামি,সে পদ্মজাকে ছেড়ে গিয়েছে। এই বোকামি আর কখনো আমির করবে না। আজ কাজে না লাগাতে পারলে সব শেষ! মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ উত্তেজনায় কাঁপছে। পদ্মজা সবার উদ্দেশ্যে বললো, 'সামনে একজন লোক বসে আছে। সে ঘুমে আছে। যদি সজাগ হয়ে যায়, সবাই আক্রমণ করবে। ভয় পাবে না।।নিজেদের ইজ্জতের উপরে কিছু নেই। ইজ্জত রক্ষার জন্য কাউকে আঘাত করার সাহস বুকে রাখতে হয়। একদম ভয় পাবে না। লড়াই করবে। এইযে তুমি আর তুমি আমার সাথে একটু আসো। বাকিরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'

দুটো মেয়ে পদ্মজার সাথে সাথে যায়। পদ্মজা বিফাইভে চলে আসে। বিকেলে যখন এদিকে হাঁটছিল এই ঘরের এক কোণে সে লাঠি আর পাথর দেখেছিল। মেয়ে দুজনকে বললো, 'লাঠিগুলো নাও,আর পাথর তিনটাই নিয়ে নাও।'

তিনজন আবার বিথ্রিতে চলে আসে। পদ্মজা সবার উদ্দেশ্যে বললো, 'কাদের সাহস বেশি? কাউকে আঘাত করার মতো সাহস কার কার আছে?'

ছয়টা মেয়ে হাত তুলে। তারা হাতে লাঠি আর পাথর তুলে নেয়। পদ্মজা বলে, 'যখনই আক্রমণ করতে বলবো,আক্রমণ করবে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে যেভাবে পারো আঘাত করবে। যদি তোমরা না পারো,তবে বিদেশ পাচার হয়ে যাবে। সেখানে তোমাদের অনেক খারাপ কাজ করতে হবে। যাদের হাতে অস্ত্র নেই তারা দাঁত আর নখ কাজে লাগাবে।'

মেয়েগুলো বাধ্যর মতো মাথা নাড়ায়। তারা ঘোরের মধ্যে আছে। প্রাণের মায়া চলে গিয়েছিল। পদ্মজার হঠাৎ আগমনে মনে বাঁচার আশা জেগেছে। সবাই সাবধানে বিথ্রি থেকে বেরিয়ে আসে। সামনে পদ্মজা। ধ-রক্ত দরজা পেরোবার সময় মেয়েগুলো ধাক্কাধাক্কি করে। ধাক্কা খেয়ে একটা মেয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। আর্তনাদ করে উঠে। আরভিদ চোখ খুলে সামনে এতগুলো মেয়েকে দেখে হকচকিয়ে যায়। সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না! পদ্মজা উঁচুকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে, 'সবাই এই লোকটাকে আক্রমণ করো।'

স্বাস্থ্যবান মেয়েটি সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি দিয়ে আরভিদের পিঠে আঘাত

করে। আরভিদ পড়ে যায়। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরভিদ মেয়েগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পনেরোটা যুবতী মেয়ে তো কম কথা নয়! সে কিছুতেই পেরে উঠেনি। মার খেতে খেতে উঁবু হয়ে যায়। যাদের হাতে অস্ত্র নেই তারা লাথি দিতে থাকে অনবরত। একটা মেয়ে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা তাকে উৎসাহ দিতে জোরে বললো, 'লোকটার মাথায় আঘাত করো। দ্রুত করো। চাইলে সব পারা যায়। তুমি ভয় পেও না।'

মেয়েটি পদ্মজার কথামতো বড়সড় পাথরটি দিয়ে আরভিদের মাথায় আঘাত করে। আরভিদের মরণ আর্তনাদ আর মেয়েগুলির ক্রোধ মেশানো নিঃশ্বাসে চারপাশ কেঁপে উঠে। পদ্মজার সত্তা বিজয়ের আগমনে হেসে উঠে। রক্তাক্ত আরভিদ নিস্তেজ হয়ে যায়। মেয়েগুলো থামে,হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা দরজার সামনে এসে চাবি খুঁজতে থাকে। চাবি নেই! দ্রুত আরভিদের কাছে আসে। তার প্যান্ট আর শার্টের পকেটে চাবি খুঁজে। নেই! পদ্মজার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আর এক ধাপের জন্য তারা আবার আটকে যাবে! পদ্মজা দুটো মেয়েকে নিয়ে পুরো পাতালঘর তন্ন,তন্ন করে চাবি খুঁজে। যেসব চাবি পেয়েছে একটাতেও দরজা খোলা যায়নি। মেয়েগুলোর মধ্যে যে আনন্দ এসেছিল তা হারিয়ে যায়। পদ্মজাও ভেঙে পড়ে। সে মেয়েগুলোকে আশ্বাস দেয়, 'কিছু হবে না। আমরা পারব।'

দরজায় সবাই মিলে ধাক্কাধাক্কি করে,তাতেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। এই দরজা কী ধাক্কা দিয়ে ভাঙার মতো! পদ্মজা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'শুনো সবাই,আমরা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকব। যখনই কেউ দরজা খুলবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। এই লোকটার মতো অবস্থা করে সবাই পালাব। এখন যেভাবে সবাই একসাথে কাজ করেছো তখনও করবে। ঠিক আছে?'

মেয়েগুলো মাথা নাড়াল। তারা প্রস্তুত। দশ মিনিট...বিশ মিনিট...ত্রিশ মিনিট পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সবার হৃদস্পন্দন থেমে যায়। পদ্মজার সবার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় আক্রমণ করতে বলে। দরজা খুলতেই সবগুলো মেয়ে হইহই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খলিল দুই হাতে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আমির পিছনে ছিল। সে এসে দেখে বাইরে খলিল,মজিদ দাঁড়িয়ে আছে। চাবি তাদের কাছে নেই। আমির খলিলের হাতে চাবি দেয়। খলিল দরজা খুলতেই এতগুলো মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দৃশ্যটি দেখে আমিরের চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। উত্তেজিত হয়ে মজিদকে বললো, 'আব্বা সামনের দরজা বন্ধ করো।'

মজিদ সামনের দরজা বন্ধ করতে চলে যান। আমির এগিয়ে আসে। দীর্ঘদেহী,তুষ্টপুষ্ট আমির দুই হাতে মেয়েগুলোকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। দুজন মেয়ে লাঠি দিয়ে আমিরকে আঘাত করতে চায়,আমির দুই হাতে দুটো লাঠি ধরে ফেলে। লাঠিসহ মেয়ে দুটোকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। বাকি মেয়েগুলোকে চোখের পলকে চড়-থাপ্পড় দিতে শুরু করে। তার চোখ দুটি থেকে রাগ,ক্রোধ-আক্রোশ ঝরছে। একটা মেয়ে আমিরের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। পাথরটি আমিরের ঘাড়ে পড়ে। রিদওয়ান ঘাড়ে আঘাত করার বোধহয় তিন সপ্তাহও কাটেনি। আবার পাথরের আঘাত পেয়ে ঘাড়ের কালো আস্তরণ সরে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। পদ্মজার জন্য কেনা শাড়িটা আমির গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। আসার পথে ট্রলারের ছাদে বসে শাড়িটা দেখছিল,শাড়ির ব্যাগ পাশে রেখেছিল। কখন যে ব্যাগটি উড়ে যায়,টের পায়নি আমির। যখন টের পেল কিছু করার ছিল না। তাই গলায় মাফলারের মতো পেঁচিয়ে রেখে দেয়। তার পদ্মবতীই তো পরবে! আমিরের রক্তে শাড়িটি ভিজে যায়। সে ঝড়ের গতিতে ঘূর্ণিপাকের মতো প্রতি মেয়েকে আঘাত করে দুর্বল করে দেয়। পদ্মজা বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। আমির তার রক্তচক্ষু দিয়ে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজার হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠে। সে কিছু বুঝে উঠার পূর্বে,আমির পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে। শাড়িটি দিয়ে পদ্মজার গলা পেঁচিয়ে জোরে টেনে ধরে। তারপর কিড়মিড় করে বলে, 'ছলনাময়ী!'

আমিরের নিঃশ্বাস থেকে যেন বিষ বের হচ্ছে। আজরাইলের রূপ ধারণ করেছে।

পদ্মজার দুই হাত বন্দি। নিজেকে রক্ষার কোনো পথ নেই। সে ছটফট করতে থাকে। একবার আমিরের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার পূর্বেই চোখ দুটি উলটো হয়ে আসে। বুকে ব্যথা শুরু হয়। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস আটকে যায়। মৃত্যু তার খুব কাছে। আর একটু সময়...পদ্মজা কালিমা পড়ার চেষ্টা করে। মৃত্যুর আগে সে কালিমা পড়ে যেতে চায়। অস্ফুটভাবে তার মুখে'ইল্লাল্লাহু'উচ্চারণ হয়। আমিরের কানে শব্দটি আসতেই তার হাত দুটি কেঁপে উঠে। ছেড়ে দেয় পদ্মজার গলা। পদ্মজা লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। চোখ আধবোজা! ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। হাঁপড়ের মতো বুক ওঠানামা করছে। কষ্টে পুরো শরীর মুচড়ে যাচ্ছে! গলা নীল হয়ে গেছে!

পর্ব ৭০

পাতালপুরী নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বিথ্রিতে মেয়েগুলো বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। পদ্মজা এওয়ানের পালঙ্কে শুয়ে আছে। তার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। ঘরের ছাদে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটি শুষ্ক। এক ফোঁটাও পানি নেই। নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে সে। বিটুর দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে আমির। তার চাহনি এলোমেলো। মস্তিষ্ক অন্যমনস্ক। এক টুকরো ছোট পাথর কামড়াচ্ছে। পাথরটা দিয়ে নিজের দাঁতে আঘাত করছে। মজিদ তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ যাবৎ আমিরকে পরখ করছেন। তিনি আমিরের হাব-ভাব বুঝার চেষ্টা করছেন। আমিরের দুই হাত অনেকক্ষণ ধরে কাঁপছে। এমনকি তার শরীরও কাঁপছে। মজিদ বিস্মিত! আমির দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সেজদার মতো উঁবু হয়। আর্তনাদের মতো শব্দ করে মুখে। দুই হাতে মেঝে খামচে ধরার চেষ্টা করে। খলিল কিছু বলতে চাইলে মজিদ আটকে বললেন, 'এখন কোনো শব্দ করা ঠিক হবে না। ওর মাথা ঠিক নেই।'

আমির সোজা হয়ে বসে। তার চোখ দুটি রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে। মেঝেতে শুয়ে, দুই হাতে নিজের চুল টেনে ধরে। কিছু একটা ভাবছে সে। দেখে মনে হচ্ছে,সমুদ্রের অতলে সে হারিয়ে যাচ্ছে। পানি খেতে খেতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কোনদিকে সাঁতরালে কিনারা পাওয়া যাবে ঠাওর করতে পারছে না। মজিদ খলিলকে নিয়ে সরে যান। আমির উঠে দাঁড়ায়। ঘরে পায়চারি করে। ঘন,ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে। ঘাড়ের রক্ত শুকিয়ে গেঞ্জির সাথে লেপ্টে আছে। আমির চেয়ারে বসে হেলান দিলো। চোখ বুজতেই ভেসে উঠে পুরনো মুহূর্ত। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা। তার মাঝে ছিল একটা মাত্র চাঁদ। আকাশের নিচে পদ্ম নীড়ের ছাদে আমির পদ্মজাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃদু কোমল বাতাসকে স্বাক্ষী রেখে পদ্মজা বলেছিল, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামীটি আমার, তাই প্রতিটি মেয়ের আমাকে হিংসে করা উচিত।'

আমির দ্রুত চোখ খুলে ফেলে। তার শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। অস্থির,অস্থির লাগছে। বোতল থেকে পানি বের করে খেল।

তারপর বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। এক কোণে পরে থাকা শাড়িটা হাতে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। যতক্ষণ না পুরো শাড়িটা ছাই হয়েছে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ঠোঁট অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। সে কী কাঁদতে চাইছে?

মজিদ হাওলাদার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন। খলিল বললো, 'আমিরের হাব-ভাব তো ভালা না ভাই। আলমগীরের মতো না কাম কইরালায়।'

মজিদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এরকম হবে না। আমির কখনো নিজের তৈরি করা সাম্রাজ্য ছাড়বে না। তুই বের হয়ে যা। মন্তুরা বসে আছে।'

'তুমি এইহানে থাকবা?'

'আর কেউ আছে এখানে? মেয়েগুলোকে তো বারেকের সাহায্য নিয়ে সামলাতে পেরেছি। এখন ওরে বাইরের পাহারা বাদ দিয়ে ভেতরে আসতে বলবো?'

'রাগো কেন? আমি তাইলে যাইতাছি।'

'কাঞ্চনপুরের চেয়ারম্যানরে বলে আসবি শুক্রবারের কথা। কোনো ভুল যাতে না হয়।'

'আচ্ছা ভাই।'

খলিল বেরিয়ে যায়। মজিদ ধোঁয়া উড়ান। পুরো ঘরে সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে।

আমির এওয়ান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। স্বাভাবিক হতে তার মাঝরাত অবধি সময় লেগে গেছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো পদ্মজাকে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে সে। আমির দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। পদ্মজা দরজা খোলার শব্দ শুনেও ফিরে তাকালো না। আমির কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলো,তার কথা আসছে না। গলা বসে গেছে। সে পদ্মজার পায়ের কাছে গিয়ে বসলো। আমির পদ্মজার পায়ে হাত

দিল,পদ্মজা পা সরিয়ে নেয়নি। আমির বেশখানিক মুহূর্ত বসে থাকে সেখানে। তারপর বললো, 'সকালে আমরা অন্দরমহলে যাবো।'

পদ্মজা জবাব দিল না। আমিরের এখানে বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যতক্ষণ এখানে থাকবে,পদ্মজা নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তাই বেরিয়ে যেতে উঠে দাঁড়াল। দরজার বাইরে পা রাখতেই পদ্মজার শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'এই শক্তি আর মেধা ভালো কাজে লাগালে এর চেয়েও বড় রাজত্ব পেতেন। বেহেশত পেতেন। পরিবার পেতেন।'

আমির শুনেও না শোনার ভান করে দরজা ছেড়ে, এওয়ানের বাইরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। সেখানে উপস্থিত হলেন মজিদ। আমিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাবু এদিকে আয়।'

আমির,মজিদ একসাথে সোফায় এসে বসে। আমির ক্লান্ত। ক্লান্তি তার চোখেমুখে। মজিদ বললেন, 'দুইদিন পর শুক্রবার। মনে আছে তো?'

আমির মনে করার চেষ্টা করলো। শীতে তারা শীতবস্ত্র বিতরণ করে। এ নিয়ে বড় সমাবেশ হয়। কত,কত গ্রাম থেকে মানুষ আসে। দুনিয়ার লোক দেখানো পাপ-পুণ্যের হিসাবের খাতায় হাওলাদার বাড়ির নাম পূণ্যের খাতায় সবার উপরে! আমির নির্বিকার স্বরে বললো, 'মনে আছে।'

'দেখিস, পদ্মজা যেন কোনো ভেজাল না করে।'

'আর কী ভেজাল করবে? মেরেই ফেলেছিলাম আরেকটু হলে। মেরে ফেললে খুশি হবে?'আমির আচমকা রেগে যায়। মজিদ মৃদু হেসে বললেন, 'মারবি কেন? তোর বউ তোর কাছে রাখবি। শুধু একটু খেয়াল রাখতে বলেছি।'

'কিছু করবে না ও। আমি দ্বিতীয়বার আর ভুল করব না।'আমির বিরক্তি নিয়ে বললো।

'না হলেই ভালো। কুয়েতে সময় চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছি।'

'সময় দিবে না। আর এতো অনুরোধ করার কী আছে? সময়মত হয়ে যাবে। তুমি এখন সামনের কাজে মন দেও। আমি এই ব্যাপারটা দেখছি।'

মজিদ আমিরের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাঘের বাচ্চা!'

আমির পূর্বের স্বরেই বললো, 'যাওয়ার সময় বারেক ভাইকে বলো আসতে।'

'বাইরে কে থাকবে? তুই এখন থাক এখানে।'

আমির কিছু বললো না।

চারপাশ থমকে আছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আমির নিজের নিশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে। চুপ করে বসে আছে। ঘাড়ের ব্যথাটা বেড়েছে। জ্বালাপোড়া করছে। সে দুই তিন বার এওয়ানের দরজার দিকে তাকিয়েছে। হাজারবার নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়েছে। কেন এমন হচ্ছে সে জানে না! তার একপাশে যেন রক্ত,অন্যপাশে ফুলের বাগান। ফুলের সুবাস তাকে চম্বুকের মতো টানছে। অন্যদিকে রক্তের রঙ যে তার পেশা,রীতি, নেশা,দায়িত্ব। আমির ঠোঁট কামড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। দ্রুত পায়ে চলে আসে এওয়ানে। ঘরে আবছা আলো। পদ্মজা ঘুমাচ্ছে। তার হাতে হ্যান্ডকাপ রয়ে গেছে। আমির জুতা খুলে হেঁটে আসে। নয়তো শব্দ শুনে উঠে যাবে পদ্মজা। সে টের পায় তার দুই পা কাঁপছে! প্রবল জড়তা কাজ করছে। তাদের আলাদা দুই পথ এক হতে চাইছে না। একজন মানুষ হয়ে দুই সত্তা নিয়ে বাঁচা যায় না। দুই সত্তা বড় যন্ত্রণার। আমির পদ্মজার পায়ের কাছে বসলো। ফর্সা দুটি পা স্থির হয়ে আছে। আমিরের লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ছুঁলো না। পদ্মজার মুখের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। পৃথিবীর একমাত্র অদ্ভুত মানুষটি বুঝি সে। আমির বিছানায় উঠে বসে। পদ্মজার গলার দাগটা দেখার চেষ্টা করে। পদ্মজা জেগে উঠে। আমিরের মুখটা ঝুঁকে আছে তার উপর। সে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই আমির পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজার বুকে মাথা রেখে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখে। শুনতে

পায়,পদ্মজার বুকের ধুকধুকানি। পদ্মজা চমকে যায়।

পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছু নেই। পদ্মজা ঢোক গিলে বললো, 'আপনার রাজত্বে এসে আপনার সাথে পেরে উঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এইটুকু তো বলতেই পারি,আপনার ছোঁয়া আমার কাছে সবচেয়ে নোংরা,অপবিত্র।'

আমির জবাবে কিছু বলল না। চুপচাপ সরে গেল। অন্যদিকে ফিরে শুয়ে রইলো। পদ্মজা আমিরের পিঠের দিকে তাকায়। বুকটা হাহাকার করে উঠে। এতক্ষণ তো সে শক্তই ছিল। আমিরের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আসেনি,মায়া আসেনি। এখন কেন এমন হচ্ছে! আমিরের সাথে সাথে নিজের প্রতিও ঘৃণা চলে আসে। হাজার মেয়ের জীবন নষ্ট করা মানুষটাকে সে এখনো ভালোবাসে! তার মন কাঁদে। পদ্মজা ছাদের মেঝেতে তাকিয়ে মনে মনে হেমলতাকে বললো, 'তোমার মেয়ে এতো খারাপ মানুষ কী করে হলো আম্মা? আমি পাপীকে ভালোবেসে পাপ করছি! ক্ষমা করে দিও আমাকে। ক্ষমা করতে না পারলে,অভিশাপে পুড়িয়ে ছাই করে দাও আমাকে।'

যাদের ভালোবাসাকে বাজি ধরতে হয়,ভালোবাসাকে রক্তারক্তির যুদ্ধে নামাতে হয়,বুকের ভেতর ভালোবাসাকে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা যায় না তারা বোধহয় সবচেয়ে বেশি অসহায়। পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে ভেজাকণ্ঠে বললো, 'যেদিন আপনার মনে হবে,আপনার দ্বারা আর কারো ক্ষতি হবে না। পাপ হবে না। সেদিন আমাকে পদ্মবতী ডেকে জড়িয়ে ধরবেন।'

আমির নিশ্চুপ রইলো। কিছু বলার মতো ভাষা তার মস্তিষ্কে নেই। সে নির্বাক। পৃথিবীতে তিনটা মানুষকে সে ভালোবেসেছে। তার থেকে দুটো মানুষই তার পাপের জন্য তার থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আরেকজন চলে যাওয়ার পথে। তারপরও আমির পারে না সবকিছু ছেড়েছুড়ে দূরে হারিয়ে যেতে। তার ইচ্ছে করে না,সে ভাবতে পারে না। পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার মা নেই,বাবা নেই। আমার স্বপ্ন,আশা,সবকিছুই তো আপনি ছিলেন। আপনাকে নিয়ে আমি বৃদ্ধ হতে চেয়েছি। সেই আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। শত,শত মেয়েকে পিটিয়ে জান ছিনিয়ে নেন। আল্লাহর দোহাই লাগে,আমার কষ্টটা অনুভব করুন। আমি হাশরের ময়দানে কী করে মুখ দেখাব? মৃত,অত্যাচারিত মেয়েগুলোর সামনে কী করে দাঁড়াব? হাশরের ময়দানে সবাই আমার দিকে ঘৃণ্য চোখে চেয়ে থাকবে। কলঙ্কিনী আমি। আপনার বউ হয়ে আমি কলঙ্কিনী হয়েছি। মেয়েগুলোর বাবা,মাকে আমি কী বলব? তাদের নারীছেঁড়া ধনকে ছিনিয়ে নেয়া পুরুষটিকে আমি ভালোবেসেছি এই কথা কী করে বলব? বলতে পারেন?'

আমির উঠে বসে। বেরিয়ে যায়। পদ্মজা কাঁদতে থাকলো। চোখের জল শুকায় না। আল্লাহ তায়ালা এ কোন পরীক্ষায় ফেলেছেন! আমির খুব দ্রুত ফিরে আসে। তার হাতে লম্বা একখানা বস্তু। সে সেই বস্তুটি বিছানার উপর রেখে প্যান্ট থেকে চাবি বের করলো। হ্যান্ডকাপ খুলে পদ্মজাকে বসিয়ে দিল। তারপর পদ্মজার সামনে বস্তুটি ধরে শান্তস্বরে বললো, 'আমি পারবো না সরে আসতে। এই তলোয়ার ব্যবহার করা হয়নি। খুব পছন্দ করে এনেছিলাম। তোমার হাতে তুলে দিলাম। যদি পারো,মুক্তি দিও আমাকে। কোনো কলঙ্ক রেখো না গায়ে। হাশরের ময়দানেও তুমি সবচেয়ে সুন্দর,সম্মানিত এবং দামী থাকবে। শুধু বেহেশতে দুজনের একসাথে রাজপ্রাসাদে থাকার স্বপ্নটা পূরণ হবে না।'

আমিরের বলা কথাগুলো শুনে পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। বুকে ব্যথা শুরু হয়। আমির পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল। তারপর বললো, 'শেষবার ছুঁয়েছি আর ছুঁবো না। শপথ করছি, আর ছুঁবো না।'

তারপর ছুটে যায় বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পদ্মজা দম বন্ধ হয়ে আসে।

মিনিট দুয়েক পার হতেই চাদর খামচে ধরে হাউমাউ করে কান্না শুরু করে। আল্লাহ উপর প্রশ্ন তুললো, 'আমার ভালোবাসায় কী কমতি ছিল আল্লাহ? কেন এমন জীবন দিলে আমায়! আমি কী করব? মৃত্যু দাও আমাকে।'

পদ্মজা চোখভর্তি জল নিয়ে তুষারের দিকে তাকালো। তুষার এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে, 'মাই গড!'

তার শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে যায়। চোখে জল চিকচিক করছে। এমন অদ্ভুত ভালোবাসা সে দুটো দেখেনি। একজন খুন হতে চেয়েছে,আরেকজন খুন করে মুক্তি দিয়েছে। ফাহিমা কাঁদছে। পদ্মজা মিষ্টি করে হেসে বললো, 'আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন?'

'আমির হাওলাদারের একটা সুন্দর জীবন হতে পারতো।'আফসোসের স্বরে বললো ফাহিমা।

পদ্মজা ফিক করে হেসে ফেললো। বললো, 'পুলিশ হয়ে ক্রাইম কিংয়ের জন্য কাঁদছেন!'

তুষারের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কঠিন মনের তুষার ভেঙে পড়েছে! ভালোবাসার অনেক ব্যাখা সে শুনেছে। কিন্তু ভালোবাসা এমনও হতে পারে সে ভাবেনি। তুষার বললো, 'তিনি অবশ্যই চেষ্টা করেছিলেন এই জগত থেকে বের হতে! কিন্তু পারেননি। তিনি আষ্ঠেপৃষ্টে পাপের রাজ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভালোবাসার কোনো আদালত থাকলে সেই আদালতে আমির হাওলাদারের সব খুন মাফ!'

পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে হাসে। অনেক কাহিনি, অনেক কান্না তো এখনও বাকি। এরা এইটুকুতে কেঁদে অস্থির! তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ভীষণ!

(শেষের আর বেশি দেরি নেই। পরবর্তী পর্ব থেকে আমির-পদ্মজার দৃশ্য কমে যাবে। দুজন বেশিরভাগ আলাদা, আলাদা থাকবে। এবার অন্য চরিত্ররা আসবে।)

পর্ব ৭১

সকালের ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে প্রকৃতি। কাঠের দুই তলা বাড়ির উঠানে শুটিং দলের সবাই বসে আছে। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে আসা কনকনে শীত সবাইকে কাবু করে ফেলেছে। সবার মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। শাকিল নামে একটা ছেলে উঠানের মাঝে আগুন ধরালো। লিখন আগুন থেকে তাপ নেয়। তীব্র ঠান্ডার জন্য শুটিং এগোচ্ছে না। বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। সূর্য যখন আকাশে উদিত হয়,মৃদুলের দেখা মিলে। সে লিখনের সাথে করমর্দন করে বললো, 'কেমন আছো ভাই?'

লিখন হেসে বললো, 'ভালো। এই শাকিল,একটা চেয়ার দিয়ে যাও।'

শাকিল চেয়ার দিয়ে যায়। মৃদুল বসলো। দুজন বড়ই গাছের নিচে বসে আছে। সেখান থেকে অলন্দপুরের বড় সড়ক দেখা যায়। লিখন বললো, 'তারপর কেমন আছো?'

'জি ভাই, ভালো আছি। একটা দরকারে আইছি ভাই।'

লিখন মৃদুলের দিকে মুখ করে বসলো। মৃদুল লজ্জা পাচ্ছে। লিখন বললো, 'পূর্ণার ব্যাপারে কিছু?'

মৃদুলের অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সত্যি সে লজ্জা পাচ্ছে। ঘাড় ম্যাসেজ করতে করতে বললো, 'পূর্ণারে কেমনে কী বলতাম বুঝতাছি না। একটু বইলা দেও।'

লিখন সশব্দে হাসলো। মৃদুলের সাথে যতবার তার দেখা হয় ততবার সে হাসতে বাধ্য! মৃদুল বললো, 'আমির ভাই আর তুমি এসব অনেক ভালো বুঝো। আমির ভাইরে ডর লাগে তাই তোমার কাছে আইছি।'

লিখন বললো, 'এটা কোনো ব্যাপার?'

তারপর দূরের পথে চেয়ে বললো, 'আমার একটা ইচ্ছে ছিল। শীতের জ্যোৎস্নায় নৌকা নিয়ে মাঝ নদীতে যাব। নৌকায় আমি থাকব আর আমি যাকে ভালোবাসি সে থাকবে। চারিদিকে জ্যোৎস্না টুপটুপ করে পড়বে, সে সময়টাকে সাক্ষী রেখে বিয়ের প্রস্তাব দেব। মনের সব অনুভূতি জানাব। কিন্তু আমার ভাগ্যে সেই সময়টা আসেনি। তুমি চেষ্টা করতে পারো।'

লিখনের কথা মৃদুলের খুব পছন্দ হয়। সে প্রফুল্লিত হয়ে বললো, 'সুন্দর বলছো ভাই।'

তারপরই মুখ গুমট করে বললো, 'কিন্তু এখন তো জ্যোৎস্না নাই।'

'শুনেছি, শুক্রবার জ্যোৎস্না রাত। আমাদের জ্যোৎস্না নিয়ে কাজ আছে।'

'নায়িকারে ভালোবাসার কথা বলবেন নাকি?'

'না, নায়িকা মারা যাবে।'

মৃদুল উঠানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভাই,নায়িকা কোনডা?'

লিখন আঙুলের ইশারায় একটা মেয়েকে দেখিয়ে বললো, 'নীল শাল পরা মেয়েটা।'

মৃদুল মেয়েটাকে দেখে বললো, 'এ তো আসমানের পরী।'

লিখন হাসলো। বললো, 'পূর্ণার সামনে এই কথা বলিও না।'

দুজন একসাথে হাসলো। আরো অনেক কথা বললো। মৃদুল কথার ফাঁকে খেয়াল করেছে যে মেয়েটিকে লিখন নায়িকা বলেছে,সে মেয়েটি বার বার লিখনের দিকে তাকাচ্ছিল। দৃষ্টি অন্যরকম। মৃদুল লিখনকে বললো, 'ভাই,নায়িকা বোধহয় তোমারে পছন্দ করে।'

লিখন ফিরে তাকাতেই, মেয়েটি দ্রুত চোখ সরিয়ে নেয়। লিখন মৃদুলকে বললো, 'আর ওদিকে তাকিও না। তোমার ধারণা সত্যি।'

মৃদুল উৎসুক হয়ে এগিয়ে আসে। আগ্রহ নিয়ে বলে, 'উনার নাম কী?'

'ফারহিন তৃধা।'

'মাশল্লাহ, নামের মতোই সুন্দর। তোমার সাথে কিন্তু মানাবে।'

লিখন স্মিত হেসে বললো, 'মানায় তো কতজনের সাথে আমরা কি সবাইকে পাই?'

মৃদুল 'না' সূচক মাথা নাড়াল। লিখন বললো, 'তৃধা ছেলেমানুষ। নতুন এসেছে মিডিয়া জগতে। শুনেছি,আমার জন্য নাকি মিডিয়া জগতে এসেছে। আমি যাকে ভালোবাসি তাকে ভুলিয়ে দিয়ে নিজে জায়গা করে নিবে। এটা কি ছেলেমানুষি ভাবনা নয়?'

লিখন হাসলো। হাসলো মৃদুলও। লিখন বললো, 'আমরা জীবনে অনেক কিছু চাই। সব কিন্তু পাই না। এটা সম্ভব নয়। আমার কী নেই? সব আছে। কিছুর অভাব নেই। শুধু একটা অংশই ফাঁকা। সে অংশটা কখনো পূর্ণ হবে নাকি জানি না। পূর্ণ হবে একদিন,এটা ভাবাও ঠিক নয়। কারণ যাকে চাই সে পরস্ত্রী! তবুও মন ভেবে ফেলে। যদিও এই আশা পূর্ণ হয়, আমার বর্তমানে যা কিছু আছে তা থেকে কিছু একটা হারিয়ে যাবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। নিয়তি। কিছুর অভাব না থাকলে,তুমি কার পিছনে দৌড়াবে? কীসের আশায় বাঁচবে? অপূর্ণতা একধারে সৌভাগ্য আবার দূর্ভাগ্য।'

'তুমি অনেক বুঝো ভাই।'

'এইযে তৃধা পাগলামি করে, আমি কিন্তু মানা করি না। তালও দেই না। পাগলামি করে যদি নিজের মনকে তৃপ্ত রাখতে পারে তবে করুক না। সে তো জানে, আমার মন অন্যখানে ছুটে।'

'কতদিন অবিবাহিত থাকবা? এইবার বিয়ে করে নেও।'

'আম্মা, চিঠি পাঠিয়েছেন। কোন রাজনীতিবিদের মেয়ের সাথে বিয়ের কথা চলছে। এইবার ফিরে বিয়ে করতেই হবে। নয়তো নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। এটা কোনো কথা?'

'এইবার বিয়ে কইরা নেওয়া দরকার। খালাম্মারও তো ইচ্ছে করে ছেলের বউ দেখার।'

'মৃদুল তুমি সব জানো। তুমি খুব ভালো ছেলে। ভালোবাসাও বুঝো। তাই তোমার সাথে কিছু বলি। পদ্মজা শুধু একটা নাম না। আমার মনে হয় পদ্মজা শব্দটা একটা প্রাণ! আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। আমি খুব খারাপভাবে পদ্মজাতে ফেঁসে গেছি। আমার মাঝে মাঝে দম বন্ধকর কষ্ট হয়। তখন চেষ্টা করি,পদ্মজা নামক মায়াজাল থেকে বেরোতে। কিন্তু পারি না। এই যে বেঁচে আছি,প্রতি মুহূর্তে মনে হয় পদ্মজা আসবে একদিন আমার কাছে আসবে। মানুষ তো আশা নিয়েই বাঁচে। আশা পূরণ না হউক। আশা রাখতে তো দোষ নেই। বাঁচতে তো হবে। তৃধা আমাকে ভালোবাসে। আমি বুঝি। যখন শুটিং চলে,মুখস্থ ডায়লগগুলো তৃধা মন থেকে অনুভব করে আমাকে বলে। কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না। আমার তখন খারাপ লাগে। আমি নিজে একজনের প্রেমে ব্যাকুল। তাই অন্য কারো ব্যাকুলতা আমি বুঝি। এখন আমি পদ্মজার অনুভূতিও বুঝি। পদ্মজার জায়গায় আমি দাঁড়িয়েছি। তৃধা আমাকে পদ্মজার অনুভূতি বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি তৃধাকে যেমন মনে জায়গা দিতে পারি না,পদ্মজাও আমাকে দিতে পারে না। পদ্মজা আমির হাওলাদরকে খুব ভালোবাসে। আমি নিজের ভালোবাসার সাথে তাদের ভালোবাসাকেও সম্মান করি। তাদের ভালোবাসা অতুলনীয়। বুকে একটু জ্বালাপোড়া হয় ঠিক তবে এটাই বাস্তবতা! তৃধার জন্য আমার মায়া হয়,মেয়েটা অন্য কাউকে ভালোবেসে সুখি হতে পারতো। ঘুরেফিরে এমন কাউকে ভালোবেসেছে যে অন্য কাউকে ভালোবাসে। আমার মত হয়তো পদ্মজাও ভাবে। তৃধার ভালোবাসাকেও আমি সম্মান করি। সে সত্যি মন উজাড় করে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সাড়া দেয়া সম্ভব নয়। এমনকি আমি তৃধাকে জায়নামাজে বসে কাঁদতেও দেখেছি। তবুও আমার মনে ভালোবাসা জন্মায়নি। ভালোবাসা খুব কোমল আবার খুব শক্তও। কিছু মানুষ একজনকেই ভালোবাসার জন্য জন্মায়। অন্য কারো ভালোবাসা তাকে ছুঁতে পারে না। তার মধ্যে আমি একজন। হয়তো পদ্মজাও তার মধ্যে আরেকজন। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। তৃধা ভালোবাসে আমাকে,আমি ভালোবাসি পদ্মজাকে,পদ্মজা ভালোবাসে আমির হাওলাদরকে! সবার ভালোবাসাই সত্য! কি কাণ্ড! এই পৃথিবীর সুখী মানুষ কারা জানো? তোমার মতো মানুষেরা।'

মৃদুল মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। সে অবাক হয়ে বলে, 'আমার মতো?'

'হুম, তোমার মতো। তুমি পূর্ণাকে ভালোবাসো, পূর্ণাও তোমাকে ভালোবাসে। তোমাদের তৃতীয় ব্যক্তির যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। এই ভালোবাসাকে কখনো হারাতে দিও না। কপাল গুণে যাকে চাও সেও তোমাকে চায়। কখনো অসম্মান করো না, ধরে রেখো। ভালোবাসা খুব দামী! যা সবাই পায় না। আমাদের জীবনে মা-বাবা,নানা-নানি,দাদা-দাদি, ভাই-বোন অনেক মানুষ আছে। যারা আমাদের ভালোবাসে। তবুও আমরা জীবনসঙ্গীর জন্য পাগল হই। তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকি। তার ভালোবাসা ছাড়া নিজেকে শূন্য মনে হয়! এই মায়া পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে হয়ে এসেছে। আমিও তেমন একজনের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে আছি। ঝাপসা ভোরে হাঁটছি। এই জায়গাটা অন্য কাউকে দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমি বিয়ে করব না। কোনো মেয়েকে জীবন্ত হত্যা করার অধিকার নেই আমার। আমাকে যে বিয়ে করবে সে সুখি হবে না। আমি পারব না। আমি স্বামী হিসেবে ব্যর্থ হয়ে যাবো। কলঙ্ক লেগে যাবে। আমি সেটা হতে দেব না। মনে একজনকে রেখে আরেকজনকে বিয়ে করে তাকে সুখি করা একটা চ্যালেঞ্জ। আমি এই চ্যালেঞ্জটা নিতে পারবো না। কারণ,আমি শতভাগ নিশ্চিত এই চ্যালেঞ্জে আমি হেরে যাব। যে যাই ভাবুক। একাই জীবন কাটিয়ে দেব। ভালোবেসে যাওয়াতেও শান্তি আছে। নিজের স্বার্থে সেই শান্তি আমি নষ্ট করব না। বিয়ের কথা আর কখনো বলো না। আম্মাকে আমি সামলে নেব। তুমি পূর্ণাকে দ্রুত বিয়ে করে নাও। যাই হয়ে যাক। কেউ কারো হাত ছাড়বে না। একজন পিছিয়ে গেলেই কিন্তু সব শেষ।'

মৃদুল লিখনের এক হাত ধরে বললো, 'ভাই,তোমারে কী বলবো আমি বুঝতাছি না। কিন্তু পূর্ণারে আমি মরে গেলেও ছাড়ব না। আমি আমার সৌভাগ্য ধরে রাখব।'

লিখন মৃদুলের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'ভালো প্রেমিক হয়ে উঠো,ভালো স্বামী হয়ে উঠো। তুমি বসো। শুটিং শুরু হবে। পরে আবার কথা হবে।'

'যাও ভাই।'

শুটিং শুরু হয়। মৃদুল উঠে আসে। তৃধা নামক সুন্দরী মেয়েটির পরনে শাড়ি। কোমর সমান লম্বা চুল। রূপে কোনো কমতি নেই। তাও তৃধা লিখনের আকর্ষণ পাচ্ছে না। ভালোবাসা এতো অদ্ভুত কেন হয়?

মৃদুল তৃধাকে খেয়াল করে। তৃধার লিখনের দিকে তাকানোর দৃষ্টি অভিনয় নয়,একদম পূর্ণার মতো। পূর্ণা যেভাবে তার দিকে তাকায়। ঠিক সেরকম। লিখন তৃধার হাতে ধরতেই তৃধার চোখেমুখে একটা আনন্দ ছিটিয়ে পড়ে। একমাত্র শুটিংই পারে তাকে লিখনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। মৃদুলের শরীরটা কেমন করে উঠে। ভালোবাসার জগতে কত রূপের ভালোবাসা রয়েছে! পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে। মৃদুল লিখনকে না বলেই বেরিয়ে পড়ে। বড়ই গাছের নিচে দুটো খালি চেয়ার পড়ে থাকে। চারিদিকে মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

সকাল সকাল পূর্ণা,প্রেমা,বাসন্তি, প্রান্ত সবাই মিলে হাওলাদার বাড়িতে চলে আসে। সবাই খুব চিন্তিত। তারা নিজের চোখে পদ্মজাকে দেখতে চায়। পদ্মজার গলায় মাফলার পরেছে,যেন গলার দাগ দেখা না যায়। তার ঘরের সামনে একজন লোক সবসময় ঘুরঘুর করছে। আমির পাহারাদার রেখেছে। এছাড়া নজর রাখার জন্য লতিফা তো আছেই। পূর্ণা,প্রেমা ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে আপা'বলে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরলো। পদ্মজা যেন প্রাণ ফিরে পায়। খুশিতে তার চোখে জল চলে আসে। সে দুই বোনের মাথায় চুমু দিয়ে বলে, 'আমার বোনেরা।'

পদ্মজার গালের ক্ষতস্থান সবার আগে প্রেমা খেয়াল করলো। সে প্রশ্ন করলো, 'আপা,তোমার গালে কী হয়েছে?'

পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে বললো, 'ব্যথা পেয়েছি।'

পূর্ণা পদ্মজার ক্ষতস্থান ছুঁয়ে বললো, 'আপা,এতোটা কেমন করে হলো? কবে হলো?'

আমির ঘরে প্রবেশ করে। পূর্ণার জবাব দেয়, 'ঢাকা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে।'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকালো। রাতের পর আর তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। ফজরে অন্দরমহলে রিদওয়ান নিয়ে এসেছে। আমির পদ্মজার দিকে তাকালো না। সে টেবিলের উপর থেকে একটা কলম তুলে নিল। তারপর'আসছি'বলে চলে যায়। পদ্মজার মুখে বসিয়ে গেছে,বানানো কথা। পূর্ণা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'আপা,দুর্ঘটনা মানে? কেমনে কী হলো?'

পদ্মজার মিথ্যে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে। সে বললো, 'যা হয়ে গেছে হয়েই গেছে। এখন তো ভালো আছি। দুর্ঘটনা মনে রাখতে নেই। এসব নিয়ে কোনো আলোচনা না।'

পূর্ণার খুব কষ্ট হচ্ছে। পদ্মজার ফর্সা গালে ক্ষতটা ভেসে আছে। ভয়ানক দেখাচ্ছে। পূর্ণা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজা টের পায় পূর্ণা কাঁদছে। পূর্ণা এত কেন ভালোবাসে! পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'কাঁদে না। এইটুকুর জন্য কেউ কাঁদে?'

পূর্ণা কান্নামাখা স্বরে বললো, 'মনে হচ্ছে,আমি ব্যথা পেয়েছি।'

পদ্মজা পূর্ণাকে সামনে দাঁড় করায়। পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বলে, 'আমার কাঁদুনিরে।'

পূর্ণা হাসে,তার সাথে পদ্মজাও হাসে। হাসে প্রেমা,প্রান্ত,বাসন্তি। পদ্মজার পাতালঘরে থাকা মেয়েগুলার কথা মনে পড়ে যায়। সেই মেয়েগুলোরও মা-বোন-বাবাও তো অপেক্ষা করে আছে। আশায় আছে,একদিন তাদের মেয়ে,বোন ঘরে ফিরবে। পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কিছুতেই মেয়েগুলোকে কুরবানি হতে দেওয়া যাবে না। সে তার সবকিছু ত্যাগ করে হলেও বাঁচাবে!

পূর্ণারা দুপুরে চলে যায়। আমির ঘরে আসে। দরজা থেকে পদ্মজাকে বলে, 'কারো কাছে কিছু বলার চেষ্টা করবে না। বোনদেরও না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কাউকে কিছু বললে তোমার বোনদের ক্ষতি হবে। বাইরে শান্টু আছে। বাড়ির গেইটেও দুজন আছে। বাইরে থেকে কেউ যেন না আসে। শুধু তোমার পরিবার ছাড়া। বেরোবার চেষ্টা করো না।'

আমির কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ায়। পদ্মজা প্রশ্ন করে, 'আম্মার কাছে আমাকে যেতে দেয়া হচ্ছে না কেন? আম্মা অসুস্থ। উনাকে আমি দেখতে চাই।'

'বলে দিচ্ছি, যেতে দিবে।'

'পূর্ণাকে বিয়ে দিতে চাই। খুব দ্রুত। প্রেমাকেও।'

আমির ঘুরে দাঁড়ায়। বললো, 'প্রেমাকেও কেন?'

'আমার ভবিষ্যৎ আমি জানি না। হয় জেল নয় মৃত্যু। কিছু একটা হবেই।'

তাৎক্ষণিক আমির কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না। সময় নিয়ে বললো, 'মৃদুল আর পূর্ণাকে গতকাল সন্ধ্যায় মেলায় দেখেছি। মৃদুলের সাথে কথা বলতে পারো।'

পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'সত্যি? কী করছিল?'

'মেলায় কী করতে যায়?'

পদ্মজা বুঝতে পারে। সে বললো, 'ছোট ভাই আপনার মতো না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে?'

'মৃদুল আমাদের বংশের না। তাই আমার সাথে নেই। বাইরে কিছু করে নাকি জানি না।'

পদ্মজার জবাব না শুনেই আমির চলে যায়। পদ্মজা ভাবতে বসে। মৃদুল অনেক সুন্দর একটা ছেলে। সে কি পূর্ণাকে সত্যি ভালোবাসে? নাকি এমনি ঘুরতে গিয়েছিল। একটা ছেলেমেয়ে এমনি তো মেলায় ঘুরতে যাবে না। তাদের সমাজ তো এমন নয়। পদ্মজা দৌড়ে বেরিয়ে আসে। আমিরকে ডাকলো, 'শুনুন।'

আমির দাঁড়াল। পদ্মজা বললো, 'আমি ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই।'

'সন্ধ্যায় কথা হবে। আমার সামনে।'

ফরিনার অবস্থা করুণ। পদ্মজা সব জেনে গেছে জানার পর অসুস্থতা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে দেখে, ফরিনা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পদ্মজা ফরিনার শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকলো, 'আম্মা?'

ফরিনার বুক ছ্যাৎ করে উঠলো। তিনি চট করে চোখ খুললেন। চোখ ভরে উঠে জলে। তিনি উঠতে চান,পদ্মজা ধরে। ফরিনা কেঁদে উঠলেন। কেঁদে উঠে পদ্মজাও। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদে। ফরিনা চোখের জল মুছে বললেন, 'আজরাইল আমার ঘরে ঘুরতাছে। তোমারে না দেইখা আমি কেমনে মরি কওতো?'

'এসব বলবেন না আম্মা। আমার মা নেই। আপনি আমার মা।'

ফরিনা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'এহন আমি শান্তিতে মরতে পারুম। তোমারে আমার অনেক কথা কওনের আছে।'

পদ্মজা ফরিনার এক হাত মুঠোয় নিয়ে ভেজাকণ্ঠে বললো, 'আপনার ছেলের সম্পর্কে সব জানি আম্মা। আমার বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়েছে।'

ফরিনায় ঘৃণায় কপাল কুঁচকে ফেললেন। বললেন, 'বাবু আমার গর্ভরে কলঙ্কিত করছে।'

'আপনি উত্তেজিত হবেন না আম্মা।'

'আমি তোমারে কইতে গিয়েও কইতে পারি নাই। আমারে মাফ কইরা দেও। তোমার জীবনটা আমার কুলাঙ্গার সন্তানের লাইগগা নষ্ট হইয়া গেছে। ও মা, ওরা তোমারে মারছে?'

'না আম্মা, আমাকে কেউ মারেনি। আপনি শান্ত হোন। আমি চলে এসেছি, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আপনার আর কষ্ট হবে না।'

ফরিনা চোখ বড় বড় করে তীব্র ঘৃণা আর রাগ নিয়ে বললেন, 'আমি যদি মইরা যাই। তুমি বাবুর বাপের মাথাডা কাইটটা আমার কবরে রাইখা আইবা। আমার আদেশ এইডা। তাইলে আমার আত্মা শান্তি পাইবো।'

ফরিনা ছটফট করছেন। শ্বাস নিচ্ছেন অনেক কষ্টে। রাগে শরীর কাঁপছে। বিছানায় দূর্গন্ধ। চোখ মুখ শুকিয়ে একটু হয়ে গেছে। পদ্মজা দুই হাতে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরলো শান্ত করার জন্য। বলে, 'আম্মা,শান্ত হোন। আল্লাহ সব পাপের জন্য শাস্তি আগে থেকেই বরাদ্দ করে রেখেছেন। সবার শাস্তি হবে। হতেই হবে।'

'শুয়োরের বাচ্চা আমার সাথে কী করছে আমি তোমারে কইতে চাই। তুমি হুনো আমার কথা।'

'সব শুনবো আম্মা। সব শুনবো। লতিফা বুবু বললো, খাবার নাকি খাচ্ছেন না। এখন খাবেন। ঔষধ খাবেন, ঘুমাবেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে সব বলবেন। আপনার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। কাঁপছেন আপনি। শান্ত হোন আপনি।'

ফরিনা আবোলতাবোল বলতেই থাকেন। মানুষটার মৃত্যু যেন ঘনিয়ে এসেছে। পদ্মজা বিছানা পরিষ্কার করে। ফরিনার শরীর মুছে দেয়। নতুন শাড়ি পরিয়ে খাইয়ে দিল। তারপর জোর করে ঘুম পাড়িয়ে,লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। মানুষটার অতীত কতোটা ভয়ংকর সে জানে না। তবে শুনতে চায়। সবকিছু জেনে বড় কোনো উদ্যোগ নিতে হবে। পদ্মজার নিজের মায়ের একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি সবসময় বলতেন "প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করে।"

যদি এই কথাটি সত্য হয়। তবে হাওলাদার বংশের শেষ পুরুষদের ধ্বংস করাই তার জন্মের উদ্দেশ্য! সে শতভাগ নিশ্চিত!

পর্ব ৭২

সন্ধ্যা নেমেছে কিছুক্ষণ পূর্বে। আজ আকাশ পরিষ্কার। কুয়াশা নামেনি। সন্ধ্যার নামায আদায় করে পদ্মজা নিজ ঘরে বসে আছে। অপেক্ষা করছে মৃদুলের জন্য। নিস্তব্ধতা ভেঙে পায়ের শব্দ ভেসে আসে। আমির ঘরে প্রবেশ করে। পদ্মজার থেকে দূরত্ব রেখে চেয়ারে বসে। তারপর প্রবেশ করলো মৃদুল। মৃদুলের বুক কাঁপছে। সে চিন্তিত। পদ্মজা মৃদুলকে সালাম দিল। তারপর বললো, 'বসুন ছোট ভাই।'

মৃদুল বসলো। সে বুঝতে পারছে না কী হতে চলেছে। শঙ্কিত সে। গোপনে ঢোক গিলে একবার আমিরকে আরেকবার পদ্মজাকে দেখলো। পদ্মজা বললো, 'কেমন আছেন?'

মৃদুলের অস্বস্তি হচ্ছে। সে দ্রুত জবাব দিল, 'ভালো আছি ভাবি। কোনো সমস্যা হইছে?'

'না, কোনো সমস্যা হয়নি। কেমন লাগছে এখানে? খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক হচ্ছে?'

'জি ভাবি, সব ঠিক আছে। ভালো লাগছে। রানি আপার কথা খুব মনে পড়ে।'

পদ্মজা আক্ষেপের স্বরে বললো, 'রানি আপা কেন যে এমন করলো! যদি ফিরে আসতো।'

মৃদুল নিরুত্তর। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকালো। আমির নিশ্চুপ। সে এই আলোচনায় যাবে না। পদ্মজা মৃদুলকে বললো, 'আচ্ছা সোজাসুজিভাবেই কথা বলি। পূর্ণার সাথে আপনার সম্পর্কটা কী?'

পদ্মজার প্রশ্ন শুনে মৃদুলের দম গলায় এসে আটকে যায়। সামনে বড় ভাই আমির হাওলাদার। যাকে সে ভয় পায়। প্রশ্ন করছে,পূর্ণার বড় বোন। যে বোনকে পূর্ণা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় আর ভালোবাসে। এমন পরিস্থিতিতে যারা পড়েছে তারাই বুঝবে তখন কেমন অনুভূতি হয়। মৃদুলকে চুপ করে থাকতে দেখে পদ্মজা বললো, 'বলুন ছোট ভাই।'

মৃদুল বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ছাড়ল। তারপর বললো, 'কোনো নাম নাই। আমি পূর্ণারে পছন্দ করি। আর পূর্ণা আমারে।'

পদ্মজার বুক থেকে ভারি বোঝাটা নেমে যায়। মৃদুল এক প্রশ্নে সত্য কথা বলতে পেরেছে ভেবে আনন্দ হচ্ছে। কথাবার্তা বাড়ানো সম্ভব নয়। হাতে সময় নেই। তাই সে নড়েচড়ে বসে বললো, 'আপনি বা আপনার পরিবার বিয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন? পূর্ণাকে বিয়ে করতে চান?'

মৃদুল আবারো আমির-পদ্মজাকে দেখলো। আমির তার দিকে এক ধ্যাণে তাকিয়ে আছে। সে নীরব দর্শক। মৃদুল বুঝতে পারছে না,কীভাবে জবাব দিলে ভদ্র দেখাবে। প্রেমিকার অভিভাবকের সাথে কথা বলার জন্য আলাদা কলিজা লাগে! মৃদুল এক হাতে মাথা চুলকাল। পদ্মজার কেন যেন হাসি পায়। কিন্তু চোখেমুখে গাম্ভীর্য ধরে রাখে। এই মুহূর্তে সে পাত্রীর অভিভাবক! মৃদুল ধীরেসুস্থে বললো, 'আম্মা,আব্বা অনেকদিন ধরেই বিয়ের কথা বলতাছে। আমি রাজি ছিলাম না। এখন রাজি আছি।'

পদ্মজা মৃদুলকে আগাগোড়া পরখ করে নিয়ে বললো, 'বিয়ের ক্ষেত্রে গায়ের রঙ নিয়ে আপনার মতামত কী?'

প্রশ্ন শুনে মৃদুল থতমত খেয়ে গেল। মনে হচ্ছে,সে পরীক্ষা দিতে এসেছে। মেট্রিক পরীক্ষায় যা পারেনি, লিখেনি। চুপচাপ বসে সময় গুণেছে কখন ছুটি হবে। কিন্তু এখন তো জিততেই হবে। জীবন মরণের প্রশ্ন! সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিল! মৃদুল মুখখানা একটুখানি করে বললো, 'জানি না ভাবি। আমার চোখে আগে কালা-সাদার ভেদাভেদ ছিল। কিন্তু এখন নাই। কেন নাই,জানি না। হুট করেই মনে হইতাছে,চামড়ায় যায় আসে না। মনের টানটা আসল। যারে ভালোবাসা যায় তার সবকিছুই ভালোবাসা যায়। সব কিছুর উপরে ভালোবাসা। ভালোবাসার সামনে সবকিছু তুচ্ছ।'

মৃদুলের কথা শুনে পদ্মজার বুকটা কেমন করে উঠে। সে আড়চোখে আমিরের দিকে

তাকালো। আমিরও আড়চোখে তাকায়। দুজনের চোখাচোখি হতেই আমির উঠে চলে যায়। মৃদুল ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। বললো, 'ভাবি ভুল কিছু কইছি? ভাই রাগ কইরা চলে গেল?'

পদ্মজা লুকানো যন্ত্রণা হজম করে নিয়ে বললো, 'ভালো কথা বলেছেন। আমি কথা বাড়াব না। পূর্ণাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলে,দ্রুত নিজের বাড়ি ফিরে যান। অভিভাবক নিয়ে আসুন। আমি আমার বোনকে বিয়ে দেব। আপনার পরিবার রাজি থাকলে আমার আপত্তি নেই। আমার বোন আমার দায়িত্বে। আমি চাই না সে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে দীর্ঘদিন থাকুক। আশা করি দ্রুত সবকিছু হবে।'

মৃদুল খুব অবাক হয়। সে ভেবেছিল,পদ্মজা রাজি হবে না। তাকে রাজি করাতে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হবে। কিন্তু পদ্মজা তো রাজি। মৃদুলের

নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হতে থাকে। সকালে কোন সৌভাগ্যবানের মুখ দেখে উঠেছিল মনে করতে পারলে, সে তাকে একটা খাসি দিবে বলে ভাবে। মৃদুল চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পদ্মজাকে সালাম করতে ঝুঁকলো। পদ্মজা আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায়। সে দ্রুত বিছানার উপর পা তুলে ফেললো। আর বললো, 'আসতাগফিরুল্লাহ! ছোট ভাই আপনি আমার বড়।'

মৃদুল আনন্দে আত্মহারা। তার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা কাজ করছে। কী করবে না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এতো দ্রুত হুট করে এমন সুন্দর প্রস্তাব পাবে,সে ভাবেনি। ঠোঁটে হাসি রেখে বললো, 'আমি শনিবারেই বাড়িত যামু। রবিবারেই আম্মা,আব্বারে নিয়া আসব। আপনি চিন্তা কইরেন না।'

মৃদুলের নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। সে ভীষণ উত্তেজিত বোঝাই যাচ্ছে। পদ্মজা পানি খেতে বললো। মৃদুল পানি পান করে। তারপর বললো, 'আসি ভাবি?'

'যান। আল্লাহ আপনার ভালো করুক।'

মৃদুল তাড়াহুড়ো পায়ে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হাসে। মৃদুল একদম পূর্ণার মতো। ছটফটে, চঞ্চল। আমির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। পদ্মজাকে হাসতে দেখে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। ধীর পায়ে জায়গা ত্যাগ করে বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়ায়। দূর আকাশে চোখ রেখে কী যেন ভাবে। তখন রিদওয়ান আসে। আমিরকে জানায়, 'শুক্রবারে সমাবেশ হচ্ছে না।'

আমির প্রশ্ন করলো, 'কেন?'

'শীতের কাপড় এখনো আসেনি। কালদিন পরই শুক্রবার।'

'আব্বার কাজই এমন। ভাগ্য ভালো গ্রামবাসীকে আগে দাওয়াত দেয়া হয়নি। শুধু চেয়ারম্যানদের দেয়া হয়েছিল। সমাবেশ যে হচ্ছে না তাদের জানানো হয়েছে?'

'হয়েছে। তুই কি আমার সাথে বের হবি?'

'আমি অন্যদিকে যাব।'

'রাতের ঘটনা শুনলাম। আরভিদের লাশটা কী করা হয়েছে?'

'যা করা হয় তাই করা হয়েছে। বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সম্ভব হয়নি।'

'আমি ঘুমে না থাকলে এমন কিছুই হতো না।'

আমিরের মেজাজ বিগড়ে যায়। বললো, 'তো ঘুমালি কেন?'

'তুই বউয়ের প্রতি দরদ দেখিয়ে আমাদের দলের একজন বিশ্বস্ত, শক্তিশালীকে হারালি।'

আমির কিছু বললো না। রিদওয়ান বললো, 'পদ্মজার বুকেও ডরভয় নাই। সব তোর দোষ!'

আমির ক্রোধ নিয়ে বললো,"আমার সাথে গলা উঁচিয়ে কথা বলবি না।'

'কী করবি? মারবি? মার।'

আমির দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কিড়মিড় করে বললো, 'রিদওয়ান! মুখ নিয়ন্ত্রণ কর। নয়তো

বিছানায় না, সোজা কবরে যাবি। পুরনো প্রতিশোধ
নিয়ে নেব।'
রিদওয়ান আমিরের দিকে অগ্নি দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। আমির গ্রিল খামচে ধরে। তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। রেগে গেলেই তার কপাল ঘামে!
ফরিনার ঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। মজিদ হাওলাদার আলাদা থাকেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে আগে হারিকেন জ্বালাল। বিছানার এক কোণে রেখে ফরিনার পাশে বসলো। ফরিনা ঘুমাচ্ছেন। নিশ্বাস নিচ্ছেন ঘন ঘন। দেখে মনে হচ্ছে,কেউ রূহর গলা চেপে ধরে রেখেছে। ফরিনা নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ছটফট করছেন। পদ্মজার বুকটা ব্যথায় ভরে উঠে। সে ফরিনার চুলে বিলি কেটে দেয়। আরেক হাতে ফরিনার এক হাত শক্ত করে ধরে। হাত দুটো নিস্তেজ,নরম! যেন মরে গেছে। পদ্মজার কষ্ট হয়। মনে পড়ে প্রথম হাওলাদার বাড়িতে প্রবেশ করার কথা। কত মানুষ ছিল। লাবণ্য বিলেত পড়তে চলে গেল। শুনেছে,লাবণ্য বিলেতের এক ছেলেকে বিয়ে করতে চলেছে। আমির অনুমতি দিয়েছে। ফরিনা কষ্ট পেয়েছেন। রানি আপা কোথাও চলে গেল কে জানে! কষ্টের পরিমাণ কতোটা বেশি হলে একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে যায়? মদনকে আজ সারাদিন দেখা যায়নি। কোথায় সে? ফরিনা চোখ খুললেন। পদ্মজাকে দেখে মৃদু হাসলেন। পদ্মজা বললো, 'কেমন আছেন আম্মা? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'
ফরিনা পদ্মজার এক হাত ধরে বললো, 'তুমি আইছো মা।'
'আসছি আম্মা। কিছু লাগবে?'
ফরিনার কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। সারা শরীরে আগুন পুড়ানো জ্বালাপোড়া। ঘরটাকে মৃত্যুপুরী মনে হয়। পৃথিবী তাকে আর রাখতে চাইছে না। ঠেলে যেন সরিয়ে দিচ্ছে অজানা জগতে। তিনি সময় নিয়ে বললেন, 'কিছু লাগব না মা। তুমি আমার ধারে থাহো।'
পদ্মজা ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আছি আম্মা। আছি আমি।'
ফরিনা হারিকেনের নিভু আলোয় পুরো ঘরটাকে দেখলেন। পদ্মজাকে দেখলেন। আচমকা ডান পা বিরতিহীন কাঁপতে থাকে। তিনি পদ্মজার শাড়ি খামচে ধরে ভয়ার্ত স্বরে বললেন, 'আমারে নিয়া যাইতাছে। আমারে ধরো পদ্মজা। আমারে ধরো। আমারে নিয়া যাইতাছে। যা,যা এখান থেকে যা।'
তিনি কাঁদতে থাকেন। পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। এক হাতে ফরিনার ডান পা চেপে ধরে। ধীরে ধীরে কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। পদ্মজা দ্রুত ফরিনাকে পানি পান করালো। তারপর বললো, 'কিছু হয়নি আম্মা। কেউ নেই এখানে। আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন।'
ফরিনা ভীত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'কেউ নাই!'
'না নেই। ঘুমানোর চেষ্টা করুন আম্মা।'
ফরিনা পদ্মজার দুই হাত আঁকড়ে ধরে চোখ বুজেন। পদ্মজা ছাড়া মানুষটার কেউ নেই। তিনি পদ্মজাকে কতোটা বিশ্বাস করেন,ভরসা করেন সেটা হাত ধরে রাখা দেখেই বুঝা যাচ্ছে।
বসে থাকতে থাকতে পদ্মজার চোখ দুটি লেগে আসে। তখন ফরিনা চোখ খুলে বললেন, 'আমার আম্মার নাম ফুলবানু আছিল। রামপুরার ছেড়ি।'
পদ্মজার ঘুম ছেড়ে যায়। সে নড়েচড়ে বসে। আরো একটি জীবনের গোপন অধ্যায়ের স্বাক্ষী হতে চলেছে পদ্মজা। ফরিনার চোখের দৃষ্টি ছাদে। তারা দুজন ছাড়া কোথাও কেউ নেই। বাইরে থেকে শেয়ালের হাঁক ভেসে আসছে।

ফুলবানু দেখতে সুন্দর ছিল বলে তার নাম ফুলবানু হয়। ফুলবানুর মা মারা যায়,যখন ফুলবানুর বয়স ছয়। বাবার আদরেই বড় হয়। যখন ফুলবানুর চৌদ্দ বছর বয়স তখন বনেদি এক পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। তাদের যৌতুকের চাহিদা অনেক। তাও ফুলবানুর বাবা রাজি ছিলেন। জমিজমা,গরু-ছাগল বেঁচে মেয়ের বিয়ে দিলেন। একটাই যে মেয়ে

ছিল। মেয়ের সুখই সব। ফুলবানুর সংসার দুই মাসের বেশি ভালো যায়নি। স্বামী চাপ দেয়,যৌতুকের জন্য। ফুলবানু সে খবর তার বাবার কাছে পাঠায়। ফুলবানুর বাবা শেষ সম্বল বাড়িটিও বিক্রি করে দেন। মেয়েকে সুখী করে নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বেছে নেন অনিশ্চিত জীবন। মানুষটার খবর আর পায়নি ফুলবানু। বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে সে জানে না। বিয়ের বছর খানেকের মাথায় জন্ম হয় ফরিনার। ফুলবানুর শ্বশুরবাড়ি অপেক্ষায় ছিল,ছেলের আশায়। মেয়ে দেখে তারা কপাল কুঁচকায়। এদিকে ফুলবানুর স্বামীর সম্পর্ক হয়েছে আরেক বনেদি ঘরের মেয়ের সাথে। যার বয়স ফুলবানুর স্বামীর চেয়েও বেশি। মেয়ে জন্ম দেয়ার অপরাধে ফুলবানুকে সহ ফরিনাকে রাস্তায় ফেলে দেয় তারা। ফুলবানুর স্বামী বিয়ে করে বনেদি ঘরের সেই মেয়েকে। যৌতুক দিয়ে ভরিয়ে দেয় ঘর! সেখানে এতিম ফুলবানুর জায়গা হয়নি কিছুতেই। রাস্তায় কত অমানুষ ছিঁড়ে খায় তাকে। তবুও রক্তাক্ত অবস্থায় ফুলবানু ধরে রাখে তার আদরের একমাত্র কন্যা ফরিনাকে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অলন্দপুরের বাজার বেছে নেয় ফুলবানু। এক পাগলির মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকে ফরিনা। বয়স বাড়তে বাড়তে বারোতে এসে ঠেকে। সেই সময়ে এক চন্দ্রহীন রাতে মজিদের শিকার হয় ফরিনা।

পর্ব ৭৩

ঘোর অন্ধকারে ফরিনাকে নিয়ে আসা হয় পাতালঘরে। ছোট ফরিনা মুক্তির জন্য ছটফট করে। মজিদ তখন টগবগে যুবক। তার একেকটা থাবা ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘের মতো। ফরিনার ছোট্ট শরীর নির্মমভাবে কলুষিত হয়। রক্তাক্ত ফরিনা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে পাতালঘরে। এরপরদিন চোখ খুলে মজিদের সাথে খলিলকে দেখতে পায়। আশেপাশে কয়েকজন পুরুষ ছিল। বাঁধা অবস্থায় ছিল চারটে মেয়ে। ফরিনার চোখের সামনে চারটা মেয়েকে বিভৎস ধর্ষণ করা হয়। ফরিনা ভয়ে কাঁপতে থাকে। সারা শরীরের ব্যথা ভুলে যায়। নৃশংসতার এই তাণ্ডব শেষ হওয়ার পর মজিদ ফরিনার কাছে আসে। তখন খলিল ফরিনাকে দেখে বললো, 'ভাই,এই ছেড়ি তো ফুলবানুর।'

মজিদ প্রশ্ন করে, 'কোন ফুলবানু?'

'বাজারের পাগলিডা যে।'

হাওলাদার বাড়ির ছেলেরা ছেলে সন্তানের জন্য খুঁজে, খুঁজে অসহায় মেয়েদের বিয়ে করে। যাতে কখনো মুখের উপর কথা না বলতে পারে। সব জানা সত্ত্বেও চুপচাপ সব মেনে নেয়। সে মেয়ে সুন্দর হউক অথবা কুৎসিত। তাতে যায় আসে না। ছেলে সন্তানটাই আসল। গরীব,অসহায় মেয়েদের হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা বিয়ে করে ঘরে তুলে বলে চারপাশে তাদের অনেক নাম। অথচ,কেউ জানে না ভেতরের খবর! কেউ জানে না ভালোমানুষির পিছনের নোংরা গল্প! চতুর মজিদ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়,ফরিনাকে বিয়ে করবে। এমন মেয়ে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফরিনার পরিবার বলতে কিছু নেই। মা আছে সেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পথেঘাটে ঘুরে। সুন্দর অনেক মেয়ের সঙ্গ তো প্রতিদিনই পাওয়া যায়। সমাজের চোখে বউ একজন হলেই হলো। মজিদের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। সে ফরিনাকে অন্দরমহলে নিয়ে আসে।

পূর্বে মজিদের একটা বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেনি। মজিদের পাপের পথের বিষধর কাঁটা হওয়ার ফলে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। খলিলের বউ আমিনা তখন গর্ভবতী। আমিনার বয়স ছিল পনেরো। মজিদ ফুলবানুকেও অন্দরমহলে নিয়ে আসে। ফুলবানু আর মজিদের বয়স কাছাকাছি ছিল। মজিদ যখন প্রস্তাব দিল,বোকা,সরল-সহজ ফুলবানু খুব খুশি হয়। তার মেয়ে এত বড় বাড়িতে রানির হালে থাকবে। তাকেও থাকতে দিবে এর চেয়ে খুশির কী হতে পারে? মজিদের মাতা নূরজাহান বিয়ের প্রস্তুতি নেন। বাড়িতে মজিদ-খলিলের অভিভাবক বলতে তিনি ছিলেন। তার স্বামী অষ্টাদশী এক তরুণীর সতীত্ব হরণ করতে গিয়ে সেই তরুণীর হাতে নিহত হয়। ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন হয় বিয়ে। অলন্দপুর সহ আশেপাশের সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে মজিদ হাওলাদারের নাম। বনেদি ঘরের শিক্ষিত পাত্র হয়ে বিয়ে করেছে এক অসহায় পাগলির মেয়েকে! সবার মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় ভরে উঠে। বিয়ের রাতে ফরিনা দ্বিতীয়বারের মতো মানুষরূপী যমদূতের দেখা পায়। শরীরে ছোপ,ছোপ দাগ বসে। বিছানায় পড়ে থাকে দীর্ঘদিন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়,মজিদের অত্যাচারে আবার শয্যা গ্রহণ করে। ফরিনার এত দূর্বলতায় মজিদ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ক্রোধে ফেটে পড়ে সে। তার বিকৃত মস্তিষ্ক ফরিনাকে নগ্ন করে পিটানোর আহ্বান জানায়। মজিদ তাই করে। সে দৃশ্য চোখে পড়ে ফুলবানুর। গগণ কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠে। সেই চিৎকার ফুলবানুর জীবনের মরণ কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। মজিদের হাতে বন্দি হয় সে। ফরিনার ঘরে তাকে বেঁধে রাখা হয়। তখন বিছানায় ফরিনা রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। অস্পষ্ট স্বরে'আম্মা,আম্মা'বলে চুপ হয়ে যায়। ফুলবানু চিৎকার করে মানুষজনকে ডাকে। কেউ শুনেনি তার চিৎকার। ফরিনাকে গলা ফাটিয়ে ডাকে, 'ফরিনারে, ও মা

একটু দেখ আমারে...আম্মারে।'

নূরজাহান, আমিনা সব শুনেও নিজেদের ঘরে শুয়ে থাকে। আমিনা ভালো বংশের মেয়ে। তাকে বিয়ে করার কারণ,সে মৃগী রোগী। আর খুব ভীতু প্রকৃতির। আমিনার পিতা

প্রভাবশালী। গ্রাম্য রাজনীতি সাহায্যের জন্য হাওলাদারদের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান আত্মীয় প্রয়োজন ছিল। আমিনার আরো বোন ছিল। সুস্থ,সুন্দর। কিন্তু মজিদ খলিলের জন্য পছন্দ করেছে রোগী,ভীতু প্রকৃতির মেয়ে আমিনাকে। ফরিনাকে সুস্থ করার জন্য ফুলবানুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এক ঘরে বন্দি রাখা হয়। কেটে যায় তিন-চার দিন। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। ফুলবানু ফরিনার মুখ ছুঁয়ে আদর করে আর বলে, 'আমার আম্মা!'

ফরিনা ঠোঁট ভেঙে কেঁদে মায়ের কাছে অভিযোগ করে, 'আমারে অনেক মারে আম্মা। আমারে লইয়া যাও। আমি এইহানে থাকুম না।'

ফুলবানুর চোখ বেয়ে জল পড়ে। দুই হাতে মাথা চুলকায়। ফরিনা তাকে নদীর পাড়ে নিয়ে গোসল করিয়ে দিতো। কেউ খাবার দিলে ফরিনা তার মাকে খাইয়ে দিতো,নিজেও খেতো। যাযাবর জীবনে ফরিনার দায়িত্বে ছিল তার মা। ফুলবানু সবকিছুতে শূন্য দেখে। শুধু বুঝতে পারে,তার মেয়েকে একজন লোক অত্যাচার করে। মনে হতেই,ফুলবানুর দৃষ্টি অস্থির হয়ে পড়ে বার বার। এলোমেলোভাবে হাত পা নাড়াতে থাকে।

দরজা খট করে শব্দ হয়। মজিদ ঘরে প্রবেশ করে। ফুলবানু তেড়ে এসে মজিদের চুল টেনে ধরে,বাহুতে দাঁত বসিয়ে দেয়। মজিদ আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায়। আর্তনাদ করে উঠে। ফুলবানুর চুল শক্ত করে ধরে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। ফুলবানু মেঝেতে পড়তেই,শব্দ হয়। ফরিনা কাঁদতে শুরু করে। ফুলবানু আবার উঠে দাঁড়ায়। রাগে সে কিড়মিড় করছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছে। ফুলবানু কাছে আসতেই মজিদ ফুলবানুর তলপেটে লাথি দেয়। ফুলবানু ছিটকে পড়ে। গোঙাতে থাকলো। ফরিনা ভয়ে জড়সড়! সে কাঁদতে কাঁদতে মজিদকে অনুরোধ করলো, 'আমার আম্মারে মাইরেন না।আপনে আমার আম্মারে মাইরেন না। আমার আম্মায় কিচ্ছু বুঝে না।'

মজিদ পালঙ্কের নীচ থেকে দড়ি নিয়ে ফরিনার হাতপা বাঁধে। ফুলবানু নতুন উদ্যমে আবার ছুটে আসে। সে মজিদকে খুন করতে চায়। কিন্তু দূর্বল,বোকা ফুলবানু পেরে উঠেনি মজিদের সাথে। মজিদ ফুলবানুর শরীরের প্রতিটি লোমকূপকে নির্মমভাবে আঘাত করে। খামচে ধরে।

তারপর দুই হাতে ফুলবানুর চুল ধরে মেঝেতে আঘাত করে কয়েকবার। ফুলবানুর মাথা থেকে রক্ত ছিটকে পড়ে চারপাশে। ফরিনার চিৎকার বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সাথে হারিয়ে যায়। থেমে যায় ফুলবানুর অভিশপ্ত যাযাবর জীবন। ফরিনার কণ্ঠনালি স্তব্ধ হয়ে যায়। এই জীবনে ভয়ংকর বলতে তার আর কিছু দেখার নেই। রাত শেষে দিন আসে। ফুলবানুর দেহ ভেসে যায় কোনো এক নদীর স্রোতে।

ফুলবানুর নির্মম মৃত্যু ফরিনার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে মিশে যায়। যত বার নিঃশ্বাস নেয় ততবার মনে পড়ে মায়ের কথা। মায়ের মৃত্যুর কথা। ছোট ফরিনা বুকের ভেতর মায়ের স্মৃতি লুকিয়ে রেখে মজিদের দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। দাসত্ব জীবনে বার বার হয়েছে অত্যাচারিত। ব্যথায় মলম লাগিয়ে দেওয়ার জন্যও কেউ ছিল না। একা কাটিয়েছে প্রতিটা মুহূর্ত। বিয়ের চার বছরের শেষদিকে কোল আলো করে আসে পুত্র সন্তান। ফরিনা জীবনে আনন্দ খুঁজে পায়। যখন তার পুত্র সন্তানের দুই বছর তখন ফরিনা ভাবে,সে তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিবে। হুট করেই বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠে। সুযোগ আসে মজিদকে হত্যা করার। ফরিনা রাম দা হাতে তুলে নেয়। দূর্ভাগ্যবশত মজিদ টের পেয়ে যায়। সে ফরিনাকে খলিল, নূরজাহান, আমিনা সবার সামনে নগ্ন করে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফরিনা দুই হাতে দেয়াল খামচায়। যেন দেয়াল ছুটে এসে তার কাপড় হয়। তার লজ্জা ঢেকে দেয়। কিন্তু অসম্ভব ঘটনাটা ঘটেনি।

ফরিনা হার মেনে নেয়। সহ্য করে নেয় সব। তার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বুকের মণিকোঠায় রক্তাক্ত তাজা অবস্থায় রয়ে যায়,তার মায়ের মৃত্যু।

ফরিনা দুই চোখ বুজে। গড়িয়ে পড়ে দুই ফোঁটা জল। ফরিনার বলা প্রতিটি কথা গুমরে, গুমরে যেন দেয়ালে বারি খাচ্ছে। সেই শব্দে পদ্মজার মাথা ভনভন করছে। তার চোখের জল বুক অবধি নেমে এসেছে। সে অনুভব করে,তার বুকের ভেতর ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সে অন্য সত্তায় অবস্থান করছে। চোখের জল মুছে ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর বললো, 'কথা দিচ্ছি,মজিদ হাওলাদারের মাথা আমি আপনার নামে উৎসর্গ করব।'

ফরিনা পদ্মজার হাতে চুমু দেন। তিনি এখন ভোরের শিশিরের মতো শীতল। নিজের ভেতরের সবটুকু রাগ,ক্ষোভ,আগুন ঢেলে দিয়েছেন পদ্মজার ভেতর। এবার বোধহয় মুক্তির পালা। ফরিনা পদ্মজার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মুখটারে আমার জান্নাতের সুবাসের লাহান মিষ্টি মনে অয়।'

পদ্মজা ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে বললো, 'আপনি আমার আরেক মা। আমার আরেক বেহেশত।'

ফরিনা হাসলেন। পদ্মজা বললো, 'আজ থেকে আপনার সব দায়িত্ব আমার। আপনাকে সুখে রাখার দায়িত্ব আমার। আমি আপনার সব চাওয়া পূরণ করব।'

ফরিনা হাসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি পাপী। ধর্ম নিয়া আমার শিক্ষা আছিলো না। তুমি আমারে শিখাইছো। শেষ দিনগুলা তোমার কথামত ইবাদাঁত (এবাদত) করছি।যদি আল্লাহ কবুল কইরা আমার নামে জান্নাত কইরা রাহে,দরজার সামনে তোমার লাইগগা খাড়ায়া থাকাম।'

ফরিনার কথাগুলো পদ্মজার বুকে তীরের মতো আঘাত হাঁনে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। সে দুই হাতে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কেন এসব বলছেন আম্মা!'

'আমার ধারে আমার লগে ঘুমাও মা।'

পদ্মজা ফরিনার পাশে শুয়ে পড়ে। ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করে। মাথায় হাজারটা ভাবনা,অনেক ক্ষোভ,ঘৃণা। এতসব নিয়ে কি ঘুম আসে? দীর্ঘসময় পর তার চোখ দুটি বন্ধ হয়।

এরপরদিন সারাদিন ফরিনা কথা বলেননি। খাবারও খাননি। বাড়ির কোনো পুরুষই বাড়িতে ছিল না। রাতে পদ্মজা শুতে আসে। ফরিনা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে একবার শুধু হাসেন। পদ্মজা দুরুদুরু বুক নিয়ে চোখ বুজে। কিছু মুহূর্ত পার হতেই দ্বিতীবারের মতো আরেক মায়ের মৃত্যুর স্বাক্ষী হয়। ধাপড়ানোর শব্দ শুনে পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। ফরিনার শরীর কাঁপছে। মাথার কাছে হারিকেনের আলো নিভে যাওয়ার পথে। পদ্মজা,ফরিনা আর অদৃশ্য আজরাইল ছাড়া ঘরে কেউ নেই। পদ্মজার বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। সে ফরিনার এক হাত চেপে ধরে। কালিমা শাহাদাঁত পড়তে থাকে। পদ্মজার মুখে উচ্চারিত,"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" স্বরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তার কথা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কাছেই ফিরে যেতে হচ্ছে। পদ্মজার সাথে সাথে ফরিনাও উচ্চারণ করেন। তারপর পরই দেহ ছেড়ে পাড়ি জমান দূর-দূরান্তে! পদ্মজা আম্মা ডেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। ফরিনার প্রাণহীন দেহটার উপর আছড়ে পড়ে বললো, 'আপনিও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন আম্মা!'

আমির সবেমাত্র বাড়িতে প্রবেশ করেছে। পানি পান করছিল। পদ্মজার কান্না কানে ভেসে আসতেই সে গ্লাস রেখে উল্কার গতিতে ছুটে আসে। মজিদের ঘুম ভেঙে যায়। পদ্মজার কান্না শুনে তিনি অবাক হলেন। আমিরতো পদ্মজাকে মারবে না। তাহলে এ মেয়ে এভাবে কাঁদে কেন? তিনি চশমা পরে ঘর থেকে বের হোন। আমিনা নিজ ঘরে চুপ করে বসে আছে। ভূমিকম্প হয়ে গেলেও তিনি বের হবেন না। খলিল,রিদওয়ান বাইরে। লতিফা,রিনু হারিকেন জ্বালিয়ে দৌড়ে আসে। বিদ্যুত নেই বিকেল থেকে। আমির ঘরে প্রবেশ করে চমকে যায়। পদ্মজা হাউমাউ করে কাঁদছে। আমির ফরিনার পাশে এসে দাঁড়ায়। আলতো করে ছুঁয়ে ডাকলো, 'আম্মা?'

ফরিনার সাড়া নেই। আমিরের মস্তিষ্কে যখন বুঝতে পারে,তার মা বেঁচে নেই,সে স্তব্ধ হয়ে যায়। চারপাশ থমকে যায়। মজিদ ঘরে এসে প্রবেশ করতেই আমির তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার রক্তবর্ণ চোখ দুটি বেয়ে জল পড়ছে। সে রাগে কাঁপতে থাকে। মজিদকে এলোপাথাড়ি ঘুষি দিল। তারপর গলা চেপে ধরে বললো, 'কুত্তার বাচ্চা,আম্মার উপর হাত তুলতে না করছিলাম।'

পদ্মজার উপর নজর রাখা দুজন ব্যক্তি আমিরকে জাপটে ধরে। আমিরের মুখ থেকে নির্গত হতে থাকে বিশ্রী গালিগালাজ। মজিদের চোখ ফুলে গেছে। নাক দিয়ে রক্তের স্রোত নেমেছে। তিনি বিস্ফোরিত নয়নে চেয়ে আছেন। আমির কখনো তার সাথে এমন করেনি!

কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। সময় তার মতো করে সবাইকে নিয়ে ছুটে বেড়ায়। দেখতে দেখতে কেটে গেছে দুইদিন। মজিদ আলগ ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। দুপুর অবধি বাড়িভর্তি মানুষ ছিল। মোড়ল বাড়ির সবাই ছিল। কিছুক্ষণ হলো সবাই নিজেদের বাড়ি ফিরেছে। তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ। আমিরের শক্ত হাতের চাপ তার গায়েও পড়েছে, তা মানতে পারছেন না। বিপদের আশঙ্কায় মাথা দপদপ করছে।

বাড়িতে আসা অনেকে প্রশ্ন করেছে,মুখে কী হয়েছে? মজিদ তখন লজ্জা নিয়ে জবাব দিয়েছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল। এছাড়া যুক্তিগত আর কোনো অজুহাত তিনি খুঁজে পাননি। অনেকে মজিদকে সন্দিহান চোখে দেখেছে। মজিদ চেয়ার এক হাতে খামচে ধরেন। রাগে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সেখানে

খলিল উপস্থিত হয়। মজিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খ্যাঁক করে কাশেন। মজিদ তাকালেন না। খলিল বললেন, 'ভাই,সমাবেশের কী করন?'

'রবিবারের দাওয়াত দিবি। ফরিনার জন্য দোয়া চেয়ে নেব সবার কাছে। এখন ভালো সময়।'

'আইচ্ছা। ভাই?'

মজিদ তাকালেন। খলিল বললেন, 'ছেড়িগুলারে কবে পাডাইবা?'

'আরো তো ছয়টা মেয়ে বাকি। কবে পাঠাবে, আমির জানে। ওর সাথে কথা বল।'

'তোমার ছেড়ার লগে আমি কথা কইতে পারতাম না।'খলিল ঘোর আপত্তি জানালো।

মজিদ আড়চোখে খলিলকে দেখলেন। দৃষ্টিতে অনেক রাগ। কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করলেন, 'রিদওয়ান কোথায়?'

'বাজারে।'

'আচ্ছা, যা।'

খলিল জায়গা ত্যাগ করেন। মজিদ এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে ভাবেন,আমিরের মনে কী চলছে? কেন তার চোখের দৃষ্টি দুইরকম! এভাবে চলতে থাকলে, হাওলাদার বংশে দূর্যোগ নেমে আসবে।

বাইরে মোলায়েম ঠান্ডা বাতাস। পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ পরিবেশ। পদ্মজা শাল দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। সে ধীর পায়ে হেঁটে আসছে। পিছনে দুজন লোক। ফরিনার ঘরের সামনে এসে থমকে যায় পদ্মজা। পালঙ্কে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে আছে আমির। এক হাঁটুতে এক হাত রাখা। জানালা দিয়ে আসা বাতাসে তার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো নড়ছে। কারো উপস্থিতি টের পেয়ে আমির চোখ তুলে তাকাল। পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'অথচ আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। অন্যের মা তো! তাই না?'

আমির চোখ সরিয়ে নিলো। পদ্মজা বললো, 'যে মেয়েগুলোকে শিকার করেন, সে মেয়েগুলোর মায়েদের এরকমই কষ্ট হয়! আমি অবাক হচ্ছি, আপনি আম্মার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন দেখে!'

'কথা শোনাতে এসেছো?'

পদ্মজা হাসলো। বললো, 'যখন আম্মা দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিলো, তখন কোথায় ছিলেন? কেন তাকে শান্তির দেখা দেননি? ছেলে হিসেবে কী করেছেন? উল্টো কষ্ট দিয়েছেন।'

'আম্মা আমার সম্পর্কে কিছু জানতোই না। কষ্ট পাবে কেন?'

'তিনি কখন জেনেছেন সব?'

আমির নিরুত্তর। পদ্মজা উৎসুক হয়ে রইলো। আমির বেশ খানিকক্ষণ পর বললো,

'যেদিন বাড়িতে এসেছি। সেদিন রাতে।'

পদ্মজার কপালে ভাঁজ পড়ে। সে প্রশ্ন করলো, 'যেদিন আম্মা আমাদের ওই বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিল, সেদিন?'

'হুম।'আমির জবাব দিল ছোট করে।

'কীভাবে জেনেছে?'

আমির বিরক্তি নিয়ে পদ্মজার দিকে তাকালো। বললো, 'এত প্রশ্ন করো কেন?'

'আমি জানতে চাই।'

'জেনে কী হবে? আম্মা আমাকে থাপ্পড় তো কম দেয়নি! আমি চুপ করে সহ্য করেছি। আম্মাকে কিছু বলিনি। তাহলে আমি কী করে কষ্ট দিয়েছি?'

আমিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পদ্মজা প্রশ্ন করলো, 'আপনি এই পাপের সাথে জড়িত সেটা আম্মা এতদিনেও বুঝেনি কেন? কীভাবে লুকিয়ে রেখেছেন?'

আমির চট করে উঠে দাঁড়ায়। মনের সবটুকু রাগ পালঙ্কে লাথি মেরে মিটিয়ে নেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। পদ্মজারও রাগ হয় খুব। সে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর আলমারি খুলে ছুরি নিলো। আমির ঘর থেকে সব ছুরি সরিয়ে দিয়েছিল। মানুষের ভীড়ে পদ্মজা মজিদের ঘর থেকে দুটো ছুরি সংগ্রহ করেছে। সতর্কতার সাথে একটা ছুরি শরীরের ভাঁজে রেখে দিলো পদ্মজা। আলমারির কপাট লাগাতে গেলেই একটা চিঠি মেঝেতে পড়ে। পদ্মজা দ্রুত চিঠিটি তুললো। পূর্ণা সকালে দিয়েছে। আলমগীর পদ্মজার নামে মোড়ল বাড়িতে এই চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠির খামের উপর লেখা, "পদ্মজা ছাড়া অন্য কারো চিঠি পড়া নিষেধ।"

তাই পূর্ণা অথবা প্রেমা কেউ পড়েনি। পূর্ণার মনে হয়েছিল এটা গোপনীয় চিঠি। তাই সে লুকিয়ে পদ্মজাকে দিয়েছে। পদ্মজা এখনো পড়েনি। সে যত্ন করে রেখে দেয়। সময় বুঝে পড়বে।

আমির তৃতীয় তলার একটা ঘরে এসে বসলো। তার নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। এক হাত কাঁপছে। যখন সে নিজের সত্তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার পা অথবা হাত কাঁপে। আমির জানালার বাইরে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা দেয়ালে নিজের কপাল দিয়ে আঘাত করে। তিন বারের সময় কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে।

চোখ দুটি ছোট ছোট হয়ে যায়। তার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। শরীর অসাড় হয়ে পড়ে। তবুও জ্ঞান হারায়নি। দূর্বল হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে থাকে মেঝেতে।

মৃদুল মোড়ল বাড়ির পথে দাঁড়িয়ে আছে। তার আজ বাড়ি ফেরার কথা ছিল। অনেকদিন ধরে অলন্দপুরে সে মেহমান হয়ে আছে। ছোটবেলা একবার চার মাস হাওলাদার বাড়িতে ছিল। তারপর আর থাকা হয়নি। এইবার এক মাস হয়ে যাচ্ছে। এতদিন থাকতো না,যদি না পূর্ণার দেখা পেতো। জ্যোৎস্না রাত নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা ছিল। কিন্তু ফরিনার মৃত্যুর জন্য সে রাত উপভোগ করা হয়নি। সে আগামীকাল বাড়ি ফিরবে। তাই পূর্ণার সাথে দেখা করতে এসেছে।

নূপুরধ্বনি ভেসে আসে! মানে পূর্ণা আসছে! মৃদুল সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ণা দৃশ্যমান হয়। সে মৃদুলের সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদুল পূর্ণার দিকে এক কদম এগিয়ে এসে বললো, 'কেমন আছো?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালা। প্রান্তর কী খবর?'

'কুড়াল বানাচ্ছে।'

'ওর কামই এমন।'

পূর্ণা হাসলো। মৃদুল বললো, 'চলো নদীর দিকে হাঁটি।'

'চলুন।'

দুজন মাদিনী নদীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দুই দিকে গাছপালা। দুজনের মাঝে দুই হাত দূরত্ব। মৃদুল এক টুকরো পাথর নদীর পানিতে ছুঁড়ে দিল। পাথরটি পানিতে দুই,তিন বার ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে ডুবে যায়। পূর্ণা হাসলো। বললো, 'আমিও এরকম পারি।'

মৃদুল একটা পাথর পূর্ণার হাতে দিয়ে বললো, 'কইরা দেখাও।'

পূর্ণা করে দেখালো। তারপর বললো, 'চাপা মারি না আমি।'

মৃদুল শুধু হাসলো। কিছু বললো না। পূর্ণা অপেক্ষা করছে,মৃদুল কী বলবে শোনার জন্য। অনেকটা সময় কেটে যায়। মৃদুল পূর্ণার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। দুই পা এগিয়ে আসে। পূর্ণা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছে। মৃদুল পূর্ণার দুই হাত শক্ত করে ধরলো। পূর্ণা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। মৃদুল তার হাত ধরলে সে অন্য এক জগতে চলে যায়। যে জগতে কেউ নেই। শুধু ভালোবাসা,ভালোবাসা আর ভালোবাসা। মৃদুল বললো,"রাইতে বাড়িত যাইতাছি।'

বাড়িতে যাবে শুনে পূর্ণার চোখেমুখে আঁধার নেমে আসে। সে প্রশ্ন করলো, 'রাতে কেন?'

'রাতে হাওলাদার বাড়ির একটা ট্রলার ওদিকে যাইব। তাই রাইতেই যাব ভাবতাছি।'

পূর্ণা নতজানু হয়ে ব্যথিত স্বরে বললো, 'ওহ,আচ্ছা যান।'

মৃদুল বললো, 'মন খারাপ কইরো না। জলদি আইসা পড়ব।'

পূর্ণার কান্না পাচ্ছে। মৃদুল চলে যাবে শুনলেই,তার বুক ফেটে কান্না আসে। সে মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেন আপনি এতো দূরের মানুষ?'

তার ব্যাকুল কণ্ঠের অভিযোগটি মৃদুলের হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে। সে মৃদু হাসলো। পূর্ণার হাত দুটি শক্ত করে ধরে বললো, 'আম্মা-আব্বারে নিয়া আসব।'

পূর্ণা চকিতে তাকায়। ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তি আলাদা হয়ে যায়। মৃদুল পূর্ণাকে আরো অবাক করে দিতে বললো, 'তোমার আপাই বলেছে,আমার আম্মা-আব্বাকে নিয়া আসতে।'

পূর্ণার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে বসে পড়লো। দুই হাতে মুখ ঢেকে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'কী বলছেন এসব!'

মৃদুল পূর্ণার সামনে বসলো। পূর্ণাকে নিজেকে সামলে নিতে দিল। তারপর বললো, 'যা হওয়ার ছিল,তাই হইতাছে।'

পূর্ণা ঠোঁটে হাসি,চোখে জল নিয়ে মৃদুলের দিকে তাকালো। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃদুলকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু এটা অসম্ভব। সে চোখ বুজতেই দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। ভালোবাসার কথা বলা হয়নি,তবুও দুজন মনে মনে জানে তারা একজন, আরেকজনকে কতোটা ভালোবাসে। কতোটা চায়!

মৃদুল বললো, 'সন্ধ্যা হইয়া যাইতাছে। এখন বাড়িত যাও। আমি সন্ধ্যার পরে খাওয়াদাওয়া কইরা রওনা দেব।'

পূর্ণা কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। এটা সে কী শুনলো! সে ধীর কণ্ঠে বললো,"সাবধানে যাবেন,সাবধানে আসবেন।'

মৃদুল পূর্ণার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ালো। সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তের আলোয় পূর্ণাকে তার অপ্সরী মনে হচ্ছে। চোখের ঘন পাঁপড়িগুলো চোখের জলে ভিজে আরো ঘন,কালো হয়ে উঠেছে। পূর্ণা মৃদুলের তাকানো দেখে লজ্জা পেল। বললো, 'কালো মানুষকে এভাবে দেখার কী আছে?'

মৃদুল চমৎকার করে বললো, 'তুমি যদি আমার চোখ দিয়া নিজেরে দেখতা বুঝতে পারতা তুমি ঠিক কতোটা সুন্দর!'

কথাটি পূর্ণার হৃদয় নাড়িয়ে দেয়।

শুটিং চলছে আসহাব নামে একজন ব্যারিস্টারের বাড়ির পুকুরঘাটে। আসহাব চৌধুরী পরিচালক আনোয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আসহাব ঢাকায় থাকেন। কয়দিন হলো গ্রামে এসেছেন। বাড়িটা বানিয়েছেন বাংলো বাড়ির মতো। আসহাব ও আনোয়ার ছাদে বসে গল্প করছেন। শুটিং শেষ হয় সন্ধ্যার খানিক পর। লিখন ক্লান্ত। সে জ্যাকেট পরে বারান্দায় এসে বসে। চারিদিকে গাছপালা। সুন্দর দৃশ্য। তার সহযোগী চা দিয়ে যায়। সে চায়ে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে,পদ্মজার কথা। সোমবারে তাদের দল ঢাকা ফিরবে। তার আগে দেখা হতো যদি! তৃধা লিখনের পাশে এসে বসলো। লিখন তৃধাকে খেয়াল করে বললো, 'তৃধা!'

তৃধা তার মিষ্টি কণ্ঠে বললো, 'অন্য কাউকে আশা করেছিলে?'

লিখন হেসে চায়ে চুমুক দিল। বললো, 'আর কার আশা করব?'

'কেন? পদ্মজা।'

লিখন জোরে হেসে উঠলো। যেন তৃধা কোনো মজার কথা বলেছে। লিখন বললো, 'তুমি অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলো তৃধা। পদ্মজা এখানে আসবে কোন দুঃখে?'

'আসতেও পারে।'তৃধার কণ্ঠে হিংসা। সে পদ্মজা নামের না দেখা মেয়েটাকে খুব হিংসা কিরে। সব মেয়েরা তাকে হিংসা করে, আর সে করে বিবাহিত এক মেয়েকে! যে মেয়ে তার স্বপ্নের পুরুষের বুকের পুরোটা জুড়ে থাকে। যদি সে পারতো, লিখনের বুক ছিঁড়ে পদ্মজার নামটা মুছে দিত।

লিখন নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'ঘরে যাও তৃধা।'

'যাব না।'

'এভাবে চলতে থাকলে, আর কখনো তোমার সাথে কাজ করার সুযোগ হলেও করতে পারব না।'

তৃধার মুখটা লাল হয়ে যায়। রাগে,হিংসায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আমিতো বলেছি,আমি তোমার বাসার কাজের মেয়ে হতেও রাজি।'

লিখনের মুখ ফসকে চা বেরিয়ে আসে। সে হাসতে থাকে। তৃধা প্রায় সময় এমন অদ্ভুত, অদ্ভুত কথা বলে। যা একটা সদ্য কিশোরী মেয়েকেই মানায়। তখন পরিচালক আনোয়ার হোসেন সেখানে উপস্থিত হয়। লিখনকে ওভাবে হাসতে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'কী নিয়ে এতো হাসা হচ্ছে?'

তৃধা দ্রুত চোখের জল মুছলো। লিখন হাসি থামিয়ে বললো, 'তেমন কিছু না। বসুন।'

'না, বসব না। শুনো লিখন, হাওলাদার বাড়ির মাতব্বরকে তো চিনো?'

'জি। দুইদিন আগে বাড়ির কর্তী মারা যায়। দেখতে গিয়েছিলাম।'

'হুম, শুনেছি। মাতব্বর মজিদ হাওলাদার প্রতি বছর বাড়ির ছেলে-বউদের নিয়ে শীতে গরীবদের শীতবস্ত্র দান করেন। বড় সমাবেশ হয়। বড় উদার মনের মানুষ। সমাবেশ শেষে কয়েকজনকে নিয়ে ভোজন আসর জমান। মজিদ হাওলাদারের ভাই আসহাবের সাথে আমাকে দাওয়াত করে গেছেন। আমি আগামীকাল সেখানে থাকব। এদিকটা তোমাদের রেখে যাচ্ছি।'

লিখন আনোয়ারকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'চিন্তা করবেন না। এখানে সবাই বুঝদার। কেউ বিশৃঙ্খলা করবে না।'

'সে আমি জানি। দাওয়াত পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। মজিদ হাওলাদারের অনেক সুনাম শুনেছি। এবার স্বচক্ষে দেখতে পারবো। খুব ভালো লাগছে।'

'জি, তিনি খুব ভালো মনের মানুষ। আমি একবার ছিলাম উনার বাড়িতে। পরিবারের

সবাই খুব ভালো।'

আনোয়ার হোসেন হাওলাদার বাড়ি সম্পর্কিত আরো কিছু কথা বললেন। তারপর চলে যান। তৃধা লিখনকে প্রশ্ন করলো, 'তাহলে পদ্মজাও আসবে?'

'হু, আসবে বোধহয়।'

তৃধার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পদ্মজা নাম উঠলেই তার খারাপ লাগে। তবুও সে এই নাম তোলে। সে অভিমানী স্বরে বললো, 'তুমি যাবে?'

'ভাবছি যাব।'

'আমিও যাব। সেই ভাগ্যবতী মেয়েটাকে দেখতে চাই।'

লিখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললো, 'ভাগ্যবতী মেয়ে না একটা ভাগ্যবান পুরুষকে দেখাব।'

কথা শেষ করে লিখন সামনের দিকে পা বাড়ায়। তৃধা তখন বললো, 'সে নিশ্চয়, আমির হাওলাদার। আপনার শুধু এই একটা মানুষকেই কেন ভাগ্যবান মনে হয়?'শেষটুকু রাগে কিড়মিড় করে বললো, তৃধা।

লিখন এগিয়ে যেতে যেতেই বললো, 'তুমি এতসব কোথা থেকে যে জানো!'

অন্দরমহলে মজিদ ছাড়া কোনো পুরুষ নেই। তাদের মেয়ে পাচারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সবাই শিকারে অথবা কোনো প্রয়োজনীয় কাজে গেছে বোধহয়। মৃদুল নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। মগা কোথায় পদ্মজা জানে না। মদন মারা গেছে। এই খবর শুনে পদ্মজা অবাক হয়েছিল। মদনের মাথায় আঘাত ছিল,ব্যান্ডেজ ছিল। এই অবস্থায় সেদিন পাতালঘরে যাওয়ার সময় পদ্মজা মদনের মুখ না দেখে মদনকে মাথার একই জায়গায় আঘাত করেছিল। ফলে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মারা যায়। পদ্মজার দুঃখ হয় আলোর জন্য। আলোর মা নেই,এখন বাবাও নেই। পদ্মজা এই মুহূর্তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে। অন্দরমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। যারা পদ্মজাকে পাহারা দেয়। মজিদের উপর হামলা করার উপযুক্ত সময়! পাতালঘরের চাবিও নিতে হবে। পদ্মজা অনুসন্ধানী চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে মজিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমির দুই হাতে মাথা চেপে ধরে উঠে বসে। মাথাটা ভন ভন করছে,রক্ত শুকিয়ে গেছে। সে দেয়ালে হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে আসে। তাকে পাতালঘরে যেতে হবে। সে নিচ তলায় নামার জন্য সিঁড়িতে পা রাখে। মজিদের ঘরের পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই পদ্মজা সাবধান হয়ে যায়। সে ছুরি হাতে ওৎ পেতে থাকে। আমিনা কখনো উপরে যায় না। লতিফা,রিনুকে সে নিজে নিচ তলার এক ঘরে ঘুমাতে দেখেছে। যে ব্যাক্তি নেমে আসছে,তার পায়ের শব্দ ধীর গতির। ধীর গতিতে একমাত্র খলিল সিঁড়ি ভেঙে নামে। পদ্মজার অনেক দিনের ইচ্ছে,খলিলকে জখম করার। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পায়ের শব্দটি কাছে আসতেই পদ্মজা ছুরি দিয়ে আন্দাজে আঘাত করে। আমির'আহ'করে উঠলো। আক্রমণকারীরা কখনো আমিরের থাবা থেকে বের হতে পারে না। আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে আমির পদ্মজাকে না দেখেই,পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার পূর্বে আন্দাজে তার এক হাত দিয়ে পদ্মজার মুখ খামচে ধরে দেয়ালে বারি মারলো। তাৎক্ষণিক আমিরের নখ ডেবে যায় পদ্মজার দুই গালে! রাতের অন্ধকার একজন আরেকজনকে ভুলক্রমে আঘাত করার মাধ্যমে ইশারা দেয়,তারা দুজন দুই পথের পথিক!

পদ্মজার মৃদু আর্তনাদ শুনে আমিরের রক্ত ছলকে উঠে। সে দ্রুত তার শার্টের বুক পকেট থেকে লাইটার বের করে,আগুন জ্বালাল। হলুদ আলোয় পদ্মজার মুখখানা ভেসে উঠে। মাথা দুই হাতে ধরে রেখেছে। ভ্রুযুগল কুঁচকানো। আমির অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'পদ্মজা!'

সে পদ্মজাকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ায়। তখন পদ্মজা বললো, 'দূরে সরুন।'

পদ্মজার কণ্ঠে একটু তেজের আঁচ টের পাওয়া যায়। আমির কথা বাড়ালো না। সোজা লতিফার ঘরের দিকে গেল। লতিফা,রিনুকে ডেকে নিয়ে আসে। রিনুর হাতে হারিকেন। লতিফা,রিনু পদ্মজাকে উঠতে সাহায্য করে। পদ্মজার মাথা ফুলে গেছে। ভনভন করছে। পদ্মজা লতিফাকে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করে। শেষ ধাপে গিয়ে একবার পিছনে ফিরে তাকাল। হারিকেনের হলুদ আলোয় আমিরের জীর্ণশীর্ণ মুখটা দেখে পদ্মজার বুকটা হাহাকার করে উঠে। কোথায় ছুড়ির আঘাত পেয়েছে কে জানে! পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। আমির রিনুকে বললো, 'উপরে যা। লতিফা বুবুকে সাহায্য করিস।'

রিনু নতজানু হয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, 'তোমার ঘাড় দিয়া রক্ত আইতাছে ভাই।'

আমির হাসলো। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় পা ফসকে যায়। আমির কুঁজো হতেই পদ্মজার আক্রমণ! এক জায়গায় বার বার আঘাত পেতে হচ্ছে! আমির রিনুকে বললো, 'ঘাড়টা পঁচে যাওয়া বাকি! যা,উপরে যা।'

আমির অন্দরমহলের বাইরে পা রেখে ঠান্ডা বাতাসে কেঁপে উঠে। শীতের প্রকোপ তীব্র! মাথায়,ঘাড়ে তীব্র ব্যাথা। ঠান্ডা বাতাসে আরো ভয়াবহ যন্ত্রনা হচ্ছে! সবকিছু ছাপিয়ে হৃদয়ের ব্যথাটা দ্বিগুণ আকারে বেড়ে চলেছে। পদ্মজার ঘৃণাভরা দৃষ্টি আমির আর নিতে পারছে না। প্রথম দিকের মতো শান্ত থাকা যাচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে পঙ্গু হওয়ার পথে। শরীরের রক্ত আর হৃদয়ের যুদ্ধ আমিরের শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আমির নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে। দুই হাতে চুল ঠিক করে অন্দরমহলের পিছন দিকে হেঁটে আসে। তিন-চারটে কুকুর দেখতে পেল। ভাঙা প্রাচীর দিয়ে হয়তো প্রবেশ করেছে। আমির কুকুরগুলোর দিকে এক ধ্যাণে তাকিয়ে থাকে। কুকুরগুলোও তাদের হিংস্র চোখ দিয়ে আমিরকে দেখছে। আমির দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

রাতের নিস্তব্ধতায় সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ দুরন্ত বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেকদূর পর্যন্ত। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো সেই শব্দ শুনে চমকে উঠল।

নড়েচড়ে দূরে সরে গেল। আমির হেসে তাদের বললো, 'বুকের যন্ত্রনার এক অংশও দীর্ঘশ্বাসের সাথে বের হয়নি! আর এতেই ভয় পেয়ে গেলি তোরা?'

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। আমির এগিয়ে যেতেই কুকুরগুলো ছুটে পালায়। আমির অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। অকারণেই হাসলো। তারপর গভীর জঙ্গল পেরিয়ে পাতালঘরে প্রবেশ করে। রাফেদ আমিরকে দেখে আঁতকে উঠলো। বললো, 'স্যার,কীভাবে হলো এসব?'

আমির চেয়ার টেনে বসে বললো, 'দ্রুত পরিষ্কার করো।'

রাফেদ আমিরকে পরিষ্কার করে দিলো। আমির শার্ট পাল্টে পাঞ্জাবি পরলো। তার আর কোনো কাপড় এখানে নেই। সব অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিল। সাদা পাঞ্জাবি রয়ে গেছে। পাঞ্জাবিটা পরতে গিয়ে মনে পড়ে পদ্মজার কথা। পদ্মজার সাদা রঙ পছন্দ। প্রতি শুক্রবারে আমির সাদা পাঞ্জাবি পরে জুম্মায় যেতো। জুম্মায় যাওয়ার পূর্বে পদ্মজা খুব যত্ন করে পাঞ্জাবির তিনটে বোতাম লাগিয়ে দিতো। লাগানো শেষে বলতো, 'আমার সুদর্শন স্বামী।'

পদ্মজা যতবার এ কথা বলতো,ততবার আমির প্রাণখুলে হেসেছে। সে জানে না পদ্মজার চোখে সে কতোটা সুন্দর! কিন্তু পদ্মজার দৃষ্টি ছিল মুগ্ধকর! মুগ্ধ হয়ে সে আমিরকে দেখতো। আমির পাঞ্জাবির বোতামে চুমু দেয়। তখনই কানে বেজে উঠে, "ছুঁবেন না

আমায়!,দূরে সরুন!,আমি আপনাকে ঘৃণা করি!'

কথাগুলো তীরের মতো আঘাত হানে মস্তিষ্কে! আমির নিজের চুল খামচে ধরে। রাগে চিৎকার করতে করতে এওয়ানের পালঙ্কে লাথি দিতে থাকে। পালঙ্ক ভেঙে যায়। রাফেদ দৌড়ে আসে। কিন্তু আমিরকে ধরার সাহস হয় না। আমিরকে আর যে যাই ভাবুক! রাফেদ জানে,আমির পাগল। একটা সাইকো সে। যখন রেগে যায় সবকিছু তছনছ করে ফেলে। আমিরের এই রাগের স্বীকার যে মেয়ে হয়েছে,সে মেয়ে নিঃশ্বাসে,নিঃশ্বাসে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে।

রাফেদ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। সে মনে মনে,এই হিংস্র মানুষটার মৃত্যু কামনা করে। কত মেয়ে আমিরকে বাবা,ভাই ডেকেছে ছেড়ে দেয়ার জন্য। আমির ছাড়েনি। মুখের উপর লাথি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝেতে। রাফেদ বাধ্য হয়ে এই জগতে প্রবেশ করেছে। অর্থের অভাবে! ভাবেনি,এতোটা পাশবিক, নির্মম এরা! কিন্তু আর বের হওয়ার উপায় ছিল না। বের হতে চাইলেই,মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে এই নৃশংসতার সাথে তাল মিলিয়েছে। পরিবারের দুর্দশা তাকে জ্ঞানহীন করে দিয়েছিল। এক কথায় গ্রহণ করে নিয়েছিল এই পথ! যখন একেকটা মেয়ের কান্না সে শুনে, মনে হয় তার বোন কাঁদছে,আকুতি করছে! প্রথম প্রথম সেও কান্না করতো। এখন মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মনের কোণে মুক্তির আশা এখনো আছে। তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও ধারালো কাছের মানুষের দেয়া আঘাত! যেদিন রাফেদ বুঝতে পেরেছে আমিরের দূর্বলতা পদ্মজা,সেদিন থেকে সে দোয়া করছে, আমির যেন এই দূর্বলতার ভার সহ্য করতে না পেরে দূর্বল হয়ে পড়ে। হাঁটুগেড়ে পড়ে যায় মাটিতে। নিঃস্ব হয়ে যেন দিকদিশা হারিয়ে ফেলে। আমিরের ছটফটানি, অস্থিরতা রাফেদের মনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। আমির শান্ত হয়! রাফেদকে বললো, 'পানি আনো।'

রাফেদ পানি নিয়ে আসে। আমির পানি পান করে ধ রক্তে এসে প্রবেশ করে। বিথ্রিতে আমির পা রাখতেই মেয়েগুলোর চোখেমুখে স্পষ্ট ভয় জমে। রাফেদ চেয়ার নিয়ে আসে। আমির চেয়ারে বসলো না। মেয়েগুলোকে দেখে বেরিয়ে আসলো। বিওয়ানে গেল। সেখানে একটা মেয়েও নেই! শুকনো রক্ত পড়ে আছে। সবকয়টি মেয়ে কুরবান হয়ে গেছে। নদীর স্রোতে ভেসে গেছে। এই ঘরের দেয়ালে দেয়ালে শত শত মেয়ের আর্তনাদ বাজে। আমির পুরো ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলো। বিশ বছর আগে সে এই পাতালঘরে প্রথমবার এসেছিল। তখন তার বয়স পনেরো। তার বয়সী একটা মেয়েকে সে প্রথম আঘাত করেছিল এই ঘরেই! মেয়েটা আমিরের পায়ে ধরে মুক্তি ভিক্ষা চায়। আমির মুখের উপর লাথি মারে। সঙ্গে,সঙ্গে মেয়েটার নাক,মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মনে পড়তেই আমিরের শরীরটা কেমন করে উঠে। তার ভেতরে অদৃশ্য কী যেন প্রবেশ করছে! ভেতরটা খুঁড়ে, খুঁড়ে খেয়ে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। এক কোণে সুন্দর নকশায় তৈরি করা,সিংহাসনের মতো চেয়ার রয়েছে। আমির সেখানে বসলো। এই চেয়ারে বসে কত নগ্ন মেয়ের, তীব্র যন্ত্রনার আর্তনাদ সে উপভোগ করেছে! আমির এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে। চোখের পর্দায় পদ্মজার রাজত্ব! তাদের ঢাকার বাড়িতে কোনো এক বর্ষায়,পদ্মজা তার শাড়ি দুই হাতে গোড়ালির উপর তুলে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পিছনে ধাওয়া করেছে,আমির। পদ্মজার কলকল হাসিতে যেন পুরো বাড়ি নৃত্য করছিল। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি! কী অপূর্ব সেই মুহূর্ত। আমির চোখ খুলে ছাদের দিকে তাকায়। তারপর রাফেদকে ডাকলো, 'রাফেদ?'

রাফেদ দৌড়ে আসে। আমির রাফেদকে মিনিট তিনেক সময় নিয়ে দেখলো। তার চোখের দৃষ্টি শীতল। রাফেদের বুক দুরুদুরু করছে। আমির বললো, 'কেমন আছো?'

রাফেদ চমকে যায়। সে হতভম্ব। বেশ খানিক সময় নিয়ে উত্তর দিল, 'ভালো স্যার।'

'তোমার বোনের ছেলে হয়েছিল নাকি মেয়ে?'

রাফেদের মনে হচ্ছে,তার কলিজা এখুনি ফেটে যাবে। তার চোখ দুটি মারবেলের মতো গোল,গোল হয়ে যায়। সে কণ্ঠে বিস্ময়তা নিয়ে বললো, 'ছেলে-মেয়ে দুটোই।'

'জমজ?'

'জি, স্যার।'

'তুমি মুক্তি চাও?'

রাফেদ বিস্ময়ের চরম পর্যায়ে। আমির বললো, 'যদি চাও,তাহলে আজ থেকে তুমি মুক্ত।'

রাফেদের মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ে। সে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লো। অস্থির হয়ে পড়ে। তার অনুভূতি এলোমেলো হয়ে যায়। সে আমিরের দুই পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল। বললো, 'স্যার,স্যার আমি মারা যাচ্ছি।'

আমির আদেশের স্বরে বললো, 'পা ছাড়ো রাফেদ। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে জায়গা না ছাড়লে,আর যেতে পারবে না।'

রাফেদ ঝরঝর করে কাঁদতে থাকল। যেন পাহাড় ভেঙে ঝর্ণার পানি ঝরছে। আমির বললো, 'উঠো তারপর দৌড়াও।'

রাফেদ দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। সে তার ব্যাগ গুছিয়ে দ্রুত এই অন্ধকার ছেড়ে হারিয়ে যায়, আলোর সন্ধানে। আমিরের বুকটা খাঁখাঁ করছে। রাফেদের চোখেমুখে মুক্তির যেই আনন্দ সে দেখেছে,সেই আনন্দের তৃষ্ণায় তার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে। কবে এই তৃষ্ণা মিটবে? কবে?

আমিরের বুকে জ্বালাপোড়া শুরু হয়,মনে হচ্ছে কোনো ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে। যে ঘূর্ণিঝড় চোখের পলকে সব লণ্ডভণ্ড করে,স্তব্ধ করে দিবে।

লতিফা, রিনু চলে যেতেই পদ্মজা বিছানা ছেড়ে টেবিলে বসলো। হাতে তুলে নিলো কলম-

প্রিয়তম,

আমার প্রতিটি রজনী যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমি আপনাকে ভুলে যেতে চাই। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না! বিছানার চাদরে আপনার শরীরের ঘ্রাণ। শরীরের প্রতিটি লোমকূপ বার বার জানান দেয়,তারা আপনাকে ভালোবাসে। আমার অস্তিত্বের পুরোটা জুড়ে আপনার বিচরণ। বুকের ভেতরটা দগ্ধ হয়ে খানখান। আপনার উন্মুক্ত বুকের সাথে চেপে ধরে বলেছিলেন, আপনার তেঁতো জীবনের মিষ্টি আমি। আপনার মুখে ছিল

হাজার,হাজার শুকরিয়া।অথচ,এই সময়ে এসে আপনি আপনার তেঁতো জীবনটা বেছে নিয়েছেন। ছুঁড়ে ফেলেছেন আমাকে! এ কোন গভীর সমুদ্রের অতলে আমাকে ছুঁড়ে দিলেন? আপনার পাপের শাস্তি কেন আমি পাচ্ছি? আবেগ-বিবেকের যুদ্ধে আমি বার বার আহত হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি। নিজের সবটুকু আপনার নামে দলিল করে দিয়ে,আমি ভুল করেছি। এখনো আপনার শরীরের একেকটা আঘাত আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। কিন্তু আমি আপনাকে আঘাত করতে চাই। আমার ভেতরের জ্বলন্ত আগুন নেভাতে, আপনার এবং আপনার দলের প্রতিটি নরপশুর রক্তের ভীষণ প্রয়োজন!

এতটুকু লিখে পদ্মজা থামলো। তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। আর লেখার শক্তি পাচ্ছে না। ডায়রির পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে, দিয়াশলাইয়ের আগুনে জ্বালিয়ে দিলো। আলমারি খুলে আমিরের দেয়া তলোয়ারটি হাতে নিল। তলোয়ারের দিকে দৃষ্টি রেখে বললো, 'আপনার বুকের হৃদয়ে আমি আজীবন রানি হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। সেই বুকে আমি কী করে আঘাত করব?'

শেষ কথাটি বলার সময় পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে নোনাজল নামে। সে তলোয়ার মেঝেতে রেখে,বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকলো। আমির যে পাশে সবসময় শুতো,সে জায়গাটা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! কোথায় মানুষটার উষ্ণ বুক? যে

বুকে মুখ গুঁজে পদ্মজা তার সব কষ্ট ভুলে যেত।

পর্ব ৭৬

রবিবার। তীব্র শীতের সকাল। সময় তখন আটটা। বাড়িজুড়ে সবার ছোটাছুটি। পদ্মজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করছে। সে পাতালঘরের চাবি খুঁজছে। হাতে সময় নেই। আজ রাতের মধ্যে জীবন বাজি রেখে হলেও কিছু করতে হবে। আলগ ঘরের সামনে খলিল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথায় উলের টুপি। লম্বা গোঁফ। মগাকে ধমকে কাজ বুঝাচ্ছেন। চারিদিকে উৎসব উৎসব আমেজ! দুপুরের নামাযের পর স্কুলের মাঠে সমাবেশ। আলগ ঘরে এবং বাইরে শত-শত কম্বল আর শীতবস্ত্র। হাওলাদাররা হারাম টাকায় লোক দেখানো নাটক করতে চলেছে! পদ্মজা মনে মনে ব্যঙ্গ করে হাসলো। রিদওয়ান অন্দরমহল থেকে বের হয়ে খলিলের পাশে এসে দাঁড়াল। তার পরনে কালো রঙের পাঞ্জাবি। গায়ের রঙ ফর্সা। তাই কালো রঙের পাঞ্জাবিতে সুদর্শন দেখাচ্ছে। পদ্মজা লতিফার কাছে শুনেছে,কয়দিনের মধ্যে নাকি রিদওয়ানের বিয়ে! কার সাথে বিয়ে কেউ জানে না। তবে এটা নিশ্চিত, কোনো অভাগীর জীবন দুর্বিষহ হতে চলেছে! রিদওয়ান, খলিল কী বিষয়ে কথা বলছে তা পদ্মজার কানে আসার কথা নয়। তবুও সে সেদিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হয় আমির। আমির এদিক-ওদিক দেখে খলিলকে বললো, 'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে আগামীকাল ভোর হয়ে যাবে। আবারো বলে যাচ্ছি, পদ্মজার গায়ে হাত তো দূরে থাক,কারো চোখও যেন না পড়ে।'

রিদওয়ান নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'তোর দুই চামচারে বলে যা,পদ্মজার উপর ভালো করে খেয়াল রাখতে। পাতালে তো কোনো মেয়ে নাই। তাই চিন্তাও নাই। তবে,কাউকে যেন কিছু না বলে। আর আমাদের উপর তেড়ে না আসে।'

'তেড়ে আসলেও কিছু বলবি না। সুন্দর করে সামলাবি।'

রিদওয়ান তীব্র বিরক্তি নিয়ে বললো, 'ধুর! এই মাইয়ারে কতদিন এভাবে রাখবি? হুদাই ভেজাল।'

আমির রেগে রিদওয়ানের দিকে এক পা বাড়ালো। খলিল পরিস্থিতি পাল্টাতে দ্রুত রিদওয়ানের বুকে ধাক্কা দিয়ে বললো, 'যা কইতাছে হুন। বাবু তুই যা,তোর বউরে কেউ কিচ্ছু করব না।'

আমির রিদওয়ানের চোখের দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে রিদওয়ানকে সাবধান করে দিল। তারপর জায়গা ছাড়ল। অন্দরমহলে ঢোকার পূর্বে চোখ পড়ে দ্বিতীয় তলার বারান্দায়। পাংশুটে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভেতরের অনুভূতিগুলো পাল্টে যায়। সে দৃষ্টি সরিয়ে দ্রুত অন্দরমহলে প্রবেশ করলো। পদ্মজা ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। আমির ঘরে এসে শার্ট,জ্যাকেট খুলে গোসলখানায় ঢুকে। তাকে ঢাকা যেতে হবে। হাতে সময় আছে, তবুও সে আজই মেয়েগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে। সে নিশ্চিত, পদ্মজা চেষ্টা করবে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে। আবার মুখোমুখি হতে হবে দুজনকে। একত্রিশটা মেয়ে যোগাড় হয়ে গেছে যখন আর রাখার মানে নেই। সে ঝুঁকি নিতে চায় না। পদ্মজা কী মনে করে দ্রুতপায়ে ঘরে আসলো। বিছানায় আমিরের শার্ট দেখে বুঝতে পারে আমির গোসলখানায় আছে। তাৎক্ষণিক পদ্মজা ভাবলো,আমিরের শার্টের পকেটে তল্লাশি চালাবে। যদি চাবি পাওয়া যায়! যেমন ভাবা তেমন কাজ।

চাবির কথা মনে পড়তেই আমির গোসলখানার দরজা খুললো। পদ্মজা শার্টের পকেটে একটা চাবি খুঁজে পায়। তার মুখে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। পুরোটা দৃশ্য আমিরের চোখে পড়ে। সে দরজা বন্ধ করে দেয়। পদ্মজার হাত থেকে চাবি ছিনিয়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। এই চাবি আর পদ্মজার কাজে লাগবে না! সে পাতালঘরে গিয়ে কিছু খুঁজে পাবে না। আমির নিশ্চিন্তে গোসল শেষ করলো। পদ্মজা চাবি নিয়ে রান্নাঘরে চলে আসে। সেখানে লতিফা, রিনু,আমিনা সহ আরো তিন-চারজন রান্না করছে। সমাবেশ শেষে আলগ ঘরে ভোজ আয়োজন হবে,তারই প্রস্তুতি চলছে। খলিল হাওলাদারের দুই মেয়ে শাহানা,শিরিনও আজ

আসবে। পদ্মজা কাজ করার বাহানায় লতিফার কাছে গিয়ে বসলো। লতিফা পদ্মজাকে দেখে হাসলো তারপর কাজে মন দিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পদ্মজা সুযোগ বুঝে লতিফাকে ফিসফিসিয়ে বললো, 'উনি বেরিয়ে গেলে আমাকে বের হতে সাহায্য করো বুবু।'

লতিফা চোখ বড় বড় করে তাকায়। চাপাস্বরে প্রশ্ন করে, 'কই যাইবা?'

পদ্মজা পিছনে ফিরে তাকায়। আমিনা থালাবাসন পরিষ্কার করছেন। পদ্মজা আমিনার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর লতিফাকে বললো, 'পাতালে যাবো।'

লতিফার হাত থেকে চামচ পড়ে যায়। ঝনঝন শব্দ হয়। শব্দ শুনে উপস্থিত সবাই উৎসুক হয়ে তাকায়। লতিফা দ্রুত চামচ তুলে নিলো। সবার দিকে চেয়ে হাসি বিনিময় করে পদ্মজাকে চাপাস্বরে বললো, 'চাবি কই পাইবা?'

পদ্মজা বললো, 'পেয়ে গেছি। তুমি শুধু সুযোগ করে দাও।'

লতিফার চোখেমুখে ভয় বাসা বাঁধে,যা স্পষ্ট। সে ভয় পাচ্ছে,আমির জেনে গেলে তার জীবন শেষ! পদ্মজা সবাইকে আরো একবার এক নজর দেখে নিয়ে লতিফাকে বললো, 'ভালো কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সম্মানের বুবু।'

লতিফা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো। সে রাজি। পদ্মজা তার ঘরে ফিরে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় আমির নিচে নামছিল। দুজন কেউ কারোর দিকে তাকায়নি। যেন কেউ কাউকে চিনে না। পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর হাতে তুলে নিল ছুরি।

লতিফা আলগ ঘরে গিয়ে খোঁজ নেয়। আমির,মজিদ,রিদওয়ান কেউ বাড়িতে নেই। খলিল আলগ ঘরের বারান্দায় তিন জন লোকের সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছে। লতিফা দ্রুত এসে পদ্মজাকে পরিস্থিতি জানায়। পরিস্থিতি গুছানো। এবার পদ্মজার পিছনে আঠার মতো লেগে থাকা দুজন লোককে সরানোর পালা। পদ্মজা আবার রান্নাঘরে আসে। দুজন লোক সদর ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের উপস্থিতি দেখে কেউ ভাববে না, এরা কাউকে নজরে রাখার জন্য পিছু,পিছু ঘুরে! পদ্মজা লতিফাকে ইশারা করতেই,লতিফা দুজন লোককে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আপনেরা খাইবেন না?'

তারা সত্যি অনেক ক্ষুধার্ত। আবার রান্নাঘর থেকে মাংসের ঘ্রাণ আসছে। সেই ঘ্রাণে ক্ষিধে যেন বেড়ে যাচ্ছে। দুজন সম্মতি জানায়,তারা খাবে। লতিফা চোখের ইশারায় পদ্মজাকে বেরিয়ে যেতে বলে। তারপর দুজন লোককে খেতে দিল। দুজন ক্ষুধার্ত পাহারাদার কব্জি ডুবিয়ে খেতে থাকে। পদ্মজা তাদের অগোচরে বেরিয়ে পড়ে। বাইরের চারপাশ দেখে দ্রুত জঙ্গলে ছুটে আসে। জঙ্গলের পথ তার চেনা। তাই পাতালঘরের কাছে আসতে বেশি সময় লাগেনি। আল্লাহর নাম নিয়ে সে পাতালে প্রবেশ করে। তার হাতের চাবি প্রবেশদ্বার খুলতে সক্ষম হয়।

পদ্মজা এক হাতে শক্ত করে ধরে ছুরি। ধ-রক্ত ও স্বাগতম দরজার মাঝ বরাবর এসে সে থমকে যায়। কেউ নেই! সবকিছু চুপচাপ,নির্জন। সে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশের দেয়ালে চাবুক ছিল। তাও নেই! পদ্মজা থম মেরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েগুলো আছে তো? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই, পদ্মজার বুকে ধড়াস করে কিছু যেন পড়ে। সে দৌড়ে ধ-রক্তে প্রবেশ করলো। উন্মাদের মতো প্রতিটি ঘর দেখলো। কেউ নেই! তার শরীর বেয়ে ঘাম ছুটে। ধ-রক্তের কোথাও কোনো চাবুক,ছুরি,রাম দা,কুড়াল কিছু নেই! এখানে যে অনাচার-ব্যভিচার হতো তার কোনো প্রমাণই নেই। পদ্মজা স্বাগতম দরজা পেরিয়ে সবকটি ঘরে তন্নতন্ন করে অসহায় মেয়েগুলোকে খুঁজে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। যখন নিশ্চিত হলো,এখানে কেউ নেই,তার হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। আমির তার চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিটি মেয়েকে সরিয়ে দিয়েছে। পদ্মজার তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে। সে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে পারেনি। আফসোস আর আত্মগ্লানি তাকে চেপে ধরে। মেয়েগুলোর ছটফটানি,বাঁচার অনুরোধ কানে বাজতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে পদ্মজা। তার মনে হচ্ছে,তার মাথায় অনেক ভারি একটা বোঝা। নিজের প্রতি খুব রাগ হয়। সে কাঁদতে

থাকলো। শাড়ি খামচে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি পারিনি! আমি এই ব্যর্থতা কোথায় লুকাবো আল্লাহ!'

পদ্মজার কান্না দেয়ালে দেয়ালে বারি খেয়ে পুরো পাতালপুরীতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

সমাবেশে বাড়ির মেয়ে-বউদের যাওয়া আবশ্যক। এটা হাওলাদার বংশের আরেক রীতি। পরিবারের সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবে। শাহানা,শিরিন তৈরি। তারা নিচ তলায় অপেক্ষা করছে। পদ্মজা তার ঘরে স্তব্ধ হয়ে পালঙ্কে বসে আছে। লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। বললো, 'ও পদ্ম,বোরকা পিন্দো নাই ক্যান? জলদি করো।'

পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো। তার চোখের চারপাশ লাল। চোখে ফোলা ফোলা ভাব। সে আত্মগ্লানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে, সে চাইলে পারতো মেয়েগুলোকে বাঁচাতে। সুযোগ ছিল। সত্যিকার অর্থে, তার সুযোগ ছিল না। পেছনের প্রতিটি নিঃশ্বাস সাক্ষী,সে প্রতি মুহূর্তে মেয়েগুলোর কথা ভেবেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। হন্ন হয়ে চাবি খুঁজেছে। ভেবেছিল,আরো দুই-তিন হাতে আছে। আমির এতো দ্রুত একত্রিশটা মেয়ে অপহরণ করে ঢাকা নিয়ে চলে যাবে সে ভাবেনি! ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। ভাবলেও কাজ হতো না! কিন্তু এসব কিছুই পদ্মজার মাথায় আসছে না। সে সমানতালে নিজেকে দোষী ভেবে যাচ্ছে। মানসিক যন্ত্রনায় হারিয়ে যাচ্ছে অন্য জগতে। রিদওয়ান ঘরে এসে উঁচু গলায় বললো, 'কি হলো? পদ্মজা এখনো তৈরি হয়নি কেন? আমাদের তো বের হতে হবে।'

পদ্মজার আচমকা মনে হলো,আমির মেয়েগুলোকে আজ রাতটা গোডাউনে অথবা অফিসে রাখতে পারে। আর নয়তো বাসায়। এর মধ্যে যদি কিছু করা যায়! কিন্তু কার সাহায্য নিবে সে? এখানে ঢাকার কে আছে? সেকেন্ড তিনেক ভাবার পর তার মাথায় লিখনের নাম আসে। লিখন চাইলে আমিরকে থামাতে পারবে। অবশ্যই পারবে! এতে আমিরের সম্পর্কে সব জেনে যাবে লিখন। বলি হবে আমির! এটা ভাবতে পদ্মজার কষ্ট হয়। সে ঢোক গিলে নিজের আবেগ,অনুভূতি সামলায়। সে আমিরকে মনে মনে বলি দিল। এখন লিখনই একমাত্র আশা। শুনেছে,শুটিং এখনো চলছে। পদ্মজা সিদ্ধান্ত নেয়,সে যেভাবেই হউক লিখনের সাথে আজ যোগাযোগ করবে। রিদওনের দিকে আগুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পদ্মজা বললো, 'আসছি।'

রিদওয়ান তাড়া দিয়ে বললো, 'জলদি।'

তারপর বেরিয়ে গেল। রিদওয়ান বের হতেই পদ্মজা বিড়বিড় করলো, 'বেজন্মা!'

তারপর দ্রুত বোরকা, নিকাব পরে নিল।

মৃদুল তার মা-বাবাকে নিয়ে হাওলাদার বাড়িতে পা রাখে। তার বুকের গোপন কুঠুরিতে থাকা হৃদয়টা খুশিতে নৃত্য করছে। যখন সে তার মা বাবাকে বললো,সে বিয়ে করতে চায়। আর মেয়েও পছন্দ করেছে। তখনি তার মা-বাবা দুজনই খুশিতে আটখানা হয়ে যায়। মিয়া বাড়ির সবাই খুশিতে ভোজ আয়োজন করে। তাদের আদরের দুলাল মৃদুল। মৃদুল এতদিন অলন্দপুরে ছিল বলে,তার মা জুলেখা বানু অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছয় বিঘা ভূমির উপর কাঠের বাড়ি আর নব্বই বিঘা জমির একমাত্র উত্তরাধিকারী মৃদুল! তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির প্রতিটি মানুষ মৃতের মতো হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়,মৃদুলের বিয়ের সিদ্ধান্ত তাদের মাঝে ঈদের আনন্দ নিয়ে এসেছে। তাই এতো দ্রুত তাদের আগমন। মৃদুলের বাবা গফুর মিয়ার মাথায় টুপি,গায়ে দামী পাঞ্জাবি। শরীর থেকে আতরের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। জুলেখা নিকাব তুলে মৃদুলকে বললেন, ‘বাড়িত কী কেউ নাই?’

মৃদুল জুলেখাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, 'অন্দরমহলে গেলেই মানুষ পাইবেন। একটু ধৈর্য্য ধরেন আম্মা।'

জুলেখা বানু কপাল কুঁচকালেন। তিনি স্বাস্থ্যবান একজন মহিলা। বাচাল প্রকৃতির

মানুষ। রূপ এবং সম্পদ নিয়ে অহংকারের শেষ নেই। তিনি সরু চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে অন্দরমহলে আসেন। অন্দরমহলের সামনে রিনু ছিল। রিনু মৃদুলকে দেখে দাঁত বের করে হাসলো। এগিয়ে এসে বললো, 'মৃদুল ভাইজান আইয়া পড়ছেন?'

'হ আইছি, দেখা যাইতাছে না?'

রিনু বোকার মতো হাসে। জুলেখা বানু আর গফুর মিয়ার পা ছুঁয়ে সালাম করে। মৃদুল বললো, 'ফুফিআম্মা ঘরে আছে?'

'না ভাইজান। বাড়ির সবাই স্কুলঘরে গেছে।'

মৃদুলের পূর্বে জুলেখা প্রশ্ন করলেন, 'কেরে? ওইহানে কী দরহার(দরকার)?'

রিনু বিস্তারিত বললো। গফুর মিয়া সন্তুষ্টির সাথে বললেন, 'মনডা জুরায়া গেলো। হাওলাদার বাড়ির আত্মীয় যে হইবো হেরই সাত জন্মের কপাল।'

গফুরের প্রশংসা জুলেখা বানুর ভালো লাগেনি। অন্যের প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারেন না। হাতের ব্যাগটা রিনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, 'এই ছেড়ি,ধরো ব্যাগডা।'

রিনু হাত বাড়িয়ে ব্যাগ নিল। জুলেখা বানু বললেন, 'আমরা কোন ঘরে থাকমু? লইয়া যাও।'

'আপনেরা আলগ ঘরে থাকবেন।'বললো রিনু।

জুলেখা পিছনে ফিরে আলগ ঘরের দিকে ইশারা করে বললেন, 'এই টিনের ঘরডাত?'

জুলেখার প্রশ্নে অবজ্ঞা। তিনি টিনের ঘরে থাকতে আগ্রহী নয় বুঝাই যাচ্ছে। রিনু কিছু বললো না। মৃদুল জুলেখাকে আদুরে স্বরে বললো, 'আম্মা, কম কথা কন। আমরা মেহমান।'

রিনু জুলেখার কথাবার্তায় বুঝে গেছে,এই মহিলা কোন প্রকৃতির। সে মনে মনে ভাবে,পূর্ণার কপালে ঝাটা আছে! জুলেখা আলগ ঘরে থাকবে না,এটা নিশ্চিত। রিনু জুলেখাকে অন্দরমহলে নিয়ে আসে। রানি-লাবণ্যর খালি ঘরটা দেখিয়ে বললো, 'এই ঘরে থাকবেন।'

জুলেখা ব্যাগপত্র রেখে বিছানায় টান,টান হয়ে শুয়ে পড়ে। হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছে। একবার ভাবলেন,রিনুকে বলবেন পা টিপে দিতে। কী মনে করে যেন বললেন না। মৃদুল গফুর মিয়াকে বললো, 'আব্বা,আমি গোসল কইরা,খাওয়াদাওয়া কইরা স্কুলঘরে যাইতাছি। আপনি যাইবেন?'

'হ যামু। মহৎ কাজ নিজের চোক্ষে দেখাও ভাগ্যরে বাপ।'

মৃদুল জুলেখার উদ্দেশ্যে বললো, 'আম্মা,আপনি যাইবেন?'

জুলেখা ক্লান্ত। তিনি মিনমিনিয়ে বললেন, 'না আব্বা,আমি যামু না।'

মৃদুল ব্যাগ থেকে লুঙ্গি,গামছা বের করলো। জুলেখা উঠে বসেন। রিনুকে ডেকে বললেন, 'এই ছেড়ি,কলডা কোনদিকে? আমারে দেহায়া দেও।'

জুলেখা আদেশ করলো নাকি হুমকি দিলো রিনু বুঝতে পারছে না। সে চুপচাপ জুলেখাকে নিয়ে কলপাড়ে গেল। লতিফা থাকলে ভালো হতো। নতুন কোনো মেহমান এসে তেড়িবেড়ি করলে লতিফা শায়েস্তা করতে পারে!

মাথার উপর সূর্য। মাঠভর্তি মানুষ। একপাশে মহিলা ও বাচ্চারা,অন্যপাশে পুরুষরা। শৃঙ্খলা বজায় রাখছে রিদওয়ান। উপর থেকে দেখলে,রিদওয়ান একজন মহৎ, ভদ্র,শান্ত ব্যাক্তি। যাকে সবমসময় দেখা যায় না। সবাই জানে,রিদওয়ান জ্ঞানী মানুষ। সারাক্ষণ বইপত্র নিয়ে থাকে। তাই তার দেখা পাওয়া যায় না। ভেতরে খবর যদি নিষ্পাপ মনের মানুষগুলো জানতো! হায় আফসোস! উপস্থিত প্রতিটি মানুষ খুব খুশি। এত এত মানুষকে শীতবস্ত্র দেয়া কম কথা নয়! সে কাজটা যখন হাওলাদার বাড়ির মানুষেরা করে,সবার কাছে তখন তারা ফেরেশতা হয়ে উঠে। ফেরেশতার সাথে তুলনা করা হয়। মজিদ হাওলাদার ও খলিল হাওলাদার শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন। পদ্মজা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার সাথে আঠার মতো লেগে আছে দুটি লোক। দুজন দুই দিকে দাঁড়ানো। তাদের চোখ সর্বক্ষণ

পদ্মজার উপর। পদ্মজার চোখ দুটি লিখনকে খুঁজছে। লিখন এখানে আসবে নাকি সে জানে না। তবে প্রার্থনা করছে,সে যেন আসে। আজ তার উপস্থিতি অনেকগুলো মেয়েকে বাঁচাতে পারে। লিখন নিঃসন্দেহে একজন ভালো মানুষ। সবকিছু শোনার পর সে কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই নিবে।

লিখন ভীড় ঠেলে প্রান্তর পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রান্ত লিখনকে দেখে অবাক হলো। তারপর হেসে করমর্দন করলো। বললো, 'কেমন আছেন ভাইয়া?'

'ভালো, তুমি কেমন আছো?'

'ভালো ভাইয়া।'

'পূর্ণা, প্রেমা আসেনি?'

'আসছে। ওদিকে আছে।'প্রান্ত স্কুলের ডানদিকে ইশারা করে বললো।

তৃধা লিখনকে প্রশ্ন করলো, 'কে ও?'

লিখন চাপাস্বরে বললো, 'পদ্মজার ভাই।'

তৃধা তাৎক্ষণিক প্রান্তকে প্রশ্ন করলো, 'তোমার পদ্মজা আপা কোথায়?'

প্রান্ত সোজা আঙুল তাক করে বললো, 'ওইযে।'

তৃধা চোখ ছোট,ছোট করে সেদিকে তাকায়। প্রান্তকে আবার প্রশ্ন করে, 'সবার তো মুখ ঢাকা। পদ্মজা কে?'

প্রান্তের আগে লিখন বললো, 'লম্বা মেয়েটা।'

তৃধা আড়চোখে লিখনের দিকে তাকালো। বললো, 'মুখ না দেখে চিনলে কী করে?'

'জানি না, মনে হলো। প্রান্ত ঠিক বলেছি?'

প্রান্ত হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল। তৃধার খুব মন খারাপ হয়। প্রান্ত বললো, 'ভাইয়া,আপা আপনাকে খুঁজছিল।'

'কোন আপা?'

'পদ্মজা আপা।'

মুহূর্তে লিখনের কী হয়ে যায়,সে নিজেও জানে না। তার বুকে অপ্রতিরোধ্য তুফান শুরু হয়! পদ্মজা তাকে খুঁজছে! এ যে অসম্ভব! লিখন চকিতে পদ্মজার দিকে তাকালো। পদ্মজার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাত-পা ঢাকা। তবুও মনে হচ্ছে,সে পদ্মজাকে দেখতে পাচ্ছে। ছয় বছর পূর্বে পদ্মজাকে যে রূপে প্রথম দেখেছিল। সে দৃশ্য ভেসে উঠে। তাদের প্রথম কথা! টমেটো আছে নাকি জিজ্ঞাসা করা! কত সুন্দর সেই মুহূর্ত।

লিখন পদ্মজার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। লিখনের চোখেমুখে আনন্দ স্পষ্ট! পদ্মজা খুঁজছে শুনে এতোই আনন্দিত হয়েছে মানুষটা! ব্যাপারটা তৃধাকে কষ্ট দিচ্ছে। তার বুকে চিনচিন ব্যাথা শুরু হয়।

শাহানার অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘুরাচ্ছে। সে বেশি মানুষের মাঝে থাকতে পারে না। শরীর দূর্বল লাগছে। পদ্মজার এক হাত ধরে দূর্বল কণ্ঠে বললো, 'পদ্ম,আমার মাথা ঘুরাইতাছে।'

পদ্মজা বিচলিত হয়ে বললো, 'বেশি খারাপ লাগছে?'

শাহানার চোখ বুজে আসছে। সে অনেক কষ্টে বললো, 'মাথাত পানি দেও আমার। দেও বইন,দেও!'

স্কুলের পিছনে ঝোপঝাড় আর মাদিনী নদী আছে। একটা ঘাটও আছে। পানির ব্যবস্থা আছে। পদ্মজা শাহানার এক হাত শক্ত করে ধরে ঘাটে নিয়ে আসে। দুজন লোকও সাথে সাথে যায়। শাহানা নিকাব খুলার আগে দুজন লোককে উদ্দেশ্য করে বললো, 'এই তোমরা আইছো কেরে? নিকাব খুইললা পানি দিমু মাথাত। যাও তোমরা।'

দুজন লোক নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চলে যায়। এদিকে কেউ নেই। কেউ আসতে চাইলেও তাদের সামনে দিয়ে আসতে হবে। তাই ভয় নেই।

শাহানা নিকাব খুলে মাথায় পানি দিল। শাহানা মাথা ঝুঁকে রাখে। আর পদ্মজা দুইহাতে

পানি নিয়ে শাহানার মাথায় ঢালে। কিছুক্ষণ পানি দেয়ার পর শাহানা সুস্থবোধ করে। বিশ্রাম নেয়ার জন্য সে একটু দূরে একটা গাছের গোড়ায় বসলো। পদ্মজা চারপাশ দেখে নিজের নিকাব খুললো। চোখ দুটি জ্বলছে। পানি দেয়া প্রয়োজন।

পদ্মজা যেখানে ছিল সেখানে নেই! লিখন চারপাশে চোখ বুলিয়েও পদ্মজার দেখা পেলো না। এখানে আসতে আসতে কোথায় চলে গেল?

তৃধাও খুঁজলো। স্কুলে একবার শুটিং হয়েছিল। তাই লিখন জানে স্কুলঘরের পিছনে একটা ঘাট আছে। পদ্মজা সেখানে থাকতে পারে ভেবে,সেদিকে গেলো লিখন। দুজন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে তার পাশ কেটে ভীড়ের দিকে যায়। লিখন ঘাটে এসে থামে। কারো উপস্থিতি টের পেয়ে শাহানা পিছনে ফিরে তাকায়। আবার চোখ সরিয়েও নেয়। পদ্মজা মুখ ধুয়ে পিছনে ফিরতেই দূরে লিখনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। পদ্মজার গলার দুটো ঘাড় কালো-খয়েরি দাগ,মুখের ক্ষত,চোখের-মুখের অবস্থা দিনের আলোর মতো লিখনের চোখের সামনে ভেসে উঠে। শাহানা পদ্মজার এমন অবস্থা দেখে চমকে যায়। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসেই সমাবেশে চলে এসেছে! পদ্মজার সাথে নিকাব পরা অবস্থায় কথা হয়েছে। তাই পদ্মজার এই অবস্থা সে দেখেনি। লিখনের কথা হারিয়ে যায়। বাকহারা হয়ে পড়ে সে। একেই বোধহয় বলে,পৃথিবী থমকে যাওয়া। পদ্মজা দ্রুত নিকাব পরে নিল।

পর্ব ৭৭

পদ্মজা এক পা,এক পা করে উপরে উঠে আসে। পদ্মজার প্রতিটি কদম লিখনের হৃৎপিণ্ডে কাঁপন ধরায়। সে কথা বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। শাহানা পদ্মজার এক হাত ধরে বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'ও পদ্ম,তোমার এই অবস্থা কেমনে হইলো?'

পদ্মজা চাপা স্বরে বললো, 'বাড়িতে গিয়ে সব বলবো আপা।'

শাহানা চোখ দুটি বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার শরীরে যে দাগ সে দেখেছে,এতে নিশ্চিত কেউ পদ্মজাকে মেরেছে। গলা চেপে ধরেছে! গালে নখের আঁচড়ও রয়েছে। শাহানা স্তব্ধ হয়ে যায়। আমির পদ্মজার জন্য কতোটা পাগল সবাই জানে। আমির-পদ্মজার ভালোবাসা গল্প সবার মুখেমুখে। শাহানা,শিরিন দুজনই তাদের শ্বশুর বাড়িতে আমির-পদ্মজার ভালোবাসার গল্প করে। সেই পদ্মজার গায়ে মারের দাগ! আমিরের তো মারার কথা না,অন্য কেউও পারবে না। তাহলে কীভাবে কী হলো? শাহানার মাথায় কিছু ঢুকছে না। পদ্মজা লিখনের দিকে তাকাতেই লিখন নিঃশ্বাস ছাড়লো। নিঃশ্বাসের শব্দ উপস্থিত তৃধা,শাহানা,পদ্মজা তিন জনই শুনতে পায়। পদ্মজা তার রিনঝিনে মিষ্টি কণ্ঠে বললো, 'আপনার সাথে আমার কথা ছিল।'

লিখন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে স্পষ্ট স্বরে বললো, 'কী হয়েছে তোমার সাথে?'

লিখনের চোখের কার্নিশে জল জমে। পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কেউ তার মুখ দেখলে তাকে অনেক রকম প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হবে। তাই সে মুখ দেখাতে চায়নি কাউকে। পূর্ণা-প্রেমার সাথে যখন দেখা হয়, তখনও সে নিকাব খুলেনি। লিখন এক পা এগিয়ে এসে আবার প্রশ্ন করলো, 'কে মেরেছে?'

পদ্মজা বুক ধুকপুক করছে। তার মিথ্যে বলায় অভ্যেস নেই। আবার সত্যটাও বলা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি সেরকম নয়। পদ্মজা লিখনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তৃধার দিকে তাকালো। পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটা। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। তৃধা পদ্মজার শরীরের দাগ নিয়ে চিন্তিত নয়। সে আগ্রহ নিয়ে পদ্মজার চোখ দেখছে। কাঁদার কারণে ফুলে থাকলেও সৌন্দর্য হারিয়ে যায়নি। অসম্ভব সুন্দর চোখ। টানা টানা চোখ বোধহয় একেই বলে! তৃধা ঈর্ষান্বিত। পদ্মজা লিখনের প্রশ্নে বললো, 'মারের দাগ হতে যাবে কেন?'

লিখন রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'মুখে দাগ,গলা চেপে ধরার দাগ,চোখ ফুলে আছে। কে বলবে এটা মারের দাগ না? আমির হাওলাদার মেরেছে?'

শাহানা চমকে যায়। রাগ হয়। শাহানা-শিরিন আমিরকে অনেক ভালোবাসে। আমিরকে নিয়ে এত বড় কথা কী করে বলতে পারে লিখন? শাহানা তেড়ে এসে রাগী স্বরে বললো, 'বাবু মারবো কেরে? তুমি কিতা কও?'

পদ্মজা দ্রুত লিখনকে বললো, 'সব বলব। আপনার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। আপনার সাহায্য প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে শুনুন।'

শাহানা পদ্মজার এক হাতে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে বললো, 'পর পুরুষের কাছে কিতার সাহায্য তোমার পদ্ম?'

পদ্মজা বললো, 'আপা,আমি আপনাকে সব বলব। একটু সময় দিন।'

পদ্মজাকে পাহারা দেয়া দুজন লোকের নাম হাবু আর জসিম। হাবু-জসিমকে একা একা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে,রিদওয়ান পদ্মজাকে খুঁজতে থাকলো। খুঁজতে খুঁজতে ঘাটে এসে উঁকি দেয়। লিখনের সামনে পদ্মজাকে দেখে ভয়ে হয় রিদওয়ানের। লিখন দেশের একজন খ্যাতিমান অভিনেতা। সে যদি পদ্মজার মুখ থেকে সব জেনে যায়,যে কোনো মূল্যে তাদের ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগবে। আর সফলও হতে পারবে। পদ্মজা পারে না,কারণ তার স্বামী এতে জড়িত। তার দুই বোনকে নিয়ে ভয় আছে। সর্বোপরি সে একজন নারী! রিদওয়ান দূর থেকে ডাকলো, 'পদ্মজা।'

রিদওয়ানের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা আশাহত হয়। লিখনের সাথে কথা যে আর দীর্ঘ হওয়া

সম্ভব নয় তা স্পষ্ট। পদ্মজা তাকালো। রিদওয়ান এগিয়ে এসে বললো, 'চাচা যেতে বলেছেন।'

শাহানা রিদওয়ানকে বললো, 'মাথাডা ঘুরতাছিল। পদ্ম আমারে ঘাটে আইননা পানি দিছে।'

রিদওয়ান আড়চোখে লিখনকে দেখলো। লিখনের প্রতিক্রিয়া দেখলো। লিখন তাকাতেই সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। রিদওয়ানের দৃষ্টি দেখে লিখনের বিচক্ষণ মস্তিষ্ক বুঝে যায়, এই দৃশ্যে ঘাপলা আছে। পদ্মজা ভালো নেই,তার সাথে খারাপ কিছু হচ্ছে। আর রিদওয়ান সব জানে। সে জড়িত। রিদওয়ান শাহানাকে বললো'এখন ঠিক আছো?'

শাহানা এক হাতে নিজের কপাল চেপে ধরে বললো, 'হ ভাই।'

রিদওয়ান হেসে লিখনের দিকে তাকালো। করমর্দন করে বললো, 'কী খবর?'

রিদওয়ানের জবাব না দিয়ে লিখন বললো, 'আমি পদ্মজার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই।'

রিদওয়ান পদ্মজার চোখের দিকে তাকায়। তারপর লিখনের দিকে। বললো, 'কী কথা?'

'ব্যাক্তিগত। দয়া করে সুযোগ করে দিলে খুশি হবো।' লিখনের সোজাসুজি কথা।

রিদওয়ান দূরে সরে দাঁড়ালো। বললো, 'পদ্মজা আমাদের বাড়ির বউ। সে যার তার সাথে বাইরে নির্জনে কথা বলতে পারে না।'

লিখনের হাঁসফাঁস লাগছে। সে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছে। নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না। মন বার বার বলছে,পদ্মজা ভালো নেই! সত্যিই তো ভালো নেই। লিখন বললো, 'পদ্মজা আমাকে কিছু বলতে চায়।'

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আদেশের স্বরে বললো, 'পদ্মজা চলো।চাচা ডাকে।'

পদ্মজা রিদওয়ানকে মোটেও ভয় পায় না। রিদওয়ানের আদেশ শোনা তো দূরের কথা। তবে এই মুহূর্তে কিছুতেই লিখনের সাথে কথা বলা সম্ভব নয়। তাই সে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই লিখন পথ আটকে দাঁড়ায়। তার গলার স্বর চড়া হয়, 'আমাকে বলে যাও তোমার গলায় কীসের দাগ? মুখে কীসের দাগ? কে মেরেছে?'

'কে মেরেছে?'প্রশ্নটা কানে আসতেই রিদওয়ানের গলা শুকিয়ে যায়। এতকিছু কী করে লিখন দেখলো? পদ্মজা দেখিয়েছে? এভাবে বাইরের পুরুষ মানুষকে নিজের গলা দেখিয়েছে! রিদওয়ান তার আসল রূপ,ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বললো, 'তুমি না সতীসাবিত্রী! পর-পুরুষকে গলা দেখিয়ে বেড়াও আমির জানে?'

লিখনের মাথা চড়ে যায়। সে শেষ কবে নিজের ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সে জানে না। তবে আজ হারিয়েছে। তার কাছে পরিষ্কার, পদ্মজা অত্যাচারিত! তার উপর জুলুম করা হয়। লিখন রিদওয়ানের শার্টের গলা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'মুখ সামলিয়ে কথা বলুন।'

রিদওয়ান লিখনকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। লিখনের ঝাঁকরা চুল কপালে ছড়িয়ে পড়ে। রিদওয়ান বললো, 'অন্যের বউয়ের উপর নজর দেয়া বন্ধ করুন। পদ্মজা চলো।'রিদওয়ান পদ্মজার হাত চেপে ধরে। পদ্মজা এক ঝটকায় রিদওয়ানের হাত সরিয়ে দিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে বললো, 'আমি একাই যেতে পারি।'

তারপর লিখনকে বললো, 'কথা বাড়াবেন না। আমাকে যেতে দিন।'

লিখন কারো কথা শুনতে রাজি নয়। সে তার ধৈর্য্য,ব্যাক্তিত্ব থেকে সরে এসেছে। লিখন আবারও পদ্মজার পথ আটকালো। প্রশ্ন করলো, 'কাকে ভয় পাচ্ছো তুমি? আমাকে বলো।'

শাহানা নিজেও অবাক পদ্মজার অবস্থা দেখে। কিন্তু লিখনের পদ্মজাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগছে না। অন্য পুরুষ কেন তাদের বাড়ির বউয়ের জন্য এতো আকুল হবে? শাহানা কর্কশ কণ্ঠে লিখনকে বললো, 'আপনে পথ ছাড়েন না ক্যান? অন্য বাড়ির বউরে এমনে আটকানি ভালা মানুষের কাম না।'

লিখনের চোখেমুখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট! অন্য বাড়ির বউ! অন্যের বউ! এই শব্দগুলো কেন পৃথিবীতে এসেছে? সহ্য করা যায় না। রিদওয়ান লিখনকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইলো। লিখন রিদওয়ানের হাতে ধরে ফেলে। রিদওয়ানের মুখের কাছে গিয়ে চাপাস্বরে বললো, 'পদ্মজা আমার হৃদয়ে যত্নে রাখা জীবন্ত ফুল। তার গায়ে আঘাত করার সাহস যে করেছে তাকে আমি টুকরো টুকরো করবো।'

লিখনের হুমকি রিদওয়ানের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আমিরকে সহ্য করে, কারণ আমির ঠান্ডা মাথার খুনী। চোখের পলকে যে কাউকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা,পাতালঘর, বাড়ি,অফিস,গোডাউন সবকিছুর একমাত্র মালিক আমির। তাই রিদওয়ান রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তাই বলে সাধারণ জগতের একজন অভিনেতার হুমকি সহ্য করবে? কিছুতেই না। রিদওয়ান লিখনের চোখে আগুন চোখে তাকিয়ে বললো, 'এসব সিনেমায় গিয়ে বলুন। নাম বাড়বে।'

লিখন রিদওয়ানকে ছেড়ে পদ্মজার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। বললো, 'পদ্মজা তুমি তো ভীতু না। ভয় পেয়ো না। আমাকে বলো কী হয়েছে তোমার সাথে?'

পদ্মজা বললো, 'আমি কাউকে ভয় পাচ্ছি না। আপনার সাথে পরে কথা বলব।'

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে তেড়ে এসে বললো, 'পরে কীসের কথা?'

রিদওয়ান পদ্মজার মুখের উপর ঝুঁকেছে বলে লিখনের রাগ বাড়ে। সে রিদওয়ানের পিঠের শার্ট খামচে ধরে। সঙ্গে,সঙ্গে রিদওয়ান লিখনের মুখ বরাবর ঘুষি মারলো। তৃধা,পদ্মজা,শাহানা চমকে যায়। তৃধা আতঙ্কে লাল হয়ে যায়। সে দৌড়ে এগিয়ে আসে। লিখন তার ঘোলা চোখ দিয়ে রিদওয়ানের উপর অগ্নি বর্ষিত করে। রিদওয়ানকে তার ঘুষি ফিরিয়ে দেয়। দুজন মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। তৃধা,পদ্মজা কেউ থামাতে পারে না। আর কিছু সময় এভাবে চললে,কেউ একজন খুন হয়ে যাবে। শাহানা চিৎকার করতে করতে স্কুলের সামনে ছুটে যায়। তার চিৎকার শুনে উপস্থিত মানুষদের মাঝে হট্টগোল শুরু হয়। শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। মজিদ,খলিল ছুটে আসে স্কুলের পিছনে। পরিচালক আনোয়ার হোসেন লিখনকে মারামারি করতে দেখে খুব অবাক হোন। সবাই মিলে লিখন ও রিদওয়ানকে থামালো। তারপর দুজনকে নিয়ে স্কুলের সামনে আসে। উপস্থিত মানুষরা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। গুরুজনরা জিজ্ঞাসা করে,তারা কেন মারামারি করছিল? মজিদ হাত তুলে সবাইকে থামালেন। তারপর রিদওয়ানের দিকে তাকালেন। রিদওয়ান চোখের ইশারায় কিছু বলছে। কিন্তু মজিদ বুঝতে পারেননি। তিনি রিদওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সমস্যা রিদওয়ান? এমন অসভ্যতামির মানে কী?'

রিদওয়ান বাঁকা চোখে উপস্থিত মানুষদের দেখলো। সবাই তাকিয়ে আছে। আজ কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে নিশ্চিত! রিদওয়ান মাথা নীচু করে বললো, 'লিখন শাহ পদ্মজার পথ আটকাচ্ছিল।'

রিদওনায়ের কথা শুনে মানুষদের মুখ থেকে লিখনের উদ্দেশ্যে ছিঃ,ছিঃ বেরিয়ে আসে। লিখন হতবাক হয়ে যায়। হতবাক হয় পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত, পদ্মজা। মজিদ লিখনকে প্রশ্ন করলেন, 'রিদওয়ান যা বলছে সত্য?'

লিখন পদ্মজার চোখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'সত্য। কিন্তু আমি পদ্মজার গলায়,মুখে দাগ দেখেছি। গলায় যে দাগ সেই দাগ দেখে বুঝা যায় তার গলা কেউ চেপে ধরেছিল। মুখে ক্ষত,নখের আঁচড়। চোখ ফোলা। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম এসব কী করে হয়েছে? কে মেরেছে?'

লিখনের কথা শুনে মজিদের মাথা ঘুরে যায়। আমির বলেছিল,পদ্মজাকে সমাবেশে না আনতে। এতে সমস্যা হতে পারে। মজিদ আমিরের কথায় গুরুত্ব দেননি। ভেবেছেন,পদ্মজা গ্রামে আছে সবাই জানে। আর গত সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, পরবর্তী সমাবেশে আমির বা পদ্মজা বিতরণ করবে শীতবস্ত্র। আমির তো চলে গেল। তাই পদ্মজাকে এনেছেন। আর এই সমাবেশে বাড়ির মেয়ে-বউরা অসুস্থ থাকলেও উপস্থিত থাকে। যদি কেউ প্রশ্ন

করে,আমিরের বউ কোথায়? প্রশ্নটা সহজ,উত্তরও বানিয়ে দেয়া যেত। তবুও মজিদ হাওলাদার প্রশ্ন এড়াতে পদ্মজাকে নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রশ্ন শুনতে পছন্দ করেন না।

মজিদের মুখের রঙ পাল্টে যাওয়াটাও লিখনের চোখে পড়ে। সে ভেবে নেয়,এ সম্পর্কে মজিদও জানে। সে সবার সামনে প্রশ্ন করে, 'আপনার বাড়ির বউয়ের শরীরে মারের দাগ কী করে এলো?'

মজিদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়। তিনি কাঠ কাঠ স্বরে বললেন, 'তুমি কী করে দেখেছো?'

'পদ্মজা ঘাটে নিকাব খুলে মুখে পানি...'

মজিদ লিখনের কথায় বাঁধা দিয়ে বললেন, 'তুমি বাড়িতে এসো এ নিয়ে কথা হবে।'

মজিদ ভেতরে ভেতরে ভয়ে জমে গিয়েছেন। পদ্মজা যদি মুখ খুলে কী হবে? এখানে মজিদের প্রতিপক্ষরাও রয়েছে। তারা সুযোগ নিবে। লিখন কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। তার পূর্বে মজিদের নতুন প্রতিপক্ষ ইয়াকুব আলী বললেন, 'বাড়ির বউয়ের গায়ে মারের দাগ! এটা তো ভালো কথা না। মাতব্বর কি ছেলের বউয়ের উপর অত্যাচার করে?'

মজিদ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন! পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে। যে করেই হউক পরিস্থিতি হাতে আনতে হবে। মজিদ ইয়াকুব আলীকে হেসে বললেন, 'অহেতুক কথা বলবেন না। আমাদের বাড়িতে বউরা রানির মতো থাকে। গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই আসে না। কথা বলার পূর্বে বিবেচনা করে বলবেন।'

ইয়াকুব আলী হাসলেন। বললেন, 'তাহলে কী নায়ক সাহেব মিথ্যা বলছেন?'

ইয়াকুব আলীর সাথে আরো দুজন তাল মিলিয়ে বললো, 'আমরা সত্যটা জানতে চাই।'

হাওলাদারদের অবস্থায় দরজার চিপায় পড়ার মতো। পদ্মজা তাদের অবস্থা দেখে মুচকি হাসে। পদ্মজার শরীরে মারের দাগ আছে! এ কথা শুনে পূর্ণা মানুষজনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে উঁচু মাটির টিলার উপর উঠলো। পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললো, 'আপা? লিখন ভাই কী বলছে?'

পদ্মজা নিরুত্তর। খলিল উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সব না সবাই জেনে যায়! আতঙ্কে তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'লিখন শাহ মিছা কথা কইতাছে।'

খলিলের কথা শুনে মজিদের ইচ্ছে হয় খলিলকে জুতা দিয়ে পিটাতে। লিখন বললো, 'এইটুকুও মিথ্যা না। দাগগুলো এখনো তাজা। পদ্মজা তো সামনেই আছে।'

একজন বয়স্ক মহিলা বললেন, 'পদ্ম মার নিকাবডা সরাইলেই হাচামিছা জানা যাইবো।'

মজিদ জানতেন কেউ এরকম কিছুই বলবে। এখন প্রমাণিত হয়ে যাবে খলিল মিথ্যা বলেছে! মজিদের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে। তিনি কী করবেন? কী বলবেন? বুঝতে পারছেন না। পদ্মজা চেয়েছিল অন্যভাবে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করতে। যেহেতু সবার সম্মূখে সব প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে সেহেতু উচিত সব ফাঁস করে দেয়া। এতে সব শুনে কেউ না কেউ মেয়েগুলোকে উদ্ধার করতে পদক্ষেপ নিতে পারবে। সে পুরো নিকাব না খুলে শুধু মুখটা উন্মুক্ত করলো। তার মুখের স্পষ্ট,কালসিটে দাগগুলো দেখে মানুষজনের কোলাহল বেড়ে যায়। সবাই ফিসফিসিয়ে কথা বলতে থাকে। পূর্ণা পদ্মজার গালের একটা ক্ষত দেখেছে। শুনেছিল তো দূর্ঘটনায় এমন হয়েছে। নখ ডেবে যাওয়া দুটো দাগ আর চোখের অবস্থা দেখে তার বুক ছ্যাঁত করে উঠে। সে পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিকাব তুলে গলা দেখে চমকে যায়। অশ্রুসজল চোখে পদ্মজা দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ডাকে, 'আপা!'

ইয়াকুব আলী খুব অবাক হয়েছেন এরকম ভান করে বললেন, 'মেয়েটার কী অবস্থা! মাতব্বর এভাবেই কী বউদের রানী করে রাখেন?'

মজিদের বুকের ব্যাথা বাড়ে। এক পা পিছিয়ে যান। কী হচ্ছে এসব! রিদওয়ান জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। সে পদ্মজার ভাব দেখে ধারণা করছে,পদ্মজা এখুনি সব বলে দিবে। আর সব শোনার পর এত মানুষের সাথে তাদের পেরে উঠা সম্ভব নয়। রিদওয়ান ঢোক

গিলে আচমকা বলে উঠলো, 'আমির মেরেছে। এমনি এমনি মারেনি! পদ্মজার লিখন শাহর সাথে ছয় বছর আগে সম্পর্ক হয়েছিল। বিয়ের পরও লুকিয়ে ঢাকা অবৈধ মেলামেশা করে গেছে। আমির কয়দিন আগে হাতেনাতে ধরেছে। আর তাই মেরেছে।'

রিদওয়ানের কথা শুনে পদ্মজা ও লিখনের মাথায় যেন বাজ পড়ে। মজিদের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠে। রিদওয়ান বাঁচার পথ খুঁজে দিয়েছে! মানুষজনের কোলাহল দ্বিগুণ হয়। মজিদ কখনো ভাবেননি,তার পরিবার নিয়ে আবারো এমন সভা হবে! যা হওয়ার হয়ে গেছে,পদ্মজার সম্মান উৎসর্গ করে হলেও তাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে। লিখন ক্রোধে-আক্রোশে রিদওয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাবু,জসিম সহ আরো কয়েকজন লিখনকে আটকায়। লিখন চেঁচিয়ে বললো, 'মিথ্যাবাদী।'

কেউ একজন বললো, 'মাতব্বর সাহেব,সত্যিডা খুলে বলেন।'

মজিদ হাওলাদার কেশে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি চাইনি,আমার বউয়ের কোনো দূর্নাম হউক। হাজার হউক সে আমার একমাত্র ছেলের বউ। কিন্তু পরিস্থিতি যখন বাধ্য করছে তখন না বলে উপায় নেই। আপনারা অনেকেই জানেন,মোড়ল বাড়িতে লিখন শাহ একবার শুটিং করতে এসেছিল। তখন পদ্মজা আর লিখন শাহর মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর আমার ছেলে আমিরের সাথে পদ্মজার বিয়ে হয়। আমির পদ্মজাকে নিয়ে ঢাকা চলে যায়। ঢাকা লিখন শাহের সাথে পদ্মজার অবৈধ সম্পর্ক চলতে থাকে। আমার বোকা ছেলে কখনো ধরতে পারেনি। গ্রামে আসার পর লিখন শাহ দুইবার আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। প্রমাণ আছে কিন্তু। অনেকেই দেখেছেন। দেখেছেন তো?'

কয়েকজন বলাবলি করলো, তারা দেখেছে! মজিদ বললেন, 'লিখন শাহ কিন্তু পদ্মজার জন্য যেত। একদিন রাতেও যায়। তখন আমির হাতেনাতে ধরে দুজনকে। তাই আমির পদ্মজার গায়ের উপর হাত তুলে। রাগে একটু মার দেয়। এতে কী কোনো দোষ হয়ে গেছে আমার ছেলের?'

পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো চিৎকার করে উঠে, 'মিথ্যা কথা। আপনি বানিয়ে কুৎসা রটাচ্ছেন।'

মজিদ হাওলাদার বুকভরা নিঃশ্বাস নেন। তিনি জানেন,এই গ্রামবাসী তাকে কতোটা বিশ্বাস করে। আর লিখনকেও অনেকে বাড়িতে যেতে দেখেছে। পদ্মজার নামে একবার সালিশ বসেছিল। যদিও সেটা তার ছেলের সাথে তবে মেয়ে নির্দোষ হলেও তার একবারের বদনাম সারা জীবন রয়ে যায়! তিনি সবার সামনে দুই হাত তুলে নরম স্বরে বললেন, 'আমার আর কিছু বলার নেই। বিশ্বাস, অবিশ্বাস আপনাদের উপর।'

লিখন হাবু ও জসিমকে আঘাত করলো। রিদওয়ান লিখনকে চেপে ধরে। রিদওয়ানের ইশারায় আরো কয়েকজন লিখনকে জাপটে ধরে। পরিচালক আনোয়ার হোসেন মাথা নিচু করে ফেলেন। মজিদ হাওলাদার মিথ্যা বলবেন না! তিনি মহৎ মানুষ। লিখন একটা মেয়ের জন্য পাগল সেটা তিনিও জানতেন। মজিদের কথা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তবে তিনি লিখনকে সৎ চরিত্রের ছেলে ভাবতেন। মুহূর্তে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দ্বিতীয়বারের মতো পদ্মজার চরিত্রে ছিঃ,ছিঃ ধিক্কার ছুঁড়ে মারে গ্রামবাসী। কেউ যেন গায়ে হাত না দিতে পারে,আত্মরক্ষার জন্য পদ্মজা কোমরে ছুরি খুঁজলো! ছুরি নেই। সে অসহায় হয়ে পড়ে। চিৎকার করে সবার উদ্দেশ্যে বললো, 'সবাই আমার কথা শুনুন।'

কেউ পদ্মজার কথা শুনলো না। সবার চেঁচামিচিতে তার গলার স্বর কারো কানেই যায় না। মজিদ হাওলাদারকে তারা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। নিয়তি পদ্মজার সম্মানে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত হানে!

পর্ব ৭৮

মজিদ হাওলাদার দুই হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তাৎক্ষণিক কোলাহল কমে আসে। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার ঘরের বিচার আমার ঘরে হবে। আমি আর এ বিষয়ে কথা বাড়াতে চাই না। রিদওয়ান, পদ্মজাকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

রিদওয়ান পদ্মজাকে ছুঁতে উদ্যত হতেই লিখন চেঁচিয়ে বললো, 'পদ্মজা যাবে না।'

লিখন পদ্মজার জন্য ভয় পাচ্ছে। হাওলাদার বাড়ির মানুষগুলো কত বড় মিথ্যাবাদী সে আজ টের পেয়েছে। এতো বড় মিথ্যে চাপিয়ে দিলো, নিজেদের কুকর্ম লুকোতে! মজিদ হাওলাদারের মিথ্যা অভিনয় তাকে অবাক করেছে খুব। এরা পদ্মজাকে বাড়ি নিয়ে কী করে কে জানে! রিদওয়ান লিখনের কথা শুনলো না। সে পদ্মজাকে ধমকের স্বরে বললো, 'বাড়ি চলো।'

তারপর হাত ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজাও রিদওয়ানের হাত চেপে ধরলো। চাপাস্বরে বললো, 'ছয় বছর আগের অপবাদ আবার আমার জীবনে নিয়ে আসার জন্য আপনার মতো নরপশুদের অভিশাপ! কিন্তু এবার না আমাকে না আমার বোনদের, কাউকে ছোঁয়ার সাহস কেউ দেখাতে পারবে না।'

পদ্মজা রিদওয়ানের মুখের উপর থুথু ছুঁড়ে মারে। উপস্থিত মানুষজন চমকে যায়। কোলাহল দ্বিগুণ হয়। রিদওয়ান পদ্মজার দিকে আগুন চোখে তাকায়। তার উপর হাত তোলার জন্য প্রস্তুত হয়। পদ্মজার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল পূর্ণা। সে আর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। রিদওয়ানের পূর্বে রিদওয়ানের গালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় বসিয়ে দিল। পূর্ণার আকস্মিক ব্যবহারে সবাই চমকে যায়। চারিদিকে চেঁচামিচি শুরু হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। রিদওয়ান রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সে পূর্ণার গলা চেপে ধরে। শিরিন ভয়ে চিৎকার করে উঠে, 'ও আল্লাহ! আল্লাহর গযব পড়ছে এইহানে! গযব পড়ছে!'

তারপর দ্রুত সরে যায়। শাহানা,খলিল রিদওয়ানকে আটকানোর চেষ্টা করে। রিদওয়ান রাগে কিড়মিড় করছে। খলিল চাপাস্বরে রিদওয়ানের কানে কানে বললেন, 'রিদু পূর্ণারে ছাড়,মানুষ দেখতাছে।'

রিদওয়ান ছাড়লো না। পদ্মজা জানে,এই মুহূর্তে সে হাওলাদার বাড়ির মানুষদের আঘাত করলে গ্রামবাসী ভালো চোখে দেখবে না। তবুও রিদওয়ানকে আঘাত করার জন্য বাধ্য হতে হয়। পদ্মজা রিদওয়ানের পেট বরাবর জোরে লাথি বসায়। রিদওয়ান ছিটকে সরে যায়। দুই হাতে পেট চেপে ধরে। শাহানা'ও মাগো'বলে চেঁচিয়ে উঠলো। পূর্ণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

মৃদুল গফুর মিয়াকে নিয়ে স্কুলের দিকে আসছিল। দূর থেকে দেখতে পেল মাঠের মানুষজন অস্থির হয়ে আছে। সে গফুর মিয়াকে বললো, '

আব্বা, আপনি আসেন। আমি আগে যাইতাছি।'

তারপর দৌড়াতে থাকে। স্কুলমাঠে পৌঁছাতেই উঁচু টিলায় রিদওয়ানকে পূর্ণার গলা চেপে ধরতে দেখলো। তার রক্ত মাথায় উঠে যায়। শরীরে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দেয়। এদিকওদিক খুঁজে একটা মাঝারি আকারের বাঁশ পেল। সে দ্রুত বাঁশ নিয়ে দৌড়াতে থাকে। এক হাতে লুঙ্গি ধরে, যা হাঁটু অবধি উঠে আসে। মৃদুলের দৌড়ের গতিতে অনেক মানুষ ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে। মৃদুলের চোখের দৃষ্টি রিদওয়ানের দিকে। তার মস্তিষ্ক এলোমেলো। মজিদ দ্রুত পদ্মজা-রিদওয়ানের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বললেন, 'কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? থামো সবাই।'

কিন্তু কোনোকিছুই থামলো না। মৃদুলের উপস্থিতি সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। সে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে টিলার উপর। বাঁশ দিয়ে রিদওয়ানকে আঘাত করতে গিয়ে শাহানা,খলিলসহ আরো দুজন লোককে আঘাত করে বসে। মজিদ দ্রুত টিলা ছেড়ে সরে যান। মৃদুল খুব রাগী! মৃদুলের এলাকার অনেকে মৃদুলকে মাথা খারাপ বলে। সে কখনো বুদ্ধি

দিয়ে কিছু করে না। সবসময় ক্রোধকে মূল্য দেয়। রাগের বশে কখন কী করে নিজেও জানে না। মানুষজন ছোটাছুটি করে পালাতে থাকে। শুধু মৃদুলের হুংকার শোনা যায়। ক্রোধ থাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। সে রিদওয়ানকে বলছে, 'জারজের বাচ্চা, তুই কার গায়ে হাত দিছস! তোরে আজ আমি মাটির ভিত্রে গাঁইথা ফেলমু।'

আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা মজিদ হাওলাদারের লোকেরা মৃদুলকে ধরতে দৌড়ে আসে। তৃধা ভয়ে দূর থেকে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। আনোয়ার হোসেন তৃধার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তৃধার মাথায় হাত রাখলেন। আনোয়ার হোসেনের দিকে তাকিয়ে তৃধা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বললো, 'লিখনকে কেন ছাড়ছে না ওরা?'

আনোয়ার হোসেন টিলার উপর চোখ রেখে বললেন, 'জানি না মা। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কেউ খুন হয়ে যাবে এখানে। লিখন যে কেন এসবে জড়িয়ে পড়লো!'

আনোয়ার হোসেনের কণ্ঠে আফসোস। তৃধা মাটিতে বসে। তার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে। চার-পাঁচজন লোক লিখনকে জাপটে ধরে রেখেছে। লিখন ছটফট করছে ছোটার জন্য। এই দৃশ্য সে সহ্য করতে পারছে না।

পদ্মজা পূর্ণাকে বুকের সাথে চেপে ধরলো। পূর্ণা ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। পদ্মজার বুক জ্বলছে। পূর্ণার কষ্ট তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মৃদুল রাগে আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করছে। রিদওয়ানকে ধরতে পারলে,সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু পারছে না। টিলার উপর পনেরো-বিশ জনের একটা জটলা লেগে যায়। হাতাহাতি,ধ্বস্তাধস্তি চলে বিরতিহীনভাবে। মজিদ চোখের চশমাটা ঠিক করে ঠান্ডা মাথায় ভাবলেন। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি হাতে আনা ভীষণ জরুরি! নয়তো অনেক বিপদ ঘটে যেতে পারে। তিনি তার ডান হাত রমজানকে ডেকে ফিসফিসিয়ে কিছু বললেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে জটলার মাঝখান থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে। শব্দ তুলে লিখন শাহর দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তার পিঠ থেকে রক্তের ধারা নামছে। মৃদুল আকস্মিক লিখনকে এভাবে পড়তে দেখে চমকে যায়। রিদওয়ান লিখনকে আহত হতে দেখে মজিদের দিকে তাকালো। তার মুখ রক্তাক্ত। মৃদুল এতজনকে উপেক্ষা করেও তাকে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে! মজিদ ইশারায় রিদওয়ানকে কিছু একটা বুঝালেন। রিদওয়ান তাৎক্ষণিক পদ্মজাকে খুঁজলো। দেখলো,পদ্মজা মাটিতে পড়ে আছে। তার চোখ দুটি বোজা। মজিদের একটা পদক্ষেপ পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিল! লিখন হয় মারা যাবে,নয়তো অনেকদিন হাসপাতালে পড়ে থাকবে। আর পদ্মজাকে একবার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলেই হলো। আর মুক্তি পাবে না! রমজান সবার আড়ালে দ্রুত ঘাটে গেল। রক্তমাখা ছুরি আর হাতের রুমাল নদীতে ছুঁড়ে ফেললো।

এশারের আযান পড়ছে। পদ্মজা ধীরে ধীরে চোখ খুললো। নিজেকে নিজের ঘরে আবিষ্কার করলো। মাথা ব্যথা করছে খুব। সে এক হাতে কপাল চেপে ধরে। তখনই দুপুরের সব ঘটনা মনে পড়ে যায়। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে, তখন কে যেন পিছন থেকে মুখে কিছু একটা চেপে ধরে। তারপর আর কিছু মনে নেই! পদ্মজা দ্রুত উঠে বসে। জুতা না পরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় লতিফার দেখা পেল। লতিফা পদ্মজাকে দেখে বললো, 'কই যাইতাছো?'

'পূর্ণা কোথায়? পূর্ণার কাছে যাব।'

'পূর্ণা তো উপরে।'

পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'উপরে মানে? তিন তলায়?'

'হ।'

'এখানে কে নিয়ে আসলো?'

পদ্মজা প্রশ্ন করলো ঠিকই,উত্তরের আশায় থাকলো না। দৌড়ে তিন তলায় চলে গেল। তিন তলার একটা ঘরেই পালঙ্ক আছে। রুম্পা যে ঘরে ছিল! পদ্মজা সেই ঘরে এসে মৃদুলকে

দেখতে পেল। মৃদুল চেয়ারে বসে আছে। বিছানায় শুয়ে আছে পূর্ণা। পদ্মজা উল্কার গতিতে পূর্ণার মাথার কাছে গিয়ে বসলো। মৃদুল পদ্মজাকে দেখে সংকুচিত হয়। বললো, 'পূর্ণা ভালা আছে ভাবি।'

'ও কি অজ্ঞান?'

'না, ঘুমাইতাছে। কিছুক্ষণ আগে সজাগ ছিল।'

'খেয়েছে?'

'হুম। আপনার ধারে অনেক্ষন বইসা ছিল।'

পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর পূর্ণার গালে,কপালে চুমু দিল। মৃদুলকে প্রশ্ন করলো, 'প্রেমা,প্রান্ত কোথায়?'

'বাড়িত গেছে।'

'ঠিক আছে ওরা?'

'জি ভাবি।'

'আর লিখন শাহ?'

লিখন শাহর কথা শুনে মৃদুল চুপ হয়ে যায়। পদ্মজা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'উনি কোথায়? কেমন আছেন?'

মৃদুল মাথা নত করে বললো,"ভাবি,ভীড়ের মাঝে কেউ একজন ভাইরে ছুরি মারছে!'

পদ্মজা এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে। তারপর কাঁপা স্বরে বললো, 'বেঁচে আছে?'

'জানি না ভাবি। হাসপাতালে নিয়া গেছে সবাই। পুলিশ আইছিল বিকালে।'

পদ্মজার চোখে জল টলমল করে উঠে। মানুষটা এতদিন তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে গেছে। ধৈর্য্য ধরে থেকেছে। কঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে তার জন্য ভালোবাসা যত্ন করে রেখেছে। পদ্মজা সবকিছু জানে। সব জেনেও সে কিছু করতে পারেনি। ভালো তো করতে পারলো না উল্টে তার জন্য ক্ষতি হয়ে গেল! পদ্মজার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। দ্রুত সে জল মুছে ফেললো। আফসোস হচ্ছে! ঘাটে কথা বলা একদম ঠিক হয়নি! মেয়েগুলো হাতছাড়া হয়ে গেছে ভেবে,সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আর লিখনও আজ এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল!

সব ভাগ্যে লেখা ছিল। তাই হয়তো হয়েছে। কখনো হায়-হুতাশ করতে নেই। তাই পদ্মজা সিদ্ধান্ত নিল,সে লিখনের জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। যেন সে সুস্থ হয়ে উঠে। লিখনের জন্য পদ্মজার প্রার্থনা করা দায়িত্ব! পদ্মজার কাছে এইটুকু অধিকার লিখনের আছে! পদ্মজা মৃদুলকে বললো, 'পূর্ণা ঘুমাক তাহলে। দেখে রাখবেন। আমি আসছি।'

'আচ্ছা ভাবি।'

পদ্মজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মৃদুল দরজার বাইরে তাকিয়ে রইলো। পদ্মজাকে তার অনেক প্রশ্ন করার আছে। লিখন-পদ্মজার নামে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে সেটা যে মিথ্যা মৃদুলের চেয়ে ভালো কে জানে! সে নিজের চোখে দেখেছে লিখন শাহর কষ্ট,পদ্মজার সম্মান রক্ষার্থে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা,একটু কথা বলার আশায় ছটফট করা! এতো বড় মিথ্যা অপবাদ হাওলাদার বাড়ির মানুষেরা কেন দিল? আর পদ্মজার গায়ের দাগগুলো সেগুলোই কীসের? আমির হাওলাদার কোথায়? মৃদুলের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে যায় লতিফার আগমনে। লতিফা খাবারের প্লেট টেবিলের উপর রাখলো। তারপর বললো, 'পূর্ণার খাওন দিয়া গেছি। আর আপনের আম্মা কইছে নিচে যাইতে।'

মৃদুল বললো, 'একটু পরে যামু। আম্মা-আব্বায় খাইছে?'

'হ, খাইছে।'

'অন্যরা খায় নাই?'

'সবাই খাইছে। রিদু ভাইজানে বাড়িত নাই।'

'কুত্তার বাচ্চা লুকাইছে।'

লতিফা আড়চোখে মৃদুলকে দেখলো। মৃদুল রাগে ছটফট করছে। এক হাত দিয়ে আরেক হাত খামচে ধরে রেখেছে। লতিফা বললো, 'আপনের আম্মার মেজাজ ভালা না।'

'কেন? কী অইছে?'

'কইতে পারি না। আপনের আব্বার লগে চিল্লাইতে হুনছি।'

মৃদুলকে চিন্তিত হতে দেখা গেল না। তার আম্মা একটু বদরাগী। সব সময় চেঁচামেচি করে। এতে সে অভ্যস্ত। মৃদুল লতিফাকে বললো, 'আমির ভাই কই আছে?'

'ঢাকাত গেছে। কুনদিন আইবো জানি না।'

'আচ্ছা, যাও এহন।'

লতিফা জায়গা ত্যাগ করলো। মৃদুল ধীরে ধীরে হেঁটে জানালার কাছে গেল। জানালার কপাট খুলে দিল। আজ চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না রাত। সে পূর্ণাকে ভালোবাসার কথা বলার জন্য এমন একটা রাতের অপেক্ষা করেছিল। জানালা খুলে দেয়াতে চাঁদের আলো পূর্ণাকে ছুঁয়ে দেয়ার সুযোগ পায়। চাঁদ তার নিজস্ব মায়াবী আলো নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পূর্ণার সারামুখে। পূর্ণার চোখমুখ সেই আলোয় চিকচিক করে উঠে। অন্যরকম সুন্দর দেখায়। মৃদুল পূর্ণার পাশে এসে বসলো। পূর্ণার মুখের দিকে তাকাতেই, মৃদুলের চোখে ভেসে উঠে,রিদওয়ান কীভাবে পূর্ণার গলা চেপে ধরেছিল! মৃদুলের মেজাজ চড়ে যায়। রিদওয়ানকে সে যতক্ষণ ইচ্ছামত পেটাতে না পারবে শান্তি মিলবে না! মৃদুল অনেকক্ষণ রিদওয়ানকে খুঁজেছে। পেল না। মৃদুল ছটফট করতে করতে বিড়বিড় করলো, 'হারামির বাচ্চা!'

পূর্ণা ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে উঠে। একপাশ হয়। পূর্ণার দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। প্রান্ত পূর্ণাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলে। বাসন্তী বাড়িতে একা। তিনি কিছুই জানেন না। তখন মজিদ বললেন,পূর্ণাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলে বেশি ভালো হবে। পদ্মজা সেখানে আছে। মৃদুলও রাজি হয়ে যায়। তার কাছাকাছি থাকবে পূর্ণা এর চেয়ে আনন্দের কী হতে পারে! প্রান্ত মেনে নিল। এই মুহূর্তে মৃদুলই পূর্ণার অভিভাবক। মৃদুল বুঝতে পারেনি ,মজিদ হাওলাদার ভালো মানুষি দেখাতে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। যাতে গফুর মিয়া বা মৃদুল অথবা গ্রামবাসী কেউই মজিদকে দোষী না ভাবে। মজিদ সবাইকে নিজের উদারতা দেখিয়েছেন। গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন,পদ্মজা দোষী হলেও তার বোন দোষী নয়। রিদওয়ান পূর্ণার সাথে অন্যায় করেছে। এজন্য রিদওয়ানের শাস্তি হবে। তিনি রিদওয়ানকে সবার সামনে থাপ্পড় দিয়েছেন। আর বলেছেন,পূর্ণা সুস্থ হলে পূর্ণার কাছে ক্ষমা চাইবে রিদওয়ান।

মৃদুল কল্পনা থেকে বেরিয়ে পূর্ণার এক হাত মুঠোয় নিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করলো, 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া যাও। আমি তোমারে নিয়া যাইতে আইছি।'

মৃদুল পূর্ণার হাতে আলতো করে স্পর্শ করতে করতে তার মায়াবী মুখখানা মুখস্থ করে নিল। মৃদুলের ইচ্ছে হচ্ছে,পদ্মজার মতো পূর্ণার কপালে চুমু এঁকে দিতে। কিন্তু সেই বৈধতা বা সাহস তার নেই। সে পূর্ণার এক হাত শক্ত করে ধরে রাখলো।

পদ্মজা ঘরে প্রবেশ করতেই মৃদুল বিজলির গতিতে পূর্ণার হাত ছুঁড়ে ফেলে। তারপর নিঃশ্বাসের গতিতে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার ঘুম ভেঙে যায়। মৃদুল এতো জোরে হাত ছুঁড়েছে, ঘুম তো পালানোরই কথা! পদ্মজা অবাক হয়ে মৃদুলকে দেখলো। এতো ভয় পাওয়ার কী হলো! পূর্ণা চোখ খুলে পদ্মজাকে দেখে খুব খুশি হয়। সে দ্রুত উঠে বসলো। পদ্মজা পূর্ণার পাশে গিয়ে বসে। পূর্ণা শক্ত করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আপা।'

পদ্মজা মৃদু হেসে বললো, 'বোন আমার!'

তারপর পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বললো, 'কষ্ট হচ্ছে?'

পূর্ণা মৃদুলকে দেখলো তারপর পদ্মজাকে বললো, 'না আপা।'

মৃদুল উসখুস করতে করতে বললো, 'আমি তাইলে যাই ভাবি। ওইখানে পূর্ণার খাবার আছে।'

পদ্মজা মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। মৃদুল দরজার বাইরে গিয়ে পূর্ণার দিকে তাকালো একবার। পূর্ণার বদলে সে পদ্মজাকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। মৃদুল জোরপূর্বক হেসে জায়গা ছাড়লো।

(আগামী দুইদিন পরে নতুন পর্ব পাবেন। ইনশাআল্লাহ।)

পর্ব ৭৯

রাতের আঁধারে চারদিকে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। শাহানা ঘুমানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। মৃদুলের অনিচ্ছাকৃত আঘাতে ডান হাতের বাহু ফুলে গেছে। হাড়ে তীব্র ব্যাথা। হাত নাড়ানো যাচ্ছে না। শাহানা বিড়বিড় করে বিলাপ করছে, 'আল্লাহগো, আল্লাহ এত্ত বেদনা ক্যারে দিছো তুমি? কমায়া দেও আল্লাহ।'

ঘুমের ঘোরে শিরিন শাহানার হাতের উপর উঠে পড়ে। শাহানা'আল্লাহগো'বলে চিৎকার করে উঠলো। শিরিনের ঘুম ভেঙে যায়। সে লাফিয়ে উঠে বসে। তার চোখেমুখে ভয়। শাহানার হাত ধরতে চাইলে শাহানা চিৎকার করে বললো, 'ছুঁবি না আমারে! ডাইনি,মাইরা দিছে আমারেগো।'

শিরিন অপরাধী স্বরে বললো, 'আমি দেখছি না আপা।'

'তুই কথা কইবি না।'

শাহানার চোখমুখ কুঁচকানো। সে প্রচণ্ড রেগে আছে। ধীরে,ধীরে বিছানা থেকে নামলো। শিরিন প্রশ্ন করলো, 'কই যাও?'

শাহনা পূর্বের স্বরেই বললো, 'মুততে যাই।'

শাহানার ঝাড়ি খেয়ে শিরিন আর কথা বললো না। সে অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। শাহানা টয়লেটে যাওয়ার পথে অন্দরমহলের ফাঁকফোকর দিয়ে আসা জ্যোৎস্নার আলোয় একটা পুরুষ অবয়বকে হাঁটতে দেখলো। শাহানা ভয় পেয়ে যায়। পুরুষ অবয়বটি শাহানাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। শাহানার দিকে এগিয়ে আসে। শাহানা ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কেলা?'

মৃদুলের মুখটা ভেসে উঠে। সে হেসে বললো, 'আপা,আমি।'

মৃদুলকে দেখেই শাহানার মেজাজ তুঙ্গে উঠে। সে চোখ রাঙিয়ে বললো, 'কুত্তার বাচ্চা,তুই আমার সামনে আইবি না। লুলা(পঙ্গু) বানায়া দিছস আমারে!'

মৃদুল কাতর স্বরে বললো, 'ছুডু ভাইয়ের লগে এমন করবা? আমি তো তোমারে দেখি নাই। ইচ্ছা কইরা মারি নাই।'

'এই তুই যা। সামনে থাইকা সর।'

শাহানা গজ গজ করতে করতে টয়লেটের দিকে চলে যায়। মৃদুল ঠোঁট উল্টে শাহানার যাওয়া দেখে। তারপর সিঁড়ির দিকে তাকালো। তার ঘুম আসছে না একটুও। পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছে জ্যোৎস্নার আলো সারাগায়ে মেখে অনেকক্ষণ গল্প করতে। কোনো এক অদৃশ্য যন্ত্রনা বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় পূর্ণাকে একটু বেশিই যেন মনে পড়ছে। বুকটা ফাঁকা,ফাঁকা লাগছে। অস্থিরতায় রুহ ছটফট করছে। মৃদুল তিনবার বিসমিল্লাহ বলে,তিনবার বুকে ফুঁ দিল। তারপর আর কিছু না ভেবে তৃতীয় তলায় উঠে আসে। শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতর কেউ বুঝি ঢোল পিটাচ্ছে! সে শুনতে পাচ্ছে। মিনিটের পর মিনিট সে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কবুতরের মতো ডাকলো! মৃদুল যে কবুতরের মতো ডাকতে পারে, পূর্ণা আর মৃদুলের পরিবার ছাড়া কেউ জানে না। পূর্ণা যদি জেগে থাকে তাহলে মৃদুলের নকল ডাক সে চিনতে পারবে। তারপর নিশ্চয় সাড়া দিবে! মৃদুল পূর্ণার জন্য আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। পূর্ণার দেখা নেই। মৃদুল ভাবলো,পূর্ণা ঘুমে বোধহয়। তাই সে আর অপেক্ষা করার কথা ভাবলো না। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। তখন দরজা খোলার শব্দ কানে আসে। মৃদুল পিছনে তাকাতে গিয়েও তাকালো না। যদি পদ্মজা হয়! মৃদুল দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হয়। তখন পূর্ণা ডাকলো, 'দাঁড়ান।'

মৃদুল ঘুরে দাঁড়ালো। সাদা রঙের উপর নীল সুতোর কাজের নকশিকাঁথা গায়ে জড়িয়ে পূর্ণা হেঁটে আসছে। মৃদুল পূর্ণার সাক্ষাৎ -এর আশায় ছিল।।যখন পূর্ণার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল,বুঝতে পারলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। অস্বস্তি হচ্ছে। অদ্ভুত এক যন্ত্রণা হচ্ছে! তবে

সেই যন্ত্রণা প্রাপ্তির! পূর্ণা সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'ছাদে চলুন। তারপর কথা বলবো।'

দুজন একসাথে ছাদে উঠে আসে। ছাদে উঠতেই রাতের পৃথিবীর সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যময় সমারোহ চোখে পড়ে। আকাশে ইয়া বড় চাঁদ। দুজন মুগ্ধ নয়নে চাঁদের দিকে তাকালো। সৌন্দর্যের মাদকতা ছড়িয়ে পড়ে দুজন প্রেমীর মনে। মৃদুল পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণাও তাকালো। চোখাচোখি হতেই দুজন হেসে ফেললো। মৃদুল প্রশ্ন করলো, 'ঘুমাও নাই?'

'না। ঘুম আসছিল না।'

'একটু ভালা লাগতাছে?'

'হুম।'

'ভাবি ঘুমে?'

'হুম।'

'ভাবি কিছু কইছে?'

পূর্ণা মুখ ভার করে বললো, 'না। অনেকবার প্রশ্ন করেছি,ভাইয়ার সাথে কী হয়েছে? মুখে,গলায় কীসের দাগ? আপা উত্তর দেয়নি। আপার মুখের উপর কথা বলার সাহসও হয়নি।'

মৃদুল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কিছু একটা তো হইছেই।'

আচমকা মনে পড়েছে এমনভাবে পূর্ণা বললো, 'তবে আমি ঘুমের ভান ধরে ছিলাম। তখন টের পেয়েছি আপা নীরবে কাঁদছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আপার জন্য। আপার কীসের কষ্ট না জানা অবধি আমি শান্তি পাবো না।'

'আমির ভাইয়ের সাথে কিছু হইছে।'

'ভাইয়ার দেখা পেলেই হতো।'বললো পূর্ণা। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। তারপর আবার বললো, 'কাল লিখন ভাইয়ের খবর এনে দিতে পারবেন?'

'পারব। চিন্তা কইরো না। লিখন ভাইয়া ঠিক হইয়া যাইব।'

পূর্ণা আর কিছু বললো না। সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলো। মৃদুল বললো, 'রাতের আকাশ তোমার কেমন লাগে?'

পূর্ণা খোশ মেজাজে জবাব দিল, 'অনেক ভালো লাগে! আমার আম্মা,আপা,প্রেমা সবাই জ্যোৎস্না রাত পছন্দ করে। আমাদের অনেক মুহূর্ত আছে জ্যোৎস্না রাত নিয়ে। আপনার কেমন লাগে?'

মৃদুল হাসলো। তারপর বললো, 'রাতের আকাশ কুনোদিন(কোনদিন) আমার দেখার ইচ্ছা হয় নাই। এমনি রাইতে বার হইলে বার হইতাম। আকাশ দেখার লাইগগা বার হইতাম না। প্রথম তোমার সাথে দেখতে আইলাম।'

পূর্ণা মৃদুলের দিকে তাকালো। তারপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এত্ত সুন্দর মানুষের পাশে আমার মতো কালো মানুষকে দেখে চাঁদ কী লজ্জা পাচ্ছে না?'

মৃদুল বললো, 'চান্দের কীসের এত্ত দেমাগ যে,পূর্ণার গায়ের রঙ নিয়া লজ্জা পাইবো?'

পূর্ণা ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকালো। জ্যোৎস্নার রূপ-মাধুরী নিজ চোখে অবলোকন করার সৌভাগ্য পূর্ণার বহুবার হয়েছে। কিন্তু আজকের সময়টা অন্যরকম লাগছে। মায়াবী এক অনুভূতি সর্বাঙ্গে শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। মৃদুল বললো, 'বইসা কথা বলি।'

'কোথায় বসবো? ছাদ তো কুয়াশায় ভেজা।'

মৃদুল চট করে তার লুঙ্গি খুললো। পূর্ণা শুরুতে চমকে যায়। পরে দেখলো,মৃদুলের পরনে প্যান্ট আছে! মৃদুল তার লুঙ্গি ছাদের মেঝেতে বিছিয়ে বললো, 'বইসা পড়ো।'

পূর্ণা মনে মনে,আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বলে লুঙ্গির উপর বসলো। কিছুটা দূরত্ব রেখে মৃদুল বসলো। বললো, 'প্যান্টের উপর লুঙ্গি পরার সুবিধা হইলো এইডা। যেকোনো দরকারে কামে লাগে। একবার টুপি ছাড়া রাইতে মাছ ধরতে গেছিলাম। ঠান্ডা বাতাসে মাথা সেকি বেদনা! এরপর করলাম কী...."

পূর্ণা বাঁধা দিয়ে বললো, 'লুঙ্গি দিয়ে টুপি বানিয়েছেন তাই তো?'

মৃদুল গর্বের সাথে বললো, 'হ। উপস্থিতি বুদ্ধি এইডা।'

পূর্ণা হাসলো। মৃদুল অনেক রাগী,অহংকারী। তবুও সে মুগ্ধ করার মতো একটা মানুষ। সবসময় ঠোঁটে হাসি থাকে। এই মুহূর্তে রেগে, ওই মুহূর্তে সব ভুলে যায়। পূর্ণা ছাদের মেঝেতে তাকালো। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় ছাদের মেঝেতে থাকা শিশির চকচক করছে। স্বচ্ছ রূপালি ঝরনার মতো চাঁদের আলো যেন চারপাশ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! কুয়াশা ভেদ করে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে বারংবার। দুজনের মাঝে পিনপতন নিরবতা নেমে আসে । নিরবতা ভেঙে মৃদুল ডাকলো, 'পূর্ণা?'

'হু।'

'আমার কাঁনতে ইচ্ছা হইতাছে।'

পূর্ণা হৃদয় কেঁপে উঠলো। সে মৃদুলের দিকে মুখ করে বসলো। বললো, 'কেন?'

'জানি না। আমি যখন যেইডা চাইছি, পাইছি। এই প্রথম কিছু পাইতে গিয়া ভয় করতাছে।'

'কী সেটা?'

মৃদুল সরাসরি পূর্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমারে! তোমারে পূর্ণা।'

নিস্তব্ধ প্রহরে, জ্যোৎস্নাময় রাতে একাকী দুজনের মাঝে প্রেমিক যখন বিভ্রম নিয়ে উচ্চারণ করে ভালোবাসার কথা প্রেমিকার হৃদয়ে কী হয়? জানে না পূর্ণা। তবে তার বেলা সে দমবন্ধকর এক অনুভূতির স্বাদ পেয়েছে। সব পাখপাখালি তাদের নীড়ে ঘুমাচ্ছে শীতে। শুধু পেঁচারা জেগে আছে। থেমে থেমে তারা ডাকছে। কনকনে শীতল হাওয়া বইছে। পূর্ণা মৃদুলের এক হাত ধরে বললো, 'আপা সবসময় বলে, ভাগ্যে যা আছে তাই হয়। আল্লাহ কপালে যা লিখে রাখেন তাই হয়। তাই চিন্তা করবেন না।'

'তুমি আপনি করে আর কথা কইবা না। তুমি কইবা।'

পূর্ণা চট করে অন্যদিকে ফিরলো। বললো, 'পারব না।'

'যা কইছি হুনো। নইলে কিন্তু?'

'কী করবেন?'

'ছাদ থাইকা ঝাঁপ দিয়া মইরা যামু।'

পূর্ণা ভ্রু কুঁচকাল। বললো, 'এসব কী কথা?'

'দেখাইতাম ঝাঁপ দিয়া?'

মৃদুল গুরুতর ভঙ্গিতে কথা বলছে। এই ছেলে দেখানোর জন্য ঝাঁপ দিয়ে দিতেও পারে! পূর্ণা বললো, 'আচ্ছা থাক,লাগবে না। আমি তুমিই বলবো।'

মৃদুল হেসে বললো, 'তাইলে কও।'

'কী বলব?'

'তুমি।'

'তুমি।'

মৃদুল হাসলো। হাসলো পূর্ণাও। আকাশের বিশাল উজ্জ্বল চাঁদটি আর তার সাথি তারাদের নিয়ে পূর্ণা,মৃদুলের প্রেমকথন চলে সারারাত। দুজন মুঠো,মুঠো চাঁদের আলোকে স্বাক্ষী রেখে কাটিয়ে দেয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত। দিনে একটা অঘটন ঘটে যাওয়ার পরও প্রকৃতি তাদের মনেপ্রাণে প্রেম নিয়ে আসে গোপনে। এ যেন কোনোকিছুর ইঙ্গিত! নয়তো অসময়ে কেন এমন সু-সময় দেখা দিল?

কাকডাকা ভোরে আমির হাওলাদার বাড়িতে পা রাখলো। সে সবেমাত্রই ফিরেছে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে নতুন বোঝা। যে বোঝা তাকে নুইয়ে রেখেছে। যখনি সে গোপন যুদ্ধে জয়ী হলো, দেখতে পেলো আলোর রেখা,তখনই সামনে

নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকারের দেয়াল। সুখ নামক বস্তুটি নিমিষে আড়াল হয়ে গেল। এই পৃথিবী যেন তার বিরুদ্ধে চলছে। সে অনুভব করছে,এই পৃথিবী আর তার নয়। বিষের বাতাস ছড়িয়ে আছে চারদিকে। পায়ের নিচের জমিন আর তাকে চায় না। শত,শত অভিশাপের বুলি কানে বাজে। অভিশাপগুলোকে তো সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাহলে তারা জীবনে ফিরে এলো কী করে? আমির জানে না। লতিফা অন্দরমহলের দরজা খুলে,আমিরকে দেখতে পেল। আমির লতিফাকে দেখে মাথা উঁচু করে। ঢোক গিলে বললো, 'ভাত আছে? ঠান্ডা হলেও চলবে।'

লতিফার শরীর কেঁপে উঠে। আমিরের এরকমভাবে ভাত খোঁজাতে সে কেন যেন চমকে যায়! আমিরকে সে যমের মতো ভয় পায়। তাই কোনো প্রশ্ন করলো না। লতিফা অস্থির হয়ে পড়ল। বললো, 'আনতাছি আমি। আনতাছি।'

সৌভাগ্যক্রমে আমিরের ভাগ্যে গরম ভাতই জুটে। ফজরের আযানের সাথে সাথে লতিফা রান্না বসিয়েছিল। ভাতের পাতিল নামিয়েই আমিরকে ভাত দিয়েছে। আমির প্রথম লোকমা মুখে দেয়ার পূর্বে লতিফাকে প্রশ্ন করলো, 'পদ্মজা ভালো আছে?'

লতিফা গতকালের ঘটনা বলতে গিয়েও বললো না। বললো, 'হ,ভালা আছে।'

আমির গাপুসগুপুস করে ভাত খেলো। সারা রাত্রি সে শীতবস্ত্র ছাড়া ছিল। ফলে শরীর মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। তাই সদ্য রান্না হওয়া গরম ভাত খুব উপভোগ করে খেয়েছে। খাওয়া শেষে ২য় তলায় উঠলো। পদ্মজা কোরআান শরীফ পড়ছে। তার মধুর সুর মনপ্রাণ জুড়িয়ে দেয়ার মতো। আমির ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ঘরে ঢুকে পদ্মজার দিকে তাকালো না। আলমারি খুলে জ্যাকেট,মোজা,টুপি বের করলো। পদ্মজা আড়চোখে আমিরকে দেখে,পড়ায় মনোযোগ দিল। আমির তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির কাছে এসে আবারও থম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি রয়ে যায় পদ্মজার ঘরের সামনে।

পাতালঘরের এওয়ানে রিদওয়ান শুয়ে ছিল। তার সাথে একজন সুন্দরী নারী। দুজনের অপ্রীতিকর অবস্থা। হঠাৎ আমিরের আগমনে রিদওয়ান চমকে যায়। তারপর হেসে আমিরকে বললো, 'সব ঠিক আছে?'

আমির এক হাতে কপাল চেপে ধরলো। তারপর সেই নারীর উদ্দেশ্যে বললো, 'এই শালী,শরীর ঢাক।'

আমিরের কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা। অশুভ সুন্দরী নারীটি দ্রুত চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। রিদওয়ান বললো, 'ওরে বকতাছস কেন?'

আমির একটা খাম রিদওয়ানের মুখের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর এটুতে চলে গেল।

পর্ব ৮০

পদ্মজা রান্নাঘরে জুলেখাবানুকে দেখে অবাক হলো। অচেনা হলেও সালাম দিল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

জুলেখা তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকালেন। অবহেলার স্বরে বললেন, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

রিনু ছিল রান্নাঘরে। পদ্মজা রিনুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় প্রশ্ন করলো, অচেনা মহিলাটি কে? রিনু হেসে বললো, 'মৃদুল ভাইজানের আম্মা।'

পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটলো। জুলেখার দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললো, 'দুঃখিত! চিনতে পারিনি। আপনি প্লেট ধুচ্ছেন কেন? রাখুন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'

জুলেখা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি চুপচাপ প্লেট ধুয়ে, চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। মুখের প্রতিক্রিয়াতে পদ্মজার প্রতি ছিল অবজ্ঞা,ঘৃণা। পদ্মজা মনে মনে আহত হয়। জুলেখার দৃষ্টি ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়ার মতো ছিল। পদ্মজা জুলেখার যাওয়ার পানে চেয়ে রইলো। রিনু পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমার মনডা কয়,এই বেডির উপর জিনের আছড় আছে!'

পদ্মজা রিনুর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকালো। বললো, 'উনি আমাদের বাড়ির মেহমান! মুখে লাগাম দাও রিনু। পূর্ণার জন্য খাবার নিতে পারবো?'

লতিফা শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘরে ঢুকলো। পদ্মজার প্রশ্নের জবাবে বললো, 'হ পদ্ম, নিতে পারবা। খাড়াও আমি দিতাছি। তুমি খাইবা কখন?'

'পূর্ণা আর আমার খাবার একসাথেই দিয়ে দাও বুবু।'

'দিতাছি। রিনু জলদি ওই বাডিডা(বাটি) দে।'

রিনুর বদলে পদ্মজা এগিয়ে দিলো। খাবার নিয়ে উপরে যাওয়ার সময় পদ্মজাকে দেখে জুলেখা হাতের গ্লাস শব্দ করে টেবিলে রাখলেন। পদ্মজা বুঝতে পারে,জুলেখার ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ! বোধহয় গতকালের অপবাদ তিনি শুনেছেন। পদ্মজার ভয় হয়। পূর্ণার বিয়েটা হবে তো? জুলেখাকে দেখে মনে হচ্ছে,বিয়ের কথা বলার অবস্থাতেও তিনি নেই। জুলেখার কপাল আর ভ্রুযুগলে পদ্মজার চোখ আটকে যায়। যেন হেমলতার কপাল আর ভ্রু দেখছে সে। হুবহু একরকম! পদ্মজার বুকটা হুহু করে উঠে। সে দুই চোখ মেলে জুলেখার কপালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন জন্ম জন্মান্তরের দুঃখ। পদ্মজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলেখা উঠে চলে যান। পদ্মজার সম্বিৎ ফিরলো। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় চলে আসে। পূর্ণা দুই হাতে একটা বালিশ জড়িয়ে ধরে পরম আবেশে ঘুমাচ্ছে। জুলেখার কপাল,ভ্রু দেখে জেগে উঠা ব্যথা পূর্ণাকে দেখে আরো বেড়ে যায়। হেমলতার যৌবনকাল পূর্ণার বর্তমান রূপের প্রতিচ্ছবি। সেই মুখ,সেই ঠোঁট,সেই গাল। নাকের পাটা মসৃণ। এতো মিল দুজনের! পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত রেখে হেমলতার কথা ভাবে।পুরনো স্মৃতিগুলো চোখের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। পদ্মজা পূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলো, 'আম্মা।'

তার দুই চোখ জলে ভরে উঠে। পূর্ণা কী কখনো জানবে? পদ্মজা পূর্ণার ঘুমন্ত মুখ দেখে বহুবার আম্মা বলে কেঁদেছে! সে মনকে বুঝিয়েছে, এইতো আম্মা আছে! আমার সামনেই আছে! আমি এতিম নই!

পদ্মজা হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছলো। পূর্ণা এতো আরাম করে ঘুমাচ্ছে যে পদ্মজার ঘুম ভাঙাতে মায়া হচ্ছে। কিন্তু বেলা করে খাওয়া তার একদম পছন্দ না। খেয়ে না হয় আরো ঘুমানো যাবে। পদ্মজা পূর্ণার চোখেমুখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে ডাকলো, 'পূর্ণা? পূর্ণা? এই পূর্ণা?'

পূর্ণা ধীরে,ধীরে চোখ খুললো। পদ্মজা বললো, 'সূর্য কখন উঠেছে খবর আছে? নামাযের তো নামগন্ধও নেই। যা দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজলো। সে ঘুমে বিভোর। পদ্মজা আবার ডাকলো। জোর করে তুলে কলপাড়ে পাঠালো। পূর্ণা ঘুমিয়ে,ঘুমিয়ে কলপাড়ে গেল। ফিরে এলো সতেজ হয়ে। ঘরে প্রবেশ করেই সোজা লেপের ভেতর ঢুকে পড়লো। পদ্মজাকে আহ্লাদী স্বরে বললো, 'খাইয়ে দাও আপা।'

পদ্মজা বিনাবাক্যে খাইয়ে দিল। পূর্ণা না বললেও খাইয়ে দিত। খাওয়ার মাঝে পূর্ণা কথা বলতে চেয়েছিল। পদ্মজা নিষেধ করে। খাওয়ার মাঝে কথা বলা ভালো না বলে চুপ করিয়ে দেয়। খাওয়া শেষে পদ্মজা বললো, 'শেষরাতে কোথা থেকে ফিরছিলি?'

পূর্ণা চোখ বড়বড় করে তাকায়। তার হেঁচকি উঠে যায়। পদ্মজা পানি এগিয়ে দিল। তাকিয়ে রইলো সরু চোখে। পূর্ণা পানি পান করে মিনমিনিয়ে বললো, 'আর যাব না।'

পদ্মজা গুরুজনদের মতো বললো, 'বাড়তি কথা না বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া বাধ্যতা।'

পূর্ণা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে নতজানু হয়ে বললো, 'মৃদুল যে... উনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'সে ডেকেছিল?'

'হু।'

'আর তুইও চলে গেলি?'

পূর্ণার মনে হচ্ছে সে ফাঁসির দঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে ঝুলে যাবে। পদ্মজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের দুই দিকে জানালা আছে। পূর্ব দিকের জানালা খোলা। উত্তর দিকেরটা বন্ধ। সে উত্তর দিকের জানালা খুলতে খুলতে বললো, 'বিয়ের আগে মাঝরাতে দেখা করা কী ঠিক হলো? মৃদুল এখনো পর-পুরুষ। বিয়েও ঠিক হয়নি। যখন এসে শুয়েছিস তখন টের পেয়েছি। তার আগে টের পেলে কানে ধরে ঘরে নিয়ে আসতাম।'

পূর্ণা অপরাধী কণ্ঠে বললো, 'আপা,আর যাব না। ক্ষমা করে দাও।'

পদ্মজা পূর্ণার পাশে এসে বসে। পূর্ণার হাতের উপর নিজের এক হাত রেখে বললো, 'বিয়ের পর আমার বোনের জীবনে হাজার জ্যোৎস্না আসুক।'

পূর্ণা তার অন্য হাত পদ্মজার হাতের উপর রাখলো। তারপর পদ্মজার চোখের দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'আপা।'

'কী?'

'তোমাকে কে মেরেছে? কেন মেরেছে? তুমি রাতে কেন কেঁদেছো?'

পদ্মজা তার হাত সরিয়ে নেয়। চোখমুখে কাঠিন্য ভাব চলে আসে। কণ্ঠে গাম্ভীর্যতা রেখে পদ্মজা বললো, 'প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলাম।'

পূর্ণা চোখ নামিয়ে বললো, 'আপা,আমি জানতে চাই।'

পদ্মজা দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'বাড়ি ফিরে যা। মৃদুলের আম্মা-আব্বা আসছে। যখন তোকে প্রয়োজন হবে ডেকে পাঠাব। তার আগে যেন এই বাড়ির আশেপাশেও না দেখি।'

পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। পূর্ণা তার পায়ের উপর থেকে দ্রুত লেপ সরাল। তারপর দৌড়ে পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়াল। অনুরোধ করে বললো, 'আপা,আপা দোহাই লাগে বলো। আমি তোমার সব কথা শুনি। কিন্তু এইটা শোনা সম্ভব হচ্ছে না।'

'পূর্ণা!'

পূর্ণা আচমকা পদ্মজার দুই পা জড়িয়ে ধরলো। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'আপা,পায়ে পড়ছি আমাকে সব বলো। তোমার গালের ক্ষত,গলার দাগ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি শান্তি পাচ্ছি না। কে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে? কে এতোবড় দুঃসাহস দেখিয়েছে? আমি তার কলিজা ছিঁড়বো।'

পূর্ণার চোখের জল পদ্মজার পায়ে পড়ে। পদ্মজা পূর্ণাকে টেনে তুললো। পূর্ণার কাজল নয়ন দুটি জলে টুইটুম্বুর। যেন স্বচ্ছ কালো জলের পুকুর।

পদ্মজা পূর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে বললো, 'কাঁদুনি।'

পূর্ণা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজার শরীরে সে মা,মা গন্ধ খুঁজে পায়। সেই ছোটবেলা থেকেই পদ্মজা তার জীবন,তার আনন্দ। পদ্মজার গলার কালসিটে দাগটা যেন তারই বুকের আঘাত। রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। পদ্মজা পূর্ণাকে অপেক্ষা করতে বলে,নিজের ঘরে যায়। আলমগীরের দেয়া খাম নিয়ে ফিরে আসে। দরজা বন্ধ করে পূর্ণাকে নিয়ে বিছানার উপর বসলো। এরপর বললো, 'আমি জানি,আমার বোন বড় হয়েছে। সেই সাথে ধৈর্য্য,জ্ঞানও বেড়েছে। আমি একটা কারণেই তোকে সব জানাব,যাতে সাবধান থাকতে পারিস। আমি চাই , সব জানার পর তুই নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিবি না। আমি যেভাবে বলবো,সেভাবে চলবি। রাজি?'

পূর্ণা বুঝতে পারছে সে ভয়াবহ কিছু জানতে চলেছে। উত্তেজনায় তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়েছে। পূর্ণা বললো, 'রাজি।'

পদ্মজা হাতের খামটা পূর্ণার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তিনটে চিঠি আছে। তিনটাই আলমগীর ভাইয়ার লেখা। আমি গতকাল পড়েছি। মন দিয়ে পড়বি। অনেক কিছু জানতে পারবি। আর যতটুকু বাকি আছে আমি বলব।'

পূর্ণা প্রবল আগ্রহ নিয়ে খাম খুলে তিনটে চিঠি বের করলো। পদ্মজার কথামতো প্রথম একটা চিঠির ভাঁজ খুললো।

বোন পদ্মজা,

সালাম নিও। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। সেদিনের রাতে তোমার আগমন আমার জীবনে নিয়ে এসেছে আনন্দ। পৌঁছে দিয়েছে আলোর জগতে। যে জগতে বাঁচার জন্য পিছনের প্রতিটি মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রণায় কাটিয়েছি। জানি না এতো পাপ করার পরও করুণাময় কেন আমার প্রতি এতো উদার হলেন! তিনি চেয়েছিলেন বলেই, তুমি ফেরেশতার মতো হাজির হয়েছিলে। বাঁচিয়েছিলে আমাকে আর রুম্পাকে। যখন তুমি এই চিঠি পড়ছো,তখন তোমার অবস্থা কী আমি জানি না। হয়তো সব জেনে গিয়েছো নয়তো এখনো অন্ধকারে ডুবে আছো। যদি অন্ধকারে ডুবে থাকো তাহলে আমি তোমাকে আলোর সন্ধান দেব। সব জানার পর সিদ্ধান্ত তোমার। চিঠিটা বোধহয় বড় হয়ে যাবে। এক পৃষ্ঠাতে হবে না। ধৈর্য্য ধরে সবটুকু পড়ো। আমি তোমাকে একটা তিক্ত দীর্ঘ গল্প শোনাবো। গল্পটার কেন্দ্রবিন্দু আমির হলেও জড়িয়ে আছি অনেকেই।

যখন আমিরের জন্ম হয় কাকি আম্মার পর সবচেয়ে বেশি খুশি হই আমি। কাকি আম্মা বড় দুঃখী ছিলেন। কাকা মারধর করতেন খুব। নিজ চোখে কাকি আম্মাকে বিবস্ত্র করে মারতে দেখেছি। আমার ছোট মন লজ্জায় মিইয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। কিন্তু কাকা বা আব্বা কাউকে একটুও মায়া দেখাতে দেখিনি,লজ্জা পেতে দেখেনি। তাদের চোখেমুখে সর্বক্ষণ হিংস্রতা ছিল। আমি খুব ভয় পেতাম আব্বাকে। ভীতু ছিলাম। আমার কাছে আমার আব্বা,কাকাই ছিল ভূত,রাক্ষস। আমার আম্মা সবসময় পাথরের মতো নিশ্চুপ। তার অনুভূতি অসাড়। কাকি আম্মা ছিলেন আমার মা। তিনি বহুবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা ছেলের জন্য আক্ষেপ করেছেন। কাকি আম্মা বলতেন,সেই ছেলে এসে নাকি কাকি আম্মার সব দুঃখ ঘুচে দিবে। যখন সেই ছেলেটা এলো আমি অনেক খুশি হই। এবার বুঝি কাকি আম্মার কষ্ট কমবে। কাকি আম্মা বলেছিলেন, আমির হবে পুলিশ। সব অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবে আর আমি হবো শিক্ষক। শুধু কাকি আম্মার না আমারও ইচ্ছে ছিল আমি শিক্ষক হবো। ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াবো। সব বাচ্চাদের আদর্শ হবো। সবাই দেখে সালাম দিবে,সম্মান করবে। সারাক্ষণ হাতে একটা বই নিয়ে হাঁটবো। এই স্বপ্ন নিয়েই পড়তে থাকি স্কুলে। এর মাঝে আব্বা একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে। বলে, সে নাকি আমাদের আরেক ভাই। তার নাম রাখে রিদওয়ান। আমরা চার ভাই হয়ে যাই। আমি,জাফর,রিদওয়ান,আমির একসাথে এক স্কুলে পড়েছি। রিদওয়ান,আমির এক শ্রেণির

ছিল। ছোট থেকেই আমিরের শরীরে ছিল অবাক করার মতো শক্তি। ওর মেধা ছিল ধারালো। আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম,আমির পুলিশ হবে। অনেক বড় পুলিশ হবে। পুরো দেশ চিনবে। ঠিক তখনই আমাকে আর জাফরকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় অভিশপ্ত এক কালো জীবনের সামনে। যে জীবনে টাকা, নারী আর রক্তের খেলা চলে। আমাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়,নারী হচ্ছে ভোগের বস্তু। পাতালঘরে বনেদি ঘরের দুই-তিনজন পুরুষের দেখাও মিলে। তারা দুজন নারীকে আমাদের সামনে কুৎসিত ভাবে আঘাত করে। আব্বা,কাকা উপভোগ করে সেই দৃশ্য। সেই অসহায় দুই নারীর চিৎকারে কলিজা ছিঁড়ে যায় আমার। আব্বা আর কাকার পায়ে পড়েছি যাতে তাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু ছাড়েনি। রক্ত দেখে জাফর জ্ঞান হারায়। ও রক্ত সহ্য করতে পারতো না। রক্তে খুব ভয় ছিল জাফরের। একটা তেরো বছরের মেয়েকে বাঁধা অবস্থায় আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। আব্বা আমাকে বুঝায়,মেয়েটার সাথে কী করতে হবে! জানতে পারি, বাড়ির পিছনে জঙ্গলে অবস্থিত এই পাতালঘর অনেক বছরের পুরনো। আমাদের বংশের প্রতিটি পুরুষের একমাত্র পেশা পতিতাবৃত্তি ও নারী ধর্ষণ। আমাদের অঢেল সম্পদ পতিতাবৃত্তির টাকায় করা। নারী বিক্রির টাকায় করা! একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে অভ্যস্ত করে দেওয়া হয় এই পথে। ঘৃণায় বমি করেছি অনেকবার। ধর্ষণের পর কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হতো মেয়েগুলোকে। আমার জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ।

তবে ঘরে ফিরে শান্তি লাগতো। আমির ছিল সেখানে। আমিরের দুষ্টুমি আমাকে খুব হাসাতো। আমিরের একটা দোষ ছিল,ও রিদওয়ানকে খুব অত্যাচার করতো। দুজনের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। সে যাই হোক, আমিরের সঙ্গ ছিল শান্তির! ওর চঞ্চলতা,সাহসিকতা ছিল মুগ্ধ করার মতো। আমার সেই শান্তিও একদিন নষ্ট হয়ে যায়। যেদিন নানাবাড়ি থেকে ফিরে পাতালঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান আর আমিরের উপস্থিতি দেখি! আমির তখন পুরোদমে পনেরো বছরের একটা মেয়েকে পেটাচ্ছিল! আমিরের চোখেমুখের হিংস্রতা আমাকে অবাক করে দেয়। আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না,আমার প্রিয় ভাইয়ের এই রূপ! এই জীবন!

এর পরের কথাগুলো তোমার জন্য খুব কষ্টের হবে পদ্মজা। দয়া করে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পড়া শুরু করো।

———

পূর্ণা থামে। তার শরীর কাঁপছে। অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। সে ছলছল চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। তার চোখে খুব ভয়,ঘৃণা। সে স্পষ্ট স্বরে উন্মাদের মতো ডাকলো, 'আপা... এই আপা।'

পদ্মজা পূর্ণার এক হাত শক্ত করে ধরলো। বললো, 'ভাইয়া আমাকে যা বলেছেন,তাই কর। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নে।'

পূর্ণার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার মাথা ভনভন করছে। শরীর যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। সে পদ্মজার এক হাত শক্ত করে ধরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। বুকে অপ্রতিরোধ্য তুফান বয়ে যাচ্ছে! আমির তার কাছে আপন বড় ভাই। সম্মানীয় বড় ভাই! এই ব্যথা সহ্য করতে পারবে না সে। পুরো শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।

পদ্মজা পূর্ণার মনের অবস্থা টের পাচ্ছে। তার মতো সহ্যশক্তি নেই পূর্ণার। পদ্মজা পূর্ণার হাতের পিঠে চুমু খেয়ে বললো, 'মন এতো দূর্বল হলে কি চলে?'

পূর্ণা পদ্মজার দিকে তাকালো। পদ্মজা চোখের ইশারায় বাকিটুকু পড়তে বলে। পূর্ণা এক হাতের তালু দিয়ে চোখের জল মুছে পড়া শুরু করলো-

---

আমাদের দাদুর সঙ্গ পেয়ে আমির ছোট থেকেই নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়েছে। কাকার কথায় দাদু আমিরকে আলাদা করে সময় দিতেন। আমির কাকার বড় শিকার ছিল। আমিরের চাল-চলন ছিল অন্যরকম। তাকে ছোট থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে,মেয়েরা ভোগের বস্তু। শিখিয়েছে টাকার ক্ষমতা আর পৈশাচিক আনন্দ কেমন! দাদু শুরু থেকে সব জানেন। তিনি কাকা আর আব্বাকে উৎসাহিত করতেন। আমাদের দাদাকেও সাহায্য করেছেন। দাদুর সোনার অলংকারের প্রতি দূর্বলতা ছিল খুব। এই দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আমার দাদা,আব্বা,কাকা দাদুকে ব্যবহার করেছেন। দাদুর সাথে দাদুর এক বোনও ছিল। দাদুর বোন বলতে আপন নয়,পরিচিত। দুজন নারী মিলে সহযোগিতা করে এসেছে বছরের পর বছর। আমির নারীর শরীর ভোগ করার চেয়ে , আঘাত করতে পছন্দ করতো। প্রথম তিন বছর সে কোনো মেয়ের সাথে জোরপূর্বক মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেনি। সবসময় প্রতিটি মেয়ের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগতো। কিন্তু একসময় অভ্যস্ত হওয়ার সাথে উপভোগ করতে থাকি। আমিরের যখন আঠারো বয়স তখন থেকে সে যৌনতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। পাশের গ্রামের এক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। মেয়েটা দেখতে মিষ্টি ছিল। আমিরকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে নিজের ইজ্জত সঁপে দিয়েছিল, বিনিময়ে এরপরদিন লাশ হয়ে নদীর ঢেউয়ে ভেসে যেতে হয়েছে! আমিরের নারী আসক্তি তীব্র হয়ে উঠে। কিন্তু জোরপূর্বক কিছু করতে সে নারাজ। বেছে নেয় ছলনার পথ,প্রতারণার পথ। কতগুলো মেয়েকে সে ঠকিয়ে ভোগ করেছে তার হিসেব নেই আমার কাছে। ঢাকায় পড়তে গিয়ে কারো মাধ্যমে নারী পাচারের সাথে যুক্ত হয়। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। টাকার পাহাড় গড়ে উঠে। পদ্মজা,তোমার খারাপ লাগবে। তাও বলতে হচ্ছে, তুমি যেমন আমিরের জীবনের প্রথম মেয়ে নও তেমন বউও নও! শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী এক মেয়েকে আমির বিয়ে করেছিল। সেই মেয়েটি নিঃসন্দেহে রূপসী ছিল। সে বিয়ের পূর্বে শারিরীক সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না বলে আমির তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি তার পরিবারে না জানিয়ে আমিরকে বিয়ে করে। এক সপ্তাহ পর মেয়েটি যখন আমিরের কাছে তিক্ত হয়ে উঠে, তখন মৃত্যু মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ায়! মেয়েটির পরিবারের কেউ জানতেও পারেনি,তাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছিল! আর সে স্বামীর হাতেই মারা গিয়েছে! আমির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে তখনই ঠান্ডা মাথায় পুরো ঘটনার চিহ্ন মুছে দেয়। এটাই কিন্তু ওর একটা বিয়ে নয়। আমির আরেকটা বিয়েও করেছিল। ভিন্ন ধর্মের এক সুন্দরী মেয়েকে। তার বেলায়ও হুবুহু ঘটনা ঘটে। সে মেয়ের মৃত্যু আমি নিজচোখে দেখেছি। কিন্তু কিছু বলিনি। বলতে ইচ্ছে হয়নি! মন বলতে কিছু ছিল না তখন। মেয়েটা মৃত্যুর পূর্বে অবাক হয়ে দেখছিল আমিরকে। সে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিল না,যাকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছে সে তাকে খুন করছে! আমির কিন্তু খুন করার ঘন্টাখানেক পরই অন্য মেয়ের সাথে সময় কাটিয়েছে! আমিরের বাড়ি-গাড়ি সব হয়। যেকোনো নারী আমিরকে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিত নির্দ্বিধায়। আমির দেখতে একটু শ্যামলা হলেও ওর কথাবার্তা, চাল-চলন, চাহনি ছিল আকর্ষণ করার মতো। যতগুলো মেয়ে আমিরকে ভালোবেসেছে বেশিরভাগই আমিরের থুতুনির কাটা দাগটা দেখে প্রেমে পড়েছে। আমির সম্পর্কিত আর কিছু বলার নেই। এইটুকুতেই তুমি আমিরের স্থান বুঝে যাবে। তোমার স্বামী

একা খারাপ এই কথা বলার মুখ নেই আমার। আমি কিছু কম করিনি!

তবে আমির কাকির ব্যাপারে ছিল দূর্বল। তার সব সাবধানতা ছিল কাকিকে নিয়ে! কাকি যেন কিছু জানতে না পারেন। আমির ঢাকা থাকার কারণে,কাকি কখনো সন্দেহও করেননি। তার আগে সন্দেহ করেছিলেন কিন্তু প্রমাণ পাননি। যেদিন কাকি তোমাকে আর আমিরকে তোমাদের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলেন। সেদিন তোমরা আসার পর রাতে কাকি জানতে পারেন আমির অনেক আগে থেকে কাকার সাথে কাজ করছে। এমনকি ঢাকা এই কাজই করে। আমির কাকার সাথে ডিল নিয়ে আলোচনা করছিল। খুব চাপ ছিল মাথার উপর। চিন্তায় আমির অসতর্ক হয়ে যায়। কাকির ঘরেই কাকার সাথে নারী পাচারের বিষয়ক কথা বলছিল। আর কাকিও সব শুনে ফেলেন। তিনি খুব কাঁদেন। রাগে আমিরকে অনেকগুলো থাপ্পড় দেন। আমির কিছু বলেনি। চুপচাপ থাপ্পড় খেয়েছে। কাকি আমিরকে নিষেধ করেন, আমির আর যেন আম্মা না ডাকে। আর যেন দেখা না করে। আমির কাকিকে সামলানোর অনেক চেষ্টা করেছে। পারেনি। কাকির খুব কষ্ট হচ্ছিলো। ঘৃণায় আমিরের শার্ট টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন। কাকির নখের দাগ আমিরের পেটে-বুকে হয়তো এখনো আছে। কাকির বেঁচে থাকার সুতোটাই ছিঁড়ে যায়। সারা রাত্রি হাউমাউ করে কেঁদেছেন। অনেকবার কাকিকে স্বান্তনা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সাহস হয়নি। আমি নিজেই তো একটা নিকৃষ্ট মানব! আবার সেদিন রাতে তুমি রুম্পার সাথে ছিলে। রুম্পা যদি সব বলে দেয় তোমাকে সে ভয়ে আমির রিদওয়ানকে পাহারায় রেখেছিল। লতিফাকে দিয়ে খাবারে ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল। যাতে রুম্পা ঘুমিয়ে পড়ে। আমির অনেক ছলচাতুরী করেছে,তুমি যাতে কিছু না জানতে পারো।

আমার আর রুম্পাকে তুমি নতুন জীবন পেতে সহযোগিতা করেছো তাই তোমাকে আমাদের গল্পটাও বলতে চাই। জানি না আর কতদিন বাঁচব। পালিয়ে এসেছি! আমিরের হাত অনেক লম্বা। ওর আমাকে খুঁজে পেতে সময় লাগবে না। বরং অবাক হচ্ছি,এতদিনেও আমির আমাকে খুঁজে পায়নি কেন?

রুম্পাকে আমার জন্য কাকা পছন্দ করেছিলেন। বিয়ের প্রথম দিনই বুঝতে পারি,রুম্পা সরল সোজা একটা মেয়ে। রুম্পার সঙ্গ ছিল অনেক শান্তির। কখন যে ভালোবেসে ফেলি বুঝিনি। বিয়ের মাস কয়েক পর বৈশাখ মাসে আমি পাতালঘরে ছিলাম। আমার সামনে নগ্ন মেয়ে ছিল। তখন পাতালঘরের চারপাশেএতো নিরাপত্তা ছিল না। হুট করে দেখি রুম্পা চলে এসেছে। তারপরের দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠে। রুম্পাকে রিদওয়ান মারে,আব্বা মারে,কাকা মারে। আমি চুপচাপ মেনে নেই। কিন্তু খুব কষ্ট হতো। নিজের সাথে যুদ্ধ করেছি। নিজের প্রতি ঘৃণা হতো। স্বামী হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ লাগতো। রিদওয়ান আমার অজান্তে আমার ভালোবাসার বউকে ধর্ষণ করে। এই খবর ধর্ষণের এক সপ্তাহ পর শুনেছি। কিন্তু আমি এমনই কাপুরুষ যে রিদওয়ানকে মারতে গিয়ে উল্টো মার খেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছি! রুম্পা তেজি মেয়ে ছিল। ও রাগে বার বার বলেছে,পুলিশের কাছে যাবে। সব বলে দিবে। তাই রুম্পাকে মারার পরিকল্পনা করা হয়। আমি রুম্পার সাথে লুকিয়ে দেখা করি। ওর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। আর বলি,পাগলের ভান ধরে থাকতে। আমি মাঝে মাঝে দেখা করব। রুম্পা তেজি হলেও মৃত্যুকে ভয় পেতো খুব। পাগলের ভান ধরে থাকলে বাঁচতে পারবে এই কথা শুনে খুব কাঁদে। আর তাই করে। সে যে এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চায়! রুম্পার চিৎকার,চেঁচামেচি শুনে আব্বা,কাকা ধরে নেয় রুম্পার মাথা ঠিক নেই। তবে আমিরের দৃষ্টি ঈগলের মতো। প্রথম দেখাতেই বুঝতে পারে,রুম্পা পাগল নয়। মানসিক ভারসাম্যও হারায়নি। তাও কেন যেন কাউকে কিছু বলেনি! রুম্পা কিন্তু তখনো জানতো না আমির এই কাজে যুক্ত আছে। আমির আর রুম্পার সম্পর্ক ভাইবোনের মতো ছিল। আমির পরিবারের সাথে সবসময় সহজ-সরল থেকেছে। একদম সাধারণ একটা মানুষের মতো। শুরু হয় রুম্পার বন্দী জীবন আর আমার নিঃসঙ্গ রাত। একটা দিনও শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। কাপুরুষ শব্দটা সর্বক্ষণ খুঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখা করেছি।

বুঝতে পেরেছি,রুম্পাকে আমি খুব ভালোবাসি। আব্বা,চাচা আর ছোট ভাই আমির এই তিন জনের ভয়ে এক পাও বাড়ানোর সাহস হয়নি। একজন লোক আমাদের দল ছেড়ে পালিয়েছিল। বিনিময়ে তার নির্মম মৃত্যু হয়েছে। সে ভারত চলে গিয়েছিল। তাও আমির ধরে ফেলেছে! বলো তো পদ্মজা,এমন ঘটনা জানার পর আমার মতো কাপুরুষ আর কী ই বা করতো? ধিক্কার আমার নিজের জীবনকে! আমাকে তো কুকুরের খাবার হওয়া উচিত! রুম্পাকে তুমি ঢাকা নিয়ে যেতে চেয়েছিলে তাই আমির বাবলুকে আদেশ করে,রুম্পাকে খুন করতে। আমি এই খবর পেয়ে পালানোর কথা ভাবি। পথে বাবলু আটক করে তখন তুমি ফেরেশতার মতো হাজির হও। এই ঋণ শোধের উপায় আমার জানা নেই।

আর কী বলবো আমি? এখন সিদ্ধান্ত তোমার। তুমি কী করবে! আমিতো সব জানিয়ে দিয়েছি। কিছু কথা না জানালেই নয়। আমির আমার কাছে সবসময় স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু তুমি আসার পর আমি তাকে চিনতে পারি না। যখন তোমাদের বিয়ে হয় ভেবেই নিয়েছিলাম কয়দিন পর তোমার লাশও দেখতে হবে। কিন্তু সেটা হয়নি। উল্টা আমির পাল্টে যায়। চারিদিকে কঠোর নিরাপত্তা দেয়া হয়। গ্রাম থেকে ঢাকা ফিরেই সুন্দরী দুই মেয়েকে সঙ্গ দেয়ার কথা ছিল। এই দুই মেয়েকে হাতের মুঠোর আনতে আমিরের সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। সুযোগ পেয়েও আমির তাদের কাছে টানতে পারেনি। বছরখানেকে বুঝে যাই, আমির সত্যি তোমাকে ভালোবেসেছে! কোনো মেয়ের শরীর আর টানেনি আমিরকে। এ নিয়ে আব্বা,কাকার মাঝে অনেক কথা হয়েছে। আমির যদি সব ছেড়ে দেয়? আমার মনের কোণে আশা জাগে,আমির এবার আমার মতো অনুভব করবে। এই কালো জগতকে তার কালোই লাগবে। আমি নিজ চোখে দেখেছি,আমিরকে তোমার জন্য ছটফট করতে। তোমার অসুখ হলে সবকিছু ভুলে যেতো। তোমার চিন্তায় এক জায়গায় স্থির থাকতে পারতো না। এমনকি ঢাকার বাড়ি সহ আমাদের বাড়িটাও আমির তোমার নামে করে দিয়েছে। আমিরের যত সম্পদ আছে সব তোমার নামে করা। আমিরের কিন্তু নিজস্ব বলতে কিছু নেই। সে নিঃস্ব। এই খবর রিদওয়ান বা আব্বা,কাকা কেউ জানে না। কোনো কাক-পক্ষীও জানে না। চট্টগ্রাম সমুদ্রের কাছে তোমার জন্য একটা বাংলো বাড়ি বানাচ্ছে। বাড়ি বানানোর টাকা একত্রিশটা মেয়ে পাচার করার বিনিময়ে অগ্রিম নিয়েছিল। এখন সেই চাপ মাথায় নিয়ে ঘুরছে। হাতে সময় কম। কিন্তু মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না! আমার জানামতে, তুমি ধার্মিক ও পবিত্র একটা মেয়ে। তুমি এতকিছু জানার পর আমিরকে মেনে নিতে পারবে না। তোমার বিবেক তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে। আমি যা জানি সব বলেছি। আমির তোমাকে ভালোবাসে এই কথাটা কঠিন সত্য। তুমি যদি আমিরের কাছে তার দুই চোখ চাও সে তোমার সামনে ছুরি ধরে হাঁটুগেড়ে বসে বলবে নিয়ে নাও! ছয় বছরে আমিরের যে রূপ,তোমার প্রতি যে টান আমি দেখেছি তা থেকে আমার এটাই মনে হয়। আমির তোমাকে অন্ধের মতো ভালোবাসে। এমন মানুষের মনে এতো ভালোবাসা দেয়ার কোনো উদ্দেশ্য হয়তো সৃষ্টিকর্তার আছে। শুনেছি,সৃষ্টিকর্তার সব সৃষ্টি কোনো উদ্দেশ্যে করা। এখন সবটা তোমার সিদ্ধান্ত। আমি এইটুকুও মিথ্যে বলিনি। তুমি বুদ্ধিমতী একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বুঝতে পারবে। যে পদক্ষেপই নাও না কেন সাবধান থেকো। আমিরের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা পক্ষীও উড়ে যেতে পারে না।

রুম্পা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে। কখনো সুযোগ মিললে আমাদের আবার দেখা হবে। আমার মৃত্যু যেকোনো সময় হয়ে যেতে পারে। রুম্পাকে যদি আবার ওই বাড়িতে নেয়া হয় তুমি দেখে রেখো। আল্লাহ তোমার সাথে আছেন। আমার জন্য দোয়া করো। আল্লাহ আমার শাস্তি যেন রুম্পাকে না দেন। আমাকেই যেন দেন। আর আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি অনুতপ্ত। এতো বড় চিঠি লিখে অভ্যেস নেই। ভুল হলে ক্ষমা করো। ভালো থেকো বোন।

ইতি,
আলমগীর।

পূর্ণা দুই হাতে মাথা চেপে ধরে। কাঁদতে কাঁদতে তার বুক ভিজে গিয়েছে। সে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আপা। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

পদ্মজা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরলো। পূর্ণা পদ্মজার বুকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকলো। পদ্মজা তার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বলে। পূর্ণা দুই হাতে শক্ত করে ধরে পদ্মজাকে। তার প্রিয় বোনের এতো কষ্ট! সে সহ্য করতে পারছে না। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'ভাইয়া তোমার আগে আরো দুটো বিয়ে করেছে। এই ব্যথা কীভাবে সহ্য করেছো আপা?'

পদ্মজা কান্না আটকিয়ে রেখেছিল। এই কথা শুনে ভেতর থেকে কান্না আপনা আপনি চলে আসে। পূর্ণাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। একটা মানুষ খুঁজছিল সে,যাকে জড়িয়ে ধরে মনখুলে কাঁদা যাবে। আমির অত্যাচারী, হিংস্র,নারী ব্যবসায়ী এইটুকুর ব্যথাই সে হজম করতে পারেনি। চিঠি পড়ে যখন জানতে পারলো,আমির নারী আসক্ত ছিল। এমনকি বিয়েও করেছে। তখন ইচ্ছে হচ্ছিল,গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যেতে। ঠান্ডা মেঝেতে বসে হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদেছে। বার বার চোখে ভেসে উঠেছে আমিরের সাথে অনেক মেয়ের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। একজন স্ত্রীর জন্য এটা কতোটা বেদনাদায়ক হতে পারে,তার কোনো পরিমাপ নেই। পদ্মজা চোখের জল মুছলো। পূর্ণাকে সামনাসামনি বসিয়ে বললো, 'এখন কাঁদার সময় নয়। তোকে আমি সব জানিয়েছি,যাতে প্রেমাকে দেখে রাখতে পারিস। আর নিজেও সাবধানে থাকিস। আমি একটা ছুরি দেব। নিজের সাথে রাখবি। রিদওয়ানের নজর ভালো না। প্রেমার দায়িত্ব তোর। তোর বিয়ে দিয়ে দেব তিন-চারদিনের মধ্যেই।'

'আপা?'পূর্ণার কণ্ঠটা অদ্ভুত শোনায়। পদ্মজা তাকালো। পূর্ণা ঢোক গিলে নতজানু হয়ে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'ভাইয়ার কোনো ক্ষতি করো না আপা।'

কথা শেষ করেই জোরে কেঁদে উঠলো পূর্ণা। সে বুঝতে পারছে সে অন্যায় আবদার করেছে। পাপীর প্রতি মায়া দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিরকে সে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসে। আমির কখনো বড় ভাইয়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। মাথার উপরের ছাদ হয়ে থেকেছে। সবচেয়ে বড় কথা তার প্রিয় বোনের ভালোবাসার মানুষ আমির। কেউ না জানুক সে জানে,আমির ছাড়া পদ্মজা বেঁচে থেকেও মৃত। পদ্মজা তার মা হেমলতার মতো হয়েছে। সত্যকে,ন্যায়কে বেছে নিবে। ভালোবাসার সিন্দুকটা তালা মেরে রাখবে। তারপর কষ্টে ধুঁকে-ধুঁকে মরবে। পূর্ণার কথা শুনে পদ্মজা অবাক হয়ে উচ্চারণ করলো, 'পূর্ণা!'

পূর্ণা পদ্মজার কোলের উপর মাথা নত করে বললো, 'আপা,আমি খুব খারাপ। কিন্তু তোমার সুখ আমার কাছে সবচেয়ে বড়। ভাইয়া তোমাকে ভালো রাখবে। ভাইয়া তোমাকে ভালোবাসে। আগের সব ভুলে যাও। মাফ করে দাও। আমি জানি তুমি ভাইয়াকেও ছাড়বে না। ভাইয়ার কিছু করে ফেলবে। আপা,দোহাই লাগে। তোমার সুখ নষ্ট করো না।'

পদ্মজা আশ্চর্যের চরম পর্যায়ে অবস্থান করছে। পূর্ণা মাথা তুলে তাকায়। পদ্মজা প্রশ্ন করে, 'আর যে মেয়েগুলো অত্যাচারিত হয়েছে? যে মেয়েগুলো ঠকেছে? যে মেয়েগুলো যন্ত্রনায় ছটফট করে জীবন দিয়েছে? তাদের প্রতি অন্যায়ের শাস্তি কে দিবে?'

পূর্ণার সহজ উত্তর, 'তোমাকে তো কিছু করেনি। তোমাকে তো ভালো রাখবে।'

পদ্মজা নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। সে ভেবেছিল পূর্ণা ঘৃণায় আমিরকে খুন করতে চাইবে। খুন করতে চাইবে রিদওয়ান, খলিল আর মজিদকে। কিন্তু এ তো উল্টা সুর তুলছে! পদ্মজা গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে পূর্ণাকে থাপ্পড় দিল। পূর্ণা আকস্মিক ঘটনায় নিজেকে শক্ত রাখার সুযোগ পায়নি। বিছানা থেকে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে। পদ্মজার নাক লাল হয়ে গেছে। সে রাগে পূর্ণাকে বললো, 'ছিঃ! তুই আম্মার মেয়ে!'

পর্ব ৮২

পূর্ণা উত্তরে কিছু বললো না। সে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকলো। নাকের পানি,চোখের পানি মিলেমিশে একাকার। দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ। পদ্মজার রাগে দুঃখে কান্না পায়। বেসামাল ঘূর্ণিপাকে সে আটকে পড়েছে। প্রতিটি নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। কেউ নেই পাশে দাঁড়ানোর মতো। কেউ মাথা ছুঁয়ে দিয়ে বলে না, পাশে আছি! মন যা চায় করো। পদ্মজার ভেতরের ঝড়ের তাণ্ডব কেউ টের পাচ্ছে না। সবাই তার বিরুদ্ধে। সবাই!

পদ্মজা চিঠি ও খাম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পূর্ণা মৃদু আর্তনাদ করলো। সে কিছুতেই চিঠির লেখাগুলো আর পদ্মজার মুখে উচ্চারিত শব্দগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কাছে ভাইয়া নামক শব্দটির মানে আমির। তাৎক্ষণিক চোখের সামনে ভেসে উঠে একটা হাসিখুশি মুখ। আমিরের যে স্নেহ,ভালোবাসা এতদিন তাদের উপর চুইয়ে-চুইয়ে পড়েছে। সেই ভালোবাসায় খাদ থাকতে পারে না! পূর্ণা দেয়ালে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শরীরটা কেমন করছে! হাজারটা সূচ যেন বুকের ভেতরটা খোঁচাচ্ছে। সে তার আপার চোখেমুখে দেখেছে সীমাহীন কষ্ট! পূর্ণা দুই হাতে কপালের দুই পাশ চেপে ধরে পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করে, 'তুমি গতকাল রাতে এজন্যে কাঁদছিলে আপা! ভাইয়ার ভালোবাসার অভাব তোমাকে ছাই করে দিচ্ছে। তুমি পুড়ে যাচ্ছো। পুড়ে যাচ্ছো তুমি।'

পূর্ণা বিছানায় বসলো। সে অস্থির হয়ে আছে। জানালায় চোখ পড়তেই সে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখের সামনে দৃশ্যমান হয় বড় বড় গাছ। তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। না জানি কত মেয়ের কুরবানির সাক্ষী এই গাছেরা! পূর্ণা জানালার গ্রিলে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে। গাল বেয়ে টুপ করে জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। তার কেন এতো কষ্ট হচ্ছে সে জানে না। বড় ভাইয়ের সমতুল্য আমিরের এমন ভয়ংকর রূপের কথা জেনে নাকি তার বোন আর বোনের ভালোবাসার বিচ্ছেদের আশঙ্কায়! পূর্ণা দুই হাতে চোখের জল মুছে ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকলো। তারপর দ্রুতপায়ে ২য় তলায় পদ্মজার ঘরে যায়। পদ্মজা ঘরে নেই। নিচ তলায় হয়তো! পূর্ণা সোজা নিচ তলায় চলে আসে। সদর ঘরে জুলেখা রিনুর সাথে কথা বলছিল। তিনি ব্যাগও গুছাচ্ছেন। পূর্ণা মৃদুলের কাছে শুনেছে,মৃদুল তার মা-বাবাকে নিয়ে এসেছে। জুলেখা বানুর মুখের সাথে মৃদুলের মুখের মিল রয়েছে। পূর্ণা আন্দাজ করে নিল,তিনি মৃদুলের মা। পূর্ণা নতজানু হয়ে এগিয়ে আসে। জুলেখার পায়ে ছুঁয়ে সালাম করার জন্য ঝুঁকতেই জুলেখা পা সরিয়ে নিলেন। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'দূরে যাও।'

পূর্ণা মনে মনে আহত হয়। দূরে সরে দাঁড়ায়। চোখের কার্নিশে জল জমে। সে ঢোক গিলে কান্না আটকিয়ে কাঁপাকণ্ঠে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম।'

জুলেখা বানু জবাব দিলেন না। তিনি কাউকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কী গো! হয় নাই তোমার? সময় যাইতাছে নাকি আইতাছে?'

গফুর মিয়া বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা গফুর মিয়াকে দেখে বুঝতে পারলো, উনি মৃদুলের বাবা। লাল রঙের লম্বা দাঁড়ি,মাথায় সাদা টুপি,পরনে সাদা পাঞ্জাবি। চোখেমুখের নূর যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে। গফুর মিয়া পূর্ণাকে দেখে হাসলেন। বললেন, 'ভালো আছো মা? শরীরটা ভালো লাগছে?'গফুর মিয়ার প্রশ্ন দুটো পূর্ণা শরীরকে চাঙ্গা করে তুললো। সে মৃদু হেসে বললো, 'ভালো আছি। আপনি...আপনি ভালো আছেন?'

'আছি। বুড়ো মানুষ...'

গফুর মিয়া কথা শেষ করতে পারলেন না। জুলেখা বানু বাজখাঁই কণ্ঠে বললেন, 'এহন তোমার গপ(গল্প) করার সময় না। ট্রেইন ছাইড়া দিলে বুঝবা।'

পদ্মজা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথার চুল ঢেকে জুলেখাবানুকে

বললো, 'গতকালই আসলেন। আজই চলে যাবেন?'

জুলেখাবানু পদ্মজার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি রিনুকে ধমকের স্বরে বললেন,

'মৃদুইল্লা কই গেছে?'
রিনু বললো, 'বাইরে গেছে। কলপাড়ে।'

'গিয়া খবর দেও,হের আম্মায় ডাকতাছে।'

রিনু পদ্মজাকে একবার দেখলো। তারপর বাইরে গেল। লতিফা সদর ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে। সে আড়চোখে জুলেখার ব্যবহার দেখছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে, মহিলাকে ভেজা কাপড়ের মতো মুচড়াতে! জুলেখার এমন ব্যবহারের কারণ পদ্মজা বুঝতে পারছে। তাও প্রশ্ন করলো, 'মনে হচ্ছে আপনি খুব বিরক্ত হয়ে আছেন! আমরা কোনো ভুল করেছি?'

জুলেখা কটাক্ষ করে বললেন, 'দেখো মা,তোমার সাথে আমি কথা কইতে চাইতাছি না। তুমিও কইয়ো না।'

পদ্মজা পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। তার চোখে, জলের পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। যেকোনো সময় গড়িয়ে পড়ে যেন ঘর ভাসিয়ে নিবে। লতিফা ঝাড়ু দেওয়ার ভান করে সব বালু জুলেখার ভেজা পায়ের উপর ছিটিয়ে দিল। জুলেখা বানু দুই লাফে দূরে সরে যান। চোখ বড় বড় করে লতিফাকে বললেন, 'এই ছেড়ি, চোক্ষে দেহো না? কেমনে কামডা বাড়াইছে! এহন আবার পাও ধুইতে হইবো।'

লতিফা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বললো, 'মাফ করেন খালাম্মা।'মৃদুল সদর ঘরে প্রবেশ করে আগে পূর্ণার মুখ দেখলো। পূর্ণাকে দেখেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে। সে পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'পূর্ণা,এহন কেমন লাগতাছে?'

পূর্ণা গুমট কণ্ঠে জবাব দিল, 'ভালো।'

মৃদুল বললো, 'লিখন ভাইয়ের খবর নিয়া আইছি।'

পদ্মজা সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন করলো, 'কেমন আছেন উনি?'

জুলেখা তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকান। জুলেখার চাহনি দেখে পদ্মজা অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মৃদুল বললো, 'জানি না ভাবি। খালি জানি, লিখন ভাইরে ঢাকা হাসপাতাল নিয়া গেছে।'পদ্মজা বিড়বিড় করে বললো, 'আল্লাহ উনাকে সুস্থ করে দিবেন,ইনশাআল্লাহ।'পূর্ণার চোখেমুখের গুমট ভাবটা স্পষ্ট। মৃদুল দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারছে না। জুলেখা বানু আদেশের স্বরে মৃদুলকে বললেন, 'তোর যে কাপড়ডি বাইর করছিলি ব্যাগে ঢুকাইছি। এহন এই

জুতাডি খুইলা তোর জুতাডি পায়ে লাগা।'

মৃদুলের কপালে ভাঁজ সৃষ্টি হয়। বললো, 'আমরা কই যাইতাছি?'

'বাড়িত যাইতাছি।'

মৃদুলের মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে আছে। মৃদুল অবাক হয়ে জুলেখাকে বললো, 'আমরা যেই কামে আইছি,সেই কাম তো হয় নাই আম্মা।'

জুলেখা পূর্ণার উপর চোখ রেখে বললেন, 'আমি এমন কালা ছেড়িরে আমার ছেড়ার বউ কইরা ঘরে নিতে রাজি না।'

মৃদুল উঁচু স্বরে উচ্চারণ করলো, 'আম্মা!'

জুলেখা বানু চেঁচিয়ে বললেন, 'তুই কী দেইক্ষা এমন ছেড়িরে পছন্দ করছস? তোর লগে এই ছেড়ির যায়? তোর আর এই ছেড়ির গায়ের রঙ আসমান আর জমিন।'

জুলেখা বানুর চিৎকার শুনে খলিল ও আমিনা উপস্থিত হোন। অপমানে,লজ্জায় পূর্ণার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। পূর্ণার চোখের জল পদ্মজা হজম করতে পারছে না। পদ্মজা বললো, 'আপনি গায়ের রঙকে মূল্য দিচ্ছেন কেন? ছেলে-মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবাসে। ভালোবাসাটাকে মূল্য দিন।'

জুলেখা বানুর মেজাজ শুধু খারাপের দিকেই যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'আমার ছেড়ার মতো সোনার টুকরা এমন কয়লারে কুনুদিনও পছন্দ করব না। এই ছেড়ি তাবিজ করছে। কালা জাদু করছে আমার ছেড়ার উপর। আমার ছেড়ারে আমি বরহাট্টার হুজুরের কাছে লইয়া

যাইয়াম। জাদু দিয়া বেশিদিন ধইরা রাখন যায় না। এইডা তুমি আর তোমার বইনে মনে রাইক্ষো।'মৃদুল চিৎকার করে উঠলো, 'আম্মা! কীসব আবোলতাবোল কইতাছেন। আপনি পূর্ণারে কষ্ট দিতাছেন।'জুলেখা কেঁদে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার কষ্ট নাই? আমি কত আশা কইরা আছিলাম আমার ছেড়ার বউ আমি পছন্দ কইরা ঘরে আনাম। পরীর মতো বউ আনাম। কিন্তু তুই এমন কালা ছেড়িরে পছন্দ কইরা রাখছস। দশ মাস দশ দিন তোরে পেটে রাখছি। আর এহন তুই এই ছেড়ির লাইগগা গলা উঁচায়া কথাও কইতাছস!'

পদ্মজা জুলেখাকে বুঝাতে চাইলো, 'আপনি অকারণে কাঁদছেন। দেখুন...'

'তুমি চুপ থাকো। তোমার বইনের তো গাত্রের রঙ কালা। আর তোমার তো চরিত্রই কালা। নষ্টা মাইয়া মানুষের মতো জামাই রাইক্ষা অন্য ছেড়ার লগে সম্পর্ক রাখছো। এমন চরিত্রহীন ছেড়ি মানুষের বইনরে আমার বংশে নিয়া কি ইজ্জতে কালি লাগামু?'

পূর্ণার ত্যাড়া রগটা সক্রিয় হয়ে উঠে। সে জুলেখার সামনে এসে আঙুল শাসিয়ে বললো, 'আমি সব সহ্য করব কিন্তু আমার আপাকে কিছু বললে আমি সহ্য করব না।'

পূর্ণার আঙুল শাসিয়ে কথা বলাটা জুলেখা হজম করতে পারলেন না। কত বড় সাহস! মিয়া বংশের বড় বউকে শাসিয়ে কথা বলছে! জুলেখা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'কইলজাডা বেশি বড়! এই ছেড়ি কারে আঙুল দেহাইতাছো তুমি? তোমার বইনে যে নষ্টা পুরা গেরামে জানে। সত্য কইতে আমি ডরাই না।'

মৃদুল ক্ষেপে যায়। সে জুলেখার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো আর বললো, 'আম্মা,আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করতাছেন।'

জুলেখা পিছনে ঘুরেই মৃদুলকে কষে চড় মারলেন। বেশ জোরেই শব্দ হয়। গফুর মিয়া জুলেখাকে ধমকালেন, 'তুমি কী করতাছো? কী কইতাছো?'

জুলেখা বানু গফুর মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কিয়ামত নাইমা আইলেও এমন নষ্টার কালি বইনরে আমার ঘরের ঝিও করতাম না।'

পূর্ণার শিরায়-শিরায় ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে। সে টেবিলে এক হাত রেখে কিড়মিড় করে বললো, 'আরেকবার নষ্টা কথা উচ্চারণ করলে আমি আপনার জিভ পুড়িয়ে দেব।'

উপস্থিত সবাই পূর্ণার দিকে চমকে তাকায়। মৃদলও অবাক হয়। পদ্মজা পূর্ণার এক হাত টেনে ধরে,কিন্তু পূর্ণাকে নাড়ানো যায় না। সে বড় বড় চোখ করে জুলেখার দিকে তাকিয়ে আছে। জুলেখা রাগে,বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তিনি ক্রোধের ভার নিতে পারছেন না। টেবিলে জোরে জোরে তিনটা থাপ্পড় দিয়ে তিনবার বললেন, 'নষ্টার বইন, নষ্টার বইন, নষ্টার বইন!'

কেউ কিছু বুঝে উঠার পূর্বে পূর্ণা টেবিলের উপর থাকা জগ হাতে তুলে নিল। তারপর জগের সবটুকু পানি জুলেখার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো। আকস্মিক ঘটনায় সবার চোখ মারবেলের মতো হয়ে যায়।

সাথে-সাথে পদ্মজা পূর্ণাকে বিরতিহীনভাবে থাপড়ানো শুরু করলো। পূর্ণা দুই হাতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। রাগে,দুঃখে সে কাঁদছে। পদ্মজার চোখভর্তি জল। সে পূর্ণাকে বললো, 'এটা কী করলি তুই? তোকে এই শিক্ষা দিয়েছি? আর কত জ্বালাবি আমাকে?'

লতিফা পূর্ণাকে বাঁচাতে দৌড়ে আসে। জুলেখা বিস্ফোরিত নয়নে তাকিয়ে আছেন। অপমানে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি মৃদুলের দিকে তাকালেন। মৃদুলের চোখেমুখে অসহায়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে! তার অনুভূতিগুলো থমকে গেছে। জুলেখার চোখে জল চিকচিক করছে। তিনি চোখের জল মুছে বললেন, 'থাক এইহানে,বাড়ি ফেইরা আমার কবর দেখবি তুই।'

মৃদুল তার মাকে খুব ভালোবাসে। জুলেখার চোখের জল তার হৃৎপিণ্ডকে জ্বালিয়ে দেয়! জুলেখা ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান। পিছন পিছন গফুর মিয়াও গেলেন। মৃদুল পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ভালো করলে না।'

পূর্ণাকে লতিফা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। সেই অবস্থায়ই পূর্ণা হুংকার ছাড়ে, ‘বেশ করেছি। আমার বোন আমার মা! আমার মাকে আপনার মা গালি দিয়েছে। আমি উনাকে ছেড়ে দিলে জাহান্নামেও আমার জায়গা হতো না।’

‘কাজটা ঠিক করো নাই পূর্ণা!’মৃদুলের কণ্ঠে তেজের আঁচ পাওয়া গেল।

মায়ের প্রতি মৃদুলের সমর্থন দেখে পূর্ণা রাগে বলে উঠলো, ‘এমন মায়ের ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।’

মৃদুল তিরস্কার করে হেসে বললো, ’আমিও করব না। তুমি না আমার গায়ের রঙের সাথে মানাও, না ব্যবহারের দিক দিয়া মানাও। জুতা মারি বিয়ারে।’

মৃদুল টেবিলে জোরে লাথি মেরে বেরিয়ে গেল। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে বসলো। ছোট থেকে শত সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে সে ক্লান্ত। বড্ড ক্লান্ত!

পর্ব ৮৩

এখন যে দুপুর তা বুঝার সাধ্যি নেই! ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে। সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশা তার গভীর মায়াজালে সূর্যকে লুকিয়ে রেখেছে। পূর্ণা আলগ ঘরের বারান্দায় বসে কাঁদছে। তার পাশে বসে আছে প্রান্ত। প্রান্ত পূর্ণাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু পূর্ণার কোনো হুঁশ নেই। সে কেঁদেই চলেছে। মগা আলগ ঘরে ঘুমাচ্ছে। নাক দিয়ে বের হচ্ছে বিদঘুটে শব্দ। সেই শব্দে প্রান্ত বিরক্ত! সে দুই আঙুল কানে ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। পূর্ণা হাঁটুর উপর থুতুনি রেখে সুপারি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ বেয়ে টুপটুপ বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। বুকের জ্বালাপোড়া সহ্য করতে পারছে না। মৃদুলের শেষ কথাগুলো তার শরীরের প্রতিটি পশমকে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ব্যথা সে কোথায় লুকোবে? মনের মণিকোঠায় যত্নে রাখা ভালোবাসার মুখের তিক্ত কথা কি সহ্য করা যায়! পূর্ণা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। বুকের ভেতর তুফান বয়ে যাচ্ছে। লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে ফুসফুস, কিডনি,মস্তিষ্ক,সর্বাঙ্গ! পূর্ণার হেঁচকি ওঠে। প্রান্ত চেয়ার ছেড়ে পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো, 'আপা!'

পূর্ণা তার ডাগরডাগর চোখদুটো মেলে প্রান্তর দিকে তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে দুঃখের মহাসাগর। পূর্ণা প্রান্তকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, 'ভাই,আল্লাহ আমাদের থেকেই কেন সবকিছু ছিনিয়ে নেন?'

প্রান্ত পূর্ণার কথার মানে বুঝলো না। কিন্তু পূর্ণার কান্না তার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আল্লাহ সব ঠিক করে দিবেন আপা। বড় আপা বলে,যা হয় সব ভালোর জন্য হয়।'

পূর্ণার কান্নার দমকে কিশোর প্রান্ত কেঁপে-কেঁপে উঠে। আলগ ঘরের ডান পাশে রিদওয়ান দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুল অন্দরমহলে আছে ভেবে সে পাতালঘর থেকে সোজা আলগ ঘরে এসেছে। কিন্তু এসে দেখে,এখানে পূর্ণা হাউমাউ করে কাঁদছে! ব্যাপারটা কী? রিদওয়ান আলগ ঘরে আর গেল না। কলপাড়ে রিনুকে দেখা যায়। রিদওয়ান চারপাশ দেখতে দেখতে কলপাড়ে আসে। রিনু রিদওয়ানকে দেখে ভয়ে জমে যায়। রিদওয়ান নানা অজুহাতে রিনুর গায়ে হাত দেয়। রিনুর ভালো লাগে না। ভয়ে কিছু বলতেও পারে না। সে এতিম! ছোট থেকে এই বাড়িতে বড় হয়েছে। যাওয়ার জায়গা নেই। রিদওয়ান রিনুকে প্রশ্ন করলো, 'পূর্ণা কাঁদতেছে দেখলাম। কিছু জানিস?'

রিনু কাচুমাচু হয়ে সকালের ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে রিদওয়ান খুব খুশি হয়। গুনগুনিয়ে গান গেয়ে অন্দরমহলের দিকে যায়। আমিনা আলোকে নিয়ে অন্দরমহলের সামনে খেলছেন। রিদওয়ান আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকলো, 'মামা,এদিকে আসো।'

রিদওয়ান আলোকে কোলে নেয়। আমিনা ভারী করুণ ভাবে বললো, 'আমার রানিরে কি পাওন যাইতো না?'

রিদওয়ান চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো, 'খোঁজা হচ্ছে। পেয়ে যাবো।'

আলোকে আমিনার কোলে দিয়ে রিদওয়ান সদর ঘরে প্রবেশ করে। রান্নাঘর থেকে পদ্মজার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। রিদওয়ান সেদিকে যায়। পদ্মজা রিদওয়ানকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। কাজে মন দিল। রিদওয়ান পদ্মজার উপর চোখ রেখে কপাল কুঁচকায়! এই মেয়ে এতো চুপচাপ আর স্বাভাবিক কেন? সব মেনে নিল নাকি? রিদওয়ান মনের প্রশ্ন মনে রেখেই জায়গা ত্যাগ করে। যাওয়ার পূর্বে লতিফাকে বলে গেল, 'লুতু,খাবার নিয়ে আয়।'

রিদওয়ান চোখের আড়াল হতেই লতিফা ভেংচি কাটে। মাংস রান্না হচ্ছে। মাংস রান্না হতে দেখলেই পদ্মজার ফরিনার কথা মনে পড়ে। ফরিনার হাতের মাংসের ঝোলের স্বাদ ছিল অন্যরকম। অন্দরমহলের বাম পাশে ফরিনার কবর! আজ তিনদিন তিনি পৃথিবীর মায়া ছেড়েছেন। পদ্মজার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মাথার উপর ভারী বোঝা! বোঝা টানতে কষ্ট হচ্ছে। নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে সে আল্লাহর নাম স্বরণ করছে। প্রার্থনা করছে, এই বোঝার ঘানি যেন সে টানতে পারে। সেই ক্ষমতা আর ধৈর্য্য যেন হয়! লতিফা পদ্মজাকে

চাপাস্বরে ডাকলো, 'পদ্ম?'

পদ্মজা তাকালো। লতিফা বললো, 'তুমি আমারে না কইছিলা বড় কাকা আর ছোট কাকার সব খবর দিতে।'

পদ্মজা দরজার বাইরে একবার তাকালো। তারপর লতিফার দিকে ঝুঁকে বললো, 'কী খবর এনেছো?'

'শনিবার রাইতে ভোজ আসর বসাইবো।'

'কীসের?'

লতিফা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। তার দৃষ্টি অস্থির। সে ফিসফিসিয়ে বললো, 'মাইয়া পাচার করার কয়কদিনের মাঝে সবাই এক লগে বইয়া খাওয়া-দাওয়া করে। পরের কাম নিয়া কথাবার্তা কয়।'

'এটাও কী নিয়ম?

'হ।'

'কত্ত খারাপ এরা! এতো মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পেরেছে সেই খুশিতে আনন্দ-ফূর্তি করে! কয়জন থাকবে জানো?'

লতিফা বললো, 'পাঁচ জনে।'

পদ্মজা আর কথা বাড়ালো না। অন্যমনস্ক হয়ে উচ্চারণ করলো, 'শনিবার রাতে!'

লতিফা কপাল ইষৎ কুঁচকিয়ে বললো, 'কিতা করবা ভাবছো?'

পদ্মজা তেজপাতা হাতে নিয়ে বললো, 'জানি না বুবু।'

পদ্মজা কথা বাড়াতে চাইছে না বুঝতে পেরে লতিফা আর কথা বললো না। সে রিদওয়ানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে।।পদ্মজা বললো, 'জানো,তোমার ভাই আমার আগে দুটো বিয়ে করেছে!'

লতিফার হাত থেকে থালা পড়ে যায়। ঝনঝন শব্দ হয়। ভাত,ঝোল মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

মৃদুল পুকুরপাড়ে বসে আছে। তার চোখ দুটি লাল। আজ ট্রেন নেই। আগামীকাল ভোরে ট্রেন আসবে। জুলেখার ফুফাতো বোনের শ্বশুর বাড়ি অলন্দপুরে। আটপাড়ার পাশের গ্রাম নয়াপাড়ায়! জুলেখা সোজা তার বোনের বাড়িতে চলে এসেছে। এখানে আসার পর থেকে বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে বসে আছে মৃদুল। তার জিভ ভারী হয়ে আছে। অকপট বলে দেওয়া কথাটা তাকে খুঁড়ে, খুঁড়ে খাচ্ছে। পূর্ণার কান্নামাখা চোখ দুটি বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দুশ্চিন্তায় দপদপ করছে মাথার রগ। কান্নারা গলায় এসে আটকে আছে। রাগের বশে সে জীবনে অনেক ভুল করেছে। কিন্তু এইবারের ভুলটা আত্মার উপর আঘাত হানছে। নিজের কথা দ্বারা নিজেই কষ্ট পাচ্ছে। জুলেখা বানু মৃদুলকে খুঁজে পুকুরপাড়ে আসেন। তিনি মৃদুলের উপর বেজায় খুশি! মৃদুলকে বললেন, 'আব্বা,খাইতে আসো।'

মৃদুল দূর্বল গলায় বললো, 'পরে খামু। যান আপনি।'

জুলেখা মৃদুলের পাশে বসলেন। মৃদুলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার লাইগগা আসমানের পরী আনাম। মন খারাপ কইরো না।'

'লাগব না আমার আসমানের পরী।'

মৃদুলের কণ্ঠস্বর কঠিন হওয়াতে জুলেখা বানুর হাসি মিলিয়ে যায়। তিনি বললেন, 'দেহো আব্বা,তুমি চাইছো আর পাও নাই এমন কিছু আছে? ওই ছেড়ি কালা। ছেড়ির বইনেরও চরিত্র ভালা না...'

'চুপ করেন আম্মা। আল্লাহর দোহাই লাগে,চুপ করেন। আপনি কারে কি কইতাছেন? পদ্মজা ভাবির নখের যোগ্যেরও কোনো নারী নাই। আর আপনি তারে চরিত্রের অপবাদ দিতাছেন।'

মৃদুল চিৎকার করে কথাগুলো বললো। মৃদুলের চিৎকার শুনে জুলেখার বোনের

শ্বাশুড়ি পুকুরপাড়ে উঁকি দেন। সেদিকে তাকিয়ে জুলেখার লজ্জা হয়। মাথা হেট হয়ে যায়। তিনি রাগে চাপাস্বরে বললেন, 'আমি কইতাছি না গেরামের মানুষ কইছে? ওই ছেড়ির শ্বশুরেও কইছে। এরা মিছা কইছে?'

'হ কইছে। আমি লিখন ভাইরেও চিনি, পদ্মজা ভাবিরেও চিনি। এই দেশের নামীদামী একজন অভিনেতা কেন অন্য বাড়ির বউয়ের সাথে লুকিয়ে সম্পর্ক রাখব আম্মা? তার কী সুন্দর মাইয়ার অভাব? পদ্মজা ভাবিরে লিখন ভাই পছন্দ করে ঠিক। কিন্তু পদ্মজা ভাবির সাথে আমির ভাইয়ের বিয়া হইবার আগে থাইকা। পদ্মজা ভাবি এমনই পবিত্র একজন মানুষ যে,লিখন ভাই এত্ত ভালোবাসে জাইননাও কোনোদিন লিখন ভাইয়ের দিকে ফেইরা তাকাইছে না। জামাইরে ভালোবাসছে। পদ্মজা ভাবি,দিনরাত এবাদত করে। ভাই-বোনের দায়িত্ব নিছে। এমন মানুষ খুঁইজা পাইবেন? পূর্ণার কাছে ওর বইনে ওর মা। তুমি ওর মারে খারাপ কথা কইছো। এজন্যে ও তোমার সাথে খারাপ করছে। আর পূর্ণা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে তাই আমিও...'

মৃদুল আর কথা বলতে পারলো না। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জুলেখা পিছনে ফিরে তাকান। বোনের শ্বাশুড়ি তাকিয়ে রয়েছে! জুলেখার মুখটা অপমানে থমথমে হয়ে যায়। গটগট শব্দ তুলে জায়গা ছাড়লেন। মৃদুল জুলেখার যাওয়ার পানে তাকালো। সে তার মায়ের স্বভাব জানে। এখন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিবে। উনিশবিশ হলেই নিজের ক্ষতি করে বসেন। এজন্য গফুর মিয়াও কিছু বলেন না,আর না মৃদুল কিছু বলতে পারে! মৃদুল মাথা নত করে কান্নায় ডুবে যায়। শেষ কবে সে কেঁদেছে জানে না!

পূর্ণা পদ্মজাকে না বলে বাড়িতে চলে গেছে। পদ্মজা এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। মস্তিষ্কে ঘুরাঘুরি করছে আমিরের কু-কীর্তি! তার দুটো বিয়ে,নারী আসক্তি,সমাজের চোখে কলঙ্কিত হওয়া আর ফরিনার মৃত্যু! কানে বাজছে'নষ্টা'শব্দটি। কতো ঘৃণা নিয়ে জুলেখা বানু এই শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন! তারপর মৃদুলের বলা কথাগুলো শুনে পূর্ণার অবাক চাহনি! পূর্ণার রক্তাক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা পদ্মজা টের পাচ্ছে! বুকটা ভারি হয়ে আছে। কান্না মন হালকা করে। কিন্তু কান্না আসছে না। আর কত কাঁদা যায়? পদ্মজা নিজেকে বুঝায়, আরো ধৈর্য্যশীল হতে হবে! এক হাতের দুই আঙুলে কপালের দুই পাশ চেপে ধরে।

আমির সদর ঘরে প্রবেশ করে থমকে যায়। তার হাতে কাপড়ের একখানা খালি ব্যাগ। পদ্মজা পা দেখেই চিনে ফেলে,মানুষটা কে! সে মুখ তুলে তাকালো না। সেকেন্ড কয়েক আমির থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর পদ্মজার পাশ কেটে দ্বিতীয় তলায় উঠে গেল। পদ্মজা অনুভব করে,তার অনুভূতিরা পাল্টে যাচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠছে! আমির ঘরে প্রবেশ করেই দ্রুত আলমারি খুললো। একবার দরজার দিকে তাকালো। তারপর কাগজে মুড়ানো একটা বস্তু দ্রুত ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। যখন আলমারি লাগাতে যাবে একটা খাম মেঝেতে পড়ে। খামের উপরের লেখাটা আমিরের চেনা-চেনা মনে হয়। তাই সে পদ্মজার অনুমতি ছাড়াই খামের ভেতর থেকেচিঠি বের করলো। চিঠির লেখাগুলো দেখে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যায়, এটা আলমগীরের চিঠি!

আমিরের ভ্রু দুটি বেঁকে গেল। সে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়লো। প্রতিটি শব্দ তার মগজে আঘাত হানে! আতঙ্কে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। নিজের অজান্তে এক কদম পিছিয়ে আসে। আলমগীরের খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় কিছু লেখার অভ্যেস রয়েছে। আমির খাম ছিঁড়লো। তার ধারণা ঠিক! সাদা খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় আলমগীরের বর্তমান ঠিকানা ও পাতালঘরের সঠিক অবস্থানের কথা লেখা আছে! আমির আলমগীরের ঠিকানাটা মুখস্থ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুখস্থ হচ্ছে না। ভেতরটা কাঁপছে। পদ্মজা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমির পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে হাতের খাম ও চিঠিগুলো বিছানার উপর রেখে কাপড়ের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। তারপর পদ্মজার দিকে তাকালো। তার চাহনি যেন মৃত!

পদ্মজা কয়েক পা এগিয়ে এলো। আমির অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা রয়ে সয়ে প্রশ্ন করলো, 'আর কিছু জানার আছে?'

আমির নির্বিকার! তার মুখে রা নেই। পদ্মজা বিছানা থেকে একটা চিরকুট হাতে নিল। বললো, 'আপনার দুই বউয়ের নাম কী ছিল?'

আমির বললো, 'শারমিন, মেহুল।'

পদ্মজার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠে। আমির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পলকও পড়ছে না। পদ্মজা ঢোক গিলে বললো, 'আমরা যে ঘরে একসঙ্গে থেকেছি,তারাও কি সেই ঘরে আপনার সঙ্গে থেকেছে?'

'না,অন্য বাড়িতে।'

'তাহলে সব সত্য?'

'মিথ্যা বলে যদি তোমাকে আরো একবার পাওয়া যেত আমি মিথ্যা বলতাম।' আমিরের সরল গলা। পদ্মজার নাকের পাটা ফুলে যায়। আমিরের সাথে কথা বললে তার এতো কান্না পায় কেন! আমির বললো, 'আসি।'

পদ্মজা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে বললো, 'কেন?'

আমির থামলো। পদ্মজা কান্না করে দিল। সে কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আমির বললো, 'আমাকে কান্না দেখাতে দাঁড় করালে?'

পদ্মজা জল ভরা আগুন চোখে আমিরের দিকে তাকায়। কিড়মিড় করে বললো, 'নরপশু আপনি! এতগুলি মেয়ের ভালোবাসা নিয়ে খেলেছেন।'

আমির নির্বাক। তার চুপ করে থাকাটা পদ্মজাকে আরো জ্বালা দেয়। তার অবচেতন মন চায় একবার আমির বলুক, সব মিথ্যে। কিন্তু আমির বলে না। কারণ,সব সত্য! সব সত্য! পদ্মজা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বললো, 'কথা বলার মুখ নেই? এতো লজ্জা হা? আসলেই লজ্জা আছে?'

পদ্মজা তাচ্ছিল্যের হাসি দিল। আমির চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। বুকের ভেতর আগুন ছুটে বেড়াচ্ছে। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকটা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। পদ্মজা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমির বের হওয়ার জন্য উদ্যত হতেই পদ্মজা বললো, 'আমাকে তালাক দিন। আমি আপনার বউয়ের পরিচয়ে আর থাকতে চাই না।'

পদ্মজার কথা শোনামাত্র আমিরের বুকটা কেঁপে উঠলো। কোথেকে যেনো একটা উত্তাল ঢেউ এসে মনের সমস্ত কিনার ওলট-পালট করে দিল। আমির কথা বলতে গিয়ে দেখলো কথা আসছে না। পদ্মজা আরো একবার চেঁচিয়ে বললো, 'আমার তালাক চাই। আপনার বউ হওয়া কলঙ্কের।'

আমির অনেক কষ্টে কয়টা শব্দ উচ্চারণ করলো, 'থাক না এক-দুটো কলঙ্ক।'

পদ্মজা সেকেন্ড তিনেক ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর মুহূর্তে ভুলে যায় পৃথিবী। ভুলে যায় পাপ-পুণ্য। ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিরের বুকে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ছেড়ে দিলে যদি হারিয়ে যায়! আমিরের বুকের সোয়েটার কামড়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'চলুন না, দূরে পালিয়ে যাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' পদ্মজা জড়িয়ে ধরতেই আমিরের শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যায়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সেই জল ফুটন্ত পানির মতো গরম। এ যেন দগ্ধ হওয়া হৃদয়ের আঁচ!

পর্ব ৮৪

হৃদয়ের প্রলয়ঙ্করী ঝড় ক্ষণমুহূর্তের জন্য থামিয়ে আমির বললো, 'ছাড়ো পদ্মজা।'

পদ্মজার কান্না থেমে যায়! হাত দুটি আমিরের পিঠ থেকে সরে যায়। পদ্মজা তার জলভরা নয়ন দুটি মেলে আমিরের দিকে তাকালো। তার রক্ত জবা ঠোঁট দুটি কাঁপছে। হোঁচট খাওয়া গলায় পদ্মজা বললো, 'আমার হৃদয়ের আকুলতা আপনাকে ছুঁতে পারছে না?'

আমির ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। পদ্মজা দূরে সরে দাঁড়ালো। আমিরের কৃষ্ণ মুখে, বিপর্যস্ত পদ্মজার নিষ্কম্প স্থির চোখের দৃষ্টি থমকে আছে। পদ্মজা থেমে থেমে বললো, 'তাহলে আমি...আমিও বঞ্চিত ভালোবাসা থেকে!'

পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। আমির আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। চোখের পলকে প্রস্থান করলো। পদ্মজা ধাতস্থ হয়ে আচমকা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো চিৎকার করে উঠলো, 'ধিক্কার নিজের উপর! জানোয়ারকে মানুষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছি! ধিক্কার নিজের ভালোবাসার উপর! প্রতিটি কাজের জন্য আপনি শাস্তি পাবেন। আমি আপনার আজরাইল হবো।'

পদ্মজার গলার হাড় ভেসে উঠে। তার চিৎকার অন্দরমহলকে কাঁপিয়ে তুলে। কাঁদতে-কাঁদতে সে মেঝেতে বসে পড়লো। আমিরের প্রত্যাখ্যান তার ভালোবাসাকে ক্রোধে পরিণত করছে। পদ্মজা রাগে বিছানার চাদর টেনে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো। বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ! পানি প্রয়োজন!

ফরিনার কবরের চারপাশে বাঁশের বেড়া দেয়া হয়েছে। আমির ফরিনার কবরের পাশে এসে বসলো। হাতের ব্যাগটা পাশে রেখে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ফরিনার কবরে হাত বুলিয়ে দিল। গাঢ় স্বরে ডাকলো, 'আম্মা! আমার আম্মা।'

চারিদিকে নিস্তব্ধতা। অন্দরমহল থেকে কোনো শব্দ আসছে না। নিস্তব্ধতা ভেঙে-ভেঙে মাঝেমধ্যে পাতার ফাঁকেফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমিরের ঠোঁট দুটো কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না। অথবা সে কিছু বলছে কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। আড়ষ্টতা ঘিরে রেখেছে তাকে। সে তার মৃত মা'কে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। আমির অনেকক্ষণ নতজানু হয়ে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো। ব্যাগ হাতে নিয়ে পাতালঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করে। লতিফা অন্দরমহল থেকে অস্থির হয়ে বের হয়। তার হাঁটায় তাড়াহুড়ো।

আমির ডাকলো, 'লুতু।'

লতিফা দাঁড়াল। আমির বললো, 'পদ্মজার খেয়াল রাখবি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক রাখবি। আর, যখন যা বলে করবি।'

লতিফা মাথা নাড়াল। আমির প্রশ্ন করলো, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

আমিরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লতিফা বললো, 'ভাইজান,তোমারে কিছু কইতাম।'

'বল।'

'মৃদুল ভাইজানে আর তার আম্মা-আব্বা আইছিলো। মৃদুল ভাইজানের আম্মা মৃদুল ভাইজানরে পূর্ণার লগে বিয়া করাইতে রাজি হয় নাই।'

আমির কপাল কুঁচকাল। বললো, 'কী সমস্যা? কেন রাজি হয়নি?'

রিদওয়ান অন্দরমহল থেকে বের হয়ে ফোড়ন কাটলো, 'আমির,তোর সাথে কথা আছে।'

আমির পিছনে ফিরে তাকালো না। বললো, 'পরে শুনব।'

রিদওয়ান বললো, 'আমি জানি কেন রাজি হয়নি। আয়, ওদিকে যেতে যেতে বলি।' লতিফা রিদওয়ানের দিকে তাকায়। রিদওয়ান তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে লতিফাকে সতর্ক করে। আমির রিদওয়ানের দিকে ফিরে বিরক্তি নিয়ে বললো, 'আরে ভাই,যা তো। লুতু কী কী হয়েছে বলতো?'

রিদওয়ানের সামনে রিদওয়ান সম্পর্কে কিছু বলার সাহস লতিফার হলো না। সে বললো, 'মৃদুল ভাইজানের আম্মা পূর্ণার গায়ের রঙ পছন্দ করে নাই। কইছে,কালা ছেড়ি ঘরে

নিব না।'

আমির রাগ নিয়ে বললো, 'ফালতু মহিলা! পূর্ণা জানে? কোথায় পূর্ণা?'

'হ জানে। এই বাড়িত আছিলো। এহন হেই বাড়িত গেছে।'

'মৃদুল...মৃদুল কী বললো?'

লতিফা পুরো ঘটনা খুলে বললো। এড়িয়ে গেল পদ্মজার ব্যাপারটা। সে মনে মনে পরিকল্পনা করলো,রাতে যদি রিদওয়ান অন্দরমহলে থাকে সে পাতালঘরে গিয়ে আমিরকে সব বলবে। আমির সব শুনে বললো, 'মৃদুল ছাড়া এই পরিস্থিতি ঠিক হবে না। দেখা যাক,ও কী সিদ্ধান্ত নেয়। আর ওই মুখছুটা মহিলাকে আমি একবার পাই শুধু!'

আমির রাগে গজগজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যায়। রিদওয়ান লতিফাকে চাপা স্বরে হুমকি দিল, 'গতকালের ঘটনা যদি আমিরের কানে যায় তোর খবর আছে। ল্যাংটো করে গাছে ঝুলিয়ে রাখবো।'

লতিফা চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলে। বললো, 'বাড়ির বাইরে গেলেই আমির ভাইজানে সব জাইননা যাইব। তহন ?'

লতিফার প্রশ্ন শুনে রিদওয়ান চিন্তায় পড়ে যায়। সে আমিরের পিছনে যেতে যেতে ভাবতে থাকে,এই পরিস্থিতি কী করে সামাল দিবে! আজ না হয় কাল আমির তো সব জানবে! আমির জঙ্গলে প্রবেশ করে রিদওয়ানকে বললো, 'কী কথা না বলবি!'

রিদওয়ান বললো, 'শনিবার রাতে ভোজ আসর হবে। চাচা সিদ্ধান্ত নিল।'

'আচ্ছা।'

'ছাগলের মাংস পুড়ানো হবে।'

'কয়টা?'

'দুটো।'

'বিরাট আয়োজন!'

দুজন কথা বলতে বলতে পাতালঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। রিদওয়ান ঘাস সরিয়ে দরজা খুললো। এক পা সিঁড়িতে দিতেই আমির রিদওয়ানের কাঁধ চেপে ধরলো। ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখানে কেউ আছে!'

আমিরের কথা শুনে রিদওয়ানের বুক ছ্যাঁত করে উঠলো। এমতাবস্থায় কে দেখে ফেললো! রিদওয়ান চারপাশে চোখ বুলায়। কোথাও কেউ নেই! আমিরের প্রখরতা নিয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। আমির যেহেতু বলেছে এখানে কেউ আছে। মানে আছে। রিদওয়ান চাপাস্বরে বললো, 'এখন কী করব?'

আমির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাক্তি। সে চারপাশে আরো একবার চোখ বুলিয়ে বললো, 'কেউ এখানে থাকলে সে ডান দিকে আছে।'

রিদওয়ান ডান দিকে এগিয়ে যায়। তখনই একজন লোক ঝোপঝাড়ের মাঝখান থেকে উঠে দৌড়াতে শুরু করে। রিদওয়ান উল্কার গতিতে তাকে ধরে ফেললো। লোকটার মাথায় চুল নেই। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া। পাটকাঠির মতো চিকন লোকটা ইয়াকুব আলীর সহকারী পলাশ মিয়া। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি অথবা ত্রিশই। রিদওয়ান পলাশকে ঘাড়ে ধরে আমিরের সামনে নিয়ে আসে। দেখে মনে হচ্ছে,রিদওয়ান জীবিত ইঁদুর ধরেছে। আমির পলাশকে প্রশ্ন করলো, 'নির্বাচনের তো অনেক দেরি আছে। এখনই আমাদের পিছনে পড়ার রহস্যটা বুঝলাম না।'

পলাশ পাতালঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এইডা কিতা? এইহানে কিতা করেন আপনেরা?'

আমির হাসলো। পলাশের মাথায় টোকা মেরে বললো, 'এই দৃশ্য দেখা তোর একদম ঠিক হয়নি। আয়ুটা কমে গেল।'

আমির পাতালে নেমে গেল। পলাশ ছটফট করতে থাকে। সে কিছুতেই ভেতরে যাবে না। সে ভয় পাচ্ছে। রিদওয়ান পলাশকে টেনে ভেতরে নিয়ে যায়। আমির বিওয়ানের

চেয়ারে এসে বসলো। রিদওয়ান পলাশকে বেঁধে মেঝেতে ফেললো। চিৎকার,চেঁচামেচি করার জন্য পলাশ রিদওয়ানের হাতে দুই-তিনটা থাপ্পড় খেল। পলাশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে আমিরকে বললো, 'আপনেরা এমন করতাছেন কেন আমার লগে? আমারে ছাইড়া দেন।'

রিদওয়ান আমিরকে বললো, 'তুই সামলা। আমি যাই,চাচার সাথে কথা আছে।'

আমির ইশারা করলো, যেতে। রিদওয়ান চলে গেল। পলাশ চারপাশ দেখে ঢোক গিললো। পাতালঘর মৃদু লাল-হলুদ আলোতে ডুবে আছে। কেমন ভূতুড়ে পরিবেশ! তার মনে হচ্ছে,সে কবরে আছে। আর সামনে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছে স্বয়ং যমদূত! আমির এক পা চেয়ারে তুলে বললো, 'তারপর,পলাশ মিয়ার এখানে কোন দরকারে আসা হয়েছে?'

পলাশ হাতজোড় করে বললো, 'আমারে ছাইড়া দেন। আমি এমন কবর আর দেহি নাই। আমার কইলজাডা কাঁপতাছে।'

আমির ধমকে বললো, 'এখানে আসছিলি কেন?'

পলাশ দ্রুত বললো, 'ইয়াকুব চাচা পাডাইছে।'

কোন দরকারে?'

আমারে খালি কইছে, মজিদ মাতব্বরের বাড়িত যা। আমার মনে হইতাছে ওই বাড়িত কিছু একটা গোলমাল আছে। কিছু যদি বাইর করতে পারছ তোরে আরেকটা বিয়া দিয়া দিয়াম।'

আমির চমকাল। বললো, 'উনার হুট করে কেন মনে হলো এখানে গোলমাল আছে?'

পলাশ কেঁদে বললো, 'আমি এইডা জানি না ভাই। আমারে ছাইড়া দেন।'

আমিরের মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়ে যায়। কী এমন হলো যে, ইয়াকুব আলী হাওলাদার বাড়ি নিয়ে সন্দেহ করছে! আমির আয়েশি ভঙ্গিতে বসলো। বললো, 'শুনেছি,গত বছর তোর বউকে নাকি হিন্দু এক জমিদারের কিনে নিয়েছে । তারপর তোর বউ আত্মহত্যা করলো! সত্যি?'

পলাশ মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে বললো, 'ভাই,আমারে মাফ কইরা দেন। আমি ভুল করছিলাম। আমারে ছাইড়া দেন। আমি কেউরে কিছু কইতাম না।'

আমির বললো, 'তুইতো ভাই আমার চাইতেও খারাপ। আচ্ছা,সবসময় তো পাপ কাজ করেছি। আজ একটা ভালো কাজ করার সুযোগ যখন পেয়েছি,করে ফেলি।'

পলাশের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। সে জানে না,এই কবরস্থানের মতো বড় ঘরটায় কী হয়! কিন্তু এখানে যে ভালো কিছু হয় না বুঝা যাচ্ছে। বাঁচতে পারলে পরে এর রহস্য বের করা যাবে। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পলাশের মুখে জোরে লাথি দিল। পলাশ আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। আমির চারিদিকে চোখ বুলিয়েও কোনো অস্ত্র পেল না। সে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাঁচি বের করলো। ধারালো কাঁচি। সে কাঁচি দিয়ে পলাশের মুখে আঁচড় কাটে। হাতে-পায়ে,শরীরে আঁচড় কাটে। পলাশের বিদঘুটে চিৎকার পাতালঘরেই চাপা পড়ে যায়। তার চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমিরকে আব্বা ডেকে অনুরোধ করে,তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সে জানে না, আমির কখনো তার শিকারের প্রতি মায়া দেখায় না। আমির পলাশের পাশে বসলো। দুই-তিনবার মাথা ঘুরাল। খুব নিঃস্ব লাগছে নিজেকে,মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে কাঁচি দিয়ে নিজের হাতে হেঁচকা টান মারে। সাথে-সাথে হাত থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। পলাশ আমিরের কাণ্ড দেখে চমকে যায়। আমির কাঁচি রেখে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। শূন্যে চোখ রেখে হাসে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি করে দেয়ালের পাশে যায়। ভয়ে পলাশের আত্মা কেঁপে উঠে! আমির দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বসে। পলাশের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে উঠে। হঠাৎ করে তার কী হয়ে গেল? আমিরের উন্মাদ আচরণ দেখে পলাশের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। আমির চট করেই উঠে দাঁড়াল। পলাশকে টেনে বসালো। তারপর নিজে গিয়ে চেয়ারে বসলো।

ব্যাগ থেকে কাগজে মুড়ানো বস্তুটি বের করলো। কাগজের ভাঁজ খুলতেই একটা লাল বেনারসি বেরিয়ে আসে। আমির লাল বেনারসি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পলাশকে বললো,

’আমার আম্মা ছোটবেলা একটা গল্প বলতেন,এক রাজা প্রতি রাতে বিয়ে করে প্রতি রাতেই বউকে খুন করতেন। তারপর শেষদিকে যে রানিকে বিয়ে করেন সেই রানি রাতজেগে রাজাকে গল্প শোনাতেন। গল্প শেষ হতো না বলে রাজাও রানিকে খুন করতে পারতেন না। রানি এভাবে গল্প বলে-বলে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। এখন আমি তোকে একটা গল্প শোনাব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে,যতক্ষণ আমার গল্প চলবে ততক্ষণ তুই বেঁচে থাকবি। গল্প শেষ তোর আয়ুও শেষ।’

পলাশ হাতজোড় করে আকুতি-মিনতি করলো, ‘ভাই,আমার জীবন ভিক্ষা দেন। আপনেরা তো ভালা মানুষ ভাই। আপনেরার অনেক নাম। আমারে কেন মারতে চাইতাছেন? আমারে ছাইড়া দেন ভাই।’

পলাশের কথায় আমিরের ভাবান্তর হলো না। সে বেনারসি থেকে ঘ্রাণ নেয়ার চেষ্টা করলো। তারপর শূন্যে চোখ রেখে ঘোর লাগা গলায় বললো, ‘এক ছিল দুষ্টু রাজা! নারী আর টাকার প্রতি ছিল তার চরম আসক্তি। যে নারী একবার তার বিছানায় যেত তার পরের দিন সে লাশ হয়ে নদীতে ভেসে যেত। রাজা এক নারীকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পছন্দ করতো না। কিন্তু সমাজে ছিল রাজার বেশ নামডাক! সবার চোখের মণি। খুন করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার কালো হাতের ছোঁয়ায় বিসর্জন হয়েছে হাজারো নারী। প্রতিটি বিসর্জন রাজার জন্য ছিল তৃপ্তিকর। তাকে শাস্তি দেয়ার মতো কোনো অস্ত্র ছিল না পৃথিবীতে। ভাইয়ের সাথে বাজি ধরে হেরে যায় রাজা। শর্তমতে,ভাইয়ের জন্য এক রাজকন্যাকে অপহরণ করতে যায়। সেদিন ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। রাজকন্যার প্রাসাদে সেদিন কেউ ছিল না। রাজা এক কামরায় ওৎ পেতে থাকে। রাজকন্যা আসলেই তাকে তার কালো হাতে অপবিত্র করে দিবে। কামড়ায় ছিল ইষৎ আলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত আসে। রাজকন্যার পা পড়ে কামড়ায়। রাজকন্যা রাজাকে দেখে চমকে যায়। ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে “‘কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?” সেই কণ্ঠ যেন কোনো কণ্ঠ ছিল না। ধনুকের ছোঁড়া তীর ছিল। রাজার বুক ছিঁড়ে সেই তীর ঢুকে পড়ে। রিনঝিনে গলার রাজকন্যাকে দেখতে রাজা আগুন জ্বালাল। আগুনের হলুদ আলোয় রাজকন্যার অপরূপ মায়াবী সুন্দর মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পা দুটো থমকে যায়। রাজকন্যা যেন এক গোলাপের বাগান। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে রাজার কালো অন্তরে। রাজা কী আর তখন বুঝেছিল,সৃষ্টিকর্তা তাকে তার পাপের শাস্তি দেয়ার জন্য সেদিন অস্ত্র পাঠিয়েছিল!’

আমির পলাশের দিকে তাকিয়ে হাসলো। কী মায়া সেই হাসিতে! মায়াভরা সেই হাসি প্রমাণ করে দিল,সেদিনটার জন্য সে কতোটা খুশি!

পর্ব ৮৫

মঙ্গলবার দুপুর বারোটা। হাওলাদার বাড়িতে কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। আলগ ঘরের বারান্দায় মজিদ বসে আছেন। তার সামনে খলিল এবং রিদওয়ান। রিদওয়ান চারপাশ দেখে মজিদের দিকে ঝুঁকে বললো, ‘কাকা,পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে। তার আগে আমাদের কিছু করতে হবে।’

মজিদ পান চিবোতে চিবোতে বললেন, ’কোন পরিস্থিতি?’

‘আমিরের হাব-ভাব ভালো না। ও কখন আমাদের উপর চড়া হয়ে যায় জানি না। আপনি আমি আব্বা সবাই জানি আমির কী কী করতে পারে! আমির আমাকে আর আব্বাকে কখনোই পছন্দ করেনি। আপনাকেও সেদিন মারলো। তাছাড়া আমাদের উপর আমিরের পুরনো একটা ক্ষোভ আছে।’

মজিদ পান চিবানো বন্ধ করে বললেন, ‘বাবু আমাদের খুন করবে?’

রিদওয়ান সোজা হয়ে বসলো। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, ‘কাকা, আমির পদ্মজার জন্য পাগল। পদ্মজার জন্য অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের খুন করে পদ্মজাকে নিয়ে ভালো থাকতে চাইতেই পারে।’

মজিদ হাসলেন। যেন রিদওয়ান কোনো কৌতুক বলেছে। রিদওয়ান অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। বললো, ’কাকা,বিশ্বাস করুন আমি আমিরর চোখেমুখে কিছু একটা দেখেছি। ও কিছু একটা করতে যাচ্ছে। আর পদ্মজা তো আছেই। পদ্মজা এতো শান্ত-স্বাভাবিক,মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। এসব লক্ষণ কিন্তু ভালো না কাকা। আমির যেমন ভয়ংকর পদ্মজাও তেমন ভয়ংকর। যেকোনো মুহূর্তে আমাদের ক্ষতি করতে পারে।’

মজিদ হাওলাদার মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। গুরুতর ভঙ্গিতে বললেন, ‘পদ্মজাকে নিয়ে আমারও চিন্তা আছে। এই মেয়ের চোখের দিকে তাকানো যায় না।”

মজিদ হাওলাদারের কল্পনায় পদ্মজার চোখ দুটি ভেসে উঠে। সবসময় তিনি পদ্মজার চোখের ভেতর আগ্নেয়গিরি দেখতে পান। তিনি দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, ’খলিল, পদ্মজার কিছু একটা করতে হবে। এই মেয়ে ক্ষতিকর। ধরে-বেঁধে রাখার মেয়ে না।’

খলিল বললেন, ’এই ছেড়ি এতোকিছু দেইক্ষাও ডরায় নাই। আর কেমনে ডরাইবো?’

মজিদ থুথু ফেলে বললেন, ‘পদ্মজাকে রাখাই যাবে না। এই দায়িত্ব রিদুর।’

রিদওয়ানের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো। পরপরই সেই আলো নিভে গেল। সে প্রশ্ন করলো, ‘আর আমির? আমির পদ্মজার ক্ষতি মানবে না।’

মজিদ চিন্তায় পড়ে যান। কিছু বলতে পারলেন না। রিদওয়ান উত্তেজিত। সে চেয়ার ছেড়ে মজিদের পায়ের কাছে বসলো। বললো, ‘কাকা, গত পরশু যা হলো,আমির জানতে পারলে আপনাকে, আমাকে আর আব্বাকে কাউকে ছাড়বে না। আমির গ্রামের সবাইকে ডেকে সবকিছু বলে দিতে পারে।’

মজিদ ধমকে উঠলেন, ‘বাবু এটা কখনো করবে না। নিজের ক্ষতি করবে না।’

‘করবে কাকা, করবে। ওর মাথা ঠিক নাই। আমাদের ক্ষতি করতে ওর হাত কাঁপবে না। মাথাও কাজ করবে না। আর নিজের ক্ষতি তো এখনই করতেছে। পরেও করতে পারবে।’

মজিদ হাওলাদারের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে। রিদওয়ানের কথায় যুক্তি আছে। রিদওয়ান বললো, ‘কাকা,আমির এখন আমাদের জন্যও হুমকি।’

মজিদ হাওলাদার রিদওয়ানের দিকে ঝুঁকে বললেন, ’আমির ছাড়া আমরা অচল রিদু। এখনের মানুষ সচেতন,বুদ্ধিমান,আইন শক্তিশালী এমন অবস্থায় আমির ছাড়া কী করে চলবে? আমিরের মাথা পরিষ্কার। একবার-দুইবার না বার বার পুলিশ সন্দেহ করেও সন্দেহ ধরে রাখতে পারেনি। আমির সামলিয়েছে।’

রিদওয়ান আশ্বাস দিল, ’কাকা,আমরা সাবধান থাকব। আপনাদের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে আর আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা। আমরা চাইলে সামলাতে পারবো।’

মজিদ হাওলাদার রিদওয়ানের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। বললেন, ’বাবুর জায়গা

নেয়ার জন্য এসব বলছিস?'

রিদওয়ানের চোখেমুখে হতাশার ছাপ পড়লো। সে চেয়ারে উঠে বসলো। বললো, 'আমার একার কোনো স্বার্থসিদ্ধি নাই কাকা। আব্বা আর আপনাকেও বাঁচাতে চাইছি। আমির আগের আমির নাই। আপনার বড় ভুল পদ্মজার সাথে আমিরের বিয়ে দেয়া।'

মজিদ হাওলাদার উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমার ছেলের সাথে আমি কথা বলবো। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

মজিদ হাওলাদার চলে যান। তিনি চোখের আড়াল হতেই রিদওয়ান মজিদের চেয়ার লাথি দিয়ে ফেলে দিল। রাগে গজগজ করতে করতে বললো, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

খলিল রিদওয়ানের উরুতে এক হাত রেখে বললেন, 'মাথাডা ঠান্ডা করো আব্বা।'

রিদওয়ান চোখ বড়-বড় করে বললো, 'আর কতদিন ওদের বাপ-ব্যাঠার কামলা খাটব? আদেশ মানব? মার খাব? বলতে পারেন? আমার বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে,আপনি অকর্মার ঢেকি আব্বা। কাকা সবকিছু আমিরের নামে করে দিল আপনি টু শব্দও করেননি।'

খলিল হাওলাদার দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলেন। তিনি ছোট থেকেই মনে মনে মজিদের উপর ক্ষিপ্ত। গোপনে অনেক পরিকল্পনাই করেছেন কখনো তা বাস্তবে রূপ নেয়নি!

লতিফা পদ্মজার ঘরে প্রবেশ করে দেখলো,পদ্মজা নেই। সে হাতের বস্তা পালঙ্কের নিচে রাখলো। বস্তার ভেতর পদ্মজার চাওয়া কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। লতিফা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হয়। তখন গোসলখানা থেকে পদ্মজা বের হলো। পদ্মজাকে দেখে লতিফার শরীর কেঁপে উঠে। পদ্মজার পরনে একদম সাদা শাড়ি! ভেজা চুল থেকে টুপটুপ করে জল পড়ছে। এই সন্ধ্যাবেলা সে গোসল করেছে! বাঁকানো কোমর,ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ,ঘন কালো লম্বা চুল,রক্তজবা ঠোঁট,মসৃণ ত্বক থাকা সত্ত্বেও তাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। পদ্মজা তো বিবাহিত সে কেন সাদা শাড়ি পরলো? লতিফার অনুভব হয়,তার পায়ের তলার মেঝে কেঁপে উঠেছে। পদ্মজা চুল মুছতে মুছতে বললো, 'যা আনতে বলছিলাম এনেছো?'

লতিফা নিরুত্তর। পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো। লতিফা হা করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ডাকলো, 'লুতু বুবু?'

লতিফা এগিয়ে আসে। তার বিস্ময়কর চাহনি। পদ্মজা লতিফার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরেছে। লতিফা বললো, 'তুমি সাদা কাপড় পিনছো কেরে?'

পদ্মজা হেসে বললো, 'বলা যাবে না।'

লতিফা বলার মতো কথা খুঁজে পেল না। পদ্মজা আলমারি থেকে ছাই রঙা ব্লাউজ বের করলো। বিছানার উপর বসে বললো, 'লুতু বুবু, ব্লাউজের এ পাশটা সেলাই করে দাও। তোমার হাতের সেলাই

খুব সুন্দর হয়।'

লতিফার ধীর পায়ে পদ্মজা সামনে এসে দাঁড়ালো। পদ্মজার হাত থেকে ব্লাউজ নিয়ে বিছানায় বসলো। পদ্মজা একটা ছোট বাক্স থেকে সুই-সুতা বের করে লতিফাকে দিল। লতিফা রয়ে সয়ে বললো, 'শাড়িডা কি বুড়ির?'

পদ্মজা ছোট করে জবাব দিল'হু।'

লতিফা বললো, 'হ,কাপড়ডা দেইক্ষাই চিনছি।'

পদ্মজা বললো,"দাদুর অবস্থা খুব বাজে। শরীরে মাছি বসে,বাজে গন্ধ বের হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করে।'

লতিফা হঠাৎ করেই হইহই করে উঠলো, 'আল্লাহর শাস্তি আল্লাহই দেয় বইন। বুড়ির সাথে উচিত অইতাছে। বুড়ি কানলে আমার যে কি শান্তি লাগে পদ্ম। মরুক বুড়ি, মরুক!'

পদ্মজা নরম স্বরে বললো, 'এভাবে বলো না বুবু। এভাবে বলতে নেই।'

লতিফা পদ্মজার চোখের দিকে তাকালো। হাতের ব্লাউজটা বিছানায় রেখে পদ্মজার এক হাত চেপে ধরে বললো, 'তুমি সাদা কাপড় কেরে পিনছো পদ্ম? আমারে কও।'

লতিফার চোখেমুখে জানার প্রবল আগ্রহ। পদ্মজা ধীরেসুস্থে বললো, 'আমি ধরে

নিয়েছি আমার স্বামী মৃত।'

'কিন্তু এইডা তো মিছা।'

পদ্মজা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'এটা সত্য হবে বুবু।'

'পদ্মজা...'

'কিছু বলো না বুবু। এই সাদা রঙ আমার আত্মবিশ্বাস আর সাহসকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। সারাজীবন ভয়ে চুপ থেকেছো,অন্যায়কে-পাপকে সমর্থন করেছো। এবার অন্তত থেকো না। মরতে হবে তো তাই

না? কবরে কী জবাব দিবে?'

লতিফা মাথা নিচু করলো। ক্ষণমুহূর্ত পর বললো, 'আমিতো কইছি তোমার সব কথা মাইননা চলাম। এখনো কইতাছি,সব মাইননা চলাম।'

'এবার বলো,যা আনতে বলেছিলাম এনেছো?'

'হ আনছি। পালঙ্কের নিচে রাখছি।'

পদ্মজা পালঙ্কের নিচে থেকে বস্তা বের করে মেঝেতে বসলো। লতিফা ব্লাউজ সেলাই করা শুরু করে। পদ্মজা বস্তার ভেতর থেকে দুটো রাম দা, একটা চাপাতি বের করলো। লতিফা বললো, 'পদ্ম, আমার

অনেক ডর লাগতাছে।'

পদ্মজা রাম দায়ের আগা দেখতে দেখতে বললো, 'কী জন্য?'

'তুমি যদি না পারো তুমারে ওরা মাইরা ফেলব।'লতিফার কণ্ঠে ভয়।

পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে লতিফার দিকে তাকালো। তার চোখ-মুখের রঙ পাল্টে গেছে। পদ্মজা বললো, 'আজ অনুশীলন করব। দেখা যাক, আমার হাত কতোটা সাহসী।'

কথা শেষ করে পদ্মজা হাসলো। লতিফার অশান্তি হচ্ছে। সামনে কী হবে সে জানে না! কিন্তু যা ই হোক, খুব খারাপ হবে! পদ্মজা চাপাতি হাতে নিয়ে লতিফাকে ডাকলো, 'বুবু?'

'কও পদ্ম।'

'জসিম গতকাল থেকে তোমার পিছনে ঘুরঘুর করছে দেখলাম।'

লতিফার মনোযোগ সেলাইয়ে। সে সেলাই করতে করতে বললো, 'জসিম আমারে খারাপ প্রস্তাব দিছে।

ডর দেহাইছে, রাজি না হইলে জোর কইরা নাকি খারাপ কাম করব।'

'ধর্ষণের হুমকি দিল?'

'হ।'

'জসিম, হাবু কতদিন ধরে কাজ করে এখানে?'

'অনেক বছর। দশ-বারো বছর তো হইবই।'

পদ্মজা চাপাতি দিয়ে রামদায় মৃদু আঘাত করে বললো, 'হাবু তো এখন নাই। তাহলে শুরুটা জসিমকে দিয়েই হউক!'

লতিফা চুপ রইলো। তার কাছে খুন স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক খুন সে নিজের চোখে দেখেছে। তাই খুনখারাপিতে তার ভয় নেই। কিন্তু এইবার ভয় হচ্ছে। খুব ভয় হচ্ছে। পদ্মজা সরাসরি কিছু বলেনি। তবে বুঝা যাচ্ছে সে কী করতে চলেছে। যদি পদ্মজা ধরা পড়ে যায়? তখন কী হবে! লতিফা ঢোক গিলল। সেলাইয়ে মন দেয়ার চেষ্টা করলো। পদ্মজা প্রশ্ন করলো, 'মগা কি এসবের সাথে জড়িত?'

'মগা অনেক ভালা পদ্ম। বাড়ির টুকটাক কাম করে। বেক্কলের মতো। আর খালি ঘুমায়। ওর ভিতরে প্যাচঁগোচ নাই।'

'বাড়ির ভেতর কখনো মেয়ে নিয়ে আসা হয়নি?'

'বাঁইচা আছে এমন আনে নাই। মরা আনছে।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। প্রশ্ন করলো, 'মৃত মেয়ে দিয়ে কী করে?'

লতিফা দরজার দিকে তাকালো। পদ্মজা দ্রুত উঠে যায় দরজা বন্ধ করতে। তারপর

লতিফার সামনে এসে বসলো। লতিফা বললো, 'যে ছেড়ি বেশি সুন্দর থাকে, জানে মারার পরেও রিদওয়ান ভাইজানে তারে ছাড়ে না। মরা মানুষের শরীরের উপর টান খলিল কাকারও আছিলো। রিদওয়ান ভাইজানেও এই স্বভাব পাইছে।'

পদ্মজার গা গুলিয়ে উঠে। বমি গলায় চলে আসে। সে এক হাতে মুখ চেপে ধরলো। ঘৃণায় তার চোখে জলে ছলছল করে উঠে। লতিফা বললো, 'রিদু ভাইজানে কয়দিন আগেও বস্তাত ভইরা এক ছেড়িরে বাড়ির ছাদে আনছিলো। তিন তলা ঘরের দরজায় তালা আছিলো। তাই ছাদে গেছিল। পরে আমি চাবি লইয়া গেছি। বস্তা থাইকা রক্ত পড়ছিল। শীতের মাঝে কাঁইপা-কাঁইপা আমি রক্ত ধুইছি।' পদ্মজা কোনোমতে বললো, 'তখন আমি এখানে ছিলাম?'

'হ। পূর্ণা আর মৃদুল ভাইজানেও আছিলো।'

পদ্মজা এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'আল্লাহ! তাও আমার চোখে পড়েনি!'

পদ্মজা সেকেন্ড দুয়েকের জন্য থামলো তারপর বললো, 'এমনকি আমি তিন তলার এক ঘর থেকে বোটকা গন্ধ পেয়েছিলাম তবুও ভাবিনি এই বাড়িতে এতো ভয়ংকর ঘটনা ঘটে!'

লতিফার সেলাই শেষ। সে ব্লাউজটি পদ্মজার উরুর উপর রেখে বললো, 'লও তোমার বেলাউজ(ব্লাউজ)।'

পদ্মজা রাগে কিড়মিড় করে লতিফাকে বললো, 'দেখো, রিদওয়ানের শরীর টুকরো, টুকরো করে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দেব আমি।'

লতিফা এতক্ষণে হাসলো। বললো, 'আল্লাহ তোমারে শক্তি দেউক।'

পদ্মজার ডান হাত কাঁপছে। সে তার ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারছে না। এই মুহূর্তে সে যা শুনেছে, তারপর শান্ত থাকা সম্ভব নয়। লতিফা পদ্মজার মস্তিষ্ক অন্য প্রসঙ্গে নেয়ার জন্য বললো, 'পারিজারে কেলা মারছে জানো পদ্ম?'

পদ্মজা লতিফার দিকে তাকালো। পারিজার কথা মনে পড়লেই তার বুকের ব্যথা বেড়ে যায়। সে ম্লান হেসে বললো, 'না। কিন্তু আন্দাজ করতে পেরেছি।'

'আমির ভাইজানে জানে।'

'সেটাও এখন বুঝতে পারছি। শুনেছি,তার আড়ালে একটা পাখিও উড়ে যেতে পারে না। সেখানে আমার মেয়ের খুনিকে সে চিনবে না? অবশ্যই চিনবে। কিন্তু কিছু করেনি কারণ এতে তার লোক কমে যাবে। ব্যবসার ক্ষতি হবে।'

'কিছু যে করে নাই এইডাও ঠিক না। এক মাস পরে আমির ভাইজানে জানছে,রিদু ভাইজানে হাবলু মিয়ারে দিয়া পারিজারে খুন করাইছে। সব জাইননা হাবলু মিয়ারে আমির ভাইজানে কুড়াল দিয়া কুপাইছে। রিদু ভাইজানরে আমির ভাইজানে খুন করতে চাইছিলো কিন্তু বড় কাকার লাইগগা পারে নাই। তয় মাসখানেক হাসপাতালে আছিলো। বছরখানেক রিদু ভাইজানে আমির ভাইজানের সামনে যায় নাই।'

পদ্মজা দুই হাতে চাদর খামচে ধরলো। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে কান্নামাখা স্বরে বললো, 'কী নিষ্ঠুর ওরা! আমার ছোট বাচ্চা!'

লতিফার পদ্মজার জন্য খুব মায়া হয়। মেয়েটা বড় বড় আঘাত সহ্য করেছে,করে যাচ্ছে! পদ্মজা বললো, 'আমির হাওলাদার তার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিত বলে সে আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে তাই না?'

লতিফা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। পদ্মজা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো, 'প্রতিশোধ নিয়েছে সে! আমিও নেব। করুণ মৃত্যু হবে তার। এতো বড় সাহস কী করে পেলো সে? আমির হাওলাদারের মেয়েকে খুন করার সাহস রিদওয়ানের থাকার কথা না। তার পিছনে মজিদ হাওলাদার আর তার ভাই ছিল। তাদের সমর্থন ছিল। সে জানতো,তাকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হবে তারা।'

লতিফা বিচলিত হয়ে বললো, 'কাইন্দো না পদ্ম। আর কাইন্দো না।'পদ্মজা দুই হাতে চোখের জল মুছে বললো, 'কাঁদব না আমি। আমার ছোট মেয়ে জান্নাতে তার নানুর সাথে

আছে। সে সুখে আছে। এই জগতে তার না থাকাটাই ভালো হয়েছে বুবু।'

পদ্মজাকে যত দেখে তত অবাক হয় লতিফা। এই নারী কীসের তৈরি? এতো যন্ত্রণা, এতো দুঃখ নিয়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীর ছিঃ চিৎকার তাকে দূর্বল করতে পারেনি। যতবার ভেঙে যায় ততবার চোখের জল মুছে নতুন উদ্যমে বেঁচে উঠে। লতিফা দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললো, 'আমি তোমারে একবার জড়ায়া ধরি পদ্ম?'

লতিফা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এশার নামায আদায় করে পদ্মজা ঘর থেকে বের হলো। দরজার পাশে জসিম নেই। একটু আগেই সে জসিমের কাশি শুনেছে। কোথায় গেল? অন্দরমহল অন্ধকারে ছেয়ে আছে। সন্ধ্যার পরপর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ব্যাপারটা বিরক্তিকর। বাড়িতে সাড়াশব্দও নেই। কখনোই থাকে না। সন্ধ্যা হলেই আলো ঘুমিয়ে পড়ে। রিনু তার ঘরে শুয়ে থাকে। লতিফা রান্নাঘরে টুকটাক কাজ করে,সবার আদেশ শুনে। আর এখন সবার খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময়। আর এই মুহূর্তেই জসিম উধাও! পদ্মজার স্নায়ু সাবধান হয়ে উঠলো।

লতিফা রান্নাঘরে থালাবাসন ধুচ্ছে। থালাবাসন ধোয়া শেষে পানি গরম করার জন্য চুলায় আগুন ধরালো। রান্নাঘরে আর আলো নেই। জসিম লতিফার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। লতিফা জসিমের উপস্থিতি টের পেয়ে কপাল কুঞ্চিত করলো। পিছনে ফিরে বললো, 'আপনে আমার পিছনে ঘুরতাছেন কেরে?'

'তোরে আমার পছন্দ অইছে। আমার লগে আয়।'

'আমি যাইতাম না।'

'আরে আয়, আয়।'

জসিম হাসলো। তার বিদঘুটে হাসি। সে অনেক চিকন হলেও তালগাছের মতো লম্বা। লতিফার মাথা উঁচু করে তাকাতে হয়। লতিফা জসিমের আক্রমণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল। সে সজোরে প্রবল কণ্ঠে বললো, 'এন থাইকা বাইর হইয়া যা কুত্তার বাচ্চা! নাইলে তোরে আমি দা দিয়া কুপাইয়াম।'

জসিম লতিফার ব্লাউজ টেনে ধরে। লতিফা চিৎকার করে দা হাতে নিতে নেয় জসিম লাথি দিয়ে দা সরিয়ে দেয়। লতিফা জসিমকে তার কাছ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। দুজনের মাঝে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়। জসিম গায়ের জোরে লতিফার স্পর্শকাতর স্থানে ছুঁতেই লতিফা চিৎকার করে মজিদ আর আমিনাকে ডাকলো। জসিম টেনেহিঁচড়ে লতিফার শাড়ি খুলে ফেললো। লতিফার গায়ে হাত দেয়ার অনুমতি সে খলিলের কাছে পেয়েছে। যদিও খলিল বলেছিল,বাড়িতে কিছু না করতে। কিন্তু জসিম সে কথা শুনেনি। ফলে,তার পরিণতি ভয়ংকর হয়। সাদা শাড়ির আবরণে আচ্ছাদিত পদ্মজা রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার হাতে রাম দা। লতিফা পদ্মজাকে দেখে জসিমকে দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজা শক্ত করে রাম দা ধরলো। তারপর'জারজের বাচ্চা, মর'বলে পিছন থেকে জসিমের গলায় কোপ বসাল। জসিমের গলা অর্ধেক কেটে যায়। রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার গায়ে। লতিফার নাকমুখ রক্তে ভেসে যায়। কিছু রক্ত ছিটকে আগুনে পড়ে। রক্তে রান্নাঘরের থালাবাসন,পাতিল রাঙা হয়ে উঠে। দেহটি সজোরে শব্দ তুলে মেঝেতে পড়ে গেল। লতিফার মুখ দিয়ে রক্ত প্রবেশ করায় সে বমি করতে থাকে। পদ্মজার বুক হাঁপড়ের মতো উঠানামা করছে। সে চোখ বুজে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে স্থির হলো। তারপর লতিফার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'এটা কিন্তু আমার দ্বিতীয় শিকার ছিল।'

পদ্মজা রাম দা হাতে নিয়ে অন্দরমহল থেকে বের হলো। রাম দা থেকে চুইয়ে-চুইয়ে রক্ত পড়ছে। তার গায়ের সাদা শাড়িতে ছোপ-ছোপ রক্তের দাগ। লতিফা আড়চোখে পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজার শান্ত থাকা দেখে লতিফা বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পদ্মজার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ খুন করাটাই তার কাজ! লতিফা নিজের কপালের ঘাম মুছে মিনমিনিয়ে বললো, 'জসিমের লাশটা কিতা করাম?'

পদ্মজা কলপাড়ে পা রেখে শান্ত স্বরে বললো, 'এতো বড় দেহ দুজন মিলে কিছুই করতে পারবো না। রিদওয়ান কুকুরটা ঘরে আছে না?'

লতিফার খুব ঘাম হচ্ছে। সে বিড়বিড় করে বললো, 'তোমারে দেইখা আমার ডর লাগতাছে পদ্ম।'

লতিফার কথা পদ্মজার কানে আসতেই পদ্মজা হাসলো। বললো, 'তুমি কখনো খুন করোনি?'

পদ্মজা শীতল চোখে তাকায়। লতিফা মাথা নাড়িয়ে বললো, 'না,করি নাই।'

'শুধু দেখেছো?'

'হ।'

'রিদওয়ানকে গিয়ে বলো, পদ্মজা জসিমরে খুন করছে।'

কলপাড়ের এক পাশে সাদা রঙের বালতি ভর্তি পানি রয়েছে। পদ্মজা বালতির পাশে বসলো। পদ্মজার কথা শুনে লতিফার বুক ছ্যাঁত করে উঠে। সে দুই কদম এগিয়ে এসে চাপাস্বরে বললো, 'এইতা কিতা

কও পদ্ম! রিদু ভাইজানে জানলে...'

লতিফাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে পদ্মজা বললো, 'কিছুই হবে না। বরং লাশটা সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে।'

পদ্মজা রাম দা বালতির ভেতর রাখলো। সঙ্গে-সঙ্গে সাদা পানি লাল হয়ে উঠে। লতিফা কথা বলছে না,চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত। পদ্মজা লতিফার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'যা বলেছি করো বুবু।'

লতিফা জবাবে কিছু বললো না। সে উল্টোদিকে ঘুরে অন্দরমহলে চলে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। তবে আকাশে চাঁদ আছে। জোনাকি পোকারা অনর্থক গল্প করে যাচ্ছে। তাদেরও কী পদ্মজার মতো শীত অনুভব হয় না? শিশির পড়ছে। মৃদু বাতাসও রয়েছে। তীব্র ঠান্ডায় মাটিও যেন কাঁপছে। শুধু কাঁপছে না পদ্মজা। শীতের দানব তার শরীর ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। পদ্মজার বুকের ভেতর একটা উষ্ণ অনুভূতি ছুটে বেড়াচ্ছে। সেই উষ্ণ অনুভূতি শীতের দানবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। রাম দা-এ লেগে থাকা জানোয়ারের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় পদ্মজা। তারপর অন্দরমহলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। অন্দরমহলের সদর দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই রিদওয়ানের দেখা মিলল। রিদওয়ান তার দিকে ছুটে আসছে। চোখেমুখে ক্রোধ স্পষ্ট।

পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালো। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রিদওয়ানকে স্বাগত জানালো। রিদওয়ান নিঃশ্বাসের গতিতে এক হাতে পদ্মজার গলা চেপে ধরে বললো, 'বেশ্যা মা* মরার ইচ্ছে জাগছে তোর?'

পদ্মজা রিদওয়ানকে বাঁধা দিল না। সে ঠোঁটে হাসি ধরে রাখলো। রিদওয়ান পদ্মজার হাসি দেখে ভড়কে যায়। পরক্ষণেই রেগে গিয়ে আরো জোরে চেপে ধরে পদ্মজার গলা। কিড়মিড় করে বললো, 'জন্মের মতো হাসি বন্ধ করে দেব!'

পদ্মজার চোখ উল্টে আসতেই রিদওয়ান পদ্মজার গলা ছেড়ে দিল। পদ্মজা দুই-তিনবার কাশলো। তারপর রিদওয়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শব্দ করে হেসে দিল! রিদওয়ানের শরীর রাগে কাঁপছে। সে পদ্মজার ব্যবহারে হতভম্ব! পদ্মজার চোখেমুখে ভয়ের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই! রিদওয়ান দ্রুতগতিতে অন্দরমহলে ভেতর চলে গেল। লতিফা দরজার

সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রিদওয়ান চলে যেতেই লতিফা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে। লতিফাকে দেখে পদ্মজা কোনো কারণ ছাড়াই বললো, 'শিকার তাকে বলে যাকে আমরা হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করি।'

লতিফা শুধু ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলো।

খলিল টয়লেটে যাচ্ছিলেন,রিদওয়ানকে অস্থির হয়ে মজিদ হাওলাদারের ঘরের দিকে যেতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রিদওয়ান মজিদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় জোরে শব্দ করলো। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। অস্থির হয়ে আছে। মজিদ হাওলাদার সবেমাত্র শুয়েছেন। দরজায় এতো জোরে শব্দ হওয়াতে খুব বিরক্ত হলেন। তিনি চোখে চশমা পরে দরজা খুললেন। ততক্ষনে খলিল হাওলাদারও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রিদওয়ানকে ডাকলেন, 'রিদু আব্বা?'

রিদওয়ান ঘাড় ঘুরিয়ে খলিলকে একবার দেখলো। দরজা খোলার শব্দ হতেই সে সামনে তাকায়। মজিদ কিছু বলার পূর্বে রিদওয়ান দুই হাত ঝাঁকিয়ে মজিদকে বললো, 'আমার কথা তো কোনোদিন শুনেন না। পদ্মজা কী করছে খবর রাখছেন?'

খলিল দুই তলায় উঠার সিঁড়িতে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেড়ি আবার কোন কাম করলো?'

মজিদ উৎসুক হয়ে রিদওয়ানের দিকে তাকালেন। রিদওয়ান এক হাত দিয়ে অন্যে হাতের তালুতে থাপ্পড় দিয়ে বললো, 'খুন করছে...খুন। জসিমের গলা কেটে রান্নাঘরে ফেলে রাখছে।'

মজিদ ও খলিল চমকালেন! রিদওয়ান গলায় জোর বাড়িয়ে বললো, 'খুন করেও একদম স্বাভাবিক আছে। মনে ভয়ডর নাই। রাম দা হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কতোটা ভয়ংকর হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন কাকা? আপনার অনুমতি নাই বলে ওই মাগীরে আমার সহ্য করতে হলো। নয়তো ওরে আমি কলপাড়েই গেঁথে আসতাম।'

মজিদ হাওলাদার কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আচমকা এমন একটা খবর পেয়ে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। রিদওয়ান গলার জোর আরো বাড়ালো, 'পদ্মজার হাতে অস্ত্র উঠে গেছে কাকা! অস্ত্র! ওদিকে আমিরের খবর নাই। পাতালঘরের দরজায় নতুন তালা দিয়ে চাবি নিয়ে ভেতরে বসে আছে। খাবারও কেউ নিয়ে যায় না,নিতেও আসে না। ভেতরে ও কী করতেছে তাও জানি না। ও নিজে মরবে আমাদেরও মারবে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমির-পদ্মজা দুজনই আমাদের জন্য হুমকি কাকা। বুঝতেছেন না কেন? আজকের ঘটনার পরও কি বুঝবেন না? সময় থাকতে আপনি দুজনের কবর খোঁড়ার অনুমতি দেন।'

বৃহস্পতিবার, দুপুর ১:৪০ মিনিট। পূর্ণা দুপুরের নামায আদায় করে লাহাড়ি ঘরের চেয়ে কিছুটা দূরে অবস্থিত গোলাপ গাছটির পাশে বসে রয়েছে। গোলাপ গাছটি তার ভীষণ প্রিয়। এই গাছটি তার মন খারাপের সঙ্গী,একাকীত্বের সঙ্গী! প্রেমা পূর্ণার পিছনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু পূর্ণা টের পেল না। সে অন্যমনস্ক। তার ঠোঁটে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। প্রেমা পূর্ণার কাঁধে হাত রাখে। পূর্ণা চমকে উঠে। প্রেমাকে দেখে বুকে তিনবার থুথু দিল। তারপর বললো, 'ভয় দেখালি কেন?'

'কখন ভয় দেখালাম?'

'কখন ভয় দেখালাম হা?'

প্রেমা ভ্রূকুঞ্চন করলো। পূর্ণা বললো, 'কী দরকার বল?'

পূর্ণার ব্যবহার দেখে বিরক্তি ধরে গেছে প্রেমার। সে তীব্র বিরক্তি নিয়ে বললো, 'বড় আম্মা খেতে ডাকছে।'

'যা,আমি আসছি।'

'আমার সাথে আসো।'

পূর্ণা রাগ নিয়ে বললো, 'যেতে বলছি,যা তো।'

'তুমি কী ভাবছিলে? মুচকি-মুচকি হাসছিলে কেন?'

'তোকে বলতে হবে?'

প্রেমা দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ,বলতে হবে।'

পূর্ণা মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'তর্ক করবি না। থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।'

'সবসময় ঝগড়া করো কেন?'

'আমি করি? নাকি তুই বেয়াদবি করে আমাকে রাগাস!'

প্রেমা গাল ফুলিয়ে চলে যেতে নিল,তখনই পূর্ণা চট করে প্রেমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। প্রেমা পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করে বললো, 'ছাড়ো। লাগবে না আমার আদর।'

পূর্ণা প্রেমাকে শক্ত করে ধরে রাখে। প্রেমার কাঁধে থুতুনি রেখে আহ্লাদী স্বরে বললো, 'কালতো সারাজীবনের জন্য চলেই যাব। রাগ করে না লক্ষী বোন।'

পূর্ণার কথা শুনে প্রেমা চুপ হয়ে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে পূর্ণার দিকে তাকালো। অবাক হয়ে প্রশ্ন বললো, 'কোথায় যাবা?'

পূর্ণা ঠোঁট কামড়ে হাসলো। প্রেমা জোর করে পূর্ণার থেকে ছুটে যায়। একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল। পূর্ণা সারাজীবনের জন্য চলে যাবে শুনে প্রেমা বিচলিত হয়ে পড়েছে। সে প্রশ্ন করলো, 'বলো, কোথায় যাবা?'

পূর্ণা হাত দিয়ে ঢেউয়ের মতো করে বললো, 'অনেক দূরে!'

'জায়গার নাম নেই?'

পূর্ণা হাসলো। তার চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রেমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙার পথে! পূর্ণা বললো, 'বিকেলে জানতে পারবি।'

'এখন বললে কী সমস্যা?'

পূর্ণা হঠাৎ চোখমুখ কঠিন করে বললো, 'বেশি কথা বলিস! আম্মা ডাকতেছে না খেতে? চল।'

'কিন্তু...'

পূর্ণা প্রেমাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়া দিল, 'চল,চল।'

বারান্দায় পা রাখার পূর্বে পূর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে গেইটের দিকে তাকালো। তার ভেতরে-বাহিরে বসন্তের কোকিল কুহু কুহু করে ডাকছে। মনের বাগানে ফুটেছে শত রঙের ফুল। সেই ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণে তলিয়ে যাচ্ছে সে। হারিয়ে যাচ্ছে বারংবার ফেলে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত মধুর ক্ষণে। সেদিন পূর্ণা হাওলাদার বাড়ি থেকে ফিরেই মোড়ল বাড়ির উঠানে বসে পড়ে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দেয় মুহূর্তের পর মুহূর্ত! বাসন্তী অনেক বুঝিয়েছেন, যেন পূর্ণা ঘরে যায়। চারিদিক ছিল কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশার জন্য কয়েক হাত দূরের বস্তুও চোখে পড়ছিল না। এমতাবস্থায় পূর্ণা উঠানে, শিশিরভেজা মাটিতে বসেছিল। প্রেমা-প্রান্ত কেউ বুঝাতে পারেনি। বাসন্তী কেঁদে বলেছেন, 'আমি তোর আপন মা না এজন্যে আমার কথা শুনস না?'

তাতেও পূর্ণার ভাবান্তর হলো না। সে যে বসে আছে তো আছেই। পাথর হয়ে গেছে। না শীত,না বাসন্তীর কান্না কিছুই ছুঁতে পারেনি। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। মা সমতূল্য বড় বোনের সাথে মনমালিন্য, ভালোবাসার পুরুষের সাথে বিচ্ছেদ কী করে সহ্য করবে? কী করে?...বুকের ভেতরটায় আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সে কী করে তা বাসন্তীকে দেখাবে? সন্ধ্যার আযান পড়ার পরও যখন পূর্ণা ঘরে গেল না তখন বাসন্তী ও প্রেমা উঠানে পাটি এনে বিছালো। তারপর পূর্ণাকে প্রেমা বললো, 'মাটিতে বসে থেকো না। পাটিতে বসো। কেন এমন করছো? বড় আপার সাথে কত খারাপ হলো! তার উপর তুমি এমন করছো!'

পূর্ণা আগের অবস্থানেই রইলো। "বড় আপার সাথে কত খারাপ হলো" কথাটি শুনে

তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বাসন্তী এবং প্রান্ত পূর্ণাকে টেনে পাটিতে নিতে চাইলে পূর্ণা চিৎকার করে কেঁদে বললো, 'কী সমস্যা তোমাদের? আল্লাহর দোহাই লাগে,একটু শান্তিতে থাকতে দাও। নয়তো আমি কিছু একটা করে ফেলবো। আমি আত্মহত্যা করবো। আমার আর সহ্য হচ্ছে না!'

পূর্ণার রুদ্রমূর্তির সামনে বেশিক্ষণ টিকে থাকার সাহস কারো হলো না। পূর্ণা যে ধাঁচের মেয়ে সে নিজের ক্ষতি করতে দুইবার ভাববে না। বাসন্তী ঘরে এসে চাপাস্বরে কাঁদতে থাকলেন। তিনি আত্মগ্লানিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। না পেরেছেন পদ্মজাকে অপবাদ থেকে বাঁচাতে,আর না পারছেন পূর্ণার কষ্ট কমাতে! সব ঘটনার জন্য তিনি নিজেকে দোষারোপ করছেন। বার বার মনে হচ্ছে, হেমলতা থাকলে এসব কিছুই হতো না। বাসন্তী মা হিসেবে নিজেকে ব্যর্থ মনে করছেন! প্রেমা বাসন্তীকে কাঁদতে দেখেও দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। তার নিজেরও বুক ভারী হয়ে আছে। গ্রামবাসী ছিঃ ছিৎকার করছে। বাড়ি বয়ে এসে যা তা বলে যাচ্ছে। বড় বোন পদ্মজার সাথে মৃত মা হেমলতাকেও তারা ছাড়ছে না। সাথে মৃদুল-পূর্ণার নাম তো আছেই। কিশোরী এই ছোট মনে আর কতক্ষণ সহ্য ক্ষমতা ধরে রাখা যায়! প্রেমার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ার আগে দ্রুত মুছে ফেললো সে।

চারপাশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে। পূর্ণা উঠান ছেড়ে তার প্রিয় গোলাপ গাছটির পাশে এসে বসলো। গাছের পাতা আলতো করে ছুঁয়ে দিতেই দুই ফোঁটা শিশির ঝরে পড়ে মাটিতে। প্রেমা পূর্ণার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বারান্দার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাসন্তী বারান্দার মুখে মোড়া নিয়ে বসে আছেন। পূর্ণাকে বাইরে রেখে তিনি ঘরে থাকতে পারবেন না! নিজের অজান্তে একসময় চোখ লেগে যায়। প্রান্ত টয়লেটে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিল। লাহাড়ি ঘরের চারপাশ অন্ধকারে তলিয়ে আছে দেখে সে এগিয়ে আসে। অন্ধকারের জন্য পূর্ণাকে তার চোখেই পড়ছে না। তাই সে রান্নাঘর গিয়ে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। তারপর পূর্ণার পাশে এসে বললো, 'আপা, ঘরে চলো।'

পূর্ণা রুক্ষ চোখে তাকায়। কাঠ-কাঠ কণ্ঠে বললো, 'যা এখান থেকে।'তাও প্রান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর পূর্ণার চেয়ে কিছুটা দূরে থাকা মুরগির খুপির উপর হারিকেন রেখে সে চলে যায়।

রাত গভীর থেকে গভীরত হয়। পূর্ণা গোলাপ গাছটি ছেড়ে লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় যায়। সেখান থেকে আবার গোলাপ গাছের সামনে আসে। রাত বাড়ার সাথে কষ্টগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আক্ষেপের ভারে শরীর ভার হয়ে আসছে! লাল বেনারসি পরার স্বপ্ন কী স্বপ্নই রয়ে যাবে? পায়ে আলতা দেয়া হবে না? হবে না একটা সংসার? যে সংসারে মৃদুল হবে কর্তা সে হবে কর্ত্রী! মৃদুল কেন তাকে বুঝলো না? মৃদুল কি তাকে ভালোবাসেনি? কখনো মুখফুটে কেন বলেনি ভালোবাসার কথা? অসহ্য যন্ত্রণায় তার ইচ্ছে হচ্ছে নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলতে!

গা ছমছমে পরিবেশ। নিস্তব্ধতায় ঘিরে আছে চারপাশ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো শিশির পড়ছে। লাহাড়ি ঘরের টিনের ছাদে টুপটুপ শব্দ হচ্ছে! পূর্ণার শরীর মৃত মানুষের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। মৃদু কাঁপছেও। তবুও তার ইচ্ছে হচ্ছে না,ঘরে যেতে। হঠাৎ এক জোড়া পায়ের শব্দ কানে এসে ধাক্কা দেয়। পূর্ণা থমকে যায়। সে টের পায় কেউ একজন তার চেয়ে কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণা চট করে উঠে দাঁড়ালো। ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুককে দেখে তার চোখেমুখে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। সে অন্যদিকে ফিরে তাকালো। তারপর আবার আগন্তুকের দিকে তাকালো। না সে সত্যি দেখছে! মৃদুল এসেছে! এই কুয়াশাজড়ানো রাত, টুপটুপ শিশির আর হারিকেনের হলুদ আলো স্বাক্ষী বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত মৃদুল ঘায়েল করা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে ছিল পূর্ণার দিকে! সেই চাহনির তীরবিদ্ধে পূর্ণার বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল শ্বাস-প্রশ্বাস! চোখের পলক পড়েনি দীর্ঘক্ষণ!

মৃদুল যখন অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো, 'পূর্ণা।'

তখন পূর্ণার সম্বিৎ ফিরলো। সে আবিষ্কার করলো, মৃদুলের উপস্থিতি, মৃদুলের চাহনি

তার মনের রাগ-ক্ষোভ পানি করে দিয়েছে! এ কেমন শক্তি! তবে মৃদুলের কণ্ঠ শুনে অভিমানের পাহাড়টা যেন মজবুত হয়ে দাঁড়িয়েছে! অভিমানের ভারে পূর্ণা বাজখাঁই কণ্ঠে বললো, 'কী চাই?'

মৃদুল মাথা নত করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। পূর্ণা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন উত্তর পেল না। তখন মৃদুলের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়,মৃদুল পথ আটকে দাঁড়ায়। তার মাথা নত।

পূর্ণা বললো, 'কী চান আপনি? এতো রাতে আমার বাড়িতে এসেছেন কেন? আপনার তো এতক্ষণে নিজের বাড়িতে থাকার কথা ছিল!'

মৃদুল কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না, গলা আটকে আসছে। সে পূর্ণার চোখের দিকে তাকালো। তার চোখেমুখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট! পূর্ণার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। ফর্সা মানুষের এই এক সমস্যা, তারা কাঁদলে চোখমুখ লাল হয়ে যায়। তখন দেখে খুব মায়া হয়। পূর্ণা গলার স্বর নরম হয়, 'কী বলবেন বলুন। বলে বিদায় হোন।'

কত নির্দয়ভাবে পূর্ণা বিদায় হতে বললো! মৃদুলের মনে হলো,এমন নিষ্ঠুর কথা সে আগে কখনো শুনেনি! সঙ্গে -সঙ্গে মৃদুলের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে তার ভুলের ক্ষমা কী করে চাইবে বুঝতে পারছে না। সারাদিন সে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে! হারে হারে টের পেয়েছে পূর্ণাকে শুধু মন নয়,তার সুখের চাবিও দিয়ে বসে আছে! কখন, কী করে তার এতোবড় ক্ষতি হয়ে গেল সে বুঝতেও পারেনি! ভেবেছিল,পূর্ণাকে এই মুখ আর দেখাবে না। কিন্তু রাতের আঁধার পাহাড়সম যন্ত্রণার সূচ নিয়ে যখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। উল্কার গতিতে হাওলাদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে দারোয়ানের কাছে জানতে পারলো, পূর্ণা নিজের বাড়ি চলে গিয়েছে। মৃদুল আর দেরি করেনি। কুয়াশার স্তর ভেদ করে ছুটে আসে প্রিয়তমার বাড়ি! কিন্তু এই মুহূর্তে মনের মণিকোঠায় জড়িয়ে রাখা প্রিয়তমাকে দেখে তার কথা হারিয়ে গেছে,হারিয়ে গেছে সত্ত্বা। নিজ সত্ত্বা হারিয়ে কাউকে ভালোবাসতে নেই! এ ক্ষতি কখনো পূরণ হয় না। কিন্তু প্রেমিক মন কি আর এতকিছু বুঝে! মৃদুলের চোখে পানি দেখে পূর্ণার গলা জড়িয়ে আসে। সে গোপনে ঢোক গিললো। মৃদুল তার কান্না আটকিয়ে বললো, 'আমি তোমারে ছাড়া থাকতে পারবো না পূর্ণা।'

পূর্ণা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। তখন মৃদুল তাকে অবজ্ঞা করে চলে গিয়েছিল,এখন সেও এর প্রতিশোধ নিবে! পূর্ণা বললো, 'কিন্তু আমি আপনাকে চাই না। আমার সাথে যাকে মানায় না আমি তার ধারেকাছেও থাকতে চাই না।'

পূর্ণার উচ্চারিত একেকটা শব্দ মৃদুলের বুক ছিঁড়ে ফুটো করে দেয়। সে পূর্ণার দিকে এক পা বাড়িয়ে বললো, 'আমি তহন বুঝি নাই। আমি...আমি আমার রাগ সামলাইতে পারি নাই।' মৃদুলের কথার ধরণ এলোমেলো! সে ভীষণ অস্থির। সে যেন নিজের মধ্যে নেই! পূর্ণা এত সহজে নরম হওয়ার পাত্রী নয়। সে তার তেজ উর্ধ্বে রেখে বললো, 'কৈফিয়ত দেয়ার জন্য কষ্ট করে কালো মেয়ের কাছে আসতে গেলেন কেন? রাতের কালো আঁধারে কালো মেয়েটাকে কি দেখা যাচ্ছে?'

মৃদুল কী বলবে,কী করবে বুঝতে পারছে না। আচমকা সে পূর্ণার কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। হঠাৎ যেন পাহাড়ের শক্ত মাটির দেয়াল ভেঙে ঝর্ণধারার বাঁধ ভেঙে গেল। পূর্ণার পায়ের তলার মাটি শিরশির করে উঠে। মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। সর্বাঙ্গে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। যেন মাথার উপর বরফের পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। মৃদুল কান্নামাখা স্বরে বললো, 'আমি কখন এমন হইয়া গেলাম পূর্ণা! তুমি আমারে কোন নদীতে নিয়া ঝাঁপ দিলা। নদীর একূলও পাই না,ওকূলও পাই না। তুমি হাত ছাইড়া দিলেই মরণ! ধইরা রাখো আমারে!'

মৃদুলের আকুল আবেদন শুনে পূর্ণার বুকের পাঁজর ব্যথায় টনটন করে উঠে। তার অভিমানের পাহাড় মুহূর্তে ধ্বসে যায়। মৃদুল কখন তাকে এতো ভালোবেসে ফেললো? এই

জাদু কখন হলো! এভাবে কোনো প্রেমিক কাঁদতে পারে! পূর্ণা মৃদুলের সামনে বসলো। তার চোখ দুটি আবারও জলে পূর্ণ হয়ে উঠে। সে মৃদুলের এক হাতে শক্ত করে ধরে। মৃদুল বললো,, 'পূর্ণা আমি আর কুনুদিন এমন করতাম না। কুনুদিন না! এইবারের মতো মাফ কইরা দেও। যদি আর এমন করি তুমি আমারে আমার লুঙ্গি দিয়া শ্বাস আটকায়া খুন কইরো!'

মৃদুলের কথা শুনে পূর্ণার মনের আকাশের মেঘ কেটে যায়। সে মৃদুলের হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে কান্না করে দিল। বিচ্ছেদের পরের পূর্ণমিলন এতো মধুর হয় কেন? পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে,মৃদুলকে নিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে!

শেষরাতের বাতাস সাঁ সাঁ করে উড়ছে। লাহাড়ি ঘরের বারান্দার চৌকিতে বসে আছে মৃদুল-পূর্ণা। দুজনের মাঝে এক হাত দূরত্ব। হাড় কাঁপানো শীত! পূর্ণা ঠকঠক করে কাঁপছে। মৃদুল মৃদু ধমকের স্বরে বললো, 'কখন থাইকা কইতাছি,ঘরে যাও।'

পূর্ণা কাঁপছে ঠিকই তবে তার মুখে হাসি। সে ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বললো, 'কাঁপতে ভালো লাগে আমার!'

'অসুস্থ হইয়া যাইবা তো। শরীর মরা মানুষের মতো ঠান্ডা হইয়া গেছে।'

'কিছু হবে না।'

মৃদুল পূর্ণাকে দেখে অবাক হচ্ছে। একটা মানুষ এমন তীব্র ঠান্ডা কী করে সহ্য করতে পারে! ফজরের আযান পড়ার খুব বেশি সময় নেই। ফজরের আযানের পূর্বে মৃদুলকে তার আত্মীয়র বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। ফজরের নামাযের পরই ট্রেন আসবে। মৃদল চৌকি থেকে নেমে বললো, 'আমি যাই এহন?'

মৃদুলের কণ্ঠে জড়তা। সে যেতে চাইছে না। পূর্ণা চৌকি থেকে নেমে মৃদুলের পাশে এসে দাঁড়ালো। মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আসবেন তো?'

মৃদুল পূর্ণার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। পূর্ণার দুই গালে হাত রেখে বিভ্রম নিয়ে বললো, 'বৃহস্পতিবার বিকালের মধ্যেই আইসসা পড়ুম। আর শুক্রবার আমার এই রানির সাথে আমার নিকাহ হইবো।'

মৃদুল নিকাহ শব্দটা খুশিতে বাকবাকম হয়ে উচ্চারণ করে। পূর্ণা বললো, 'আপনার আম্মা রাজি না হলে?'

'পুরা দুইন্নারে এক পাশে রাইখা শুক্রবার আমি তোমারে বিয়া করাম। বিয়ার শাড়ি,গয়না সব নিয়া আসুম। তুমি খালি প্রহর গুণতে থাহো।'

পূর্ণার খুশিতে কান্না পাচ্ছে। তিনদিন পর সেও বউ সাজবে! মৃদুলের বউ হবে! সুদর্শন, বাউন্ডুলে,রাগী ছেলেটার বউ! ভাবতেই বুকের ভেতর শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। মৃদুল আমুদে গলায় বললো, 'এহন যাও, লেপের তলে ঢুইকা ঘুম দেও। তোমারে ধরছি না সাপরে ধরছি বুঝা যাইতাছে না। এত্ত ঠান্ডা! যাও ঘরে যাও।'

'টর্চ নিয়ে আসেননি? অন্ধকারে যাবেন কী করে?'

মৃদুল চুল ঝাঁকি দিয়ে ভাব নিয়ে বললো, 'আমি মিয়া বংশের ছেড়া! দুইন্নাত এমন কিছু নাই যে আমার পথ আটকাইবো! যেমনে আইছি ওমনেই যামু।'

পূর্ণা ফিক করে হেসে দিল।

গেইটের কাছাকাছি এসে পূর্ণা বললো, 'তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু! আমি অপেক্ষা করব।'

মৃদুল হেসে মাথা নাড়াল। ইশারায় আশ্বস্ত করলো, সে তাড়াতাড়ি আসবে! গেইটের কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো মৃদুল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে! মনে হচ্ছে কিছু একটা বলা হয়নি। সে কথাটি না বললে,বড় ভুল হয়ে যবে। মৃদুল পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো। খুব কাছাকাছি! পূর্ণাও উৎসুক হয়ে আছে। সেও কি যেন শুনতে চাইছে! মৃদুল তার শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল। তারপর ডাকলো, 'পূর্ণা?'

মৃদুলের কথার সাথে মুখ থেকে ধোঁয়া বের হয়। পূর্ণা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। মৃদুল পূর্ণাকে একবার দেখলো তারপর লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকালো। তারপর আবার পূর্ণার দিকে

তাকিয়ে বললো, 'তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর সুখ আমার জন্যে হারাম হইয়া যাক পূর্ণা!'
মৃদুলের প্রতিটা কথা এতো মধুর কেন মনে হচ্ছে পূর্ণার! তারা যেন নতুন কোনো জগতে চলে এসেছে। যেখানে শুধু সে,মৃদুল, প্রেম,প্রেম আর প্রেম! পরক্ষণেই মৃদুল বললো, 'ভালোবাসি না কইলে হয় না? কইতেই হয়?'

পূর্ণা চোখে জল নিয়ে হেসে উঠে। তার রেশমি কালো চুল মৃদু বাতাসে উড়ছে। কুয়াশার আবছা আলোয় শ্যামবর্ণের পূর্ণাকে আবেদনময়ী মনে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারের নিজস্ব ক্ষমতা আছে। রাত মানুষের মনের অনুভূতিকে সযত্নে জাগ্রত করে তুলে। মৃদলের উপর রাত তার নিজস্ব ক্ষমতা ফলায়! ফলস্বরূপ, মৃদুলের মনের জানালায় উঁকি দেয় নিষিদ্ধ সব আবদার! যখন মৃদুলের নিজের মনের চাওয়া বুঝতে পারলো সে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলে উঠলো, 'শয়তান,শয়তান!'

পূর্ণা হতভম্ব হয়ে যায়। সে চোখমুখ বিকৃত করে বললো, 'শয়তান কে? আমি?'

মৃদুল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে বললো, 'না, না! তুমি হইবা কেন?'

মৃদুল চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে আবার বললো, 'দেখো,আমার চারপাশে শয়তান ঘুরতাছে।
পূর্ণা মৃদুলের চারপাশ দেখে বললো, 'কোথায়? কীভাবে দেখলেন?'

মৃদুল অসহায় চোখে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়েই থাকে। তারপর বললো, 'আমার তোমারে চুমু খাইতে ইচ্ছা করতাছে। এইটা তো শয়তানের কাম!'

মৃদলের সহজ/সরল স্বীকারোক্তি। পূর্ণার কান গরম হয়ে যায়। লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলে। মৃদুল অস্থির হয়ে বললো, 'আমি যাইতাছি।'

কথা শেষ করেই মৃদুল ঘুরে দাঁড়ায়। গেইটের বাইরে যেতে যেতে দুইগালে থাপ্পড় দিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করলো, 'আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ!'

মৃদুল চোখের আড়াল হতেই পূর্ণা একা একা হেসে কুটি-কুটি হয়ে যায়।

পূর্ণা পায়ে আলতা দিয়ে প্রেমাকে বললো, 'ভালো দেখাচ্ছে না?'

প্রেমা পূর্ণার উপর ভীষণ রেগে আছে। সে তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বললো, 'কথা বলব না তোমার সাথে।'
'ওমা! আমি আবার কী করলাম?'

'আম্মা এতো রান্নাবান্না করছে। আর তুমি পুরো বাড়ি নতুন করে গুছালে এখন আবার সাজতে বসেছো। কেন এসব হচ্ছে সেটা বলছো না! কেন?'

পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসলো। দুই ডজন লাল কাচের চুড়ি দুই হাতে পরে বললো, 'আমি কি আর কখনো সাজিনি?'
'এবার আলাদা মনে হচ্ছে।'

'সেটা তোর দোষ।'

'আপা,বলো না।'

'বিরক্ত করবি না তো।'

প্রেমা রাগে পায়ে গটগট শব্দ তুলে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। এখন সে বাসন্তীকে চাপ দিয়ে সব জেনে নিবে! প্রেমাকে রাগাতে পূর্ণার বেশ লাগে। সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। মৃদুল পূর্ণার আলতা দেয়া পা খুব পছন্দ করে! যতবার পূর্ণা আলতা দিয়েছে মৃদুল ততবার প্রশংসা করেছে। পূর্ণার নিজেকে প্রজাপতি মনে হচ্ছে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছে যত্রতত্র। চোখ বুঁজলেই সেদিনের রাতটা ধরা দেয় ছবির মতন! মৃদুল চলে যাওয়ার পরদিন সকালে উঠেই পূর্ণা পদ্মজার কাছে গিয়েছিল। দুই বোনের মন-মালিন্য শেষ হয়েছে। পূর্ণার মুখে সব শুনে পদ্মজা ভীষণ খুশি হয়েছে। মাঝে একদিনের বেশি সময় চলে গেল,পদ্মজার সাথে পূর্ণার দেখা হয়নি। তাই পূর্ণা সিদ্ধান্ত নেয় সে এখন হাওলাদার বাড়িতে যাবে। মৃদুলের জন্য অপেক্ষা করা সময়টা খুব বেশি দীর্ঘ মনে হচ্ছে। ওই বাড়িতে গেলে সময়টা কেটে যাবে, আর ফিরেই দেখবে মৃদুল চলে এসেছে! তাছাড়া

আমিরের সাথে পূর্ণা সাক্ষাৎ করতে চায়। পদ্মজার অনিশ্চিত জীবনটা গুছিয়ে দেয়ার কোনো পথ আছে নাকি খুঁজতে হবে! পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে নিল। তারপর চিৎকার করে বাসন্তীকে বললো, 'বড় আম্মা,আপার কাছে যাচ্ছি।'

রান্নাঘর থেকে বাসন্তীর জবাব আসে, 'যাস না এখন।'

কিন্তু চঞ্চল পূর্ণা কী কারো কথা শুনার মেয়ে! সে দৌড়ে পালাতে চায়। গেইটের কাছে এসেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বড়ই কাঁটা পড়ে ছিল,সেই কাঁটা তেড়চাভাবে পূর্ণার হাতে প্রবেশ করে। কিঞ্চিৎ রক্ত বেরিয়ে আসে। তাতেও দমবার পাত্রী নয় সে। কাঁটা বের করে দ্রুত মোড়ল বাড়ি ছাড়লো! বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পূর্ণার মনটা হঠাৎ করেই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে মোড়ল বাড়ির দিকে তাকালো। গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে তাদের ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে!

পর্ব ৮৭

পদ্মজা দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফরিনার কবরের পাশে গেল। সাথে নিয়ে এসেছে গোলাপ, জারবেরা,গাঁদা ও চন্দ্রমল্লিকা গাছের চারা। ফরিনার কবরের চেয়ে একটু দূরে গর্ত খুঁড়লো। প্রথমে গোলাপ গাছের চারা রোপণ করে। রিদওয়ান অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে পদ্মজাকে দেখে সেকেন্ড তিনেকের জন্য দাঁড়ালো। তার চোখেমুখে আনন্দের ছাপ! তারা গত দুইদিন পদ্মজার উপর কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করেনি এবং বাজে আচরণও করেনি! পদ্মজা প্রথম যখন ব্যাপারটা ধরতে পারলো অবাক হয়েছিল। পরে আন্দাজ করে নিয়েছে, আড়ালে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র চলছে! পদ্মজা স্বাভাবিক আচরণ করলেও ভেতরে ভেতরে সর্বক্ষণ ওঁৎ পেতে থেকেছে। সাবধান থেকেছে।কিন্তু কোনো আক্রমণ এখনো আসেনি। রিদওয়ান পদ্মজার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও সেদিকে গেল না। পদ্মজার উদ্দেশ্যে শিস বাজিয়ে যেখানে চাচ্ছিল সেদিকে চলে যায়। পদ্মজা শিস শুনেও তাকালো না। সে বুঝতে পেরেছে শিসটা কে দিয়েছে! পদ্মজা আরেকটা গর্ত খুঁড়লো চন্দ্রমল্লিকার জন্য।

আমির জানালা খুলে বাইরে তাকালো। সঙ্গে-সঙ্গে চোখেমুখে এক মুঠো বাতাস আর তীব্র আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমির চোখ ছোট ছোট করে ফেললো। তারপর চারপাশে চোখ বুলাল। অন্দরমহলের কারো উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। কারো সাড়া শব্দও নেই। বাড়িটা মৃত হয়ে গেছে! একসময় কত শোরগোল ছিল! শাহানা,শিরিন,রানি,লাবণ্য,ফরিনার মতো ভালোমনের সহজ-সরল মানুষগুলো ছিল। এখন কেউ নেই! লাবণ্যর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল,হয়েছে কী? লাবণ্য নিজের ভাইকে ছাড়া কী করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল! আর রানি? রানি ভাগ্যের সাথে অভিমান করে কোথায় হারিয়ে গেল? আদৌ বেঁচে আছে ? নাকি অভিমানের পাল্লাটা এতোই ভারী যে সইতে না পেরে নিজেকে উৎসর্গ করেছে? আমিরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সে ফরিনার কবরের দিকে তাকালো। পদ্মজা বাঁশের কঞ্চি নেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে মাত্র। তার সাদা শাড়ির আঁচল মাটি ছুঁইছুঁই। শাড়ির একপাশে কাদা মাখানো। সাদা শাড়ি পরা অবস্থায় পদ্মজাকে দেখে আমিরের আত্মা স্তব্ধ হয়ে যায়! সে চেয়ার খামচে ধরে। বুকের ভেতর সূচের মতো তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা শুরু হয়। ক্ষণ মুহূর্তের পার্থক্যে সেই যন্ত্রণা বুক ছাপিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাখ্যাতীত যন্ত্রণার অনুভতিতে তার ভেতরটা গাঁট হয়ে যায়।

সে তিনরাত, দুইদিন পাতালঘরে থেকে আজ সকালে বেরিয়ে এসেছে। অন্দরমহলে না গিয়ে সোজা আলগ ঘরে চলে আসে। মগার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মগা আমিরকে তার পাশে শুতে দেখে চমকায়। তবে উদ্ভ্রান্ত আমিরের সাথে কথা বলার সাহস হয় না। সে মেরুদণ্ড সোজা করে চুপচাপ শুয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর আমির ঘুম ঘুম চোখে বললো, 'আমি যে এখানে আছি কেউ যেন জানতে না পারে।'

মগা সোজা থেকেই চোখ ঘুরিয়ে আমিরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আইচ্ছা।”

আমির ঘুমিয়ে পড়ে। এইতো কিছুক্ষণ আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। শরীরে এক ফোঁটাও শক্তি ছিল না। দুইদিন শুকনো খাবার আর দুই বোতল পানি খেয়ে কাটিয়েছে। মগা আমিরের মুখ দেখে বুঝতে পারে, আমির ক্ষুধার্ত! সে অন্দরমহল থেকে পিঠা এনে দেয়। লতিফা গতকাল বিকেলে পিঠা বানিয়েছিল। আমির বিনাবাক্যে পিঠা খেল। তারপর জানালা খুলে পদ্মজার পরনে সাদা শাড়ি দেখে থমকে গেল,স্তব্ধ হয়ে গেল। আমিরের বুকের ভেতর থেকে কেউ একজন বললো, “এই চোখ গলে যাক। দৃষ্টি কমে যাক। সাদা রঙ এতো বিচ্ছিরি কেন?”

আমির অযত্নে বড় হওয়া মাথার চুলগুলো এক হাতে টেনে ধরে হা করে শ্বাস নিল। জানালা দিয়ে আসা আলোয় মগা আবিষ্কার করলো,আমিরের হাতে অগণিত কামড়ের দাগ! তাও সে চুপ থাকলো। আগ্রহ চাপা দিল। আমির হাতে কামড় দেয়ার জন্য হা করে তখন মগার উপস্থিতি টের পায় আর থেমে যায়। তার চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকমের লাল! মগা

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে ফেলে। আমির পানি পান করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে।

পূর্ণা হাওলাদার বাড়িতে ঢুকেই আলগ ঘরের সামনে আমিরকে দেখতে পায়। আমিরকে দেখে অজানা,বোবা একটা অনুভূতি কুন্ডলী পাকিয়ে পূর্ণার বুকের ভেতর ঢুকে পড়ে। সে দৌড়ে আসে। পূর্ণাকে আসতে দেখে,আমির তার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে, হাসি হাসি মুখ করার চেষ্টা করলো। পূর্ণা আমিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে অবাক চোখে আমিরকে দেখে। আমিরের মাথার চুল লম্বা হয়েছে। চুলগুলো আগে চিকচিক করতো এখন কেমন ময়লা দেখাচ্ছে! দাঁড়ি-গোঁফের জন্য গাল দেখা যাচ্ছে না। শুকিয়েছে অনেক। আমিরকে দেখে পূর্ণার চোখেমুখে যে আনন্দটা আগে ফুটে উঠতো সেটা আজ নেই। বরং বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে! আমিরকে দেখেই পূর্ণার চোখ দুটি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

পূর্ণার আমিরের জন্য মায়া হয়। আমির কখনো তার বোনের জামাই ছিল না,বড় ভাই ছিল! তাই অনুভূতিটা ছোট বোনের মতোই রক্তাক্ত।

পূর্ণা পাংশুটে স্বরে বললো, 'আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না ভাইয়া।'

পূর্ণার কথা শুনে আমির অবাক হলো না। সে শুনেছে, পূর্ণা একরাত এখানে ছিল। তাহলে পদ্মজা নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। পূর্ণা আবার বললো, 'এতো নিখুঁত অভিনয় কেউ করতে পারে না। তোমার ধমক,উপদেশ, ভালোবাসা কিছু অভিনয় ছিল না। এতটুকু আমি বুঝতে শিখেছি। তুমি চাইলে সব খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে পারবে। ভাইয়া দয়া করে তুমি আমার ভালো ভাই-ই থাকো!'

পূর্ণা কেঁদে দিল। সে কান্না ছাড়া অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না। আমির সবসময় পূর্ণার মাথায় হাত রেখে উপদেশ দেয়,স্বান্তনা দেয়। অভ্যাসমতো আজও পূর্ণার মাথায় হাত রাখতে গেল,কিন্তু রাখলো না। থেমে গেল। যদি পূর্ণা এই ছোঁয়াকে অপবিত্র মনে করে! আমির নিজের হাত গুটিয়ে নিল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললো, 'মৃদুল নাকি আজেবাজে কথা বলেছে?'

পূর্ণার বুকের ভেতরে থাকা টনটনে অভিমানটা কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো, 'কথা ঘোরাচ্ছ কেন ভাইয়া?'

আমির নিরুত্তর। পূর্ণা বললো, 'তোমার নাকি মন নেই? মায়াদয়া নেই? তুমি নাকি পাষাণ, নিষ্ঠুর!'

এতো করুণ কারো কণ্ঠ হয়? বোন বলছে, তুমি নাকি পাষাণ,নিষ্ঠুর! উত্তরে কী বলবে আমির? হ্যাঁ আমি পাষান বলবে? নাকি চুপ থাকবে? আমির বুঝতে পারলো না। পূর্ণা আমিরের নিশ্চুপ থাকাটা পছন্দ করছে না। শ্যামবর্ণের আমির হাওলাদারকে একসময় পূর্ণা পছন্দ না করলেও এখন আত্মার সাথে মিশে গিয়েছে। আমির বাচাল প্রকৃতির মানুষ। সারাক্ষণ কথা বলে। কিন্তু আজ তার মুখে কথা নেই। সে নির্জীব, নিষ্ক্রিয়। পূর্ণা সাবধানে ভেজা কণ্ঠে বললো, 'আমিও কি তোমাকে ঘৃণা করব ভাইয়া?'

আমির ছটফট করতে থাকে। তার পা দুটি অস্থির,চোখের দৃষ্টি অস্থির। কপালে ছড়িয়ে থাকা কয়টা চুল টেনে ধরে। পূর্ণা গাঢ় স্বরে বললো, 'আপা খুব কষ্টে আছে ভাইয়া। আপা ছোট থেকে কষ্ট পেয়ে আসছে। এখনো পাচ্ছে। আর কতদিন কষ্ট পাবে?কবে সবকিছু ঠিক হবে?'

আমির চটজলদি উত্তর দিল, 'দুইদিন!'

পূর্ণা ভ্রু কুঁচকাল। বললো, 'দুইদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে?'

আমির কথা বললো না। তবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। পূর্ণার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। তবে কি,আমির সবকিছু ছেড়ে দিতে যাচ্ছে! পূর্নার ঠোঁটের হাসি প্রশস্ত হয়। সে খুশিতে বাকবাকুম হয়ে যায়। বললো, 'সত্যি?'

আমির ধীরসুস্থে বললো, 'আমাদের কী কথা হয়েছে পদ্মজাকে বলো না এখন।'

'বলব না,ভাইয়া। ভুলেও বলব না।'

আমিরের সাথে পূর্ণার বেশিক্ষণ কথা হলো না। আমির চুপচাপ,বিষণ্ণ। পূর্ণা অনুমতি

নিয়ে পদ্মজার কাছে চলে যায়। আমির বারান্দা থেকে চেয়ার নিয়ে বাইরে এসে বসলো। লতিফা মগাকে বাজারে পাঠানোর জন্য আলগ ঘরে আসে। ঘর থেকে বাইরে তাকিয়ে আমিরকে দেখতে পেল। আমিরকে দেখে সে প্রাণ ফিরে পায়! উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ঘর থেকে চিৎকার করে ডাকলো, 'ভাইজান।'

আমির তাকালো। লতিফা ছুটে বাইরে আসে। সে গত দুইদিন পাতালঘরের আশেপাশে গিয়ে ঘুরঘুর করেছে কিন্তু আমিরের দেখা পায়নি। পদ্মজার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা না বলা অবধি সে কিছুতেই শান্তি পাবে না!

পদ্মজা চারা লাগানোর পর আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে গোড়ার মাটি শক্ত করে দিল। এরপর গোড়ায় পানি দিল। তারপর গাছকে খাড়া রাখার জন্য বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে। কাজ শেষ করে হাত ধুয়ে উঠতেই পূর্ণার গলা ভেসে আসে, 'আপা?'

পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। পূর্ণার চোখ দুটি মারবেলের মতো গোল গোল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার বুঝতে পারলো,তার পরনের সাদা শাড়ি দেখে পূর্ণা অবাক হয়েছে! পূর্ণা এগিয়ে এসে রাগী স্বরে বললো, 'সাদা শাড়ি পরছো কেন আপা? তুমি কি বিধবা?'

পদ্মজা বালতি হাতে নিয়ে বললো, 'বিধবা হলেই মানুষ সাদা শাড়ি পরে? এমনি পরা যায় না?'

'বিবাহিতারা সাদা শাড়ি পরতে পারে না। আবার এমন শাড়ি! অন্য কোনো রঙই নাই।'

'বলছিলাম না, এই বাড়িতে না আসতে? আমিতো আগামীকাল সকালেই যেতাম।'

'তুমি শাড়ি পাল্টাও।'

পদ্মজা ভ্রুকুটি করে বললো, 'তুই তো ক্যাটকেটে হয়ে গেছিস। সংসার করবি কী করে?'

'আপা তুমি এই সাদা শাড়ি এক্ষুনি পাল্টাবে।'

পূর্ণাকে বাচ্চাদের মতো জেদ করা দেখে পদ্মজা হাসলো। বললো, 'কেন ভালো দেখাচ্ছে না?'

পূর্ণা চোখ ছোট ছোট করে বললো, 'না,দেখাচ্ছে না। ভূতের মতো দেখাচ্ছে।'

পূর্ণার দৃঢ়কণ্ঠ! তাকে এখন যাই বলা হউক সে শুনবে না। আগামীকাল বিয়েটা হয়েই গেলে পদ্মজার শান্তি। পদ্মজা অন্দরমহলের দিকে যেতে যেতে বললো, 'ঘরে আয়।'

'আগে বলো, শাড়ি পাল্টাবা?'

পদ্মজার পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণা রাগী রাগী ভাব আনার চেষ্টা করে। পদ্মজা হাসলো। বললো, 'ঘরে চল। পাল্টাব।'

পূর্ণা পদ্মজাকে পিছন থেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। আজকের দিনটা আসলেই সুন্দর! যা চাচ্ছে তাই হচ্ছে! সে উল্লাসিত। পদ্মজা বললো, 'বাড়ি ছেড়ে এলি কেন? মৃদুল এসে তোকে না দেখলে মন খারাপ করবে।'

'করলে করুক!'

ঘরে এসে পূর্ণা জোর করে পদ্মজাকে কালো শাড়ি পরিয়ে দিল। পদ্মজাও মেনে নিল। যদি মৃদুল আজ আসে আগামীকাল আল্লাহ চাইলে পূর্ণার বিয়ে হবে। তারপর চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। এরপর আর কোনোদিন দেখা হবে নাকি পদ্মজা জানে না! সজ্ঞানে,পরিকল্পিতভাবে সে যা করতে যাচ্ছে,তাতে আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই

আজ আর কালকের দিনটা শুধু পূর্ণার মতোই হউক! পূর্ণা পদ্মজাকে শাড়ি পরানো শেষে বললো, 'কত সুন্দর লাগছে! আর তখন কী একটা মরা রঙের শাড়ি পরেছিলে। দেখতে খুব খারাপ লাগছিল।'

'আসলেই দেখতে খারাপ লাগছিল?'

পূর্ণা অসহায় চোখে তাকায়। সে কী করে বলবে, তার আপাকে সবকিছুতেই ভালো

দেখায়। কিন্তু সাদা রঙটা যে অশুভ ইঙ্গিত দেয়!

পূর্ণার মনের অবস্থা পদ্মজা যেন উপলব্ধি করতে পারে। সে পূর্ণাকে বিছানায় বসিয়ে বললো, 'আজ আমার বোনকে খুব বেশি সুন্দর লাগছে।'

পূর্ণা লজ্জা পেল। পদ্মজা বললো, 'কী খাবি?'

পূর্ণা আয়েশ করে বসে বললো,'

'খাব না। খেয়ে আসছি।'

'ভাপা পিঠা খাবি? লুতু বুবু বানিয়েছে।'

'না আপা কিছুই খাবো না। আপা?'

পূর্ণা চাপাস্বরে 'আপা'ডাকলো। পদ্মজা উৎসুক হয়ে তাকালো। পূর্ণা বললো, 'বাড়ির মানুষদের কী অবস্থা?'

'জানি না। খাওয়ার সময় শুধু দেখা হয়। তারাও কিছু বলে না আমিও না।'

পূর্ণা প্রবল উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইলো, 'ওদের নিয়ে কী পরিকল্পনা করেছো?'

পদ্মজা তার পরিকল্পনা চেপে গেল, 'এখনো ভাবিনি। তুই তোর বিয়েতে মন দে। নামায-রোজা কিন্তু কখনো ছাড়বি না। ভদ্রভাবে থাকবি। মাথা ঢেকে রাখবি সবসময়। আর অন্যায় করবি না আর কখনো সহ্য করবি না। ঠিক আছে?'

পূর্ণা গর্ব করে বললো, 'আমি গত দুইদিন এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়িনি। এখনো দুপুরের নামায পড়ে আসছি।'

'এইতো,ভালো মেয়ে। ভালো বউও হবে।'

পূর্ণার চোখভর্তি কাজল। ডাগরডোগর চোখ দুটি কাজলের ছোঁয়াতে ফুটে আছে। সোজা সিঁথি করে লম্বা চুল বেণী করা। কানে সাত রঙের গোল আকৃতির দুল। গায়ের ওড়নায় পাথরের কাজ। হাতে ঝনঝন করছে কাচের চুড়ি। সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। পদ্মজা মুগ্ধ হয়। সে পূর্ণার এক হাতের উল্টোপাশে চুমু দিয়ে বললো, 'সত্যি আজ খুব বেশি সুন্দর লাগছে! নজর না লাগুক। মাশা-আল্লাহ।'

পূর্ণা মনে মনে ভীষণ খুশি হয়। গড়গড় করে উগড়ে দেয় ভেতরের সব কথা,স্বপ্ন,আশা। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে,সে যেন বহু বছর পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে। বা একটা রঙিন ফড়িং বোতল থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে উড়ছে। পূর্ণাকে এতো খুশি দেখে পদ্মজার মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। তার কোমল হৃদয়টা পূর্ণার মনখোলা হাসি দেখে খুশিতে কেঁদে উঠে।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে পূর্ণা অন্দরমহল থেকে বের হয়। পদ্মজা মগাকে ডেকে বললো,পূর্ণাকে এগিয়ে দিয়ে আসতে। পূর্ণা জেদ ধরে, 'আমি একা যেতে পারবো আপা। সন্ধ্যা তো হয়নি।'

পূর্ণার জেদকে পদ্মজা পাত্তা দিল না। তাই পূর্ণা মগার সাথে যেতে রাজি হয়। পূর্ণা যাওয়ার আগে শক্ত করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরলো। পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'সকালেই আসব।'

পূর্ণা পদ্মজার দিকে মুখ তুলে তাকায়। বললো, 'তোমার সুখই আমার সুখ আপা। তুমি আমার মা,তুমিই আমার ভালোবাসা।'

পূর্ণা কেন এতো ভালোবাসে? পদ্মজার বুক ভরে যায়। সে পূর্ণার গাল ছুঁয়ে বললো, 'আম্মাকে তোর মাঝে খুঁজে পাই আমি। যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি আমার মাও চলে যাবে।'

পূর্ণার কান্না পায়। সে আবার পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। দুই বোনের বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। পদ্মজা বেলা দেখে তাড়া দিল, 'বাড়ি যা। সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

'আরেকটু জড়িয়ে রাখি।'

পূর্ণার মায়াময় আবদার! পদ্মজা কী বলবে খুঁজে পায় না। পূর্ণাকে বুকের সাথে শুধু চেপে ধরে রাখে। আকাশপানে চেয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে,তার বোনটা যেন সুখী হয়। মৃদুলের ভালোবাসায় পূর্ণার জীবনটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠে।

হাওলাদার বাড়ি থেকে দুই মিনিট দুরত্বে গিয়ে পূর্ণার মনে পড়ে,সে মৃদুলের কথা আমিরকে বলেনি। এমনকি বিয়ের কথাও বলেনি! পদ্মজা আমিরকে কিছু বলবে না পূর্ণা জানে। এখন যদি সেও না বলে,কাল যদি আমির তাদের বাড়িতে না যায়? পূর্ণা হাঁটা থামিয়ে মগাকে বললো, 'এখন বাড়ি যাব না। আমাকে আবার ও বাড়িতে যেতে হবে।'

'রাইত হইয়া যাইব।'

'তুমি যাও। আমি আমির ভাইয়ার সাথে দেখা করব।'মগা কান চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'পরে আমি তোমারে দিয়া আইতে পারতাম না। বাজারে যামু।''তুমি বাজারে যাও। আমাকে ভাইয়া দিয়ে আসবে।'

'আইচ্ছা,তাইলে আমি যাই।'

মগা বাজারের দিকে চলে যায়। পূর্ণা আবার হাওলাদার বাড়িতে আসে। হাওলাদার বাড়ির সুপারি গাছগুলো মৃদু বাতাসে দুলছে। বাতাস শীত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্ণা তার ওড়না ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল। আলগ ঘরের আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার আযানের সুর ভেসে আসে কানে। দিনের আলো বিদায় নিচ্ছে,ফিরে আসছে গাঢ় অন্ধকার। আলগ ঘরের সবকটা ঘরে পূর্ণা আমিরকে খুঁজলো। ধান রাখার ঘরে গিয়ে সে একটু ভয় পেয়েছিল বৈকি! সেই ঘরে জানালা নেই। তাই ঘরটি অন্ধকারে ডুবে ছিল। ঘরে প্রবেশ করতেই একটা কালো বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে। পূর্ণার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বুকে থুথু দিয়ে দ্রুত সে ঘর থেকে বের হয় আসে। প্রতিটি ঘরে আমিরকে খোঁজে। কিন্তু কোথাও আমিরকে পেল না। অন্দরমহলে গেল নাকি?

পূর্ণা যখন আলগ ঘর থেকে বের হতে যাবে তখন দেখলো, খলিল হাওলাদারের সাথে বোরকা পরা একটি মেয়ে। তারা দ্রুত হাঁটছে। মেয়েটির হাতে চাপাতি! পূর্ণার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে যায়। শিরশির করে উঠে বুকের ভেতরটা। খলিল চোরের মতো চারপাশ দেখছে আর হাঁটছে। পূর্ণা নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। খলিল মেয়েটিকে নিয়ে অন্দরমহলে না গিয়ে অন্দরমহলের পিছনে যাচ্ছে। পূর্ণার মনে প্রশ্ন জাগে,তারা কি পাতালঘরে যাচ্ছে? সাথে মেয়েটি কে? খলিলের মতো খারাপ লোকের সাথে একটা মেয়ে জঙ্গলের দিকে কেন যাবে? মেয়েটির হাতে চাপাতি-ই বা কেন? পূর্ণার মাথায় প্রশ্নগুলো আসতেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শিরদাঁড়া উঁচিয়ে আলগ ঘর থেকে বের হলো। একবার ভাবলো,পদ্মজাকে গিয়ে বলবে। কিন্তু তারপর ভাবলো, ততক্ষণে যদি মেয়েটি হারিয়ে যায়। মেয়েটির সম্পর্কে বোধহয় পদ্মজা জানে না। তাই তাকে বলেনি! মেয়েটি যদি পদ্মজার কোনো ক্ষতি করে বসে! কিছু করার আগে জানতে হবে মেয়েটি কে? এই বাড়ির সাথে তার কী সম্পর্ক! পূর্ণা বুকে থুথু দিয়ে খলিলের পিছু নিল। সে ঠোঁট টিপে সাবধানে এগিয়ে যায়। উত্তেজনায় তার হাত-পা কাঁপছে। কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বার বার ঢোক গিলছে। ততক্ষণে আকাশ তার ঝাঁপি থেকে অন্ধকার নামিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। পূর্ণা যত এগুচ্ছে তত কাঁপুনি বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘনঘন। একবার ভাবলো,চলে যাবে। কিন্তু কৌতূহল তাকে জাপটে ধরে রেখেছে। তাই পিছু হটতে পারলো না। চারপাশ নির্জন,ছমছমে! খলিল মেয়েটিকে নিয়ে অন্দরমহলের পিছনে চলে যেতেই পূর্ণা দৌড়ে শেষ মাথায় আসে। অন্দরমহলের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সাবধানে জঙ্গলের দিকে উঁকি দেয়। খলিল বোরকা পরাহিত মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা চাবি বের করে মেয়েটির হাতে দিলেন। তারপর চাপাস্বরে কিছু বললেন। মেয়েটিও যেন কিছু বললো! পূর্ণা রাতের জঙ্গল ভয় পায়। একটু পর গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে চারপাশ। তার ভীতু মন কিছুতেই খলিলের পিছু পিছু জঙ্গলের ভেতর যেতে সায় দিবে না! তাই পূর্ণার বোকা মস্তিষ্ক বুদ্ধি করলো,সে দূর থেকে খলিলের উপর পাথর ছুঁড়ে মারবে। পাথর কে মেরেছে সেটা দেখার জন্য খলিলের সাথে মেয়েটিও তাকাবে। আর তখনই পূর্ণা মেয়েটির মুখ দেখে নিবে আর দৌড়ে পালাবে। যে ভাবনা সে কাজ! পূর্ণা চারপাশে চোখ বুলিয়ে ছোট

একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। তারপর খলিলের উপর ছুঁড়ে মারলো। পাথরটি সোজা খলিলের ঘাড়ের উপর পড়লো। খলিল চমকে তাকালেও মেয়েটি তাকায়নি। মেয়েটি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চুপচাপ থাকাটা বলে দেয়,সে সাবধানী মানুষ! শত্রুর উদেশ্য বুঝার ক্ষমতা আছে! পূর্ণার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। খলিল পূর্ণার দিকে তেড়ে আসার আগে পূর্ণা ছুটে পালাতে উল্টোদিকে দৌড় দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না। আচমকা সেখানে রিদওয়ান উপস্থিত হয়। জাপটে ধরে পূর্ণাকে।

পূর্ণা চিৎকার দেয়ার পূর্বে রিদওয়ান মুখ চেপে ধরলো। মেয়েটি রিদওয়ানকে দেখে জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। খলিল রিদওয়ানের দিকে এগিয়ে আসেন। পূর্ণা ছটফট করছে ছোটার জন্য। কিন্তু রিদওয়ানের বিশাল দেহের সাথে সে পারছে না। রিদওয়ান খলিলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, ‘ওরে নিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে আসতে না করছিলাম না? বাড়িতে মানুষ নাই বলে এমন অসাবধান হবেন?’
খলিল কৈফিয়তের স্বরে বললেন, ’না পাইরা আইছি।’রিদওয়ান আগুন চোখে জঙ্গলের দিকে তাকালো। তারপর নিজের গলার মাফলার দিয়ে পূর্ণার মুখ বেঁধে দিল। আর খলিলের গলার মাফলার দিয়ে পা বাঁধলো। পূর্ণার দুই হাত পিছনে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর জোর করে পূর্ণাকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়।

ভয়ে পূর্ণার বুক কাঁপছে। শরীর অবশ হয়ে আসছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে ছোটার জন্য। রিদওয়ান টেনে হিঁচড়ে পূর্ণাকে পাতালঘরের সামনে নিয়ে আসে। পূর্ণা চোখ ঘুরিয়ে দানবের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় গাছ দেখে শিউরে উঠে। মুখ দিয়ে “উউউউ” ধরণের শব্দ করতে থাকে। তখন একটা গর্ত থেকে মেয়েলি স্বর ভেসে আসে, ‘চাবি কাজ করতাছে না।’কণ্ঠ স্বরটি পূর্ণার খুব বেশি পরিচিত মনে হয়! পূর্ণা উৎসুক হয়ে সেখানে তাকালো। খলিলের হাতের টর্চের আলোয় পাতালে যাওয়ার সিঁড়ি চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়। সেই দৃশ্য দেখে পূর্ণার পা থেকে মাথার তালু অবধি কেঁপে উঠে। সে পদ্মজার কাছে পাতালঘরের বর্ণনা শুনেছে কিন্তু এখন সরাসরি দেখছে! অনুভূতি ব্যাখ্যা করার মতো না! তার বুকের ভেতরে দামামা বেজে চলেছে! রিদওয়ান পূর্ণাকে টেনেহিঁচড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামিয়ে আনে। পাতালঘরে প্রধান দরজায় সামনে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটির হাত থেকে চাবি নিয়ে খলিল দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনিও পারলেন না। টর্চের আলো মেয়েটির পায়ের কাছে পড়ে আছে। পূর্ণা চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে মেয়েটির মুখ দেখার জন্য। মেয়েটির মুখ অন্ধকারে তলিয়ে আছে। খলিল হাত নাড়াচাড়া করাতে টর্চের আলো অস্থির হয়ে এদিকসেদিক ছুটছে। একসময় আলো মেয়েটির মুখের উপর পড়লো আবার তাৎক্ষণিক সরেও গেল। চোখের পলকের গতিতে আলো সরে গেলেও পূর্ণা দেখে ফেললো মেয়েটির মুখ!

পূর্ণার মনে হলো,আশেপাশে কোনো বজ্রপাত পড়লো মাত্র! তার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে জোরে জোরে লাফাতে থাকলো। রিদওয়ান পূর্ণাকে ঠেসে ধরে। পূর্ণা গোঙাতে শুরু করে। সে মেয়েটির উদ্দেশ্যে কিছু বলছে। কিন্তু মুখ বেঁধে রাখার জন্য কথাগুলো গোঙানোর মতো মনে হচ্ছে। রিদওয়ান পূর্ণাকে বিশ্রী কয়েকটা গালি দিয়ে খলিলকে রাগী স্বরে বললো, ’এখনো খোলা হয়নি?’

খলিল হাওলাদার বললেন, ’চাবিডা কাম করে না।’‘আপনি এই মাগীর হাত ধরেন। আমি দেখতাছি।’ খলিল পূর্ণার হাত ধরলেন। রিদওয়ান চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করে। পূর্ণা মেয়েটির দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে আছে। খলিল মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললেন, ‘তোর ওড়না দে। এই ছেড়ির হাত বান্ধা লাগবো।’

মেয়েটি তার মাথার ওড়না খুলে পূর্ণার হাত বাঁধার জন্য আসতেই খলিল পূর্ণার হাত ছেড়ে দিলেন। পূর্ণা সাথে সাথে তার দুই হাতে খামচে ধরলো মেয়েটির দুই গাল। একটা গালিও দিল। কিন্তু সেই গালি স্পষ্ট উচ্চারণ হলো না। খলিক পূর্ণাকে জোরে লাথি দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। শুকনো পাটকাঠির মতো পূর্ণা এক লাথিতে মিইয়ে গেল। শরীরের শক্তি

কমে গেল। তারপর খলিল আর মেয়েটি মিলে পূর্ণার হাত শক্ত করে বাঁধলো। পূর্ণার কোমর ব্যথায় টনটন করে উঠে। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

রিদওয়ান চেষ্টা করেও চাবি কাজে লাগাতে পারলো না। তীব্র রাগ নিয়ে সে বললো, 'দরজার চাবি এটা না।'

'আমির তো এইডাই দিল।'বললেন খলিল। রিদওয়ানের মাথা গরম হয়ে যায়। সে ছুঁড়ে ফেলে চাবি। পা দিয়ে মেঝেতে লাথি দেয় কয়েকবার। তারপর দুই হাত তুলে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। কয়েকবার শ্বাস নিল। তারপর পূর্ণার সামনে বসে খলিলের উদ্দেশ্যে বললো, 'এই মেয়ের কোনো ব্যবস্থা করতে হবে আব্বা।' খলিল বললেন, 'কী করবি?'রিদওয়ান কিছু একটা চিন্তা করলো। তারপর পূর্ণার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে পূর্ণাকে প্রশ্ন করলো, 'আব্বার পিছু নিয়েছিলে কেন? কতটুকু জানো তুমি?'পূর্ণা সর্বপ্রথমে মেয়েটির উদ্দেশ্যে থুথু ফেললো। তারপর রাগে কিড়মিড় করে রিদওয়ানকে বললো, 'জারজের বাচ্চা থুথু দেই তোর মুখে আর তোর বাপের মুখে।'

রিদওয়ান হাসলো। দ্রুতগতিতে মেঝেতে পা ভাঁজ করে বসলো। তারপর পূর্ণার মুখর উপর ঝুঁকে তুই-তুকারি করে বললো, 'আমিরের মুখেও দিবি?'পূর্ণা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। রিদওয়ান হাসি হাসি মুখ রেখে খলিলের দিকে তাকালো। বললো, 'কুমারী মেয়ের থুথুও মজা কী বলেন আব্বা?'

খলিলের উত্তরের আশায় না থেকে রিদওয়ান পূর্ণার মুখের একদম কাছে এসে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো। রিদওয়ান উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পূর্ণা শরীর ঘৃণার রি রি করে উঠলো। রিদওয়ান এক হাতে ঠেসে ধরে পূর্ণার মুখ। তারপর পূর্ণার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে পূর্ণার গায়ের গন্ধ শুঁকে। তাকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে। পূর্ণার জান বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়! রিদওয়ানের ভারী দেহের ভরে তার শরীরের হাড্ডি বিষিয়ে উঠছে। একটুও নড়তে পারছে না। চোখ ফেটে জল পড়ছে। রিদওয়ান পূর্ণার জামার পিঠের চেইন খুলে পূর্ণার ঘাড়ে চুমু দিল। সাথে সাথে ঘৃণায় পূর্ণা চোখ বন্ধ করে ফেললো। তখন চোখের সামনে ছবির মতোন ধরা দেয় মৃদুলের মুখটা। কোথায় সে? সে কি এসেছে? সে কি অনুভব করছে,তার প্রিয়তমা এক হায়েনার শিকার হয়েছে? পূর্ণার মনটা হুহু করে কেঁদে উঠে। ভেতরে ভেতরে সে আর্তনাদ করে ডাকলো, তার দ্বিতীয় মাকে! যাকে সে আপা বলে ডাকে!

রিদওয়ান পূর্ণার মুখ ছেড়ে চট করে উঠে দাঁড়ালো। গায়ের কাপড় খুলতে খুলতে খলিলকে বললো, 'দেখবেন? নাকি যাবেন?'

'কোনো ভেজাল হইবো না তো?'খলিলের গলার স্বর পাংশুটে। 'কীসের ভেজাল?'

'আমির যদি জানে।'

'কী বলবে ও? বউয়ের প্রতি মায়া দেখায় না হয় বুঝলাম। শালিরে দিয়ে কী দরকার ওর? আর যা নিয়ম তাই হচ্ছে আব্বা। পূর্ণা যখন সব জেনে গেছে ওর বাঁচার অধিকার নাই।'রিদওয়ান উত্তেজিত। সে কথা শেষ করে পূর্ণার দিকে ঝুঁকলো। পূর্ণা জোরে কেঁদে উঠলো। চিৎকার করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললো, 'ভাবি, বাঁচাও। দোহাই লাগে,কিছু করো।'রিদওয়ান ফিক করে হেসে ফেললো। পূর্ণা আরো ঘাবড়ে যায়। সে আকুতি করে মেয়েটিকে বললো, 'ভাবি, এভাবে চুপ থেকো না। আল্লাহ সইবে না।'

রিদওয়ান পূর্ণার দুই গাল টিপে ধরে জিহ্বা দিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে গাঢ় স্বরে বললো, 'তোদের মাগী বললে তোদের ঘেন্না হয়। আর আসমানিরে মাগী বললে ও খুশি হয়। সাহায্য চাওয়ারও মানুষ পাইলি না।'খলিল ব্যাপারটা উপভোগ করছেন। তিনি হেসে আসমানিকে বললেন, 'যখন ছেড়া আছিলাম রিদুর মতো আছিলাম। যে ছেড়ি একবার আমার হাতে পড়ছে কাইন্দা বাপ ডাকছে। ডরায়া মুইত্তা দিছে।'

খলিল কথা শেষ করে হাসলেন। তার হাসির শব্দ ফ্যাচফ্যাচে! খুবই বিশ্রী। আসমানি মৃদু হেসে আবার চুপসে গেল। পাতালঘরের দরজা না খোলাতে সে চিন্তিত। আবার রিদওয়ান এতোটাই উত্তেজিত যে,দরজার সামনে ফাঁকা জায়গায় তার খেল দেখানো শুরু

করেছে! দরজা খোলার নামগন্ধ নেই,চিন্তাও নেই! খলিল এক হাতে আসমানিকে জড়িয়ে ধরে একটু দূরে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন।তারপর আমুদে গলায় বললেন, ‘আমার রাজকন্যের মন খারাপ কেরে?

রিদওয়ান পূর্ণার বুকের উপর থাবা দিতেই পূর্ণা আর্তনাদ করে উঠলো , ’আম্মা... আপা....’রিদওয়ান পূর্ণার বুকের উপর বসে পূর্ণার মুখ চেপে ধরে কিড়মিড় করে চাপাস্বরে বললো, ’চুপ,একদম চুপ!’

পূর্ণা স্পষ্ট টের পাচ্ছে তার পৃথিবী বিকট শব্দ তুলে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ওইতো...ওইতো মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে লাল বেনারসি। পূর্ণা চিৎকার করে মৃদুলকে ডাকলো। কিন্তু মৃদুল আসলো না। সে কেন বাঁচাতে আসছে না? কেন আসছে না? মৃদুল হঠাৎ করেই কাঁদতে থাকলো। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লো। তারপর চোখের পলকে সে উধাও হয়ে যায়!

পূর্ণার শরীর কেঁপে উঠে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। নিজেকে বুঝায়, তার আপা আসবে, আসবেই! পূর্ণার চোখের পর্দায় পদ্মজার আগমন ঘটে। পদ্মজা আসছে। হ্যাঁ আসছে, হাতে রাম দা নিয়ে দৌড়ে আসছে। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন। শক্তিশালী বাতাস তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে। তার চুলগুলোকে উড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। সব কিছু ছাড়িয়ে সে ছুটে আসছে। এক কোপে সব জানোয়ারের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিতে সে আসছে! কিন্তু দেরি করছে আসতে! ভীষণ দেরি করছে! পূর্ণা শব্দ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে, চোখ বুজলো। নিষ্ঠুর মাটি নীরব থেকে দেখে পূর্ণার সতীত্ব হরণ! সময়ের ব্যবধানে বেঁহুশ হয়ে যায় পূর্ণা। বাপ-বেটা মিলে পর পর দুইবার ধর্ষণ করে। পূর্ণার গলা তৃষ্ণায় চৌচির। প্রাণ ভ্রমর যাই যাই! চোখ দুটি নিভু নিভু। রিদওয়ান দূরে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। খলিল ও আসমানি মিলে পূর্ণার গলায় রশি টেনে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। হত্যার সময় পূর্ণা হাত-পা দাপিয়ে কাতরায়! আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় নিস্তব্ধ প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে!

(গল্পের প্রয়োজন অনেক নেগেটিভ দৃশ্য, শব্দ ব্যবহার করতে হলো।)

পর্ব ৮৮

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যেতেই গাছের পাতাগুলো নড়েচড়ে উঠে। রিদওয়ান চমকে সেদিকে তাকালো। আকাশের অর্ধবৃত্ত চাঁদটি দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোতে রিদওয়ান আবিষ্কার করলো,সে প্রচণ্ড শীতেও ঘামছে। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে পূর্ণার লাশ। অন্ধকার, ছমছমে পরিবেশ। শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। রিদওয়ান প্যান্টের পকেট খুঁজে বিড়ি আর দিয়াশলাই বের করলো।

পূর্ণাকে হত্যার পর যখন ভাবলো অন্য মেয়েগুলোর মতো চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে পূর্ণার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিবে তখন খলিল উপর থেকে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসে চাপাস্বরে বললেন, 'কে জানি আইতাছে। মনে কয়,আমির। হুন রিদু,এইবার আমির তোর উপরে চ্যাতলে আমি কিছু করতে পারতাম না। ভাইজানেও করব না। ভাইজানে আমারে আগেই কইছে।'

খলিল হাওলাদার অন্দরমহলে যাচ্ছিলেন। পাতাল ছেড়ে একটু সামনে এগোতেই চোখে পড়ে কে যেন টর্চ নিয়ে এদিকে আসছে। তিনি আন্দাজ করেছেন, অজ্ঞাত লোকটি আমির। তারপরই দৌড়ে আসেন। খলিলের মুখে আমির নামটা শুনতেই রিদওয়ান বুকের ভেতর ভয় জেঁকে বসে।

রিদওয়ান আমিরকে ভয় পেতে চায় না। তবুও ভয় তাকে ছাড়ে না। ভয় পাওয়ার কিছু কারণও রয়েছে। প্রথমত, পারিজার হত্যার ব্যাপারে আমির সব জানে। রিদওয়ান টের পায় আমিরের মনে এই হত্যা নিয়ে ক্ষোভ রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই পাপের জগতের জন্য পদ্মজার সাথে তার বিচ্ছেদ হয়েছে। সে এখন বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ছে। জ্বলন্ত কয়লা হয়ে আছে। এখন যদি শুনে,পূর্ণাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে জ্বলন্ত কয়লা নিজ শক্তিকে আগুন তৈরি করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রিদওয়ান পূর্ণাকে ধর্ষণের আগে যদিও বলেছিল, আমির শালীর জন্য কিছুই করবে না। কিন্তু রিদওয়ান এখন বুঝতে পারছে, সে তখন উত্তেজিত হয়ে ভুল কথা বলেছে। শালীর জন্য কিছু না করুক, শালীর মৃত্যু আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ নিশ্চয়ই করবে! পূর্ণা পদ্মজার জীবন! আর পদ্মজা আমিরের প্রাণভোমরা! সংযোগ তো আছেই। কিছুতেই ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আবার খলিল হাওলাদার বলছেন, এবার আর ছেলের পক্ষ নিবেন না! রিদওয়ান এতো চেষ্টা করেও খলিল-মজিদকে নিজের বশে আনতে পারেনি। সব মিলিয়ে বিপদের আশঙ্কা শতভাগ! রিদওয়ান ভাবলো, আপাতত আমিরকে রাগানো ঠিক হবে না। আমিরকে হত্যা করার ব্যাপারে মজিদ,খলিল দুজনকে রিদওয়ান বাগে আনতে পেরেছে। একটা মৃত লাশের জন্য পরিকল্পনা নষ্ট করা উচিত হবে না। আর দুটো দিন সহ্য করতেই হবে আমিরকে।

রিদওয়ান খলিল ও আসমানিকে নিঃশ্বাসের গতিতে বললো, 'তোমরা এখানে থাকো। দড়িটা ওই চিপায় লুকিয়ে রাখো। আমি যে এখানে ছিলাম আমির যেন জানতে না পারে।'

রিদওয়ান পূর্ণার লাশ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর দ্রুত ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ঝোপঝাড়ে কেউ থাকলে সেটাও টের পেয়ে যায় আমির। এই ক্ষমতা সে কোথায় পেয়েছে,রিদওয়ানের জানা নেই। তবে আমিরের কাছে শুনেছে,আমির লুকিয়ে থাকা মানুষটির নিঃশ্বাস ও তাকিয়ে থাকাটা অনুভব করতে পারে! তাই রিদওয়ান চোখ বুজে,নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

আমির পাতালে ঢুকলো। খলিল সিঁড়ির দিকে টর্চ ধরলেন। মুখে টর্চের তীব্র আলো পড়তেই আমির কপাল কুঁচকে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আলোর গতিবেগ রোধ করে মুখে অস্ফুট বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

খলিল হেসে আমুদে কণ্ঠে বললেন, 'বাবু আইছস নাকি!'আমির চোখ ছোট ছোট করে ধমকের স্বরে বললো, 'আরে এভাবে মুখের উপর টর্চ ধরে রাখছেন কেন?'খলিল টর্চের আলো দ্রুত অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন। আমির তার হাতের চাবি খলিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে

বললো, 'এইযে চাবি।'খলিল চাবি হাতে নিয়ে বললেন, 'কুন সময় থাইকা খাড়ায়া আছি। চাবি লইয়া আইয়া ভালা করছো আব্বা।'

'আনতে গেলেন না কেন? আমি অন্দরমহলেই ছিলাম।'

'এইতো অহন যাইতে চাইছিলাম।'আমির টর্চ আসমানির মুখের উপর ধরে বললো, 'তোর এই সময় এখানে কী?'আসমানি তার বোরকা খুলতে খুলতে বললো, 'রিদওয়ানে ডাকছে।'

'রিদওয়ান কোথায়?'

'জানি না। আমারে আইতে কইয়া নিজের আওয়ার নাম নাই। না আইলেও সমস্যা নাই। তুমি আইছো চলবো।'আসমানি লম্বা করে হাসলো। খলিল বা আসমানি কারো চোখেমুখে একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। আমির আসমানির নোংরা অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসলো। আসমানির সামনে সে যতবার আসে ততবার আসমানি বিভিন্নভাবে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। গত চার বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু ফল এখনো পায়নি। আমির আসমানির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চাপাস্বরে বললো, 'খোদার কসম, তোর মতো বেজন্মা দুটো দেখিনি।'

আমিরের অপমানজনক কথা আসমানি গায়ে লাগা তো দূরের কথা, কানেই ঢোকায়নি। খলিল দরজা খুললেন। তিনজন একসাথে ভেতরে প্রবেশ করলো। দরজা লাগানোর সময় আমির তার টর্চের আলোতে মেঝেতে একটা নুপুর দেখতে পেলো। সে ভ্রুকুটি করে এগিয়ে আসে। হাতে নুপুরটি তুলে নেয়। আসমানি পিছন থেকে বললো, 'আমার নুপুর।'

এই মুহূর্তে রিদওয়ান ঝোপঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে, লাশটার কী করা যায়? পাতালে তো এখন ঢোকা যাবে না। সেখানে আমির আছে। অন্দরমহল থেকে রাম দা আর বস্তা নিয়ে আসতে অন্দরমহলে যাওয়া যায়। তারপর জঙ্গলের পিছনের ভাঙা দেয়াল টপকে ঘাটে চলে গেলেই নিশ্চিত। ঘাটে তাদের ট্রলার আছে। একবার ট্রলারে উঠতে পারলে পূর্ণার লাশ আর কেউ পাবে না। রিদওয়ান হাতের বিড়ি ফেলে পূর্ণার লাশ রেখে দ্রুত অন্দরমহলে যায়। পূর্ণার ফ্যাকাসে মুখের উপর একটা জোনাকিপোকা বসে। জোনাকিপোকার জ্বলে জ্বলে আবার নিভে যাওয়া আলোয় পূর্ণার মুখটা আরো ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে! বুক মোচড় দিয়ে উঠার মতো। পূর্ণার দুই হাত নিস্তেজ হয়ে ঘাসে পড়ে আছে। সারা জনমের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই পৃথিবীর বুকে তার একুশ বছরেরই জীবন ছিল। কী হতো যদি আরো কয়টা দিন সে বাঁচতে পারতো?

রিদওয়ান ভীষণ উত্তেজিত। শত-শত খুন করার পর এই প্রথম কোনো মৃত দেহ নিয়ে সে বিপাকে পড়েছে। অন্দরমহলের সামনে এসে দেখে,পদ্মজা দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার সাথে কথা বলছে প্রান্ত! প্রান্ত কি পূর্ণার খোঁজে এসেছে? রিদওয়ান এক হাতে নিজের ঘাড় ম্যাসাজ করলো। অন্দরমহল থেকে বস্তা বা রাম দা আনা এখন বিপদজনক। পদ্মজা বুদ্ধিমতী, তার রিদওয়ানকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা শতভাগ। সন্দেহ না এই মেয়ে নিশ্চিত হয়ে যাবে। লতিফাকে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে ওকে দিয়ে সাহায্য নেয়া যেত। এখন কী করবে সে? রিদওয়ানের মাথা ফাঁকা হয়ে যায়। পরক্ষণেই মন বলে উঠলো, সামান্য নারীকে সে কেন ভয় পাবে? তারপর আবার ভাবলো, না এখন আমির বা পদ্মজার মুখোমুখি হওয়া যাবে না,এতে বহু কাঙ্ক্ষিত সাজানো পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। রিদওয়ান উল্টো ঘুরে জঙ্গলে ছুটে আসে। পূর্ণার লাশের পাশে এসে দাঁড়ায়। আরেকটা বিড়ির জন্য পকেটে হাত দেয়। বিড়ি নেই। সে পায়চারি করতে করতে ভাবতে থাকলো। কী করা যায়? হুট করে তার মাথা কাজ করে। ট্রলারে করে পূর্ণার লাশ নিয়ে দূরে চলে যাবে। পথে কোনো না কোনো ব্যবস্থা হবে। ভাবতে দেরি হলেও কাজে দেরি করলো না। সে পূর্ণার লাশ কাঁধে তুলে নিল। জঙ্গল পেরিয়ে ভাঙা ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাঙা অংশ কম। পূর্ণার লাশ নিয়ে একসাথে বের হওয়া সম্ভব নয়। আগে রিদওয়ানকে বের হতে হবে তারপর পূর্ণার লাশ টেনে বের করতে হবে। রিদওয়ান পূর্ণার লাশ রেখে নিজে আগে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হলো।

বাইরের দৃশ্য দেখে সঙ্গে – সঙ্গে সে চমকে গেল! বাইরে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। একজন ইয়াকুব আলী। যিনি গত চার বছর ধরে মজিদ হাওলাদারের মাতব্বর পদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সাথে উনার বিএ পাশ ছেলে ইউসুফ আর রয়েছে চামচা দুজন। তারা এই রাতের বেলা গাঢ় অন্ধকারে এখানে কী করছে? একইদিনে এতো বিপদ! রিদওয়ান তার ঠোঁট ভেজাল। নিজেদের গোলকধাঁধায় আটকে রাখা এলাকা যেন এখন নিজেদের জন্যই গোলকধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কয়দিন আগে ইয়াকুব আলীর এক লোক এখানে এসেছিল। তারপর আমিরের হাতে খুন হলো। আর এখন ইয়াকুব আলী নিজে তার ছেলেকে নিয়ে এসেছেন! কী চাচ্ছে এরা? কিছু কি সন্দেহ করেছে?

যদি নারী পাচার সম্পর্কিত কিছু জেনে থাকে! ভাবতেই রিদওয়ানের হৃৎপিণ্ড ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ডে গরম খুন্তি ছুঁইয়ে দিয়েছে। রিদওয়ান নিজেকে আড়াল করে নেয়। ইয়াকুব আলী চলে যান। রয়ে যায় বাকি তিনজন। তারা চারপাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছে। এই খবর দ্রুত মজিদ এবং খলিলকে দিতে হবে। রিদওয়ান দ্রুত সরে আসে। পূর্ণার লাশ দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তের জন্য সে পূর্ণার কথা ভুলে গিয়েছিল। আগে এই লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মুহূর্তে সে একা হয়ে পড়েছে। মজিদ হাওলাদার বাড়িতে নেই। খলিল হাওলাদার আমিরের সাথে পাতালে রয়েছেন। দলের কেউও আপাতত কাছে নেই! সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা! রিদওয়ান পূর্ণার লাশ আবার কাঁধে তুলে নিল। একটা মৃত,নিস্তেজ দেহ নিয়ে টানাহেঁচড়া করে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। মাথার রগ দপদপ করছে। এতদিনের অভিজ্ঞতা আজ রিদওয়ানের কোনো কাজেই লাগছে না। কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আচ্ছা,আমির তার জায়গায় থাকলে কী করতো? কিছুতো করতোই। রিদওয়ান নিজের উপর বিতৃষ্ণা নিয়ে বললো, 'আব্বা,কাকা ঠিকই বলে। আমিরের মাথার এক ফোঁটা বুদ্ধি আমার মাথায় নাই।'

অনেক ভাবাভাবির পর রিদওয়ান পূর্ণার লাশ একটি গাছের পাশে রাখলো। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালো। বার কয়েক নিঃশ্বাস নিল এবং ছাড়লো। এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে অন্দরমহলে গেল। সদর ঘরে পদ্মজা বসে আছে। পদ্মজার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। রিদওয়ান অবাক হওয়ার ভান ধরে প্রশ্ন করলো, 'এই রাতের বেলা সবাই এমন তব্ধা লেগে বসে আছে কেন?'

পদ্মজা রিদওয়ানের দিকে ঘুরেও তাকালো না। প্রান্ত বললো, 'মেজো আপাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

রিদওয়ান এক গ্লাস পানি খেয়ে হেসে বললো, 'এই মেয়ে বাঁদরের মতো। দেখো,কার বাড়িতে আছে।'

'আপার আজ কোথাও যাওয়ার কথা না।'

'যেতেও পারে।'কথা শেষ করে রিদওয়ান নিজ ঘরে চলে গেল। ঘরে এসেই সে অস্থির হয়ে উঠে। দ্রুত তোষকের নিচ থেকে বড় একটা বস্তা নিয়ে, ছোট করে ভাঁজ করে। তারপর ভাঁজকরা বস্তা শার্টের ভেতর বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাম দা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাম দা লুকানোর মতো জায়গা তার শরীরে নেই! সে চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাবধানে আবার জঙ্গলে আসে। পূর্ণার লাশ বস্তার ভেতর ভরে কাঁধে তুলে নেয়। অন্দরমহলের চারপাশ সুপারি গাছে আচ্ছাদিত। সুপারি গাছ আর রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে রিদওয়ান গেইটের কাছে খুব সহজেই চলে আসে।

গেইটের দারোয়ান মুত্তালিব ঝিমুচ্ছেন। মুত্তালিব মজিদের বিশ্বস্ত দারোয়ান। সে এই বাড়ি সম্পর্কিত সবকিছু জানে। কিন্তু কখনো খুন হতে দেখেনি বা খুন হওয়া লাশও দেখেনি। এমন দায়িত্ব সে কখনো পায়নি। এই বাড়ির গোপনীয়তা গোপন রাখাই তার কাজ। রিদওয়ান বাধ্য হয়ে মুত্তালিবকে নতুন দায়িত্ব দেয়ার জন্য ডাকলো, 'মুত্তালিব কাকা?'

মুত্তালিব পিটপিট করে তাকালেন। রিদওয়ানের মুখটা স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসতেই

তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। রিদওয়ান ইশারায় শান্ত হতে বললো। মুত্তালিব উৎসুক হয়ে তাকালেন। রিদওয়ান তার কাঁধের বস্তা মুত্তালিবের পায়ের কাছে রাখে। মুত্তালিব প্রশ্ন করলেন, 'বস্তার ভিতরে কিতা?'

রিদওয়ান শান্তস্বরে জানালো, 'লাশ।'

রিদওয়ান শান্তস্বরে বললেও মুত্তালিবের জন্য এই শব্দটি ভয়ানক ছিল। তিনি চমকে উঠলেন। রিদওয়ান চারপাশ দেখে বললো, 'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। বিনিময়ে বেতনের চেয়ে তিনগুন পাবেন।'

মুত্তালিবের বেতন সাধারণ বেতনের চেয়ে এমনিতেই তিনগুণ। তার উপর আরো তিনগুণ মানে রাজপ্রাসাদ জেতার মতো! লোভনীয় প্রস্তাব! মুত্তালিবের চোখ দুটি চকচক করে উঠে। অর্থের লোভে মনের ভয় চাপা পড়ে। তিনি অভিজ্ঞ স্বরে সাহস নিয়ে বললেন, 'তুমি খালি কও,বাকি কাম আমার।'

রিদওয়ান আরেকটু এগিয়ে আসে ফিসফিসিয়ে বললো, 'ভ্যানগাড়িটা নিয়ে আসেন। ছন নিবেন বেশি। তারপর এই বস্তাটা আজমপুরের হাওড়ে ফেলে আসবেন।'

মুত্তালিব মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ভয়টা আবার জেগে উঠে। কিন্তু অর্থের জন্য তিনি জোর করে ভয়কে চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন।এতগুলো টাকা জলে ভাসিয়ে দেয়া যায় না! তার চেয়ে একটা দেহ জলে ভাসিয়ে দেয়াই উত্তম! তিনি ভ্যানগাড়ি নিয়ে আসেন। ভ্যানগাড়িটি হাওলাদার বাড়ির। সাথে অনেক ছনও নিলেন। দুজনের তাড়াহুড়ো করে ছনের ভেতর বস্তা রাখলো। রিদওয়ান বললো, 'সাবধানে কাজ করবেন। এমন জায়গায় ফেলবেন যাতে কেউ লাশ খুঁজে না পায়।'

মুত্তালিব চারপাশ দেখে ঢোক গিললেন। তার চোরাচাহনি! তিনি আতঙ্কিত। কিন্তু তা রিদওয়ানের সামনে প্রকাশ করতে নারাজ। তিনি রিদওয়ানকে আশ্বস্ত করলেন, 'কোনো ভুল হইবো না। কাম সাইরাই আমি আইতাছি।'

'সকালেই আপনি আপনার টাকা পেয়ে যাবেন।'বললো রিদওয়ান। মুত্তালিব হাসি বিনিময় করলেন। তারপর মাফলার দিয়ে মুখ ঢেকে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়েন।

মুত্তালিবের পা বার বার ফসকে যাচ্ছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন। যদি কেউ টের পেয়ে যায় তখন কী হবে? তিনি ঘামছেন,হাতও কাঁপছে। পথে এক দুজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি জানেন না,কার লাশ নিয়ে তিনি পথ পাড়ি দিচ্ছেন। বার বার মনে হচ্ছে, বস্তার ভেতর থেকে লাশটি বেরিয়ে এসে তার গলা চেপে ধরবে। রক্ত চুষে খাবে! চিরচেনা পথঘাটকে তার পরিত্যাক্ত মনে হচ্ছে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন বার বার। আটপাড়া ছেড়ে নোয়াপাড়ায় আসেন। রাস্তার দুই ধারে গাছ-গাছালি। তারপর যতদূর চোখ যার বিস্তীর্ণ ক্ষেত। তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। ভয়ে বুকে চাপ অনুভব করছেন। আজমপুর যেতে পথে থানা পড়ে। থানার সামনে দিয়ে তিনি কী করে যাবেন? যদি কেউ বুঝে যায়! এই চিন্তায় রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেছে। তিনি ক্লান্ত হয়ে গাড়ি থামালেন। মিনিট ছয়েক পথের ধারে বসে বিড়ি ফুঁকলেন। ভয় কিছুতেই কাটছে না। বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। টাকার লোভে এতোবড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হয়নি। তিনি ভাবলেন, ও বাড়িতে তো এই কাজ করার অনেক মানুষ আছে। তাকেই কেন এই কাজ দেয়া হলো? এই লাশের সাথে কি কোনো বড় বিপদ জড়িত? মুত্তালিবের লাশের মুখ দেখার কৌতূহল জাগলো। তিনি চারদিক দেখে বস্তার মুখ খুললেন। বেরিয়ে আসে চেনা শ্যামবর্ণের মুখখানা। গলায় গাঢ় দাগ! চোখেমুখে আঁচড়। মুত্তালিব ভয়ে কান্না করে দিলেন। এই মেয়েটাকে তিনি সন্ধ্যাবেলায় দেখেছেন জলজ্যান্ত! এখন মৃত! তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েন। বাতাস ও পাতার ঘর্ষণে সৃষ্ট শব্দে তিনি চমকে উঠেন। প্রস্রাবের বেগ বেড়ে যায়। চোখের পলকে লুঙ্গি ভিজে যায়। তিনি নিজের কাজে নিজে লজ্জিত হোন। লজ্জা,ভয় সব মিলিয়ে মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে গেছে। আজমপুর যেতে আরো দুই ঘন্টা লাগবে। এতক্ষণ তিনি এই লাশ নিয়ে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারবেন না। মুত্তালিব

দ্রুত বস্তার মুখ বেঁধে ফেলেন। আরেকটু এগিয়ে নোয়াপাড়ার শেষ মাথায় পৌঁছালেন। সেখানে ক্ষেতের পাশে ঘন ঝোঁপঝাড় রয়েছে। এখানে সহজে কারোর আসার কথা নয়। ঝোঁপঝাড়ের ভেতর ছন বিছিয়ে সেখানে বস্তাটি রাখলেন। তারপর বস্তার উপর আরো ছন দিয়ে দ্রুত জায়গা ছাড়লেন।

সকাল নয়টা বাজে। পূর্ণার হদিস মিলেনি। পূর্ণা লাপাত্তা, এই খবর পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রেমা ঘরে বসে কান্নাকাটি করছে। মৃদুলও আসেনি। বাসন্তী ও প্রান্ত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের সাথে আরো কয়েকজন রয়েছে৷ সবাই মিলে পূর্ণাকে খুঁজছে। পদ্মজার নানাবাড়ির মানুষজন বলতে, পদ্মজার নানু আর প্রতিবন্ধী হিমেল বেঁচে আছে। তারা দুজনই অনেকদিন ধরে পদ্মজার খালার বাড়ি ঢাকাতে আছে। গ্রামে কাছের আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই। হাওলাদার বাড়িতে তো পূর্ণা নেই। পদ্মজা মগার কাছে যখন শুনলো,পূর্ণা আমিরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তাৎক্ষণিক পদ্মজা আমিরকে খোঁজে। সে পাতালঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু চাবি না থাকার কারণে যেতে পারেনি। চিন্তায় তার মাথা ব্যথা উঠে গেছে। মজিদ গ্রামের বাইরে ছিলেন। তিনি ভোররাতে ফিরেন। রিদওয়ান ঘরে বেঘোরে ঘুমিয়েছে। দুজনের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ নেই। তবে পদ্মজা সন্দেহের তালিকায় দুজনকেই রেখেছে৷ বাকি রইলো খলিল আর আমির হাওলাদার। তারা দুজন রাত থেকে চোখের বাইরে আছে। দুজনের সাথে মুখোমুখি হতে হবে। পদ্মজার ধারণা,পূর্ণা বন্দী হয়েছে। তাকে ভয় দেখানোর জন্য এরা পূর্ণাকে বন্দি করেছে। পদ্মজা সরাসরি মজিদ এবং রিদওয়ানকে সকালে প্রশ্ন করেছে। দুজনই উত্তর দিয়েছে,তারা জানে না। আমিরের সাথে সাক্ষাৎ হলেই,নিশ্চিত হওয়া যাবে।
বেলা সাড়ে নয়টায় আমিরের দেখা মিলে। তার পরনে ঢিলা সাদা রঙের পায়জামা আর ফতুয়া। অনেক পুরনো কাপড়! হাঁটার তালে ফতুয়া দুলছে। সে সোজা আলগঘরে আসে। মগার হাতে একটা নীল খাম আরেকটা ছোট কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললো, ‘এই কাগজে আলমগীর ভাইয়ার ঠিকানা আছে। ঠিকানায় এই খাম পৌঁছে দিবি।’

মগা বাধ্যর মতো মাথা নাড়ালো। যে ঠিকানা লেখা আছে সে ঠিকানায় পৌঁছাতে মগার ষোল ঘন্টা লাগবে। আমির চারপাশ দেখে বললো, ’মরে গেলেও এই খাম অন্য কারো হাতে দিবি না। দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে রওনা হবি।’

‘আইচ্ছা।’

আমির ঘুরে দাঁড়ায় চলে যেতে। মগা ডাকলো, ‘ভাই?’আমির তাকালো। মগা বললো, ’পূর্ণায় রাইতে তোমার লগে দেখা করতে আইছিল না?’আমির চোখ ছোট ছোট করে ফেললো। বললো, ‘না তো। কেন?’মগা উসখুস করে বললো, ’পূর্ণারে খুঁইজা পাইতাছে না কাইল থাইকা।’

আমির সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সে মগাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত হয় পদ্মজা। পদ্মজা আমিরের উদ্দেশ্যে বললো, ‘আমাকে নিজের দাসী বানাতে আমার বোনকে পথ করেছেন আপনি? পূর্ণা কোথায়?’

পদ্মজার কণ্ঠে তেজের আঁচ পাওয়া যায়। সে রাগান্বিত। আমির আশ্চর্য হয়ে গেল। সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, ‘আমি কী করে জানবো? পূর্ণা তোমার কাছে গিয়েছিল না?’

মগা বললো, ‘ভাই,পূর্ণারে নিয়া বাড়িত যাইতাছিলাম। তখন পূর্ণায় পথে থাইমা কইলো তোমার লগে দেখা করবো। পরে নাকি তুমি হেরে বাড়িত দিয়া আইবা।’

আমির একবার পদ্মজাকে দেখলো তারপর মগার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, ‘তারপর এই বাড়িতে আসছিল?’
‘আইছিল মনে কয়।’

‘তুই কোথায় ছিলি?’

মগা মাথা নত করে বললো, 'বাজারে।'

আমির চিন্তায় পড়ে যায়। সে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার সাথে তো পূর্ণার দেখা হয়নি। মগা,তুই পূর্ণাকে নিজ চোখে দেখেছিস এই বাড়িতে ঢুকতে?'

মগা না সূচক মাথা নাড়াল। আমির দ্রুত গেইটের দারোয়ান মুত্তালিবের কাছে যায়। মুত্তালিব পদ্মজাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়ায়। আমির মুত্তালিবকে প্রশ্ন করলো, 'পূর্ণা গতকাল বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার বাড়িতে আসছিল?'

মুত্তালিব কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া মিথ্যা বললেন, 'না আহে নাই তো।'

পদ্মজা থমকায়। এতক্ষণ ভেবেছিল,পূর্ণা বোধহয় আমিরের হাতে বন্দি আছে। কিন্তু পূর্ণা নাকি আসেইনি! আমির বাইরে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা মিনিটের পর মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্ণার পরিয়ে দেয়া কালো শাড়িটা এখনো তার গায়ে জড়িয়ে আছে। লতিফা ও রিনু পদ্মজার পিছনে এসে দাঁড়ায়। তখন গেইটের ভেতর এসে প্রবেশ করে বিপর্যস্ত প্রান্ত। সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে পদ্মজার জন্য মৃত্যুর সংবাদ।

হেমলতার হাতে বানানো শীতল পাটির উপর শুয়ে আছে পূর্ণা। পা থেকে গলা অবধি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা। পদ্মজা মোড়ল বাড়িতে পা রাখতেই সবাই তার দিকে তাকালো। মানুষের ভীড় জমেছে। নোয়াপাড়ার গরীব ঘরের এক ছোট মেয়ে প্রতিদিন ভোরে রান্নার জন্য শুকনো পাতা কুড়ায়। বস্তা ভরে শুকনো পাতা নিয়ে বাড়ি ফেরে। সঙ্গে থাকে তার ছোট ভাই। দুজন মিলে নিত্যদিনের মতো আজও পাতা কুড়াতে বের হয়েছিল। ঝোপঝাড়ে ছনের স্তূপ দেখে তারা খুব অবাক হয়। রান্নার কাজে ছন খুব ভালো কাজ করে। তারা ছন সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা ভারী বস্তা আবিষ্কার করে। বস্তার মুখ খুলে দুজনই ভয় পেয়ে যায়। দৌড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা গ্রামে ছড়িয়ে দেয়। গ্রামের কয়েকজন পূর্ণাকে চিহ্নিত করে। তারপর নিয়ে আসে আটপাড়ায়। পূর্ণার লাশ মোড়ল বাড়িতে নিয়ে আসতে আসতে পুরো গ্রাম পূর্ণার মৃত্যুর খবর জেনে যায়।

মোড়ল বাড়িতে কত রকম মানুষ উপস্থিত হয়েছে। তাও পদ্মজার কাছে চারপাশ জনমানবহীন লাগছে। তার চোখ শুষ্ক। প্রেমা বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। কাঁদছে বাসন্তী ও প্রান্ত। তারা পারলে জোর করে পূর্ণাকে জাগিয়ে তুলে। পদ্মজা ধীরপায়ে পূর্ণার মাথার কাছে এসে বসলো। পূর্ণার আঁচড় কাটা মুখটা জুড়ে গুচ্ছ,গুচ্ছ মায়া। পদ্মজা এক হাতে ছুঁয়ে দেয় পূর্ণার মুখ। তারপর মৃদুস্বরে ডাকলো, 'পূর্ণা? পূর্ণারে....

পূর্ণা সাড়া দেয় না। সে এখন মৃত একটি লাশ মাত্র। যে কিছুক্ষণের মধ্যে মাটির নিচে চিরজীবনের জন্য চলে যাবে। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখলো। তাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। পদ্মজা চারিদিকে তাকিয়েও কোনো মানুষ দেখতে পেল না! অথচ তার চারপাশে মানুষজনের মেলা বসেছে! পদ্মজা পূর্ণার এক হাত মুঠোর নিয়ে চুমু দিল। পূর্ণার আঙুলে চুল প্যাঁচানো। পদ্মজা সময় নিয়ে চুল থেকে পূর্ণার আঙুল মুক্ত করলো। অনেক লম্বা একটা চুল! মেয়ে মানুষের চুল। পূর্ণা মৃত্যুর পূর্বে কোনো মেয়ের চুল টেনে ধরেছিল তা স্পষ্ট! পদ্মজা পূর্ণার কপালে চুমু দিল। তারপর আবার আদুরে স্বরে ডাকলো, 'পূর্ণা? বোন আমার। তোর আপা ডাকছে...তোর পদ্মজা আপা।'

পূর্ণা আর সাড়া দিবে না...কোনোদিন দিবে না! তার দুরন্তপনা জীবনের জন্য থেমে গেছে। পদ্মজা বিশ্বাস করতে পারছে না! সে অস্থির হয়ে উঠে। একটু দূরে সরে বসে। তার নিঃশ্বাস এলোমেলো এবং ভারী। বুকের ভেতর তোলপাড় বয়ে যাচ্ছে। তার মস্তিষ্কের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটু দূরে সরে যায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে। তারপর আরেকটু দূরে সরে যায়! এভাবে যেতে যেতে অনেক দূরে চলে যায়। মানুষ তাকে হা করে দেখছে। কিছুক্ষণ দূরে বসে থেকে চট করে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুতপায়ে পূর্ণার কাছে আসে। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চারপাশ দেখলো। কী অদ্ভুত! সে এখনো কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু বাসন্তী, প্রেমা ও প্রান্তকে দেখছে। আর দেখছে ঘুমন্ত পূর্ণাকে। পদ্মজা পূর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমার সুন্দর চাঁদ,আজ তোর

বিয়ে। মৃদুল...মৃদুল ভাই কোথায়? সে কি আসেনি?'

পদ্মজা চারপাশে চোখ বুলিয়ে মৃদুলকে খুঁজলো। যখন সে মৃদুলকে খুঁজতে লাগলো তখন তার চোখে পড়লো,অনেক অনেক মানুষ এসেছে। এতো মানুষ কখন এলো? মৃদুল কোথায়? পদ্মজা মৃদুলকে খুঁজতে উঠে দাঁড়ায়। মানুষের ভীড়ে ঢুকে সে মৃদুলকে খুঁজতে থাকে। আমির দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুক ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে এলোমেলো হয়ে যাওয়া পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজা বুকের ভেতর যে সহ্য ক্ষমতা পুষে রেখেছিল, আজ সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে৷ এই মুহূর্তে পদ্মজা নিজের মধ্যে নেই৷ একটুও কাঁদছে না। আমিরের ইচ্ছে হচ্ছে,পদ্মজাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখতে। যেন সে হাউমাউ করে কাঁদতে পারে। কিন্তু সেই ইচ্ছে প্রকাশের দুঃসাহস আমিরের নেই। সে এগিয়ে এসে পূর্ণার মুখের দিকে তাকালো। পূর্ণা খুন হয়েছে শুনে,আমির রিদওয়ান,খলিল আর মজিদকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমিরের জানামতে, এরা এতো বড় ভুল করবে না। তারা কখনো ঝোপঝাড়ে লাশ ফেলবে না। তারা নদীতে ভাসিয়ে দেয়,যাতে প্রমাণ মুছে যায়। কিন্তু পূর্ণার শরীরে এখন অগণিত প্রমাণ পাওয়া যাবে। একজন কুখ্যাত অপরাধী হিসেবে আমির নিশ্চিত, এমন বোকামি একমাত্র প্রথম খুন করা কেউই করবে। অথবা যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লাশ গুম করার,সে বোকা! অলন্দপুরে তারা ছাড়া আর কে হতে পারে? বাসন্তীর হাতের নাড়াচাড়ায় পূর্ণার পায়ের চাদর সরে যায়। তার এক পায়ের নুপুর দেখে আমিরের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে সে রাগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেললো। তার চোখের রং পাল্টে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। এবার সে নিশ্চিত এই কাজ কারা করেছে! আমির দ্রুতপায়ে সবার অগোচরে মোড়ল বাড়ি ছাড়লো। তার গন্তব্য আজিদের বাড়ি।

মৃদুল! সে আজ বেজায় খুশি। ট্রলার নিয়ে এসেছে বউ নিতে। সাথে এসেছে মা-বাবাসহ আত্মীয়স্বজন। গতকাল তার আসার কথা ছিল। কিন্তু আসতে পারেনি। জুলেখা প্রথম রাজি হোননি। যখন দেখলেন মৃদুল সত্যি তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন তিনি হার মানলেন। বললেন,তিনি এই বিয়েতে রাজি। তিনি ছেলের বিয়েতে থাকতে চান। আর কাছের কয়েজনকে নিয়ে তারপর বউ আনতে যেতে চান। আত্মীয়দের নিয়ে তৈরি হতে হতে রাত হয়ে যায়। তারপর নিজেদের ট্রলার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে। জুলেখা এখনো গাল ফুলিয়ে বসে আছেন। তিনি মন থেকে এই বিয়েতে রাজি নন। মৃদুলের তাতে যায় আসে না,তার মা-বাবা বিয়েতে থাকছে এটাই অনেক। আটপাড়ার খালে এসে ট্রলার থামে। খাল থেকে পূর্ণাদের বাড়ি যেতে মিনিট পাঁচেক লাগে। উত্তেজনায় মৃদুলের বুক কাঁপছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। যেকোনো কথায় সে হাসছে। ট্রলার থেকে নামার সময় একটা কালো ব্যাগ হাতে তুলে নেয়। মৃদুলকে ব্যাগ নিতে দেখে তার এক ভাই বললো, 'আরে ব্যাঠা, ব্যাগ আমার কাছে দে। তুই জামাই মানুষ।'

মৃদুল দিতে রাজি হলো না। এই ব্যাগে থাকা প্রতিটি জিনিস লাল। সে নিজে পূর্ণার জন্য পছন্দ করে কিনেছে। ব্যাগের সবকিছু দিয়ে আজ পূর্ণা সাজবে। সে নিজের হাতে এই ব্যাগ পূর্ণার হাতে দিতে চায়। মৃদুল নাছোড়বান্দা। তার ভাই তার সাথে তর্ক করে পারলো না। মৃদুল খুশির জোয়ারে ভাসছে। সে সবার আগে আগে হেঁটে যায়। মিনিট দুয়েক হাঁটার পর মোড়ল বাড়ির সামনে সে ভীড় দেখতে পেল। মৃদুল অবাক হলো। গ্রামবাসীকে দাওয়াত দেয়া হলো নাকি? নিজে নিজে উত্তর খুঁজে নিল। দাওয়াতই হবে। পূর্ণা কতো পাগল! মৃদুল হাসলো। কিন্তু সেই হাসি মিলিয়ে গেল বাড়ির কাছাকাছি এসে। বাড়ি থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। জুলেখা বললেন, 'বাড়ির ভিতরে কান্দাকাটি হইতাছে না?'

মৃদুল চুপসে গেল। মনে মনে প্রশ্ন করলো, পদ্মজা ভাবির সাথে আবার কিছু হলো নাকি? সে দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে। মানুষজনকে ঠেলেঠুলে পূর্ণার লাশের সামনে এসে দাঁড়ায়। পূর্ণার লাশ দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেললো। খুশিতে মাথা নষ্ট হয়ে গেল নাকি? চোখ কীসব দেখছে! মৃদুল আবার চোখ খুললো। পূর্ণাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখলো। পূর্ণার পায়ে এখনো আলতা লেগে আছে। কাদামাখা লাল টুকটুকে দুটো পা। এই পায়ে হেঁটে

দৌড়ে তার কাছে আসার কথা ছিল না? অথচ কেমন নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে পূর্ণা! মৃদুল তার হাতের ব্যাগটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। পূর্ণার মাথার কাছে চলে আসে। পূর্ণার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে ছলছল চোখে সবার দিকে তাকায়। বাসন্তী মৃদুলকে দেখে আরো জোরে কাঁদতে থাকলেন। ঘটনাটা বুঝতে মৃদুলের অনেক সময় লাগে। সে পূর্ণার গালে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে পূর্ণাকে ডাকলো। ভালোবাসার মানুষের সাথে সংসার করার আশায় পবিত্র মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে ছুটে এসেছে। কিন্তু সে মানুষটি নাকি মৃত! মৃদুল অবাক চোখে তার মা-বাবার দিকে তাকায়। কেমন স্বপ্ন লাগছে সব! পুলিশ এসে ভীড় কমিয়ে দেয়। লাশের আশপাশ থেকে সবাইকে সরে যেতে বলে। মৃদুল বোকা বোকা চোখে পুলিশদের দিকে তাকায়। একজন পুলিশ তার বাহু ধরে সরে যেতে বললে,মৃদুল পূর্ণাকে অনুরোধ করে বললো, 'পূর্ণা,এই পূর্ণা। উঠো। আমার শেষ কথাটা রাখো। উঠো তুমি। আমি তোমারে নিয়া যাইতে আইছি।'

মৃদুল দ্রুত ব্যাগের চেইন খুললো। তার হাত কাঁপছে। এসব কী হলো? কেন হলো? পৃথিবীটা এরকম করে ভেঙে যাচ্ছে কেন? বুকের ভেতর কীসের এতো শব্দ? সে ব্যাগ থেকে লাল টুকটুকে বেনারসি বের করলো। তারপর সেই বেনারসি পূর্ণার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে পূর্ণাকে বললো, 'আমরা যে ঘরে সংসার পাতাম সেই ঘর আমি সাজায়া আইছি পূর্ণা। সুন্দর কইরা সাজায়া আইছি।'

পুলিশ তাড়া দিচ্ছে। কেউ ছোঁয়ার আগে লাশ তারা নিয়ে যাবে পরীক্ষার জন্য। খুন হওয়া লাশ ছোঁয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু মৃদুল জাপটে ধরে রেখেছে পূর্ণাকে। পদ্মজা দূরে বসে আছে। হাঁটুতে থুতুনি ঠেকিয়ে মৃদুলকে দেখছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। যেন সত্যি মৃদুল বিয়ে করতে এসেছে! আর বিয়ে হচ্ছে। মানুষগুলো একবার পদ্মজাকে দেখছে আরেকবার মৃদুলকে! মৃদুলের বাবা মৃদুলকে বলে পূর্ণাকে ছেড়ে দিতে। মৃদুল আরো শক্ত করে ধরে। সে বিড়বিড় করছে। পূর্ণাকে কানে কানে কিছু বলছে।যখন দুজন লোক মৃদুলকে টেনে তুলতে নিল,মৃদুল চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, 'পূর্ণা...আমার পূর্ণা। তুমি উঠো না কেন? আম্মা...আম্মা তুমি কই? আম্মা চুড়ি বাইর করো,আলতা বাইর করো আরো কি কি আছে না? সব বাইর করো আম্মা। পূর্ণারে সাজাইবা সবাই। আমি বিয়া করব আম্মা। আম্মা... আম্মা পূর্ণারে উঠতে কও। আম্মা ওরে কারা মারছে? আম্মা..'

মৃদুলের পাগলামি দেখে ভড়কে যান জুলেখা। এতোবড় ছেলে কেমন হাউমাউ করে কাঁদছে! তিনি দৌড়ে মৃদুলের পাশে আসেন। মৃদুল জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আম্মা মরা মানুষরে বিয়া করা যায় না? আমারে বিয়া দেও আম্মা। তারপর একলগে কবর দেও। আমি ওরে ছাড়া কেমনে থাকুম আম্মা?'

মৃদুল পূর্ণাকে বেনারসি দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলে। তাকে মানুষজন খামচে ধরেও আটকাতে পারছে না। সে পূর্ণাকে শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। তার দুই হাত টেনে ছোটাতে চেষ্টা করে সবাই। কিন্তু পারছে না। মৃদুল কিছুতেই পূর্ণাকে ছাড়বে না। আকাশের মালিক যেন নিজ দায়িত্বে মৃদুলের উপর শক্তির ভান্ডারের সব শক্তি ঢেলে দিয়েছেন। এভাবে চলতে থাকলে,লাশ পঁচে যাবে। তদন্তও ঠিকঠাক হবে না। একজন পুলিশ হাতের লাঠি দিয়ে মৃদুলের পিঠে আঘাত করলো। মৃদুল তাও তার কাজে অটল থাকে। সে হাউমাউ করে কাঁদছে। পূর্ণাকে চিৎকার করে ডাকছে। বুক ফেটে যাচ্ছে তার। সে পূর্ণার মাথায় চুমু দিয়ে পূর্ণাকে বললো, 'কবুল,কবুল,কবুল। আমি কবুল কইছি পূর্ণা। তুমি কও। সবাই হুনছে আমি কইছি। সবাই হুনছেন না? এহন তুমি কও। পূর্ণা...আমারে এতো বড় শাস্তি দিও না পূর্ণা। আমারেও সাথে নিয়া যাও।'

মৃদুল মানুষজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমারেও সবাই কবর দেন। পূর্ণার লগে কবর দেন। দিবেন আপনেরা? আমি কবুল কইছি না? অর্ধেক বিয়াতো হইয়া গেছে। হইছে না?'

মৃদুল কাঁদতে কাঁদতে হাসলো। জুলেখা কান্না শুরু করেছেন। মৃদুলের এমন পাগলামি তিনি

সহ্য করতে পারছেন না। ছেলেটা পাগল হয়ে গেল নাকি? তার কলিজার টুকরা এমন করে কাঁদছে কেন! কীসের অভাব তার! নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও তিনি মৃদুলকে সুখী দেখতে চান। তিনি মনে মনে চাইছেন,অলৌকিক কিছু হউক,মেয়েটা জেগে উঠুক। মৃদুল হাসুক! মৃদুলের পিঠ ছিঁড়ে যাচ্ছে আঘাতে-আঘাতে। তারা সবাই উন্মাদ এক প্রেমিককে আঘাত করছে যেন পূর্ণাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মৃদুল তো ছাড়বে না। সে কিছুতেই ছাড়বে না। মৃদুল পূর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো'এই কালি? কালি কইছি তো। গুসা করো...গুসা করো আমার সাথে। গালি দেও আমারে। ও পূর্ণা...ও ভ্রমর। চাইয়া দেহো একবার। আসমানের পরী তুমি...সবচেয়ে সুন্দর মুখ তোমার। হাসো পূর্ণা। হাসো।'

বেশ অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধস্তির পর মৃদুলের থেকে পূর্ণাকে সরানো যায়। মৃদুল বন্দী পাখির মতো ছটফট করছে। সে পায়ে মাটি খুঁড়ছে। সবাইকে অনুরোধ করছে তাকে ছেড়ে দিতে। চিৎকার করার কারণে মৃদুলের গলার রগ ফুলে লাল হয়ে গেছে। মানুষের টানাহেঁচড়ায় তার পরনের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। নিজের অজান্তে এক শ্যামকন্যার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ত্যাগ করে সে সর্বসুখ! ত্যাগ করে সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন-আশা! এমনও হয়?

পর্ব ৮৯

আকস্মিক থাপ্পড়ে রিদওয়ানের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে প্রচণ্ড আক্রোশে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষোভ আড়াল করে। মজিদ হাওলাদার টেবিলে থাপ্পড় দিয়ে চাপাস্বরে বললেন, 'এমন বোকামি কী করে করলি? এখন কে বাঁচাবে?'

রিদওয়ান মাথা নত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পূর্ণার খবরটা শোনার পর থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে গেছে। পূর্ণার শরীরে অগণিত প্রমাণ রয়েছে যা রিদওয়ানের জন্য বিপদজনক। মুত্তালিব যেখানে সেখানে ফেলে চলে আসবে জানলে সে এই দায়িত্ব দিত না। কিন্তু যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। এখন তাকে একমাত্র মজিদ বাঁচাতে পারেন। খলিল মিইয়ে যাওয়া গলায় বললো, 'ভাইজান,ও বুঝে নাই। না বুইঝা কইরা ফেলছে।'

মজিদ চেয়ারে বসলেন। জগ থেকে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বললেন, 'যা করেছে করেছেই! কিন্তু শেষে কী বোকামিটা করলো! লাশ কেউ ঝোপে ফেলে আসে?'

রিদওয়ান মুখ খুললো, 'আমি মুত্তালিব কাকারে বলছিলাম,লাশটা আজমপুর হাওড়ে ফেলে আসতে।'

রিদওয়ানের কথা যেন আগুনে ঘি ঢাললো। মজিদ উঠে দাঁড়ান। রিদওয়ানের পিঠে একনাগাড়ে কয়টা থাপ্পড় বসিয়ে খিটখিট করে বললেন, 'তুই চুপ থাক হারামজাদা!'

রিদওয়ানের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। মজিদ খলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন এখানে বসে থাকবি? নাকি আমার সাথে যাবি?'

খলিল চট করে উঠে দাঁড়ালেন। মজিদ মাথার টুপিটা ঠিক করে রিদওয়ানকে বললেন, 'তুইও আয় সাথে।'

রিদওয়ান পথ আটকে বললো, 'কাকা,একটা কথা ছিল।'

'আবার কী বলবি তুই?'

'গতকাল রাতে ভাঙা ফটকের বাইরে ইয়াকুব আলী আর তার ছেলেকে দেখছি।'

মজিদের চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ইয়াকুব আলী শিক্ষিত মার্জিত একজন ব্যক্তি। যিনি ইসলামের আদর্শে চলাফেরা করেন। নিজের সর্বত্র বিলিয়ে দেন গরীব-দুঃখীদের। কিন্তু মজিদকে টেক্কা দিয়ে মাতব্বরি পদটা ছিনিয়ে নিতে পারেননি। তবে তিনি ক্ষমতাবান ব্যক্তি। মজিদের সামনে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা তার আছে। গত চার বছর ধরে এই মহান ব্যক্তির মুখোমুখি মজিদকে হতে হচ্ছে। চার বছর আগে ইয়াকুব আলী সৌদিতে ছিলেন। সৌদি থেকে এসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জনসেবা করবেন। এই লোক তার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে মানে তো,বিপদজনক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ মজিদ আন্দাজ করে নিলেন,সেদিনের সমাবেশের ঘটনা থেকে ইয়াকুব আলীর কিছু সন্দেহ হয়েছে। তিনি রিদওয়ানের দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বললেন, 'বিপদের জাল চারিদিকে, তার মধ্যে তুই আবার আরেক অঘটন ঘটালি!'

রিদওয়ান প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, 'আপনি পূর্ণার ব্যাপারটা সামলান। আমি বাকিগুলো সামলে নেব।'

রিদওয়ানের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ মজিদের গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি কটাক্ষ করে বললেন, 'তুই আমার বাল করবি!'

অপমানে রিদওয়ানের মুখটা থমথমে হয়ে যায়। সে খলিলের দিকে তাকায়। খলিল চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। মজিদ রাগে ফুঁসছেন। তিনি মেঝেতে থুথু ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। মজিদের সাথে খলিলও বেরিয়ে গেলেন। রিদওয়ান অনেকক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জগের পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল। রিনু আলগ ঘর ছেড়ে দৌড়ে অন্দরমহলে চলে আসে। সে আলগ ঘর ঝাড়ু দিতে গিয়েছিল। তারপরই মজিদ,খলিল ও রিদওয়ানের কথা শুনেছে। বাড়িতে আমিনা আর আলো আছে। লতিফা পদ্মজার সাথে গিয়েছে। রিনু রান্নাঘরে এসে চার-পাঁচ গ্লাস পানি খেল। তার বুক কাঁপছে। সে বাকহারা!

পূর্ণাকে রিদওয়ান আর খলিল খুন করেছে! এটা শুনে তার মাথা ভনভন করছে।

আজিদের বাড়ির আঙিনা শূন্য! কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমির চারপাশে চোখ বুলিয়ে সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। আসমানি হঠাৎ আমিরকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সে নিজেকে ধাতস্থ করার পূর্বে আমির তার গলা চেপে ধরলো। আসমানি আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব। সে দ্রুত আমিরের হাত চেপে ধরে। আমির দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'একটা মিথ্যা বললে,সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব মা* ঝি।'

আসমানির নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। এক্ষুনি বুঝি দম বেরিয়ে যাবে! তার মুখ দিয়ে ঘ্যারঘ্যার জাতীয় শব্দ বেরিয়ে আসে। আমির আসমানির হাঁটুতে লাথি দিয়ে আসমানিকে মাটিতে ফেলে দেয়,তারপর চুলের মুঠি ধরে শক্ত করে। আসমানি কাশতে থাকে। হৃৎপিণ্ড আরেকটু হলে ফেটে যেত। শ্বাসনালী ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসতো! তার মনে হচ্ছে,সে নতুন জীবন পেয়েছে। আসমানি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। রাগে আমিরের কপালের রগ ভেসে উঠেছে। পারলে সে আসমানিকে পিষে ফেলে! আমির গলার আওয়াজ নীচু করে বললো, 'পূর্ণার সাথে কী হয়েছিল?'

আসমানির চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে আমিরকে যতটুকু চিনে গতকালই আন্দাজ করতে পেরেছিল,আমির দ্রুত সব ধরে ফেলবে। কিন্তু এতো দ্রুত ধরে ফেলবে ভাবেনি। আসমানি কথা বলার জন্য উদ্যত হলো তখন আমির হুমকি দিল, 'একটা অক্ষর মিথ্যে বললে এখানেই পুঁতে যাবো। সত্য বলার সুযোগ দেব না।'

আমিরের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় আসমানি। দুই বছর আগের কথা, তাদের দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আমির সেই বিশ্বাসঘাতককে যেখানে ধরেছিল সেখানেই মাটি খুঁড়ে পুঁতে এসেছিল! আসমানি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'চুল ছাড়ো। কইতাছি।'

আমির আরো শক্ত করে ধরে। আসমানি আর্তনাদ করে উঠলো। সে যত সময় নিবে তত বেশি অত্যাচারিত হবে। তাই দ্রুত সব বলে দিল। আমির আসমানিকে ছেড়ে দেয়। ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ান মালেহা বানু। তিনি আজিদের মা এবং আসমানির শ্বাশুড়ি। আমির চলে যেতে উঠে দাঁড়ায়। আসমানি তড়িৎ গতিতে বলে উঠলো, 'কিছু খাইয়া যাও।'

আমির শুনেও না শোনার ভান করে মালেহা বানুর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মালেহা বানু অবাক চোখে আসমানিকে দেখছেন।মাতব্বরের ছেলে তার ছেলের বউকে মারলো কেন? তিনি প্রশ্ন করতে গিয়েও করলেন না। তীব্র কৌতূহল চাপা দিয়ে দরজা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। শফিক আমিরের হাতে খুন হওয়ার পর মালেহা বানু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জানেন শফিক নিখোঁজ। আসমানি এবং আজিদ শফিকের পরিণতি জানে। তারা কেউ শফিককে হারিয়ে একটুও ব্যথিত নয়। পাপের রাজত্বে প্রয়োজনে সহযোগী পাওয়া যায়, আপনজন নয়! মালেহা বানু এ সম্পর্কিত কিছুই জানেন না। তিনি সবসময় নীরব। পাড়া ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। দুই ছেলে অর্থ উপার্জন করছে এইতো অনেক! তিনি রানীর মতো আছেন। আর কী লাগে? তার রাগটা আসমানির উপর। আসমানির সাথে শফিকের দৃষ্টিকটু ঘেষাঘেষি তিনি অনেকবার দেখেছেন! এ নিয়ে কথা শুনাতে গেলে,শফিক ও আজিদ দুজনই ক্রুদ্ধ হতো! তাই তিনি অনেকদিন হলো আসমানির সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আজিদের সাথে দেখা হয়। আজিদ আমিরকে দেখে বললো, 'হুনলাম,পূর্ণা নাকি খুন অইছে?'

আমির উত্তর দিল না। সে আজিদকে এড়িয়ে যায়। আজিদ ঘাড় ঘুরিয়ে আমিরের উপর কটমট করে তাকায়। সে তার বড় ভাই শফিকের কথা শুনে এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। সেখানে দেখা হয় আসমানির সাথে। আসমানি সুন্দরী। রূপের ঝলকে পুরুষ মানুষকে কাত করার ক্ষমতা তার আছে। আজিদ মাঝেমধ্যে পাতালে যেত তাও আসমানির সাথে সময় কাটানোর জন্য। আসমানি একাধারে পাতালের প্রতিটি পুরুষের সাথে রাত কাটাত। আজিদ প্রথম অবাক হয়েছিল,একটা মেয়ে কী করে এতোটা খারাপ হতে পারে? তারপর অবশ্য

জেনেছে,আসমানি তার জন্মদাত্রীর মতো হয়েছে। আমিরের দাদি নূরজাহানের সঙ্গী হিসেবে তার একজন বান্ধবী ছিল। সেই বান্দবীর মেয়ে আসমানি। মায়ের পেশা মেয়ে পেয়েছে! আসমানি ষোল বছর বয়স থেকেই তার গ্রামে কু-কীর্তি করে বেরিয়েছে। গ্রামের সালিশে যখন তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল,তখন মজিদ হাওলাদার আর আমির হাওলাদার আসমানিকে আজিদের গলায় ঝুলিয়ে দিল। আজিদ এমন একটা মেয়েকে বউ হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচ করেছিল। কিন্তু তার বড় ভাই বিয়েটা সমর্থন করে। এখানে আজিদের আর কিছু বলার ছিল না। সে আসমানিকে বিয়ে করে। তবে ইদানীং একটা বাচ্চার জন্য আজিদের মন কাঁদে। আসমানির কখনো বাচ্চা হলে সে মানতে পারবে না,এই বাচ্চা তার। এ নিয়ে সে যন্ত্রণায় আছে। মনে মনে হাওলাদার বাড়ি আর মৃত শফিকের উপর ক্ষিপ্ত সে। গত কয়দিন ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে,মজিদের অনুমতি নিয়ে সে আরেকটা বিয়ে করবে। আজিদ সোজা কলপাড়ে চলে আসে। আজ বিকেলে তাকে রওনা হতে হবে। মালেহা বানুর অসুস্থতা বেড়েছে। শহরের ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

—

তখন সময় বোধহয় রাত নয়টা। আমির অন্দরমহলে না গিয়ে সোজা আলগ ঘরে প্রবেশ করলো। গাঢ় অন্ধকারে আলগ ঘর ডুবে আছে। চারিদিক এতটাই নির্জন যে,মনে হচ্ছে মৃত্যু নেমে এসেছে চারিদিকে। খলিল-মজিদ বাড়িতে নেই। তারা লোক দেখানো ভালোমানুষিতে ব্যস্ত। দুজনে মোড়ল বাড়ির অভিভাবক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমির জানে,তারা প্রমাণ লুটপাটে ব্যস্ত। প্রমাণ নষ্ট করা তাদের বাঁ হাতের কাজ! আমির বিছানা হাতড়ে বালিশের নিচ থেকে দিয়াশলাই বের করে হারিকেন জ্বালাল। মগা বিকেলে বেরিয়ে গেছে। তাই আলগ ঘরে সুনসান নীরবতা। নয়তো অন্যবার মগার নাক ডাকার শব্দে আলগ ঘরে টেকা যায় না।

আমির তার খয়েরী শার্টের পকেট থেকে একটা লাল ছোট খাম বের করলো। তারপর হারিকেনের সামনে বসলো। পাশের ঘরে ধপ করে শব্দ হয়। আমির সে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো,বিড়াল ছোটাছুটি করছে। নিশ্চয়ই ইদুর দেখেছে! সে হারিকেন নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাল খামটি পায়জামার পকেটে রাখে। অন্দরমহলের চারপাশ ঘিরে জোনাকি পোকারা অনর্থক গল্প করে যাচ্ছে। আমির জোনাকিপোকাদের ভীড়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। আজকের দিনটা অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল! কিছুটা সুন্দর কিছুটা দুঃখের! অথচ সবটাই শব্দহীন। আমির কিছু একটা ভেবে অন্দরমহলে প্রবেশ করে। লতিফা আমিরকে দেখে দৌড়ে এসে পথ আটকে বললো, 'ভাইজান,পদ্মর কী হইলো বুঝতাছি না। কথাবাতা কয় না।'

লতিফা চিন্তিত। আমির প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'আমি থাকব এখানে। তুই রান্না বসা।' কথা শেষ করে উপরে উঠে গেল আমির। লতিফা রান্নাঘরে চলে যায়। আমির আজ পদ্মজার সাথে থাকবে শুনে সে কেন জানি খুব খুশি হলো! পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল,আমির সারাক্ষণ ঘরের ভেতর আঠার মতো লেগে থাকতো। না নিজে বের হতো আর না পদ্মজাকে বের হতে দিতো! এ নিয়ে ফরিনা,রানি,নূরজাহান ও আমিনার কত কথা ছিল! লতিফার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। অতীত এতো সুন্দর কেন হয়?

দ্বিতীয় তলায় উঠতেই আমিরের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। বারান্দা জুড়ে উত্তুরে হাওয়া বইছে। আকাশের তারা ও অর্ধচন্দ্রের আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। এমন একটা পরিবেশে মিনমিনিয়ে কেউ কাঁদছে । বড্ড অচেনা এই কান্না! যেন কোনো অশরীরী শত জনমের দুঃখ একসাথে মনে করে কাঁদছে! আমির দ্রুত পায়ে পদ্মজার ঘরে আসে। ঘরের প্রতিটি কোণা অন্ধকারে তলিয়ে আছে। বাতাসে একটা ভারী কান্না ভেসে বেড়াচ্ছে। আমির আন্দাজে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। বিছানার পাশে একটা টেবিল আছে। সে টেবিলে হারিকেন থাকে আর ড্রয়ারে থাকে দিয়াশলাই। আমির দিয়াশলাই বের করে হারিকেন

জ্বালাল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো,দেয়াল ঘেঁষে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে পদ্মজা। সে কাঁদছে! কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার করুণ কান্না এসে আমিরের বুক ভিজিয়ে দেয়। ও বাড়ির অবস্থা ভালো নেই। প্রেমার গা কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। চোখ খুলে তাকাতে পারছে না। বাসন্তী পড়েছেন বড় কষ্টে! একদিকে পূর্ণার সমাপ্তি অন্যদিকে প্রেমার গা কাঁপানো জ্বর! মৃদুলের গলা ভেঙে গেছে,বড্ড এলোমেলো হয়ে গেছে সে। বাবা-মায়ের বড় আদরের একমাত্র ছেলে। কখনো মায়ের হাতে মার খেয়েছে কিনা সন্দেহ! তার প্রাপ্তির খাতা সবসময় পরিপূর্ণ ছিল। সে কখনো কষ্টে কাঁদেনি,বাস্তবতা দেখেনি। সোনার চামচে খেয়ে বড় হওয়া আহ্লাদী আদুরে ছেলে! তার জন্য এই ধাক্কাটা মৃত্যুর মতো! সে স্বাভাবিক হতে কত সময় নিবে কে জানে! অথচ সবকিছু ছেড়ে পদ্মজা অন্দরমহলে চলে এসেছে। তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এক জায়গায় সারাক্ষণ বসে ছিল। তারপর হুট করেই অন্দরমহলে চলে আসে। সাথে খন্ড খন্ড মেঘ আষাঢ়ী দুই চোখে জড়ো করে নিয়ে আসে।

আমির কথা বলার জন্য যখন উদ্যত হলো সে টের পেলো তার হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে! এমন কেন হয়? পদ্মজা কোন আসমানের চাঁদ যে তাকে ছোঁয়ার কথা ভাবলেই আমিরের গলা শুকিয়ে আসে! কয়দিনের দূরত্বে, মানুষটার চোখের দিকে তাকাতেও সংকোচ হচ্ছে! অথচ,ফেলে আসা দীর্ঘ ছয় বছরের প্রতিটি রাত দুজন দুজনের বুকের সাথে লেপ্টে কাটিয়েছে। কত উছলে পড়া জ্যোৎস্না রাতে তারা ভালোবাসার গল্প রচনা করেছে! আমির রয়ে সয়ে বললো, 'চলে এলে কেন?'

পদ্মজা মাথা তুলে তাকালো। পদ্মজার চোখের দৃষ্টিতে আমির এলোমেলো হয়ে গেল। বুক প্রবলভাবে কাঁপতে থাকলো। পদ্মজার দৃষ্টির জাল আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে তাকে। সে বিছানার উপর বসলো। বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অথচ পদ্মজা নির্লিপ্ত। পদ্মজার নাকের নাকফুলটা জ্বলজ্বল করছে। নাকফুলটি বিয়ের পর আমির পরিয়ে দিয়েছিল। নাকফুলে গেঁথে দিয়েছিল জনম জনমের ভালোবাসা। অথচ,এখন সেই ভালোবাসা বিষের দাঁনার মতো রূপ নিয়েছে! পদ্মজা এক হাতে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'আমি কিছু পেলাম না জীবনে। আব্বার অবহেলা আর নোংরা কথা শুনে কাটিয়েছি ষোলটা বছর। তারপর আমার মা,আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে হচ্ছে আরেক বিশ্বাসঘাতক।'

শেষ লাইনটায় ক্ষোভ-অভিমান প্রকাশ পায়। পদ্মজা গলার জোর বাড়িয়ে'বিশ্বাসঘাতক'শব্দটি উচ্চারণ করলো। আমির চট করে বললো, 'উনি বিশ্বাসঘাতক নন।'

পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো দুই হাতে খামচে ধরে মেঝে। আমিরের দিকে রক্তচোখে তাকায়। তার বুক থেকে আঁচল মেঝেতে পড়ে। সে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে আমিরকে বললো, 'করেছে,করেছে। সবকিছুর জন্য আমার মা দায়ী। সব ভুল আমার মায়ের। সে আমাকে জন্ম দিয়েছে। আমাকে আগুনে ঠেলে দিয়ে নিজে চলে গেছে। ছোট থেকে আমাকে বলে এসেছে, সারাজীবন আমার সাথে থাকবে। আমাকে আগলে রাখবেন। যাই হয়ে যাক,সব আমাকে বলবে। কিন্তু আম্মা,একটা কথাও রাখেনি। রাখেনি কোনো কথা। প্রতারক,বিশ্বাসঘাতক। সব দোষ আমার মায়ের। সব দোষ...'

পদ্মজা অস্থির হয়ে পড়েছে। তার নিঃশ্বাস এলোমেলো। সে বিপর্যস্ত। কাঁদতে কাঁদতে হুট করে আমিরের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। বললো, 'সবাই কী ভেবেছে? আমাকে কষ্ট দিয়ে কাঁদাবে? আমি কাঁদব না। কিছুতেই কাঁদব না।'

কাঁদব না বলেও আবার কাঁদতে শুরু করলো। কষ্টের মাত্রা পেরিয়ে গেলে,মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে তার জীবনের ছোট ঘটনাগুলোকে বড় করে ভাবতে থাকে।সারাক্ষণ বিলাপ করে আর কাঁদে। পদ্মজার অবস্থা এখন ওরকম! সে তার চেনা সত্ত্বা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পদ্মজার কান্না শুনে আমিরের মাথা ফেটে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলতে চাইছে, পদ্মবতী, কান্না থামাও। কান্না থামাও তুমি। আমি সহ্য করতে পারছি না। এতো কেন কষ্ট তোমার? তুমি পদ্মবতী নাকি কষ্টবতী?

মনের কথা মনে রয়ে গেল। আমির পারলো না কিছু বলতে। সে বিছানার মাঝে গিয়ে বসলো। দুই হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরে৷ ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। আত্মগ্লানি তাকে গ্রাস করে ফেলেছে৷ সে যেন অদৃশ্য কোনো শেকলে বন্দী। পদ্মজার আর্তনাদ, বিলাপ গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমির টের পাচ্ছে! আর টের পাচ্ছে বলেই,মনে হচ্ছে তার মস্তিষ্কে কেউ যেন রড দিয়ে পিটাচ্ছে। সে জানালার বাইরে তাকায়৷ রাতের লক্ষ তারাতেও যেন বেদনার গুঞ্জন। হৃদয়ের শহর খাঁখাঁ করছে। ইচ্ছে হচ্ছে,অন্যবারের মতো পালিয়ে যেতে। কিন্তু আজ সে পালাবে না। সে পালাতে চায় না। তার ভেতরটা তিরতির করে কাঁপছে। মোলায়েম বাতাসের ঝংকারে রগে রগে শিরশির অনুভুতি হচ্ছে। আমির পদ্মজার দিকে তাকায়। নিজের মাথার চুল আরো জোরে টেনে ধরে। পদ্মজা পা ছড়িয়ে বসলো। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজলো। আমির পদ্মজার উপর চোখ রেখে নিজের হাত কামড়ে ধরে। সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, সে কি নিজের সিদ্ধান্তে অটল? হ্যাঁ/না,/হ্যাঁ/না একটা সিদ্ধান্তের ব্যবধান মাত্র। তাহলেই মনের যুদ্ধের সমাপ্তি! খুব দ্রুত উত্তর আসে হ্যাঁ! মুহূর্তে অদৃশ্য ভারী দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পৃথিবীর সব ফুল জেগে উঠে। শান্ত সমুদ্রের ঢেউ যেন বিকট শব্দ তুলে আছড়ে পড়ে তীরে। আমির বিছানা থেকে নেমে পদ্মজার দুই বাহু চেপে ধরে দাঁড় করায়। পদ্মজা দরজার বাইরে তাকিয়ে আছে। তার বার বার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। একবার পূর্ণাকে দেখছে তো অন্যবার পারিজাকে। দুজনই রক্তাক্ত অবস্থায় তার সামনে আসে। পদ্মজা খামচে ধরে আমিরের চোখমুখ। নখের আঁচড়ে গাল ছিঁড়ে নেয়। আমির তার দুই হাতে পদ্মজাকে বুকের সাথে চেপে ধরলো। পদ্মজা আবার কান্না শুরু করে।

আমির পদ্মজাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললো, 'একটু শান্ত হও...একটু!'

পদ্মজা এতক্ষণ আমিরকে টের পায়নি। এখন টের পাচ্ছে। সে এক ঝটকায় আমিরের হাত দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর বিছানার মাঝে গিয়ে বসলো। আমির পদ্মজার সামনে এসে বসে৷ আমিরের মুখটা দেখে মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের কথা। যেদিন পাতালে আমিরের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল। আমির নগ্ন মেয়েগুলোকে বেল্ট দিয়ে পিটাচ্ছিল! পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। তার বোনের সাথেও কি এমন হয়েছে? কিছু বুঝে উঠার পূর্বে পদ্মজা আমিরের গলা চেপে ধরলো। আমির হকচকিয়ে গেলেও বাঁধা দিল না। পদ্মজা আমিরের মুখের উপর ঝুঁকে কিছু একটা বিড়বিড় করে। যা অস্পষ্ট। বিড়বিড় করতে করতে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে দুই হাতে আমিরের গলা চেপে ধরে রাখে। আমির গলায় প্রচণ্ড চাপ অনুভব করে। তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। চোখ বুজতেই যন্ত্রণায় চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। পদ্মজা আমিরের গলা ছেড়ে দিল। দূরে সরে বসলো। আমিরের শুকিয়ে যাওয়া মুখটা দেখে ফিক করে হেসে দিল। তারপর আবার নীরব হয়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে,হেমলতার মৃত মুখ,পারিজারর মৃত মুখ,পূর্ণার মৃত মুখ! পূর্ণা একটা গাছের সামনে বসে কাঁদছে। এইতো তার চেয়ে মাত্র কয়েক দূরেই সেই গাছটা। পারিজা একটা বাড়ির ছাদে বসে আছে। তার গলা থেকে রক্ত চুঁইয়ে- চুঁইয়ে পড়ছে! পদ্মজা থম মেরে সেখানে তাকিয়ে রইলো। অদ্ভুত স্বরে কেঁদে উঠলো। আমির নিজেকে ধাতস্থ করতে সময় নিল। পদ্মজা কান্না থামিয়ে অবাক চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছু দেখছে! আমির পদ্মজার কাছে এসে বসে। পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে আঙুলগুলো আলতো করে ছুঁয়ে দেয়। পদ্মজার মুখের উপর কয়টা চুল উড়ে বেড়াচ্ছে৷ আমির অবাধ্য চুলগুলোকে পদ্মজার কানে গুঁজে দিল৷ পদ্মজার চোখ,নাক,গাল,ঠোঁট পর্যবেক্ষণ করে আমির উঁকি দিল অতীতে। গল্পটা ভীষণ ব্যক্তিগত। পদ্মজা একবার বিরক্ত হয়ে রাগী স্বরে বলেছিল, 'আরেকটা চুমু দিলে আমি বাড়ি ছেড়ে কিন্তু চলে যাব।'

আমির পদ্মজার কথায় থমকে যায়। তখন ঢাকায় নতুন নতুন তাদের সংসার। পদ্মজা ভার্সিটিতে পড়ছে। আগামীকাল তার পরীক্ষা তাই সে পড়ছিল। কিন্তু আমির সেদিন বাড়িতে ছিল। আর সারাক্ষণ পদ্মজাকে বিরক্ত করে যাচ্ছিল। পদ্মজার মুখের সামনে গিয়ে একবার

নাকে চুমু দেয় তো আরেকবার গালে। বারংবার পদ্মজা পড়ার খেই হারিয়ে ফেলছিল। সে ভীষণ রেগে যায়। আর কথাটা বলে ফেলে। আমিরতো বরাবরই রাগী। সে তাৎক্ষনিক রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যা সময় বাড়ি ফেরে তাও পদ্মজার সাথে কোনো কথা বললো না। পদ্মজা তো অবাক। সে কথা বলতে গেলে, হু হ্যাঁ ছাড়া আমির কিছু বলে না। পদ্মজা মুখে কিছু বলতে লজ্জা পায়। তাই সে বিভিন্নভাবে আমিরের আকর্ষণ পাওয়ার চেষ্টা করেছে। আমির প্রথম পদক্ষেপে নরম হয়ে গেলেও প্রকাশ করলো না। সে গম্ভীর হয়ে থাকে। চুপচাপ খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অথচ অন্যবার পদ্মজাকে টেনে নিয়ে যায়,তারপর একসাথে ঘুমায়। আমিরের আচরণে পদ্মজা মনে ব্যথা পায়। একটা কথার জন্য এরকম কেউ করে? পদ্মজা অভিমানে বৈঠকখানায় বসে থাকে। আমির এদিকে চিন্তিত। রাত বাড়ছে,পদ্মজা আসে না কেন? সে ভাবলো,পদ্মজা এসে ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলে তার রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করবে। তখন সে কিছু একটা চেয়ে বসবে। কিন্তু তার অর্ধাঙ্গিনী তো ঘরেই আসছে না! আমির বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় দেখে পদ্মজা সোফায় গাল ফুলিয়ে থম মেরে বসে আছে! রাগ ভাঙানোর বদলে উল্টো রাগ করে বসে আছে। কি অদ্ভুত! আমির খ্যাক করে গলা পরিষ্কার করে বললো, ‘রাত কয়টা বাজে কারো খবর আছে? কেউ কি ঘরে যাবে না?’

পদ্মজা অভিমানী স্বরে বললো, ‘কেউ তাকে পাত্তা না দিলে সে কেন ঘরে যাবে?’আমির হেসে ফেললো। সে পদ্মজার সামনে এসে বসে। পদ্মজার চোখে জল চিকচিক করছে। আমির পদ্মজার হাতে চুমু দিয়ে বললো, ‘কী বাচ্চাকাচ্চা বিয়ে করলাম রে। একটুতে কেঁদে দেয়।’

‘তো ছেড়ে দিন না।’

আমিরের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়! পদ্মজা এতো কথা কবে শিখলো। কী অভিমান তার! আমির হাসি দীর্ঘ করলো। পদ্মজার মুখের উপর ঝুঁকে বললো, ‘মৃত্যুর আগে ছাড়ছি না। পরপারে যদি আবার দেখা হয় তখনও তোমার পিছু নেব।’

আমিরকে মুখের উপর ঝুঁকতে দেখে পদ্মজা লজ্জা পেয়ে গেল।

ও বাড়ির প্রতিটি ইট তাদের ভালোবাসার স্বাক্ষী। সবখানে ভালোবাসা লেপ্টে লেপ্টে আছে। আমির বর্তমানে ফিরে আসে। সে রান্নাঘরে যায়। লতিফাকে বলে গরম পানি আর ছোট তোয়ালে নিয়ে আসে। পদ্মজার মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে। তার চোখ দুটির উপর যেন ভারী পর্দা টানানো। এই জগতের কিছু দেখছে না। সে চোখ বুজলো। তার হাঁটু থেকে পা অবধি কাঁদা লেগে আছে। আমির ভেজা তোয়ালে দিয়ে পদ্মজার হাত-পা মুছে দিল। তারপর লতিফাকে ডেকে আনে। লতিফা পদ্মজাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। সে পদ্মজাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমির লতিফাকে বললো, ‘কয়দিনে ঠিক হয়ে যাবে। শোন তোর সাথে কিছু কথা আছে।’

লতিফা উৎসুক হয়ে তাকায়। আমির বললো, ‘পদ্মজার যত্ন নিবি। রাধাপুরের রঞ্জন মিয়ারে চিনিস না?’

লতিফা বললো, ‘চিনি।’

‘উনি নিজের হাতে বাদামের তেল বানান। খাঁটি বাদামের তেল। পদ্মজা চুলে বাদামের তেল দেয়। উনার কাছ থেকে সবসময় বাদামের তেল আনবি। আর, ওর পিঠের হাড়ে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। ছোটবেলা কোথাও আঘাত পেয়েছে। যখন ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটবে বুঝবি,পিঠের হাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। তখন ধরে নিয়ে সরিষা তেল ডলে দিবি আর গরম সেঁক দিবি। তিনবেলা নিজ দায়িত্বে জোর করে খাওয়াবি। আর পিঠের দিকে কিন্তু খেয়াল অবশ্যই রাখবি।’

লতিফা জানে না তাকে কেন এই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। সে প্রশ্নও করলো না। বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। পদ্মজা আবার মিনমিনিয়ে কাঁদছে। অস্পষ্ট স্বরে পূর্ণাকে ডাকছে। লতিফা পদ্মজার শাড়ি ও বিছানার চাদর পাল্টে দিল। শাড়ি পাল্টানোর সময় যখন পদ্মজা অর্ধনগ্ন তখন সে লতিফাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, ’পূর্ণা..পূর্ণা…বোন আমার।’

লতিফা চমকে গেল। তাকে পদ্মজা পূর্ণা বলছে কেন? পদ্মজার কান্না শুনে আমির ছুটে ঘরে আসে। পদ্মজা আমিরকে দেখেই,টেবিল থেকে হারিকেন নিয়ে তার উপর ছুঁড়ে মারে। তারপর চিৎকার করে বললো, 'খুনী, ধর্ষক, জানোয়ার... জানোয়ার....।'

পদ্মজার চিৎকারে অন্দরমহল কেঁপে উঠে। হারিকেনের কাচের উপর ব্যবহৃত প্লাস্টিক আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাই পদ্মজা চিকন তার দিয়ে সেটি জোড়া দেয়। তারের একাংশ খাড়া হয়ে ছিল। সেই খাড়া অংশ আমিরের চোখের পাশে ঢুকে পড়ে। আরেকটু হলে চোখ গলে যেত। সঙ্গে সঙ্গে আমির মেঝেতে বসে পড়লো। দুই-তিন ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে। লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। পদ্মজা রাগে কিড়মিড় করতে করতে চাদর ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে। আমির লতিফাকে বললো, 'পদ্মজাকে দেখ তুই।'

তারপর সে অন্য চোখে পথ দেখে সোজা কলপাড়ে চলে যায়। চোখের পাশে আঘাত পেলেও চোখের ভেতর ভীষণ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। খলিল-রিদওয়ান সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছে। এসেই পদ্মজার চিৎকার শুনে। পদ্মজার চিৎকার কোনো স্বাভাবিক মানুষের মতো না। তাছাড়া তারা দুজনই পদ্মজাকে ও বাড়িতে কাঁদতে দেখেনি। অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেছে। খলিল রিদওয়ানকে বললো, 'এই ছেড়ি পাগল হইয়া গেল নাকি?'

রিদওয়ান হেসে বললো, 'আরো আগে হওয়ার কথা ছিল আব্বা।'

আমিরকে কলপাড়ে দৌড়ে যেতে দেখে রিনুও পিছনে যায়। সে কল চাপে। আমির উন্মাদের মতো চোখে পানি দিতে থাকে। তার চোখ জ্বলে যাচ্ছে। যাক, সে তো এটাই চায়! হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত সব ছারখার হয়ে যাক! পদ্মজা লতিফার হাত খামচে ধরে। তার চোখমুখ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সে চাপা স্বরে প্রশ্ন করলো, 'আমার বোনকে কে খুন করেছে? কার আদেশে হয়েছে?'পদ্মজার চাহনি দেখে মনে হচ্ছে,লতিফা যদি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে তাহলে পদ্মজা তাকেও খুন করে ফেলবে। লতিফা পদ্মজার সাথে বাড়ি ফেরার পর রিনু লতিফার কাছে ছুটে আসে। সে যা যা শুনেছে সব লতিফাকে বলে। লতিফা এখন সব জানা সত্ত্বেও বলতে চাইছে না। সে বললো, 'শাড়িডা আগে পিন্দো। ঠান্ডা লাগব।'

পদ্মজা লতিফার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। সে লতিফার হাত খামচে ধরে রাখা অবস্থায় বললো, 'কী জানো তুমি? বলো আমাকে।'

যতক্ষণ লতিফার মুখ থেকে কিছু না শুনবে ততক্ষণ লতিফার হাত পদ্মজা ছাড়বে না। তার নখ লতিফার হাতের চামড়া ভেদ করেছে। লতিফা সংক্ষেপে দ্রুত সব বললো। সব শুনে পদ্মজা লতিফার হাত ছেড়ে নিজের হাত নিজে খামচে ধরে। মুখ দিয়ে'ইইইই'জাতীয় শব্দ করে রাগে কাঁপতে থাকে। লতিফা ভয় পেয়ে যায়। সে পদ্মজার মাথায় হাত রাখে,পদ্মজা সেই হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দেয়। লতিফা দূরে সরে আসে। পদ্মজা শূন্যে তাকিয়ে নিজেকে স্থির করলো। তারপর চুপচাপ শাড়ি পড়ে শুয়ে পড়ে। লতিফা ধীর পায়ে পদ্মজার পায়ের কাছে এসে বসলো।

ঘন্টাখানেক পার হওয়ার পর আমির ঘরে আসে। আমিরকে দেখে লতিফা বেরিয়ে যায়। আমির এক চোখে ঝাপসা দেখছে। সে ধীরপায়ে পদ্মজার পায়ের কাছে এসে বসলো। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশ দেখে আবিষ্কার করলো, পুরো ঘর জুড়ে গাঢ় বিষাদের ছায়া। এ ঘরে আনন্দরা আসে না অনেকদিন! আমির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পদ্মজার পায়ের আঙুল ফুটিয়ে দিল। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে। মৃদুলের মতো হাউমাউ করে যদি কান্না করা যেত! আমির ঠোঁট কামড়ে ধরে। দুই গাল বেয়ে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টিতে পদ্মজার দুই পা স্নান করে। তাদের জীবনের সব সুর,ছন্দ এক থাবায় কে ছিনিয়ে নিল? কেন হলো না দীর্ঘ সংসার! তবে কেন হয়েছিল,পাপ-পবিত্রের মিলন? শূন্যে অভিযোগ তুলেও উত্তর মিলে না। আমির তার চোখের জল মুছে ফেললো। তারপর পদ্মজার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। একবার ভাবলো,পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে। তারপর আবার ভাবলো, যদি পদ্মজার ঘুম ভেঙে যায়। পাশেও শুয়ে থাকতে পারবে না। তাই চুপচাপ দূরত্ব রেখে শুয়ে থাকে। শেষ রাতে পদ্মজা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠে। সে স্বপ্নে শুধু রক্ত দেখছে।

রক্তের সাগর,রক্তের নদী,রক্তের পুকুর! পদ্মজা ভয়ে চট করে চোখ খুলে। সে ঘুমাচ্ছে না বরং বার বার পূর্ণার সাথে সাক্ষাৎ করছে! পাশ ফিরে দেখে আমির শুয়ে আছে। তার চোখ দুটি বোজা। গত দিনগুলোতে সে ঘুমায়নি। পদ্মজার সংস্পর্শে আসতেই তাকে ঘুম জেঁকে ধরেছে। পদ্মজা আমিরকে দেখে থমকায়। আমিরের এক চোখ ফুলে গেছে। পদ্মজা আলতো করে আহতস্থান ছুঁয়ে দেয়। কী যেন মনে পড়তেই অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়ে। আমির চোখ খুললো। সে পদ্মজার পিঠের উপর নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলো।

ফজরের আযানের সুর ভেসে আসে কানে। বিষাদ রাঙা ভোরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের ভেতর। আমির উঠে বসে। পদ্মজা আবার ঘুমিয়েছে। ঘুমের মাঝে বিড়বিড় করছে। আমির কান পেতে শুনে,পদ্মজা পূর্ণাকে কিছু বলছে! সে তার পায়জামার পকেট থেকে লাল খামটি বের করে বালিশের কভারের ভেতর রেখে দিল। তারপর বিছানা থেকে নেমে পদ্মজার মুখের সামনে চেয়ার নিয়ে বসলো। ভোরের মায়াবী আলোয় পদ্মজার বিষণ্ণ মুখটা আরো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। আমির সাবধানে পদ্মজার কপালে চুমু দিল,হাতে চুমু দিল। তারপর মিষ্টি করে হেসে বললো, ‘তুমি চাও বা না চাও,পরপারে দেখা হলে আবার তোমার পিছু নেব।’

(সতর্কতা – নিজ দায়িত্বে পর্বটি পড়বেন। এই পর্বে নৃশংস খুনের বর্ণনা রয়েছে।)

পর্ব ৯০(১)

চাঁদটা ঠিক মাথার উপরে। চারিদিকে ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। জোনাকি পোকা ও রাতের প্যাঁচা কারোর মুখে রা নেই। এমনকি বাতাসের নিজস্ব শব্দও থমকে গিয়েছে। শুধু শোনা যাচ্ছে তাণ্ডবলীলার আহবান। গাছের ডালপালার আড়াল থেকে নিশাচর পাখিরা চেয়ে আছে। তারা তেজস্বী পদ্মজার আগমন দেখছে। পদ্মজার একেকটা কদম নিশাচর পাখিদের মনে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানছে। তার সাদা শাড়ি থেকে বিচ্ছুরিত সাদা রঙ নিশাচরদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে। পদ্মজার এক হাতে রাম দা অন্যহাতে দঁড়ি। দঁড়ি দিয়ে বাঁধা তিনটে নেড়ি কুকুর! আচমকা কুকুরগুলো চিৎকার করে উঠলো। নিশাচর পাখিরা ভয় পেয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গেল। গাছের ডালপালা নড়ে উঠাতে পদ্মজাসহ তিনটে কুকুর আড়চোখে উপরে তাকালো। চার জোড়া হিংস্র চোখ জ্বলজ্বল করছে! কুকুরগুলোর চোখের চেয়ে মানবসন্তান পদ্মজার চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর! যেন চোখ নয় আগ্নেয়গিরি! এক্ষুনি আগুন ছড়িয়ে দিয়ে চারপাশ ভস্ম করে দিবে! পদ্মজা পায়ে হেঁটে ঘাস পেরিয়ে একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো। পুকুরের জল কুচকুচে কালো। পুকুরের চেয়ে কিছুটা দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় রেইনট্রি গাছ। গাছগুলোর শত বছর বয়স। রেইনট্রি গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায় ঘুমাচ্ছে মজিদ,খলিল,আমির,রিদওয়ান ও আসমানি।

পদ্মজা পাশ থেকে ছোট চৌকিখাট টেনে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসলো। তার শরীরের রক্ত বুদবুদ করে ফুটছে! ঘুমন্ত অমানুষগুলোকে দেখে তার ঠোঁটে তিরস্কারের মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। যখন চোখ খুলে আমির ও তার দলবল আবিষ্কার করবে, তারা বন্দী! আর সামনে তিনটে কুকুরের সাথে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা! তখন তাদের কেমন অনুভূতি হবে?

সাত ঘন্টা পূর্বে, তখন শেষপ্রহরের বিকেল। পদ্মজা লতিফাকে পানি আনতে পাঠিয়েছে। সে রান্নাঘরে রান্না করছে। লতিফা কলপাড়ে এসে আমিরকে দেখতে পেল। আমির আলগ ঘরে প্রবেশ করেছে মাত্র। লতিফা কলসি রেখে আমিরের কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু দুই কদম হেঁটে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। দ্রুত উল্টো ঘুরে কলপাড়ে চলে আসে। কলপাড়ে খালি কলসিটা স্থির হয়ে আছে। লতিফা কলসির উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে কপাল কুঁচকায়। নূরজাহানের ঘর থেকে তিনদিন আগেই ঘুমের ঔষধ সংগ্রহ করে রেখেছিল পদ্মজা। আজ রাতের খাবার পরিবেশন করার পূর্বে খাবারের সাথে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেয়া হবে। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন পদ্মজা আক্রমণ করবে! এই পরিকল্পনাই লতিফাকে জানানো হয়েছে। লতিফা কলপাড়ে এসে আমিরকে দেখে দূর্বল হয়ে পড়ে। তার বলে দিতে ইচ্ছে হয়,আমির যেন রাতের খাবার না খায়! কিন্তু যখন মনুষ্যত্ব জেগে উঠলো সে থেমে গেল।

আজ লতিফার একখানা বড় কাজ আছে। রিনুকে নিয়ে তার পালাতে হবে! এই বাড়িতে কিশোরী রিনু এসেছে গতবছর। তার আগেও অন্দরমহলে রিনু নামে একজন কাজের মহিলা ছিল। তিনি ডায়রিয়ায় গত হয়েছেন দুই বছর আগে। এতিম লতিফা প্রথম যখন এই বাড়িতে এসেছিল,মজিদ ও খলিলের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিল। তারপর লতিফা ফরিনাকে সব জানায়। ফরিনা প্রতিবাদ করায় আমির সব শুনলো। আমির তার বাপ-চাচাকে নিষেধ করে লতিফাকে নির্যাতন করতে। সে চায়,তার মায়ের সেবা করা মানুষগুলো নিরাপদ থাকুক।

এরপর প্রায় দুই-তিনবছর নিরাপদে কেটে গেলেও পনেরো বছর বয়সে রিদওয়ানের মাধ্যমে লতিফা ধর্ষিতা হয়। ধর্ষণের পর লতিফা পালানোর জন্য ছটফট করেছে। দরজা বন্ধ করে দিনের পর দিন লুকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদেছে। তারপর বেশ কয়েকবার মজিদ ও খলিলের থাবার শিকার হতে হয়েছে। দিনগুলো বিষাক্ত ছিল। পালানোর মতো জায়গা ছিল

না। তাই একসময় লতিফা ভাগ্যকে মেনে নিল। সহ্য করে নিল সবকিছু। অন্দরমহলের পাশাপাশি পাতালঘরের বিশ্বস্ত সহযোগী হয়ে উঠলো। তবে গত চার বছর ধরে সে মজিদ,খলিল আর রিদওয়ানের থাবা থেকে মুক্ত। এর পিছনেও কাহিনি রয়েছে। ফরিনার প্রতি লতিফার ভালোবাসা এবং সম্মান দেখে আমির লতিফার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। তার হুমকিতে থেমে যায় লতিফার কালরাত্রিগুলো। লতিফা বিশ্বস্ততার সাথে আমিরের গোপন আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলে। পদ্মজা, রুম্পা ও হেমলতাকে চোখে চোখে রাখা ছিল লতিফার দায়িত্ব। গত বছর কিশোরী রিনু নতুন এসেছে অন্দরমহলে। সে এ বাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানে না। মজিদ হাওলাদার উদারতা দেখিয়ে এতিম রিনুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। যেহেতু রিনুকে উদারতার জন্য আনা তাই রিনুকে দেখেশুনে রাখা হয়। বিয়ের জন্য পাত্রও খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু লতিফা দেখেছে,রিদওয়ানের কু-দৃষ্টি রিনুর উপরে আছে। রিনুর সাথে একই বিছানায় থাকতে থাকতে লতিফা রিনুকে আপন ছোট বোন ভাবা শুরু করেছে। সে রিনুকে ছোট বোনের মতো ভালোবাসে। রিনুকে অভিশপ্ত নিখুঁত যন্ত্রণাময় কালরাত্রিগুলো থেকে বাঁচাতে লতিফা দ্রুত পালাতে চায়। তাই আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা সত্ত্বেও গোপন পরিকল্পনার কথা বলতে পারলো না। দমে গেল! সে কলসি রেখে দ্রুতপায়ে অন্দরমহলে চলে যায়।
রান্নাঘরে পা রাখতেই পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সে পাথরের মতো স্থির! লতিফার হাত খালি দেখে যান্ত্রিক স্বরে বললো, 'পানি কোথায়?'লতিফা নিজের হাতে নিজের কপাল চাপড়ালো। সে কলসি রেখে চলে এসেছে। লতিফা টান টান করে হেসে বললো, 'এহনি আনতাছি। খাড়াও।'

লতিফা কলসি আনতে চলে গেল। পদ্মজা এক এক করে পাতিলে মশলা ঢাললো। মুরগি কষানো হবে। পুলিশ ভোরে পূর্ণার লাশ ফেরত দিয়েছে। বাসন্তী নাকি রাতে স্বপ্ন দেখেছেন,পূর্ণা লাহাড়ি ঘরের পাশে কবর খুঁড়ছে। তাই তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছেন,পূর্ণার কবর যেন লাহাড়ি ঘরের পাশে গোলাপ গাছটির নিচে হয়। বাসন্তীর কথা রাখা হয়৷ পূর্ণা তার প্রিয় গোলাপ গাছটির নিচে পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা আজও কাঁদলো না। সে চুপচাপ কোরান শরীফ পড়েছে। তারপর পূর্ণাকে কবর দেয়া হলে অন্দরমহলে ফিরে এসেছে। এ নিয়ে সমাজে নানান কথা হচ্ছে৷ পদ্মজার ব্যবহারে অবাক হয়েছে প্রেমা,বাসন্তী ও প্রান্ত। মৃদুলের অবস্থা নাজেহাল। তাকে হাজার টেনেও পূর্ণার কবর থেকে সরানো যাচ্ছে না। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মৃদুলের মা জুলেখা বানু ছেলের পাগলামি দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মোড়ল বাড়ির অবস্থা করুণ! পদ্মজা ভাবনা ছেড়ে কাজে মন দিল। লতিফা কলসি নিয়ে দৌড়ে আসে। তারপর মেঝেতে কলসি রেখে বললো, 'লও পানি।'

পদ্মজা পূর্বের স্বরেই বললো, 'যা যা আনতে বলেছিলাম,আনা হয়েছে?'

'হ, আনছি।'

'রিনু ব্যাগ গুছিয়েছে?'

'হ, গুছাইছে।'

'রিনুকে ডাকো।'

লতিফা রান্নাঘর থেকে গলা উঁচু করে ডাকলো, 'রিনুরে...ওই রিনু।'রিনু আশেপাশেই ছিল। লতিফার ডাক শুনে দ্রুত হেঁটে আসে। সে গতকাল থেকে আতঙ্কে আছে। ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারেনি। রিনুর সামনের দাঁতগুলো উঁচু। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কিন্তু মনটা সাদা। সরল-সহজ একটা মেয়ে। রিনু এসে বললো, 'হ, আপা?'

পদ্মজা বললো, 'রাতে বের হয়ে যাবি লুতু বুবুর সাথে। পথে একদম ভয় পাবি না। আমি লুতু বুবুকে কিছু টাকা দিয়েছি আর একটা ঠিকানা দিয়েছি। আল্লাহ সহায় আছেন। বিসমিল্লাহ বলে বের হবি। পথে আল্লাহকে স্মরণ করবি বেশি বেশি। ইনশাআল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে না।'

রিনু বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। লতিফা পদ্মজাকে বললো, 'তোমারে ওরা কিচ্ছু যদি করে?' পদ্মজা উত্তর দিল না। লতিফা উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পর পদ্মজা বললো, 'আমার ঘর থেকে কাপড়ের ব্যাগটা নিয়ে পুকুরপাড়ের আশেপাশে কোথাও রেখে আসো। এখন আরেকটু পেঁয়াজ, রসুন বাটো।'

'রাইখা আইছি। সব কাম শেষ। গোয়ালঘরের পিছনে তিনডা কুত্তা বান্ধা আছে। চিল্লাইছে অনেকক্ষণ, খাওন দিছি এরপরে থামছে। আর ওইযে আলমারিডার পিছনে একটা বৈয়াম আছে। ওইডার ভিতরে রিনু বিষ পিঁপড়া ভরছে। এইডাও একটু পরে রাইখা আমুনে।'

'মরে যাবে না?'

'না। বৈয়ামের মুখ কাপড় দিয়া বাইন্ধা রাখছি। ভিত্রে(ভিতরে)মাডিও আছে।'বললো রিনু।

পদ্মজা,লতিফা ও রিনু তিনজনে মিলে রান্নাবান্না শেষ করলো। আমিনা সদর ঘরে আলোকে নিয়ে খেলছেন। তার জীবন আলোতে সীমাবদ্ধ। আর কিছুতে পরোয়া করেন না। আগে ঘরের ব্যাপারে হলেও কথা বলতেন। এখন তাও করেন না। সারাদিন আলোর সাথে কথা বলেন। মনের ব্যথা আলোকে শোনান। আলো কিছু বুঝে না। শুধু হাসে। আলোর হাসিটাই আমিনার সঙ্গী। রিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মিনিট দুয়েকের মাঝে দৌড়ে ফিরে আসে। পদ্মজাকে জানায়, 'রিদওয়ান ভাইজানে আইতাছে। লগে একটা ছেড়ি।'

পদ্মজার হাত থেমে যায়! তাহলে সেই নারী? যে পূর্ণাকে হত্যা করতে সাহায্য করেছে! রিনু এক হাত দিয়ে অন্য হাত চুলকাতে থাকলো। সে রিদওয়ানকে আগে ভয় পেত,এখন নাম শুনলেই কাঁপে। লতিফা রিনুর অস্বস্তি,ভয় খেয়াল করে বললো, 'রিনু ঘরে যা। দরজাডা লাগায়া দিবি।'

লতিফার বলতে দেরি হয়, রিনুর ঘরে চলে যেতে দেরি হয় না।

রিদওয়ান সদর ঘরে প্রবেশ করে আসমানিকে বললো, 'আমার লগে থাকবা না অন্য ঘর লইবা?'

রিদওয়ানকে দেখেই আমিনা আলোকে নিয়ে ঘরে চলে যান। আসমানি নিকাব তুলে চোখ বড় বড় করে বললো, 'বাড়ির ভিত্রে(ভিতরে) তোমার লগে থাকুম? আইছি যে এইডাই বেশি। এমনিতে ডর লাগতাছে আমার।'

'তখন রানি, কাকি এরা ছিল। এখন তো নাই। যারা আছে এরা থাকা আর না থাকা সমান।'

আসমানি চারপাশ দেখে বললো, 'পদ্মজা কই?'আসমানির চোখমুখ দেখে দাঁত কেলিয়ে হাসলো রিদওয়ান। বললো, 'বাবুর বউ পাগল হইছে। মাথা ঠিক নাই। ভয় পেও না।'

আসমানি চারপাশ দেখতে দেখতে বললো, 'মাথা ঠিক নাই দেইখাই তো ডর বেশি।'

রিদওয়ান আসমানির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'আজিদ ফিরবে কোনদিন?'

'মা রে লইয়া শহরে গেছে। আইতে চাইর-পাঁচদিন তো লাগবই।'

'তাহলে কয়দিন আমার সাথে থাকো।'

আসমানি রিদওয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। রান্নাঘর থেকে টুংটাং শব্দ আসছে। আসমানি বললো, 'পদ্মজা যদি জিগায়,আমি কার কী লাগি?'

'তোমাকে চিনে না? বাড়ির কাছে থাকো, আজিদের বউ হিসেবে দেখেনি কখনো?'

'না।'

'তাইলে কিছু বলার দরকার নাই। প্রশ্ন করলে উত্তর দিও না।'

'সন্দেহ করলে?'

'সন্দেহ করলেই কী? না করলেই কী? পদ্মজার দাম আছে আর?'

'আইচ্ছা ছাড়ো, আমি পদ্মজারে দেইখা আইতাছি।'

আসমানি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সে চোখ বুলিয়ে চারপাশ দেখছে। এই

বাড়িতে আসার অনেক ইচ্ছে ছিল তার। কখনো আসতে পারেনি। এই প্রথম আসতে পেরেছে। অন্যবার সোজা পাতালঘরে যেত। লুকোচুরি লুকোচুরি খেলাটা কমেছে বলে ভালো লাগছে। এখন হয়তো প্রতিনিয়ত অন্দরমহলে আসা হবে! লুকিয়ে ভাঙা ফটক দিয়ে পাতালঘরে যেতে হবে না।

আমির ধানের বস্তায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে। ঘরের অর্ধেক অংশ জুড়ে ধানের বস্তা রাখা হয়েছে। বস্তাগুলো বাঁশের মাচার উপর। মাটি স্যাঁতসেঁতে। এই ঘরটায় খুব দরকার ছাড়া কেউ আসে না। আবছা অন্ধকারে আমিরের মুখটা অস্পষ্ট। তার হাতে পদ্মজার বেনারসি। বুকটা ধড়ফড় ধড়ফড় করছে। আর মাত্র কয়টা ঘণ্টা! ইশ,যদি থেকে যাওয়া যেত! আফসোসে বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো পথ নেই। সব পথ বন্ধ। হয় আগুনে ঝলসে যেতে থাকো নয় মৃত্যু গ্রহণ করো। কী নিষ্ঠুর শর্ত! আমির পদ্মজার বেনারসির দিকে তাকালো। ধূলোর আস্তরণে বন্দী হয়ে গেছে সব স্বপ্ন-আশা! চোখে ছবির মতোন দৃশ্যমান হয়,পদ্মজার লাজুক মুখখানা। তার দুধে আলতা ছিমছিমে গড়নে খয়েরী রঙটা কী ভীষণ মানাতো! বর্ষাকালের শুক্রবার মানেই ছিল, বৃষ্টিতে ভেজা। আমির ঘন্টার পর ঘন্টা পদ্মজাকে একধ্যানে দেখেছে। মুখস্থ করে নিয়েছে তার প্রতিটি পশমের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। আমির কল্পনা থেকে বেরিয়ে বেনারসিতে চুমু দিল। সীমাহীন যন্ত্রণা থেকে বললো, 'যখন তোমার কথা ভাবি, তখন আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা বাজতে থাকে। আমাদের পথটা কি আরেকটু দীর্ঘ হতে পারতো না?'

আমির উত্তরের আশায় বেনারসির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ঠোঁট দুটো বাচ্চাদের মতো ভেঙে আসে। একটু কথা বলুক না...বেনারসিটি একটু কথা বলুক! আমির ভেজা গলায় আবার বললো, 'তোমার জন্য বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। তোমায় ছোঁয়ার সাধ্যি,দেখার সাধ্যি কেন নেই আমার?'

বেনারসি নিশ্চুপ! সে বোবা,প্রাণহীন। আমির চোখ বুজে বস্তায় হেলান দিল। গত কয়দিনে পদ্মজার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ কানে বাজছে। যখন পদ্মজার বলা, 'একবার...একবার নিজের মা-বোনকে মেয়েগুলোর জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবুন। একবার আমাকে মেয়েগুলোর জায়গায় ভেবে দেখুন।'কথাগুলো কানে বাজলো তখন চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পদ্মজার নগ্ন শরীর। তার সারা শরীরে ছোপ ছোপ দাগ। একটা ছায়া পদ্মজার শরীরে চাবুক মারছে। পদ্মজা আর্তনাদ করার শক্তিটুকু পাচ্ছে না। শুধু গলা কাটা গরুর মতো কাতরাচ্ছে।

আমির ছায়াটির গলা চেপে ধরার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু একি! ছায়াটিকে ছোঁয়া যাচ্ছে না! আমির দ্রুত চোখ খুলে ফেললো। তার মুখ থেকে অস্পষ্ট উচ্চারণ হয়,পদ্মজা! আমির চট করে উঠে দাঁড়ায়। বুকের ভেতর আগুন লেগে গেছে। ভেতরটা ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। শরীর দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে শার্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দূরে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। শরীরের শিরা-উপশিরায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। এই যন্ত্রণা আমির নিতে পারে না। সেই দুই হাতে নিজের চুল টেনে ধরলো। বিগত দিনগুলো তাকে নরকীয় শাস্তি দিয়েই চলেছে। চোখগুলো আজেবাজে দেখছে। মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন আজেবাজে ভাবছে। পদ্মজা,পদ্মজা,পদ্মজা...এই পদ্মজাতে কী শক্তি লুকিয়ে আছে? এই একটিমাত্র নাম তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। বিষাক্ত করে তুলেছে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস। আমির টিনের দেয়ালে এক হাত রেখে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

মজিদ ক্লান্ত হয়ে আলগ ঘরে বসলেন। এখানে প্রচুর আলো-বাতাস আসে। লতিফা মজিদকে আসতে দেখে,দ্রুত শরবত আর পান-সুপারি নিয়ে আসে। মজিদের সামনে এসে বসে রিদওয়ান ও খলিল। মজিদ শরবত পান করে লতিফাকে প্রশ্ন করলেন, 'পদ্মজা কথাবার্তা বলছে?'

লতিফা নতজানু অবস্থায় উত্তর দিল, 'হ,কইছে।'

রিদওয়ান লতিফাকে বললো, 'যে মেয়েটা আসছে দেখে রাখবি। যত্ন নিবি।'

লতিফা বাধ্যের মতো বললো, 'আইচ্ছা, ভাইজান।'

খলিল বললেন, 'আসিদপুর থাইকা যে বড় পাটিডা আনছিলাম, পুশকুনিপাড়ে ওইডা বিছাবি।'

'বিছাইছি খালু। এশারের আযানডার পরে সব খাওনদাওন দিয়া আমু।'

'ভালা করছস।'খলিল পান মুখ পুরে বললেন। লতিফা শরবতের খালি গ্লাস নিয়ে চলে গেল। মজিদ আরো দুই গ্লাস পানি পান করলেন। তিনি ভীষণ ক্লান্ত। সারাদিন দৌড়ের উপর ছিলেন। রিদওয়ানের ভুল আপাতত মগার উপর ঘুরে গিয়েছে। মগা গতকাল থেকে বাড়িতে নেই। আবার শেষবার মগার সাথে পূর্ণা ছিল। সবার জবানবন্দির ভিত্তিতে আপাতদৃষ্টিতে মগা খুনি! পুলিশ হাওলাদার বাড়ির দারোয়ানকে খুঁজেছে। মোড়ল বাড়িতে পুলিশ এসেছে শুনেই রিদওয়ান দারোয়ান মুত্তালিবকে হত্যা করেছিল। তাই পুলিশ মুত্তালিবকে পেল না। মজিদ হাওলাদার পুলিশকে বলেছেন,তিনি ধারণা করছেন দারোয়ান ও মগা পরিকল্পনা করে পূর্ণালে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে। পুলিশ এখন দারোয়ান মুত্তালিব ও মগাকে খুঁজছে। রিদওয়ান নিরাপদে আছে। খলিল মজিদকে বললেন, 'ভাইজান, কিছু ভাবছেন?'

'কী নিয়ে?'মজিদের নির্বিকার স্বর। রিদওয়ানের ভ্রূকুটি হয়ে গেল। সে চারপাশ দেখে বললো, 'আপনি এতো নির্বিকার কেন চাচা? আজ আমিরকে খুন করার কথা ছিল।'

মজিদ এক হাত তুলে রিদওয়ানকে চুপ করতে ইশারা করলেন। তারপর বললেন, 'বাবু যদি আমাদের কথা না শুনে তখন ব্যবস্থা নেব। তার আগে না।'

রিদওয়ানের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে নাছোড়বান্দা স্বরে বললো, 'আমির কখনোই পদ্মজাকে খুন করবে না, শেকল বন্দীও করবে না!'

মজিদ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দেখা যাবে।'

রিদওয়ান খলিলের দিকে তাকালো। তারপর অধৈর্য্য হয়ে মজিদকে বললো, 'আমিরের জন্য আমাদের ক্ষতি না হয়ে যায়!'

মজিদ খলিলকে বললেন, 'দেখ তো আশেপাশে কেউ আছে নাকি। ঘরগুলোও দেখবি।'

আমির মাত্র বের হতে যাচ্ছিল। মজিদের শেষ কথাটা কানে আসতেই সে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। খলিল আলগ ঘরের প্রথম দুটো ঘর দেখে এসে বললেন, 'কেউ নাই।'

তারপর চেয়ারে বসলেন। রিদওয়ান খলিলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে মজিদকে বুঝাতে। খলিল মজিদের আরেকটু কাছে এসে বসলেন। তারপর বললেন, 'রিদু কিন্তু হাচা কইতাছে ভাইজান। বাবুরে দিয়া আর ভরসা নাই।'

মজিদ রিদওয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই কী বোঝাতে চাচ্ছিস? বাবু আমাদের খুন করে পদ্মজাকে নিয়ে সংসার করতে চাইবে?'

রিদওয়ান তড়িৎ গতিতে বললো, 'এটা কি সম্ভব না কাকা? আলমগীর ভাই কী করলো?'

মজিদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে খলিলকে বললেন, 'খলিল, তোর ছেলের বুদ্ধি এখনো হাঁটুতে আছে।'

রিদওয়ান উঠে দাঁড়ায়। তার মাথা চড়ে যাচ্ছে। মজিদ বললেন, 'তুই আমার পাশে বস। তোর মাথায় কিছু কথা ঢোকাতে হবে।'

রিদওয়ান মনের বিরুদ্ধে আবার বসলো। মজিদ বললেন, 'চুপ করে আমার কথা শোন। আলমগীর আর বাবুর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পাতালঘরের রীতি পূর্বপুরুষ থেকে পেলেও, নারীপাচার চক্রটার সৃষ্টি বাবুর। এই চক্রে আলমগীর, তুই, আমি আর খলিল বাবুর দলের একটা অংশমাত্র। আমরা সরে গেলে আমাদের উপর রাগ একমাত্র বাবুই ঝাড়তে পারবে। কিন্তু এই চক্রের শুরুটা যে করেছে সে হচ্ছে নেতা। গত সপ্তাহে বাবু ঢাকা থেকে একটা খাম নিয়ে আসছে। খামের চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে,ছয় মাস পর বাবু নিজ

দায়িত্বে ষোলটা মেয়ে সিঙ্গাপুরে পাঠাবে। সার্নার জনের সাথে তিন মাস আগে থেকে চুক্তিবদ্ধ বাবু। বাবুর সাক্ষর আছে চিঠিতে। বাবু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' রিদওয়ান বললো, 'পড়ছি আমি। কিন্তু টাকা কী করছে? আমাদের তো দেয়নি।'

মজিদ বিরক্তিতে কপাল কুঁচকালেন। তিনি কথার মাঝে কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। বললেন'হয়তো কাজশেষে দিত। আমার পুরো কথা শোন। কথার মাঝে কথা বলবি না।'

রিদওয়ান মাথা নাড়াল। মজিদ বললেন, 'এখন বাবু যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করে এর পরিণতি কেমন হবে ধারণা আছে? বিদেশের কত মানুষের সাথে ও কাজ করছে হিসাব আছে? সবার বিরুদ্ধে ছোটখাটো প্রমাণ হলেও বাবুর কাছে আছে। আর এই দেশে কি একমাত্র বাবু মেয়ে পাচার করে? আরো আছে। কম হলেও আট-নয় জন দলনেতার সাথে বাবুর ভালো পরিচয় আছে। যেখানে এই দেশ পরিচালনা করা একজন নেতা এই চক্রের সাথে জড়িত আর বাবুর তার সাথে যোগসূত্র আছে, সেখানে বাবু পালিয়েছে যদি জানতে পারেন তিনি বাবুকে ছেড়ে দিবেন না। সব রকম ব্যবস্থা নিবেন। সম্মানহানির ভয় পাবেন,সব প্রকাশ হওয়ার ভয় পাবেন। বাবুর সাথে পদ্মজার ক্ষতি করবেন। পদ্মজা সুন্দর। বাবুর সামনে পদ্মজার বেইজ্জতি হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ আছে। আরো কত ক্ষমতাশীল লোক বাবুর সাথে এই কাজে জড়িত আছে। যতদিন বাবু এই কাজে নিজেকে রাখবে ততদিন ভালো থাকবে। ছাড়তে চাইলেই সর্বনাশ। বাবুর বুদ্ধি তোর মতো না রিদু। ও আর যাই করুক পালিয়ে যাওয়ার মতো বোকামি করবে না। এতোটা বোকা বাবু না। যদি সত্যি বাবু পদ্মজাকে ভালোবেসে থাকে ও ভুলেও পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে না। এই চক্রের সাথে জড়িত সবাই একজোট! বাবু পালানোর চেষ্টা করলে ও একা হয়ে যাবে। সবাই ঠিক ধরে ফেলবে বাবুকে। আর বাবু ধরা পড়লে পদ্মজাও ধরা পড়বে। পদ্মজা একবার ধরা পড়লে চোখের পলকে ভোগের বস্তু হয়ে যাবে।'

'পালিয়ে কোথাও না গিয়ে পুলিশকে সব খুলে বললেই তো ও নিরাপত্তা পেয়ে যাবে! আর ফেঁসে যাবো আমরা আর অন্যরা!'

মজিদ বোকা রিদওয়ানের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'পুলিশ কয়জনকে ধরবে? আমির নিজেও পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। ফাঁসিও হবে। নিজের মৃত্যু নিজে টেনে আনবে। তো কী হলো? কিছু কিছু কাজ আছে,যেগুলোতে একবার প্রবেশ করে ঘাঁটি সৃষ্টি করে ফেললে আর সেখান থেকে বের হওয়া যায় না। বাবু তেমনই চিপায় আছে। যদি পালাতে চায় নিজের সাথে পদ্মজার ইজ্জত আর জীবন হারাবে। এই ঝুঁকি নেয়ার সাহস বাবুর হবে না। আমি নিজের চোখে ঢাকায় দেখেছি, পদ্মজা অসুস্থ হয়ে ঘরে ঘুমাচ্ছে আর আমির বাড়ির সব কাজ করছে। পদ্মজার জন্য হলেও বাবু পাতালঘর আর আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখবে ।'

'দেশে কি জায়গার অভাব আছে? কোথাও না কোথাও ঠিক লুকিয়ে থাকতে পারবে।'

'ওর কাজ করতে হবে না? ঘরে বসে খাবে? তুই নিজ চোখে দেখেছিস, আমির কীভাবে মাত্র দশ দিনে আলীকে রাজশাহী থেকে ধরেছে। আলীর পালিয়ে যাওয়া আমিরের জন্য হুমকি ছিল। তাই চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঠিক খুঁজে বের করছে। আমিরের অভিজ্ঞতা আছে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে এতো বড় ঝুঁকি নিবে না। আমির চিনে তার পেশার রক্ত কেমন! এতদিন অন্য মেয়েদের পিটিয়েছে। তখন নিজের বউকে পিটাতে দেখবে।'

মজিদ থামলেন, দাঁত বের করে হাসলেন। এতো কথাতেও রিদওয়ানের মনে শান্তি এলো না। সে দুইহাত তুলে বললো, 'আচ্ছা ধরলাম,আমির পালাবে না। কিন্তু পদ্মজাকে বেইজ্জতি করার জন্য আমাদের খুন করবে না তার নিশ্চয়তা আছে?'

মজিদ হাওলাদার এবার রেগে গেলেন। বললেন, 'বাবুর যখন এই কাজের সাথে থাকতেই হবে তখন আমাদের খুন করে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে না। খলিল তোর ছেলেরে নিয়ে যা। তারপর গোয়ালঘর থেকে কতোটা গোবর খাইয়ে দে।'

অপমানে রিদওয়ানের মুখটা থমথমে হয়ে যায়। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকলো। আমিরের জায়গাটা সে কিছুতেই দখল করতে পারছে না!ব্যর্থ হচ্ছে বার বার। রিদওয়ান

চেয়ারে লাথি দিয়ে, চলে গেল। খলিল বললেন, 'ভাইজান, আসমানিরে আনা কি ঠিক কাম হইলো?'

'একদম না। রিদওয়ান আবার আরেকটা ভুল করলো। বাড়িতে কেউ নাই বলে, ঝুঁকি নিয়ে যা ইচ্ছে করছে। আবার বিপদে পড়লে আমার পা যেন না চাটে বলে দিস।'

খলিল মুখ থেকে পানের পিচকিরি ফেলে বাইরে চোখ নিবদ্ধ করলেন।

ক্রোধে-আক্রোশে আমিরের কপালের রগ ভেসে উঠে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করে। সে রাগে এক হাতে দরজা চেপে ধরলো। তার দূর্বলতা ধরতে পেরে মজিদের আনন্দ হচ্ছে! মজিদের হাসি দেখে আমিরের গা জ্বলে যাচ্ছে। সে একবার ভাবলো এক্ষুনি গিয়ে মজিদের গলা চেপে ধরবে। কিন্তু পরক্ষণে কী ভেবে থেমে গেল। চলে এলো ধান রাখার ঘরে। ধানের মাচার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো,চাপাতি আর রাম দা ঠিকঠাক আছে নাকি। হ্যাঁ,ঠিকঠাক আছে! আমির স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই বিকেলের রঙহীন ধূসর কুয়াশা চোখে পড়ে।

পদ্মজা পালঙ্কের উপর গাঁট হয়ে বসে আছে। এশারের নামায আদায় করে মাত্রই উঠেছে। তার পরনে সাদা শাড়ি৷ লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পদ্মজাকে জানালো,সে পুকুরপাড়ে খাবার রেখে এসেছে। বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে চারপাশ। মজিদ,খলিল,আমির,রিদওয়ান ও আসমানি এখুনি যাবে৷ পদ্মজা নিস্তেজ গলায় বললো, 'ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ডেকো।'

তার শান্ত স্বর ! কথা শুনে মনে হচ্ছে,পদ্মজা লতিফাকে ঘর ঝাড়ুর জন্য অথবা রান্না করার জন্য ডাকতে বলেছে! লতিফা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার বুকের ভেতর দামামা বাজছে। মনে হচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। এ তো সত্যিই যুদ্ধ! লতিফার ঘাম হচ্ছে।চাপা একটা আনন্দও কাজ করছে! কী অদ্ভুত!

রান্নাঘরে আসমানি গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পদ্মজাকে কথা বলাতে পারেনি৷ পদ্মজা একটাও জবাব দেয়নি। সে আসমানিকে পুরোদমে এড়িয়ে গিয়েছে। আসমানি নিরাশ হয়ে বেরিয়ে যায়৷ তারপর আর তাদের দেখা হয়নি। পদ্মজা বিছানা থেকে নেমে শক্ত করে হাত খোঁপা করলো। জানালা গলে চাঁদের আলো পদ্মজার পায়ের উপর পড়ে। নিখুঁত কালো রাতকে চাঁদ তার নরম আলোয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পদ্মজা চাঁদের আলোকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ছোঁয়া গেল ঠিকই অনুভব করা গেল না। পদ্মজার কানের পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বাতাস উড়ে যায়। সে বাতাসের শীতলতাকে আগুনের আঁচের মতো অনুভব করছে!

তারা পাঁচ জন গোল হয়ে বসেছে। খাবারের সুন্দর ঘ্রাণে চারপাশ মৌ মৌ করছে। রান্নার ঘ্রাণ শুনেই আমির বুঝে গেল,সব পদ্মজা রান্না করেছে! সে নিজেকে সামলাতে পারলো না। সবার আগে খাওয়া শুরু করলো। আগে তাদের হালকা-পাতলা আলোচনা করার কথা ছিল। তারপর খাওয়া দাওয়া করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা করবে। কিন্তু আমির নিয়ম ভঙ্গ করে শুরুতেই খাওয়া শুরু করে। অগত্যা বাকিরাও খাওয়া শুরু করলো। তাদের চেয়ে কয়েক হাত দূরে টলটলে জলের বিশাল পুকুর। জলের রঙ কালো। আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ আছে। একটা মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসছে৷ কালো জলের পুকুরটির পঁচিশটি সিঁড়ি। এই পুকুর নিয়ে অনেক গুজব রয়েছে। যদিও সব মিথ্যে৷ বাড়ির মেয়েরা এদিকটায় কখনো আসেনি। মজিদ হাওলাদারের ভীষণ প্রিয় এই জায়গাটা। তার দাদা এই জায়গাটাতে সবসময় ভোজ আসর করতেন। মজিদের ইচ্ছে ছিল চাঁদের রাতে পুকুরের পাশে বসে ভোজ আসর উপভোগ করার। কিন্তু সম্ভব হয়নি! মজিদ হাওলাদারের দাদা নিজের বউকে ভূতে ধরা পাগল প্রমাণ করার জন্য গুজব রটিয়ে দেন। সেই গুজব ধরে রাখতে মজিদ হাওলাদারও এদিকটায় আসেননি কখনো। আজ বাড়ি খালি হওয়াতে সেই সুযোগ মিলেছে৷ তিনি গতকালই দুজন লোক দিয়ে জায়গাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করেছেন। চোখ জুড়িয়ে দেয়ার মতো দৃশ্য হয়েছে!

একটু দূরেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা উড়ছে৷ মাথার উপর চাঁদের আলো। চারপাশে

চারটি হারিকেন। চমৎকার পরিবেশ। খলিল মুরগির রানে কামড় দিয়ে বললেন, 'বাবু, সারাদিন কই থাহছ?'

আমির ছোট করে উত্তর দিল, 'এখানেই।'

মজিদ আমিরকে আগাগোড়া পরখ করে নিয়ে বললেন, 'কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছিস?'

'না,আব্বা।'বললো আমির।

রিদওয়ান কিছু বলতে আগ্রহী নয়। সে চুপচাপ খাচ্ছে। তার চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ। আসমানি আমিরের পাশ ঘেঁষে বসলো। বললো, 'পরের কামে কয়দিনের সময় দিছে?'

'অনেকদিন।'

'এইবার ভৈরবে নিশানা রাইখো। ওইহানে সুযোগ সুবিধা আছে অনেক।'

মজিদ আসমানির সাথে তাল মেলালেন, 'আমিও ভৈরবের কথা বলতাম।

আমির রিদওয়ানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই কাজ রিদওয়ান নিক। আজিদ আর হাবুরে নিয়ে কয়দিনের জন্য ট্রলার নিয়ে ভৈরবে চলে যাবে।'

রিদওয়ান না চাইতেও সম্মতি জানালো। আমির আড়চোখে পিছনে তাকালো। তার চেয়ে পাঁচ হাত দূরে একটা রেইনট্রি গাছ। গাছটির পিছনে সে চাপাতি আর রাম দা রেখেছে। আরেকটু রাত বাড়লে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে যাবে,নেশা করবে তখন সে আক্রমণ করবে। দুই হাতে দুই অস্ত্র নিয়ে রিদওয়ান ও মজিদকে আঘাত করা তার লক্ষ্য। তারপর খলিল ও আসমানি বাঁ হাতের খেল! আমির চুপচাপ প্রহর গুণতে থাকে।

খাওয়া শেষে প্লেটগুলো দূরে রাখা হয়। প্লেটগুলো সরানোর জন্য মজিদ চারপাশে চোখ বুলিয়ে লতিফাকে খুঁজলেন। লতিফা আশেপাশে নেই।

অন্যবার তো থাকে। আজ কোথায়? মজিদ বিরক্ত হলেন। তিনি মনে মনে লতিফাকে একটা নোংরা গালি দিলেন। তারপর পরবর্তী ডিল নিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। কীভাবে এগোতে হবে কোন এলাকায় যেতে হবে,বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে স্বাভাবিক করা যায়। এসব নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। রিদওয়ান চোখমুখ কুঁচকে বসে আছে। মজিদ হাওলাদার আমিরকে কী প্রশ্ন করবেন বলেছিলেন। তাও করছে না। এই বুড়ো আবার গুটি পাল্টে দিয়েছে। আমির কথা কম বলছে। সে মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায়! কিন্তু তার সুযোগ আসার পূর্বেই সে এবং বাকিরা ঘুমের কাছে হেরে যায়। এতোই ঘুম পেয়েছিল যে,তাদের শরীর অন্দরমহলে যাওয়া অবধি ইচ্ছেশক্তি পায়নি।

লতিফা কিছুটা দূরে অন্ধকারে লেবু গাছের আড়ালে বসে ছিল। মশা কামড়ে তার হাত-পা বিষিয়ে দিয়েছে। যখনই দেখলো ভোজ আসরের পাঁচজনই ঘুমিয়ে পড়েছে,তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। সে ছুটে যায় অন্দরমহলে। পদ্মজা সদর ঘরে শান্ত হয়ে বসেছিল। লতিফা হাঁপাতে হাঁপাতে সব জানালো। তারপর তারা লুকিয়ে রাখা দঁড়ি আর ওড়না নিয়ে চলে আসে পুকুরপাড়ে। পদ্মজা, লতিফা ও রিনু মিলে ঠান্ডা মাথায় মজিদ,খলিল,আমির,রিদওয়ান এবং আসমানির হাত-পা ও মুখ বেঁধে ফেললো। তারপর এক এক করে টেনে নিয়ে গেল রেইনট্রি গাছের সামনে। পাঁচজনকে পাঁচটি গাছের সাথে বেঁধে তারা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

লতিফা,রিনু ঘেমে একাকার। রিনু তো ভয়ে তরতর করে কাঁপছে। এমন একটি দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করে সে হতভম্ব! পদ্মজা বললো, 'এবার তোমরা বেরিয়ে যাও।'

লতফা ও রিনু দুজনের গায়েই বোরকা ছিল। তারা ব্যাগ নেয়ার জন্য অন্দরমহলে দৌড়ে যায়। পদ্মজা বিদায় জানাতে অন্দরমহলে আসে। বের হওয়ার পূর্বে রিনু ও লতিফা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিল। লতিফা বিষণ্ণ গলায় বললো, 'আবার দেখা হইবো তো পদ্ম?'

'আল্লাহ চাইলে, আবার আমাদের দেখা হবে বুবু।'

'সামলাইতে পারবা সব?'

'পারবো। তুমি বেরিয়ে যাও। আর দেরি করো না।'

লতিফা এক হাতে ব্যাগ নিয়ে অন্য হাতে রিনুর হাত ধরলো। তারপর ছলছল চোখে পদ্মজাকে একবার দেখে বেরিয়ে পড়লো অচেনা গন্তব্যে। আমিনা সদর ঘর থেকে সবকিছু দেখেছেন। এতদিনের পুরনো কাজের মেয়ে চলে যাচ্ছে কেন? তিনি প্রবল আগ্রহ থেকে পদ্মজাকে প্রশ্ন করলেন, ‘লুতু কই যাইতাছে?’
পদ্মজা শান্ত স্বরে বললো, ‘শহরে যাচ্ছে।’

‘ওমা! কার কাছে?’

‘আপনি ঘরে যান। সকাল হওয়া অবধি বের হবেন না।’

আমিনা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, ’কেরে?’

পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো,বললো, ‘এতদিন যেরকম নির্জীব ছিলেন আজও থাকুন।’

পদ্মজা রান্নাঘর থেকে হাতে রাম দা তুলে নিল। তারপর আমিনাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করার আগে আমিনার উদ্দেশ্যে বললো, ’যদি কোনো শব্দ করেন আপনার মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।’

তারপর পদ্মজা রাম দা নিয়ে গোয়ালঘরে গেল। সেখান থেকে তিনটে নেড়ি কুকুর নিয়ে পুকুরপাড়ের পথ ধরলো।

নিশীথে পাঁচজন মানুষ বাঁধা অবস্থায় মাথা ঝুঁকে ঘুমাচ্ছে। আর সামনে রাম দা নিয়ে এক রূপসী বসে আছে। পাশে তিনটে কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটি ভয়ংকর। সুনসান নীরবতায় কেটে যায় ক্ষণ মুহূর্ত। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তারা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। মৃত্যু উপভোগ না করে অমানুষগুলো মরে যাক পদ্মজা চায় না। সে দুই জগ পানি পাঁচ জনের মাথার উপর ঢেলে দিল। তাতেও তাদের ঘুম ভাঙলো না। পদ্মজা রাম দার শেষ প্রান্ত দিয়ে পর পর পাঁচজনের পায়ের তালুতে আঘাত করলো। এতে কাজ হয়। তারা সক্রিয় হয়। পাঁচ জনই আধবোজা চোখে তাকায়। তাদের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি। মাথা ভারী হয়ে আছে। ভনভন করছে। পদ্মজা চৌকিখাটের উপর গিয়ে বসলো। রিদওয়ান পদ্মজাকে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে। সে চোখ বুজে আবার তাকালো। পদ্মজার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠে। তার হাতে রাম দা। জ্বলজ্বল করছে পদ্মজার পাশের তিনটে কুকুরের চোখ! রিদওয়ান চমকে গেল। মজিদ,খলিল এবং আসমানি যখন পরিস্থিতি বুঝতে পারলো তারাও চমকে যায়। তারা কথা বলতে গেলে’উউউ’আওয়াজ বের হয়। উঠতে গেলে টের পায় তাদের হাত-পা বাঁধা। ঘুম উবে যায়। মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। রিদওয়ান অবাক চোখে মজিদের দিকে তাকায়। মজিদও তাকালেন। তারা ছোটার জন্য ছটফট করলো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হচ্ছে না। আমির পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটি বার বার বুজে যাচ্ছে। তবে পরিস্থিতি ধরতে পেরেছে। সে সবসময় বলে,পদ্মজার নাকি নিজস্ব আলো আছে! এইযে এখন তার মনে হচ্ছে,অন্ধকারাচ্ছন্ন অতলে যখন সে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন পদ্মজা এসে আলোর মিছিলে ভরিয়ে দিয়েছে তার মনের উঠান!

(দুঃখিত পর্ব টা অনেক বড় হওয়ার জন্য একসাথে সবটুকু পোস্ট হচ্ছে না, এজন্য ৯০(২) করতে হয়েছে।)

পর্ব ৯০(২)

নিশীথে পাঁচজন মানুষ বাঁধা অবস্থায় মাথা ঝুঁকে ঘুমাচ্ছে। আর সামনে রাম দা নিয়ে এক রূপসী বসে আছে। পাশে তিনটে কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটি ভয়ংকর। সুনসান নীরবতায় কেটে যায় ক্ষণ মুহূর্ত। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তারা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। মৃত্যু উপভোগ না করে অমানুষগুলো মরে যাক পদ্মজা চায় না। সে দুই জগ পানি পাঁচ জনের মাথার উপর ঢেলে দিল। তাতেও তাদের ঘুম ভাঙলো না। পদ্মজা রাম দার শেষ প্রান্ত দিয়ে পর পর পাঁচজনের পায়ের তালুতে আঘাত করলো। এতে কাজ হয়। তারা সক্রিয় হয়। পাঁচ জনই আধবোজা চোখে তাকায়। তাদের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি। মাথা ভারী হয়ে আছে। ভনভন করছে। পদ্মজা চৌকিখাটের উপর গিয়ে বসলো। রিদওয়ান পদ্মজাকে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে। সে চোখ বুজে আবার তাকালো। পদ্মজার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠে। তার হাতে রাম দা। জ্বলজ্বল করছে পদ্মজার পাশের তিনটে কুকুরের চোখ! রিদওয়ান চমকে গেল। মজিদ,খলিল এবং আসমানি যখন পরিস্থিতি বুঝতে পারলো তারাও চমকে যায়। তারা কথা বলতে গেলে'উউউ'আওয়াজ বের হয়। উঠতে গেলে টের পায় তাদের হাত-পা বাঁধা। ঘুম উবে যায়। মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। রিদওয়ান অবাক চোখে মজিদের দিকে তাকায়। মজিদও তাকালেন। তারা ছোটার জন্য ছটফট করলো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হচ্ছে না। আমির পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটি বার বার বুজে যাচ্ছে। তবে পরিস্থিতি ধরতে পেরেছে। সে সবসময় বলে,পদ্মজার নাকি নিজস্ব আলো আছে! এইযে এখন তার মনে হচ্ছে,অন্ধকারাচ্ছন্ন অতলে যখন সে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন পদ্মজা এসে আলোর মিছিলে ভরিয়ে দিয়েছে তার মনের উঠান!

পদ্মজা পাঁচজনকে পরখ করে নিল। তাদের ছটফটানি আর ভয়ার্ত চোখ পদ্মজার দেখা সবচেয়ে সুন্দর ও তৃপ্তিকর দৃশ্য। আমিরের উপর চোখ পড়তেই আগে চোখে ভাসে আমিরের অযত্নে বেড়ে উঠা মাথার চুল। যা আমিরের কপাল ও চোখ ঢেকে রেখেছে৷ পদ্মজা উঠে দাঁড়ালো। রিদওয়ান ও মজিদের পাশে গিয়ে বসলো। দূরে সন্তানহারা পেঁচা ডাকছে চাপাস্বরে। আশেপাশে নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পদ্মজা তাদের উপর ঝুঁকলো। তারপর মৃদু হেসে চাপাস্বরে বললো, 'তবে হউক উৎসব।' পদ্মজার কন্ঠ ও হাসি তাদের হৃৎপিণ্ডে জোরেশোরে আঘাত হানে। আসমানি 'উউ' শব্দ করই চলেছে। সে ভীতগ্রস্ত। ভয়ে তার শরীরে ঘাম হচ্ছে। ভয় পাচ্ছে উপস্থিত চারজনই। পদ্মজা আনাড়ি নয়৷ সে এর আগে তিনটে খুন করেছে। শেষ খুনটা নিখুঁত ছিল! পদ্মজাকে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রিদওয়ান শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। পদ্মজা হিজল গাছটির দিকে এগিয়ে যায়। লতিফা হিজল গাছের পিছনে কাপড়ের ব্যাগটি রেখেছে। পদ্মজা কাপড়ের ব্যাগখানা নিয়ে আসে। ব্যাগ উল্টো করতেই বেরিয়ে আসে তিনটে বৈয়াম, চাপাতি,ছুরি,রাম দা ও তলোয়ার। অস্ত্রগুলো দেখেই বন্দীদের আত্মা কেঁপে উঠে। খলিল হাওলাদার ভয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে গোঙানো শুরু করলেন। পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। ছুরি নিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পদ্মজার হাতে ছুরি দেখে কুকুরগুলো পালাতে উদ্যত হয়। কিন্তু তারা সুপারি গাছের সাথে বাঁধা! তাই পালাতে পারলো না।

ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠলো।

পদ্মজা খলিলের উপর ঝুঁকে তার মাথার চুল শক্ত করে ধরে কিড়মিড় করে বললো, 'যে হাত দিয়ে

এতদিন হত্যা করে আসা হয়েছে আমি আজ সেই হাত কেটে ফেলবো।'

খলিল চোখ দুটি মারবেলের মতো বড় বড় হয়ে যায়। পদ্মজার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে পূর্ণার মৃত দেহের সোঁদা গন্ধ৷ ভেসে উঠে আঁচড় কাটা মায়াবী মুখটা। সে মনের ক্রোধ প্রকাশ করতে,খলিলের চুলে ধরে রেইনট্রি গাছের সাথে বার কয়েক আঘাত করলো। খলিলের মাথা ফুলে টিলার মতো উঁচু হয়ে যায়। যে চোখে এতদিন হিংস্রতা ছিল সেই চোখে ভয়ের ছাপ।

পদ্মজা ছুরি দিয়ে খলিলের হাত-পায়ের চামড়া ছিঁড়ে দিল। তারপর বৈয়াম থেকে মরিচ নিয়ে সেখানে আহত স্থানে মাখিয়ে দিল। খলিলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। তিনি কেঁদে কিছু বলছেন, কিন্তু'উউ'ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় তার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে হাত-পা।

খলিলকে ছেড়ে পদ্মজা সরু চোখে রিদওয়ানের দিকে তাকালো। কাছে কোথাও থেকে থেকে পেঁচা ডাকছে। জোনাকি পোকাদের দেখা যাচ্ছে না। কুকুর তিনটে পদ্মজার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।
খলিলকে আঘাত করার সময় পদ্মজার চোখেমুখে যে হিংস্রতা ফুটে উঠেছিল, সেই দৃশ্য দেখে তারা অবাক হয়েছে৷ পদ্মজাকে তাকাতে দেখে রিদওয়ান চট করে চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। খলিলের অবস্থা দেখার পর থেকে সে পদ্মজাকে ভয় পাচ্ছে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে ছোটার। রিদওয়ানের চোরা চাহনি দেখে পদ্মজা হয়তো হাসলো। মধ্যরাতের বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। পদ্মজা দ্বিতীয় বৈয়ামটি নিয়ে রিদওয়ানের দিকে এগিয়ে আসে। পদ্মজার একেকটা কদম রিদওয়ানের আত্মাকে কাঁপিয়ে তুলছে। পদ্মজা রিদওয়ানের পাশে বসলো। রিদওয়ান আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজা রিদওয়ানের মুখের সামনে মুখ নিয়ে দাঁত বের করে হাসলো। বললো, 'রাখে আল্লাহ মারে কে হা?'

রিদওয়ান একটু নড়াচড়া করে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। পদ্মজা এক থাবায় রিদওয়ানের মুখ থেকে ওড়নার বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রিদওয়ান মজিদের উদ্দেশ্যে বললো, 'আমি আগেই বলছিলাম এই মেয়ে আমাদের বিপদের কারণ হবে। শুনেননি।'

পদ্মজা খপ করে রিদওয়ানের তালুর চুল টেনে ধরলো। রিদওয়ান পদ্মজার মুখে থুথু ছুঁড়ে মারে। পদ্মজা তার মুখ দ্রুত সরিয়ে নেয়। রিদওয়ানের থুথু রিদওয়ানের মুখের উপরই পড়লো। রিদওয়ান কটমট করে তাকালো। বললো, 'বেজন্মা মাগী তোরে প্রথম দিনই মেরে ফেলা উচিত ছিল।'

পদ্মজা উঠে দাঁড়ায়। জোরে লাথি মারে রিদওয়ানের মুখে। লাথি খেয়ে রেইনট্রি গাছের সাথে আঘাত পায় রিদওয়ান। তার মাথা ভনভন করে উঠে। রিদওয়ান কিছু বুঝে উঠার আগে পদ্মজা তার প্যান্টের ভেতর বৈয়াম থেকে কিছু ঢেলে দিল। সেকেন্ড কয়েক পার হতেই বিশেষস্থানে জ্বালাপোড়া অনুভুব করে। একসাথে অনেকগুলো জীবের কামড়ে তার মুখ নীল হয়ে যায়। সে চমকে তাকায় পদ্মজার দিকে। প্রশ্ন করে, 'কী দিছস? খানকির ঝি প্যান্টের ভেতর কী দিছস তুই?'

পদ্মজা উত্তর দিল না। রিদওয়ান চিৎকার করতে থাকে। পদ্মজা রয়ে সয়ে রিদওয়ানের চিৎকার করার দৃশ্য দেখতে দেখতে কুকুরগুলোকে মুক্ত করে দেয়। কুকুর তিনটে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে পিছিয়ে যায়। পদ্মজা তৃতীয় বৈয়াম নিয়ে মজিদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। বৈয়াম থেকে দুই টুকরো কাঁচা মাংস বের করলো। ছাগল জবাই করেছিল আজ। সে দেখেশুনে হাড্ডিসহ কয়েক টুকরো মাংস রেখে দিয়েছিল। মাংস দেখে কুকুরগুলোর চোখ চকচক করে উঠলো। পদ্মজা এক টুকরো মাংস নিয়ে মজিদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মজিদের মুখের উপর মাংসের টুকরোটি ধরলো। তিনটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে মজিদের উপর। কুকুরগুলো লাফ দিতেই পদ্মজা মাংসের টুকরোটা মজিদের উরুর উপর ছেড়ে দেয়।

কুকুরগুলোকে নিজের দিকে তেড়ে আসতে দেখে মজিদ নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যান। চোখের পলকে মজিদের হাত-পা ও মুখের চামড়া ছিঁড়ে যায়। বেরিয়ে আসে রক্ত। এক টুকরো মাংস নিয়ে তিন কুকুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। তাদের বিষদাঁতের কামড় পড়ে মজিদের গোপনাঙ্গে! তিনি গোঙাতে গোঙাতে চোখের ইশারায় পদ্মজাকে আকুতি করেন এসব যেন থামানো হয়। অন্যদিকে রিদওয়ান ছোটার জন্য ছটফট করছে। পদ্মজাকে বিশ্রী গালিগালাজ করে হুমকিও দিয়েছে। যখন পিপড়ার কামড়ে সর্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠে তখন সে

পদ্মজাকে অনুরোধ করে তাকে বাঁচাতে। কখনো পদ্মজাকে দেবী বলে আবার কখনো মা বলে ডাকলো। ওয়াদা করলো,সে আর কখনো অন্যায় করবে না। পদ্মজা উত্তরে কিছুই বলেনি। সে নির্বিকার। রিদওয়ান ও কুকুরের চিৎকার শুনে মাথার উপর এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। আবার ডানা ঝাপটিয়ে ফিরে এলো। পাখিদের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। তাদের অস্থিরতায় দানবের মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর কচি ডালপালা ও পাতা বার বার নড়েচড়ে উঠছে। পদ্মজা এবার বৈয়াম নিয়ে খলিলের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। পূর্বের মাংসটি নিয়ে একটি কুকুর দৌড়ে দূরে চলে যায়। তার পিছনে পিছনে বাকি দুটি কুকুরও গেল।

পদ্মজা আরেক টুকরো মাংস খলিলের মুখের উপর ধরলো। তারপর কুকুর তিনটের আকর্ষণ পেতে মুখ দিয়ে শব্দ করলো, 'হুশশ!'

খলিল হাওলাদার কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে প্রস্রাব করে দিলেন। পদ্মজার ডাকে তিনটে নেড়ি কুকুর সাড়া দিল। তারা ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে আসে। খলিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পদ্মজা আগের মতোই হাতের মাংস খলিলের উরুর উপর ছেড়ে দিল।

তারপর আরেক টুকরো মাংস নিয়ে আসমানির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বৈয়াম রাখলো মাটিতে। একটা কুকুর পদ্মজার পিছনে এসে দাঁড়ায়। ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে,তাকে মাংস দিতে। পদ্মজার এক হাতে ছুঁরি বলে ভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস কেড়ে নেয়ার সাহস পাচ্ছে না। আসমানি পদ্মজাকে তার সামনে দাঁড়াতে দেখে গোপনে ঢোক গিলল। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে কিছু একটা বলতে চাইছে। চোখের জলে যেন এক্ষুনি বন্যা বয়ে যাবে! মেয়েরা ভালো হউক,খারাপ হউক, বুড়ো হউক আর যুবতী হউক তারা ভীষণ কাঁদতে পারে! পদ্মজা আসমানির মুখ মুক্ত করে দিল। আসমানি কাঁদো কাঁদো স্বরে অনুরোধ করলো, 'আল্লাহর দোহাই লাগে ভাবি,আমারে ছাইড়া দেন। আমি আপনার গোলামি করাম সারাজীবন।'

পদ্মজা আসমানির সামনে বসলো। আসমানির উপর ঝুঁকে তার গাল আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে আদুরে স্বরে বললো, 'তুমি ভীষণ সুন্দর।'

পদ্মজার ঠান্ডা স্পর্শ আসমানির যকৃত ছুঁয়ে ফেললো। সে কেঁপে উঠে। চোখেমুখে অসহায়ত্ব ফুটিয়ে পদ্মজার চোখের দিকে তাকায়। পদ্মজা হাসলো। আসমানির চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে বললো, 'আমি পুরুষ না যে আমাকে আকৃষ্ট করবে। আমার বোনের মৃত্যুকষ্ট তোমাকেও অনুভব করতে হবে।'

পদ্মজা হাতের মাংসের টুকরোটি মজিদের উপর ছুঁড়ে মারলো। তাৎক্ষণিক কুকুর তিনটে মজিদের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পদ্মজা আসমানির পায়ের দঁড়ি খুলে সেই দঁড়ি দিয়ে আসমানির গলা পেঁচিয়ে ধরে৷ আসমানির চোখ উল্টে যায়। পদ্মজার চোখেমুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সে শান্ত,স্বাভাবিক। যখন আসমানি নিস্তেজ হওয়ার পথে পদ্মজা দঁড়ি ছেড়ে দিল৷ আসমানি কাশতে কাশতে নতজানু হয়। পদ্মজা আবার পেঁচিয়ে ধরলো। আসমানি দুই পা দাপিয়ে দম নেয়ার চেষ্টা করে। তার শাড়ি হাঁটু অবধি চলে এসেছে। যতক্ষণ না আসমানির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় পদ্মজা শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে টেনে ধরে রাখে দঁড়ি। ক্ষণমুহূর্ত যুদ্ধে আসমানি নিস্তেজ হয়ে যায়। পদ্মজা দঁড়ি ছেড়ে দিল। আসমানির জিহবা মুখের ভেতর নেই। বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটি উল্টে রয়েছে। সারামুখ কালচে ভাব। পদ্মজা তার দুই হাত ঝেড়ে আসমানির মৃত লাশ থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়।

পিঁপড়ার কামড়ে রিদওয়ানের কোমর থেকে পায়ের তালু অবধি অবশ হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ! শরীর ব্যথায় টনটন করছে। তার স্পর্শকাতর স্থান গুরুতর আহত। পদ্মজা ছুরি নিয়ে রিদওয়ানের সামনে এসে দাঁড়ায়। রিদওয়ানের উরুতে ছুরি প্রবেশ করে আবার বের করে আনে। রিদওয়ান চিৎকার করে উঠলো। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলো, 'আর না। আর না...'

পদ্মজা শূন্যে ছুরি ছুঁড়ে মেরে কৌশল করে ধরলো। তারপর ছুরি দিয়ে রিদওয়ানের শরীরে অগণিত আঘাত করতে থাকে। তারপর এক চোখ তুলে নিল। রিদওয়ান জোরে আর্তনাদ করে উঠে। আকুতি করে তাকে মৃত্যু দিতে নয়তো বাঁচতে দিতে। পদ্মজা দাঁতে দাঁত চেপে রিদওয়ানের দুই গাল চিপা দিয়ে ধরলো। ফিসফিস আওয়াজের মতো করে বললো, 'এই...এই চোখগুলো আর কোনোদিন কোনো মেয়েকে দেখবে না।কোনোদিন না।'

রিদওয়ানের এক চোখ থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। কুকুরগুলো আরো মাংসের জন্য বিরতিহীনভাবে চিৎকার করে যাচ্ছে। পদ্মজা তার কথা শেষ করে রিদওয়ানের আরেকটা চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। তারপরই মুখের উপর ছুরি দিয়ে তেরছাভাবে টান মারলো। রিদওয়ানের নাক ছিঁড়ে উপরের ঠোঁট দুই ভাগ হয়ে যায়। চিৎকার করার শক্তিটুকুও আর সে পেল না। তার পূর্বেই বেহুশ হয়ে যায়। পদ্মজা ক্রোধে মৃদু কাঁপছে। তার সাদা শাড়ি ইতিমধ্যে রাঙা হয়ে গেছে। সে রাম দা নিয়ে নিঃশ্বাসের গতিতে যেভাবে পারে রিদওয়ানকে কোপাতে থাকলো। তার মুখ দিয়ে ক্রোধ স্বর বের হচ্ছে। রিদওয়ান শরীরের মাংস ছিটকে পড়ে এদিকসেদিক। লুকিয়ে দেখা নিশাচরেরা একস্বরে ডেকে উঠে। তারা পদ্মজাকে তার কাজে সাহস যোগাতে কিছু বলছে? নাকি ভয় পেয়ে ডাকছে? কে জানে!

প্রায় মিনিট দশেক পর পদ্মজা স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তার মুখ রক্তে অস্পষ্ট। চোখ দুটি ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। শাড়ি তাজা রক্তে জবজবে! সামনের চুলগুলো রক্তে আঠালো হয়ে গেছে। তার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। বাতাস পদ্মজার সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য ধেয়ে আসে। পদ্মজা রাম দা থেকে রক্ত পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে। সে রাম দা রেখে সদ্য কেনা চাপাতি তুলে নেয় হাতে। ঘুরে এসে মজিদের সামনে দাঁড়ায়। কুকুরের আঁচড় আর কামড়ে মজিদের প্রাণ নেতিয়ে পড়েছে! পদ্মজা মজিদের মুখের বাঁধন খুলে দেয় মজিদের শেষ আর্তনাদ শোনার জন্য। মজিদ অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'মা,মা...আমায়...'

মজিদ কথা শেষ করতে পারলেন না। পদ্মজা চিৎকার করে হাত ঘুরিয়ে এক আঘাতে মজিদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়ে। বুরবুর শব্দ তুলে পেটের নাড়িভুড়ি ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। পদ্মজা এক মুহূর্তও থামলো না। হিংস্র তাণ্ডব চালিয়ে গেল। তার রক্তের তৃষ্ণা মিটেনি! সে খলিলের মুখের বাঁধন খুলে দিল। পদ্মজাকে রক্তমানবী মনে হচ্ছে। তার শরীরে প্রতিটি লোমকূপ রক্তে স্নান করেছে। খলিল হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, 'ও মা, ও মা আমারে ছাইড়া দেও। আমি তোমার বাপের মতো। ও মা আমারে ছাইড়া দেও....'

পদ্মজা দাঁত বের করে হাসলো। তার দাঁতেও রক্ত লেগে আছে! ভয়ানক দেখাচ্ছে! কোথায় গেল তার ভুবনমোহিনী রূপ? রক্তের সাগরে ডুব দিয়েছে সে। পদ্মজা চাপাতি দুই হাতে ধরে হাত ঘুরিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো খলিলকে আঘাত করতে থাকে। এক আঘাতেই খলিলের আত্মা দেহ ছেড়ে দেয়। কিন্তু পদ্মজা থামলো না। সে ক্রোধ স্বর মুখে রেখে খলিলকে ইচ্ছেমতো কোপাতে থাকলো। ক্যাচক্যাচ শব্দে চারপাশ কেঁপে কেঁপে উঠে। আঘাতে আঘাতে খলিলের এহ হাত,কান, নাক শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। পদ্মজা ক্লান্ত হয়ে চাপাতি খলিলের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। বাম হাতে কোমর থেকে আরেকটা ছুরি নিয়ে খলিলের পেটে ঢুকিয়ে দিল। রিদওয়ান, মজিদ আর খলিলের রক্ত মাটি বেয়ে পুকুরের কালো জলের দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা মাটিতে বসে পড়ে। নেড়ি কুকুরগুলো ভয় পেয়ে দূরে চলে গিয়েছে। দূর থেকে তারা পদ্মজাকে দেখছে।

হিংস্র ঝড়ের তান্ডব থামতেই চারিদিকে নিস্তব্ধতা ভর করে। পদ্মজা ভীষণ ক্লান্ত। সে দুই চোখ বুজে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। তারপর মাথা তুলে আমিরের দিকে তাকালো। আমির এতক্ষণ পদ্মজার দিকে তাকিয়ে ছিল। পদ্মজাকে তার দিকে তাকাতে দেখে সে চোখ সরিয়ে নিল। আমিরের চোখের উপর পড়ে থাকা চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। সে শান্ত হয়ে বসে আছে। কোনো ছটফটানি নেই,অস্থিরতা নেই,ভয় নেই। সে নির্লিপ্ত। পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে ডান

পাশে তাকালো। আমিরের দেয়া নতুন তলোয়ারটি ঘাসের উপর পড়ে আছে। পদ্মজা মাটিতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তিন কদম এগিয়ে তলোয়ারটি হাতে তুলে নিল। তারপর ফিরে তাকালো আমিরের দিকে। সেদিনের কথা,যেদিন আমির নিজে এই তলোয়ার পদ্মজার হাতে তুলে দিয়েছিল,জীবন নেয়ার অনুমতি দিয়েছিল! এ কথা শুনে পদ্মজার সেকি কান্না! কিন্তু আজ পদ্মজা শুধুই পদ্মজা,প্রিয় স্বামীর পদ্মবতী নয়! পদ্মজা শক্ত করে তলোয়ার ধরে সামনে এগিয়ে যায়। সে যত এগুচ্ছে অনুভব করছে বুকের ভেতরের শক্ত আবরণটা সরে যাচ্ছে। একটা নরম কোমল অনুভূতি জেঁকে বসছে!

পদ্মজা আমিরের সামনে এসে দাঁড়াতেই আমির চোখ তুলে তাকালো। এইযে রাতের বাতাসে পদ্মজার এক দুটো চুল উড়ছে। তাতেও ভালো লাগছে। রক্তের মাখামাখিও পদ্মজার রূপের বাহার নষ্ট করতে পারেনি। অন্তত আমিরের কাছে!

নির্জন,নিরিবিলি পরিবেশে আমিরকে এমন অবস্থায় এতো কাছে দেখে পদ্মজার চোখগুলো শীতল হয়ে উঠে। তার মনে হচ্ছে, আমিরের চোখ,পা,হাত,বুক,বাহু সব কথা বলছে! সেদিনই তো তাদের বিয়ে হলো। আমির তার শক্তপোক্ত দুটি হাত দিয়ে পদ্মজাকে কোলে নিয়ে ঘরে তুলে। উপহার দেয় নতুন সংসার,নতুন পৃথিবী! সে আমিরের সংস্পর্শে এসে আবিষ্কার করে নতুন এক সত্ত্বা। পুরনো কথা ভেবে পদ্মজার কণ্ঠনালিতে একটা যন্ত্রণা ঠেকছে। তার কণ্ঠনালী ব্যথা করছে! সে মাটিতে তলোয়ার রেখে রেইনট্রি গাছের দঁড়ি থেকে আমিরকে মুক্ত করে দেয়। এখন শুধু আমিরের হাত-পা আর মুখ বাঁধা। পদ্মজা আমিরের সামনে বসলো। আমিরের নতজানু মুখটা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলো । তারপর আমিরের বুকে সাবধানে এক হাত রাখলো। পদ্মজার একটুখানি ছোঁয়া আমিরের সত্ত্বাকে কাঁপিয়ে তুলে। যেন সমুদ্রের ঢেউ গর্জে উঠে। আকাশ ভেঙে বজ্রপাত পড়ে!

কুকুরগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। পদ্মজার ছলছল চোখ দুটি স্পষ্ট! আমিরের মনে হচ্ছে, আকাশের চাঁদটা ঠিক পদ্মজার মাথার উপরেই। সে সকল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পদ্মজাকে কোমল চোখে তাকাতে দেখে তার বুকটা হুহু করে কেঁদে উঠলো। চোখের চাহনীতে মনের সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছে পদ্মজা। বুঝা যাচ্ছে সে আমিরের প্রেমে কতোটা মাতোয়ারা! আমির আশা করেনি,এই মুহূর্তে এতোকিছুর পর পদ্মজার চোখে পুরনো প্রেম দেখতে পাবে! বুকটা আর কত পুড়বে? যখন একসাথে থাকা সম্ভবই নয়।

আমিরের চুপ থাকা,আমিরের নির্লিপ্ততা বলে দিচ্ছে সে পদ্মজার কোনো আঘাতকেই পরোয়া করে না। আমিরের মায়া মায়া চোখ দুটি গ্রাস করে ফেলে পদ্মজাকে। কেনো জানি তার খুব কান্না পাচ্ছে! বুকের ভিতরে কোথায় যেনো লুকানো জায়গা থেকে একদল অভিমান প্রচণ্ড কান্না হয়ে দু'চোখ ফেটে বেরুতে চাইছে। পদ্মজা ধীর কণ্ঠে বললো, 'কেন আমায় ভালোবাসলেন না?'

তার কণ্ঠে কান্না! আমিরের এক চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। সে কোন শাব্দিক উচ্চারণে বোঝাবে,পদ্মজাকে ঠিক কতোটা ভালোবাসে? কী করে বলবে? সে পদ্মজার জন্য বিষের দাঁনা!

ভালোবাসা এক ভয়ংকর মহামারির নাম। যে মহামারির একমাত্র পথ,বিপরীত মানুষটিকে ছাড়া নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে কত মানুষ বৈরাগী হয়েছে! আর আমির বেছে নিয়েছে মৃত্যু! পদ্মজা হুট করে আমিরের কপালে চুমু খেল। আমিরের হৃৎপিণ্ড জ্বলে উঠে! তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পদ্মজার দুই চোখের জল আটকাতে পারলো না। সে বললো, 'আপনার দুটি সত্ত্বার একটি আমার স্বামী। আমি তাকে সম্মান করি। কিন্তু অন্য সত্ত্বার জন্য আপনাকে মরতে হবে।'

পদ্মজা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কান্না আটকাচ্ছে। আমির নিজেকে সামলে চোখের দৃষ্টি নত করলো। পদ্মজা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে,বুকটা জ্বলে যাচ্ছে কেন? একটু আগের তেজটা কেন নেই বুকের ভেতর? আমিরের ভালোবাসার অভাব তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ছয়টা বছর

মানুষটা এতো কেন ভালোবাসলো? এত নিখুঁত ভালোবাসার অভিনয় হতে পারে? কাঙাল সে,তার স্বামীর ভালোবাসার কাঙাল। কিন্তু সেই ভালোবাসাই প্রতারণা করলো। এই ভালোবাসা ভাগ হয়েছে আরো আগে। কষ্টগুলো বাতাসে উড়ে যায় না কেন?

পদ্মজা খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো। তলোয়ারখানা দেখে পদ্মজার বুকের ভেতরে দ্রিমদ্রিম করে কিছু বাজতে থাকে। কেঁপে উঠে তার হাত। পদ্মজা ঢোক গিলে নিজেকে ধাতস্থ করলো। তারপর কাঁপা হাতে আমিরের মুখ থেকে ওড়নার বাঁধন খুলে দিল। আমিরের আর্তনাদ শোনার জন্য নয়! সে চায়,আমির তাকে কিছু বলুক। কিন্তু কী শুনতে চায় সে জানে না। আমিরের বেলা সে কঠোর হওয়া তো দূরে থাক,তলোয়ার চালানোর সাহস পাচ্ছে না। আমির মাথা নত করে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য। মৃত্যু তার জন্য উপহার! পদ্মজা আঘাত করতে সময় নিচ্ছে। আমিরের নিশ্চুপতা তার মনের ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। সে বেহায়া হয়ে কাঠ কাঠ কণ্ঠে বললো, 'কিছু বলার আছে?'

আমির তাকালো। এইতো...এই দৃষ্টি পদ্মজাকে খুন করে ফেলে! তীরের বেগে বুকের ভেতর ছিদ্র করে ফেলে! এই পৃথিবীতে নাকি শ্যামবর্ণ অবহেলিত! অথচ ভুবনমোহিনী রূপসী পদ্মজা শ্যামবর্ণ এক পুরুষকে ভালোবেসে থমকে গিয়েছে! আমির বললো, 'গত চারদিনের যন্ত্রণার একাংশ যদি তুমি অনুভব করতে আমাকে খুন না করে বাঁচিয়ে রাখতে। আমার শাস্তি হতো আমার বেঁচে থাকা!'
আমির কথা শেষ করে চোখের পলক ফেলার পূর্বে পদ্মজা তার বুকের মধ্যিখানে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল। তলোয়ার বুক ভেদ করে পিঠে গিয়ে ঠেকে!

আচমকা আক্রমণ করায় আমির অবাক হলো। তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। বুকের যন্ত্রণারা শেষবারের মতো দুই চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমিরের মুখ থেকে এতো রক্ত বের হতে দেখে পদ্মজার পায়ের তলা কেঁপে উঠে। সে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার টেনে বের করলো। আমিরের দেহটা দপ করে শব্দ তুলে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। পদ্মজা বুক ছ্যাঁৎ করে উঠে। বুকের ভেতর পাহাড় ধ্বসে পড়ে। সে দ্রুত আমিরের দুই হাতের বাঁধন খুলে দেয়। বুকের ভেতর থেকে শব্দ তুলে কান্নারা বেরিয়ে আসে। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'যাবেন না...যাবেন না।'

আমিরের শরীর দুই-তিনটে ঝাঁকি দিয়ে নিথর হয়ে যায়। পদ্মজা মাথায় এক হাত দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো এদিকসেদিক তাকায়। তার শরীরটা কেমন যেন করছে। চোখের সামনে তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রেমের রাজপ্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শব্দের আঘাতে তার মগজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পদ্মজা আর্তনাদ করে উঠে। দুই হাতে মাটি চাপড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, 'আল্লাহ...আল্লাহ।'

তার চিৎকার শুনে সন্তানহারা পেঁচাটির কান্না থেমে যায়।'আল্লাহ'উচ্চারণটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে যেন বার বার। এই একটি ডাকে পদ্মজার সর্বহারার বেদনা ফুটে উঠে। সে আপন মানুষদের মৃত্যু দেখতে দেখতে ক্লান্ত। তার যন্ত্রণার পাহাড় ভেঙে গেছে। পদ্মজা বাচ্চাদের মতো হাঁটুতে ভর দিয়ে একবার ডানে যায় আরেকবার বামে যায়। তারপর আমিরের মাথার কাছে এসে বসে। আমিরের চোখ দুটো খোলা। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে! চোখ জোড়ার কি পদ্মজাকে দেখার তৃষ্ণা মেটেনি?

"তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আমার কখনোই মিটবে না, পদ্মবতী।" পদ্মজা চমকে পিছনে তাকায়। কেউ নেই। ডান পাশ থেকে আবার শুনতে পায় একই কথা। পদ্মজা ডান পাশে তাকায়। তারপর শুনতে পায় বাম পাশ থেকে। পদ্মজা চরকির মতো ঘুরতে থাকে। সে বাস্তব দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক আগে। আমিরের বলা পুরনো কথাগুলো সে শুনছে। প্রতিটি কথা তাকে সূচের মতো খোঁচাচ্ছে। পদ্মজা এতো ব্যথা সহ্য করতে না পেরে দুই হাতে খামচে ঘাস টেনে তুললো। তারপর এক হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে চিৎকার করে কাঁদলো।

কাঁদতে কাঁদতে তার গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। সে শরীরের ভার ছেড়ে দেয়। সেজদার

মতো উঁবু হয়। তারপর মাথা তুলে এক হাতে আমিরের চোখ দুটি বন্ধ করে দিল। চোখের জল মুছে চারপাশে চোখ বুলাল। তার চোখের দৃষ্টি অস্থির৷ নিঃশ্বাস এলোমেলো। এই বিশাল পৃথিবীতে এখন সে একা!
আচমকা সে উঠে দাঁড়ায়। যেখানে ভোজ আসর হয়েছিল সেখানে ছুটে যায়। আমিরের প্লেট আলাদা। তার প্লেটে দুটো পদ্মফুল আঁকানো। পদ্মজা খুঁজে খুঁজে আমিরের প্লেটটা বের করলো। সেখানে কিছু খাবার অবশিষ্ট ছিল। পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমিরের মৃত দেহ দেখলো। তারপর দ্রুত অবশিষ্ট খাবারটুকু খেল। খাবার শেষ হতেই পানি না খেয়েই দৌড়ে আমিরের কাছে আসে। একটা তীক্ষ্ণ ঠান্ডা স্রোত বুকের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। চাঁদটা অর্ধেক ডুবে গিয়েছে। তবে তার আলো এখনো রয়ে গেছে৷ পদ্মজা আমিরকে টেনে সোজা করলো৷

আমিরের শার্টের বুক পকেট থেকে একটি বিষের শিশি বেরিয়ে আসে। পদ্মজা শিশিখানা হাতে নিয়ে অবাক চোখে আমিরের ফ্যাকাসে মুখটা দেখে। সে কিছু একটা বলে কিন্তু কথাটি ফুটল না। তার কথা হারিয়ে গেছে! তারপর ভাবলো, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে৷ কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়লো, আত্মহত্যা মহাপাপ! পদ্মজা বিষের শিশি ছুঁড়ে ফেলে পুকুরে।

আমিরের মাথাটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ গুনগুন করে কাঁদলো পদ্মজা। বাতাসের বেগ বেড়েছে। রক্ত শুকোনোর পথে। ঠান্ডা কাঁটার মতো বিঁধছে শরীরে। পদ্মজার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সে রক্তাক্ত আমিরকে টেনে মাঝে নিয়ে এসে সুন্দর করে শুইয়ে দিল। তারপর আমিরের নিথর দেহটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর শুয়ে পড়লো। মিনিট দুয়েক পর ঘুম ঘুম চোখে মাথা উঁচু করে আমিরের দুই গালে সময় নিয়ে দুটো চুমু দিল পদ্মজা। একটা কুকুর পদ্মজাকে ঘিরে হাঁটছে। আর বাকি দুটো কুকুর মজিদ,খলিল,রিদওয়ান ও আসমানির লাশ শুঁকছে। ক্লান্ত পদ্মজা আমিরের বুকে শুয়ে শান্ত হলো। চোখ বুজলো। যে পৃথিবীর লীলাখেলায় সে বাধ্য হয়েছে স্বামীর বুকে অস্ত্র চালাতে সেই পৃথিবীর উদেশ্যে মনের খাতায় চিঠি লিখলো-

"ক্ষমা করো পৃথিবী। তাকে আমি ঘৃণা করতে পারিনি। তাকে আমি নিষ্ঠুর মৃত্যু দিতে পারিনি। যার হাতের পাঁচটি আঙুল আমার নির্ভরতা, যার বুকের পাঁজরে লেগে থাকা ঘামের গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়, যার উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁয়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস, যার এলোমেলো চুলে আমি হারিয়ে যাই বারংবার, যার ভালোবাসার আহবানে সবকিছু তুচ্ছ করে ছুটে যাই, যার মিষ্টি সোহাগে অন্য জগতে হারিয়ে যাই, তার কষ্ট আমি কী করে সহ্য করি? লোকে বলে, স্বামীর বাঁ পাঁজরের হাড়ে স্ত্রী তৈরি। তাহলে যার পাঁজরে আমার সৃষ্টি তার আর্তনাদ কী করে শুনি? এই কঠিন কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ও পৃথিবী সবাইকে বলে দিও,আমার কবরটা যেন আমার স্বামীর কবরের ঠিক বাঁ পাশেই হয়! আমি তাকে ভালোবাসি। যেমন সত্য চন্দ্র-সূর্য তেমন সত্য আমি তাকে ভালোবাসি!

শেষ রাত্রি। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে রক্ত,একটি জিহবা বের করা নারী দেহ,তিনটি ক্ষত-বিক্ষত পুরুষ দেহ ও একটা মাথা। মাঝখানে শুয়ে আছে আমির হাওলাদার। তার বুকের উপর শুয়ে আছে তারই অর্ধাঙ্গিনী তারই খুনি উম্মে পদ্মজা! খাবারে ঘুমের ঔষধ ছিল বলে, পদ্মজা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনটে নেড়ি কুকুর এলোমেলো হয়ে এদিক সেদিক হাঁটছে। সাঁইসাঁই করে বাতাস বইছে। অনেকগুলো তারার মাঝে একটা চাঁদ। স্বচ্ছ আকাশ। চাঁদটা তার নরম আলো নিয়ে ঠিক আমির-পদ্মজার উপর স্থির হয়ে আছে।

শেষ পর্ব (প্রথম অংশ)

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। প্রেমা ঘেমে একাকার। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে চৌচির! ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে নদীর পানি দিয়ে গলা ভেজাতে পারে। কিন্তু তার ইচ্ছে করছে না। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সাত মাস পূর্বেই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ভগ্নহৃদয় নিয়েই দিব্যি বেঁচে আছে! মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন সে বেঁচে আছে?

তুষার তার হাতের সিগারেটটি নদীতে ফেললো। তারপর সামনে তাকালো। কালো বোরকা পরে বসে আছে প্রেমা। তার মাথার উপর বাঁশের ছাউনি। সে চোখ ছোট ছোট করে উদাসীন হয়ে তাকিয়ে আছে দূরে,বহুদূরে। তুষার চার মাস ধরে প্রেমাকে দেখছে। মেয়েটা সবসময় উদাসীন থাকে। তুষার তার কপালের ঘাম মুছলো। গরম ভালোই পড়েছে। সে তার ব্যাগপ্যাক থেকে পানির বোতল বের করে গলা ভেজালো। তারপর প্রেমাকে ডাকলো, 'এই মেয়ে,পানি খাও। গরম পড়েছে খুব।'

প্রেমা তাকালো না। তুষার তার এক ভ্রু উঁচিয়ে ডাকলো, 'এই যে খুকী?'

প্রেমা ঘাড় ঘুরিয়ে ছোঁ মেরে বোতল নিল। তারপর আবার আগের মতো ঘুরে বসলো। প্রেমার ব্যবহারে তুষার বেকুব বনে যায়। তার মাথা চড়ে যায়। এইটুকু মেয়ে বেয়াদবি করলো কীভাবে? তুষার দূরে গিয়ে বসলো। কিন্তু তার রাগ বেশিক্ষণ রইলো না। দোষটা তো তারই! বয়সের পার্থক্যটা বেশি হওয়াতে প্রেমাকে তার বউ মনে হয় না। তাই গত চার মাসের দাম্পত্য জীবনে একবারও সে প্রেমার হাত ধরেনি। কখনো ভাবেওনি তার একটা বউ আছে! শুধু দুজন এক বাড়িতে থেকেছে,এই যা! এই যুগে একরকম চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের পার্থক্যে স্বামী-স্ত্রী অহরহ দেখা যায়। তবুও কেন যেন তুষার প্রেমাকে ছোট স্কুলপড়ুয়া একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না! সে প্রেমার সাথে সবসময় দূরত্ব রেখেছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মেয়েটাকে সময় দেয়নি,এতোবার কাঁদতে দেখেও আদর করে কখনো কান্না থামায়নি! সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। তুষার যে রসকষহীন কাঠখোট্টা একটা মানুষ প্রেমা বুঝে নিয়েছে! তুষারও বুঝতে পেরেছে। তাকে বুঝিয়েছে তার মা। গত শুক্রবার জুম্মার পর তুষারের মা আয়তুন বিবি তুষারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। বুঝান, বউকে বউয়ের মতো দেখতে। বিয়ে যখন হয়েছে প্রেমাই তুষারের জীবনের নিখুঁত স্ত্রী। প্রেমা নিঃসঙ্গতায় কামড়ে খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। এক বোন কবরে অন্য বোন জেলে। যে স্বামী হয়েছে সেও দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এভাবে মেয়েটা কীভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে? মায়ের কথা শোনার পর তুষার কাজকর্ম রেখে অনেক ভেবেছে। উপলব্ধি করলো,পদ্মজার মুখে প্রেমার যে বর্ণনা সে শুনেছিল,যে প্রাণোচ্ছল, লজ্জাবতী মেয়েটার কথা সে শুনেছিল সে মেয়েটা আর আগের মতো নেই! তুষারের বিবেক জাগ্রত হয়। সিদ্ধান্ত নেয় প্রেমাকে সময় দিবে। সম্পর্কটাকে সুযোগ দিবে,সহজ করবে! তাৎক্ষণিক সে প্রেমাকে জানালো,তারা অলন্দপুরে ঘুরতে যাবে। তুষারের সিদ্ধান্ত শুনে প্রেমা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। গত দুইদিন তুষার ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছে। তাও সব কথা পড়া নিয়ে! এতো ছোট মেয়ের সাথে কী বন্ধুত্ব হয়! তুষার কথা বলে সম্পর্ক সহজ করতে গিয়ে আরো কঠিন করে তুলছে। সে কিছুতেই প্রেমার সাথে সহজ হতে পারছে না। তারপর আজই দুজন গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হলো। পথে কেউ কোনো কথা বলেনি। অলন্দপুরে চলে এসেছে তারা। নৌকা ধীরগতিতে আটপাড়ার দিকে এগোচ্ছে। তুষার আড়চোখে প্রেমাকে দেখলো। প্রেমা ঝিম ধরে বসে আছে। তুষার খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে ডাকলো, 'প্রেমা?'

প্রেমা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সে অবাক হয়েছে। স্বামী নামক কঠিন পাথরটি তাকে সবসময় খুকী বলে অথবা এই মেয়ে ডাকে! হুট করে প্রেমা ডাকটা শুনে অবাক হয়েছে আবার ভালোও লাগলো! তুষার গাম্ভীর্যতা ভেঙে প্রেমার দিকে এগিয়ে আসে। প্রেমার সামনে এসে বসলো। মাঝি বাউল গান গাইছে। গাইতে গাইতে বৈঠা বাইছে। তুষারকে এরকম

মুখোমুখি বসতে দেখে প্রেমা উৎসুক হয়ে তাকায়।

তুষার বসেছে তো ঠিকই। কিন্তু কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আরো দুই-তিনবার খ্যাঁক করে কাশলো। তারপর বললো, 'আমাদের সম্পর্কটা আসলে কী?'

এটা কেমন প্রশ্ন! প্রেমা ভ্রুকুটি করলো। তুষার নিজের প্রশ্নে নিজে হতভম্ব হয়ে যায়! হয় সে কঠিন,কঠিন কথা বলে। নয়তো কী বলে নিজেও বুঝে না। প্রেমাও বুঝে না। তুষার দুই দিনের চেষ্টায় বুঝে গিয়েছে মেয়ে মানুষ পটানোর চেয়ে আসামী ধরা সোজা! প্রেমার সাথে তার জমছেই না! আসলে কি পটাতে পারছে না? নাকি কীভাবে পটাতে হয় সেটাই তুষার জানে না? প্রেমা চোখ ফিরিয়ে নিল। তুষারের হাবভাব সে বুঝে না। বুঝার ইচ্ছেও নেই। মেট্রিক পরীক্ষাটা দেয়া হয়নি। আরো এক বছর পড়তে হবে! জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে। তার পাশে আপন বলতে কেউ নেই। প্রেমার বুক চিঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তুষার সেই দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। সে প্রেমার দিকে তাকালো। এইটুকু মেয়ের দীর্ঘশ্বাস এতো ভারী! তুষার নরম কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলো, 'তুমি কি আমার উপর বিরক্ত?'

তুষার নরম কণ্ঠে কথা বলার চেষ্টা করলেও, কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যতা থেকে যায়। প্রশ্ন করে দুই ভ্রু কুঁচকে প্রেমার দিকে তাকায়। তার চাহনি দেখে মনে হচ্ছে,প্রেমা চোর! চুরি করে ধরা পড়েছে। আর তারই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রেমা জবাব দিল না। তুষারের ভ্রু দুটি আরো বেঁকে গেল। সে কাঠ কাঠ স্বরে বললো, 'প্রশ্ন করেছি তো? উত্তর কোথায়?'

প্রেমা অন্যদিকে চোখ রেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'না। বিরক্ত না।'

'তাহলে আমার সাথে কথা বলো না কেন?'

প্রেমা নির্বিকার চোখে তাকালো। বললো, 'আপনিও তো বলেন না।'

তুষার থতমত খেয়ে যায়। প্রথম প্রথম প্রেমা তুষারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে। তখন তুষারই হু,হ্যাঁ এর বেশি কিছু বলেনি। তাই কখনো দীর্ঘ আলাপ হয়নি। প্রেমার কথায় তুষার বিব্রতবোধ করলেও নিজেকে গুটিয়ে নিল না। সে কখনো হারেনি। সবসময় জয়ী হয়েছে। এবারের চ্যালেঞ্জটা মেয়েলি ব্যাপার! যাই হোক,সে হারবে না। হ্যাঁ...কিছুতেই হারবে না। তুষার মাছি তাড়ানো মতো হাত নাড়িয়ে বললো, 'পিছনের কথা বাদ। এখন থেকে দুজনই কথা বলবো। ঠিক আছে?'

প্রেমা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। তুষার বললো, 'বেশি গরম লাগছে?'

'লাগছে।'

তুষারের দূরে চোখ রেখে বললো, 'আর কিছুক্ষণ। এসেই পড়েছি।'

আচমকা কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। দখিনা বাতাস ধেয়ে আসে। দস্যি বাতাসে প্রেমার ওড়নার একাংশ ছাউনির বাইরে চলে যায়। তুষার ধরলো। প্রেমা তার অবাধ্য ওড়নাকে সুন্দর করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল। তিন-চারদিন ধরে হুটহাট বাতাস বইছে। সেই সাথে ভ্যাপসা গরম তো রয়েছেই। তুষার চোখ ছোট ছোট করে চারপাশ দেখছে। নদীর দুই পাড়ে দুই গ্রাম। বামে হিন্দু পাড়া ডানে আটপাড়া। আটপাড়ার সব মানুষ মুসলমান। তুষার বললো, 'হিন্দু পাড়ায় কখনো গিয়েছো?'

'হু, অনেকবার।'

তুষার প্রেমার মুখের দিকে তাকালো। বললো, 'আমাদের বিয়েটা কী করে হলো জানো?'

'জানি।'

'কী জানো?'

প্রেমা নির্বিকার স্বরে বললো, 'হানি খালামনির কাছে আপনার আম্মা প্রস্তাব নিয়ে যান। তারপর কিছু বুঝে উঠার আগে পরদিনই আমার বিয়ে হয়ে যায়।'

তুষার গুরুতর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো, 'অচেনা একজনকে এক কথায় বিয়ে করে নিলে কেন? তোমার অনুমতি নেয়া হয়নি?'

তুষার এসব কেন জিজ্ঞাসা করছে প্রেমা জানে না। জানতে ইচ্ছে হলেও সে প্রশ্ন করবে

না। প্রেমা উদাস গলায় বললো, ‘তখন আমার অভিভাবক আমার নানু আর খালামনি ছিল। আমার ভাবার বা বলার কিছু ছিল না। খালামনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।

‘তুমি এই বিয়েতে সুখী হতে পারোনি তাই না?’

তুষারের সহজ/সরল প্রশ্ন! প্রেমা তুষারের চোখের দিকে সরাসরি তাকালো। মানুষটা হঠাৎ করে তার সুখ নিয়ে ভাবছে কেন? সে চোখ নামিয়ে ফেললো। কিছু বললো না। তুষার মিনিট দুয়েক সময় পার করে বললো, ‘আমাদের বিয়ে হউক তোমার বড় আপা চেয়েছিলেন।’

প্রেমা চকিতে তাকালো। তার চোখ দুটি হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে উঠে। তুষার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে,প্রেমার মুখটা কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। প্রেমা বললো, ’আপা চেয়েছিল?’

তুষার বললো, ‘তোমার আপা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলেও তিনি তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তখন আমার আম্মা আমার বিয়ে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বার বার টেলিফোন করতেন। বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতেন। আমি বিয়েতে আগ্রহী ছিলাম না। আমার বেড়ে উঠা অন্য দশজনের মতো ছিল না। বাবা ছাড়া শহরে বেড়ে উঠা ছেলেমেয়েগুলো জানে জীবন কতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে! তোমার আপা কম কথা বলতেন। কথা বলতে বলতে হুট করে থেমে যেতেন। তার মাঝে আম্মাও কল করতেন অনবরত। তাই একবার আম্মার সাথে চেঁচামেচি করেছিলাম। কিছু কথা তোমার আপার কানে যায়। সেদিনই রাত্রিবেলা হাওলাদার বাড়ি সম্পর্কে বলতে বলতে তোমার আপা থেমে যান। বাকি কথা কিছুতেই বলছিলেন না।

যখন জোর করছিলাম বলার জন্য। আমাকে অনুরোধ করেন, আম্মাকে নিয়ে তোমাকে একবার যেন দেখতে যাই। আর আম্মার পছন্দ হলে যেন বিয়ে করি। ততক্ষণে তোমার সম্পর্কে অনেককিছুই শুনেছি। আমার বিয়ে করাও জরুরি নয়তো আম্মা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিবেন। অন্যদিকে তোমার আপা নিজ ইচ্ছায় কিছু না বললে কিছু জানাও সম্ভব নয়। তাই কথা দেই,তোমাকে দেখতে যাব। তোমার আপা হাসিমুখে বাকিটুকু বলেন। তিনি যেন নিশ্চিত ছিলেন, আম্মা তোমাকে দেখলে পছন্দ করবে। ঠিক তাই হলো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তুমি আর তোমার পরিবার হানি খালামনির বাসায় আছো। আম্মাকেও জানাই,একটা মেয়ে আছে দেখে আসো পছন্দ হয় নাকি। আম্মা তো খুব খুশি। তোমাকে দেখার পর রাত্রে ঘুমাননি। সারারাত তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। বাকিটুকু তো তুমি জানো।’

‘আমাকে বিয়ে করাটা অনুগ্রহ ছিল?’ প্রেমার কণ্ঠটা কেমন যেন শোনায়।

তুষার কৈফিয়ত দেয়ার মতো বললো, ‘মোটেও না। আম্মার পছন্দ না হলে বিয়েটা হতো না। তোমার আপাও কিন্তু আমার উপর চাপিয়ে দেননি। বলেছেন,একবার যেন দেখি। পছন্দ হওয়ার পর বিয়ে। আর আমার আম্মার তোমাকে পছন্দ হয়েছে। বরং তোমার সাথে আমাকে মানায় না।’

‘কেন মানায় না?’প্রেমা নিজের অজান্তে প্রশ্ন করলো।

তুষার বললো, ‘আমার বয়স বেশি।’

প্রেমা আর কথা বাড়ালো না। তার ভালো লাগছে! হুট করেই ভীষণ ভালো লাগছে। এমনকি কাঠখোট্টা তুষারকেও এখন তার ভালো লাগছে। সে মৃদু হাসলো। তুষার প্রেমার হাসি খেয়াল করে বললো, ‘হাসছো যে?’

প্রেমা ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললো, ‘আপনার গোঁফ জমিদারদের মতো বড় বড়।’

প্রেমার কথা শুনে তুষারও হাসলো। পদ্মজা নামটাতে জাদু আছে। তার কথা উঠতেই প্রেমা হেসেছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তুষার বললো, ‘তোমার নানাবাড়িতে এখন কে কে আছে?’

‘নানু আর হিমেল মামা।’

‘নানুর কিডনিতে কী না হয়েছিল? অপারেশন হয়েছে শুনেছি। শহরেই মেয়ের কাছে থাকতেন। গ্রামে আসতে গেলেন কেন?’

প্রেমা অবাক হওয়ার ভান ধরে বললো,"আমি কী এখানে থাকি যে জানব?'

প্রেমা থামলো। তারপর আবার বললো, 'গত বছর আপা যখন আসছিল গ্রামে। তখন নানু আর মামা খালামনির কাছে ছিল। নানুর অপারেশন তখন হয়েছে। অনেকদিন কেটে গেছে। এখন নানু সুস্থ।গ্রামে সমস্যা হবে না।'

'তোমার নানাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। দেখতে পারিনি।'আক্ষেপের স্বরে বললো তুষার।

প্রেমা বললো, 'নানা তো দুই বছর আগেই চলে গিয়েছেন। দেখবেন কী করে!'

তুষার ছাউনির বাইরে আঙুলে ইশারা করে বললো, 'তোমাদের বাড়ির ঘাট না?'

প্রেমা বাইরে তাকালো। বললো, 'হু,এতো জলদি চলে এসেছি!'

তুষার কাপড়ের ব্যাগ হাতে নিয়ে বললো, 'কথা বলতে বলতে সময় কেটে গেছে।'

নৌকা মোড়ল বাড়ির ঘাটে এসে থামলো। তুষার মাঝিকে টাকা দিয়ে প্রেমাকে হাতে ধরে নামায়। প্রেমার হাত ধরার সময় তুষারের মনে হলো, এতো কোমল হাত সে কখনো ধরেনি! তাৎক্ষণিক তার বুকের ভেতর কী যেন হয়!

প্রেমা উঠানে পা রাখতেই বাসন্তীর সাথে দেখা হয়। বাসন্তী প্রেমাকে দেখে চমকে যান। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন। প্রেমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। বাসন্তীর কান্না শুনে রুম্পা আর প্রান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রুম্পা বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রান্ত বাইরে ছুটে আসে। বাসন্তী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ও মা! মা আমার!'প্রেমার আকস্মিক আগমন তিনি হজম করতে পারছেন না। মোড়ল বাড়ি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির মাঝে প্রেমা যেন জল হয়ে এসেছে! প্রেমা বাসন্তীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, 'শান্ত হও বড় আম্মা। শান্ত হও।'

বাসন্তী প্রেমার কপালে,গালে চুমু দিলেন। তুষার পাশ থেকে সালাম দিল৷ বাসন্তী চোখের জল মুছে তুষারকে বললেন, 'ভালো আছো আব্বা?'

'জি আম্মা। আপনি তো অনেক শুকিয়ে গেছেন।'

'মেয়েগুলো কাছে নাই। তারা ভালো নাই। আমি কেমনে ভালো থাকি বাপ?'

প্রেমা প্রান্তর দিকে তাকাতেই প্রান্ত প্রেমার মাথায় থাপ্পড় দিল। বললো, 'এতদিন পর আসলি!'

প্রেমা প্রান্তর চুল টেনে ধরে বললো, 'একদম মাথায় থাপ্পড় দিবি না। আমার মাথা ব্যথা করে।'

প্রান্ত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তুষারকে দেখে থেমে যায়। তুষার হাসতে কার্পন্য করলো না। সে প্রান্তর সাথে হ্যান্ডশেক করে বললো, 'দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

কুশল-বিনিময় শেষে বাসন্তী তুষার আর প্রেমাকে নিয়ে বারান্দায় পা রাখলেন। দেখা হয় রুম্পার সাথে। রুম্পার পেট উঁচু হয়েছে। তার গর্ভাবস্থার সাত মাস চলছে। সে এই বাড়িতেই থাকে। হাওলাদার বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। সাত মাসে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আমিনা আলোকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। বৃদ্ধা নূরজাহান মারা গিয়েছেন৷ বিদেশ থেকে লাবণ্য ও জাফর তাদের স্বামী-স্ত্রী নিয়ে দেশে এসেছিল। দুই সপ্তাহ থেকে আবার ফিরে গিয়েছে। গ্রামবাসী এখন হাওলাদার বাড়িতে যেতে ভয় পায়। সেখানে নাকি আত্মারা ঘুরঘুর করে! প্রেমা রুম্পাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। কুশল-বিনিময় শেষ করে রুম্পা তুষারকে প্রশ্ন করলো, 'উনি ভালা আছে? জেলে খাওনদাওন দেয়? মারে কেউ?'

রুম্পার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। তুষার রুম্পাকে আশ্বস্ত করে বললো, 'আলমগীর সাহেব ভালো আছেন,সুস্থ আছেন। খাবার দেয়া হয়৷ কেউ মারধোর করে না। আপনি চিন্তা করবেন না।'

রুম্পা হাসলো। আলমগীর সুস্থ আছে এই খবরটুকুই রুম্পার বেঁচে থাকার শক্তি!

সাত মাস পূর্বে, রবিবার দুপুরে মুমিন নামে একজন ব্যাক্তি মজিদের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখে ফরিনার কবরের পাশে এক মেয়ে শুয়ে আছে। তার পরনের সাদা শাড়ি রক্তে রাঙা। আর কবরের উপর একটা মাথা! মজিদ হাওলাদার মুমিনকে নতুন দারোয়ান হিসেবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। মুমিন এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যায়। জান নিয়ে দৌড়ে পালায়। তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যে হাওলাদার বাড়ির গণহত্যার ঘটনা পুরো অলন্দপুরে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক জড়ো হয়। পদ্মজা এতো মানুষকে দেখেও নীরব থাকে। তার রূপ হয় রূপকথার অতৃপ্ত অশরীরীর মতো। কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলো,ডাকলো,কুহকিনী, ডাইনি,রাক্ষসী ! থানা থেকে পুলিশ আসে। পদ্মজাকে শহরে নিয়ে যায়। নৃশংস এই খুনের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। টেলিভিশন, রেডিও সব জায়গায় এক কথা, "অলন্দপুরের ছোট গ্রাম আটপাড়ার হাওলাদার বাড়ির বধূ উম্মে পদ্মজা চলচ্চিত্র অভিনেতা লিখন শাহর সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে খুন করেছে স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর ও চাচা শ্বশুরকে। সাথে আরেকটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। তাকে খুন করার কারণ এখনও শনাক্ত করা যায়নি।'

এক দিনের ব্যবধানে পুরো দেশে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নৃশংস খুনের বর্ণনা শুনে কেউ কেউ রাতে ঘুমাতে পারেনি। গ্রামবাসী তাদের প্রিয় ও মহান মাতব্বরের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে। তারা সমস্বরে চিৎকার করে জানায়,তারা পদ্মজার ফাঁসি চায়। মুহূর্তে পুরো দেশের কাছে কলঙ্কিত হয়ে যায় পদ্মজা। আলমগীর গ্রামে এসে শুনে পুলিশ পদ্মজাকে ধরে নিয়ে গেছে! খুন হয়েছে বাড়ির প্রতিটি পুরুষ। সব শুনে ঘাবড়ে যায় আলমগীর। ফিরে যায় রুম্পার কাছে।

মগা গ্রামে প্রবেশ করতেই পুলিশ তাকে পূর্ণার খুনের দায়ে আটক করে। আলমগীর ঘরে ফিরে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। রুম্পা আলমগীর কে অনেক প্রশ্ন করলো,আলমগীর জবাব দিল না। আমিরের দেয়া নীল খামটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। এই খামে একটা চিঠি আর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দলিল রয়েছে। চিঠিতে লেখা এক পরিকল্পনা। আর ঘটেছে অন্য ঘটনা! সবাই যেভাবে পদ্মজার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে,ফাঁসি নিশ্চিত! সে চাইলে পদ্মজার ফাঁসি আটকাতে পারে। তার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের জীবন ও সংসার ত্যাগ করতে হবে। এতো সাধনার পর পাওয়া নতুন জীবন ভালো করে উপভোগ করার পূর্বে কিছুতেই সে বন্দী হতে চায় না! আলমগীর খাম থেকে চিঠিটি বের করে আরো একবার পড়লো;-

প্রিয় বড় ভাই,

বড় বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছি। এখানে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। পদ্মজা জেনে গিয়েছে সব সত্য। তোমার চিঠি পাওয়ার পূর্বেই সব জেনেছে। আমি বিস্তারিত কিছু লেখব না। তুমি পরে পদ্মজার কাছে জেনে নিও। আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। তার আগে আমি চারজনকে হত্যা করতে চাই। তার মাঝে তিন জন পদ্মজার নামে কুৎসা রটিয়েছে। আমি তখন গ্রামে ছিলাম না। ঢাকা গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে তারা সুন্দর চাঁদে দাগ ছিটিয়েছে। রবিবারের সকাল আমার দেখা হবে না। আমার বেঁচে থাকা পদ্মজার জন্য হুমকি! সেই সাথে আমার জন্য ভীষণ কষ্টের। আমি তোমাকে কিছু দলিল দিয়েছি। যা প্রমাণ করে আমি একজন নারী পাচারকারী। সেই সাথে এটাও প্রমাণ করে,আমার সাথে কারা কারা ছিল। একটু খুঁজে দেখো দলিলগুলোর মাঝে আরেকটি চিরকুট আছে। সেখানে আমি স্পষ্ট করে আমার সাথে কাজ করা সবার নাম লিখে দিয়েছি। যাদের বর্তমান ঠিকানা জানা আছে সেই ঠিকানাও লিখে দিয়েছি। আমি প্রমাণ সহ স্বীকার করেছি,আমার সব অপরাধ। তোমার নাম সেখানে কোথাও নেই। কোথায় মেয়ে পাচার হয়? কীভাবে হয়? কারা এই কাজের সাথে যুক্ত? আমার জানা সব বিস্তারিত লেখা আছে। আমার দেয়া ঠিকানা অনুসারে খোঁজ চালালে উদ্ধার হবে,আড়াইশোরও বেশি মেয়ে! তুমি এই চিরকুট নিজের কাছে রেখে আমার

স্বীকারোক্তি চিরকুটটি ও সকল দলিল প্রমাণ হিসেবে সকলের সামনে উন্মোচন করবে। রুম্পা ভাবিকে বাঁচিয়ে রাখার অবদান পুরোটাই আমার ছিল। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে হলেও তুমি পদ্মজাকে কলঙ্কমুক্ত করো ভাই। পদ্মজাকে নিজের সাথে নিয়ে যেও। দেখে রেখো। তোমার কাছে আমানত রেখে গেলাম।

ইতি,
আমির হাওলাদার

আলমগীর চিঠি মেঝেতে রেখে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে। সে মগার থেকে চিঠি পাওয়ার পর পরই আমিরকে বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে। আমিরকে সে ভীষণ ভালোবাসে। আমিরের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত আলমগীরকে বসে থাকতে দেয়নি। কিন্তু গ্রামে পৌঁছে শুনলো সব শেষ! পদ্মজা খুন করেছে সবাইকে। আর এখন পদ্মজা মিথ্যা অপবাদে জেলে বাস করছে। এই মুহূর্তে সে যদি এই প্রমাণসমূহ নিয়ে সে পুলিশের কাছে যায়। পুলিশ তাকেও আটক করবে। সে পুলিশকে মিথ্যে বলতে পারবে না। সেই সাহস হবে না। সব সত্য জানার পর তার ফাঁসিও হতে পারে। সে নিজেকে উৎসর্গ করার সাহস পায় না।

পদ্মজার মামলার তর্কবিতর্কে যখন পঁচিশ দিন পার হয় তখন রুম্পা নিজ ইচ্ছায় আলমগীরকে অনুরোধ করলো,আলমগীর যেন পদ্মজাকে বাঁচায়। মিথ্যা অপবাদে পদ্মজার ফাঁসি হতে দেখে সে সুখের সংসার করতে পারবে না। পদ্মজা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে কাউকে খুন করেনি,এই টুকু সত্য যেন আলমগীর সবাইকে জানায়। আলমগীর রাতেই রুম্পাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পদ্মজাও তখন সব স্বীকার করেছে। সব প্রমাণ পাওয়ার পর দেশের পরিবেশ পাল্টে যায়। জনগণের মাথায় পড়ে হাত। আমিরের দেয়া তথ্যানুসারে ধরা পড়ে কয়েকটি চক্রের নেতা! তদন্ত চালিয়ে জানা যায়, স্বয়ং বাণিজ্য মন্ত্রী এই চক্রের সাথে জড়িত৷ উদ্ধার হয় তিনশোরও বেশি অসহায় মেয়ে। কেউ কেউ পলাতক। এই খবর দেশের বাইরেও বেরিয়ে পড়ে। কুয়েত,সৌদি সহ আরো কয়েকটি দেশে তদন্ত শুরু হয়। তারা চিরুনি অভিযান চালিয়ে আমিরের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে মেয়ে সংগ্রহকারীদের খুঁজে চলে। দুজন ধরা পড়ে। বাকিরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উদ্ধারকৃত মেয়েগুলি নতুন জীবন পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আমিরের চিঠিতে নতুন গোপন তথ্য ছিল, অন্দরমহলের পিছনে বড় নারিকেল গাছটির নিচে একটি বিশাল গর্ত আছে যেখানে ছুরি,রাম দা,চাপাতি,কুড়াল,চাবুক সহ অনেক অস্ত্র রয়েছে। তুষার অস্ত্রসমূহ উদ্ধার করে,সেই সাথে উদ্ধার হয় পদ্মজার জন্য রেখে যাওয়া আমিরের লাল খামটি! পদ্মজা তখন অস্বাভাবিক ছিল। সে নিজের মধ্যে ছিল না। তাকে হাসপাতালে রাখার আদেশ দেয় আদালত। দেড় মাসের চিকিৎসার পর পদ্মজার শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা সেড়ে উঠে। আদালত থেকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। আলমগীর রাজ স্বাক্ষী হওয়াতে ফাঁসির বদলে আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। শেষ নিঃশ্বাস অবধি সে কারাগারে কাটাবে। তারপর রুম্পা চলে আসে গ্রামে। গ্রামে আসার এক মাস পর জানতে পারে সে গর্ভবতী। তার শূন্য জীবনে আশার আলো হয়ে আসে সন্তান আগমনের সংবাদ! দেশবাসীর মুখের কথা পাল্টে যায়। তারা পদ্মজার মুক্তি চেয়ে আজও আন্দোলন করে চলেছে!

পরদিন সকাল সাতটা। তুষার খাওয়াদাওয়া করে মাত্র উঠেছে। তখন দুই-তিনটে কুকুরের চিৎকার ভেসে আসে। তুষার দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকালো। সকালের মিষ্টি বাতাসে বিষণ্ণ এক দৃশ্য চোখে পড়ে। অপরিচ্ছন্ন মৃদুল কুকুরগুলোর সাথে কী নিয়ে যেন তর্ক করছে! মাঝেমধ্যে মাটি ছুঁড়ে মারছে। তুষার দ্রুতপায়ে মৃদুলের দিকে এগিয়ে যায়। তুষারের পিছন পিছন বাসন্তী ও প্রেমাও গেল। গতকাল রাতে তুষার মৃদুলকে দেখতে এসেছিল।তখন মৃদুল পূর্ণার কবরের পাশে ঘুমাচ্ছিল। জুলেখা বানু ডাকতে নিষেধ করেন৷ তাই তুষার ডাকেনি।

গোঁফ-দাড়ির জন্য মৃদুলকে চেনা যাচ্ছে না। গায়ে মাটি লেগে আছে। প্যান্টের এক পা হাঁটু অবধি ছেঁড়া। তুষারকে দেখে মৃদুল দুই কদম পিছিয়ে গেল। লাহাড়ি ঘর থেকে জুলেখা বানু বেরিয়ে আসেন। তিনি ভীষণ শুকিয়েছেন। চোখেমুখে আগের সৌন্দর্যটুকু নেই। একমাত্র ছেলেকে রেখে তিনি নিজের বাড়িতে ঘুমাতে পারেন না। মৃদুল মোড়ল বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ে না। সে তার সুস্থ জীবন পূর্ণার সাথে কবর দিয়েছে। মাস তিনেক আগে মৃদুলকে জোর করে বেঁধে শহরের ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে পাগলা গারদে রেখে আসা হয়। তিন-চার দিন পার হতেই খবর আসে,দারোয়ান ও দুজন নার্সকে আহত করে মৃদুল পালিয়েছে। জুলেখা বানু এই খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে যান। মৃদুলের জ্ঞান সুস্থ নয়। সে কী করে গ্রামে ফিরবে? দীর্ঘ পনেরো দিন পর মৃদুলকে এক গ্রামে পাওয়া যায়। জুলেখা বানু কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়েন। মৃদুল পাগল থাকুক তাও চোখের সামনে থাকুক সেটাই তিনি চান। তাই মৃদুলকে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু মৃদুল পূর্ণাকে ছাড়া কিছুতেই খাবে না। তাই বাধ্য হয়ে মৃদুলকে আবার মোড়ল বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃদুল সর্বক্ষণ পূর্ণার কবরের পাশে বসে থাকে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। পূর্ণার কবরের চারপাশে গর্ত করে বাঁশ পুঁতেছে তারপর টিনের ছাদ দিয়েছে,যেন পূর্ণা বৃষ্টিতে না ভিজে। রাতে পূর্ণার জন্য কিনে আনা লাল বেনারসিটি আঁকড়ে ধরে ঘুমায়। জুলেখা বানু জোর করে দুইবেলা খাইয়ে দেন। মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতে যান।

নিজের বিলাসবহুল বাড়ি নিয়ে জুলেখা বানুর অহংকার ছিল। আর আজ ছেলের জন্য তাকে অন্যের বাড়ির লাহাড়ি ঘরে থাকতে হচ্ছে। সন্তানের উপরে যে কিছু নেই! গ্রামের বাচ্চারা মৃদুলকে লাল পাগল ডাকে। লাল পাগল ডাকার কারণ,মৃদুল ফর্সা,সুন্দর! যদিও তার সৌন্দর্য টিকে নেই। গোলাপি ঠোঁট দুটি কালচে হয়েছে। তুষার মৃদুলকে আদুরে স্বরে ডাকলো, ‘মৃদুল।’

মৃদুল এক নজর তুষারকে দেখলো। তারপর দূরে সরে গেল। তুষার জুলেখা বানুকে প্রশ্ন করলো, ’মৃদুল খেয়েছে?’

জুলেখা ভেজা কণ্ঠে বললেন, ‘না। খায় নাই। কাইল থাইকা খাইতাছে না।’

তুষার কপাল ইষৎ কুঁচকে মৃদুলের দিকে তাকালো। জুলেখাকে আবার প্রশ্ন করলো, ’শুনেছিলাম ডাক্তারের কাছে নিয়েছিলেন। ওর অবস্থা কেমন? মাথা কতটুকু কাজ করে?’

জুলেখা বানুর চোখের কার্ণিশে জল জমে। তিনি বললেন, ‘বাচ্চারাও ওর থাইকা বেশি বুঝে। যত দিন যাইতাছে পাগলামি বাড়তাছে। আমি আর ওর বাপে ছাড়া যে যেইডা কয় ওইডাই বিশ্বাস করে।’

‘চাচা কোথায়?’

‘বাড়িত। বাড়িঘর জমিজমা দেহন লাগে না? আর কেলা দেখবো? কেউ আছে?’জুলেখার কণ্ঠে অসহায়ত্ব স্পষ্ট।

তুষার মৃদুলের পাশে গিয়ে বসলো। বললো, ‘আমাকে ভয় পাচ্ছো?’

মৃদুল আড়চোখে তুষারকে দেখলো। মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো,সে ভয় পাচ্ছে। হাওলাদার বাড়ির খুঁটিনাটি তদন্ত করতে তুষার যখন অলন্দপুরে এসেছিল তখন মৃদুলের সাথে তার দেখা হয়। তখন মৃদুলের এতো খারাপ অবস্থা ছিল না। তুষার বললো, ’আজ রাজহাঁস জবাই করবো। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?’

মৃদুল কিছু বললো না। তুষার বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললো, ’আম্মা, রাজহাঁস আছে না?’

‘আছে আব্বা।’বললেন বাসন্তী।

তারপর তুষার মৃদুলকে বললো, ’রাজহাঁস আছে। অর্ধেক আমরা খাব আর অর্ধেক পূর্ণাকে দেব। পূর্ণা রাজহাঁস খেতে পছন্দ করতো। তাই না প্রেমা?’

কোনাকালেই পূর্ণা রাজহাঁস পছন্দ করতো না। তাও প্রেমা তুষারের সাথে তাল মিলালো। তুষার সাবধানে মৃদুলকে বললো, ‘তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো আর আমার সাথে খেতে না বসো আমি কিন্তু পূর্ণাকে কিছু দেব না। দেখিয়ে দেখিয়ে খাব। তখন পূর্ণা

কষ্ট পাবে।' মৃদুল পূর্ণার কবরে হাত বুলিয়ে দিল। সে চিন্তা করছে কী করবে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে রাজি হলো। সারাদিন তুষারের সাথে ভালো সময় কাটে। তুষার এমনভাবে কথা বলে,যেন পূর্ণা সত্যি বেঁচে আছে৷ মৃদুল তুষারের সঙ্গ উপভোগ করে। এক ফাঁকে জুলেখাকে তুষার জানালো,মৃদুলকে ঢাকা নিয়ে গেলে ভালো হয়। আরেকটু চেষ্টা করে দেখা যেত। জুলেখা তুষারের দুই হাত ধরে অনুরোধ করেন,মৃদুলের সুস্থতার জন্য তিনি সবরকম খরচ করতে প্রস্তুত। শুধু মৃদুলকে যেন তুষার সামলায়। তুষার জুলেখাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর আটপাড়ায় ঘুরাঘুরি করে জানতে পারলো,মগা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ইয়াকুব আলীর বাড়িতে কাজ নিয়েছে। আর ইয়াকুব আলী অলন্দপুরের মাতব্বর হয়েছেন।

দিনের আলো কেটে রাত নামতেই মৃদুল পূর্ণার কবরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর তুষার রাতের খাবার খেয়ে ঘরে আসে। প্রেমা মশারি টানাচ্ছে। বাইরে বিরতিহীনভাবে ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। তাদের ডাকাডাকিতে তুষারের কানে তালা লেগে যাচ্ছে। সে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক পছন্দ করে না। অন্যদিকে প্রেমার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভীষণ পছন্দ। সে মুগ্ধ হয়ে শুনে। তুষার দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে বিরক্তি নিয়ে বললো, 'পোকাগুলো কি সারারাত ডাকাডাকি করবে?'

প্রেমা বললো, 'মাঝরাত অবধি ডাকবে।'

তুষার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'মাঝরাত অবধি জেগে থাকবো?'

'কানে তুলা দিয়ে রাখুন।'

'আছে তুলা?'বললো তুষার।

প্রেমা আলমারি খুলে তুলা বের করে দিল। তুষার প্রেমার কাণ্ডে বিস্মিত! সত্যি সত্যি তুলা দিয়ে দিল! এই মেয়ে নাকি বাকি দুই বোনের চেয়ে লজ্জাবতী আর ভীতু ছিল! অথচ,পদ্মজা আমিরকে লজ্জা পেত। পূর্ণা মৃদুলকে লজ্জা পেত। আর প্রেমা লজ্জা তো দূরের কথা তার চেয়ে এতো বড় মানুষটিকে পরোয়াও করে না। নির্বিকার ভঙ্গিতে থাকে। সময় ও পরিস্থিতি মানুষকে কতোটা পাল্টে দেয়! তুষার তুলা হাতে বসে রইলো। প্রেমা খেয়াল করেও কিছু বললো না। শোবার সময় প্রেমা প্রশ্ন করলো, 'আপার কারাদণ্ডের সময় কি কমানো যায় না?'

'কমতে পারে। মনে হয় না এতদিন জেলে রাখবে। অনেক সময় যতদিন জেল হওয়ার কথা ততদিন হয় না।"

'এমনও হয়?'

'হয়। মেয়াদের আগে মুক্তি পেয়ে যায় অনেকে। তাছাড়া লিখন শাহ দৌড়াদৌড়ি করছেন, জনগণও চাইছে সাজা কমানো হউক। কমবে নিশ্চয়ই।'

'আপা কি জেল থেকে বের হয়ে লিখন ভাইয়াকে বিয়ে করতে রাজি হবে?'

'আমার যতটুকু ধারণা, রাজি হবে না। লিখন শাহ আশা নিয়ে বসে আছেন। পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পদ্মজা লিখন শাহকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন ।'

প্রেমা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো, 'কী লেখা সেখানে?'

তুষার চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে বসলো। বললো, 'আমি পড়িনি। পিন্টুকে দিয়ে পাঠিয়েছি।'

প্রেমা ছোট করে বললো, 'ওহ।'

তারপর প্রশ্ন করলো, 'গত কয়েকদিনের মধ্যে আপার সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, গতকাল বিকেলেই দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে দেখলেই গুটিয়ে যান। পর পুরুষের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। তাই না?'

প্রেমা হেসে মাথা ঝাঁকালো। আবার পদ্মজার কথা শুনে প্রেমা হেসেছে! তুষার প্রেমাকে ভালো করে খেয়াল করলো। পদ্মজার মুখের ছাপ প্রেমার মুখে আছে। প্রেমা সবসময় সোজা সিঁথি করে বেণি করে। শাড়ি পরে বলে বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড় লাগে। এই যা...হুট করে প্রেমাকে বড় মনে হচ্ছে কেন? এতদিন তো শাড়ি পরাই দেখেছে। বড় তো লাগেনি! এ

কোন কেরামতি! তুষার মুচকি হাসলো। প্রেমা তুষারকে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে বললো, 'হাসছেন কেন?'

তুষার টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'আমির হাওলাদার তিনটে বিয়ে করেছেন। আমি হলে চারটে বিয়ে করতাম। চার বিয়ে করা সুন্নত!'

প্রেমা বাঁকা চোখে তুষারের দিকে তাকালো। বললো, 'করুন গিয়ে। তবে ভাইয়ার প্রথম দুটো বিয়ের কোনো মূল্য নেই। ভাইয়ার বউ একমাত্র আমার আপা।'

তুষার এক হাতে মাথার ভর দিয়ে প্রেমার দিকে ফিরে বললো, 'কেন মূল্য নেই?'
'ইসলামে পালিয়ে বিয়ে করার মূল্য নেই। মেয়ের অভিভাবক লাগে। ভাইয়ার দুটো বউ বাসায় কিছু না বলে বিয়ে করেছে। তাই হাশরের ময়দানে আমির ভাইয়ার বউ শুধু আমার আপা!'কথাটা প্রেমা ভাব নিয়ে বললো।

তুষার আবার হাসলো। সোজা হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো। মাঝে দূরত্ব রেখে প্রেমাও শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তুষার বললো, 'প্রেমা?'

প্রেমা জেগেই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'সাত দিনের কথা তো আজ একদিনে বলে ফেলছেন!'

প্রেমার কণ্ঠে ঝাঁঝ। তার মনে তুষারের জন্য কতো রাগ জমে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে। কেন এতো রাগ? সে কি গত চার মাসে তুষারের সঙ্গ পাওয়ার আশা করে বার বার নিরাশ হয়েছে? সত্যি এমন কিছু হয়েছে? তুষার ভাবলো। অদ্ভুত বিষয় প্রেমার মুখের ঝাঁঝালো কথাগুলো তুষারের ভালো লাগছে। সর্বনাশ! তবে কি সেও মরণ প্রেমে পড়তে যাচ্ছে! পরিণতি আমিরের মতো হবে নাকি মৃদুলের মতো? নাকি আরো ভয়ানক?

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে তুষার বলে উঠলো, 'জানো প্রেমা,ভালোবাসার ব্যাখা ও রূপের বাহার পর্যবেক্ষণ করতে গেলে মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়।'

তুষারের গলার স্বরটা পরিবর্তন হয়েছে। কোমল হয়েছে! সে এতো পাল্টে গেল কী করে? প্রেমা বললো, 'কেন এমন হয়?'

তুষার শূন্যে চোখ রেখে বললো, 'ভালোবেসে মানুষ পাগল হয়,ভালো হয়,খারাপ হয়, নিঃস্ব হয় এমনকি নিজের জীবনকেও হত্যা করতে দুইবার ভাবে না! কী অদ্ভুত!'

তুষারের কথাগুলো প্রেমার ভালো লাগছে। সে তুষারের দিকে ফিরলো। তুষারও প্রেমার দিকে তাকালো। প্রেমা বললো, 'যে ফাঁসে সে জানে,ভালোবাসা বড়ই অদ্ভুত!'

কী সুন্দর কথা! কত মোহনীয় তার কণ্ঠ! তুষার ধীর স্বরে বললো, 'কাউকে ভালোবেসেছো?'

প্রশ্নটি শুনে প্রেমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে। সে দ্রুত অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজলো। কী করে সে বুঝাবে, তুষারের প্রেমে পড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়! তার ব্যথিত হৃদয় তারই অজান্তে তুষারের প্রেমে কবেই পড়েছে! তুষার প্রেমার পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার কেন যেন মনে হলো,প্রেমা তার চোখের দৃষ্টি আড়াল করেছে!

লিখনের মা ফাতিমা ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করছেন। তিনি তৃধার সাথে লিখনের বিয়ে ঠিক করেছেন। কিন্তু লিখন বিয়ে করবে না। সে পদ্মজার জন্য অপেক্ষা করছে। পদ্মজা জেল থেকে বের হলে তাকেই বিয়ে করবে। ফাতিমা একজন খুনি, বিবাহিত, এক বাচ্চার মাকে কিছুতেই ছেলের বউ হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। লিখন যেরকম নাছোড়বান্দা তার মা তেমন নাছোড়বান্দা। ফাতিমা কঠোরভাবে জানিয়েছেন, যদি লিখন পদ্মজাকে বিয়ে করে তিনি আত্মহত্যা করবেন। সম্মান নষ্ট হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়! এতেও লিখন ভ্রুক্ষেপ করলো না। সে পাগল হয়ে আছে। আমির নেই। এবার সে পদ্মজাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে। জীবন তাকে একটা সুযোগ দিয়েছে। সে সেই সুযোগ এড়াতে পারবে না। এতদিন দূরে থেকেছে পদ্মজার স্বামী ছিল বলে। এখন পদ্মজা একা। তার স্বামী মৃত। পদ্মজাকে বিয়ে করে

তাকে একটা নতুন জীবন উপহার দিবে,সেই সাথে নিজের ক্ষত হৃদয় সাড়িয়ে তুলবে। লিখন বৈঠকখানাতে গিয়ে বসলো। যেদিন জানলো পদ্মজা জেলে। সেদিন থেকে সে দৌড়ের উপর আছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। একদিকে পদ্মজার ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা অন্যদিকে মিথ্যা বদনামে তার ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার পথে! ভাগ্য সহায় ছিল,তাই দুটোর কোনোটিরই ক্ষতি হয়নি। এজন্য খোদার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া! দ্বিতীয় তলা থেকে ফাতিমার চিৎকার ভেসে আসে, 'এই মেয়ের জন্য আমার ছেলে জীবনে প্রথমবার আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল। এমন অশুভ মেয়েকে আমি আমার ছেলের জীবনে মেনে নেব না। তুমি তোমার ছেলেকে সামলাও।'

ফাতিমাকে তার স্বামী সামলানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না।

দরজায় কলিং বেল বেজে উঠে। আশেপাশে কেউ নেই। লিখন কয়েকবার তাদের বাসার কাজের মেয়েটিকে ডাকলো। তারও খোঁজ নেই। লিখন বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলতে গেল। দরজার সামনে তার বাড়ির দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা খাম। লিখন প্রশ্ন করলো, 'কে দিয়েছে?'

দারোয়ান বললো, 'তুষার সাহেব পাঠিয়েছেন।'

লিখন খামটি হাতে নিয়ে বললো, 'আচ্ছা,যাও।'

লিখন দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে আসে। খামটি বিছানায় উপর রেখে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে দেখার সময় সে তার পাশে পদ্মজাকেও দেখতে পায়। তার জীবনে কিছুর অভাব নেই। শুধু একটাই অভাব, পদ্মজার অভাব! সে তার পরনের শার্ট খুলে গোসলখানায় গেল। গোসল করে কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে তারপর খামটি হাতে নিল। খামের ভেতর চিঠি! লিখন আগ্রহ নিয়ে চিঠির ভাঁজ খুললো:-

সম্মানিত লিখন শাহ,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। সর্বপ্রথম বলতে চাই,আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি আপনাকে এবং আপনার অনুভূতিকে সম্মান করি। বাধ্য হয়ে কারাগারে থাকা অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে হলো। শুনেছি,আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আপনি আমাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু কিছু স্বপ্ন নিষিদ্ধ! আপনি এমন এক আশায় নিষ্পাপ একটি মনকে আঘাত করছেন যে আশা পূরণ হওয়ার নয়। আপনার সাথে আমার বিয়ে হলে আগেই হতো। আমার মনপ্রাণ একজনের প্রেমে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই কী করে আবার আপনি পুড়াবেন? মানুষ এক জীবনে সবকিছু পায় না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু না কিছুর অভাব থাকে। এক-দুটো অভাব নিয়ে বেঁচে থাকা খুব বেশি কঠিন নয়। যে আপনাকে ভালোবাসে তাকে আপনি ভালোবাসুন। যে আপনার জন্য মরতে প্রস্তুত তার জন্য বুকের এক টুকরো জায়গা দলিল করে দিন। তৃধা মেয়েটি ভীষণ ভালো। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে আপনাকে খুব ভালোবাসে। তার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার। অথচ,সে মেডিকেলের পড়া ছেড়ে মিডিয়ায় যোগ দিয়েছে! কতোটা ভালোবাসা থাকলে মানুষ এরকম করে? আপনি নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য তৃধা আপনাকে ভালোবাসে! সে আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। তৃধাই আপনাকে উজাড় করে ভালোবাসতে পারবে। আমাদের জুটি হওয়া সম্ভব নয়। এ স্বপ্নকে আর দূরে যেতে দিয়েন না। আমার সর্বত্র জুড়ে একটি নাম। আমি একটি মানুষের জন্যই আকুল। আমি হাজার চেষ্টা করেও আপনাকে এক টুকরো ভালোবাসা দিতে পারবো না। তখন ভালোবাসা অভিশাপে পরিণত হবে। চিন্তা করে দেখুন, আমাদের সত্যি বিয়ে হলে কেউ সুখী হবে না। না আপনি হবেন, না আমি হবো। আর না আপনার পরিবার আর তৃধা সুখী হবে। আমি বলছি না আমার কথায় তৃধাকে বিয়ে করতে,ভালোবাসতে। ভালোবাসা জোর করে হয় না। তবে বিয়েতে আল্লাহ তায়ালা নিজে রহমত ঢেলে দেন। ভালোবাসা ঢেলে দেন। জীবনকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন। আমার আম্মা

বলতেন,পৃথিবীতে মানুষ দায়িত্ব নিয়ে আসে। সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হয়তো আমার কোনো দায়িত্ব বাকি! তাই এখনো বেঁচে আছি। যদি সত্যি দশ বছর পর পৃথিবীর বুকে মুক্ত হয়ে হাঁটার সুযোগ পাই,আমি আপনাকে আমার পাশে দেখতে চাই না। আমি আমার স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। এই বাঁচায় সুখ না থাকুক,স্বস্তি আছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেই স্বস্তিটুকু কেড়ে নিবেন না। আপনি আমার জীবনের গল্পটির একটা পৃষ্ঠা মাত্র! আমি আমার শেষ জীবনটুকু নিজের মতো কাটাতে চাই। পাষাণের মতো কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত! আপনার জীবন ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠুক। পরিবারকে সময় দিন।

ইতি,

পদ্মজা

লিখনের চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল চিঠির উপর পড়ে! কী নিষ্ঠুর প্রতিটি শব্দ! লিখন চিঠিটি রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। ধূলো উড়িয়ে বাতাস ছুটছে। আজ রাতে ঝড় হতে পারে! তার বুকেও ঝড় বইছে। নিজেকে পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট মনে হচ্ছে! পদ্মজা তার জন্য চাঁদই রয়ে গেল আর সে গরীব ব্রাহ্মণ!

শেষ পর্বের দ্বিতীয় অংশ রাত নয়টার পর আসবে। পদ্মজা হাওলাদার বাড়ির যে খুনটা করেছিল বা যে অবস্থায় খুন করেছিল তাকে কাল্পেবল হোমিসাইড বলা হয়। এর সাজা সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন অথবা দশ বছরের জেল। কোর্ট চাইলে আরো কম সাজাও দিতে পারে।

শেষ পর্ব (দ্বিতীয় ও শেষ অংশ)

২০০৯ সাল। দেখতে দেখতে কেটে গেল তেরোটি বছর। পদ্মজা দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি কুয়াশা হাড় কাঁপানো শীত নিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। পদ্মজা দুই হাতে চাদর টেনে ধরলো। যত দূর চোখ যায় কেবল সবুজের হাতছানি। চা বাগানের সারি সারি টিলা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর ঘন সবুজ অরণ্য! আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কত সুন্দর! রঙহীন ধূসর কুয়াশাও চা বাগানের সৌন্দর্য আড়াল করতে পারলো না। কুয়াশার জন্য যেন অন্যরকম সুন্দর লাগছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য যে কাউকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম । তবে বৃষ্টিস্নাত পাহাড়ি সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি সুন্দর। পদ্মজা দুই পা তুলে বেতের চেয়ারে বসলো। তার মুখ শুষ্ক। আজ তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় প্রিয়তমর মৃত্যুবার্ষিকী! প্রিয়তম মারা গিয়েও যেন সর্বত্র বিছিয়ে রেখে গেছে ভালোবাসার ডালপালা। পদ্মজা সময়-অসময়ে,কারণে-অকারণে বার বার সেসব ডালপালার বেড়াজালে আটকে পড়ে। নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হয়।

পদ্মজা তার হাতের লাল খামটি থেকে দুটো চিঠি বের করলো। সে প্রতিদিন এই চিঠি দুটো পড়ে দিন শুরু করে। যতক্ষণ পড়ে,মনে হয় যেন আমিরের সাথে কথা বলছে! তার একদম পাশ ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে আমির বলছে, ',পদ্মবতী,ভালোবাসি।'

পদ্মজা চিঠি দুটিতে প্রথমে চুমু দিল। তারপর একটি চিঠির ভাঁজ খুললো। শুরুতে কোনো সম্বোধন নেই। অদ্ভুত একখানা চিঠি। চিঠিও বলা যায় না,এক পৃষ্ঠায় লেখা এক রাজা ও রানির গল্প। পদ্মজা পড়া শুরু করলো-

"এক ছিল দুষ্টু রাজা! নারী আর টাকার প্রতি ছিল তার চরম আসক্তি। যে নারী একবার তার বিছানায় যেত তার পরের দিন সে লাশ হয়ে নদীতে ভেসে যেত। রাজা এক নারীকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পছন্দ করতো না। কিন্তু সমাজে ছিল রাজার বেশ নামডাক! সবার চোখের মণি। খুন করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার কালো হাতের ছোঁয়ায় বিসর্জন হয়েছে শত শত নারী। প্রতিটি বিসর্জন রাজার জন্য ছিল তৃপ্তিকর। নারী ব্যবসায় লাভবান হয়ে গড়ে তুলে প্রাসাদের পর প্রাসাদ! একদিন চাচাতো ভাইয়ের সাথে বাজি ধরে হেরে গেল রাজা। শর্তমতে,ভাইয়ের জন্য এক রাজকন্যাকে অপহরণ করতে যায়। সেদিন ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। রাজকন্যার প্রাসাদে সেদিন কেউ ছিল না। রাজা এক কামরায় ওৎ পেতে থাকে। রাজকন্যা আসলেই তাকে তার কালো হাতে অপবিত্র করে দিবে। কামরায় ছিল ইষৎ আলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত আসে। রাজকন্যার পা পড়ে কামরায়। রাজকন্যা রাজাকে দেখে চমকে যায়। ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে "'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?" সেই কণ্ঠ যেন কোনো কণ্ঠ ছিল না। ধনুকের ছোঁড়া তীর ছিল। রাজার বুক ছিঁড়ে সেই তীর ঢুকে পড়ে। রিনঝিনে গলার রাজকন্যাকে দেখতে রাজা আগুন জ্বালায়। আগুনের হলুদ আলোয় রাজকন্যার অপরূপ মায়াবী সুন্দর মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পা দুটো থমকে যায়। রাজকন্যা যেন এক গোলাপের বাগান। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে রাজার কালো অন্তরে। রাজা নেশাগ্রস্তের মতো উচ্চারণ করলো নিজের নাম। নাম শুনেও রাজকন্যার ভয় কমলো না। পালিয়ে গেল অন্য কামরায়। রাজা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না রাজকন্যার মুখ। তার চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে যায়। রাজকন্যার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। সেদিনই ঘটে গেল দূর্ঘটনা। রাজ্যবাসী শূন্য প্রাসাদে দুষ্টু রাজা ও মিষ্টি রাজকন্যাকে এক সঙ্গে দেখে ফেললো। রাজকন্যার গায়ে লেগে গেল কলঙ্ক। কয়েকজন অমানুষ রাজকন্যাকে নোংরা ভাষায় হেনস্তা করলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজার বুকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সে নিজ প্রাসাদে ফিরে এক দণ্ডও শান্তি পেল না। তার চাচাতো ভাইকে তাৎক্ষণিক আদেশ করলো যারা রাজকন্যাকে তাদের মুখ দিয়ে অপমান করেছে তাদের যেন জিহবা ছিঁড়ে ফেলা হয়,যে হাত দিয়ে রাজকন্যাকে ছুঁয়েছে সে হাত যেন কেটে দেয়া হয়, যে চোখ দিয়ে রাজকন্যাকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে সে চোখ যেন উপড়ে ফেলা হয়। ভোররাতে দুষ্টু রাজা খবর পেল, রাজকন্যার মাতা সেই অমানুষ দের হত্যা

করেছে। এতে রাজা খুশি হলেও রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে একটা চাপা ভয় কাজ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে ভাবলো না। রাজকন্যাকে যে ভোলা যাচ্ছে না। তাকে যে করেই হউক পেতে হবে৷ নয়তো জীবন বৃথা। রাজা তার পিতাকে আদেশ করলো, মায়াবতী রাজকন্যাকে তার চাই ই চাই। নয়তো সে বাঁচবে না। এই পৃথিবী তোলপাড় করে দিবে৷ রাজার পাগলামি দেখে অবাক তার পরিবার। সালিশ বসে। সালিশে সেই দুষ্টু রাজা রাজকন্যার মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়ে,জিতে নিল রাজকন্যাকে। তিনি এক কথায় রাজকন্যাকে দিতে রাজি হলেন। আনন্দে রাজার বুকে উথাল ঢেউ শুরু হয়। কী অসহ্য সুখময় যন্ত্রণা! রাজা এর আগে এতো খুশি হয়েছে নাকি জানা নেই! যথাসময়ে তাদের বিয়ে হলো। রাজকন্যা রাজার রানী হলো। নাম তার পদ্মবতী। ফুলের মতো পবিত্র সে,সদ্যজাত শিশুর মতোই নিষ্পাপ। রাজা ভুলে গেল নারী সঙ্গের কথা,ভুলে গেল তার রাজত্বের কথা। তার ধ্যানজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে গেল পদ্মবতীতে। পদ্মবতীর একেকটা কদম রাজার বুকে ঢেউ তুলে,পদ্মবতীর প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ে। পদ্মবতীর পায়ে চুমু দেয়ার সময় রাজার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, 'পদ্মবতী...আমার রানী,আমি কাঁটা বিছানো বাগানে শুয়ে থাকি তুমি আমার বুকে হেঁটে বেড়াও।'

ধীরে ধীরে রাজা উপলব্ধি করতে পারলো, তার পদ্মবতী পবিত্র। এতোই পবিত্র যে সে কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না। এই পবিত্রতা রাজাকে আরো আকৃষ্ট করে ফেললো। সেই সাথে রাজা ভয় পেল,তার কালো অন্তরের খবর যদি পদ্মবতী জেনে যায় তখন কী হবে? কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ধরে বেঁধে রাখা গেলেও পদ্মবতীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই বিচ্ছেদ সহ্য করার ক্ষমতা তার হবে না। নির্ঘাত মরে যাবে। যে ভালোবাসা নিজ ইচ্ছায় তাকে বিমুগ্ধ করে তুলে,সে ভালোবাসা জোর করে সে কখনো নিতে পারবে না। রাজা তার পাপ লুকিয়ে রাখতে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা অভিনয় করা শুরু করলো। পদ্মবতীর থেকে সহানুভূতি আর বিশ্বাস অর্জন করতে গল্প বানালো৷ তার পাপের মহলে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিল। প্রয়োজনে সে পৃথিবীর প্রতিটি মানব সন্তানকে খুন করতে প্রস্তুত,তাও তার পাপের জন্য পদ্মবতীকে হারাতে চায় না। যথাসম্ভব পদ্মবতীকে নিয়ে দুষ্টু রাজা অন্য রাজপ্রাসাদে চলে আসে। সেই প্রাসাদে রাজা আর তার পদ্মবতী ছাড়া কেউ নেই! ভালোবাসার সোহাগ ও খুনসুটিতে ভরে উঠে তাদের ঘর। রাজার দৃষ্টি ডুবে যায় একজনেতে! কোনো নারী আর তাকে টানতে পারলো না। প্রতিটি প্রহর পদ্মবতীকেই নতুন করে অনুভব করে। নারী আসক্তি চিরতরে তাকে ছেড়ে গেল। কিন্তু নারী ব্যবসা রয়েই গেল। সৎ পেশার অজুহাতে অসৎ পেশা জ্বলজ্বল করে তখনো জ্বলছিল। মাঝেমধ্যে রাজার ভয় হতো,পদ্মবতী সব জেনে যাবে না তো? রাজা সব রকম পট্টি বেঁধে দিল পদ্মবতীর চোখে। পদ্মবতী সেই পট্টিসমূহ ভেদ করে পৌঁছাতে পারলো না গভীরে! ভালোবাসার বেড়াজালেই আটকে রইলো।

বছর দেড়েক পর তাদের ঘর আলো করে এলো এক রাজকন্যা। রাজকন্যা ছিল মায়ের মতোই সুন্দর। আকাশে একটা চাঁদ উঠে,কিন্তু রাজার আকাশে উঠেছিল দুটো চাঁদ! ছোট্ট রাজকন্যাকে দেখে রাজার বুক কেঁপে উঠে। তৃতীয়বারের মতো কোনো মেয়ের প্রতি সে ভালোবাসা অনুভব করে। তার প্রথম ভালোবাসা তার মা,দ্বিতীয় ভালোবাসা স্ত্রী, আর তৃতীয় ভালোবাসা তার কন্যা! রাজা যতবার রাজকন্যাকে কোলে নিত, বুকে একটা ব্যথা অনুভব করতো। বার বার মনে হতো, আমার জগৎ-সংসার একটু সাধারণ হতে পারতো না? এই চিন্তা তার অসৎ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার দলবল চিন্তিত হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি রাজার উদাসীনতা তাদের ক্ষিপ্ত করে। পূর্ব ক্ষোভের জেদ ধরে তারা রাজার দুর্বলতা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারে। সেই তীরে ছোট্ট রাজকন্যার প্রাণের আলো নিভে যায়। রাজার বুক থেকে একটা চাঁদ খসে পড়ে! পদ্মবতী ভেঙে গুড়িয়ে যায়। পদ্মবতীর ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা রাজার নেই। শক্ত দুই হাতে আঁকড়ে ধরে পদ্মবতীকে। তার কন্যার খুনিকে সে নিজ হাতে কোপাতে পারলেও,খুনের আদেশ দাতাদের হত্যা করতে পারলো না।

জানতে পারলো তার পিতা,চাচা ও চাচাতো ভাইয়ের আদেশে তার রাজকন্যার চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে! ততদিনে রাজা এটাও বুঝে গেল, যে জগতে সে প্রবেশ করেছে সেই জগতের শেষ পরিণতি মৃত্যু। সে যদি খুনের আদেশ দাতাদের ক্ষতি করে তার ব্যবসা ডুবে যাবে৷ ব্যবসার খুঁটি সে হলেও, আদেশ দাতারা সেই খুঁটি ধরে রেখেছে। আর ব্যবসার পতন মানে পদ্মবতীর সব জেনে যাওয়া। সেই সাথে অন্য রাজাদের ক্ষোভের শিকার হওয়া। যে রাজাদের সাথে মিলে দুষ্টু রাজা পাপ জমায় তারা হিংস্র হয়ে উঠবে। আর তারা দুষ্টু রাজার উপর ক্ষিপ্ত হলে ক্ষতি হবে পদ্মবতীরও। এতোজনকে রুখতে যাওয়ার ক্ষমতা দুষ্টু রাজার নেই। আবার মাথার উপর আছে শাসকের আদালত! একমাত্র রাজার মৃত্যু পারে তার কন্যার খুনীদের ধ্বংস করতে। কিন্তু রাজা নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় না। পদ্মবতীর সাথে সারাজীবন বাঁচতে চায়। তাই রাজা ধামাচাপা দিল রাজকন্যার ব্যথা! বাবা হিসেবে হেরে গেল,চুপসে গেল। অভিশাপ সেই রাজাকে। অভিশাপ!

পদ্মজা চিঠির উপর হাত বুলিয়ে দিল। যখন সে প্রথম এই বাস্তব রূপকথা পড়েছিল,সাদা অংশে শুকনো রক্ত লেগে ছিল। তার প্রিয় স্বামীর রক্ত! আমিরের শরীরে পাওয়া গেছে অগণিত কামড়ের দাগ,চাবুক মারার দাগ,ছুরির আঘাতের দাগ। সে নিজেকে শেষ দিনগুলোতে অনেক আঘাত করেছে। নিজেকে রক্তাক্ত করে পাতালঘরে আর্তনাদ করেছে। পদ্মজা হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে দ্বিতীয় চিঠিটি হাতে নিল। ভাঁজ খুললো,

প্রিয়র চেয়েও প্রিয় পদ্মবতী,

আমার পাপের রাজত্বে তোমার আগমন ভূমিকম্পের মতো ছিল। যখনই দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো,আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখের সামনে ছয় বছরে গড়ে তোলা ভারী দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আমার চোখের মণি পদ্মজা,তোমার ওই দুচোখের অবিশ্বাস্য চাহনি আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। আমার কথা হারিয়ে যায়। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। খারাপের মাঝেও ভালো থাকার মন্ত্র ছিল তোমার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে যখন ঘৃণা দেখতে পাই,আমার বুক পুড়ে যায়। আমার মস্তিষ্ক ফেটে যায়!তোমার আহত মুখশ্রী দেখে আমার শরীরের চামড়া ঝলসে যায়। তোমার চোখের জল দেখে সমুদ্র আছড়ে পড়ে মাথার উপর। আমার মিথ্যাচার, আমার প্রতারণা তোমাকে কষ্টের ভুবনে ছুঁড়ে ফেলে। বিষাদের ছায়া ঢেকে যায় তোমার চোখ। সেই বিষাদটুকু মুছে দেয়ার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলি। যদি পারতাম আকাশের মেঘ হয়ে তোমার কাজলকালো আঁখি ছুঁয়ে সবটুকু বিষাদ ধুয়েমুছে সাফ করে দিতাম।

আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা, তুমি একটু দূরে সরলেই যে আমি মনে মনে পুরো পৃথিবী ভস্ম করে দেয়ার ইচ্ছে পুষি, সেই আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম,তোমার-আমার পথচলা এখানেই শেষ! আমি শান্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে যাই। গন্তব্য হারিয়ে ফেলি। এই ভুবনে তুমি আমার শেষ আশ্রয়স্থল ছিলে। আম্মার সাথে তখন যোজন যোজন দূরত্ব। তোমার ঘৃণাভরা চাহনি আমাকে চোখের পলকে পুড়িয়ে দেয়৷ তোমার আমার বিচ্ছেদ আমাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, প্রেমানলে জ্বলতে জ্বলতে আমি অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছি।

সোনালি রোদ্দুরের মতো সুন্দর পদ্মবতী, আমি তোমাকে আঘাত করে নিজে মরে গিয়েছি। যে হাতে আঘাত করেছি সেই হাত পুড়ে যাক,পোকামাকড় খাক! তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি ভালো নেই। ছুরির আঘাতও আমার মনের ব্যথার চেয়ে বেশি হতে পারছে না। যদি পারতাম হয় তোমাকে ভালোবাসতাম ,নয় শুধু হাওলাদার বংশে জন্ম নিতাম। দুটো একসাথে গ্রহণ করতাম না। দুই সত্ত্বা মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বে আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি নিষ্ঠুর,তুমি মায়াবতী
আমি ধ্বংস,তুমি সৃষ্টি
আমি পাপ,তুমি পবিত্র

এতো অমিলে কেন হলো মিলন? কেন কালো অন্তরে ছড়িয়েছিল ফুলের সুবাস? আমাকে ধ্বংস করার কি অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না? এমন কঠিন কষ্ট কেন দেয়া হচ্ছে আমাকে? তোমার ব্যথায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। তোমার কান্না,তোমার আর্তনাদ আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনকে কাঁপিয়ে তুলে। মনে হয়,মাথার ভেতর পোকারা কিলবিল করছে। বিচ্ছেদের বিষাক্ত ছোবলে নীল হয়ে যাচ্ছি আমি। আমাকে বাঁচাও!

শূন্য আকাশে গাঙচিল যেমন একা আমিও তেমন একা। প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে। একাকী নীরবে সহ্য করি। এটাই তো আমার প্রাপ্য। মেয়েগুলোকে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারিনি। বুকের উপর পাথর চেপে পাঠিয়ে দিয়েছি বহুদূরে। যখন তাদের জাহাজে তুলে দিয়েছি আমার দিকে করুন চোখে তাকিয়ে ছিল। ব্যথিত হৃদয় প্রথমবারের মতো অনুভব করে, তারাও তো আমার মতো কষ্ট পাচ্ছে! কিন্তু তখন আমার আর সামর্থ্য ছিল না।

আমার জীবনের বসন্তকাল তুমি। তোমার অসহ্য আলিঙ্গন আমার সহ্যের বাইরে ছিল। তোমার আর্তনাদ করে পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। সত্যি যদি পারতাম,পালিয়ে যেতে! কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। আমার আকাশ সমান পাপ আমার পিছু ছাড়বে না। আজীবন দৌড়াতে হবে। এক দন্ডও শান্তি মিলবে না।

মেঘলা বরণ অঙ্গের সাম্রাজ্ঞী, তোমার ভালোবাসার সাম্রাজ্যে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম শত জনম। হলো না। তোমার চোখের খাদে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম আজীবন। তাও হলো না। সময় এসেছে আমার বিদায়ের! আমাদের পথচলা এতটুকুই। আমি ছিলাম দূর্গের মতো কঠিন। সেই দূর্গ তুমি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছো। ভালোবাসা আমার হাঁটু ভেঙে দিয়েছে। আমার আর উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। শেষ বারের মতো তোমাকে ছুঁয়ে যেতে চাই। আমার প্রেম তুমি,আমার ভালোবাসা তুমি। সত্যি বলছি,আমার জীবনে আসা প্রতিটি নারী আমাকে নয় আমার হারাম টাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের আমি কিনে নিয়েছি। শারমিন আর মেহুল দুজনকে বাড়ি উপহার দিয়ে তারপর আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে। তাও আমি অপরাধী। আমি তাদের ঠকিয়েছি, প্রতারণা করেছি,খুন করেছি। আমি অনুতপ্ত। বড্ড আফসোস হচ্ছে,বড্ড আক্ষেপ থেকে গেল। ওপারেও আমি তোমাকে পাবো না! আমার মতো ঘৃণিত ব্যাক্তি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আমার জায়গা হবে,জাহান্নামের কোনো এক দুর্গন্ধময় জগতে! তোমাকে দেখার তৃষ্ণা, তোমাকে ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মিটলো না। হয়তো সহস্র বছরেও মিটবে না।

আমার হৃদয়ের রঙহীন বাগানের রঙিন প্রজাপতি, সাদা শাড়িকে তোমার সঙ্গী করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুঃখিত। তুমি মুক্ত হবে। পাখির মতো উড়বে। শুধু আমি থাকবো না পাশে। আফসোস!

চিঠির শেষ প্রহরে এসে হাত কাঁপছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমি আরেকটু থাকতে চাই। এই পৃথিবীর সবুজ বুকে তোমাকে নিয়ে প্রতিটি ভোর হাঁটতে চাই। আমাদের ভালোবাসার জ্যোৎস্না রাতগুলো আরেকটু দীর্ঘ হলে কী এমন হতো? আমাদের প্রেমের পরিণতি এতো নিষ্ঠুর কেন হলো?
তোমার ওই ঘোলা চোখের মায়াজাল ছেড়ে চলে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেতে হবেই। আর থাকা যাবে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার কোনো ক্ষতি হওয়ার আগে,আমাকে সব কীটদের নিয়ে এই পৃথিবী ছাড়তে হবে।

আমার আঁধার জীবনের জোনাকি, সৃষ্টিকর্তাকে বলো আমাকে যেন আরেকটা সুযোগ দেয়া হয়। এই পৃথিবীতে আবার যেন পাঠানো হয়।

পৃথিবীর বুকে তো জায়গা, সম্পদের অভাব নেই। আরেকটা জীবন কি পেতে পারি না? তখন আমি কঠিন পরীক্ষা দেব। তোমাকে পেতে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটবো, ভাঙা কাচের ধারে পা ছিন্নভিন্ন করে হলেও তোমাকে জিতে নেব। থাকবে না কোনো অন্ধকার জগতের হাতছানি,তৈরি হবে তোমার আমার প্রেমের উপাখ্যান। আমাদের ভালোবাসা দেখে জ্যোৎস্না

ও তারকারাজি ঝলমলিয়ে ওঠবে।

আমাদের আবার দেখা হবে। কোনো না কোনো ভাবে আবার দেখা হবে। দেখা হতেই হবে। নিজের খেয়াল রেখো। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করো। পূর্ণা,মা হেমলতার কাছে নিশ্চয়ই ভালো আছে। চিন্তা করো না। পারলাম না আরো কয়টা দিন তোমাকে আগলে রাখতে। ক্ষমা করো আমায়। অতৃপ্ত আমি মৃত্যুকে তৃপ্তি হিসেবে গ্রহণ করছি।

ইতি,

আমির হাওলাদার ”

চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠে,আমিরের শেষ চাহনি। রক্ত বমি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়া! ভেসে উঠে সেই শিশি। যে শিশির উপরে বড় বড় করে লেখা ছিল Poison (বিষ)। পদ্মজা দুটো চিঠি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। তারপর শূন্য আকাশে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই চিঠি যেদিন প্রথম পড়লো সে,চিৎকার করে কেঁদেছে। সে আমিরকে খুন করে অনুতপ্ত নয়। সে কাঁদে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে!

দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। পদ্মজা দ্রুত চিঠি দুটো ভাঁজ করে খামের ভেতর রেখে দিল। গলার স্বর উঁচু করে বললো, 'বলো বুবু।'

দরজার ওপাশ থেকে লতিফার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'মাহবুব মাস্টার আইছে?'

পদ্মজা বললো, 'নাস্তা তৈরি করো। আমি আসছি।'

পদ্মজা চোখের পানি মুছে ঘরে আসলো। আয়নায় দেখলো,সে যে কেঁদেছে বুঝা যাচ্ছে নাকি। না বুঝা যাচ্ছে না। গায়ের শালটি রেখে আলনা থেকে আরেকটি কালো শাল নিয়ে ভালো করে মাথা ঢেকে নিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। বৈঠকখানার সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

মাহবুব মাস্টার বসে আছেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি অংকের মাস্টার। পদ্মজা আর তিনি এক স্কুলের শিক্ষক। ভালো পড়ান। তার সামনে বসে আছে তিনটি ছেলেমেয়ে। এই তিনজনকে পড়ানোর জন্যই পদ্মজা মাহবুব মাস্টারকে ডেকেছে। মাহবুব মাস্টার বারো বছরের ছেলেটিকে আগে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটি প্রবল উৎসাহ নিয়ে বললো, 'আমার নাম নুহাশ হাওলাদার। আর ওর নাম...'

মাহবুব নুহাশকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'তুমি শুধু তোমার নাম বলো। অন্যজনেরটা বলতে বলিনি। কাঁটা থুতুনি তোমার নাম কী?'

'আমীরাতুন নিসা নুড়ি।'নুড়ি অবাক হওয়ার ভান করে নিজের নাম বললো। তার থুতনিতে গর্ত আছে বলে কি তাকে কাঁটা থুতুনি ডাকতে হবে! সে মনে মনে ব্যথা পেয়েছে। নুড়ির পাশে বসে থাকা দশ বছরের মেয়েটি বললো, 'আমার নাম জিজ্ঞাসা করছেন না কেন? আমি সবার ছোট। আমার নাম খাদিজাতুল আলিয়া।'

মাহবুব মাস্টার চোখের চশমা ঠিক করে বললেন, 'ভীষণ বেয়াদব তো! এতো অধৈর্য্য কেন তুমি?'

নুহাশ আলিয়ার মাথায় থাপ্পড় দিয়ে বললো, 'মা কী বলছে মনে নেই? বেশি কথা বলতে নিষেধ করেনি?'

আলিয়া কটমট করে নুহাশের দিকে তাকালো। নুহাশ বললো, 'খেয়ে ফেলবি আমাকে?'

আলিয়া খামচে ধরলো নুহাশের মাথার চুল। নুহাশও আলিয়ার চুল খামচে ধরে। দুজন ধস্তাধস্তি করে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। তারা দুজন কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলে। মাহবুব মাস্টার আঁতকে উঠলেন,হইহই করে চিৎকার করে উঠলেন। পদ্মজা পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নুহাশ ও আলিয়া থেমে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নুড়ি দুই চোখ খিঁচে চাপাস্বরে নুহাশকে বললো, 'দিলি তো মা কে রাগিয়ে!'

মাহবুব মাস্টার হতবাক! পদ্মজার মতো নম্রভদ্র শিক্ষিকার এমন উশৃংখল ছেলেমেয়ে! তিনি চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, 'এত অসভ্য এরা!'

পদ্মজা শীতল চোখে নুহাশ ও আলিয়ার দিকে তাকালো। তারা নতজানু হয়ে আছে।

পদ্মজা বললো, 'সবাই ভেতরে যাও।'পদ্মজার কণ্ঠে রাগের আঁচ। তা টের পেয়ে আলিয়ার চোখে জল জমে। প্রায় প্রতিদিন নুহাশ আর তার ঝগড়া হয়। ঝগড়ার জন্য শাস্তি পায় তবুও ভুলে ভুলে আবার ঝগড়া করে ফেলে। তারা চুপচাপ ঘরের ভেতর চলে গেল। পদ্মজা মৃদু হেসে মাহবুব মাস্টারকে বললো, 'ওরা একটু ক্ষেপা ধরণের। ভাইবোন একসাথে থাকলে যা হয়!'

'শয়তানদের মেরুদণ্ড সোজা করতে করতে চুল পেকেছে আমার। এদেরও কয়দিনে সোজা করে ফেলবো।'

'আগামীকাল থেকে আর দুষ্টুমি করবে না। আপনি একটু ভালো করে পড়াবেন। আমার তিনটা ছেলেমেয়েই অংকে কাঁচা।'

'আপনি আমাকে বলেছেন, এতেই যথেষ্ট। অংক ওদের প্রিয় সাবজেক্ট না বানাতে পারলে আমি মাহবুব মাস্টার না।'

পদ্মজা জোরপূর্বক হাসলো। মাহবুব মাস্টার একটু বেশি কথা বলেন। যাওয়ার পূর্বে মাহবুব মাস্টার বলে গেলেন, আগামীকাল থেকে প্রতিদিন সকাল সাতটায় অংক পড়াতে আসবেন।

পড়ন্ত বিকেল! আলিয়া ছবি আঁকছে। সে খুব ভালো ছবি আঁকে। বর্ণনা শুনে হুবহু ছবি আঁকতে পারে! গায়ের রং শ্যামলা। তার নাম আমিরের নামের সাথে মিল রেখে আলিয়া রাখা হয়েছে। পদ্মজা পাঁচ বছর জেলে ছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার নিঃস্ব জীবনে রুম্পার ছেলে নুহাশের আগমন হয়৷ রুম্পা নুহাশকে জন্ম দিয়েই মারা যায়। চার-পাঁচ বছর লতিফা আর বাসন্তী নুহাশকে দেখেছে। তারপর পদ্মজা দায়িত্ব নিলো। নুহাশ আর লতিফাকে নিয়ে চলে আসে চা বাগানের দেশ সিলেটে। তার নামে যত সম্পত্তি আমির লিখে দিয়েছিল সেসব পদ্মজা সরকারের দায়িত্বে দিয়েছে।এবং অন্দরমহল ও অলন্দপুরের জমিজমা বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে এতিমখানা,মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেছে। গরীবদের খাবার,জামা-কাপড় দান করেছে। একটি পয়সাও নিজের জন্য রাখেনি। খালি হাতে সিলেট এসেছে। সিলেটে পদ্মজার রেনু নামে এক বান্ধবী ছিল । তারা একসাথে ঢাকা পড়েছে। রেনুর সহযোগিতায় পদ্মজা একটা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক হয়। মাস তিনেক পার হতেই পদ্মজা অনুভব করলো,তার বেঁচে থাকা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। তাই নুহাশকে নিয়ে ঢাকা ঘুরতে যায়। কথায় কথায় পদ্মজা তুষারকে জানালো,সে একটা মেয়ে বাচ্চা দত্তক নিতে চায়। তুষার এ কথা শুনে বললো,পদ্মজা চাইলে তাদের এলাকার এতিমখানা থেকে বাচ্চা নিতে পারে। তুষারের ভালো পরিচিতি আছে। প্রতি মাসে সে তার বেতনের একাংশ এতিমখানায় দেয়। পদ্মজা কথাটি শুনে খুব খুশি হলো। তুষারের সাহায্যে এতিমখানা থেকে আড়াই বছরের এক শ্যামবর্ণের মেয়েকে দত্তক নিয়ে নিজের মেয়ে মনে করে বুকে জড়িয়ে নেয়। নাম দেয়,খাদিজাতুল আলিয়া। যেদিন আলিয়াকে নিয়ে বাসায় আসে সেদিন রাতে টের পেল,আলিয়ার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। পদ্মজা এরপর দিন সকালে আবার এতিমখানায় গেল। আলিয়ার শ্বাসকষ্ট নিয়ে কথা বলতে। তারা চিকিৎসা করেছে নাকি? ঔষধের নামগুলো কী?

সব জেনে যখন সে এতিমখানা থেকে বের হতে উদ্যত হলো তখন তার পিঠের উপর একটা নুড়ি পাথর এসে পড়ে। পদ্মজা পিছনে ফিরে নুহাশের বয়সী একটা মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটির থুতনির গর্তটি তার পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে তুলে। হুবহু আমিরের কাঁটা দাগটির মতো! এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়,তার আর আমিরের সন্তান দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠে। মেয়েটি দৌড়ে পালায়। পদ্মজা মেয়েটিকে খুঁজে বের করে। তারপর এতিমখানার দায়িত্বে থাকা কতৃপক্ষকে অনুরোধ করলো, এই মেয়েটিকেও সে দত্তক নিতে চায়। পদ্মজার দূর্বলতা টের পেয়ে লোকটি,বিরাট অংকের টাকা চেয়ে বসে। পদ্মজা বাধ্য হয়ে আশা ছেড়ে দেয়। তবে যে কয়টাদিন ঢাকা ছিল,নিজের অজান্তে বোরকা পরে বার বার এতিমখানার সামনে গিয়ে ঘুরঘুর করেছে। তারপর ফিরে

আসে সিলেট। মাস তিনেক অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চা মেয়েটির মুখ ভুলতে পারলো না। তার বুকের ভেতর ছোট মেয়েটি যেন আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। পদ্মজা আবার ঢাকা গেল। নিজ থেকে তুষারকে বললো মেয়েটিকে আনার ব্যবস্থা করে দিতে। তুষার ও প্রেমা দুজনই পদ্মজার অস্থিরতা গভীর ভাবে টের পেল। তুষার দ্রুত সম্ভব মেয়েটিকে নিয়ে আসে। মেয়েটিকে হাতের কাছে পেয়ে পদ্মজা কেঁদে দেয়। খুশিতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। নুড়ি পাথরের জন্য মেয়েটিকে পাওয়া বলে,তার নাম দিল আমীরাতুন নিসা নুড়ি।

এই হলো পদ্মজার তিন সন্তানের মা হওয়ার গল্প। সিলেটে তাকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সব সমস্যা পেরিয়ে আজ সে এক বেসরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষিক। বিশাল চা বাগানের মধ্যিস্থলে এক কোয়ার্টারে তারা থাকে। তাদের বাড়িটি এক তলা।

পদ্মজা রাতের রান্না করছে। আলিয়া ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে পদ্মজাকে দেখছে। নুহাশ ভয়ে তাকাচ্ছেই না। পদ্মজা যখন রেগে যায়। কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আর পদ্মজা দূরত্বের রেখা টেনে দিলে তার তিন ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। নুড়ি আড়চোখে পদ্মজাকে দেখে আলিয়াকে ফিসফিসিয়ে বললো, 'মা কষ্ট পেয়েছে।'

আলিয়ার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'আমি মা কে কষ্ট দিতে

চাইনি।'

নুহাশ ব্যথিত স্বরে তাল মিলালো, 'আমিও চাইনি।'

আলিয়া চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার জন্য হয়েছে ভাইয়া৷ তুমি আমাকে রাগিয়েছো।'

নুড়ি ঠোঁটে এক আঙুল রেখে ইশারা করে চুপ হতে৷ আলিয়া দ্রুত এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে। সে ভুলে ভুলে আবার চিৎকার করে উঠেছে! নুহাশ ঠোঁট টিপে হাসলো। আলিয়া ভুল করলে তার ভালো লাগে। নুড়ি রান্নাঘরে গিয়ে পদ্মজাকে বললো, 'মা, আমি সাহায্য করবো?'

পদ্মজা বললো, 'না মা,আমি আর তোমার লুতু খালামনি আছি। বই পড়তে বলেছিলাম পড়া হয়েছে?'

নুড়ি জিহবা কামড়ে বললো, 'আল্লাহ! ভুলে গেছি মা।'

'কতদিন বলেছি,ছুটির দিন পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে? ভুলে গেলে চলবে? আমাদের ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।'

নুড়ি মিইয়ে যাওয়া গলায় বললো, 'আর ভুল হবে না।'

পদ্মজা নুড়ির দিকে তাকালো। সবেমাত্র বয়সসন্ধিকালে পা দিয়েছে মেয়েটা। তার ফর্সা সাধারণ মুখশ্রী থুতুনিতে থাকা খাঁচ কাঁটা দাগটির জন্য অসাধারণ হয়ে উঠেছে। মাথায় চুল কোঁকড়া। হাত-পা চিকন চিকন। নুড়ি পদ্মজাকে এভাবে তাকাতে দেখে বিব্রতবোধ করলো। পদ্মজা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বললো, 'বাঁদর দুটোকে গিয়ে বল,যদি আমার হাতে মার খেতে না চায় অযু করে জায়নামাযে যেন বসে। এক্ষুনি মাগরিবের আযান পড়বে।'

নুড়ি মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পদ্মজা চোখ ছোট করে বললো, 'কী হলো?'

'মা, আমি নামায আদায় করতে পারবো না।'

পদ্মজা রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল,তখনই বুঝতে পারলো নুড়ি কেন নামায আদায় করতে পারবে না। সে আমুদে স্বরে বললো, 'ও তাহলে আপনি এজন্যই আজ এতো চুপচাপ?'

নুড়ি দাঁত বের করে হাসলো। নুহাশ,আলিয়ার চেয়েও নুড়ি বেশি দুষ্টু ৷ রাগ,জেদ খুব বেশি। তবে পদ্মজার সামনে ভেজা বিড়াল। সে আর যাই করুক,পদ্মজাকে কখনো কষ্ট দিতে চায় না। নিজের অজান্তেও না।

রাতের খাবার পরিবেশন করার সময় লতিফা বললো, ‘প্রান্ত কোনদিন আইবো কইছে?’

‘আগামী মাসে আসবে। ভাবছি, এইবার গ্রামে গিয়ে প্রান্তর বিয়ে দেব। জমিজমা নিয়েই সারাক্ষণ পড়ে

থাকে। ধরেবেঁধে বিয়ে দিতে হবে।’

‘বউ কোন এলাকার আনবা?’

পদ্মজা হাসলো। বললো, ’প্রান্ত যা চায়।’

ধপাস করে কিছু একটা পড়ে! নুহাশ আর আলিয়া আবার দুষ্টুমি শুরু করেছে। লতিফা বিরক্তি নিয়ে বললো, ‘ওরা দিন দিন খালি শয়তান অইতাছে।’

‘শয়তান বলতে মানা করেছি। আল্লাহর রহমতে আমার ছেলেমেয়েরা আমার গর্ব হবে। আমি টের পাই।’

পদ্মজা এই তিন বাঁদর ছেলেমেয়ের মুখে অলৌকিক কী দেখেছে লতিফার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানে,এরা তিনজন যেখানে যায় সে জায়গায় তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। লতিফা জোর গলায় বললো, ‘দেহো পদ্মজা,আমি কিন্তু হুদাই কইতাছি না। দিন দিন আরো বিগড়ে যাইবো।’

পদ্মজা লতিফার কথা পাত্তা দিল না। সে খাবার পরিবেশন শেষে ঘরে চলে যায়। একদিন নুহাশ ও আলিয়াকে রাগ দেখিয়ে চলতে হবে। নুহাশ খাবার খেতে এসে বললো, ‘লুতু খালামনি,মা খাবে না?’

লতিফা বললো, ’না,খাইবো না। তোমরা দুইডায় যেমনে মাস্টারের সামনে পদ্মর মুখ কালা করছো। পদ্ম খাইবো কেন? হে গুসা করছে।’

আলিয়া পদ্মজার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘তাহলে আমরাও খাব না।’নুড়ি বললো, ‘তাহলে আরো বেশি রাগ করবে। আরো বেশি কষ্ট পাবে।’মনে ব্যথা নিয়ে মুখ গুমট করে তারা দুজন খেল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে তিনজন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা প্রতিদিন ঘুমাবার পূর্বে তাদের গল্প বলে। গত এক মাস ধরে পদ্মজা একটা গল্প বলছে। গল্পটা এক দুষ্টু রাজা ও এক মিষ্টি রানির। ভালোবাসা সত্ত্বেও রানি রাজাকে খুন করে। তারপর রানির কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড হওয়ার পর কখন মুক্তি পেল? পরের জীবনটা কীভাবে কাটলো? বললো না পদ্মজা। সেটা জানার জন্য তিনটি ছেলেমেয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে। পদ্মজা বলেছিল আজ বলবে, কিন্তু বলার সুযোগই পেল না। নুহাশ ও আলিয়া রাগিয়ে দিল। নুড়ি দরজা লাগিয়ে নুহাশ ও আলিয়াকে ডাকলো। একত্রে বসার পর নুড়ি বললো, ’আজ বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। তাই কিছু বলার দরকার নেই। কাল সকালে তোরা দুজন মার পায়ে ধরে ফেলবি।’নুড়ি কথা শেষ করে হাত তালি দিল। যেন সব সমস্যা শেষ! নুহাশ ভ্রু কুঁচকে বললো, ’মা,পা ধরে ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করে না।’

নুড়ির হাসি মিলিয়ে গেল। আলিয়া বললো, ’পেয়েছি,আমরা সব বই পড়ে শেষ করে ফেলবো। মা খুশি হবে।’

‘বছর পার হয়ে যাবে। মা এক বছর রেগে থাকবে?’বললো নুড়ি।

তারা ঘন্টাখানেক আলোচনা করলো। কোনো পরিকল্পনাই চূড়ান্ত হলো না। একজনের পছন্দ হয় তো অন্যজনের হয় না। হুট করে তারা পদ্মজার গলার স্বর শুনতে পেল। পদ্মজা লতিফাকে বলছে, ‘লুতু বুবু, বাড়ির বড় বিড়ালদের বলে দাও তাদের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে।’

নুহাশ,নুড়ি ও আলিয়া দ্রুত লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা মাঝ রাতে নিজ ঘর থেকে বের হয়। লতিফা জেগে ছিল। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করছে। পদ্মজার সংস্পর্শে এসে তার মুখের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া সব পাল্টে গেছে। রিনুকে বিয়ে দিয়েই সে পদ্মজার সঙ্গী হয়েছে। লতিফা জায়নামাজ ছেড়ে উঠতেই পদ্মজা বললো, ‘আমি বের হচ্ছি। আমাকে না পেয়ে ওরা যেন বের না হয়। আশেপাশের অবস্থা ভালো না। পাশের এলাকায় পর পর দুটো লাশ পাওয়া গেছে। এখানে আবার কোন চক্রান্ত চলছে কে জানে! দরজা বন্ধ করে রেখ।’

'তুমিও যাইয়ো না পদ্ম।'

পদ্মজা শুনলো না। প্রথমে ছেলেমেয়েদের ঘরে গেল। নুড়ি ও আলিয়া এক বিছানায় ঘুমাচ্ছে। আর নুহাশ পাশের বিছানায়। পদ্মজা ঘুমন্ত তিন ছেলেমেয়ের কপালে চুমু দিয়ে আলতো করে মুখ ছুঁয়ে দিল। এই তিনটে ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে সে ভীষণ ভালোবাসে। তাদের জন্য পদ্মজা নিজের জীবন কোরবান দিতেও প্রস্তুত। জীবনে যতটুকু আনন্দ আছে তার পুরোটা অবদান নুড়ি,নুহাশ আর আলিয়ার। পদ্মজা অনেকক্ষণ বসে রইলো। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো বাইরে। কোয়ার্টার ছেড়ে বের হতেই নিঃসঙ্গতা কামড়ে ধরে তাকে। আমিরের প্রতিটি মৃত্যুবার্ষিকীর রাত সে খোলা আকাশের নিচে কাটায়। চোখ বন্ধ করে অনুভব করে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো। এই সময়টুকু একান্ত তার আর আমিরের। ঘন্টাখানেক হেঁটে এসে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালো পদ্মজা। এই পাহাড়টি এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। একটা মই হলেই যেন আকাশ ছোঁয়া যাবে। আকাশের গায়ে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলজ্বল করছে। এর মাঝে কোন তারাগুলো পদ্মজার প্রিয়জন? পদ্মজা এক হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে ভেজা কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, 'আমার প্রিয়জনেরা!'

তার এই দুটি শব্দে প্রকাশ পায় ভেতরের সব দুঃখ,যন্ত্রণা, অভাববোধ। মা-বাবা,বোন,স্বামী,শ্বাশুড়ি সবাই আকাশটাতে থাকে। শুধু সে জমিনে রয়ে গেছে। পদ্মজা চোখ বুজলো। সাঁইসাঁই করে বাতাস বইছে। বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডায় শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। চোখের পাতায় দৃশ্যমান হয়,হেমলতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,রুক্ষমূর্তি, পূর্ণার আহ্লাদ, হাসি,আমিরের ছোঁয়ার বাহানা,বুকে নিয়ে কান্না থামানো। কত সুন্দর অতীত! কতোটা সুন্দর! পদ্মজা চোখ খুললো। তার ঘোলা দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে শিশির ভেজা ঘাসের উপর বসলো। দিনটা কেটে যায়, রাতটা তার কাটে না। আমির শয়নেস্বপনে রাজত্ব করে। পদ্মজা অসহায় চোখ দুটি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করে যদি তার স্বামীর মুখটা ভেসে উঠতো! কেমন আছে সে? পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। নীরবে কাঁদতে থাকে। কী ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে তাকে! দিনের আলোয় দেখা কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাগী পদ্মজা রাতের বেলায় এমন অসহায় হয়ে কাঁদে কেউ বিশ্বাস করবে? করবে না।

পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সে কারো উপস্থিতি টের পেল। তার দিকে কেউ হেঁটে আসছে। গত দুই সপ্তাহে দুটো খুন হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পাশের এলাকায়। এলাকাটি খুব কাছে। লাশের ছবি দেখে বুঝা গেছে,কেউ বা কারা দেশে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সেই সাথে লাশের শরীরের ক্ষতস্থান দেখে মনে হয়েছে,হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা শয়তানের উপাসনা করে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়। সে তার কোমরের খাঁজে থাকা খাপ থেকে ছুরি বের করলো। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো নুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে কালো বোরকা। নুড়িকে দেখে পদ্মজা অবাক হয়। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে অবাকের ছাপটা মুখ থেকে সরেও গেল। নুড়ি প্রায় সময় তাকে অনুসরণ করে। সে পদ্মজাকে একা ছাড়তে নারাজ। পদ্মজা ঘাসের উপর বসতে বসতে বললো, 'পিছু নিতে না করেছিলাম।'

নুড়ি কিছু বললো না। পদ্মজাও চুপ রইলো। নুড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো। নুহাশ ও আলিয়া দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেয়েও দূরে দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। লতিফা নুড়িদের আটকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঁদরদের সে আটকে রাখতে পারলো না। পারে তো তারা লতিফার হা-পা বেঁধে ফেলে। নুড়ি সাবধানে ডাকলো, 'মা?'

পদ্মজা দূরে চোখ রেখে নির্বিকার কণ্ঠে বললো, 'বল।'

'বাবার জন্য কাঁদছিলে?'

পদ্মজা নিরুত্তর। নুড়ি সময় নিয়ে দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলো, 'দুষ্টু রাজাটা বাবা আর মিষ্টি রানীটা তুমি তাই না আম্মা?'

পদ্মজা চমকে তাকালো। অপলকভাবে তাকিয়েই রইলো। নুড়ি কী করে জানলো,

তাদেরকে বলা গল্পটি তাদেরই মায়ের গল্প! নুড়িকে দেখলে মনে হয় না,সে যে পদ্মজা ও আমির হাওলাদারের নিজের মেয়ে নয়। নুড়ির চোখের দৃষ্টি ঈগলের মতো। যেমন চঞ্চল তেমন সাহস। সে ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আশেপাশে যা কিছুই ঘটুক সর্বপ্রথম তার চোখে ধরা পড়ে। পদ্মজা নুড়ির প্রশ্ন এড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলো। নুড়ি সংকোচ নিয়ে বললো, 'মা, তুমি সোয়েটার পরোনি। ঠান্ডা লাগবে।'পদ্মজা খাপে ছুরি রেখে বললো, 'নুহাশ আর আলিয়াও এসেছে?'

নুড়ি মাথা ঝাঁকালো। পদ্মজা নুড়িকে নিয়ে নিচে নেমে আসে। নুহাশ ও আলিয়ার সামনে এসে তিনজনের উদ্দেশ্যে বললো, 'সাহসী সঠিক সময়ে হতে বলেছি। এই রাতের বেলা ঝুঁকি নিয়ে মায়ের পিছু নিতে নয়।'লতিফা এগিয়ে এসে বললো, 'তোমারে লইয়া হেরা চিন্তাত আছিলো। খুনটুন যে হইলো গত সপ্তাত এর লাইগগা।"

পদ্মজা ভ্রু উঁচিয়ে বললো, 'তাহলে ওরা আমাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছে?'

নুড়ি,নুহাশ ও আলিয়া ভয়ে একজন আরেকজন চাওয়াচাওয়ি করলো। পদ্মজা হেসে তিনজনকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমার সাহসী বাচ্চারা! কিন্তু এতো রাতে আসা একদম ঠিক হয়নি। হ্যাঁ আমারও ঠিক হয়নি। আমরা কেউই আর ভুল করবো না। ঠিক আছে?'

তিনজন সমস্বরে বললো, 'ঠিক আছে মা।'

পদ্মজা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামে। পথে আলিয়া বললো, 'মা,একটা কথা বলবো।'

পদ্মজা আদুরে স্বরে বললো, 'বলো বাবা।'

'মজনু স্যার রূপকথা দিদিকে কিছু বলেছে মনে হয়।'

পদ্মজার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। মজনু তার স্কুলেরই একজন শিক্ষক। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের বাংলা পড়ায়। তার নামে অনেক অভিযোগ আছে। ছাত্রীদের হ্যারাস করে। শরীরে বিভিন্ন অজুহাতে হাত দেয়। বিয়ে করেছে দুটি। অনেক মেয়ে মজনুর জন্য স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। তারা কিছু বলতেও পারে না,সইতেও পারে না। মাস ছয়েক আগে স্কুলের এক মেয়ে দাবি করেছে,সে গর্ভবতী। মজনু তাকে ভয় দেখিয়ে অনেকবার শারিরীক সম্পর্ক করেছে। মজনু অস্বীকার করে। উল্টো সমাজে মেয়েটির বদনাম হয়। তাকে আর স্কুলে দেখা যায়নি। পদ্মজা সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য মেয়েটিকে খুঁজেছে। কিন্তু পেল না। তার পরিবারকেও পেল না। মজনু পদ্মজার সাথে ঘেঁষার চেষ্টাও করেছে অনেকবার। চরিত্রহীন,লম্পট পুরুষ সে। পদ্মজা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছিল,লাভ হয়নি। মজনু সিলেটের এমপি সুহিন আলমের শালা। এজন্যই পদ্মজার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমনকি সেই মেয়েটির পরিবার নাকি মামলা করেছিল,সেই মামলাও ধামাচাপা পড়ে যায় সুহিন আলমের ক্ষমতার কাছে। তাই মজনুর নাম উঠতেই পদ্মজা বিচলিত হয়ে উঠে। বললো, 'কেন এমন মনে হলো?'

নুড়ি মাথা নিচু করে বললো, 'রূপকথা দিদিকে ডেকেছিল মনে হয়। অনেকক্ষণ পর দিদি দ্বিতীয় ভবন থেকে বের হয়। তখন দিদি কাঁদছিল। দিদির চুল ঢোকার সময় খোঁপা ছিল বের হওয়ার সময় এলোমেলো ছিল।'

আলিয়া বললো, 'আমি আর নুড়ি আপা রূপকথা দিদিকে টিফিন টাইমে জাম গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছি মা।'

পদ্মজা তাদের মেয়েদের আশ্বস্ত করলো। বললো,সব ঠিক হয়ে যাবে। সারা রাত পদ্মজা এ নিয়ে ভেবেছে। মজনুকে আর সহ্য করা যায় না। মেয়েগুলোর জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলোকে দূষিত করে ফেলছে! আবর্জনা বেশিদিন রাখা ঠিক হচ্ছে না। চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে! পরদিনই স্কুলে গিয়ে পদ্মজা রূপকথাকে ডেকে পাঠালো। রূপকথা হিন্দু ধর্মালম্বী। খুব সুন্দর মেয়ে। রূপকথার ধর্মের ভাষায় বলা যায়, সে দেবীর মতো সুন্দর! নবম

শ্রেণিতে পড়ে। রূপকথা পদ্মজার সামনে এসে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়ালো। পদ্মজা রূপকথাকে পরখ করে বললো, 'তোমাকে ভীষণ হতাশাগ্রস্ত আর ভীতগ্রস্ত দেখাচ্ছে। আমাকে তোমার সমস্যা খুলে বলতে পারো।'
রূপকথা পদ্মজার কথায় অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। পদ্মজা চেয়ার ছেড়ে রূপকথার পাশে এসে দাঁড়ায়। রূপকথার মাথায় হাত রেখে বললো, 'মনের মাঝে চেপে রেখো না। কষ্ট লুকিয়ে রাখতে নেই। হাতের মুঠোয় এনে চেপে ধরে ধ্বংস করে দিতে হয়।'

রূপকথা পদ্মজার সংস্পর্শে আজ প্রথম এসেছে। পদ্মজাকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সম্মান করে,ভালোবাসে। তার ব্যবহার এবং সৌন্দর্য দুটোই সবাইকে অভিভূত করে ফেলে। অনেকে বলে পদ্মজার শরীরে তারা নাকি মা মা গন্ধ খুঁজে পায়। রূপকথাও পাচ্ছে। সে কেঁদে ফেললো। পদ্মজা রূপকথার মুখটা উঁচু করে ধরলো। বড়,বড় আঁখি তার। লাল টুকটুকে গাল,জোড়া ভ্রু। এমন সুন্দর মেয়ে কাঁদতে পারে! পদ্মজা বললো, 'মজনু স্যার কী বলেছে তোমাকে? আমাকে বলো।'

রূপকথা অনেক কষ্টে কান্না আটকে বললো, 'আমার মা-বাবা নেই। জ্যাঠা জ্যাঠামির কাছে থাকি। ঠাম্মার কথায় জ্যাঠা আমাকে পড়াচ্ছে। দিঘীপাড়ার সতেন্দ্র বাবু আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। জ্যাঠা বলেছে,পরীক্ষায় যদি ফেইল করি আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে।'পদ্মজা জানতে চাইলো, 'সতেন্দ্র বাবু মানে দিঘীপাড়ার মোড়ের মধু ব্যবসায়ী?'

'হু।'
'উনি তো তোমার দাদার বয়সী। আর যেহেতু তোমার জ্যাঠা বলেছে, ফেইল করলে বিয়ে দিয়ে দিবে। তাহলে পাস করার চেষ্টা করো।'রূপকথার কান্না বাড়লো। পদ্মজা বুঝতে পারলো, এখানে আরো ঘটনা আছে। সে কোমল কণ্ঠে বললো, 'লক্ষী মেয়ে, সবটা বলো আমাকে।'

রূপকথা বললো, 'মজনু স্যার বলেছেন,উনার সাথে প্রেম না করলে আমাকে ফেইল করিয়ে দিবেন। উনার সাথে যেন প্রেম করি। আমি ভয় পেয়ে যাই। আমি জানি না প্রেম কীভাবে করে। উনি যখন আমাকে ডাকেন,আমি যাই। আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। শরীরে হাত দেয়। আমার ভালো লাগে না। রাতে ঘুমাতে পারি না। ঠাম্মাকে বলছি,ঠাম্মা বলছে স্যার যা বলে শুনতে। তাহলে বেশি মার্ক পাবো। স্যার গত পরশু আমাকে বলছে, আমি আজ যেন স্যারের সাথে ঘুরতে যাই।'রূপকথা কাঁপছে। হেঁচকি তুলে কাঁদছে। অনাথ মেয়েটা! মা-বাবার আদর ছাড়া বড় হয়েছে। আপন দাদি সমস্যা শুনে বলেছে,স্যার যা বলে শুনতে। এতে নাকি বেশি মার্ক পাবে! কেমন মানসিকতা! আজ ঘুরতে গিয়ে জানোয়ারটা মেয়েটার কতবড় ক্ষতি করে ফেলবে কে জানে! মজনু সেই অভাগী মেয়েটিকেও কি এভাবে ভয় দেখিয়ে কাছে টেনেছিল? পদ্মজা রূপকথাকে বুকের সাথে চেপে ধরে। পদ্মজার গায়ের মিষ্টি ঘ্রাণে রূপকথা ডুবে যায়। মনে হচ্ছে,সে তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার কান্নার বেগ বাড়ে। পদ্মজা রূপকথার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'এই ব্যাপারে আর কাউকে কিছু বলো না। আজ বাড়ি চলে যাও।'

স্কুল ছুটির পর পদ্মজা মজনুর পিছু নেয়। মজনু তার বাসায় না গিয়ে সিলেট বোরহান উদ্দিন মাজারের পাশের এলাকায় গেল। পদ্মজাও সেখানে গেল। মজনু বার বার হাতের ঘড়ি দেখছে। বুঝা যাচ্ছে, সে কারোর জন্য অপেক্ষা করছে। পদ্মজা একটা সাদা বিল্ডিংয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর তাদের স্কুলের জামা পরা একটা মেয়ে মজনুর সাথে দেখা করতে আসে। পদ্মজা ঘৃণায় কপাল কুঞ্চিত করলো। মজনু পড়ানোর জন্য নয় সুযোগ ব্যবহার করে মেয়েদের ভোগ করার জন্য শিক্ষক হয়েছে। শিক্ষক কখনো লম্পট হয় না, লম্পটরা শিক্ষকের মুখোশ পরে। পদ্মজা পর পর তিনদিন সাবধানে মজনুকে অনুসরণ করে নিশ্চিত হয়েছে,মজনু রাতে ঘুমাবার পূর্বে বাইরে টং দোকানে চা খেতে যায়। তারপর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাড়ি ফিরে। রাস্তার দুই পাশে ঝোপজঙ্গল।এটা মজনুর প্রিয় অভ্যাস হতে পারে। রূপকথা তিনদিন পদ্মজার কথায় স্কুলে আসেনি। চতুর্থ দিন শেষে রাত

আটটায় পদ্মজা একখানা বড় লাগেজে একটি বড় ধানের বস্তা ও রাম দা নিল। খুলে নিল নিজের কানের দুল। শরীরে এমন কিছু রাখলো না,যা প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগতে পারে। কাঁধের ব্যাগে নিল বোরকা ও রুমাল । তারপর নতুন শাল দিয়ে মাথা ঢেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাত ঠিক দশটা বাজে তখন। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। ঠান্ডা বাতাস বইছে। মাঝেমধ্যে শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে। মজনু সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গুনগুন করে গান গেয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। হাঁটছে হেলেদুলে। আশেপাশে গাছপালা বেশি। রাস্তার দুই ধারের ঝোপজঙ্গল গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। এদিকটায় মানুষজন তেমন আসে না। পদ্মজা রাম দা নিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার লাগেজ ও কাঁধ ব্যাগটি কিছুটা দূরে রাখা। সে তীক্ষ্ণ চোখ দুটি মেলে অপেক্ষা করছে মজনুর জন্য। চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। তার নিঃশ্বাসেও যেন ছন্দ রয়েছে। শরীর ঠান্ডা করা ছন্দ! আর সেই ছন্দে আছে প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের পূর্বাভাস! মজনুর দেখা মিলতেই পদ্মজা চাপাস্বরে ডাকলো, 'স্যার...স্যার।'

যেন অশরীরী ডাকছে। মজনুর একটু ভয় করলেও উৎসুক হয়ে ডানে তাকালো। জঙ্গল থেকে কে ডাকছে! মজনু উঁচু স্বরে প্রশ্ন করলো, 'কে?'

'আমি স্যার...'

কণ্ঠস্বরটা চেনা মনে হচ্ছে। তবে কেমন যেন ভূতুড়ে এবং ভারী! মজনু হাতের সিগারেট ফেলে দুই পা এগিয়ে গেল। বললো, 'আমিটা কে?'

"আমি পদ্মজা।"

সমাপ্ত।

বিঃদ্রঃ

এতদিন যারা সাথে ছিলেন পুরো গল্পটা নিয়ে অনুভূতি বলে যাবেন। আর গল্প শেষ হওয়ার পর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন গ্রুপে রিভিউ দেয়। তাদের কাছে আমার রিকুয়েষ্ট,রিভিউ দেয়ার সময় স্পয়লার দিবেন না। এমনভাবে রিভিউ লিখবেন যেন গল্পের ভেতরের গোপনীয়তা থাকে।

উপন্যাসের ভেতর অনেক কুসংস্কার রয়েছে। পুরনো সময়কারের গ্রামের চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে কুসংস্কার আনা প্রয়োজন ছিল। দয়া করে কেউ বিব্রত হবেন না।